স্বামী বিবেকানন্দ

নতুন তথ্য নতুন আলো

স্বামী বিবেকানন্দ

নতুন তথ্য নতুন আলো

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

মান্না পাবলিকেশন

৩০/১ বি, কলেজ রো • কলকাতা-৭০০ ০০৯

বিবেকানন্দ-গবেষণায় আমার তিন সহযাত্রী

সুনীলবিহারী ঘোষ

লক্ষ্মীকান্ত বড়াল

বিমলকুমার ঘোষ

করকমলেষু

সূচিপত্র

সংযোজন

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-সম্পাদিত সচিত্র সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' পত্রিকায়

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ

স্বামী বিবেকানন্দ
নতুন তথ্য নতুন আলো

জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড হেস্টি এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত

॥ এক ॥

জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন, রেভারেন্ড হেস্টি, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামকৃষ্ণ পরমহংস, হেদুয়ার লোহার রেলিং—এই সবকিছুই স্বামী বিবেকানন্দের কলেজীয় ছাত্রজীবনের কথা মনে এলে ঘুরপাক খেয়ে জড়িয়ে যায়। কেন এমন ঘটে, একটু জট খুলে দেখবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

স্বামীজীর বিভিন্ন জীবনী ও তাঁর বিষয়ে স্মৃতিকথা ইত্যাদি থেকে দেখা যায়, তিনি সম্ভবত ১৮৮১ সালের গোড়ার দিকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। নরেন্দ্রনাথ ১৮৮০, জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের 'সাধারণ বিভাগে' ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু "প্রথম বর্ষের শেষে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া যথানিয়মে কলেজে আসিতে পারিতেন না। কাজেই নিয়মানুযায়ী বৎসরে যতদিন উপস্থিত থাকা আবশ্যক তাহা সম্ভব হইল না, এবং যথাকালে এফ্-এ পরীক্ষার অনুমতি বিষয়ে গোল বাধার সম্ভাবনা দেখা গেল। তাই তিনি বাড়ীর নিকটবর্তী জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) ভর্তি হইলেন।"[১]

স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রদত্ত উপরের বিবরণ স্বামীজীর বিখ্যাত ইংরেজী জীবনী[২] থেকেই গৃহীত। স্বামী নির্লেপানন্দ, কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শুনে স্বামীজীর প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগের অতিরিক্ত কারণের কথা অনুমান-মুখে জানিয়েছেন। ঐ সময়ে নাকি নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত অর্থকৃচ্ছ্রতায় ছিলেন, তাই "প্রথম বর্ষ প্রেসিডেন্সিতে পড়বার পরে অপেক্ষাকৃত কম মাহিনার মধ্যবিত্ত ছাপোষাদের জেনারেল অ্যাসেমব্লিতে দ্বিতীয় বর্ষে পাঠ বিচিত্র নহে।"[৩] এই তথ্য যেহেতু দ্বিতীয় কোনো সূত্র থেকে সমর্থিত হয়নি, তাই এখনো পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগের মূলে প্রথমোক্ত কারণের অতিরিক্ত একটি আনুমানিক কারণ আমরা উপস্থিত করতে পারি। আমরা দেখি যে, প্রেসিডেন্সি সরকারি কলেজ, যেখানে ছাত্রদের ইউরোপীয় পোশাকে বা ভারতীয় চাপকান ও পাজামা পরে যেতে হত। নরেন্দ্রনাথও চাপকান ইত্যাদি পরে কলেজে যেতেন। এই পোশাকের এবং সুবিহিত আচরণের কাষ্ঠবন্ধনে কি তাঁর মতো ঝঞ্ঝাময় চরিত্রের মানুষ সুখবোধ করতে পারেন? বিশেষত যখন দেখি, "কলেজে পাঠকালে তিনি বাহ্য বেশভূষার পারিপাট্য আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। ছাত্রদের মধ্যে কাহাকেও সৌখিন বাবু দেখিলে তিনি অনেক সময় তাহার মুখের উপর দু'কথা শুনাইয়া দিতেন।"[৪] অবশ্য একথাও আমরা

জেনেছি, বেশভূষার সকল অপরিপাট্যের মধ্যে তাঁর অভ্যস্ত রাজকীয়তা কদাপি আচ্ছন্ন থাকেনি। “কলেজে যাঁরা নরেন্দ্রনাথের বন্ধু বা পরিচিত জন ছিলেন, তাঁরা তাঁকে প্রচণ্ড প্রভাবশালী এবং মহাকুল-সম্ভবের গরিমায় আত্মসচেতন যুবকরূপেই জেনেছেন। তিনি ভারতীয় এবং ইংরাজ, উভয় শ্রেণীর অধ্যাপকেরই প্রশংসা ও শুভেচ্ছা অর্জন করেছিলেন। তাঁরা নরেন্দ্রনাথের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং মহাশক্তি-নিহিত ব্যক্তিত্বের কথা বলেছেন।”[৫]

জেনারেল অ্যাসেমব্লিতে ভর্তি হবার আরও একটি কারণ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের লেখায় পেয়েছি। তিনি বলেছেন : “ভাবীকালে [নরেন্দ্রনাথ] ধর্মাচার্য হইবেন, বোধহয় সেইজন্য দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অনুরাগ; রেভারেন্ড হেস্টি সাহেব পাশ্চাত্য দর্শনবিদ্যায় সুপণ্ডিত জানিয়া জেনারেল অ্যাসেমব্লিতে তাঁহার অধ্যাপনায় এল-এ [?] ও বি-এ পাস করেন।”[৬] একটি স্মৃতিকথায় জেনারেল অ্যাসেমব্লি কলেজ প্রসঙ্গে আরও পাই : নরেন্দ্রনাথের সময়ে অনার্স প্রথা চালু হয়নি। তিনি এ কোর্স অর্থাৎ আর্টস নিয়ে বি-এ পড়েন। বি কোর্স ছিল বিজ্ঞান। “দুই জড়িয়ে ফল বাহির হতো।” তাঁর “বিশেষ প্রীতি দর্শনে, ইতিহাসে। অধ্যক্ষ হেস্টি আর খ্যাতনামা মনীষী অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁর বিদ্যাগুরু। ডাক্তার জার্ডিন, ডবলিউ স্মিথ, জে এডওয়ার্ডস, মিস উইলসন প্রভৃতিও। ১৮৮৩ সালে বি-এ দেবার কথা। পাস করলেন ১৮৮৪-তে দ্বিতীয় বিভাগে। তখন গুণানুসারে কেবল প্রথম বিভাগের ফল দেওয়া হত। এই বছরই নীলরতন সরকার দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। স্বামীজীর জীবনীতে উল্লিখিত সহপাঠী হরিদাস, [চট্টোপাধ্যায়] দাশু সান্যাল (বিখ্যাত আইনজীবী দাশরথি সান্যাল) দ্বিতীয় বিভাগে। তৃতীয়ে বেশ কয়েকটি নাম আছে।”[৭]

॥ দুই ॥

নরেন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাস করলেও এফ-এ ও বি-এ পাশ করেন দ্বিতীয় বিভাগে। ফলাফল মাঝারি। আরও খারাপ হয়নি কেন, তাই আশ্চর্য। এর প্রথম কারণ, পরীক্ষা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। পড়ছেন যখন, তখন পাস করাটা দরকার, ডিগ্রির মূল্য নেই কে বলবে? কিন্তু জ্ঞানার্জনের সঙ্গে পরীক্ষায় ভাল করার কী সম্পর্ক? “কলেজীয় পড়াশোনাটা তাঁর কাছে তেমন গ্রাহ্যের বস্তু ছিলনা। বস্তুতঃপক্ষে পরীক্ষার আগে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। পরীক্ষা এসে গেলেই ও-বিষয়ে যত মনোযোগ, তাও কেবল পাসের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই। অন্য সময় নানা বিষয়ে বক্তৃতা শোনা, সমকালের চিন্তাবীরদের চিন্তাবস্তুকে আয়ত্ত করার চেষ্টায় কেটে যেত। অবশ্য কলেজের কিছু কিছু পাঠ্যবস্তু তাঁর পছন্দসই বিষয়ের মধ্যেই পড়েছিল।”

পরীক্ষার জন্য তিনি ব্যস্ত নন কেন, এ-বিষয়ে তাঁর এক কলেজ-সহপাঠী প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, “মাথায় একগাদা আজে-বাজে জিনিস ঠেসে রেখে কি ফল? আমি শুধু পাস করবার জন্য কলেজের পড়া পড়ি। ডিগ্রি দরকার, নইলে অন্ন জুটবে না।”[৮] কিন্তু যারা কেবল কলেজে নিছক ডিগ্রির জন্য যায়, জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের কোনো অভিপ্রায় রাখে না, তাদের সম্বন্ধে তাঁর ছিল সুস্পষ্ট বিতৃষ্ণা। তিনি বলেছিলেন: “পাস করাই তো জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আর পাসের পড়া মুখস্থ করা মানে শুধু স্মরণশক্তির অপব্যবহার করা। পাসটা

করতে হবে বলে যতটুকু পড়া দরকার, তাই করা উচিত।" অধিকতর বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলেছেন : "[এইসব] ছাত্রদের লক্ষ্য তো আর জ্ঞানার্জন নয়। তাই দেখি, ডিগ্রিটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে [তাদের] পড়াশোনা শেষ।"[৯]

এই ধরনের চিন্তার ফল : জ্ঞানসমুদ্রে মহাস্ফূর্তিতে সন্তরণ করতে করতে আচমকা সংবিৎ—সর্বনাশ, পরীক্ষা সমুপস্থিত। সুতরাং প্রাণপণ চেষ্টায় সেই দুর্গম পার্বত্য দ্বীপে উত্তরণের প্রয়াস। অর্থাৎ—নরেন্দ্রনাথের আত্মকথা:

"(পরীক্ষার সময়ে, রাত্রে) ঘরের মধ্যে বই নিয়ে বসতুম, আর পাশেই একটা পাত্রে থাকত কড়া চা বা কফি। ক্লান্ত হয়ে পড়লেই মাথা তাজা ক'রে নেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে তাতে চুমুক দিতুম। ঘুম পেলে পায়ে একটা দড়ি বাঁধতুম। তারপর ঘুমের ঝোঁকে বেহুঁশ হয়ে পড়লে যেই পায়ের দড়িতে টান পড়ত, অমনি আবার জেগে উঠতুম।"[১০]

নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী বন্ধু প্রিয়নাথ সিংহের স্মৃতিকথা :

"পরীক্ষার আর বেশি দেরী নাই, বোধহয় মাসখানেকও নাই—বিপুল কলেবর ইংল্যান্ডের ইতিহাস (Green's History of England) নরেন্দ্রনাথের একেবারে পড়া হয় নাই। পরীক্ষায় পাস করিতে হইবে বলিয়া নরেন্দ্রনাথের কোনো চেষ্টাই তাঁহার সহপাঠী বন্ধুরা দেখেন না; মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্র পূর্বোক্ত বন্ধুদের বাসায় চোরবাগানে একটু আধটু পড়াশোনা করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু তথায় যাইলে অধিক সময় কথাবার্তা বা গান গাওয়াই হইত। তাঁহার মাতুলালয়ে—একটি চোরকুঠরী বা দো-ছত্রীর ঘর ছিল। হামাগুড়ি দিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিতে হয়, এত ছোট।...এই সময় একদিন প্রাতে তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহার নিকট যাইয়া 'নরেন' বলিয়া ডাকিলে নরেন উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু বন্ধুটি তাঁহাকে তাঁহার [নিজের] ঘরের মধ্যে চারিদিকে খুঁজিয়া না পাইয়া একটু আশ্চর্য হইলেন। এমন সময় নরেন কহিলেন, 'এই চোরকুঠরীর ভিতর আছি।' সেইখান হইতেই বন্ধুর সহিত কথাবার্তা কওয়া হইল। পরে বন্ধু শুনিলেন, বিগত দুইদিন ওই কুঠরীর মধ্যে বসিয়া নরেন ইংল্যান্ডের ইতিহাস পাঠ করিতেছেন। সংকল্প করিয়া বসিয়াছেন যে, একাসনে বসিয়া পাঠ শেষ করিয়া তবে কুঠরী হইতে বাহির হইবেন। নরেন্দ্র কার্যত তাহাই করিলেন। তিনদিনে ঐ বিপুলকায় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া আসিলেন।"[১১]

এ-ধরনের জিনিস তিনি এই প্রথম করেননি। প্রবেশিকা পরীক্ষাকালে তিনি কী করেছিলেন, তার সংবাদ স্বামী সারদানন্দকে দিয়েছেন। পুনশ্চ, স্বামীজীর আত্মকথা :

"প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভের দুই-তিন দিন মাত্র থাকিতে দেখি, জ্যামিতি কিছুমাত্র আয়ত্ত হয় নাই। তখন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উহা পাঠ করিতে লাগিলাম এবং চব্বিশ ঘণ্টায় উহার চারিখানি পুস্তক আয়ত্ত করিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিলাম।"[১২]

জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গ-মধ্যে নরেন্দ্রনাথের চেহারার আরও কয়েকটি ছবি দেখে নেওয়া যেতে পারে। স্বামীজীর সব জীবনীতেই তাঁর

রসিক আনন্দময় স্বভাবের কথা আছে। ছাত্রদের মধ্যে তাঁর মতো রসিক কেউ ছিলেন না, একথা সহপাঠী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় হাস্যরসের সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বও ছিল অবিসংবাদিত। "রহস্যে-বিদ্রূপে, আমোদে-প্রমোদে, ক্রীড়ায়-সঙ্গীতে—সকল বিষয়েই তিনি অগ্রণী ছিলেন।" তাঁর রসিক স্বভাব, দুষ্টবুদ্ধি এবং বন্ধুপ্রীতির বিষয়টি চমৎকার ফুটেছে কলেজের কেরানি রাজকুমারবাবুর সঙ্গে মোকাবিলার ঘটনায়। ঘটনা এই—

বি-এ পরীক্ষার ফি জমা দেবার সময় এলে দেখা গেল—হরিদাস চট্টোপাধ্যায় নামে নরেন্দ্রনাথের এক সহপাঠী মুশকিলে পড়েছেন। তাঁর এক বছরের মাহিনা বাকি। সে টাকা দেওয়ার সঙ্গতি তাঁর নেই। তখনকার দিনে জেনারেল অ্যাসেমব্লিতে ধারে পড়া চলত—পরীক্ষার সময়ে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিলেই হত। অনেকে আবার বাকি টাকার পুরো বা আংশিক ছাড়ও পেত। এই ছাড় দেওয়ার ভার ছিল বৃদ্ধ কেরানি রাজকুমারবাবুর উপর। মানুষটি মোটের উপর সহৃদয়। সত্যই কোনো ছেলে অসুবিধায় পড়লে তিনি টাকা মকুব ক'রে দিতেন। আর এসব ক্ষেত্রে তিনি কয়েকজন প্রিয় ছাত্রের সুপারিশকে মূল্য দিতেন—নরেন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রণী। সুতরাং হরিদাস নরেন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হয়েছেন—এবং নরেন্দ্রনাথ ভরসা দিয়েছেন, কিছু ভাবিস নি; ফি'র টাকাটা জোগাড় রাখ, মাইনে আমি মকুব করিয়ে দেব। তদনুযায়ী তিনি নির্দিষ্ট দিনে অন্য ছাত্রদের সামনে রাজকুমারবাবুকে বললেন, 'মশাই, হরিদাস মাইনেটা দিতে পারছে না, ওকে মাপ ক'রে দিন', ইত্যাদি। এখন যে-কোনো কারণেই হোক, রাজকুমারবাবুর মেজাজ সেদিন ভালো ছিলনা। তারপর হয়ত নরেন্দ্রনাথের মুরুব্বিয়ানা একটু বেশি রকমই হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁর কথা শুনেই রাজকুমারবাবু মহা চটে, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'তোকে জ্যাঠামি ক'রে সুপারিশ করতে হবে না, নিজের চরকায় তেল দিগে যা। মাইনে না দিলে ওকে পাঠাব না।' শুনে হরিদাসের মাথায় বজ্রাঘাত, আর নরেন্দ্রনাথ চরম অপদস্থ। বন্ধুকে তিনি কিন্তু ভরসা দিলেন, ভয় নেই, আমি ব্যবস্থা ক'রে দেব। এবং তিনি ব্যবস্থা সত্যই করলেন। সেদিন সন্ধ্যার সময়ে নরেন্দ্রনাথ সিমুলিয়ার বাজারের সামনে হাজির, এবং কার জন্য যেন প্রতীক্ষারত। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার যখন গাঢ় হয়েছে, তখন দেখা গেল, রাজকুমারবাবু একটু গা-ঢাকা দিয়ে আসছেন। যাবেন—বাজারের পাশে একটি গলিতে—গুলির আড্ডায়। বৃদ্ধের ঐ নেশাটি ছিল, এবং গোপনে কাজ সারতেন। গলিতে তিনি ঢুকতে যাবেন—দেখেন রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছেন নরেন্দ্রনাথ। থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে দত্ত, এখানে কেন?' 'কেন আবার, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।'

আর ঘটনার বর্ণনা দেবার দরকার নেই। মিটমাট না ক'রে বৃদ্ধের উপায় ছিল না। হরিদাসের মাইনে মকুব হয়েছিল। এবং পরদিন প্রত্যুষে নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে গাইতে ("অনুপম-মহিম-পূর্ণ ব্রহ্ম কর ধ্যান") হরিদাসের বাড়িতে গিয়ে শুভ-সংবাদ দিয়ে এসেছিলেন।

আমরা সানন্দে লক্ষ্য করি, নরেন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীতগুলিকে কেবল ব্রাহ্মমন্দিরে পরিবেশন করবার জন্য তুলে রাখতেন না। স্ফূর্তি হলেই ও-বস্তু তিনি বিতরণ করতেন, যেমন পরীক্ষার সকালে তাঁকে "মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ" গাইতে গাইতে বন্ধুর বাড়িতে হাজির হতে দেখা গেছে। পরীক্ষার দিন পড়া ছেড়ে এ-ধরনের

সঙ্গীত-উৎসাহে পূর্ণ হবার কারণ কি—বন্ধু সেকথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর শুনেছিলেন : 'মাথাটা সাফ রাখছি। এগজামিনের দিন সকালে ফুর্তি ক'রে শরীর-মনকে শান্তি দিতে হয়। ঘোড়াটা খেটে এসে তাকে ডলাই-মালাই ক'রে যেমন তাজা ক'রে নিতে হয়, মগজটাকেও তাই করতে হয়।'

নরেন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই ওস্তাদ গায়ক হয়ে উঠেছেন। এমন যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রধান গায়ক তিনি—কোরাসে নেতৃত্ব করেন। আর গান আরম্ভ করলে শেষ হয় না, কারণ প্রতি গানের শেষে বন্ধুদের সহর্ষ দাবি—এনকোর্ এনকোর্। কলেজের একটি ঘটনা—

> "জেনারেল এসেমব্লিজ কলেজের ছাত্ররা প্রায়ই দল বাঁধিয়া তাঁহার গান শুনিতে বসিত। একদিন একজন ইংরাজ অধ্যাপক ক্লাসে আসিতে কিছু দেরী করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অধ্যাপকের আসিতে বিলম্ব আছে মনে করিয়া তাহারা সকলে নরেন্দ্রকে একটি গান গাহিতে অনুরোধ করিল। নরেন্দ্র গাহিতে আরম্ভ করিলেন, সকলে নীরব হইয়া শুনিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অধ্যাপক ক্লাসের নিকটে আসিয়া মনোহর সঙ্গীত শ্রবণে স্তব্ধ হইয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং গান থামিলে সহর্ষবদনে ক্লাসে প্রবেশ করিয়া গায়কের খুব প্রশংসা করিলেন।"[১৩]

॥ তিন ॥

কেবল সুখের তরণীতে দাঁড় বাওয়া নয়—গভীরে ডুব দিয়ে রত্নোদ্ধারের প্রয়াসও চলছিল। তর্কে ছিলেন অপরাজেয়। প্রতিবাদীর দু'চারটি কথা শুনেই ধরতে পারতেন, সে কি বলতে চায়, আর তার কোথায় দুর্বলতা? সুতরাং তাকে তারপর কাবু ক'রে ফেলতে অসুবিধা হত না। তাঁর বক্তব্য ছিল : "পৃথিবীতে কটাই বা নতুন চিন্তা আছে? সে-কটা জানা হয়ে গেলে তাদের সপক্ষে বা বিপক্ষে যে-কটা যুক্তি এ-পর্যন্ত প্রযুক্ত হয়েছে সেগুলি আয়ত্ত থাকলে বাদীকে ভেবেচিন্তে উত্তর দেবার প্রয়োজন হয় না।"

কলেজে থাকাকালে যেসব বিষয় বিশেষভাবে পড়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিল : হোয়েটলি, জেভনস্, মিল প্রভৃতির ন্যায়শাস্ত্র ; গ্রীনের 'হিস্টরি অব ইংলিশ পীপল্', অ্যালিসনের 'হিস্টরি অব ইউরোপ,' গিবনের 'ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার', কার্লাইলের 'হিস্টরি অব দ্য ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন', মার্সম্যান, এলফিনস্টোনের ইতিহাস-গ্রন্থাবলী, 'গডফ্রেজ্ অ্যাস্ট্রনমি'। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্য ব্যাপকভাবে পড়েছিলেন, ফলিত গণিতে আসক্তি ছিল—কিন্তু তাঁর প্রাণমন অধিকার করেছিল দর্শন—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। অ্যারিস্টটল, কান্ট, হেগেল, কোঁত, মিল, শোপেনহাওয়ার, স্পিনোজা, এবং হারবার্ট স্পেনসার। তাঁর দার্শনিক-জ্ঞান এমনই উচ্চপর্যায়ে উঠেছিল যে, সেকালের সুপণ্ডিত লেখক ও সম্পাদক অমৃতলাল রায় তাঁর সম্বন্ধে কাছাকাছি সময়ে বলেছিলেন, তিনি "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শ্রেণীর দর্শনে অনন্যসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী।"[১৪]

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ কাছে দর্শনচর্চা কেবল বুদ্ধিচর্চা ছিল না—তা তাঁর জীবনজিজ্ঞাসার

অংশ। ইতিমধ্যেই তিনি "এ-জীবন লইয়া কী করিব—কী করিতে হয়?"—এই মহৎ যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। ঝড় উঠেছে, যার বিষয়ে তাঁর জীবনীকার বলেছেন, "মনোরাজ্যে তুমুল ঝটিকা।" বাল্যাবধি ধ্যানপরায়ণ; বিচিত্র সব অনুভূতি লোক-জগতের সীমারেখাকে বিচলিত করেছে; কিন্তু বাইরের যুক্তিবুদ্ধিতে সেই 'কেন কিভাবে'র কিনারা ক'রে উঠতে পারছেন না; উত্তর সন্ধানে ধর্মের আচার্যদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন; প্রার্থিত প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে আরও অস্থির হচ্ছেন; কেবলই ভাবছেন, আমার দেখা দুটি স্বপ্নের কোন্‌টি আমার জীবনে স্বপ্ন নয়, মায়া নয়—সত্য, সত্য—

> "যৌবনে পদার্পণ করিয়া পর্যন্ত প্রতিরাত্রে শয়ন করিলেই [স্বামীজীর স্মৃতিকথন] দুইটি কল্পনা আমার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত। একটিতে দেখিতাম যেন আমার অশেষ ধনজন সম্পদ-ঐশ্বর্যাদি লাভ হইয়াছে।...আবার পরক্ষণে দেখিতাম, আমি যেন পৃথিবীর সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ভরপূর্বক কৌপীন ধারণ, যদৃচ্ছালব্ধ ভোজন এবং বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়া কাল কাটাইতেছি। ঐ দুই প্রকার...ছবি কল্পনায় উদিত হইয়া পরিশেষে শেষোক্তটিই হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত।"[১৫]

ঐ দ্বিতীয় জীবন সত্য—কিন্তু সে তো কেবল যৌবন স্বপ্নে—বাস্তবের কোন্‌ প্রাপ্তি ঐ জীবনকে ক'রে তুলবে অমোঘ নিয়তি...

নরেন্দ্রনাথের এইকালের অন্বেষু অস্থির জীবনের অনবদ্য কথাচিত্র দিয়েছেন জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের আর এক অসাধারণ ছাত্র, দার্শনিকচূড়ামণি ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তাঁর বিবরণে, তিনি যে-পরিমাণে নরেন্দ্রনাথকে দার্শনিক গ্রন্থাদি পাঠে প্রবৃত্ত করেছিলেন বলে দেখিয়েছেন, তার সম্বন্ধে ঈষৎ সন্দেহ প্রকাশ অবশ্যই করা যায়, কারণ দর্শনশাস্ত্র পূর্ব থেকেই নরেন্দ্রনাথের প্রিয় বিষয়, তবে নরেন্দ্রনাথের আগ্রহের বস্তু-তালিকায় আরও অনেককিছু ছিল, এবং উদ্‌ভ্রান্ত মানসিক অবস্থায় যেমন অনেকে কোনো বিশেষ বিষয়ে চর্চাকারী বন্ধুকে সেই বিষয়ে নানা প্রশ্নাদি ক'রে থাকে, নরেন্দ্রনাথ হয়ত সেইরূপই করেছিলেন—সে যাই হোক, সুগভীর ও আলোড়িত যে-বিবরণটি পেয়েছি, তা কেবল ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতো প্রতিভাধর লেখকই দিতে সমর্থ। 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থে তার যে অনুবাদ করেছিলুম, তার কিছু অংশ এই :

> "১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে বিবেকানন্দের সঙ্গে যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হলো তখন আমরা দুজনেই জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ কলেজে পড়ি এবং পণ্ডিত, দার্শনিক ও কবি উইলিয়ম হেস্টির ছাত্র। বিবেকানন্দ বয়সে আমার অপেক্ষা কিছু বড় হলেও আমি তাঁর এক ক্লাস উপরে পড়তাম। বিবেকানন্দ—নিঃসন্দেহে প্রতিভাসম্পন্ন যুবক, মুক্তস্বভাব, আচরণে বেপরোয়া, মিশুক, সামাজিক সম্মেলনের প্রাণস্বরূপ এবং মধুকণ্ঠ গায়ক; অসাধারণ বাক্‌-নিপুণ, যদিও কথাগুলি অনেক সময়েই অম্ল ও তিক্ত, পৃথিবীর ভণ্ডামি ও জুয়াচুরিকে তীক্ষ্ণশর সহাস্য বাক্যে অবিরত বিদ্ধ করেন, মনে হয় অবজ্ঞার উচ্চাসনে আসীন তিনি, কিন্তু সেই বক্রসংশয় তাঁর ছদ্মবেশ, তার দ্বারা আবৃত ক'রে রাখেন

কোমলতম হৃদয়কে—সব জড়িয়ে প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ বোহেমিয়ান, অথচ বোহেমিয়ানরা যাতে বঞ্চিত সেই লৌহকঠিন প্রতিজ্ঞায় সমৃদ্ধ, ভঙ্গিতে অটল ও অভ্রান্ত, অধিকারের দার্ঢ্য নিয়ে কথা বলেন, আর সেই সঙ্গে আছে চোখে এক অদ্ভুত শক্তি, যা সম্মোহিত ক'রে রাখে শ্রোতাদের।

"এ সমস্তই সকলের প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যকই জানত তাঁর ভিতরের মানুষটিকে—তাঁর সংগ্রামকে—অস্থির ও অধৈর্য অন্বেষার মধ্য দিয়ে সত্তার যে ঝড়ঝঞ্ঝা আত্মপ্রকাশ করত।

"তাঁর মানস-ইতিহাসের এক সংকট মুহূর্তের এই সূচনা-পর্বেই তিনি আত্মসচেতনতার জগতে জাগরিত হয়েছিলেন, যা তাঁর ভাবী ব্যক্তিত্বের ভিত্তিভূমি হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের বহির্মণ্ডল থেকে তিনি বালসুলভ আস্তিকতা এবং সহজ আশাবাদ অর্জন করেছিলেন—জন স্টুয়ার্ট মিলের 'থ্রি এসেজ্ অন রিলিজন' তাতে বিপর্যয় এনে দিল। সৃষ্টির হেতুবাদী এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা তাঁর কাছে খড়কুটোর মতো নির্ভরের অযোগ্য প্রতীয়মান হলো; তিনি প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্বের সমস্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন; সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার মঙ্গলময় স্বভাবের সঙ্গে সৃষ্টির অমঙ্গলকে তিনি কিছুতেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবতে পারলেন না। এক বন্ধু তাঁকে এইকালে হিউমের সংশয়বাদ এবং হারবার্ট স্পেনসারের অজ্ঞেয়বাদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলেন, ফলে তাঁর সাধারণ অবিশ্বাস রূপান্তরিত হলো স্থায়ী দার্শনিক সংশয়বাদে।

"বিবেকানন্দের প্রাথমিক সতেজ আবেগ এবং সহজ বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেল; এক ধরনের বিশুষ্কতা ও অবসাদ এলো—প্রার্থনাময় ভক্তির পুরাতন সামর্থ্য আর রইল না। স্বভাবসিদ্ধ উপহাস ও ঔদাসীন্যের দ্বারা তাকে আবৃত ক'রে রাখলেও ব্যাপারটা তাঁর আত্মাকে অস্থির ক'রে তুলল যন্ত্রণায়। কিন্তু তখনো রইল সঙ্গীত—যা আলোড়িত করত তাঁর গভীরকে—যা তাঁকে অলৌকিক, অপার্থিব ও অপ্রত্যক্ষ সত্যের চেতনায় উন্নীত করত—যা অশ্রু আনত নয়নে।

"এই সময়ে তিনি আমার কাছে এলেন। যে-বন্ধু তাঁকে হিউম ও হারবার্ট স্পেনসারের গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই বন্ধুই আলাপ ঘটিয়ে দিলেন। আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে মুখ-চেনা পরিচয় ছিল, কিন্তু এই সুযোগে তিনি নিজেকে উন্মোচন করলেন আমার কাছে—বলে গেলেন সংশয়ের যন্ত্রণার কথা, নিত্যবস্তু সম্বন্ধে স্থিরপ্রত্যয়ে উপনীত হতে না-পারার নৈরাশ্যের কথা। তাঁর মানসিক অবস্থার উপযোগী হতে পারে এমন আস্তিক্য দর্শনের কথা জানতে চাইলেন। কয়েকজন প্রামাণ্য লেখকের নাম আমি করলাম। কিন্তু 'ইনটিউশনিস্টদের, সেইসঙ্গে স্কচ 'কমনসেন্স'-মতবাদীদের ধরাবাঁধা ছেঁদো যুক্তি তাঁর অবিশ্বাসকেই দৃঢ়তর ক'রে তুলল। তাছাড়া, একঘেয়ে সবকিছু পড়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট ধৈর্য তাঁর আছে বলে মনে হলো না; নিজ স্বভাব অনুযায়ী তিনি গ্রন্থ থেকে আহরণের চেয়ে জীবনের সহযোগ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহেরই পক্ষপাতী। প্রাণ থেকে প্রাণ—চিন্তা থেকে চিন্তার প্রজ্বলনই তাঁর প্রকৃতিসিদ্ধ।

"আমি বিবেকানন্দের দিকে সুগভীরভাবে আকৃষ্ট হলাম, কারণ বুঝলাম—তিনি নিষ্পত্তি করতে চান ঐকান্তিকভাবে।"

এর পরে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বর্ণনা করেছেন—কিভাবে নরেন্দ্রনাথ তাঁর কথা অনুযায়ী বিভিন্ন দর্শন ও চিন্তার জগতে প্রবেশ করেছিলেন এবং তার প্রতিক্রিয়া কি প্রকার হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ শেলী পড়লেন—'শেলীর প্রজ্ঞাময় সৌন্দর্যতত্ত্বের বন্দনা, নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বপ্রেমের তত্ত্ব, এবং গৌরবদীপ্ত চিরশ্রেয় মানবসমাজের ভাবদর্শন' তাঁকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছিল, যা দার্শনিকদের যুক্তিতর্ক করতে পারেনি। এর ফলে ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কাছে আর প্রাণহীন, প্রেমহীন, যন্ত্রবিশেষ থাকেনি। অনুভব করেছিলেন—তার মধ্যে আছে জাগ্রত আধ্যাত্মিক ঐক্য। ব্রজেন্দ্রনাথ অতঃপর নরেন্দ্রনাথের কাছে শেলীর ঐক্যবোধের অপেক্ষা উচ্চতর ঐক্যবোধ উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন যা ঐকালে তাঁর ভাষায়—সার্বিক হেতুবোধ। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর দার্শনিক প্রত্যয়ে একের মধ্যে তিনটি তত্ত্বকে সমন্বিত করতে সচেষ্ট ছিলেন—বেদান্তের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ, হেগেলের 'ডায়ালেক্‌টিকস্ অব দ্য অ্যাবসলিউট আইডিয়া' এবং ফরাসি বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা তত্ত্ব। এই সময়ে তাঁর বিবেচনায় অনুভূতি ব্যাপারটা শারীরিক ছাড়া আর কিছু ছিলনা। ব্রজেন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, তরুণ, অভিজ্ঞতাহীন স্বাপ্নিকের ভাবাবেগ নিয়ে তিনি নিজে বৈপ্লবিক সমাজের কল্পনায় নিয়োজিত ছিলেন—যেখানে যুক্তিহীনতার বন্ধন থেকে সমাজের মুক্তি ঘটেছে এবং সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা, মুল মন্ত্র হিসাবে যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সে যাই হোক, 'সার্বিক হেতুবাদ' নরেন্দ্রনাথের বুদ্ধিকে তৃপ্ত করলেও তিনি শান্তি পেলেন না।

"সত্তার আরও গভীরে প্রবেশ করল সংঘাত, কারণ সার্বিক হেতুর ধারণা তাঁকে তাঁর শিল্পী ও বাউল স্বভাবের স্পর্শকাতরতা ও অভীপ্সাকে দমিত করতে আহ্বান করল। তীক্ষ্ণ ও তীব্র তাঁর অনুভূতি, আবেগে দুর্বার, যৌবনের স্পর্শচেতনায় কোমল, বন্ধুসঙ্গে সদানন্দ মুক্তপ্রাণ। এ সকলকে দমন করার অর্থ—নিজের স্বাভাবিক বিকাশকে রোধ করা, কার্যত আত্মহত্যা করা। তাঁর সংগ্রাম শীঘ্রই গভীর নৈতিক রূপ গ্রহণ করল—বাসনা ও ইন্দ্রিয়ের উপর হেতুর আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রাম। ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ, যৌবনের আকাঙ্ক্ষাকে তাঁর মনে হলো—অপবিত্র, স্থূল ও দৈহিক। তাঁর জীবনের ঘনতম সংঘাতের এই কাল। সঙ্গীতনৈপুণ্যের জন্য যেসব বন্ধু জুটেছিল, তাদের অনেকের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে ছিল তিক্ততম প্রকাশ্য ঘৃণা। কিন্তু মজা-মজলিশের প্রতি তাঁর আগ্রহও ছিল অপরিসীম। তাই আমি যখন কোনো-কোনো সন্ধ্যায় সঙ্গীতের আসরে তাঁর সঙ্গী হতাম, তিনি আশ্বস্ত হতেন। তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম—সমুচ্চ, ঐকান্তিক ও পবিত্র স্বভাবকে—সে স্বভাব প্রচণ্ড অনুভূতিতে স্পন্দিত-ধ্বনিত। তিনি অবশ্যই অল্পমুখ, বিরক্তস্বভাব, শুচিবাতিক ছিলেন না, কিংবা স্বভাব-বিষণ্ণ কোনো মানুষের মতো; আমাকে বাঁচিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সঙ্গে রীতি-গর্হিত ভাষাও ব্যবহার করতেন। প্রচলিতের ঘাড় ধরে নাড়া দেওয়ায়, ভব্যরীতিকে তার সাজানো আবাসে আক্রমণ করার মধ্যে তাঁর যেন একটা বিকট আনন্দ ছিল, এবং আনন্দের জন্য যা করতেন তা অন্তরঙ্গ ভিন্ন অন্যদের কাছে অনেক সময়ই উদ্ভট ও বিভ্রান্তিকর বলে মনে হতো—কিন্তু সেই একই কালে সত্তার নিভৃত আলয়ে তিনি বাসনার সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত, মায়ার সূক্ষ্ম মোহজাল ছিন্ন করতে উদ্যত।"

এর পরে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, যিনি স্বভাবে দার্শনিক, এবং সেইকালে কেবল বুদ্ধিযোগে সর্বসমস্যার সমাধানে বিশ্বাসী, তাঁর সঙ্গে—সকল দার্শনিক চিন্তাতে পারঙ্গম হয়েও অপরোক্ষ অনুভূতির জন্য মথিতচিত্ত নরেন্দ্রনাথের ভাবসংঘাতের অপূর্ব বর্ণনা করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ অকুণ্ঠে স্বীকার করেছেন নিজের তৎকালীন মননগত সংকীর্ণতাকে :

"বিবেকানন্দ বারে বারে সন্ধান করতে লাগলেন সেই শক্তিকে যা তাঁকে বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে—উদ্ধার করবে এই দুষ্কর সংগ্রাম থেকে। উত্তরে, আমি শুধু বিশুদ্ধ হেতুবাদের মহিমার কথাই বলতে পারলাম: সার্বিক হেতুর সঙ্গে একাত্মতা আনতে পারলে আসবে প্রার্থিত অপার প্রশান্তি। আমার কাছে এই কালটা প্লেটোর অতীন্দ্রিয়বাদের বিজয়ের যুগ। অবাধ্য দেহচেতনা বা বিদ্রোহী মনের অভিজ্ঞতা আমার ঘটেনি। কৃপাবাদ বা ঈশ্বরধ্যান জাতীয় কৃত্রিম বহিরঙ্গ সাহায্যের কাছে যে-স্বভাব ও মন আত্মসমর্পণ করে—তাদের বিষয়ে তখন আমার যথেষ্ট মানসিক সহিষ্ণুতা ছিলনা। হেতুবাদের সঙ্গে অনুভূতি ও স্বভাবধর্মকে সমন্বিত করার কোনো প্রয়োজন তখন আমি বোধ করিনি। 'আইডিয়াল ও রিয়্যাল', 'নেচার ও স্পিরিট'-এর মধ্যে বিরোধ যে একটি বিশেষ সত্য—এই বিষয়ক ধারণা আমার মনে বহিরঙ্গভাবে ইতিপূর্বে এসে গিয়েছিল, আরও পরে সেটা আত্মগত ভাবেও আসবে, যদিও বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতার রূপের সঙ্গে তার পার্থক্য থাকবে—কিন্তু ঐকালে তাঁর সমস্যা আমার সমস্যা নয়, তাঁর সংকট আমার সংকট নয়।

"বিবেকানন্দ স্বীকার করলেন—তাঁর বুদ্ধি যদিও নির্বিশেষ তত্ত্বের দ্বারা বিজিত, কিন্তু তাঁর হৃদয় ব্যক্তি-অহং-এর অনুগত। তাঁর অভিযোগ হলো—রক্তহীন হেতুবাদ, যা বাস্তবতা নয়, শুধু পুঁথিগতভাবে সার্বভৌম—সে বস্তু কিন্তু প্রলোভন থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তিনি জানতে চাইলেন—আমার দর্শন কি তাঁর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি আনতে পারবে, আত্মার উদ্ধারের জন্য কার্যত শারীরিক মধ্যস্থতায় সমর্থ হবে? সংক্ষেপে, তিনি যেন রক্তমাংসে দর্শনীয় আকারভূত সত্যকে চাইলেন; সর্বোপরি অধীর হয়ে আর্তনাদ করলেন এমন একটি শক্তির জন্য যার বাহু তাঁকে রক্ষা করবে, উন্নীত করবে, উদ্ধার করবে এই নিষ্ফলতা থেকে, তাঁর শূন্য ভুবনে আনবে মহিমার প্লাবন—তেমন একজন গুরু চাই, চাই দেহধারী পূর্ণতাকে, চাই বিক্ষুব্ধ আত্মার শান্তিদাতাকে।

"দেহীর মধ্যে এই পূর্ণতা সন্ধান, উদ্ধারের জন্য এই বহিরঙ্গ শক্তির প্রার্থনা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বোধের (Sense) কাছে যুক্তির (Reason) এহেন বলিদানকে অ-প্রজ্ঞাজাত দুর্বলতা বলেই তৎকালে আমার মনে হয়েছিল। তরুণ অনভিজ্ঞ আমি—নিজের সঙ্গে সংগ্রামে অস্থির একটি আত্মার সম্মুখীন হয়ে বলতেই পারলাম না—কোথায় তার শান্তি মিলবে? বিবেকানন্দ শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও আচার্যদের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। আদর্শের দেহগত বাস্তবতা, সত্যের প্রত্যক্ষতা, পরিত্রাণশক্তির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তাঁর সেইসব প্রশ্নের ভিতরে ছিল অসচেতন সক্রেটিসীয় বিদ্রূপ। বিবেকানন্দ তিক্তভাবে অভিযোগ জানালেন—তিনি সুনীতি-সন্দর্ভ যথেষ্ট পড়েছেন, তত্ত্বকথা শুনতে বাকি নেই, কিন্তু ঐসব নীরস বিস্বাদ জিনিসে আর রুচি নেই। বহু মত, পথ ও শিক্ষকের কাছে তিনি গেলেন—"

॥ চার ॥

ব্রজেন্দ্রনাথ অতঃপর লিখেছেন, "এমন এক সংশয়ী সন্ধানই তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কাছে হাজির করেছিল, যিনি অন্যের অসাধ্য অধিকারের সুরে কথা বলেছিলেন, নিজ শক্তিতে এনেছিলেন বিবেকানন্দের আত্মায় শান্তি, তাঁর সত্তার ক্ষতকে করেছিলেন নিরাময়।"

বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন—সেই তাঁর নিয়তি। নিয়তি কারও বাধ্য নয়। তবু ঘটনাগতির আপাত কারণের সন্ধান করতে হয়, এবং সেখানে আমাদের জন্য একটি নাটকীয় ঘটনা অপেক্ষা ক'রে আছে।

নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী হরমোহন মিত্র বলেছেন :

"ছাত্ররা ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা বুঝতে পারেনি বলে একদিন আমাদের ইংরাজির সাহেব-অধ্যাপক ছাত্রদের উপর ক্ষেপে গিয়েছিলেন। তিনি রেগে গিয়ে, টেবিল চাপড়ে, বুট দিয়ে পাদানি ঠুকে, শেষ পর্যন্ত ক্লাস ছেড়ে চলে গেলেন। সেই সময়ে আমি কি-একটা কাজে ক্লাসঘর থেকে বাইরে যাচ্ছিলাম—কিন্তু দেখতে পেলাম, প্রিন্সিপাল রেভারেন্ড হেস্টি ক্লাসঘরের দিকে গট্ গট্ ক'রে আসছেন। আমি ফিরে এসে হেস্টি-সাহেবের বক্তৃতা শুনতে লাগলাম। তিনি বললেন, 'অমুক অধ্যাপক বলেন যে, ছেলেরা নির্বোধ, তারা ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা বুঝতে পারেনা। সম্ভবতঃ তিনি নিজেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ বোঝেন না। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মাঝে মাঝে সমাধি ইত্যাদি হতো।' তারপর তিনি এই বলে শেষ করলেন, 'এমনি ধরনের এক ব্যক্তি দক্ষিণেশ্বরে আছেন, যাঁর সমাধি হয়। তোমরা তাঁকে দেখে এসো'।"[৬]

স্বামীজীর জীবনী থেকে জেনেছি, পূর্বোক্ত পাঠ্য কবিতাটি ছিল—ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'একস্‌কারসান'। স্বামী সারদানন্দ, নরেন্দ্রনাথের গুরুভ্রাতা এবং বন্ধু, শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে উক্ত ঘটনার এই বিবরণ দিয়েছেন :

"দক্ষিণেশ্বরে [প্রথম] আসিবার কালে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কলিকাতার জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন নামক বিদ্যালয় হইতে এফ-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। উদারচেতা সুপণ্ডিত হেস্টি-সাহেব উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। সাহেবের বহুমুখী প্রতিভা, পবিত্র জীবন এবং ছাত্রদিগের সহিত সরল সপ্রেম আচরণের জন্য নরেন্দ্রনাথ ইঁহাকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। সাহিত্যের অধ্যাপক সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায়[১১] হেস্টি-সাহেব একদিন এফ-এ ক্লাসের ছাত্রবৃন্দকে সাহিত্য অধ্যয়ন করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুভবে উক্ত কবির ভাবসমাধি হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ সমাধির কথা বুঝিতে না পারায় তিনি তাহাদিগকে উক্ত অবস্থার কথা যথাবিধি বুঝাইয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, 'চিত্তের পবিত্রতা ও বিষয়বিশেষে একাগ্রতা হইতে উক্ত অবস্থার উদয় হইয়া থাকে। ঐ প্রকার অবস্থার অধিকারী বিরল দেখিতে পাওয়া যায়।

একমাত্র দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আজকাল ঐরূপ অবস্থা হইতে দেখিয়াছি। তাঁহার উক্ত অবস্থা একদিন দর্শন করিয়া আসিলে তোমরা এ-বিষয়ে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।' ঐরূপে হেস্টি-সাহেবের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা প্রথম শ্রবণ করিবার পরে, সুরেন্দ্রনাথের [সুরেন্দ্রনাথ মিত্র] আলয়ে তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছিলেন"।[১৮]

বিবেকানন্দের মহাজীবনে আগ্রহী অগণিত মানুষকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে—প্রিন্সিপাল হেস্টিই তাঁকে প্রথম ঠিকভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবহিত করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ এবং তাঁদের পত্র-পত্রিকা, বা অন্য সূত্র থেকে নরেন্দ্রনাথ পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনলেও শুনতে পারেন, কিন্তু সেই রামকৃষ্ণ যে যথার্থ বিবেচনা-যোগ্য কেউ, একথা হেস্টির সূত্রেই তাঁর কাছে স্বীকার্য হয়েছিল। একথা স্বয়ং তিনি নিবেদিতাকে বলেছিলেন। খ্রীস্টান মিশনারিরা ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে তাঁর উপরে কোনো প্রভাব বিস্তার করেছেন, একথা স্বামীজী স্বীকার করেননি। কিন্তু পরিষ্কার বলেছিলেন—অধ্যক্ষ হেস্টিই তাঁকে রামকৃষ্ণের কাছে প্রেরণ করেন। ["It was he who had first sent the Swami to Sri Ramakrishna"][১৯]

হেস্টির সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সম্পর্কের বিষয়টিকে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া যাক। মিশনারি হেস্টি সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের কোনো সমাদরের মনোভাব থাকতে পারেনা। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত থাকা কালে, বা পরে রামকৃষ্ণ-শিষ্যরূপে, খ্রীস্টীয় ধর্মতত্ত্বের রীতিমূলক অংশ সম্বন্ধে তিনি অবশ্যই আগ্রহ বোধ করেননি, যদিও যীশুখ্রীস্ট সম্বন্ধে তাঁর ছিল অত্যুচ্চ শ্রদ্ধা, যাঁর চরণপদ্ম তিনি হৃদয়রক্তে ধুইয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। হেস্টি তাঁকে আকর্ষণ করেছিলেন—প্রথমত তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের দ্বারা, দ্বিতীয়ত পাণ্ডিত্যশক্তিতে—বিশেষ তাঁর দর্শন-পাণ্ডিত্যে। হেস্টির সাহিত্যদৃষ্টির দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হতে পারেন।

একেবারে শেষোক্ত প্রসঙ্গে বলতে পারি—নরেন্দ্রনাথ ইংরাজ কবিদের মধ্যে এইকালে ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিশেষ পক্ষপাতী—এবং আমরা আগেই দেখেছি, হেস্টি কিভাবে একদিন ছাত্রদের ওয়ার্ডসওয়ার্থের সুগভীর ভাবাত্মক কবিতা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এই শিক্ষা নরেন্দ্রনাথ কেবল একদিন পেয়েছিলেন এমন হতে পারে না। ব্যক্তিগত আলোচনাতে বহুভাবে তা শুনতে পারেন। নরেন্দ্রনাথের ওয়ার্ডসওয়ার্থ-প্রীতি সম্বন্ধে তাঁর জীবনীতে পাই :

"ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থকেই তিনি কাব্যগগনের ধ্রুবতারা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং উক্ত কবির উচ্চভাবপূর্ণ কবিতার অধিকাংশ স্থলই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি ছন্দোঝঙ্কারপূর্ণ শব্দবিন্যাসকেই কবিতা মনে করিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল, প্রকৃত কাব্য বহুবর্ণাঙ্কিত চিত্রপটের ন্যায় একখানি মনোরম শব্দময় চিত্রবিশেষ; ইহা যেন আদর্শকে লোকলোচনের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার শ্রেষ্ঠতম শিল্প—সত্যকে সাধারণ জগতের অঙ্গীভূত করিবার একমাত্র কৌশল।"[২০]

হেস্টির পাণ্ডিত্য যে, নরেন্দ্রনাথকে অভিভূত করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আমরা আগেই বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের রচনানুযায়ী জেনেছি—জেনারেল অ্যাসেমব্লিতে তাঁর ভর্তি হবার অন্যতম কারণ, অধ্যক্ষ হেস্টির দর্শনপাণ্ডিত্যের খ্যাতি, এবং সত্যই তিনি দিকপাল পণ্ডিত ছিলেন। অধ্যাপক অলোক রায় পুরশ্রী পত্রিকায় (১২ জানুয়ারি, ১৯৮০) "অধ্যক্ষ

উইলিয়াম হেস্টি" নামে এক প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন, তার থেকে জেনেছি যে, হেস্টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন, পদার্থ, গণিত বিদ্যাতেও তাই, তবে সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখান দর্শন শাস্ত্রে। দর্শনে প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে স্নাতক হন, পরে 'ব্যাচেলার অফ ডিভিনিটি' উপাধি পান। তার পরে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান ঘুরে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করেন। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষাশিক্ষাও করেন। ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, ইতালিতে শিক্ষা নেন—বিশেষত জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাইডেলবার্গ, গটিনজেন, ইউট্রেকট)। ১৮৯৪ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় যখন তাঁকে 'ডক্টর অফ ডিভিনিটি' উপাধি দেয় তখন তাঁর বিষয়ে বলা হয়েছিল: "Rev. William Hastie than whom few of its alumni during its history of 300 years can have had a more distinguished University record."

১৮৮১ সালের গোড়ায় নরেন্দ্রনাথ যখন জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ কলেজে প্রবেশ করলেন—তার দু-বছর আগেই হেস্টি উক্ত কলেজে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেছেন, ঐ দু-বছরের মধ্যেই তাঁর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়েছে এবং তাঁর নেতৃত্বে এই কলেজ দেশের প্রধান বে-সরকারী কলেজ হয়ে উঠেছে। একথা ধরে নিতে বাধা নেই—নরেন্দ্রনাথ হেস্টির দর্শনের ক্লাস শুনতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনের বিষয়ে আলোচনা করতেন। স্বামীজীর জীবনীতেও আছে: "ভারতবর্ষে ইংরেজ পণ্ডিতদিগের মধ্যে তখন কেহই পাণ্ডিত্যে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট দর্শনশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন।"[২১]

হেস্টির মতো বিরাট পণ্ডিত, যুবক নরেন্দ্রনাথের দর্শনশাস্ত্রে অধিকার সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন, তা চরম গৌরবজনক। হেস্টি বলেছিলেন—

"Narendra Nath Dutta is really a genius. I have travelled far and wide, but I have never yet come across a lad of his talents and possibilities, even in the German Universities, amongst philosophical students."[২২]

ব্যক্তিমানুষ হিসাবে হেস্টির সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার অবধি ছিলনা। সারদানন্দের পূর্বে উদ্ধৃত রচনাংশে তা আমরা দেখেছি। ১৮৯৮ সালে নিবেদিতাকে তিনি হেস্টির বিষয়ে যা বলেছেন, তার মধ্যেও ঐ শ্রদ্ধার যথেষ্ট পরিচয় আছে। তিনি গাঢ় স্নেহপূর্ণ অনুরাগের সঙ্গে হেস্টি সম্বন্ধে বলেছিলেন, "উষ্ণ-মস্তিষ্ক বৃদ্ধ"। কেন তিনি একথা বলেছিলেন, তার যথেষ্ট কারণ আমরা অধ্যাপক অলোক রায়ের প্রবন্ধ থেকে খুঁজে পাই। এই একগুঁয়ে, আদর্শবাদী এবং আপসবিরোধী মানুষটি যেন সর্বদা বিবাদ-বিতর্কের বোঝা ঘাড়ে ক'রে ঘুরতেন। তিনি কেবল হিন্দুধর্মকেই বিশ্রীরকম গালিগালাজ ক'রে হিন্দুসমাজের ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র হননি (সে-প্রসঙ্গ পরে আসবে), নিজ মিশনের কর্তাব্যক্তি ও সাধারণ কর্মীদের সঙ্গেও ঝগড়া বাধিয়েছিলেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য তাঁর পক্ষে ছিল—কিন্তু তিনি যে মাথাগরম মানুষ তা সকলেই বুঝে নিয়েছিলেন। হিন্দুধর্মের অযথা কুৎসা করলে তাঁর কলেজের ছাত্ররাও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে প্রতিবাদসভা করেন এবং সেখানে হেস্টি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কৈফিয়ত দেন। সঙ্গতভাবেই অনুমান করতে পারি, এক্ষেত্রে হেস্টি-বিরোধী ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু যেহেতু নরেন্দ্রনাথ

হেস্টিকে খুব নিকট থেকে দেখেছেন তাই তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে যাই হোক, মানুষটি সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা টলেনি। হেস্টি যখন স্কটিশ জেনানা মিশনের স্কুল ও অনাথাশ্রমের সুপারিনটেনডেন্ট, মিস পিগট নাম্নী এক ইউরেশিয়ান মহিলার 'যথেচ্ছাচার' সম্বন্ধে কিছু সত্য কথা তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন, যার জন্য মানহানির দায়ে পড়ে তাঁকে কারাবাসসহ অসীম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়—এবং হেস্টির দ্বারা নিন্দিত হিন্দুসমাজই গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে তাঁর মর্যাদারক্ষায় এগিয়ে আসে—নরেন্দ্রনাথ তখন নিশ্চয় মনে করেছিলেন, আমার অধ্যাপক অবশ্যই আলোকপ্রাপ্তদের অন্ধকারবিলাসের চেহারা দেখে চমৎকৃত হচ্ছেন। কিন্তু একই সঙ্গে অসীম মমত্ববোধ করেছিলেন এই আদর্শবাদী বেপরোয়া মানুষটির দুঃখ-দুর্দশা দেখে, শ্রদ্ধাও বোধ করেছিলেন একইসঙ্গে।

হেস্টি ও নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল একেবারে ব্যক্তিগত ভালবাসা। হেস্টির ভালবাসা নরেন্দ্রনাথকে কতখানি প্রশ্রয় দিত, তার উল্লেখ করেছেন বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল।—"প্রতিভায় প্রীত হইয়া অধ্যাপক নিজ কক্ষেও প্রাণ ভরিয়া [নরেন্দ্রকে] শিক্ষা দিতেন। ভালবাসায় দোষ দেখিতে পায়না, তাই নরেন্দ্রনাথের ধূমপানের ব্যবস্থা করিয়া দেন।"[২৩] এখানে স্মরণ করানো যায়, নরেন্দ্রনাথের এই অসংবরণীয় ধূমপান-দোষটি অন্য মান্যজনদের দ্বারাও লালিত হয়েছে—যাঁদের মধ্যে তাঁর পিতা এবং গুরুদেবও আছেন।

যাই হোক, নরেন্দ্রনাথের নিজ কথায় দেখি—তিনি হেস্টিকে সেই মহাপ্রাণ আচার্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন, যাঁর গৃহদ্বারই কেবল ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত ছিলনা—গৃহমধ্যের সকল কিছুই ছিল ছাত্রদের জন্যই।

["He (Swamiji) told us with much pride of his only contact with missionary influences, in the person of his old Scotch master, Mr. Hastie. This hot-headed old man lived on nothing and regarded his room as his boys' home as much as his own."] [২৪]

॥ পাঁচ ॥

রেভারেন্ড হেস্টি, নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পাঠিয়ে খ্রীস্টান সমাজের কাছে বিশেষ দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। ১৮৯৪ সালে এন্টালিতে ব্যাপ্টিস্ট চ্যাপেলে "বেঙ্গল ক্রীশ্চান কনফারেন্সের" সভাপতি টি সি ব্যানার্জী বলেছিলেন :

"নিজেই নিজেকে উপাধি-দানকারী যে-স্বামী ব্যক্তিটি ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন—তিনি নিজেই একসময়ে খ্রীস্টান হবার পথে অনেকখানি এগিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সে-পথ থেকে তিনি ফিরে আসেন নিজের কোন-কোন খ্রীস্টান আত্মীয়ের অযোগ্য জীবনযাত্রা দেখে এবং যে মিশন ইনস্টিটিউশনে তিনি পড়তেন সেখানকার একজন মিশনারির আহাম্মকির জন্য। এই মিশনারিকে তিনি কতকগুলি কঠিন বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে বলেন। তখন মিশনারি মহোদয় তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের

পরমহংস রামকৃষ্ণের কাছে যেতে বলেন। ছাত্রটি তখন রামকৃষ্ণের কাছে যান, যার পরিণতি—ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে তিনি দণ্ডায়মান! উক্ত মিশনারি যদি স্ব-ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত হতেন, যা হওয়া তাঁর উচিত ছিল, তাহলে এই স্বামী-ব্যক্তিটি ধর্মমহাসভায় দাঁড়াতেন—ভারতীয় খ্রীস্টান ধর্মের প্রতিনিধিরূপে।"[২৫]

এই বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট তথ্যভ্রান্তি আছে। নরেন্দ্রনাথ কদাপি খ্রীস্টান হতে যাননি এবং খ্রীস্টান আত্মীয়দের অসৎ জীবনের জন্য খ্রীস্টধর্মকে দায়ী করার মতো নির্বোধও তিনি ছিলেন না। কিন্তু ঐ রিপোর্ট থেকে বোঝা যায়, ১৮৯৪ সালেই খ্রীস্টান মহলে জানা হয়ে গিয়েছিল যে, হেস্টিই নরেন্দ্রনাথকে রামকৃষ্ণের কাছে যেতে বলেছিলেন।

প্রশ্ন এই—হেস্টি যখন ঐ অনুরোধ করেন, তখন কি তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন? কোথায়? বরং তার বিপরীত প্রমাণই আছে। ১৮৮১ নভেম্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ। তার প্রায় এক বৎসর পরে, ১৮৮২ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে, হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে হেস্টির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশ্য তর্কযুদ্ধ হয়। শোভাবাজার রাজবাড়িতে এক বৃদ্ধা মহিলার শ্রাদ্ধস্থলে ইংরেজীশিক্ষিত বিশিষ্ট হিন্দুরা উপস্থিত ছিলেন—এই সংবাদ স্টেটসম্যানে পড়ে হেস্টি মহাক্রোধে একই কাগজে কেবল উক্ত শ্রাদ্ধের নয়, সমগ্র হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতির শ্রাদ্ধ করেন। সেকালের মিশনারিদের অভ্যস্ত সর্বপ্রকার কদর্য গালমন্দ তিনি হিন্দুদের উপর বর্ষণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার যথোপযুক্ত উত্তর দেন 'রামচন্দ্র' ছদ্মনামে। সুতরাং হেস্টি যখন নরেন্দ্রনাথকে রামকৃষ্ণের কাছে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি স্বধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতক তো ননই, বরং রীতিমত ধর্মান্ধ অসহিষ্ণু মিশনারি।

তবু কেন ঐ কাজ করেছিলেন? তার উত্তর, বর্তমানে অবশ্য কাল্পনিক হবে। এর এই ব্যাখ্যা হতে পারে—হেস্টি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাপরায়ণ হলেও জিজ্ঞাসু ছিলেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মোট ধারণা অবশ্যই খারাপ, কিন্তু স্বচক্ষে দেখা হিন্দুযোগীর সমাধিকে চোখ বা মন বুজে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। আর রামকৃষ্ণের ছিল প্রভাববিস্তারের আশ্চর্য ক্ষমতা। সে প্রভাব কী বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল হতো, তার বিবরণ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর পূর্বোক্ত লেখায় দিয়েছেন। রামকৃষ্ণের প্রভাবে নরেন্দ্রনাথের রূপান্তরকে গভীর বিতৃষ্ণা ও কঠিন সমালোচনার দৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন। তখন কালীপূজা ও আধ্যাত্মিক ভাবাবেশ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর মতন তরুণ উগ্র হেগেলবাদীর মনে তীব্র জ্বলন্ত ঘৃণা। তাঁর তৎকালীন নৈরাশ্য—"বিবেকানন্দের মতো একজন জন্ম-বিদ্রোহী, যিনি চিন্তায় স্বাধীন, বুদ্ধিতে সৃষ্টিশীল এবং প্রচণ্ড প্রতাপশালী, যিনি মানুষকে বশীভূত করেন অক্লেশে—তিনি কিনা বিদ্‌ঘুটে অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার ফাঁদে পড়লেন।" সংশয়ে উদগ্র এবং বন্ধুকে উদ্ধার করতে আগ্রহী, ব্রজেন্দ্রনাথ একদিন দক্ষিণেশ্বরে হাজির হয়েছিলেন। সেখানে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পরে যখন ফিরছিলেন, তখন তাঁর মানসিক অবস্থা এই :

"মন্দির-উদ্যানের শান্তিময় আশ্রয়ে এক সুদীর্ঘ গ্রীষ্ম-দিবসের প্রায় সমস্তক্ষণ কাটাবার পরে, সূর্যাস্তকালে দৃষ্টিভ্রান্তিকর গর্জনশীল ঝঞ্ঝাবায়ু ও বজ্রপাতের মধ্যে যখন প্রত্যাবর্তন করছিলাম—তখন আমি দৈহিক ও নৈতিক সত্য সম্বন্ধে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছি। আমার মনে

তখন এই অস্পষ্ট সত্যবোধ জেগেছে যে, আপাতভাবে বিশৃঙ্খল উদ্ভট বস্তুকেও বিশ্বনিয়ম নিয়ন্ত্রিত করছে—যেটাকে বাইরে থেকে নিছক আত্ম-উৎসাদন বলে মনে হয় সেটা আত্ম-আধিপত্যও হতে পারে; ইন্দ্রিয় তার ভ্রান্তি সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ হেতুরূপে স্বীকার্য এবং বাইরের ত্রাণশক্তির উপর বিশ্বাস হলো আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলকর্মের অস্পষ্ট প্রতিভাস।"

ব্রজেন্দ্রনাথের সেদিনকার ধাক্কা-খাওয়া মনের সেই অস্পষ্ট বোধ পরবর্তীকালে সুস্পষ্ট স্বীকৃতিতে পৌঁছেছিল। তিনি বলেছেন, রামকৃষ্ণের প্রভাবে বিবেকানন্দের প্রখর মনীষার সংশয় ক্রমে দূর হয়েছিল এবং তা হয়েছিল "অলৌকিক শক্তির প্রশান্ত উন্মোচনের আশ্বাসে।"

হেস্টিরও কি ব্রজেন্দ্রনাথের অনুরূপ কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি? না হয়ে থাকলে কি তাঁর পক্ষে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সর্ববিধ বিরূপতা সত্ত্বেও সেই ধর্মের কালীপূজক এক সাধকের কাছে তাঁর ছাত্রদের পাঠানো সম্ভব? উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, তাই দিচ্ছি না। হেস্টি প্রসঙ্গে স্বামীজী নিবেদিতাকে আর একটি কথা বলেছিলেন যার তাৎপর্য সুগভীর।—

[The Swami said], "Towards the end of his [Hastie's] stay in India he used to say, 'Yes my boy, you were right!— It is true that all is God'!"

স্বামীজীর এই উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, হেস্টির ভারতবাসের শেষ সময় পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।[২৬] এবং তিনি নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের নানা পর্যায়ের সঙ্গে পরিচিতও ছিলেন। মনে হয়, নাস্তিকতার পক্ষে নরেন্দ্রনাথের যুক্তি তিনি শুনেছেন, বলাবাহুল্য খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। তারপর নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের কাছে গেছেন—তখনও তিনি মূর্তিপূজাবিরোধী এবং অদ্বৈতবাদের ঘোরতর সমালোচক—সে নরেন্দ্রনাথকেও হেস্টি জানতেন। তারপর নরেন্দ্রনাথের জীবনের আর এক ভাববিপ্লব ঘটেছে। অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে নরেন্দ্রনাথ নিয়মিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ও-বস্তুটা তখন তাঁর কাছে কার্যত নাস্তিকতা ছাড়া কিছু নয় (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-সহ ব্রাহ্মরা সেকথা বলতেন, মিশনারিরাও তাই বলতেন)—তখন একদিন, দক্ষিণেশ্বরে প্রতাপ হাজরার সঙ্গে বসে 'তাহলে ঘটিটাও ঈশ্বর, বাটিটাও ঈশ্বর' বলে উচ্চহাস্যে আমোদিত হচ্ছিলেন—তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে স্পর্শ করেন এবং—(এবার কিছু 'অলৌকিক' ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কথা নরেন্দ্রনাথের মুখে শোনা যাক :)

"ঠাকুরের ঐদিনকার অদ্ভুত স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। স্তম্ভিত হইয়া সত্যসত্যই দেখিতে লাগিলাম—ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই।...বাটীতে ফিরিলাম—সেখানেও তাহাই।...খাইতে বসিলাম, দেখি—অন্ন, থাল, যিনি পরিবেশন করিতেছেন, সে সকলই এবং আমি নিজেও তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নহে।...খাইতে, শুইতে, কলেজ যাইতে, সকল সময়ই ঐরূপ দেখিতে লাগিলাম।...রাস্তায় চলিয়াছি, গাড়ি আসিতেছে দেখিতেছি, কিন্তু অন্য সময়ের ন্যায়...সরিবার প্রবৃত্তি হইত না।...হেদুয়া পুষ্করিণীতে বেড়াইতে যাইয়া উহার চতুষ্পার্শের লৌহরেলে মাথা ঠুকিয়া দেখিতাম—যা দেখিতেছি তাহা স্বপ্নের রেল অথবা সত্যকার!"[২৭]

নরেন্দ্রনাথ অতঃপর অদ্বৈততত্ত্বের বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন—এবং যাকে তিনি একবার স্বীকার করেছেন তার বিষয়ে অকুণ্ঠে বলতে তাঁর কখনো দ্বিধা হয়নি। অধ্যক্ষ হেস্টিকেও তা বলেছেন, শিক্ষক-ছাত্রে এ নিয়ে ঘোরতর তর্কযুদ্ধ হয়েছে। হেস্টি সত্যই আচার্য, এ সুযোগ ছাত্রদের দিতেনই। এবং বিবেকানন্দের উক্তি অনুযায়ী, হেস্টি, তাঁর অনুরূপ মতবাদীদের দ্বারা ঘোরতর নিন্দিত 'প্যানথীজম্'-এর মৌল সত্যকে স্বীকার করেছিলেন: "হাঁ বৎস, তুমি ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ—হাঁ সকলই ঈশ্বর।" বিবেকানন্দের এই উক্তি অন্যে মানতে পারেন, নাও পারেন।

যাই হোক, জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন ও নরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ শেষ করছি একটি ছবি দিয়ে। ১৮৯৭, ২০ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশ থেকে কলকাতায় ফেরেন দিগ্‌বিজয়ী বীরের মতো। হাজার হাজার মানুষ শিয়ালদহ স্টেশনে সমবেত হয়েছিলেন সংবর্ধনা দেবার জন্য। তাঁকে শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল একটি ল্যান্ডো গাড়িতে বসিয়ে—একদল ছাত্র ধেয়ে গিয়ে, তাঁর গাড়ির ঘোড়া খুলে, নিজেরাই টানতে লাগল। সেই ছাত্ররা প্রধানত ছিলেন—তাঁরই প্রিয় কলেজের ছাত্র।

"When Naren returned in triumph from the West, as the famous spiritual teacher, it was the students of this College [General Assembly's Institution] who stopped the carriage of state in which he was driving with some of his European and Indian admirers, unharnessed the horses and drew the carriage themselves. The memory of Naren, the college boy, is still with the Institution."[২৮]

উল্লেখপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. স্বামী গম্ভীরানন্দ, 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ', ১ম খণ্ড (১৩৭৩), পৃ. ৬১। প্রকাশক, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।

২. *The Life of the Swami Vivekananda*, by His Eastern and Western Disciples (1912) Vol. 1. অতঃপর 'ইংরেজী জীবনী' বলে উল্লিখিত হবে।

৩. স্বামী নির্লেপানন্দ, 'স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন' (১৩৭৪), পৃ. ১০। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

৪. প্রমথনাথ বসু, 'স্বামী বিবেকানন্দ' (১৩৭০), পৃ. ৬১। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।

৫. ইংরেজী জীবনী, ১ম, পৃ. ১০৬ ০৭।

৬. বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত' (১৩৪৩), পৃ. ২৮৭। বসুমতী কার্যালয়, কলকাতা।

৭. নির্লেপানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১।

৮. ইংরেজী জীবনী, পৃ ১২৫।

৯. প্রমথনাথ বসু, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫০।

১০. ইংরেজী জীবনী, পৃ. ১০৯।

১১. প্রমথনাথ বসু, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৮।

১২. স্বামী সারদানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' (১৩৬০ সংস্করণ), ২য় খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ৬৮।

১৩. প্রমথনাথ বসু, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৭-৫৮।

১৪. বর্তমান লেখকের 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।

১৫. স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ ও খণ্ড, পৃ. ৬৩।

১৬. ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *Vivekananda : Patriot and Prophet*, পৃ. ১৫৫।

১৭. হরমোহন মিত্রের বিবরণের সঙ্গে এই ব্যাপারে স্বামী সারদানন্দের বিবরণের পার্থক্য আছে। হরমোহনের মুখে শুনে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ঐ ঘটনার কথা তাঁর গ্রন্থভুক্ত করেন। আমরা ধরে নিতে পারি, স্বয়ং স্বামীজীর কাছে শুনে সারদানন্দ ঐ বিবরণ লিখেছিলেন। তবে হরমোহন স্বয়ং ঘটনাকালে উপস্থিত ছিলেন বলে তাঁর বিবরণ এই অংশে স্বীকার্য। স্বামীজী হয়ত সাহেব-অধ্যাপকের ব্যর্থতাজনিত ক্রোধের কথা অধ্যাপকের পক্ষে অসম্মানজনক হবে বলে উল্লেখ করেন নি, আর সেই শূন্যস্থান অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতির উদারতর ব্যাখ্যায় পূর্ণ করা হয়েছে। নচেৎ, হরমোহন যেমন বলেছেন, হেস্টি-সাহেব উক্ত অধ্যাপকের ব্যর্থতাবিষয়ে কটূক্তি ক'রে নিজে কবিতা বোঝাবার ভার নিতেই পারেন, কেননা তাঁর মাথাগরম স্বভাবের কথা নানা সূত্রেই পাওয়া যায়।

১৮. স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯৮।

১৯. Sister Nivedita, *Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda*, 4th edition, 1957, p. 33. Advaita Ashrama, Kolkata.

২০. প্রমথনাথ বসু, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৩-৫৪।

২১. ঐ, পৃ. ৭২।

২২. ইংরেজী জীবনী, পৃ. ১৭০।

২৩. বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৮৭।

২৪. Sister Nivedita, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, p. 33.

২৫. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম, পৃ. ৩১০।

২৬. অধ্যাপক অলোক রায়ের প্রবন্ধ থেকে জেনেছি, হেস্টি প্রথমবার কলকাতায় পৌঁছোন ২ জানুয়ারি ১৮৭৯, এবং কলকাতা ছাড়েন ৬ এপ্রিল ১৮৮৪। দ্বিতীয় ও শেষবার মামলাসূত্রে কলকাতা আসেন ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫, এবং কলকাতা ছাড়েন ২৯ এপ্রিল ১৮৮৫।

২৭. স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩৯-৪০।

২৮. ইংরেজী জীবনী, পৃ. ১০৫।

[রচনাটি *Scottish Church College Ter-Jubilee 1830-1850 Commemoration Volume*-এ প্রকাশিত হয়।]

সংযোজন

[হিন্দুধর্ম নিয়ে হেস্টি-বঙ্কিম বিতর্ক কেবল বঙ্কিমজীবনীর পক্ষে নয়, বাংলার ধর্মান্দোলনের ইতিহাসেও উল্লেখযোগ্য বিষয়, কারণ তার পরেই বঙ্কিমচন্দ্র নব্যহিন্দুধর্মের দার্শনিক নেতার ভূমিকা বিশেষভাবে গ্রহণ করেন। ঐ বিতর্কের অন্তর্গত হেস্টি-বক্তব্যের কিছু রূপ নিম্নে উপস্থিত করছি আমার 'বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও নানাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থভুক্ত 'বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচর্চা' প্রবন্ধের মধ্য থেকে। হেস্টি প্রচণ্ডরকম হিন্দুধর্মবিদ্বেষী ছিলেন (এখানে তিনি তৎকালচলিত গোঁড়া মিশনারির ভূমিকাই গ্রহণ করেছিলেন), অথচ তিনিই নরেন্দ্রনাথকে কালীপূজক হিন্দু রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে যেতে বলেছিলেন 'ট্র্যান্স' দেখবার জন্য—মনুষ্যচরিত্রের বিচিত্র এই ধাঁধা, যার মীমাংসা করা কঠিন।]

হেস্টি-বিতর্কের সূত্রপাত হয়—১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮২ তারিখে শোভাবাজারের মহারাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব-বাহাদুরের পিতামহীর দানসাগর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সূত্রে। সে এক এলাহি কাণ্ড, সেখানে চার হাজার অধ্যাপক-ব্রাহ্মণ এসেছেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার নানা স্থান থেকে;

অন্য ধরনের আরও হাজার-হাজার লোক উপস্থিত; তাঁদের মধ্যে মহা ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালি মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল, ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ছিলেন। আর এসেছিলেন দেব-পরিবারের গৃহদেবতা গোপীনাথজী। সুতরাং সংবাদপত্র চুপ ক'রে থাকতে পারে না, যেহেতু শ্রাদ্ধ-ভোজ্য অপেক্ষা সংবাদ-ভোজ্য কম উপাদেয় নয়। স্টেটসম্যান ২০ সেপ্টেম্বর ফলাও ক'রে ঘটনার বিবরণ ছাপল। আর তাতেই দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠলেন রেভারেন্ড হেস্টি—কারণ রেভারেন্ড হিসাবে তিনি হিন্দুধর্মের, বিশেষত 'পৌত্তলিক' হিন্দুধর্মের, মৃত্যুচিতায় অগ্নিসংকার করার শুষ্ক কাষ্ঠ হয়েই ছিলেন। তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা হায় হায় ক'রে উঠেছিল যখন দেখলেন তাঁদের এত বছরের সাধনা একেবারে বৃথায় গেছে। একে তো উপযুক্ত সংখ্যায় খ্রীস্টান করতে পারেন নি, তার দুঃখ আছে, তাই বলে ইংরেজী শিক্ষা দেবার পরেও শিক্ষিত হিন্দুদের পুতুলপুজোর আসরে যাওয়া বন্ধ করতে পারলেন না! হেস্টি অবিলম্বে ২২ সেপ্টেম্বর স্টেটসম্যানে এক চিঠি ছাপালেন ধিক্কার দিয়ে। ছি ছি! মহারাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের মতো উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এখনও পারিবারিক পুতুল-গড্‌কে খাতির জানালেন! ছি ছি! ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতো মানুষ ওহেন সভায় উপস্থিত থেকে ব্রহ্মণ্য আনুষ্ঠানিকতাকে হাস্যবিকাশসহ সমর্থন জানালেন!!—হেস্টি লিখেছিলেন। পরে তিনি গাম্ভীর্য অবলম্বন ক'রে সাহেবগণ-প্রদত্ত ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে ঐতিহ্যবাদী পৌত্তলিকতার শত্রু-সম্পর্ক, এবং এ-ব্যাপারে শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত হিন্দুগণের দায়দায়িত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে যথোচিত উপদেশ ও শিক্ষাদান করলেন। হেস্টি তারপর ক্রমান্বয়ে আরও ৬টি দীর্ঘ পত্র স্টেটসম্যানে প্রকাশ করলেন, কিছু যুক্তি, অধিক রোষ, তীব্র তিরস্কার, মৃদু অভিমান, নিবিড় মর্মবেদনা, বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস—এবং নরকাগ্নি থেকে উদ্ধারলাভের জন্য খ্রীস্টধর্ম অবলম্বনের পথ্যপ্রদান—এ সমস্তই ওইসব চিঠিতে ছিল। আর ছিল হিন্দু দেবদেবীর কেচ্ছা। শতাধিক বৎসর ধরে মিশনারিরা ইংরেজী এবং দেশীয় ভাষায় কেচ্ছা-সাহিত্য সমৃদ্ধ ক'রে গেছেন, একথা তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রে জানেন। হিন্দুদের মধ্য থেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল—তার মধ্যে ব্রাহ্ম-আন্দোলন তখন সবচেয়ে শক্তিশালী। রক্ষণশীলরাও নড়াচড়া করছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনা ও সত্যবোধ নিয়ে অল্পদিন আগে আবির্ভূত হয়েছেন। হেস্টি এ-সকল বিষয়ে সচেতন ছিলেন। খুবই বিস্ময়ের কথা, এই একই হেস্টি এই বিতর্কের এক বছর আগে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের ছাত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের কাছে দক্ষিণেশ্বরের কালীপূজক রামকৃষ্ণের কথা বলেছিলেন—যাঁর ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো সমাধি হয়! এবং এই কাজ করেছিলেন বলে এক মিশনারি সম্মেলনের সভাপতি তাঁর 'আহাম্মকি'র নিন্দা করেছিলেন, কেননা নরেন্দ্র দত্ত বিবেকানন্দ হয়ে ওইকালে মিশনারি প্রচারের বারোটা বাজিয়েছিলেন, এসব কথা আমরা আগেই জানিয়েছি। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষ্যে আরও জেনেছি যে, তাঁর এই প্রিয় "উষ্ণমস্তিষ্ক, বৃদ্ধ স্কটল্যান্ডবাসী শিক্ষক, যাঁর গৃহ ছাত্রদেরই গৃহ ছিল"—তিনি আরও কয়েক বৎসর পরে খ্রীস্টান মতে নিন্দিত সর্বেশ্বরবাদকে মেনে নিয়েছিলেন।

হেস্টি স্বয়ং বিরাট পণ্ডিতও ছিলেন—দিকপাল পণ্ডিত বলা যায়। সেই মানুষ কিভাবে পরধর্মের কদর্য নিন্দায় নেমে পড়েছিলেন তা বিস্ময়কর মনে হয়। তার কারণ হয়তো এই—ধর্মের মতো উদারতাবর্ধক ও অন্ধতাবর্ধক দ্বিতীয় পদার্থ নেই। তদনুযায়ী হেস্টি "রক্তপিপাসু

বিকট কালী", "হস্তীমুণ্ড গণেশ", প্রভৃতির প্রতি খ্রীস্টানোচিত ঘৃণাবর্ষণ করেন; "পাপের প্রতিমূর্তি দেবদেবীকে আশ্রয় দিয়েছে হিন্দুধর্ম, তা দানবিক ধর্ম—যা নীতিহীনতার গহ্বরে পতিত ভারতবর্ষের সকল দুর্গতির মূলে"—একথা না-বলে পারেন নি; "একদা আলোককন্যা ভারতবর্ষ বর্তমানে বেশ্যাজননী হয়ে কালাতিপাত করছে"—এই হৃদয়ব্যথাও তাঁর ছিল; এবং "খ্রীস্টধর্মের বিশুদ্ধ পুণ্যজীবনে" পাপী হিন্দুদের স্থাপন করার ধর্মব্রত গ্রহণ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর কাছে হিন্দুধর্মের মোট চেহারাটা এই :

"এই ঊনবিংশ শতাব্দী যতদূর দেখতে পেয়েছে তা হলো—হিন্দুধর্মে আছে কেবল বাজে খোসা, ভিতরে শাঁসের চিহ্নমাত্র নেই। তা একেবারে শূন্যে পূর্ণ—কপিল এবং তাঁর মতো অন্যান্যরা সেকথা বলছেন—কেবল বলছেন না 'রামচন্দ্র' (বঙ্কিমচন্দ্র)। হিন্দুধর্মের অক্ষিহীন অক্ষিকোটরে প্রাণ, আলোক, বা প্রেম সঞ্চারিত করার চেষ্টা বৃথা—বৃথা তার ঠক্‌ঠকে নড়বড়ে হাড়ে নতুন রক্ত-মাংস পুরে দেওয়ার প্রয়াস। তার কম্পমান উন্মুক্ত কঙ্কালদেহের মধ্যে যতই উঁকি-ঝুঁকি দিই-না কেন, কোথাও যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবনের শ্বাস প্রবাহিত হতে দেখব না।"

আমাদের বিশেষ আলোচ্য যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচর্চা, তাই কৃষ্ণ বিষয়ে হেস্টির মন্তব্য লক্ষ্য ক'রে নিতে চাই। বহুদিন ধরে কৃষ্ণ মিশনারিদের চাঁদমারি। তাঁরা কৃষ্ণের উপর গুলি ছুঁড়ে ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদী একাগ্রতা অভ্যাস করেছেন। একটি-দুটি হেস্টি-পূর্ব নমুনা এই:

"হে প্রিয় পাঠকেরা, বিবেচনা করিয়া দেখ, যিনি এই প্রকার পরদার [গ্রহণ], বধ, চৌর্য, মত্ততা ও মিথ্যাবাক্যাদি অশেষ কুকর্ম করেন, তিনি কিরূপে ঈশ্বর হইতে পারেন? ও তাঁহার আরাধনা করিলে মানুষদিগের পরিত্রাণ বা কি প্রকারে হয়?...শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিলে মানুষদিগের অন্তঃকরণ কখন পবিত্র হইবে না। কেননা যেমন গুরু তেমনি শিষ্য, অতএব শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরদার [গ্রহণ] বধ, চৌর্যাদি করিয়াছেন, তাহারাও তেমনি কেন না করিবে?" ['ধর্ম অবতার' ১৮৩৮]

হেস্টি-বিতর্কের পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশার দান উল্টে দিয়েছেন, তখন রোষান্ধ রেভারেন্ড জন মার্ডক (ইনি ৫০ বৎসর ধরে হিন্দু-কুৎসা ক'রে গেছেন) 'স্বামী বিবেকানন্দ অন হিন্দুইজম' গ্রন্থে লিখেছিলেন—যা পূর্বের বহু বৎসরের রচনার পুনরাবৃত্তি :

"The supposed Avatara of Krishna is fully described in Bhagavata and Vishnu Puranas. Love was certainly not a feature of his character. He murdered Kansa's washerman because he complained of the injury done to his master's clothes; a great part of his life was spent in fighting; he burnt up the city of Beneras and destroyed its inhabitants; and one of the last acts of his life was to kill the survivors of his reputed 180,000 sons.

"In the Bhagavad Gita, Arjuna, his eyes full of tears, expresses his unwillingness to kill his own relations and teachers in battle, his preceptors and friends. Krishna's reply was, 'Cast off this base weakness of heart, and arise, O terror of foes.'

"With 8 queens and 16, 000 wives, Krishna was rather an incarnation of lust than of God."

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কৃষ্ণচরিত্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই সকল অভিযোগের উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে দিয়েছেন।

হিন্দুসমাজের উপর যে কদর্য নিন্দার পাহাড় মিশনারিরা চাপিয়েছিলেন, তার নমুনা আর দিতে চাইনা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সাত সাগরের জল দিয়ে ধুলেও সে কাদা সরানো যাবেনা।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে রেভারেন্ড হেস্টির বক্তব্য :

"...And to take the special example in point of the Krishna cult, what is it at the best, with all its merry music and mincing movements but the apotheosis of sexual desire and the idolatry of merely finite life."

পুনশ্চ :

"...What is Krishna, after all, but an imaginary embodiment of the sensuous feeling of the 'East' by an exaggeration of a mythological fancy to the supposed dimensions of the Divine?"

সরাসরি কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই পাদরী-বচন। কৃষ্ণ অধিকন্তু অন্যান্যদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহুতর আপ্যায়ন লাভ করেছিলেন। পরাধীনতার অনেক গ্লানি। কীভাবে বিজয়ী জাতির লাথি খেতে হয় তার সামান্য নমুনা হেস্টির লেখা থেকে এই :

"Notwithstanding all that has been written about the myriotheistic idolatry of India, no pen has yet adequately depicted all the hideousness and grossness of the monstrous system. It has been well described by one who knew it as 'Satan's masterpiece of ingenuity for the entanglement of souls', and as 'the most stupendous fortress and citadel of ancient error and idolatry now in the world.'...This debasing idolatry produced, according to the painful testimony of native writers themselves, a mass of shrinking cowards, of unscrupulous deceivers, of bestial idlers, of filthy songsters, of degraded women and lustful men. ...Every Hindu home is still polluted with idols and the opening senses meet their abominations at every turn. The children drink in the hideous spirit of demons with their mother's milk and cannot learn to speak without the foulest words. Rational men wear the sign of beastly gods unabashed upon their foreheads and have lost the modesty of manhood."

ইংরেজি ভাষাকে ধন্য এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে অভিনন্দনযোগ্য করেছে কটুগন্ধী শব্দের অসামান্য ভাণ্ডার এই রচনাটি—বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন। হেস্টির রচনার যৎসামান্য অংশই আমি উদ্ধৃত করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের চোখের ও মনের সামনে দগ্‌দগে হয়ে কথাগুলো রসনিঃসরণ করছিল। তিনি উত্তর না-দিয়ে পারেন? 'রামচন্দ্র' এই ছদ্মনাম নিয়ে উত্তর দেন—যদিও একেবারে শেষে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন। বঙ্কিম বললেন, হেস্টি-সাহেবের মাথা গরম হয়েছে। তাঁর বীরমূর্তির যোগ্য রূপাঙ্কন করতে ভারতীয় সেরভান্তেসের প্রয়োজন হবে। (বঙ্কিম স্বয়ং সে ভূমিকা কিছুটা গ্রহণ করেছিলেন)। হেস্টিকে তিনি এক জায়গায় বেকায়দায় ফেললেন। বিদ্রূপ ক'রে বললেন, মূল সংস্কৃত আগে পড়ুন, তারপর

তর্ক করবেন। হেস্টি আত্মরক্ষার জন্য সাফাই গেয়ে বললেন, পাশ্চাত্যে বড় বড় সংস্কৃত পণ্ডিত আছেন (যাঁদের অনুবাদ থেকে হেস্টি বস্তু সংগ্রহ করেছেন), ভারতে তেমনটি মিলবে না। আরও বললেন, রামচন্দ্রের চিঠিগুলি তাঁর অন্তরঙ্গমহলে রীতিমতো আমোদের সৃষ্টি করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাতে সায় দিয়ে হেস্টির আমোদ বাড়াবার মতো বহু বস্তু সরবরাহ করলেন, তার মধ্যে এক ক্ষুধার্ত গোরার নারকেল খেতে গিয়ে ছোবড়া চিবানোর নিষ্ঠুর কাহিনীটি ছিল। হেস্টিগণের সংস্কৃত-আস্বাদন এইপ্রকার ঝুনা নারিকেলের ছোবড়া চিবানোর মতোই। বঙ্কিম যেসব যুক্তিতে হিন্দু ধর্মতত্ত্ব ও হিন্দু ধর্মাচার সমর্থন করেছিলেন, তাদের উপস্থাপনার প্রয়োজন এখানে নেই, কিন্তু তিনি একটি মারাত্মক উক্তি ক'রে ফেলেছিলেন, যা তাঁর পূর্ব-ধারণার প্রতি আনুগত্যযুক্ত : "ভারতীয় ছাত্রদের কাছে বেদ মৃত; তারা মৃত পূর্বপুরুষদের প্রতি যে ধরনের শ্রদ্ধা জানায়, বেদকেও তাই জানায়, কিন্তু বেদ সম্বন্ধে ব্যস্ত হবার কোনো কারণ আছে বলে তারা মনে করেনা।" সেইরকম আরও একটি অসতর্ক মন্তব্য বঙ্কিম করলেন মূর্তিপূজা সম্বন্ধে। বললেন : মানুষ স্বভাবে কবি ও শিল্পী; সৌন্দর্যের মধ্যে, শক্তির মধ্যে, পবিত্রতার মধ্যে, তার ব্যাকুল আদর্শসন্ধান বাস্তব পৃথিবীতে মূর্তি কামনা করে। এইজন্যই ঈশ্বরের মূর্তি কল্পনা করে মানুষ; হ্যামলেটের ট্রাজেডি বা প্রোমিথিউসের কাহিনীর মতোই মূর্তির ঔচিত্য আছে; মূর্তির ধর্মীয় অর্চনা হ্যামলেট বা প্রোমিথিউসের বৌদ্ধিক অর্চনার মতোই যুক্তিসঙ্গত ইত্যাদি। বঙ্কিম এইখানেই থামলেন না। এমন কথাও বললেন যার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ স্বয়ং তাঁকে পরে করতে হবে—

"ওঁরা বলেন, আমাদের মূর্তিগুলি বিকট। সেকথা ঠিক। আমরা উপযুক্ত ভাস্করের অপেক্ষায় আছি। এটা কেবল শিল্পগত ব্যাপার। হিন্দু দেবদেবীর মন্দির কদাপি যথাযোগ্যভাবে প্রস্তর অথবা মৃত্তিকায় রূপায়িত হয়নি কারণ ভারতবর্ষ কোনো ভাস্করের জন্ম দেয়নি। বাংলায় আমরা যে-সকল মূর্তি পূজা করি, শিল্পরূপে সেগুলি জাতীয় লজ্জার বস্তু। ইউরোপ থেকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি তৈরি করিয়ে আনাই ধনী হিন্দুদের পক্ষে সঠিক কাজ হবে।"

এক কথায় ভ্রান্ত এবং শোচনীয়—বঙ্কিমের কথাগুলি। যে গৃহদেবতার তিনি ভক্ত, বাল্যাবধি যাঁর দর্শন তিনি করছেন, তাঁর আকারের শিল্পসৌন্দর্য কি তাঁর চোখে ধরা পড়েনি—যা শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্কিম জীবন-চরিতে মুদ্রিত চিত্র থেকে অন্তত আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রতীয়মান। বস্তুতপক্ষে এই পর্ব পর্যন্ত বঙ্কিমের শিল্পবোধ অপরিণত। তিনি কি ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের Antiquities of Orissa পড়েন নি, কিংবা ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত ফার্গুসনের History of India and Eastern Architecture-এর পৃষ্ঠা ওল্টান নি? হেস্টি-বিতর্কের আগেই তিনি ১৮৮২ আগস্ট থেকে ৬ মাসের জন্য উড়িষ্যার জাজপুরে কর্মরত ছিলেন। তখনও নিশ্চয় তিনি উড়িষ্যার অতুলনীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দেখেন নি, অথবা দেখলেও সাহেবি চশমা পরে দেখেছিলেন, কিংবা তিনি কি সেসব সরাসরি দেখেন ১৮৮৫ জুলাই মাসের পর কয়েকমাস কটকে কর্মরত থাকার সময়ে? প্রথম পর্যায়ে দেখেছিলেন সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত, কারণ সীতারাম উপন্যাসের মধ্যে এই লাইনগুলি আছে (প্রচারে সীতারামের শুরু ১২৯১ শ্রাবণ, ১৮৮৪ থেকে):

"(উড়িষ্যার ললিতগিরির ভাস্কর্য প্রসঙ্গে)...এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে...মনোমুগ্ধকর মূর্তিরাশি।

তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের মধ্যে থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। হায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইনডাস্‌ট্রিয়াল স্কুলে পুতুলগড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ন পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি!"

কঠিন আত্মসমালোচনা—অন্তত তাই দাঁড়াল। হিন্দুমূর্তির সৌন্দর্য বর্ণনার পরে বঙ্কিম অসামান্য ভাষায় লিখলেন :

"চারিদিকে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মতো হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মতো হিন্দু? আর এই প্রস্তর মূর্তিসকল যে খোদিয়াছিল...তাহারা কি হিন্দু?"

এর পরে বঙ্কিমের মনের চরম পরিণতির রূপ :

"তখন মনে পড়িল, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক—এ সকলই হিন্দুর কীর্তি—এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

দেখা গেল, হেস্টির সঙ্গে তর্ককালে বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পবোধের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যমুগ্ধতার প্রকোপে যেমন কাঁচা কথা বলছেন, তেমনি তিনি সাংখ্যদর্শনের প্রভাবে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে পুরুষ ও প্রকৃতি এবং তাদের অবৈধ মিলনের বোধ কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। পূর্বের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে যে-কথা বলেছিলেন, এখানেও তাই বললেন—পুরুষ ও প্রকৃতির বিচ্ছেদেই মুক্তি ; কৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি, তাঁদের মিলন তাই অবৈধ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র থেমে থাকেন নি। সাংখ্যদর্শনের নৈরাশ্যবাদকে কীভাবে হিন্দু ভক্তরা অতিক্রম করেছেন, তাও দেখিয়েছেন। বলেছেন, হাঁ, সাংখ্য অনুযায়ী রাধা ও কৃষ্ণের মিলন ঘটনাগতভাবে অবৈধ, কিন্তু আত্মা ও প্রকৃতির মিলনে আছে অনন্ত সৌন্দর্য ও আনন্দ—রাধাকৃষ্ণের লীলা আস্বাদনে সেই সর্বব্যাপক আনন্দরূপের অর্চনার দ্বারা হিন্দুরা সাংখ্যের নৈরাশ্যবাদের প্রতিরোধ করেছে :

"It [the Sankhya] had pronounced their [i. e. Nature and Soul] connection illegitimate; and the legend of Radha and Krishna retains the illegitimate connection. Nevertheless, the Hindu worships this illicit union. He worships it because, with a truer insight than is given to the morose philosopher [Kapila], he has perceived that in this union of the Soul with Nature lies the source of all beauty, all truth and all love. And this magnificent legend, the basis of Hindu religion, of love for all that exists, is treated by its European critics as the grossest and most revolting story of crime ever invented by the brain of man. So much for the intellectual superiority of Europe." [স্টেটসম্যানে ২৮ অক্টোবর ১৮৮২ তারিখে লিখিত বঙ্কিমের তৃতীয় পত্র]।

এই ধারণা বঙ্কিম জীবনের শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন। জীবনের শেষ পর্বে লিখিত *Letters on Hinduism*-এর চতুর্থ পত্রে রাধা-কৃষ্ণ, ও কুমারসম্ভবের শিব-উমার সম্পর্কের মধ্যে এই তত্ত্ব কিভাবে প্রতিপাদিত তা দেখিয়েছেন। ওইসব প্রেমসম্পর্কের মধ্য দিয়ে, তাঁর মতে, সাংখ্যের নৈরাশ্যবাদের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের শেষ প্রচণ্ড প্রতিবাদ। আর পঞ্চম পত্রে

তিনি, যেহেতু ইতিমধ্যে কৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্বে বিশ্বাস ঘোষণা করেছেন, তাই রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বলেছেন যে, তা ঐতিহাসিক মানবচরিত্রের উপর রূপকারোপ—রূপকের মানব চরিত্রায়ণ, একথা বলেন নি।

রেভারেন্ড হেস্টি হিন্দু সংস্কৃতিকে বাইরে থেকে জেনেছেন, কিন্তু রেভারেন্ড কে এম ব্যানার্জি তাকে জানতেন ঘরের মানুষ হিসাবেই। বঙ্কিমচন্দ্র তর্ক-যুদ্ধের টানে হিন্দু সংস্কৃতিকে কোথায় আঘাত ক'রে হিন্দু-অনুভূতিকে পীড়িত করেছেন, তার সঠিক নির্ধারণ রেভারেন্ড ব্যানার্জি করেছিলেন। তিনি ১৪ নভেম্বর ১৮৮২ তারিখে স্টেটসম্যানে এক চিঠিতে বঙ্কিমকে চেপে ধরলেন তাঁর কয়েকটি দুর্বল ক্ষেত্রে, যথা, বঙ্কিম বলেছেন, বেদ মৃত, কিংবা রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবৈধ। বঙ্কিম যেভাবে ন্যায়, বেদান্ত, ও সাংখ্যকে ব্যাখ্যা করেছেন, তা ওইসব মতের বিশেষজ্ঞরা গ্রহণ করবেন, এমনও নয়। তন্ত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমের মন্তব্যে উনি আপত্তি জানালেন। বঙ্কিম সম্ভবত এই ক্ষেত্রগুলিতে নিজের দুর্বল ভিত্তির কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ২২ নভেম্বরের পত্রে রেভারেন্ড ব্যানার্জির উত্থাপিত অন্য প্রসঙ্গগুলি এড়িয়ে কেবল তন্ত্র সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমণ

॥ এক ॥

প্রথমেই স্বামীজীর ভালবাসা ও যন্ত্রণার রক্তে ভেজানো একটি চিঠির অংশ উৎকলন করা যাক। চিঠির তারিখ ২৯ জানুয়ারি ১৮৯৪, শিকাগো থেকে লেখা। স্বামীজী তার অল্প কয়েকমাস আগে ধর্মমহাসভায় আবির্ভাবের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন, এখন চিঠি লিখেছেন 'ভারতের গ্ল্যাডস্টোন' আখ্যায় সম্মানিত জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসকে। হরিদাস বিহারীদাস কলকাতায় গিয়ে স্বামীজীর মা ও ভাইদের দেখে আসেন। ওঁরা খুবই দুর্দশায় ছিলেন। ব্যথিত হরিদাস বিহারীদাস নিশ্চয় অনুযোগ ক'রে বলেছিলেন—স্বামীজীর মতো উপযুক্ত সন্তান সংসারত্যাগ করার ফলেই তাঁর মা ও ভাইদের ওই শোচনীয় অবস্থা। স্বামীজী তারই প্রসঙ্গে লেখেন :

> **"এই বিপুল সংসারে আমার ভালবাসার পাত্র যদি কেউ থাকেন তবে তিনি আমার মা। তবু এই বিশ্বাস আমি দৃঢ়ভাবে পোষণ ক'রে এসেছি এবং এখনো করি যে, যদি আমি সংসারত্যাগ না করতাম তাহলে আমার মহান গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বিরাট সত্য প্রচার করতে জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা প্রকাশিত হতে পারত না। আর তাছাড়া যে-সকল যুবক বর্তমান যুগের বিলাসিতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার তরঙ্গাঘাত প্রতিহত করার জন্য সুদৃঢ় পাষাণভিত্তির মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে—তাদেরই বা কী অবস্থা হতো?... প্রভুর কৃপায় এরা এমন কাজ ক'রে যাবে যার জন্য সমস্ত জগৎ যুগের পর যুগ এদের আশীর্বাদ করবে।**
>
> **"সুতরাং একদিকে ভারত ও বিশ্বের ভাবী ধর্মসম্বন্ধীয় আমার পরিকল্পনা, এবং উপেক্ষিত যে-লক্ষ লক্ষ নরনারী দিন দিন দুঃখের তমোগহ্বরে ধীরে ধীরে ডুবছে, যাদের সাহায্য করার কিংবা যাদের বিষয়ে চিন্তা করার কেউ নেই তাদের জন্য আমার সহানুভূতি ও ভালবাসা—আর অন্যদিকে আমার যত নিকট আত্মীয়-স্বজন আছেন তাঁদের দুঃখ ও দুর্গতির হেতু হওয়া—এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমটিকেই আমি ব্রতরূপে গ্রহণ করেছি।"**

রচনাংশটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কারণ স্বামীজী কদাচিৎ নিজ সন্ন্যাসগ্রহণের হেতু এইভাবে আত্ম-উন্মোচন ক'রে দেখিয়েছেন। তাঁর ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের যেসব অমোঘ আদেশ ছিল, তার অনেকগুলিই স্বামীজী পত্রমধ্যে উল্লেখ করেছেন। সেই আদেশগুলি প্রধানত এই :

নরেন লোকশিক্ষা দেবে; নরেন হাঁক দেবে; নরেন এদের (অর্থাৎ ধর্মার্থে গৃহত্যাগী যুবকদের) দেখবে।

এইসঙ্গে আছে, খালি পেটে ধর্ম হয় না; জীবকে শিবজ্ঞান ক'রে সেবা করতে হবে।

উপরের রচনাংশে পেয়েছি—শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদত্ত ধর্মবার্তা বহনের কথা (নরেন 'হাঁক' দেবে); সংঘ গঠনের কথা (বিলাসিতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার প্রচণ্ড তরঙ্গের বিরুদ্ধে যে-সংঘভুক্ত যুবকদল প্রস্তরভিত্তির মতো তরঙ্গ-প্রতিহতকারী শক্তি, যাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছিলেন এবং যাঁরা উত্তরকালে রামকৃষ্ণ সংঘকে বিশ্বসংস্থায় পরিণত করবেন); জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ব্রতের কথা ("খালি পেটে ধর্ম হয় না", "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" ইত্যাদি)। শেযোক্ত প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয়—সাধারণত মনে করা হয়, স্বামীজী ব্যাপক ভারত-ভ্রমণের কালে ভারতীয় জনগণের দুঃখ-দুর্দশার রূপ দেখে তা নিরাময়ের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন—স্বামীজী কিন্তু এখানে সেকথা বলছেন না; এখানে বক্তব্য, তাঁর সংসারত্যাগের অন্যতম কারণ ভারতের সাধারণ মানুষের দুর্গতি দূর করার উপায় অন্বেষণ; অর্থাৎ তিনি পরিব্রাজকের জীবন শুরু করার আগেই সে-বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনকে জীবনের অন্যতম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। পরিব্রাজক জীবনের অন্তে যদি তিনি কন্যাকুমারিকার শেষশিলায় ধ্যানান্তে সিদ্ধান্ত ক'রে থাকেন (সে-বিষয়ে নিজেও বলেছেন)—বুভুক্ষু ও অশিক্ষিত দেশবাসীর জন্য অন্ন ও শিক্ষার সংস্থান-চেষ্টাই হওয়া উচিত কর্তব্যকর্ম—তাহলে বলতে হবে, বহুতর অভিজ্ঞতার পরে ব্যক্ত এই উক্তিতে তাঁর পূর্বে-গৃহীত সিদ্ধান্তই দৃঢ়তর ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

উদ্ধৃত পত্রাংশে আরেকটি জিনিস আছে যা স্বামীজীর জীবনীসমূহে সাধারণভাবে উপেক্ষিত—সংসারত্যাগকালে তাঁর বিচ্ছেদবেদনা। গৃহত্যাগকালে বুদ্ধের পত্নীত্যাগের বেদনা নিয়ে অনেক কাব্য হয়েছে, শ্রীচৈতন্যের ক্ষেত্রেও তাই, (শ্রীচৈতন্যের ক্ষেত্রে মাতৃবিরহের কাব্য-কথাও আছে—'কাঁদে শচীমাতা নিমাই নিমাই/প্রতিধ্বনি ফিরে বলে, নাই নাই নাই।'), কিন্তু স্বামীজীর ক্ষেত্রে ও-ব্যাপারটি যেন খুব স্বচ্ছন্দে ঘটে গেছে—বোঁটা থেকে পাকা আমের খসে পড়ার মতোই। তাঁর আবাল্য ধর্মৈষণা ও বিবাহবন্ধন না-থাকা, এ-ধরনের সিদ্ধান্ত করতে সাহায্য করেছে। তিনি অখণ্ডের ঘরের ঋষি কিংবা নিত্যমুক্ত শুকদেব ইত্যাদি কথাও এক্ষেত্রে সহায়ক। কিন্তু স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ সর্বাংশে তা মনে করতেন না—নিজেই উদ্ধৃত অংশে তা বলেছেন। নিজ সংসারত্যাগকে তিনি আত্মীয়-স্বজনকে বলি দেওয়ার কাজ বলে মনে করছেন। এর সঙ্গে আমরা যোগ করব, পরিব্রাজক অবস্থায় এক বোনের আত্মহত্যার সংবাদে তাঁর মর্মান্তিক যন্ত্রণার কথা; আমেরিকাযাত্রার আগে খেতড়ির রাজা তাঁর মা ও ভাইদের অন্নবস্ত্রের ভার নেবেন—এই কথায় একান্ত স্বস্তির কথা; আমেরিকা থেকে ফেরার পরে নিজের মায়ের জন্য একটি বাড়ি তৈরির টাকা খেতড়ির রাজার কাছে ভিখারীর মতো চাওয়ার কথা; মায়ের মাথা গোঁজবার জায়গা করবার জন্য প্রবঞ্চক আত্মীয়দের সঙ্গে জীবনের শেষপর্বে সন্ন্যাসী হয়েও মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ার কথা। লেখকগণ ধরে নেন—এই ভারতবর্ষেও—ভালবাসা মানে শুধু নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্কজাতীয় ভালবাসা। মায়ের বা ভাইবোনদের প্রতি ভালবাসা লেখার ক্ষেত্রে যে তেমন জমে না!! তাই স্বামীজীর বিষয়ে অসন্ন্যাসী লেখকগণ স্বামীজীর মা ও ভাইবোনদের প্রতি ভালবাসার দিকে নজর দিতে পারেন নি, আর

সন্ন্যাসী লেখকগণ নিজ জীবনাদর্শ অনুযায়ী স্বামীজীর জ্বলন্ত বৈরাগ্যের দিকেই মনোযোগ অধিক নিবদ্ধ রেখেছেন।

হরিদাস বিহারীদাসকে লেখা পত্রটিতে একটি জিনিস নেই—থাকার কথাও নয়—স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনে ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসাধনা ও উপলব্ধির প্রসঙ্গ। স্বামীজী, বাইরের সম্মানিত মানুষকে ও-ধরনের কথা চিঠিতে লিখে জানাবেন না তা ধরেই নেওয়া যায়। (হরিদাস বিহারীদাস অবশ্য ইতস্তত সংবাদে সে-বিষয়ে অবহিত থাকতেও পারেন)। পরিব্রজ্যাকালে প্রাপ্ত অন্যান্য অভিজ্ঞতার কথাও ঐ চিঠিতে স্বামীজী স্পষ্টভাবে বলেন নি—প্রয়োজন ছিলনা বলেই হয়তো।

॥ দুই ॥

পরিব্রাজক জীবনে ইতিমধ্যে সূচিত রামকৃষ্ণ মঠকে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থান করার চিন্তা তাঁর মাথায় সর্বদা বর্তমান ছিলই। তিনি বুঝেছিলেন, শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার পরে তবে তাকে বিকীর্ণ করলে উপযুক্ত ফললাভ হয়। সেই শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ—তার আধার রামকৃষ্ণ মঠ—স্বামীজীর নেতৃত্বে বরানগর-মঠে তার সুচনা হয়েছে। সেই মঠবাড়ি ভাঙা এবং ভাড়া-করা। স্থায়ী আস্তানা চাই, আর চাই সেই আস্তানায় রামকৃষ্ণ-আদর্শে জীবনগঠনকারী মনুষ্যদল। স্বামীজী এই দেখে আশ্বস্ত হয়েছেন, বরানগর-মঠের তরুণ সন্ন্যাসীরা ত্যাগে-বৈরাগ্যে, ঈশ্বর-উৎকণ্ঠায় এবং রামকৃষ্ণ-প্রেমে জ্বলছেন। সেই আগুনকে নিয়ে তাঁরা ভারতের নানাদিকে ছুটে চলেছেন—তাঁরা সাধনা করছেন এবং সঞ্চয় করছেন অভিজ্ঞতা ও শক্তি। ওধারে জাগ্-প্রদীপের মতো বরানগর-মঠে থেকে গেছেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। স্বামীজী নিজে পরিব্রাজক, নিঃসঙ্গ হয়ে ভ্রমণ করতে চান, এড়াতে চান বিশেষভাবে গুরুভাইদের সংস্রব, কেননা সে বড় ভালবাসার মায়া-বন্ধন—কিন্তু সর্বাংশে তা করতে সমর্থ হননা। তরুতলে শয়ন, ভিক্ষান্ন ভোজন ইত্যাদি সুমহৎ কাজের চোটে শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেলে তাঁরা পথিমধ্যে পরস্পরের সেবা করেন, কখনো-বা কোনো শহরে কিছুদিনের জন্য একসঙ্গে জুটে পড়েন, যেমন মীরাটে। তখন ধ্যান, সাধনা, ভজন-কীর্তন, শাস্ত্রচর্চায় মাতোয়ারা দিনগুলিতে যেন ফেলে আসা 'বরানগর-মঠ' নবজন্ম নেয় এবং স্বামীজী গভীর তৃপ্তিতে অনুভব করেন (যেকথা হরিদাস বিহারীদাসকে পূর্বোক্ত পত্রে তিনি লিখেছেন)—গড়ে উঠেছে "পৃথিবীতে অদৃষ্টপূর্ব অতুলনীয় একটি সমাজ—যেখানে দশজন মানুষ দশ প্রকার ভিন্ন মত ও ভাব অবলম্বন ক'রে পরিপূর্ণ সাম্যের মধ্যে বাস করতে পারে।"

পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী বরানগর-মঠ ও সন্ন্যাসী গুরুভাইদের চিন্তায় কতখানি উৎকণ্ঠিত ছিলেন তা কলকাতায় একবার ফেরার পরে ২৬ মে ১৮৯০ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়। স্বামীজী লিখেছেন :

"আমার উপর নির্দেশ এই যে, তাঁহার [শ্রীরামকৃষ্ণের] দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি।"

"ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে...তজ্জন্য...ভারপ্রাপ্ত" বিবেকানন্দ উক্ত

জীবনোদ্দেশ্য পূরণের ব্যাপারে দুই প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় মানুষের কাছ থেকে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। ত্যাগী সেবকমণ্ডলীকে একত্র রাখতে হলে স্থায়ী আস্তানা চাই যেখানে তাঁদের আরাধ্য গুরু, যাঁকে তাঁরা ঈশ্বরাবতার মনে করেন, তাঁর ভস্মাস্থি সংরক্ষিত থাকবে। বরানগর-মঠের ভাঙাবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ-অস্থির পূজাদি চলছিল। হরিদাস বিহারীদাস তা দেখে আপত্তি জানিয়ে স্বামীজীকে চিঠি লিখেছিলেন। স্বামীজী উত্তরে পূর্বোক্ত পত্রে লেখেন :

"যে-গুরু আপনাদের ইতিহাসে বর্ণিত সমুদয় অবতার-প্রথিত পুরুষগণ অপেক্ষা শত শত গুণে অধিক পবিত্র—সেই প্রকার গুরুকে যদি কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে পূজাই করে, তবে তাতে ক্ষতি কি! যদি খ্রীস্ট, কৃষ্ণ কিংবা বুদ্ধকে পূজা করলে কোনো ক্ষতি না হয় তবে যে-পুরুষপ্রবর জীবনে চিন্তায় বা কর্মে লেশমাত্র অপবিত্র কিছু করেন নি, যাঁর অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত তীক্ষ্ণবুদ্ধি অন্য সকল একদেশদর্শী ধর্মগুরু অপেক্ষা উর্ধ্বতর স্তরে বিদ্যমান—তাঁকে পূজা করলে কোন্ ক্ষতি? দর্শন বিজ্ঞান বা অপর কোন বিদ্যার সহায়তা না নিয়ে এই মহাপুরুষই জগতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন যে, 'সকল ধর্মের মধ্যে সত্য আছে—শুধু একথা বললেই চলবে না, বস্তুতপক্ষে সকল ধর্মই সত্য'। আর এই ভাব জগতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করছে।"

স্বামীজী এর সঙ্গে যোগ ক'রে দিয়েছিলেন: "কিন্তু এই মতও আমরা জোর ক'রে কারো ওপর চাপাই না।"

হরিদাস বিহারীদাসকে লেখা ঐ চিঠির প্রায় চার বছর আগে (২৬ মে ১৮৯০) প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা এক চিঠিতে স্বামীজীর একই আকুতি। সেই পত্রে প্রমদাদাসকে তিনি আকুল আবেদন জানালেন কিছু অর্থের জন্য, যাতে গঙ্গাতীরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভস্মাস্থি রক্ষার উপযোগী একটি মঠ তৈরি করতে পারেন। অনিকেত সন্ন্যাসীর এইরকম নিকেতনী অভিপ্রায় কেন, এই প্রশ্ন উঠতে পারে অনুমান ক'রে স্বামীজী লিখেছেন :

"যদি এই অকপট, বিদ্বান, সৎকুলোদ্ভব যুবা সন্ন্যাসিগণ স্থানাভাবে এবং সাহায্যাভাবে রামকৃষ্ণের ideal ভাব লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের 'অহো দুর্দৈবম্'। যদি বলেন, 'আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এ-সকল বাসনা কেন,'—আমি বলি, আমি রামকৃষ্ণের দাস—তাঁহার নাম তাঁহার জন্ম ও সাধন-ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অণুমাত্র সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি-ডাকাতি করিতে হয় আমি তাহাতেও রাজি।"

স্বামীজীর মাথায় আরও একটি চিন্তা বা কল্পনা ঘুরছিল—হরিদাস বিহারীদাস বা প্রমদাদাস মিত্রকে তা বলা কোনমতেই সম্ভব ছিলনা, তাই বলেন নি—শ্রীমা সারদাদেবীর জন্য একটি আস্তানাও করতে হবে, যেখানে তাঁকে কেন্দ্র ক'রে ত্যাগী নারীরা সমবেত হবেন এবং স্বাভাবিকভাবে সূচনা হয়ে যাবে তাঁর স্বপ্নের স্ত্রীমঠের, যা কোনমতেই পুরুষ-কর্তৃত্বের অধীন থাকবে না। আমেরিকায় প্রথম সাফল্যলাভের কিছুদিনের মধ্যে তিনি স্বজনমণ্ডলীতে এই অভিপ্রায়ের কথা চিঠিতে লিখে পাঠান।

॥ তিন ॥

পরিব্রজ্যাকালে স্বামীজীর ব্যক্তিগত সাধনা ও উপলব্ধির বিষয়ে সংবাদ অল্পই মেলে। স্বামীজী বিশ্বসংসারের সমস্যার কথা পঞ্চমুখে বলতে পারেন, নিজের জাগতিক দুঃখ-কষ্টের কথাও, কিন্তু নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা বলতে গেলে তাঁর মুখ যেন আটকে যেত—ওসব কথা বলা যেন বড়ই আত্মমর্যাদাহানিকর!! অথচ ইতস্তত যেসব সংবাদ পাই তাতে বোঝা যায়, তিনি নিরন্তর উপলব্ধির তরঙ্গে ভাসছিলেন। তাঁর বহিঃরূপেও সেই প্রমাণ অঙ্কিত ছিল। একবার তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন : ঈশ্বরোপলব্ধি বোঝা যায় কিসে?—প্রাপ্তির আগে যিনি ছিলেন নাজারেথের যীশু, প্রাপ্তির পরে তিনি হয়ে গিয়েছিলেন যীশুখ্রীস্ট। এইভাবে আমরাও যোগ করিতে পারি—শাক্যসিংহ হয়ে গিয়েছিলেন—গৌতম বুদ্ধ, নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। নরেন্দ্রনাথ কী হয়েছিলেন? স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের মধ্যোত্তর-পর্বে স্বামী অখণ্ডানন্দ অনেক চেষ্টা ক'রে গুজরাটের মাণ্ডবীতে এক ভাটিয়ার বাড়িতে স্বামীজীর সন্ধান পেলেন। সেখানে কি দেখলেন?

"দেখিলাম স্বামীজীর আর পূর্ব রূপ নাই। তিনি রূপলাবণ্যে ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন..."[১]

আরও কিছুদিন পরের কথা। স্বামীজী ভারতের দক্ষিণাংশে নেমেছেন। মাদ্রাজে আছেন। অনুরাগী মানুষ, অধিকাংশই যুবক, তাঁর চারপাশে যথারীতি জুটেছেন। তাঁদের সঙ্গে নানা সময়ে আলোচনাদি চলছে। এমনই একদিনের কথা এক প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে :

> "শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সমুদ্রতীরের বাড়ি। অপরূপ চন্দ্রালোকিত রাত্রি। স্বামীজী সর্বোত্তম ভাবাবেশে আছেন। তাঁর মুখ সত্যই প্রদীপ্ত। সুস্মিত সৌম্য দেহ থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে তাঁর চারপাশে যেন জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করেছে। একটু আগেই গান গাইছিলেন।... সেই স্মরণীয় সন্ধ্যায় সেখানে সমবেত সকলে নিঃশ্বাস রোধ ক'রে সেই গান শুনছিল।... স্বামীজী... বললেন, কখনো কখনো কিভাবে যেন তাঁর ওপরে শক্তি ভর করে, তখন তিনি একেবারে বদলে যান। সেই সময়ে... যদি কেউ তাঁকে স্পর্শ করে, তার সমাধির অনুভূতিলাভ হয়, চিররহস্যের দ্বার তার কাছে খুলে যায়, তার পার্থিব আকর্ষণ ছিন্ন হয়ে যায়।... স্বামীজী যেই এই কথা শেষ করেছেন, সহসা শ্রোতাদের মধ্যে একজন উঠে পড়ে স্বামীজীর কাছে এগিয়ে এসে তাঁর দু-পা আঁকড়ে ধরলেন। ইনি পরলোকগত সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ার, মাদ্রাজ খ্রীস্টান কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক।... স্বামীজী বললেন,... 'এ তুমি কী করলে? এতখানি ঝুঁকি নিলে কেন? এর পরিণাম থেকে তোমার অব্যাহতি নেই।' ঠিক তখনি আমরা দেখলাম, সিঙ্গারাভেলুর মুখে চরম তৃপ্তির আলো।... সেদিন থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ—সংসার ত্যাগ করেছিলেন—স্ত্রী-পুত্র সবকিছু—অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়েছিলেন—তারপর শুধু স্বামীজীর কাজ ক'রে গেছেন।"[২]

স্বামীজীর 'প্রাপ্তি'র কথা বলবার সময়ে অপ্রাপ্তির যন্ত্রণার কথা যেন ভুলে না যাই। চরম সিদ্ধি কেন হচ্ছে না, এই বলে তিনি অবিরাম ছটফট করেছেন। "আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি,

আদর্শ মনুষ্য দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট।" [প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা, ৪.৭.১৮৮৯]। "আমি দিবারাত্র কী যাতনা ভুগিতেছি, কে জানিবে?" [একই ব্যক্তিকে, ৩১.৩.১৮৯০]। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আগেই যিনি নির্বিকল্প সমাধির মতো সর্বোচ্চ উপলব্ধি লাভ করেছেন, তাঁর এত না-পাওয়ার কষ্ট কেন? উত্তর খুবই সহজ—পেয়েছেন বলেই তো কষ্ট—হায়, নিশিদিন কেন পাই না। শ্রীচৈতন্য কেন বছরের পর বছর 'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বলে আর্তনাদ করতেন—কৃষ্ণ তো তাঁরই মধ্যে অধিষ্ঠিত! এই হলো অধ্যাত্মজগতের পরম রহস্য—সুধাপানের সময়েও অতৃপ্ত তৃষ্ণা—আরও আরও আরও! স্বামীজীর ক্ষেত্রে আহত অভিমানের স্পষ্ট কারণ আছে—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আস্বাদনের সুযোগ দিয়ে তার থেকে পরে বঞ্চিত রেখেছিলেন—কিনা তাঁকে 'মায়ের কাজ করতে হবে'। সেইজন্যই তো পওহারী বাবার কাছে স্বামীজীর শান্তির আশ্রয়-সন্ধান, হিমালয়ের গুহায় তপস্যা। অদ্বৈতে নিরন্তর নিমজ্জন তাঁর চাই, অথচ তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছে দ্বৈতের বোধে—কেননা তাঁকে মানবসেবা করতে হবে। সাধনকালে অদ্বৈতের বোধ এসে যখনই আত্মহারা হবার ক্ষণ উপস্থিত, তখনি—স্বামীজী বলেছেন—ঘটনা-পরম্পরার চাপে পড়ে তা ছাড়তে হয়েছে।°

আলমোড়ার নিকটবর্তী কাঁকড়িঘাটে উচ্চ উপলব্ধির পরে তিনি যে-ভাষায় তার রূপ প্রকাশ করেছেন তাকে বিশুদ্ধ অদ্বৈতানুভূতি (যার রূপ স্বামীজীর বিখ্যাত গানে পাই—'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর' ইত্যাদি) বলা যাবে কিনা তাত্ত্বিকরা ঠিক করবেন, আপাতত তা বিশিষ্টাদ্বৈত বলেই মনে হয়: "বিশ্বাত্মার এই বিবিধ প্রকাশ অনাদি। অতএব আমরা যাহা কিছু দেখি বা অনুভব করি, সবই সাকার ও নিরাকারের মিলনে সংগঠিত।" আলমোড়া শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে কাঁসারদেবী পাহাড়ের গুহায় তাঁর উচ্চ উপলব্ধি ও পরবর্তী বাধাতামূলক অবতরণের কাহিনী এখানে স্মর্তব্য। স্বামীজীর বিখ্যাত ইংরেজী জীবনীর প্রথম সংস্করণে লিখিত আছে :

> "এই গুহামধ্যে... তিনি দিবারাত্র কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা করলেন—তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সত্যলাভ করতেই হবে। সেই গভীর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে, যেখানে তাঁর ধ্যানভঙ্গ ঘটানোর মতো কেউ-ই ছিল না—বোধিলাভের পথে তিনি ক্রমান্বয়ে নানা উপলব্ধি লাভ করলেন—এবং দিব্যাগ্নিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল তাঁর আনন। তারপর, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম শিখরে যখন তিনি উপনীত, তখনই তাঁর পরম বাঞ্ছিত ব্যক্তিমুক্তির চির-আনন্দের পরিবর্তে কাজের জন্য প্রচণ্ড প্রেরণা বোধ করলেন, তা যেন সজোরে তাঁকে ঐ সাধনভূমি থেকে টেনে বার ক'রে আনল।"

দ্বৈতের সেবা করতে হবে অদ্বৈত বুদ্ধিতে, এরই নাম ব্যবহারিক বেদান্ত। সে-অভিজ্ঞতার শিক্ষা স্বামীজী পরিব্রাজক জীবনেই লাভ করেছেন। সেইজন্যই তাঁর মেথরের বাড়িতে অবস্থান, চামারের প্রস্তুত-করা আহার্য গ্রহণ এবং ভাঙ্গীর হুঁকো টানা। শেষোক্ত ব্যাপারে দেখা গেছে, স্বামীজীর মতো সংস্কারমুক্ত মানুষের মনের গভীরেও কিভাবে সংস্কার-শিকড় ছড়িয়ে ছিল। লোকটি ভাঙ্গী, একথা শুনে তিনি গোড়ায় তার হুঁকো টানতে পারেন নি, মুখ

ফিরিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপর ফিরেও এসেছিলেন আত্ম-তিরস্কার করতে করতে : 'আমি না সন্ন্যাসী! জাতি-বর্ণের পারে চলে গিয়েছি! কার্যকালে তা তো করতে পারিনি!' স্বামীজীর স্বীকারোক্তি থেকেই এসব কথা পাওয়া গেছে।

নিজেকে যাচাই করার অন্য দৃষ্টান্তও তাঁর পরিব্রাজক জীবনে ঘটেছে। সত্যকার ঈশ্বরবিশ্বাস আছে কিনা তার প্রমাণ ঈশ্বর-নির্ভরতায়। সেই পরীক্ষা স্বামীজী একাধিকবার নিজের ওপরে করেছেন। বৃন্দাবনে থাকাকালে গোবর্ধন-পরিক্রমার সময় সিদ্ধান্ত করেছিলেন, খাদ্যভিক্ষা করবেন না, অপ্রার্থিতভাবে এলেই তা গ্রহণ করবেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যখন ছটফট করছেন তখন আকস্মিকভাবে একটি লোক তাঁর জন্য আহার্য এনেছিল। সত্যই কি তাঁরই জন্য সে এনেছে, তা পরীক্ষা করবার জন্য স্বামীজী ছুটে পালিয়েছিলেন, কিন্তু অব্যাহতি পাননি; কারণ, লোকটি যে, তাঁকেই খাওয়াবার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট। এ-ধরনের অভিজ্ঞতা তাঁর আরও হয়েছে পরিব্রাজক জীবনে।

॥ চার ॥

পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী ধর্ম-ভারতকে দেখেছেন—সাধারণ এবং অসাধারণ, সকল মানুষের মধ্যে। ত্রৈলঙ্গ-স্বামী, স্বামী ভাস্করানন্দ, পওহারী বাবাকে দেখেছেন, অল্পদিন পূর্বে লোকান্তরিত রঘুনাথ দাসের আশ্রমে গিয়ে ওঁর অপূর্ব জীবনকথা শুনে মোহিত হয়েছেন, দেখেছেন এক মুসলমান সাধুকে, "যাঁর অঙ্গের প্রতিটি রেখা বলে দিচ্ছিল তিনি একজন পরমহংস!"[৯] জেনেছেন যে, কোনো মানুষের পতন তার সম্বন্ধে শেষকথা বলে না। পওহারী বাবার বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিল একটি চোর, পওহারী বাবা জেগে উঠতে সে যখন জিনিসপত্র ফেলে পালাচ্ছিল, তখন দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে ঐ জিনিসগুলি তাকে প্রীতিভরে অর্পণ করেন উক্ত মহাপুরুষ। এর পরে দস্যু রত্নাকরের ঋষি বাল্মীকি না-হয়ে উপায় ছিলনা। স্বামীজী পরিবর্তিত মানুষটিকে হিমালয়ে দেখেন—"অনুভূতির অতি উর্ধ্বস্তরে সেই সাধু অবস্থিত।" আর স্বামীজীর মন কেড়েছিল হৃষীকেশের পাগল দিগম্বর সাধুটি। সেই পাগল সাধু ছিলেন ছেলেদের কাছে মজার খেলার জিনিস, যাঁকে ঢিল ছুঁড়ে রক্তাক্ত ক'রে দেওয়া যায়, কিন্তু তাঁর হাসি থামানো যায়না। স্বামীজী যখন তাঁকে ছেলেদের হাত থেকে বাঁচিয়ে শুশ্রূষা করছিলেন, তখনো তিনি হাসিতে লুটোপুটি—"কেয়া মজাদার খেল হ্যায়! বিলকুল বাবা কা খেল! কেয়া আনন্দ!" এই পর্বেই স্বামীজী জেনেছিলেন সেই সাধুর বিষয়ে, যাঁকে আক্রমণ ক'রে বাঘ যখন মুখে ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল তখনো বলছিলেন: "শিবোঽহম্ শিবোঽহম্।"

ধর্ম-ভারতকে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ কেবল হিন্দুদের মধ্যে দেখেন নি—বৌদ্ধ-জৈন-শিখ-মুসলমান-খ্রীস্টান—সর্ব মত ও সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখেছেন এবং সকলের সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা করেছেন। "ধর্মাচার্য হিসাবে [নিবেদিতা লিখেছেন] তাঁহার নিকট সমগ্র জগৎই ভারতবর্ষ এবং সর্বদেশের মানবই তাঁহার নিজ ধর্মাবলম্বী।"[১০]

স্বামীজীর অসাধারণ এক রচনা 'মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর', যা লেখেন ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় থাকাকালে। তার মধ্যে এক দীর্ঘ বাক্যে, দীর্ঘ একটানে, ভারতের ধারাবাহিক ধর্মের ইতিহাসধারাকে উপস্থিত করেন :

"হিমাচলস্থিত অরণ্যানীর হৃদয়স্তব্ধকারী গাম্ভীর্যের মধ্যে স্বর্ণদীর গভীর ধ্বনিমিশ্রিত অদ্বৈতকেশরীর 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়' রূপ বজ্রগম্ভীর রবই কেহ শ্রবণ করুন, অথবা বৃন্দাবনের মনোহর কুঞ্জসমূহে 'পিয়া পীতম্' কূজনই শ্রবণ করুন, বারাণসীধামের মঠসমূহের সাধুদিগের গভীর ধ্যানেই যোগদান করুন, বড়গেলে তেঙ্গেলে প্রভৃতি শাখাযুক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতমতাবলম্বী আচার্যগণের পাদমূলেই উপবেশন করুন, অথবা মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্যগণের বাক্যই শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করুন, গৃহী শিখদিগের 'ওয়া গুরুকি ফতে'-রূপ সমরবাণীই শ্রবণ করুন, অথবা উদাসী ও নির্মলাদিগের গ্রন্থসাহেবের উপদেশই শ্রবণ করুন, কবীরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে সৎসাহেব বলিয়া অভিবাদনই করুন, অথবা সখী-সম্প্রদায়ের ভজনই শ্রবণ করুন, রাজপুতানার সংস্কারক দাদূর অদ্ভুত গ্রন্থাবলী বা তাঁহার শিষ্য রাজা সুন্দরদাস ও তাঁহা হইতে ক্রমশঃ নামিয়া 'বিচারসাগরে'র বিখ্যাত রচয়িতা নিশ্চলদাসের গ্রন্থই (ভারতে গত তিন শতাব্দী ধরিয়া যত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই বিচারসাগর গ্রন্থের প্রভাব ভারতীয় জনসমাজে সর্বাপেক্ষা অধিক) পাঠ করুন, এমনকি আর্যাবর্তের ভাঙ্গী মেথরগণকে তাঁহাদের লালগুরুর উপদেশ বিবৃত করিতেই শুনুন... দেখিবেন, এই আচার্যগণ ও সম্প্রদায়সমূহ সকলেই সেই ধর্মপ্রণালীর অনুবর্তী, শ্রুতি যাহার প্রামাণ্য গ্রন্থ, গীতা যাহার ভগবদ্বক্ত্রবিনিঃসৃত টীকা, শারীরক ভাষ্য যাহার প্রণালীবদ্ধ বিবৃতি, আর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যগণ হইতে লালগুরুর মেথর শিষ্যগণ পর্যন্ত ভারতের সমুদয় বিভিন্ন সম্প্রদায় যাহার বিভিন্ন বিকাশ।"

এই ইতিহাসের ধারার সঙ্গে স্বামীজীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যোগ ছিল। তারই শক্তিতে তিনি বলেছেন : "এমনকি বৌদ্ধ বা জৈনদিগের দার্শনিক গ্রন্থাবলীতেও শ্রুতির সহায়তা পরিত্যক্ত হয় নাই," কিংবা "সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব লক্ষিত হয়," কিংবা "পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে ত্যাগের যে-মহিমা প্রচারিত হয়, তাহাতে অতি নিম্নশ্রেণীর লোকও বেদান্ত-দর্শনের উচ্চতম উপদেশ পর্যন্ত শিক্ষা পাইয়াছে; যথোচিত গর্বের সহিত পঞ্জাবের কৃষকবালিকা বলিয়া থাকে যে, তাহার চরকা পর্যন্ত 'সোঽহম্ সোঽহম্' ধ্বনি করিতেছে," কিংবা—

"আমি হৃষীকেশের জঙ্গলে সন্ন্যাসিবেশধারী ত্যাগী মেথরদিগকে বেদান্ত পাঠ করিতে দেখিয়াছি। অনেক গর্বিত অভিজাত ব্যক্তিও তাঁহাদের পদতলে বসিয়া আনন্দের সহিত উপদেশ পাইতে পারেন।"[৬]

॥ পাঁচ ॥

ভারত ভ্রমণ ক'রে স্বামীজী এই-যে স্থির প্রত্যয়ে উপনীত হলেন—ভারত ধর্মের দেশ—সে-ধর্মের আশ্রয় কি শুধু মঠ-মন্দির, পার্বত্য গুহা, একান্তে ধর্মার্চনায়? —না। স্বামীজী প্রত্যক্ষ করেছেন, ধর্ম ভারতের সমগ্র জনজীবনে ওতপ্রোত। যেমন ধরা যাক, অতিথিকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা। অতিদরিদ্র পরিবারেও ভারতের ধর্ম-প্রতিনিধি সন্ন্যাসীদের জন্য ভিক্ষা দেবার পদ্ধতি ছিল (বা আছে) বলেই পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা কিংবা লোকালয়-বিচ্ছিন্ন তপস্যারত সন্ন্যাসীরা দেহধারণ করতে পেরেছেন। স্বামীজীর মুখে নিবেদিতা শুনেছেন :

> "দরিদ্র কৃষকগৃহে যে অতিথিসৎকার হয় তা ভারতের অন্য কোনো শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়না। সত্য বটে, গৃহকর্ত্রী অতিথিকে তৃণশয্যার বেশি ভালো শয্যা দিতে পারেন না, তাঁকে আশ্রয় দিতে পারেন কেবল নিচু ছাউনি-দেওয়া মাটির ঘরে, তার বেশি নয়—কিন্তু তিনিই আবার শুতে যাবার ঠিক আগে, বাড়ির অপর সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন একটি দাঁতন ও একবাটি দুধ চুপি-চুপি এমন একস্থানে রেখে যান যাতে অতিথি প্রভাতে শয্যাত্যাগ ক'রে তা দেখতে পান এবং চলে যাবার আগে কিছু জলযোগ ক'রে যেতে পারেন।"[৩]

॥ ছয় ॥

স্বামীজী দেখতে চেয়েছিলেন গোটা ভারতবর্ষকে, অতীত ও বর্তমান নিয়ে যে-ভারতবর্ষ, ধর্ম যার প্রাণকেন্দ্রে আছে, আর যার দেহ বিস্তৃত হয়েছে সভ্যতার নানা উপকরণে। কিছুদিনের মধ্যে আমেরিকায় বক্তৃতাকালে তিনি বারেবারে অতীত ভারতবর্ষের শিল্প ও বিজ্ঞানের সমৃদ্ধির কাহিনী শুনিয়েছেন। কলাশিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর ছিল বাসনাময় ভালবাসা। পরিব্রাজক জীবনে তিনি যথাসম্ভব শিল্পনিদর্শনগুলি দেখেছেন। সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা না গেলেও যা পাওয়া গিয়েছে তার থেকে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিমাণ কিছুটা অনুমান করা যায়। নিবেদিতা প্রমুখের সঙ্গে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভারত-ভ্রমণকালে স্বামীজী পূর্বস্মৃতিতে তন্ময় হয়ে যেতেন : "রেল-যোগে পূর্বদিক থেকে প্রবেশ করবার মুখে কাশীর ঘাটগুলির যে-দৃশ্য চোখে পড়ে তা জগতের দর্শনীয় দৃশ্যগুলির অন্যতম। স্বামীজী সাগ্রহে তাদের প্রশংসা করতে ভুললেন না। লখনৌ-এ যে-সকল শিল্পদ্রব্য ও বিলাসোপকরণ প্রস্তুত হয়, তাদের নাম ও গুণবর্ণনা অনেকক্ষণ ধরে চলল।"[৪]

এই ভ্রমণে স্বামীজী দলবলের সঙ্গে প্রধানত বড় বড় শহরের ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন বলে সেসব স্থানের বিবরণই নিবেদিতা ইতস্তত দিয়েছেন—বনজঙ্গলের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে সন্নিহিত মন্দির ও তার ভাস্কর্যের কথা আনেন নি। কিন্তু একই সঙ্গে এই কথা স্মরণ রাখতে হবে, স্বামীজীর সৌন্দর্যসন্ধান কেবল সুনির্মিত সুবিখ্যাত বস্তুতে নয়, ভারতের নিসর্গ প্রকৃতিকে, এবং সাধারণ মানুষের জীবনছবিকে, নিবিড় অনুরাগের সঙ্গে দর্শনের মধ্যেও তার রূপ দেখা যায়।

"আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত খেত, খামার ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করবার সময় তাঁর প্রেম যেমন উথলে উঠত, অথবা তন্ময়তা যেমন প্রগাঢ় হয়ে উঠত, এমন আর বোধহয় কোথাও হয়নি। এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে এক অখণ্ডভাবে চিন্তা করতে পারতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কিভাবে ভাগে জমি চাষ হয়, তা বুঝিতে দিতেন অথবা কৃষক-গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা করতেন, কোন খুঁটিনাটি বাদ যেত না। যেমন, সকালের জলখাবারের জন্য রাত্রে শেষ উনুনে খিচুড়ি চড়িয়ে রাখা হতো, তাও বলতেন। এসকল কথা বলতে বলতে তাঁর নয়নপ্রান্তে যে-আনন্দরেখা ফুটে উঠত, অথবা কণ্ঠ যে-প্রকার আবেগে কম্পিত হতো, তা নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বের পরিব্রাজক জীবনের স্মৃতিবশত।"[৯]

স্বামীজী ভারতের যে-স্থান দিয়েই যেতেন, সেখানকার ইতিহাস যেন উথলে উঠত তাঁর মনে ও কণ্ঠে। মগধের কোনো ভূখণ্ডকে তিনি বুদ্ধের কিশোরজীবনের ও বৈরাগ্যজীবনের লীলাক্ষেত্র বলে অনুভব করতেন, রাজপুতানার বন্য ময়ূরের নৃত্যছন্দ তাঁর মনে পড়িয়ে দিত বীরযুগের চারণসঙ্গীতের কথা, কোনো একটি হস্তী তাঁর কাছে বিদেশীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে জীবন্ত কামানের মতো প্রতীয়মান হতো। আর চিরদিনের মতো তাঁর মন কেড়ে রেখেছিল মায়ের ও শিশুর ভালবাসায় মাখানো একটি আপাতসামান্য কিন্তু অসামান্য ছবি—"একবার তিনি দেখেছিলেন, এক জননী এক পাথর থেকে অন্য পাথরে পা দিয়ে পার্বত্য তটিনী পার হচ্ছেন, আর তারই ফাঁকে এক-একবার মুখ ফিরিয়ে পিঠে বাঁধা শিশুসন্তানটিকে খেলনা দিচ্ছেন আর আদর করছেন।" সজীব ভারতের চলচ্চিত্র তাঁর বিশাল নয়ন-পটের ওপর দিয়ে সরে যেত—"পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে একবার তিনি প্রদোষে কোনো ভারতীয় গ্রামের বহির্ভাগে দাঁড়িয়ে ক্রীড়ারত বালক-বালিকাগণের তন্দ্রাজড়িত কোলাহল, সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টাধ্বনি, গোপবালকগণের চিৎকার এবং স্বল্পকালস্থায়ী গোধূলির আধো-অন্ধকারে শ্রুত অস্ফুট কণ্ঠস্বর—এই সকল সান্ধ্য শব্দ শুনবার জন্য কত উৎসুক ছিলেন, তা বলেছিলেন।" তাঁর শান্ত সুন্দর মৃত্যুকল্পনার সঙ্গেও পরিব্রাজক জীবনের স্নায়ুশিরাময় অভিজ্ঞতা জড়িয়ে ছিল—"তাঁর চোখে, হিমালয়ের অরণ্যমধ্যে এক পর্বতপৃষ্ঠে শয়ন ক'রে, নিম্নে স্রোতস্বিনীর অবিরাম 'হর হর' ধ্বনি শুনতে শুনতে শরীর ছেড়ে দেওয়াই আদর্শ মৃত্যু।"[১০]

॥ সাত ॥

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, নিবেদিতা জানিয়েছেন : "বিধাতা সমগ্র ভারতবর্ষকেই গলাবার পাত্রে নিক্ষেপ করতে উদ্যত—তার ফলে কোন্ নব নব আকারের শক্তি ও সমৃদ্ধির সৃষ্টি হবে, তা আগে থেকে বলা মানুষের ক্ষমতার বাইরে।" অমন একটা সুমহান কাজ কি স্বামীজী অদৃশ্য বিধাতার হাতে ফেলে রাখার পাত্র ছিলেন? না। তিনি অবশ্যই অনুভব করেছেন, বিধাতার দক্ষিণ বাহুরূপেই তাঁর আবির্ভাব। সুতরাং ভারত-পরিক্রমার কালে তিনি সমগ্র ভারতের একদেহে মিশ্রিত হবার পথে বাধা কি কি, তা গভীরভাবে চিন্তা

করেছেন—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। নিরন্ন ভারতবর্ষ—ভারতের অন্নচিন্তা তাই তাঁর নিরন্তর চিন্তা। সেজন্য কৃষির সঙ্গে উৎপাদনী যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনের জন্য তাঁর পরিকল্পনা। নিরক্ষর ভারত—সেজন্য তাঁর গণশিক্ষার পরিকল্পনা। সে-শিক্ষা এমন হবে যা ভারতবাসীকে হারানো ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দেবে, জীবনধারণের পথ দেখাবে। ভারতের সাধারণ মানুষ অধিকারবঞ্চিত—অর্থে, শিক্ষায় এবং ধর্মীয় ব্যবস্থাদিতে। তিনি সিদ্ধান্ত জানালেন, বিশেষাধিকার হলো সামাজিক অগ্রগতির সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। একথা মনে করার কারণ নেই যে, পাশ্চাত্য-ভ্রমণের ফলেই বিবেকানন্দ সামাজিক চিন্তায় প্রগতিশীল হয়েছেন। ৭ আগস্ট ১৮৮৯ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা চিঠিতে শূদ্রের বেদ-অধ্যয়নে অনধিকার সম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের বিধানকে চ্যালেঞ্জ করেছেন—শঙ্করাচার্যের বক্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি দেখিয়ে। যুক্তির শেষে তীব্র এবং বেদনার্ত প্রশ্ন : "কেন শূদ্র উপনিষদ্ পড়িবে না?" কিছুদিন পরে একই ব্যক্তিকে আর এক চিঠিতে (১৭ আগস্ট ১৮৮৯) লিখেছেন : "স্পার্টানরা যে-প্রকার হেলট্ [-দের উপর ব্যবহার করিত] অথবা মার্কিনদেশে কাফ্রীদের উপর যে-প্রকার ব্যবহার হইত, সময়ে সময়ে শূদ্রেরা যে তদপেক্ষাও নিগৃহীত হইত, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।" এর পরে কয়েক বছরের ভারত-ভ্রমণকালে বিকট অস্পৃশ্যতার রূপ তিনি দেখলেন, আগুনঝরা ভাষায় তার বর্ণনা করলেন, দক্ষিণ ভারতকে তাঁর মনে হলো পাগলাগারদ। ভারতে ফেরার পরে স্বামীজী বক্তৃতায় বা কথাবার্তার সময়ে সমাজ-সংস্কারকদের মুখস্থ বুলির সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করেছেন; কারণ, আমূল সংস্কারই তাঁর মূলগত পরিকল্পনা। তাঁর বিরাট আহ্বান—ভারতীয় জনশক্তির অধঃপতিত শতকরা নব্বইভাগ অংশকে উত্তোলন ক'রে শিক্ষিত অভিজাত অংশের সমস্তরে স্থাপন করতে হবে। সেই আহ্বানই ছিল, "নতুন ভারত বেরুক—বেরুক চাষার কুটির ভেদ ক'রে" ইত্যাদি অংশে। কিন্তু সমাজ-সংস্কারের বাস্তব প্রয়োজন তিনি কখনো অস্বীকার করেন নি, তা আমেরিকা-যাত্রার আগে মাদ্রাজের ট্রিপ্লিকেন লিটার‍্যারি সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতায় দেখা যায়। ঐ বক্তৃতায় তিনি প্রভূত বিস্ফোরক কথাবার্তা বলেছিলেন :

> "ব্রাহ্মণরা একদা গোমাংস খেতেন এবং শূদ্রনারী বিবাহ করতেন।... জাতিভেদ সামাজিক ব্যাপার—ধর্মব্যাপার নয়।... একজন ব্রাহ্মণ যে-কারো সঙ্গে আহার করতে পারেন—এমনকি পারিয়ার [অর্থাৎ অচ্ছুতশ্রেণীর] সঙ্গেও।... পারিয়ার স্পর্শে যে-আধ্যাত্মিকতার ক্ষয় হয়, সে বড় মন্দমানের আধ্যাত্মিকতা।... জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি যেসব প্রথা শিক্ষার প্রতিবন্ধক, সেগুলির মুণ্ড অবিলম্বে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। এমনকি শ্রাদ্ধকেও বর্জন করা যায় যদি তার অনুষ্ঠান করতে সময় নষ্ট হয়, যে-সময়কে আত্মশিক্ষার জন্য শ্রেয়তরভাবে কাজে লাগানো যেত।... নারীদের পড়াশোনার স্বাধীনতা দিতেই হবে, পুরুষদের মতোই তাদের শিক্ষালাভের অধিকার আছে।... এখনকার হিন্দুরা অধিকাংশই ভণ্ড।... কলিযুগে খাঁটি ব্রাহ্মণ বলতে কিছু নেই। পারিয়ারা আমাদেরই মতো মানুষ, তাদের শিক্ষার দায় নিতে হবে উচ্চতর শ্রেণীর মানুষদের।"[১১]

বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ-সমাধি মন্দিরে স্বামীজীর রিলিফ, জয়পুরের এক প্রস্তর-শিল্পী নির্মিত। এটির পিছনে ছিল নিবেদিতার উদ্যোগ এবং মিসেস লেগেটের অর্থসাহায্য। গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে আলোচিত।

সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটি পরিচালিত ট্রাবুকো মন্যাস্ট্রিতে স্থাপিত স্বামীজীর ব্রোঞ্জমূর্তি, প্রখ্যাত ভাস্কর মালভিনা হফম্যান নির্মিত। ইনি শৈশবে স্বামীজীকে দেখেছেন।

লস্ এঞ্জেলেস-এর দক্ষিণ প্যাসাডেনা শহরে স্বামীজী মীড-ভগিনীদের বাড়িতে মাসাধিককাল কাটিয়েছেন, তারই একটি কক্ষে স্বামীজীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র রক্ষিত। বাড়িটি এখন সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটির অধিকারে। নাম 'বিবেকানন্দ হাউস'। এক রচনায় আলোচিত।
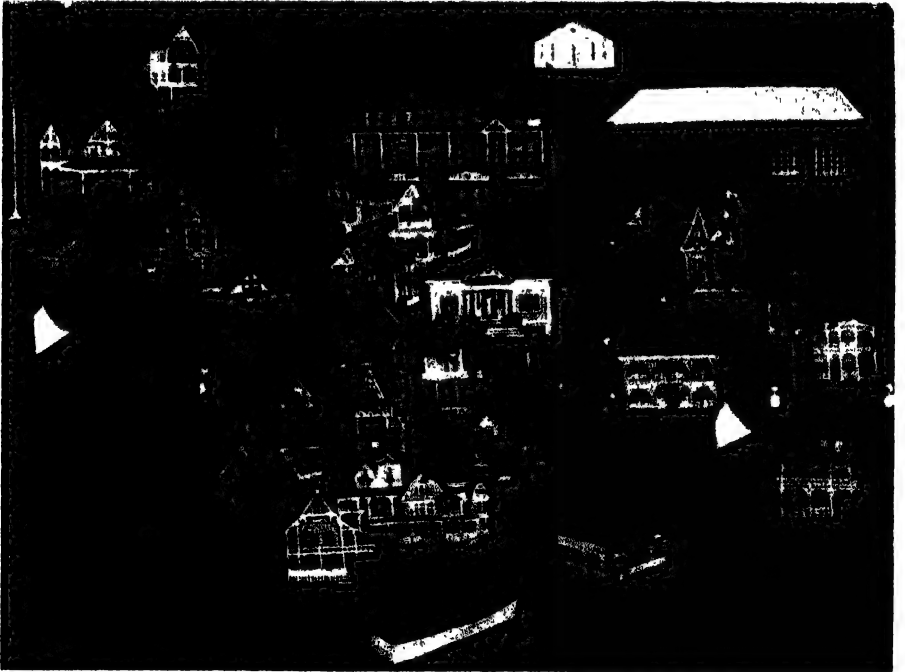
উত্তর-পূর্ব আমেরিকার থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক-এ স্বামীজীর বাসগৃহ, মানচিত্রের বামদিকে একেবারে উচ্চে অবস্থিত। এখানে স্বামীজী প্রায় দুই মাস ছিলেন, অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবাবস্থায়। বাড়িটি ঐ দ্বীপে দ্বিতীয় প্রাচীন ধর্মস্থান। বর্তমানে নিউইয়র্ক 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টার'-এর অধিকারে। একটি রচনায় আলোচিত।

দক্ষিণ প্যাসাডেনাব 'বিবেকানন্দ হাউস' স্থানীয় পৌরপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'কালচারাল ল্যান্ডমার্ক' হিসাবে চিহ্নিত।

স্বামীজী কি নিউইয়র্ক সংলগ্ন সমুদ্রমধ্যে স্থাপিত 'স্বাধীনতা-মূর্তি' দেখেছিলেন? এক রচনায় আলোচিত।

প্লেগ-রোগী কোলে ভগিনী নিবেদিতার রিলিফ। শিল্পী অধ্যাপক নিত্যানন্দ ভকত।

স্বামী অশোকানন্দের শিষ্যা মারী লুইস বার্ক (সিস্টার গার্গী), স্বামীজীর পাশ্চাত্যজীবন সম্বন্ধে প্রধান গবেষক, 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন দ্য ওয়েস্ট, নিউ ডিসকভারিজ' (৬ খণ্ড) গ্রন্থের অমর লেখক। একটি প্রবন্ধে আলোচিত।

বিবেকানন্দ-জননী ভুবনেশ্বরী দেবীর এক বিরল চিত্র, 'স্বরাজ' পত্রিকায় প্রকাশিত। এটিই সম্ভবত ভুবনেশ্বরী দেবীর এতাবৎপ্রাপ্ত দ্বিতীয় ফটো। প্রথমটি সুপরিচিত, বিভিন্ন গ্রন্থে মুদ্রিত। ভুবনেশ্বরী দেবীর জীবনে দুর্ভাগ্যের অন্ত ছিল না। ১৮৮৪-তে ৪৩ বৎসর বয়সে স্বামীহারা। ১৯০২-তে ৬১ বৎসর বয়সে প্রাণপ্রিয় জ্যেষ্ঠ সন্তান স্বামীজীর দেহত্যাগ। ৬৬ বৎসর বয়সে কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথের কারাবাস ও বিদেশে প্রস্থান। মধ্যম পুত্র মহেন্দ্রনাথের সব সময়েই অনিশ্চিত অবস্থান। ক্রমাগত মামলা-মোকর্দমা, নির্মম দারিদ্র্য, শরীর-মনকে বিধ্বস্ত ক'রে দিয়েছিল। তার রূপ ছবিটিতে দেখা যায়।
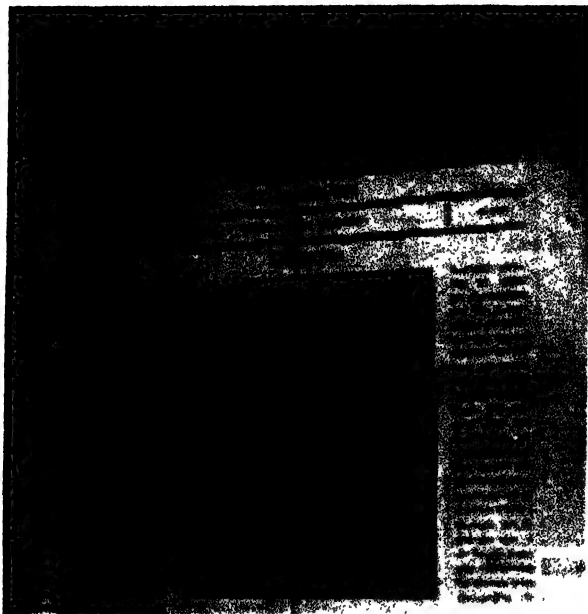
স্বদেশী আন্দোলন পর্বের আগ্নেয় চরিত্র ব্রহ্মানন্দ উপাধ্যায়ের স্বল্পায়ু 'স্বরাজ' পত্রিকায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কয়েকটি লেখা বেরিয়েছে। তেমনি একটি রচনা, স্বরাজ, ১০ই চৈত্র, ১৩১৩।

স্বরাজ পত্রিকায় স্বামীজীর পৈতৃক ভবনের ভগ্ন চেহারা।

॥ আট ॥

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষই বিবেকানন্দের। কেবল ভারতের ইতিহাস নয়, ভারতের ভূগোলকেও তিনি অখণ্ডরূপে ধরতে চেয়েছিলেন। কলকাতায় তাঁর জন্ম, কলকাতার উপকণ্ঠ দক্ষিণেশ্বরে তাঁর গুরুলাভ ও অধ্যাত্মশিক্ষা, হিমালয়ের গিরিগুহায় তাঁর ধ্যান, তারপর 'বাধার বিন্ধ্যাচল' অতিক্রম ক'রে কন্যাকুমারিকায় তাঁর পুনশ্চ ধ্যান। এই দুই ধ্যান-শিখরের মধ্যে অগণ্য ধ্যানের মৌন পর্বত। ওই দুই ধ্যান-শিখরে অবস্থান আবার শ্রীরামকৃষ্ণেরই অমোঘ নির্দেশে। এক ধ্যানে আত্মসাক্ষাৎকার, অন্য ধ্যানে ক্ষুধার্ত অশিক্ষিত ভারতের উজ্জীবন-মন্ত্রলাভ।

এই ভারতের দেহের ওপর দিয়ে যেসব ভেদরেখা সেদিনও টানা ছিল, সেগুলি তাঁর চোখ এড়ায় নি। পঞ্জাবের কথাই ধরা যাক। পঞ্জাবে তখনই হিন্দু ও শিখের মধ্যে মানসিক সংঘাত শুরু হয়ে গেছে। (শিখ ও মুসলমানের সংঘাতের কথা বলাই বাহুল্য)। স্বামীজী ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে পঞ্জাবে গিয়ে যা বলেছিলেন, তা অবশ্যই পূব-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থাপিত। তিনি নিজেকে "পূর্বদেশের ভ্রাতা"-রূপে চিহ্নিত ক'রে বললেন : "আমি এসেছি পশ্চিমদেশের ভ্রাতৃগণের কাছে—প্রীতিসম্ভাষণ জানাতে, আলাপ ও ভাববিনিময় করতে। কোথায় আছে বিভিন্নতা, তা আবিষ্কার কবতে আমি আসিনি এসেছি মিলনভূমি সন্ধান করতে। ভাঙবার পরামর্শ দিতে আসিনি—এসেছি গড়বার প্রস্তাব নিয়ে।" স্বামীজীর কাছে পঞ্জাব বহু আদর্শের মিলনভূমি, আর্যদের স্থান, গ্রীক-সহ বিদেশীদের প্রবেশভূমি, নানা সভ্যতার প্রয়াগস্থল। তাঁর দৃষ্টিতে গুরু নানক কেবল শিখগুরু নন, গোটা ভারতের অন্যতম প্রধান ধর্মগুরু। তাঁর মতে গুরু গোবিন্দ হিন্দু-আদর্শের এক শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, যাঁর অসাধারণ সংগঠন, তেজ-বীর্য এবং অপূর্ব প্রেমের কথা বলবার সময়ে স্বামীজী উচ্ছ্বসিত। গুরু গোবিন্দের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব—তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমষ্টিস্বার্থের বোধ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তাই উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর অনুগামী হয়েছিল। নিবেদিতার সাক্ষ্য অনুসারে, পঞ্জাবে অনেকেই তাঁকে গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের মিলিত মূর্তিরূপে কল্পনা করেছিলেন।

দক্ষিণ ভারতের বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা তাঁর চোখ এড়ায়নি। ইংরেজ-আমলে তার সূত্রপাত। প্রজা-মনুষ্যের মনোভেদের ওপর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে—এই নীতি অনুযায়ী ইংরেজ শাসক নানা মাধ্যমে ভারতবাসীর মধ্যে ভেদসৃষ্টির চেষ্টা করেছে এবং সে-ব্যাপারে ভারতবর্ষকে উর্বর ক্ষেত্ররূপে লাভ করেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে সক্রিয় ছিল বহু কর্মী—প্রশাসক থেকে ধর্মযাজক, প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক—সবাই মিলে সরবে এই প্রচার শুরু করেছিল যে, উত্তর ভারত থেকে আর্যরা এসে দক্ষিণ দেশে অভিযান চালিয়ে ধ্বংস করেছে প্রাচীন দ্রাবিড়-সংস্কৃতি। স্বামীজী পরিব্রাজক-জীবন থেকেই এই প্রচারের বিরুদ্ধে সতর্ক করতে থাকেন। তার কিছুদিন পরে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মাদ্রাজ-অভিনন্দনের উত্তরে তিনি আর্যাভিমানীদের স্মরণ করিয়ে দেন—উত্তর ভারতে যেসব ধর্মধারা প্রবল, তাদের ভিতরে প্রাণশক্তি দান করেছেন দক্ষিণ ভারতের সুমহান আচার্যগণ। তিনি বলেছিলেন :

দাক্ষিণাত্যের কাছে আর্যাবর্ত গভীরভাবে ঋণী, কারণ ভারতীয় ধর্মজগতে সক্রিয় শক্তিসমূহের অধিকাংশের মূল দাক্ষিণাত্যে;

মহাত্মা শঙ্করের নিকট সকল অদ্বৈতবাদী ঋণী;
মহাত্মা রামানুজের স্বর্গীয় স্পর্শ পদদলিত পারিয়াদের আলওয়ারে পরিণত করেছিল;
সমগ্র ভারতে শক্তিসঞ্চারকারী শ্রীচৈতন্যের অনুবর্তিগণ মহাত্মা মধ্বের ভাবানুগত্য গ্রহণ করেছিলেন;
বারাণসীধামের শ্রেষ্ঠ মন্দিরসমূহে দাক্ষিণাত্যবাসীদের প্রাধান্য;
দাক্ষিণাত্যবাসীরাই সুদূর হিমালয়ের দেবালয়সমূহ রক্ষা করেছেন;
দাক্ষিণাত্য চিরদিন বেদবিদ্যার ভাণ্ডার; এবং দাক্ষিণাত্য সর্বাগ্রে রামকৃষ্ণ-বাণীকে গ্রহণ করেছে।

ভারতদেহের 'সহস্রার' কিন্তু হিমালয়।

ভারতের উত্তরে কয়েক সহস্র মাইলব্যাপী মহান প্রহরী দেবতাত্মা হিমালয়—নগাধিরাজ। উত্তর ও পশ্চিমাগত আক্রমণকারীদের যথাসম্ভব পথরোধ করেছে এই হিমালয়, রক্ষা করেছে উত্তরের মরুঝড় থেকে, সর্বোপরি আশ্রয় দিয়েছে অগণিত মুনি-ঋষিকে, যাঁদের মনন ও সাধনা ভারত ও পৃথিবীর মানবসমাজকে দান করেছে পরম সম্পদ—আত্মতত্ত্ব।

হিমালয় বিবেকানন্দের 'নিজ নিকেতন'।

এই হিমালয়ের ওপরে আক্রমণ এসেছে বারেবারে—অতীতে এবং বর্তমানে। ভবিষ্যতেও তা সম্ভাবিত। শেষ রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ভারতবাসীকে রক্ষা করতে হবে হিমালয়কে। বিবেকানন্দের পরিব্রাজক-জীবনপর্বকে বিস্তৃত ক'রে যদি ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে পৌঁছাই—সেখানে দেখব, ভারত-আত্মার বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দের দুই সমুচ্চ অধ্যাত্ম-উপলব্ধির স্থান কাশ্মীর, যাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত এখন চলছে।

অমরনাথে স্বামীজীর শিবদর্শন।

ক্ষীরভবানীতে মাতৃদর্শন।

ভারতীয় জীবনে হিমালয়ের ভূমিকা কী, স্বামীজী তা বর্ণনা করেছিলেন তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতার আবেগ নিয়ে। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে আলমোড়া অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেছিলেন :

"আমাদের পূর্বপুরুষগণ শয়নে স্বপনে যে ভূমির বিষয়ে ধ্যান করিতেন—এই সেই ভূমি—ভারতজননী পার্বতীদেবীর জন্মভূমি। এই সেই পবিত্র ভূমি, যেখানে ভারতের প্রত্যেক যথার্থ সত্যপিপাসু আত্মা শেষ অবস্থায় আসিয়া জীবনের যবনিকাপাতে অভিলাষী হয়।

"এই পবিত্র ভূমির গিরিশিখরে, এর গভীর গহ্বরে, এর দ্রুতগামিনী স্রোতস্বতীসকলের তীরে, সেই অপূর্ব তত্ত্বরাশির চিন্তা করা হইয়াছিল, যার কণামাত্রের প্রকাশও বৈদেশিকগণের নিকট হইতে বিপুল শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে।...এই হিমালয় পর্বত বৈরাগ্য ও ত্যাগের সাকার মূর্তিরূপে দণ্ডায়মান। এই ত্যাগ ও বৈরাগ্য হইতে উচ্চতর ও মহত্তর কিছু মানবজাতিকে শিক্ষা দিবার নাই।...

"এই হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিসমূহ জড়িত; যদি ভারতের

ধর্মেতিহাস হইতে হিমালয়কে বাদ দেওয়া হয়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে।"

আগেই দেখেছি, স্বামীজী নিজের সুন্দরতম মৃত্যুকামনা করেছিলেন হিমালয়ের ক্রোড়েই। এখানেও সেই কথা :

"এই সেই ভূমি—অতি বাল্যকাল হইতে আমি যেখানে বাস করিবার কল্পনা করিয়াছি। আমার প্রাণের বাসনা, এই ঋষিগণের প্রাচীন নিবাসভূমি, দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি—এই পর্বতরাজের ক্রোড়ে আমার জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইব।"

একই প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে বারেবারে—এক অপূর্ব দ্বৈতলীলার কাণ্ড—ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে 'স্বয়ং ভারতবর্ষ' পরিভ্রমণ করছেন। দ্বিতীয় ভারতবর্ষ—বিবেকানন্দ। ভারতের যা-কিছু সুখ-দুঃখ, গৌরব-অগৌরব, উত্থান-পতন—সবই তাঁর। "তাঁর কথোপকথনে রাজপুতদের বীরত্ব, শিখদের বিশ্বাস, মরাঠাদের শৌর্য, সাধুদের ঈশ্বরভক্তি, মহীয়সী নারীদের পবিত্রতা ও নিষ্ঠা যেন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠত।... হুমায়ুন, শের শাহ, আকবর, শাহজাহান—এই সকল ইতিহাসের পৃষ্ঠা-উজ্জ্বলকারীদের নামের সঙ্গে আরও কত নাম তিনি উল্লেখ করতেন। আকবরের সিংহাসন আরোহণ বিষয়ে তানসেন-রচিত এবং অদ্যাপি দিল্লীর রাস্তায় গীত গানটি তানসেনেরই সুরে-লয়ে তিনি আমাদের কাছে গেয়ে শুনিয়েছেন।"[১২] নিবেদিতা এখানে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের বিবেকানন্দের কথা বলেছেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের খণ্ডচিত্র পাই মাদ্রাজের এক পরিচিত ব্যক্তির স্মৃতিকথায় :

"স্বামীজীর মনের বিশাল দিগন্তের আকার আমাকে বিমূঢ় ও অভিভূত ক'রে ফেলল। ঋগ্বেদ থেকে রঘুবংশ, বেদান্ত-দর্শনের তাত্ত্বিক ঊর্ধ্বগত রূপ থেকে আধুনিক কালের কান্ট ও হেগেল, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও নীতিশাস্ত্রের পরিধি, প্রাচীন যোগের সুমহান পরিধি থেকে আধুনিক ল্যাবরেটরির জটিলতা—সবই যেন এঁর দৃষ্টির সামনে পরিষ্কার।"

শুধু এই ছবি?

"অ্যাডেয়ার সমুদ্রতীরের কাছে একবার যখন জেলেদের কয়েকটি নগ্ন শিশুকে তাদের মায়ের পিছনে হাঁটু-কাদাজলে ঘুরতে দেখেছিলেন [তাদের মায়েরা সেখানে কাজ করছিল], তখন তাঁর দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল। কী যন্ত্রণায় ঐ অশ্রুপাত, তা আমরা বুঝতেই পারতাম না যদি-না তাঁর গলা চিরে এই কাতরোক্তি বেরিয়ে আসত—'হে ভগবান! কেন তুমি এদের সৃষ্টি করলে! এ-দৃশ্য আমি যে আর দেখতে পারছি না'!"[১৩]

"ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে যে-কোনো কাতর ধ্বনি উঠত"—ওপরের ঘটনার কয়েক বছর

পরেও নিবেদিতার প্রত্যক্ষ দর্শনের বর্ণনা—"সে-সকলই তাঁর হৃদয়ে প্রতিধ্বনি-রূপ উত্তর পেত। ভারতের প্রতিটি ভীতিমূলক চিৎকার, দুর্বলতাজনিত গাত্রকম্পন, অপমানজনিত সঙ্কোচবোধ, তিনি জানতেন এবং বুঝতেন। ভারতকে তার পাপাচরণসমূহের জন্য তিনি তীব্র তিরস্কার করতেন, তার সাংসারিক অনভিজ্ঞতার ওপর খড়্গহস্ত ছিলেন—কিন্তু সে-সকলের মূলে ছিল এই অনুভূতি—ও তো আমারই দোষ। অপরপক্ষে কেউই তাঁর ন্যায় ভারতের ভাবী মহিমা-কল্পনায় অভিভূত হতেন না।"[১৪]

'এ-ভারত আমার'। কিন্তু এ-ভারতের আত্মগঠন কিভাবে হয়েছে! জীবনের একেবারে শেষে তাঁর চোখের সামনে গোটা ভারত ধরা দিয়েছিল এইভাবে :

"সত্যই, এ-এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়তো সম্প্রতি-আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডলমেনদেরও অভাব নাই। চকমকি-পাথরের অস্ত্র-শস্ত্রও যে-কোনো স্থানে মাটি খুঁড়িলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে।... গুহাবাসী এবং বৃক্ষপত্র-পরিহিত মানুষ এখনও বর্তমান। বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনও এদেশের নানা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশসম্ভূতগণ এবং ভাষাতাত্ত্বিকগণের তথাকথিত আর্যদের নানা প্রশাখা-উপশাখা আসিয়া মিলিত হয়। পারসীক, গ্রীক, ইয়ুংচি, হূন, চীন, সীথিয়ান—এমন অসংখ্য জাতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে; ইহুদী, পারসীক, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্ক্যান্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি—যাহারা এখনও একাত্ম হইয়া যায় নাই—এইসব জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আবার শান্ত হইতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।"

গোটা ভারতবর্ষকে 'আমার—আমারই' বলে গ্রহণ করার সময়ে স্বামীজী খণ্ড স্বার্থের আত্মাভিমানকে শাসন ক'রে উদার মহান স্বরধ্বনি তুললেন :

"আমরা বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী—আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অনুভব করি; এ পর্যন্ত পরিচিত সর্বপ্রাচীন সভ্যজাতি তামিলভাষীদের জন্য আমরা গর্বিত; এই দুই সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল পূর্বপুরুষগণের জন্য আমরা গর্বিত।... যদি বিবর্তনবাদ সত্য হয়, তবে আমাদের সেই জন্তুরূপী পূর্বপুরুষদের জন্যও আমরা গর্বিত।... জড় অথবা চেতন—সমগ্র বিশ্বজগতের উত্তরপুরুষ বলিয়া আমরা গর্বিত।"

॥ নয় ॥

স্বামীজীর ভারতীয় অভিজ্ঞতার বিষয়ে অনেক প্রসঙ্গই আনা যায়। এখানে তা করা সম্ভব নয়। আর দু-একটির উল্লেখ মাত্র করব। যথা, যে-কোনো আপাত মন্দ বা ঘৃণ্য ব্যাপারের মধ্যেও এমন কোনো উচিত দিক থাকতে পারে, যাকে সতর্কভাবে বিবেচনা করলে দ্রুত সিদ্ধান্তের হঠকারিতা থেকে মুক্ত থাকা যায়। হিমালয়ে ভ্রমণের সময়ে এক তিব্বতী পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। সে-পরিবারে ছয় ভাইয়ের এক স্ত্রী [পাণ্ডবী কাণ্ড !] ! এই বীভৎস সংবাদে স্বামীজীর গা গুলিয়ে উঠেছিল। তাঁর তিরস্কারের উত্তরে এক ভাইয়ের কাছ থেকে এই প্রতি-তিরস্কার তিনি শুনেছিলেন : "সে কি, আমরা স্বার্থপর হব?" তা শুনে সমাজবিজ্ঞানাত্মক এই চিন্তা তাঁকে কিছুটা সুস্থির করেছিল—ঐ পার্বত্য অঞ্চলে নারীরা সংখ্যালঘু, তাই এক নারীর একাধিক স্বামী না-থাকলে সমাজরক্ষা হবেনা।

তেমনি ভারতে ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ তাঁকে হিন্দুসমাজের ক্ষয়িষ্ণু রূপ সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে তুলেছিল। পূর্বকালে এই কাজ প্রধানত হয়েছে আক্রমণকারী মুসলমানদের দ্বারা; স্বামীজীর কালে তা হচ্ছিল শাসকজাতির অন্তর্গত খ্রীস্টান মিশনারিদের দ্বারা। ব্রিটিশ শাসন ভারতে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের ব্যবস্থা ক'রে, বহুসংখ্যক অনাথ শিশু সৃষ্টি ক'রে, মিশনারিদের সুবিধা ক'রে দিচ্ছিল। মিশনারিরা সবেগে সানন্দে 'ফেমিন ক্রীশ্চান' বানাচ্ছিলেন। স্বামীজীর দৃষ্টিতে এ অতি গর্হিত কর্ম—পয়সা ছড়িয়ে মানুষের আত্মা কেনার বাজারী চেষ্টা। তবু তিনি মূল দোষ দিয়েছেন হিন্দুসমাজকেই—যেখানে অস্পৃশ্যতার মতো বিকট ব্যাপার ধর্মের নামে চলছে, যেখানে সমাজপতি নামধারী দুরাত্মারা স্বজাতির মানুষকে তাড়িয়ে বের ক'রে দেবার জন্য দরজা খুলে রেখেছে, এবং ভিতরে ঢোকার পথ করেছে বন্ধ।

আরও একটি কারণে ধর্মান্তরকরণ তাঁর কাছে অপরাধ—শ্রীরামকৃষ্ণের মূল বাণীর ওপরে প্রচণ্ড আঘাত ওতে ঘটে। 'যত মত তত পথ'—শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহাবাণী হলো ধর্মসংঘাত নিবারণের উপায় এবং তা এনেছে ধর্মরাজ্যে অপূর্ব স্বাধীনতার বার্তা। প্রহারে বা প্রলোভনে ধর্মান্তরকরণ ঐ স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ।

এ জাতি আত্মবিস্মৃত। একদা সে বিরাট সভ্যতার ঐশ্বর্যকে বহন করেছিল, তার ইতিহাস এখন ভুলে গেছে। তার শক্তির মধ্যে দুর্বলতার ছিদ্র কোথায় ছিল, সে-তথ্যও সে জানেনা, জানবার ইচ্ছাও নেই। স্বামীজীর চোখের সামনে ছড়িয়ে ছিল ক্ষয়িত, অর্ধলুপ্ত, অতীত সভ্যতার অজস্র উপাদান, আর তার বর্তমান দুর্গতির রক্তাক্ত চিত্র। তিনি চাইলেন, অতীত কাহিনীর সঙ্গে বর্তমান অবস্থানের তুলনা করুক ভারতবাসী, সেই সূত্রে জানুক নিজেদের সত্য ইতিহাস—যাতে বৃথা গৌরবাভিমানের ভাবালুতা থাকবে না—কিংবা উল্টোপক্ষে, বিদেশী-নিক্ষিপ্ত অর্ধবিকৃত কাহিনীলব্ধ হীনতাবোধ। এই ইতিহাস রচনার জন্য চাই সংস্কৃতজ্ঞান, কেননা প্রাচীন ভারতের জ্ঞানবস্তু নিহিত আছে ঐ ভাষার মধ্যে। আর চর্চা চাই বিজ্ঞানের। বিজ্ঞান আধুনিক সভ্যতার নিয়ন্ত্রী শক্তি। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর অপর জাতির সঙ্গে সমতালে পদক্ষেপ সম্ভব নয়। বিজ্ঞান অধিকন্তু সেই চেতনা দিতে পারে, যার সাহায্যে কুসংস্কারের সঙ্গে লড়াই করা যায়। পরিব্রাজক জীবনে আলোয়ারে অবস্থানকালে স্বামীজী যুবকদের বলেছিলেন : "সংস্কৃত পড়ো, আর সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চা করো; সব জিনিসকে যথাযথভাবে দেখতে ও বলতে শেখো। এমনভাবে পড়ো আর খাটো যে, তার

দ্বারা আমাদের দেশের ইতিহাসকে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে নতুন ক'রে গড়ে তুলতে পারো। এখন তো আমাদের দেশের ইতিহাসের কোনও মাথামুণ্ডু নেই। ইংরেজরা আমাদের দেশের যে-ইতিহাস লিখেছে, তাতে আমাদের মনে দুর্বলতা না এসে যায়না, কেননা তারা শুধু অবনতির কথাই বলে। যেসব বিদেশী আমাদের রীতিনীতির, ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে অতি অল্পই পরিচিত, তারা কেমন করে বিশ্বস্ত ও নিরপেক্ষভাবে ভারতের ইতিহাস লিখবে?" ভারতীয় ইতিহাসচর্চার দিঙ্‌নির্ণায়ক এই সকল গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্যের মধ্যে স্বামীজী অবশ্য স্বীকার করেছিলেন, এদেশে ঐতিহাসিক গবেষণার সূত্রপাত বিদেশীরাই করেছেন। কিন্তু এদেশীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা অথবা অবজ্ঞার কারণে বহু অপসিদ্ধান্তও তাঁরা করেছেন। সেজন্য ভারতের সত্য ইতিহাস রচনার গুরুদায়িত্ব ভারতবাসীরই। গোটা ভারতবর্ষই যেন বিরাট যাদুঘর। সেদিকে না তাকিয়ে উদাসীন ভারতবাসী যখন এগিয়ে চলেছে, তখন স্বামীজীর আর্তনাদ—দাঁড়াও পথিকবর! "...বিস্মৃতি-সাগর থেকে আমাদের লুপ্ত ও গুপ্ত রত্নরাজি উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হও। কারো ছেলে হারিয়ে গেলে সে যেমন তাকে না-পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হতে পারে না, তেমনি যতক্ষণ ভারতের গৌরবময় অতীতকে জনমনে পুনরুজ্জীবিত করতে না পারছ ততক্ষণ তোমরা থেমো না।"[১৫]

ভারতের পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজী যতই দেখছেন দেশের অবনতির রূপ, পরাধীনতার যন্ত্রণা, ততই তাঁর বুকফাটা আর্তনাদ ও আহ্বান। ভারতের পরাধীনতার জ্বালায় তিনি নিরন্তর জ্বলেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, রাক্ষসের দল তাঁর দেশমাতার রক্তপান করছে। পরিব্রাজক জীবনের অন্তে আমেরিকায় পৌঁছেই, তখনো ধর্মমহাসভায় তিনি বিখ্যাত হননি, স্বামীজী কোন্ ভয়ঙ্কর শাণিত ভাষায় ব্রিটিশ শাসনের রূপ বর্ণনা করেছিলেন তা মেরি লুইস বার্কের গবেষণালব্ধ তথ্যাদি থেকে আমরা জানতে পেরেছি। এমনকি ধর্মমহাসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন ক্রমাগত খ্রীস্টান মিশনারিদের মুখে শুনেছেন—পৃথিবীব্যাপ্ত ইউরোপীয় সাম্রাজ্য অতীব মহিমময়, কারণ তা খ্রীস্টানজাতির শাসন, এবং তা ধর্মশাসন, তখন তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। তখন অনল-উদ্‌গারী তাঁর বক্তব্য ও ভাষা :

> "তোমরা ভারতে গিয়েছ এক হাতে বাইবেল, অন্য হাতে বিজয়ীর তরবারি নিয়ে।...তোমরা আমাদের পায়ে দলেছ, পায়ের তলার ধুলোর মতোই আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছ।... তোমরা মদ ধরিয়ে আমাদের জনগণকে অধঃপাতিত করেছ, মর্যাদা নষ্ট করেছ নারীর, ঘৃণা করেছ আমাদের ধর্মকে।... ইতস্তত তাকিয়ে দেখি, পৃথিবীর খ্রীস্টান দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী হলো ইংল্যান্ড—যার পা ২৫ কোটি (২৫০,০০০,০০০) এশিয়াবাসীর গলার ওপর চেপে আছে। ইতিহাসের দিকে পিছন ফিরলে দেখব, খ্রীস্টান ইউরোপের সমৃদ্ধির সূচনা স্পেন দেশে—আর স্পেনের সমৃদ্ধির সূচনা মেক্সিকো অভিযানের পর থেকে।"

স্বামীজী তাই পরিব্রাজক জীবনে যেখানে সম্ভব এবং উচিত সেখানেই পরাধীনতার শোচনীয় রূপ উদ্‌ঘাটিত ক'রে শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন; উৎসাহিত করেছেন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের জন্য; পরাধীন মানুষের ঘৃণ্য কাপুরুষতা এবং অক্ষমের আত্মাভিমানকে ব্যঙ্গ করেছেন (পরবর্তী এক চিঠিতে তার রূপ)—"এক লাখ লোকের

দাবানিতে ৩০০ মিলিয়ান (ত্রিশ কোটি) কুকুরের মতো ঘোরে, আর তারা আর্যবংশ!!!;" উদ্‌ঘাটন করেছেন ধর্মবিকার এবং ধর্মের নামে নানা অনাচারের রূপকে; সচেতন করেছেন এই বিষয়ে যে, কয়েকটি ওপর-ওপর সংস্কারচেষ্টায় দেশের উন্নতি ঘটবে না, তা সম্ভব হবে নারী ও জনগণের আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত স্তরোন্নয়নে; এবং তিনি অবিরাম আহ্বান করেছেন—"ওঠো জাগো! যতক্ষণ না লক্ষ্যলাভ করছ অগ্রসর হও!"

॥ দশ ॥

পরিব্রাজক-জীবন স্বামী বিবেকানন্দের আত্মগঠন ও আত্মবিস্তারের প্রস্তুতি-পর্বও।

নরেনকে যদি সত্যই 'শিক্ষে' দিতে হয় এবং সেই 'শিক্ষে'কে যদি স্বদেশে আবদ্ধ না রেখে সারা বিশ্বে 'হাঁক' দিয়ে পৌঁছে দিতে হয়, তাহলে তার জন্য ভিতরে বাইরে প্রস্তুতি দরকার। স্বামীজীর অধ্যাত্মসাধনা ও উপলব্ধি এক্ষেত্রে তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'চাপরাশ' দিয়েছিল, তিনি ঈশ্বরের 'আদেশ' পেয়েছিলেন। এই হলো ভিতরের প্রস্তুতি। বাইরের প্রস্তুতি—বিদ্যার্জনে ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর দর্শন ও ইতিহাসজ্ঞান অনেক বিশিষ্ট মানুষকে চমৎকৃত করেছিল। পরে তাঁর পরিব্রাজক-জীবন সম্বন্ধীয় একাধিক স্মৃতিকথায় একই সাক্ষ্য পাই। এই পর্বে, যখন পথে পথে তিনি ঘুরছেন, তখনো সময় বা সুযোগ মিললে তাঁর বিদ্যাচর্চা চলেছে সবেগে। মীরাটে শেঠজীর বাগানে কয়েকজন গুরুভাইয়ের সঙ্গে অবস্থানকালে অধ্যাত্মসাধনা ও বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে স্বামী গম্ভীরানন্দ মন্তব্য করেছেন, স্থানটি "দ্বিতীয় বরানগর-মঠে পরিণত হইল।" পরিব্রাজক জীবনের ভূমিকাপর্বে বরানগর-মঠে যুবক সন্ন্যাসীদের বিপুল জ্ঞানচর্চার কাহিনী স্বামীজীর জীবনীপাঠকদের কাছে সুপরিজ্ঞাত।

স্বামীজী বিশেষভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার সংস্কৃত। অথচ সে-ভাষা অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যাকরণনির্ভর। পাণিনি-ব্যাকরণ সংস্কৃতের অবয়ব-সংস্থানের নির্ণায়ক। তাই পাণিনি-ব্যাকরণ আয়ত্ত করা প্রয়োজন। স্বামীজী এই ব্যাপারে কতখানি সচেতন ও আগ্রহী ছিলেন, তা দেখা যায় ১৯.১১.১৮৮৮ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা চিঠিতে, যার মধ্যে বরানগর-মঠে "সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুল চর্চা"র কথা জানিয়েছিলেন। "বঙ্গদেশে বেদশাস্ত্রের একেবারে অপ্রচার বলিলেই হয়। এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ, এবং তাঁহাদের বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একান্ত অভিলাষ।... পাণিনিকৃত সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ আয়ত্ত না হইলে বৈদিক ভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব।" এক সপ্তাহ পরে পাণিনি-ব্যাকরণ পাওয়ার জন্য স্বামীজী প্রমদাদাস মিত্রকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সেখানেই শেষ হয়নি। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি যখন জয়পুরে ছিলেন তখন "একজন সুপণ্ডিত বৈয়াকরণের... নিকট পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পড়িতে আরম্ভ" করেন। একই ভাবে তিনি পাণিনি-ব্যাকরণের শিক্ষা নেন "রাজস্থানের বৈয়াকরণদের অন্যতম অগ্রণী পণ্ডিত নারায়ণদাসজী"র কাছে—যখন খেতড়িতে ছিলেন। তারপরেও তাঁর সংস্কৃতচর্চা চলতে থাকে। জুনাগড়ে থাকাকালে তিনি শঙ্কর পাণ্ডুরঙের সাহচর্যে সংস্কৃত ভাষায়

কথোপকথনে পারদর্শিতা অর্জন করেন। এঁর কাছে পাণিনির পতঞ্জলি-ভাষ্য "সমাপ্ত করার বিশেষ সুযোগ" পেয়েছিলেন। স্বামীজী, শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গের ন্যায় "বেদের পণ্ডিত ভারতে দেখেন নাই"। বোম্বাই শহরে অবস্থানকালেও তিনি সংস্কৃতচর্চা করেছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা তিনি এমনই আয়ত্ত করেছিলেন যে, বেলগাঁও-এ তাঁকে পাণিনি-ব্যাকরণে গভীরভাবে ব্যুৎপন্ন-রূপে দেখা গিয়েছিল (জি. এস. ভাট-এর স্মৃতিকথায় তা পাচ্ছি) এবং আরও পরে ত্রিবান্দ্রামে ১৮৯২-এর ডিসেম্বর মাসে অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার স্বামীজীকে বঞ্চীশ্বর শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় যখন ব্যাপৃত দেখেন (বঞ্চীশ্বর শাস্ত্রী "সংস্কৃতভাষায় রচিত সর্বাপেক্ষা দুরূহ শাস্ত্র ব্যাকরণে লব্ধবিদ্য"), তখন তাঁদের "আলোচ্য বিষয় ছিল ব্যাকরণের এক জটিল ও তর্কবহুল সমস্যা" এবং স্বামীজী আলোচনাকালে "ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃতভাষায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন।"

স্বামীজীর সংস্কৃতচর্চা বিষয়ে ওপরের তথ্যগুলি 'যুগনায়ক' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। আমরা দেখি, শাস্ত্র-ব্যাপারে তিনি বহু পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কবিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর যেসব শিক্ষিত ভারতবাসী সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ, তাঁদের সঙ্গে ইংরেজীতে নানা ধরনের আলোচনা করতেন। ইংরেজী-জানা সন্ন্যাসী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়েছিল। নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় লোকচরিত্রজ্ঞানও বেড়েছিল। অভিজ্ঞতা, দীপ্ত বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিতে সম্পন্ন তিনি, অপরের মনোভাব বা বক্তব্য পূর্বাহ্ণে অনুমান করতে পারতেন। ফলে তর্ককালে তিনি হয়ে উঠতেন অপরাজেয়। ছোট-বড় সভাতে বক্তৃতাদিও করেছেন—যথা, বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গী হিসাবে পুনার হীরাবাগে ডেকান ক্লাবে ঘরোয়া সভায় তাঁর বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা, কিংবা হায়দ্রাবাদে সহস্রাধিক শ্রোতার সভায় বক্তৃতা। সব জড়িয়ে তিনি যখন ধর্মমহাসভায় যাত্রার জন্য মনস্থির করেছেন তখন তিনি একেবারে প্রস্তুত আচার্য। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, এই অধিকার তাঁকে ক্রমাগত চেষ্টায় অর্জন করতে হয়েছে। স্বামী গম্ভীরানন্দের মতে, ১৮৯১-এর মার্চ মাসে "আলোয়ারে আমরা [তাঁকে] পূর্ণ আচার্যরূপে পাই।" আরও কয়েক মাস পরে "জুনাগড়ে যেন তাঁহার অসামান্য প্রতিভা কার্যকরী পূর্ণ বিকাশের পথে ধাবিত" হয়েছিল।

পরিব্রাজক জীবনের শেষপর্বে উচ্চারিত তাঁর দুটি উক্তিকে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করব। এক, মহাবালেশ্বরে তিনি স্বামী অভেদানন্দকে বলেন: "কালী, আমার ভিতর এতটা শক্তি জমেছে যে, ভয় হয় পাছে ফেটে যাই।" দুই, আবুরোড স্টেশনে শিকাগো রওনা হবার আগে স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেন :

"হরিভাই, তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে, আমি অপরের দুঃখ *feel* করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জন্মেছে।"

উক্তি দুটি দেখিয়ে দিচ্ছে, জীবনোদ্দেশ্য সফল করার জন্য যা প্রয়োজন, বিবেকানন্দ তা অর্জন ক'রে ফেলেছেন। আলোড়ন আনতে গেলে—চাই শক্তি। পাঞ্চজন্য ধ্বনির সঙ্গে পৃথিবীর বুক চিরে যদি রথকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়—চাই শক্তি। সেই শক্তি তাঁর মধ্যে জেগেছে। তারই নির্ঘোষ তাঁর কণ্ঠে অভেদানন্দ শুনেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীস্রোতকে উৎস থেকে আকর্ষণ ক'রে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে—সেই হলো তাঁর জীবনব্রত। বাণীবজ্রকে নিক্ষেপ করার মতো শক্তিধর পুরুষ তিনি এখন।

কিন্তু সে কি শুধুই বাণী? সে-বাণী কার? সে-বাণী পরম প্রেমিকের—যিনি 'প্রেম-পাথার'। সে-বাণী শোনাবেন কে? শোনাবেন সেই মানুষটি, যিনি নিশিদিন আর্তনাদ ক'রে বলতেন : আমার সর্বনাশ করল আমার হৃদয়, আমার প্রেম। পারতাম যদি হতে বেদান্তী নিত্য নির্বিকার—তাহলে কত ভাল হতো। কিন্তু পারলাম কই—আমি যে দেখছি "ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়"। আমি ধর্ম-টর্ম বুঝি না—আমি অনুভব করতে শিখেছি—আমি অপরের জন্য *feel* করতে পারি।

এ হৃদয় কার? স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন: "বুদ্ধও কি ঠিক এমনই অনুভব করেন নি, আর এমনই কথা বলেন নি!... স্বামীজীর হৃদয়টা যেন প্রকাণ্ড একটা কটাহ, যাতে মানবসংসারের দুঃখ-যন্ত্রণা দগ্ধ হয়ে তৈরি হচ্ছে নিরাময়ের প্রলেপ-ঔষধ।"

বিবেকানন্দ মহাজ্ঞানী, তাঁর অপর সকল গুণাবলীকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর মনীষা-কথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে আমরা বলতে পারি—বিবেকানন্দ যদি প্রেমিক না হন তবে তিনি কিছুই নন। সেই প্রেম ভারতে তাঁকে করেছে সেবাযজ্ঞের প্রবর্তক-পুরুষ; সেই একই প্রেম পাশ্চাত্যের আত্মার ক্ষুধা নিবারণের জন্য তাঁকে করেছে বেদান্তের বার্তাবহ; হয়ে উঠেছেন শাশ্বত মানবধর্মের মহত্তম আচার্য। আর এই সবই তিনি করেছেন একটি পরম মানবের টানে—যাঁর সম্বন্ধে মর্মরিত কণ্ঠে বলেছেন : "আমি অনুভব করেছি তাঁর অপূর্ব প্রেম।"

॥ এগারো ॥

প্রসঙ্গ শেষ ক'রে আনি। পুনরুক্তি করি পূর্বকথার।

ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ভ্রমণ ক'রে স্বামীজী অনুভব করেন—ভারতের প্রাণপাখি ধর্ম। সে ধর্ম জনজীবনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের এই ব্যাপক প্রসার তাঁকে চমৎকৃত করেছিল। পরিব্রাজক জীবনে ব্যাপক সংস্কৃতচর্চা ক'রে, বেদ-বেদান্ত পুরাণাদির মধ্যে প্রবেশ ক'রে, অগণিত সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে এসে, ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির উত্তুঙ্গ মহিমার রূপ যেমন তিনি উপলব্ধি করেন, অন্যদিকে তেমনি পথে পথে ঘুরবার সময়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে দীন-দরিদ্রের আবাসে দাঁড়িয়ে অনুভব করেছিলেন—ধর্মের শিকড় ছড়িয়েছে কুটির কুটিরে। ভারতের দরিদ্র কুটিরবাসীরা হয়ে উঠেছিলেন বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ নারায়ণ। ইতিহাসজ্ঞানে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন—ভারতবর্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে বিশেষ এক সাধনায় সর্বাধিক ও সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োজিত করেছে—অন্তর্জীবন গঠনের সাধনা। এরই নাম ধর্মের সাধনা। পৃথিবীর অপরাপর জাতি যখন বহির্জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির সংগ্রামে নিরত, বড় জোর মনোজীবনের সন্ধানে কিছুটা তৎপর, ভারতবর্ষ তখন আরও গভীরে নেমে আত্মদর্শন করতে চেয়েছে। ফল তার পক্ষে সর্বাংশে ভালো হয়নি। বহির্দেহ দুর্বল হয়ে তাকে অপরের স্বচ্ছন্দ শিকারের বস্তু করেছে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে আত্মদর্শনের এত বড় চেষ্টাও তো আর কোথাও হয়নি। এই সাধনা যদি ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে কেবল ভারতের নয়, পৃথিবীর সর্বনাশ। স্বামীজী আতঙ্কের সঙ্গে বলেছেন :

"ভারতবর্ষ কি মরবে—মরতে পারে? ভারতবর্ষ যদি মরে যায় তাহলে পৃথিবী থেকে বিনষ্ট হবে আধ্যাত্মিকতা, বিলুপ্ত হয়ে যাবে নৈতিক আদর্শের চরম প্রকাশগুলি এবং সকল ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব, মৃত্যু হবে ভাবুকতার। আর তার স্থানে দেব-দেবীরূপে রাজত্ব করবে কাম ও বিলাস, অর্থ হবে তার পুরোহিত, তার পূজানুষ্ঠান হবে প্রতারণা, পশুবল ও নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা, এবং বলির বস্তু হবে—মানবাত্মা।"

এই ভারতবর্ষ কি 'সত্য' ভারতবর্ষ, নাকি স্বামীজীর স্বপ্ন-কল্পনার ভারতবর্ষ? সন্দিগ্ধ মন এই প্রশ্ন এখন অন্তত করবেই। তার উত্তর—এই ভারতবর্ষকে বিবেকানন্দ পেয়েছেন নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। তাঁর তুল্য বিরাট মনের সত্যবোধের সঙ্গে ক্ষুদ্র মনের সত্যবোধের পার্থক্য হয়ই। বিবেকানন্দের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সেই বিরাট মনের আকাশবিস্তার দেখে অভিভূত হয়েছেন। সিস্টার ক্রিস্টিন যখন স্বামীজীকে INDIA (ইন্ডিয়া)—এই পাঁচ অক্ষরের শব্দটি অপূর্ব স্বরে উচ্চারণ করতে শুনেছিলেন, তখনই ক্রিস্টিনের ভারতপ্রেমের জন্ম হয়েছিল। **"একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় যখন ভাবি—পাঁচ অক্ষরের একটু ক্ষুদ্র শব্দে অতকিছু ধরিয়ে দেওয়া যায়। তাতে ছিল—ভালবাসা, জ্বালাময় বাসনা, গর্ব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পূজা, গভীর বিষাদ, উদ্দীপ্ত শৌর্য, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা—এবং পুনশ্চ ভালবাসা।...অন্যের অন্তরে প্রেমসঞ্চারের যাদুশক্তি ওর মধ্যে ছিল। যে-ই শুনত, তার কাছে ভারত হয়ে উঠত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। তখন সবকিছুই তার আগ্রহের বস্তু—তার জনগণ, ইতিহাস, শিল্প-সভ্যতা, আচার-ব্যবহার, নদী-পর্বত-উপত্যকা-সমভূমি, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্মধারণা, শাস্ত্রাদি—সবকিছুই জীবন্ত।"**

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের এক রবিবারের অপরাহ্ণে লন্ডন শহরের ওয়েস্ট-এন্ড অঞ্চলের এক বৈঠকখানায় স্বামীজীকে প্রথম দেখেছিলেন লন্ডনের এক শিক্ষয়িত্রী—মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। স্বামীজীর আননে তিনি দেখেন খুব ধ্যানপ্রবণ মানুষের মুখের কোমলতা, যার রূপ রাফায়েল তাঁর শিশু যীশুর আননে অঙ্কিত করেছেন। আর স্বামীজীকে তিনি মাঝে মাঝে সংস্কৃত স্তোত্র সুর ক'রে আবৃত্তি করতে শুনেছিলেন। স্বামীজীর মনে কি তখন সূর্যাস্তকালে ভারতবর্ষের কোনো উদ্যান বা তরুতল বা গ্রামসীমার কূপপার্শ্বে উপবিষ্ট কোনো সাধুর চারপাশে ঘিরে বসে থাকা গ্রামবাসীদের স্মৃতি জেগেছিল? ধরে নিতে পারি, নিবেদিতা কল্পনায় সেই ছবি দেখেছিলেন। তারপর মিস মার্গারেট নোবল হয়েছেন ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতা কয়েক বছর স্বামীজীর সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন, স্বামীজীর সঙ্গে উত্তর ভারত ও হিমালয়-ভ্রমণের অনবদ্য স্মৃতিকথা লিখেছেন। (বঙ্গানুবাদ—'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে')। এবং স্বামীজীর সামগ্রিক রূপ যথাসম্ভব ধরতে চেষ্টা করেছেন এক অমর গ্রন্থে। (বঙ্গানুবাদ—'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি')। নিবেদিতা উপলব্ধি করেছেন—বিবেকানন্দ আর কেউ নন, দেহধারী ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের জন্য নিবেদিতা সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। তাঁরও জপমন্ত্র হয়েছিল—'ভারতবর্ষ'।

ভারত-পরিক্রমার শেষপর্বে কন্যাকুমারিকার শিলার ওপরে ধ্যানান্তে স্বামীজীর উচ্চারণ—ভারতবর্ষ!

আর তাঁর শিষ্যা ও কন্যা নিবেদিতার উচ্চারণ?

"ভারতবর্ষের কথা উঠিলেই তিনি [নিবেদিতা] একেবারে ভাবমগ্না হইয়া যাইতেন। মেয়েদের বলিতেন : 'ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা, মা, মা! ভারতের কন্যাগণ, তোমরা সকলে জপ করিবে—ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা, মা, মা!' এই বলিয়া নিজের জপমালা হাতে লইয়া নিজেই জপ করিতে লাগিলেন, মা, মা, মা!"[১৬]

আবার বলি, নিবেদিতা ও অন্য অনেকের কাছে বিবেকানন্দ ছিলেন দেহধারী ভারতবর্ষ।

উল্লেখপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. স্বামী অখণ্ডানন্দ, 'স্মৃতিকথা', ২য় সং, ১৩৫৭, পৃ. ৭৯।
২. 'সমকালীন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৪-১১৬।
৩. স্বামী গম্ভীরানন্দ, 'যুগনায়ক', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮।
৪. ভগিনী নিবেদিতা, 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি,' পৃ ৪৩।
৫. ঐ, পৃ. ১৪৩।
৬. 'বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯-৪৫২।
৭. 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', পৃ. ৫৩।
৮. ঐ
৯. ঐ, পৃ. ৫৩
১০. ঐ, পৃ. ৩২।
১১. 'সমকালীন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩-১০৫।
১২. 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিযাছি', পৃ. ৩১।
১৩ 'সমকালীন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৩।
১৪ 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', পৃ. ৩০।
১৫. 'যুগনায়ক', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪-২৫৫।
১৬ সরলাবালা সরকার, 'নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি', ১৪শ সং, ১৩৭৪, পৃ. ২২-২৩।

[উদ্বোধন পত্রিকার ১৪০০ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত]

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত 'উদ্বোধন' পত্রিকা ও প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত

॥ এক ॥

স্বামীজীর বাণীবহ প্রথম বাঙলা পত্রিকা 'উদ্বোধন'—তার প্রথম সম্পাদককে কি বজ্রবহনের উপযোগী আধার হতে হবে না?

প্রথম সম্পাদকের নাম স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ—ঈষৎ হ্রস্ব আকারে ত্রিগুণাতীত। তাঁর জীবনের একটি ঘটনার কথা স্মরণ করা যাক :

সময় ১৮৯৯-এর অগস্ট মাস। শ্রীমা সারদাদেবী কলকাতা থেকে বর্ধমানের পথে জয়রামবাটী যাচ্ছেন। সঙ্গে আছেন ত্রিগুণাতীত। দামোদর পার হওয়ার পরে শ্রীমায়ের জন্য পালকি পাওয়া গেল না। গরুর গাড়িতে তাঁর যাত্রা শুরু হলো। রাত্রি ঘনালো—মধ্যরাত্রি পেরিয়েছে। সামনে যাচ্ছেন লাঠিকাঁধে ত্রিগুণাতীত। তিনি সভয়ে দেখলেন, পথের খানিকটা বানের জলে ভেঙে গেছে। সেখানে গাড়ি পড়লে মায়ের ঘুম ভেঙে যাবে—আহতও হতে পারেন। মায়ের কষ্টের ঘুম তো ভাঙানো যায় না! সুতরাং উন্মেষশালিনী বুদ্ধিযোগে বলীয়ান শ্রীমৎ ত্রিগুণাতীত ঐ ভাঙা অংশটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন—তাঁর উপর দিয়ে গাড়ি দিব্যি চলে যাবে, মাতাঠাকুরানীর কোনই অসুবিধে হবে না। আর নিজের অবস্থা—যায় যদি যাক জীবন চলে 'বন্দে মাতরম্' বলে।

অবশ্য মায়ের প্রাণে ছেলের জন্য সাড়া জাগেই। ঘটনাটি ঘটবার আগে মায়ের ঘুম ভেঙেছিল। ওহেন বীরকর্মের জন্য পুত্র যথোচিত তিরস্কার লাভ করেছিলেন এবং অবশ্যই মায়ের সজল চোখের আশীর্বাদ।

স্বামীজীর 'উদ্বোধন'-এর চাকা নিজের শরীরের ওপর দিয়ে চলে যাক—এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই ত্রিগুণাতীত কাজে নেমেছিলেন।

কিন্তু সত্যই কি ত্রিগুণাতীতের সাধ্য ছিল 'উদ্বোধন'-এর রথারোহী হয়ে একক যাত্রা করার?

আরেকটি দৃশ্য এই—সরাসরি স্বামী গম্ভীরানন্দের লেখা থেকে উদ্ধৃত করি :

"(ত্রিগুণাতীত মহারাজ)...১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতের লাদাখ, কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শনে যাত্রা করিলেন।...একদিন পথ চলিতে চলিতে ঠিক সন্ধ্যা-সমাগমে এক বিস্তীর্ণ খরস্রোতা পার্বত্য নদীর তীরে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন, পার হইবার জন্য একটি

পুরাতন বাঁধমাত্র আছে; তাহাও মধ্যে মধ্যে ভগ্ন। জ্যোৎস্নার আলোকে কোনপ্রকারে উহারই উপর দিয়া চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া অগ্রসর হইলেন এবং ভগ্নস্থানগুলি উল্লম্ফনপূর্বক অতিক্রম করিতে থাকিলেন। এইভাবে চলিয়া সবেমাত্র মধ্যস্থলে পৌঁছিয়াছেন, এমন সময়ে একখানি কালো মেঘ উজ্জ্বল চন্দ্রমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করায় অমানিশার মতো চারিদিক সম্পূর্ণ তিমিরাবৃত হইল। অন্ধকারে এই বাঁধের উপর দিয়া এক পা অগ্রসর হওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; মনে মনে শুধু ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলেন। সহসা শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে, 'আমায় অনুসরণ করো।' হঠাৎ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—কলের পুতুলের মতো চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে নদীর অপর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ততক্ষণে কালো মেঘখানি সরিয়া যাওয়াতে চাঁদের আলো পরিষ্কারভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; তথাপি নদীর তীরে তিনি কোনো লোকের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না।"[১]

অলৌকিক কাণ্ডকারখানা! বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের দায় পাঠকের। কিন্তু ত্রিগুণাতীতের বিশ্বাস একেবারে বাস্তব।

সেই বিশ্বাসের চেহারা কিরকম?

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে জানুয়ারি ১৮৯৬-এ ত্রিগুণাতীতকে লিখলেন :

"তুই খুব বাহাদুরি করেছিস। বাহবা, সাবাস! গুঁজগুঁজেগুলো পেছু পড়ে থাকবে হাঁ ক'রে, আর তুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি।...মোচ্ছব (মহোৎসব) এমনি মাচাবি যে, দুনিয়াময় তার আওয়াজ যায়।...তোলপাড় কর্—তোলপাড় কর্ দুনিয়া।"[২]

কাছাকাছি সময়ে ১৭ জানুয়ারি স্বামীজী ওঁকেই লিখলেন : "লোহার দিল চাই, তবে লঙ্কা ডিঙ্গুবি। বজ্রবাঁটুলের মতো হতে হবে. পাহাড় পর্বত ভেদ হয়ে যাতে যায়।...তুই, শশী আর গঙ্গাধর—এই তিনজন দেখছি faithful...তোদের মুখে হাতে বাগ্‌দেবী বসবেন—ছাতিতে অনন্তবীর্য ভগবান বসবেন—তোরা এমন কাজ করবি যে দুনিয়া তাক হয়ে দেখবে।"[৩]

বিবেকানন্দ জানিয়েছিলেন বিশ্বাসের চেহারা কিরকম হওয়া দরকার। ত্রিগুণাতীত জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন—সত্যই স্বামীজীর ইচ্ছা পূরণ করা যায়।

সুতরাং ত্রিগুণাতীত ভাবতেই পারেন—দুর্গম পার্বত্যপথে খরস্রোতা নদীর ভগ্ন সেতুর উপরে তাঁর হাত ধরে পার ক'রে দিয়েছিলেন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এবং গুরুতুল্য গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ।

॥ দুই ॥

ত্রিগুণাতীত মানুষটি কেবল অদ্ভুতকর্মা নন—নিজেও স্বভাবে অদ্ভুত। ৩০ জানুয়ারি ১৮৬৫ তারিখে জন্ম, পিতা শিবকৃষ্ণ মিত্র। তাঁদের সম্পন্ন পরিবার। তাঁর সংসারাশ্রমের নাম সারদাপ্রসন্ন। পড়াশোনায় ভাল। শ্যামপুকুরের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন তখন স্বয়ং তিনি এবং অন্য সকলে স্থির ক'রে রেখেছিলেন, পরীক্ষায় উচ্চস্থানলাভ অবধারিত। কিন্তু প্রাপ্য ও প্রাপ্তির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিল একটি সোনার ঘড়ি। ঘড়িটি তাঁর বড় প্রিয়—পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে সেটি চুরি হয়ে গেল, ফলে পরীক্ষাগত স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কালিমাচ্ছন্ন। ভেঙে পড়লেন। পাস করলেন দ্বিতীয় বিভাগে। তাঁর নৈরাশ্য কাটাতে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 'ছেলেধরা' নামে খ্যাত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) তাঁকে হাজির করলেন নৈরাশ্যসূদন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। ফলে পড়াশোনা মাথায় উঠল, এফ-এ-ও পাস করলেন সাধারণভাবে, কেননা ইতিমধ্যে অসাধারণের সংস্পর্শে অসাধারণের সন্ধানী হয়ে পড়েছেন।

সারদাপ্রসন্ন স্বতঃই খেয়ালী, তার সঙ্গে যুক্ত হলো ধর্ম-নেশা, ফলে আচার-আচরণ লাগামছাড়া। এধার-ওধার ছুটতে লাগলেন বিপদকে সঙ্গী ক'রে। কাণ্ড দেখে তাঁর সংসারে প্রবল আলোড়ন—সোনার টুকরো ছেলে দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনের পাল্লায় পড়ে বুঝিবা কৌপীনবন্ত হয়ে পড়ে! পিতা শিবকৃষ্ণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন—যখন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্ত হলো। তিনি হাসলেন—হাসতে হাসতে বললেন—"আমি কালীঘাটে গিয়ে জপ করলুম, তবে তো হলো!"

কিন্তু মা কালী নিশ্চয় উলটো সমঝেছিলেন। সারদাপ্রসন্ন এবার সংসারের শেষ বন্ধন ছিঁড়ে ভিড়ে পড়লেন বরাহনগরের উন্মাদ দলটির সঙ্গে। সন্ন্যাস নেওয়ার পরে নাম হলো ত্রিগুণাতীতানন্দ। নামটি বড় মাপের—তাঁর কোনকিছুই কি মাপসই ছিল?" বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে তাঁকে ঘুরতেই হবে—কোনকিছুর ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, খেতে পেলে খাবেন, আর দু-চারদিন না খেতে পেলেই বা কি? যখন খাবেন—মানে খেতে পাবেন—তখন সে এক বিপর্যয় কাণ্ড!

'সৃষ্টিছাড়া' খাওয়ার দু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পেটের অসুখে ভুগছিলেন দেখে চিকিৎসার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে ডাক্তার বিপিন ঘোষের কাছে পাঠালেন। ডাক্তার তাঁকে চিনতেন। সুতরাং সাধুকে খাওয়াবার জন্য দু-টাকার রসগোল্লা আনালেন (তখনকার দু-টাকায় এখনকার প্রমাণ মাপের ৬৪টি রসগোল্লা পাওয়া যেত)। ত্রিগুণাতীত সেগুলি নির্বিবাদে খেলেন। তারপর ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন: "তা এসেছ কেন?" শুনলেন—পেটের অসুখের চিকিৎসা করাবার জন্য এসেছেন। চমকে উঠে ডাক্তার বললেন : "তাহলে অতগুলো রসগোল্লা খেলে কেন?" উত্তর—"আপনি দিলেন, আমি কি করব?"

স্বামী প্রেমানন্দ একবার চমৎকৃত হয়েছিলেন। তিনি সাড়ে সাত সের ঘন দুধ ধীরে ধীরে ত্রিগুণাতীতকে খেতে দিয়েছিলেন এবং একেবারে না থেমে সেই দুধ উনি খেয়েছিলেন। প্রেমানন্দ বলেছিলেন : "আমিও থামলুম না, ও-ও থামল না।"

ছেলের সঙ্গে মায়ের অভিজ্ঞতা এক তারে বাঁধা ছিল। প্রেমানন্দ-জননী একবার ত্রিগুণাতীত ও আরো দুজনকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন। ত্রিগুণাতীতের আহারাদির

অতিকায় রূপ সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণে ধারণা থাকায় আয়োজন বড় মাপের হয়েছিল। নিমন্ত্রিত বাকি দুজন আসেন নি। আহা, ওঁদের এত সব জিনিস নষ্ট হবে!—সম্ভবত গৃহস্বামিনীর প্রতি এই ধরনের সহানুভূতি বোধ ক'রে ত্রিগুণাতীত কেবল নিজের নয়, বাকি দুজনেরও খাবার খেয়ে নিলেন। গৃহের কল্যাণ হলো, কিন্তু গৃহস্বামিনীর রাত্রির নিদ্রা গেল। বৃদ্ধা ভয়ে অস্থির, না-জানি কি অসুখ হয়! পরদিন ত্রিগুণাতীতকে সুস্থ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন : "সারদা কি খায় রে! ও অনেক পাহাড়-পর্বত ঘুরে বেড়িয়েছে, ও অনেক 'মোন্তর' শিখেছে, তাই উড়ো মন্তরে উড়িয়ে দেয়। তা না হলে মানুষ কি অত খেতে পারে!" ওঁর পুত্র প্রেমানন্দও ত্রিগুণাতীতকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন—"ওর সিদ্ধাই ছিল।"

গভীর ভক্তি এবং কিঞ্চিৎ ছেলেমানুষি মেশানো খাদ্যগ্রহণের একটি মনোহর দৃষ্টান্ত আছে। শ্রীমা সারদাদেবী সন্তান সারদাকে বাজার থেকে ঝাল লঙ্কা কিনে আনতে বলেছিলেন। মায়ের ইচ্ছা যখন, তখন সেরা জিনিসটি চাই। সুতরাং ত্রিগুণাতীত কোন্‌টি সেরা ঝাল লঙ্কা তা জানবার জন্য বাগবাজার থেকে বড়বাজার পর্যন্ত দোকানগুলিতে লঙ্কা চাখতে চাখতে চললেন। তার ফলে তিনি সেরা ঝাল লঙ্কা পেয়েছিলেন কিনা সে-সংবাদ আমরা পাইনি (কে আর অমনভাবে চেখে-চেখে পরীক্ষা করতে রাজি হবে?)—কিন্তু জেনেছি যে, তাঁর জিভ-মুখ ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল।

খাদ্য ব্যাপারে সমদর্শিতার মনোমুগ্ধকর দৃষ্টান্তও আছে।

বরাহনগর-মঠে থাকাকালে স্বামীজীর নির্দেশে শরৎ-মহারাজ পায়ে হেঁটে নবদ্বীপযাত্রা শুরু করেছিলেন, মহাপুরুষ-মহারাজ তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে খবর পেয়ে "আমি চঞ্চল হে" সারদা-মহারাজ (ত্রিগুণাতীত) কি দলে না-ভিড়ে পারেন? কিন্তু পথ চলতে চলতে তাঁর দেখা বাকি দুজন পেলেন না। সূর্য চড়তে চড়তে মাথার ওপর উঠে পড়ল, বিশ্রামের জন্য তাঁরা একটা বাগানের সামনে বসে পড়লেন ক্লান্ত হয়ে। হঠাৎ দেখা গেল, ত্রিগুণাতীত একটা বাগানের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন। মনে হয়, তাঁকে অভ্যর্থনার ভাষাটা কিছু কড়া হয়েছিল! তাঁদের রাগ-তাপ কিন্তু গলে জল হয়ে গেল যখন অপূর্ব উত্তর শুনলেন—স্নেহের সারদা-মহারাজ বাগানে সুন্দর পুকুর দেখে স্নানাদি করবার ইচ্ছা বোধ করেছিলেন এবং স্নান শেষে নিয়মমাফিক পিত্তরক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন। "কিভাবে?"

—"কেন, দেখলুম চমৎকার কচি দূর্বা রয়েছে, তাই দিয়ে পিত্তরক্ষার কাজটা সেরে ফেললুম।"

তবে মাঝে মাঝে এই ঘুরনচণ্ডী মানুষটি বনে-বাদাড়ে পিত্তরক্ষাও করতে পারেন নি। কিংবা যখন স্বেচ্ছাব্রতে মাত্র পিত্তরক্ষাটুকুই করেছিলেন, তখন পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দের সবিস্ময় শ্রদ্ধাও লাভ করেন।

"স্বামী প্রেমানন্দই আবার বেলুড়-মঠে বসিয়া শিবরাত্রির পরদিন বলিয়াছিলেন : 'রোজ একটা ক'রে কলা খেয়ে (সারদা) ঐ বেলতলায় সাতদিন পড়ে রইল।' "[৩]

॥ তিন ॥

'উদ্বোধন'-এর প্রকাশকর্মে সরাসরি জড়িত হওয়ার আগে ত্রিগুণাতীতের নিজ জীবনের বোধনপর্ব শেষ হয়ে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শ পেয়েছেন, তাঁর শিষ্য তিনি, সুতরাং সাধ্য ও সাধন একত্রে লাভ। কিন্তু তাঁর যে দ্বিতীয় গুরু ছিলেন—বিবেকানন্দ। তাঁর টানে পাহাড়-পর্বত ওল্টাবার কাজও জুটে গেল। বরাত আরো ভাল, যিনি মানবদেহাধারে স্বয়ং মহাশক্তি মহাশান্তি—সেই সারদাদেবীর আশ্রয়লাভও জীবনে ঘটল। তা অবশ্য কিছু পরের ঘটনা যখন স্বামী যোগানন্দের দেহান্ত ঘটল এবং তিনি কিছুদিনের জন্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দ্বারপাল এবং গৃহের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

স্বামীজী নিজের সম্বন্ধে বলতেন, তাঁর পায়ের তলায় 'চক্কর' (চক্র) আছে। চক্রের সংখ্যা অনেক। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রিয় মানুষগুলির পায়ের তলায় সেই সদাঘূর্ণিত চক্র থাকবে না, তা হতে পারে না। আর ঘূর্ণিপাকে যদি ঘুরতেই হয়, তাহলে ভারতের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত সাঙ্গ করার পরে তিব্বতের কৈলাস ও মানস সরোবরের দিকে না এগিয়ে পারা যায়? কৈলাস শিবের স্বভূমি এবং মানস সরোবর—'মানসে মা যথা ফলে।' সুতরাং বিবেকানন্দের দুই গুরুভাই—অখণ্ডানন্দ ও ত্রিগুণাতীত উক্ত স্থানে না-গিয়ে কি পারেন কখনো? বিবেকানন্দের শিষ্যরাও ঐ পরম রহস্যভূমিতে গিয়েছেন—শুদ্ধানন্দ ও সুরেশ্বরানন্দ।

বিবেকানন্দের খুশির সীমা ছিলনা। আতুপুতু প্রাণওয়ালা ভারতীয় বাবুর দল যখন বক্তৃতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে গলা ফাটাচ্ছেন এবং কাগজে-কলমে স্বদেশের নোংরা ঘর ঝাড়ছেন—তখন 'স্বদেশ' ব্যাপারটি কী, তা জানবার জন্য নিজের প্রাণটাকে নিয়ে খেলা করতে করতে বিবেকানন্দের গুরুভাইরা স্বদেশের সর্বদিকে ঘুরেছেন।

স্বামীজী সহর্ষে বললেন:

> "শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য চরণস্পর্শে যে মুষ্টিমেয় যুবকদলের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখ। আসাম হইতে সিন্ধু, হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা তাহারা প্রচার করিয়াছে। তাহারা পদব্রজে বিশ হাজার ফুট ঊর্ধ্বে হিমালয়ের তুষাররাশি অতিক্রম করিয়া তিব্বতের রহস্য ভেদ করিয়াছে। তাহারা চীরধারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছে। কত অত্যাচার তাহাদের উপর দিয়া গিয়াছে—পুলিশ তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে—কারাগারে তাহারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।"[৬]

॥ চার ॥

অভিজ্ঞতা অন্যদিকেও ছিল। প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পঠন ও মননের অভিজ্ঞতা। ফলে ত্রিগুণাতীত লেখক হয়ে উঠেছিলেন—বাস্তব অভিজ্ঞতা, চিন্তার শক্তি এবং স্বাধীনচিত্ততার প্রকাশ সেইসব লেখায় ছিল। 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশের বেশ কয়েক বছর আগে তখনকার দিনের নামী ইংরেজী দৈনিক 'ইন্ডিয়ান মিরর'-এ ১৮৯৫ সালের ২২ ডিসেম্বর থেকে নয় সংখ্যায় তাঁর তিব্বত ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয়। (শেষ কিস্তি বের হয় ২৯ ডিসেম্বর ১৮৯৬—স্বামীজী তখনও ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন নি।)

আরেকটি দীর্ঘ লেখা বেরিয়েছিল 'ইন্ডিয়ান মিরর'-এর ২৮-৩০ জানুয়ারি, ২৬ ফেব্রুয়ারি, এবং ৫ মার্চ ১৮৯৮—দুর্ভিক্ষের ইতিহাস ও তত্ত্ব সম্বন্ধে। (Swami Trigunatita's 'Lecture on the History and Philosophy of Famine')।[৭]

শেষোক্ত লেখাটির পটভূমিকায় ছিল উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষের সমগোত্রীয় খাদ্যাভাব। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে ত্রিগুণাতীত সেখানে ১৮৯৭-এর অগস্ট মাসে সেবাকাজে যান, বিরোল গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে কাজ শুরু করেন। চার মাসের মতো কাজ করেন তিনি, সর্বমোট ৮৪টি গ্রামে সেবাকাজ চালান। নিখুঁতভাবে কাজ করেছিলেন, অধিকাংশ কাজ নিজেই করতেন; গ্রামগুলির ঘরে-ঘরে গিয়ে সন্ধান নিয়ে তবে প্রয়োজনমতো খাদ্যবস্তু সরবরাহ করেছেন। রাত্রে বিরোল গ্রামের সেবা-ঘরটিতে চালের বস্তার ওপর শুয়ে ঘুমিয়েছেন, পাছে কেউ চুরি ক'রে নিয়ে যায়। নভেম্বরের শেষে কাজ সমাপ্ত করেন এবং তাঁর সেবাকাজে মুগ্ধ স্থানীয় অধিবাসীরা ৩ ডিসেম্বর এক বিরাট সংবর্ধনার আয়োজন করেন দিনাজপুর শহরের ময়দানে। সেই সভায় শহরের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু ক'রে সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন জেলার কালেক্টর মিঃ এন বনহ্যাম কার্টার।

সভায় ত্রিগুণাতীতকে মানপত্র দেওয়া হয়—স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ইয়াকুইনুদ্দিন আমেদ। মানপত্রে প্রভূত প্রশস্তি ছিল, সেইসঙ্গে গভীর কৃতজ্ঞতা—কঠিন দুঃখের দিনে ত্রিগুণাতীতের ত্রাণকর্তা ভূমিকার জন্য। তাতে উল্লিখিত হয়েছিল—কেন্দ্রপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণের অভূতপূর্ব লোকসেবার বিষয়টি :

"পরম আনন্দের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রয়াত পরমহংস রামকৃষ্ণ আপনার মতো উপযুক্ত শিষ্য এবং সহযোগী কর্মিবৃন্দকে রেখে যেতে পেরেছেন, যাঁরা তাঁদের শুভকর্মের দ্বারা উক্ত খ্যাতনামা ঋষির এবং যে-দেশে তিনি জন্মেছেন সেই দেশের নামকে উচ্চে স্থাপন করতে পেরেছেন। আপনার সেবাকর্মের বিনিময়ে আমাদের দেওয়ার মতো কিছু নেই, শুধু আছে ধন্যবাদটুকু। সে-ধন্যবাদ, বিশ্বাস করুন, আমাদের প্রাণের গভীর থেকে এসেছে—তা আপনি ও আপনার মিশন সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিতে পূর্ণ। সেবা এক মহান গুণ, আর আপনি যে-সেবাব্রত নিয়েছেন তা পৃথিবীর পরমতম পবিত্রতম এক ব্রত।"

দেশীয় মানুষদের কার্যাবলী সম্বন্ধে ঢালাও সার্টিফিকেট দেওয়া ইংরেজ প্রশাসকদের কার্যবিধির অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। যেখানে প্রশংসা করতেন, সেখানে মুরুব্বিয়ানার সুর গোপন থাকত না। সভাপতি মিঃ এন বনহ্যাম কার্টার-এর সাধুবাদে যদি কিছু মুরুব্বিয়ানা থাকেও

(ছিল কি?), তাকে ছাপিয়ে উঠেছিল যথার্থ শ্রদ্ধার উচ্চারণ। বাস্তব তথ্য ও সুষ্ঠু বিশ্লেষণ—দুইই ছিল তাঁর ভাষণে:

"স্বামী ত্রিগুণাতীত ও তাঁর ভ্রাতৃসংঘকে ধন্যবাদ দানের আনন্দদায়ক কর্তব্য পালনের জন্য আমরা সমবেত হয়েছি— যাঁরা নিজ হস্ত ও মস্তিষ্ক সহায়ে অভাবগ্রস্তদের মধ্যে সেবাকাজ করেছেন। একাধিক কারণে আমি এই সভায় সভাপতিত্ব করতে সানন্দে রাজি হয়েছি। প্রথমত, আমি পুরোপুরি উপলব্ধি করেছি—স্বামী-মহোদয়ের এই মঙ্গলকর্ম সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য। এই জেলার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কবন্ধন নেই। মানবমঙ্গলই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। আমি অবশ্য জমিদারগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ভালো কাজের কথা ভুলছি না। কিন্তু স্বার্থহীন মঙ্গলকর্ম অধিকতর প্রশংসার যোগ্য। স্বামী ত্রিগুণাতীত সরকারের সাহায্যের ওপর নির্ভর করেন নি—আবার সরকারী কর্মচারীদের বিরোধিতা করার কাজও করেন নি।...

"আরেকটি কারণে আমি এসেছি। স্বামী-মহোদয় নিজে কাজ করেছেন—একেবারে নিজের হাতে। স্বায়ত্তশাসনের সাফল্যের রহস্য এখানেই আছে। স্বায়ত্তশাসন মানে কেবল সভা করা নয়—স্বায়ত্তশাসন মানে কাজ করা। যখন বড়মাপের কাজ তখন সভা-সমিতির দরকার আছে, কিন্তু আসল ব্যাপার দাঁড়ায় খাঁটি কাজে। যদি এঁর মতো আরো মানুষ থাকেন তাহলে আরো স্বায়ত্তশাসন ঘটবে। সরকারের সাহায্য ছাড়াই এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেখানে জনসাধারণ স্ব-শাসন চালাচ্ছে। যেমন ইউরোপে বিরাট বিরাট ট্রেড ইউনিয়ন এবং ইংল্যান্ডে খেলাধূলার ও ঘোড়দৌড়ের ক্লাবগুলি। তারা মস্ত-মস্ত কাজ ক'রে যায়। সরকারের মুখাপেক্ষী তারা নয়—জনসাধারণের সঙ্গে সহজ ধরনের চুক্তির ওপর তারা নির্ভরশীল। যদি এখানকার মানুষ সত্যকার কাজ ক'রে যায়, কাজের বাহ্য আড়ম্বর না করে, তাহলে দেখব যে, এদেশে স্বায়ত্তশাসন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

"তৃতীয় কারণ হলো—স্বামী-মহোদয় রীতিবদ্ধভাবে কাজ ক'রে গেছেন। টাকা থাকলে দান বিতরণ করা সোজা ব্যাপার। কিন্তু অপাত্রে দান ভালোর চেয়ে মন্দ করে বেশি। মানুষকে তা ভিখারী ক'রে তোলে। অযোগ্যের দান-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। স্বামী-মহোদয় শ্রমস্বীকার ক'রে ব্যক্তিগতভাবে সন্ধান নিয়েছেন—কার সাহায্য প্রয়োজন।

"এই সভায় সভাপতিত্ব করতে পেরে আমি আনন্দিত, কারণ, ক্ষুদ্রাকারে কাজের সূচনা হলেও তা সঠিক পথে স্ব-নির্ভরতার সূচনা। বীজ থাকলে তা যথাকালে ফুটে উঠবেই।"

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের চরিত্র সম্বন্ধে চকিত কিন্তু উজ্জ্বল আলোকপাত ঘটেছে ওপরের বক্তৃতায়। দারিদ্র্য, সেবার সুযোগ দেয়, সুতরাং দারিদ্র্য সেবাকর্মীর পক্ষে ঈশ্বরের আশীর্বাদ—এই একান্ত ভ্রান্ত, সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর দর্শনের বিরুদ্ধে ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাদর্শন ও তার প্রয়োগ, যা দুঃস্থ ভ্রাতৃগণের দুঃখের দিনে সেবার হাত বাড়ায়; আবার সেবাপ্রাপ্তদের মনে গেঁথে দিতে চেষ্টা করে যে, আত্মনির্ভরতাই দুঃখমোচনের একমাত্র

উপায়। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্ম যিনি প্রথম বৃহত্তর আকারে বাস্তবায়িত করেন সেই স্বামী অখণ্ডানন্দকে স্বামী বিবেকানন্দ চিঠির পর চিঠিতে আগ্নেয় ভাষায় উদ্দীপিত করেছেন, সেই সঙ্গে বারবার বলেছেন : কেবল সাহায্য বিতরণ ক'রে থেমে যেও না, সংগঠন করো, শক্তিসঞ্চার করো গ্রামবাসীদের মধ্যে, তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখাও। অখণ্ডানন্দের কাজ সম্বন্ধে প্রশংসার সঙ্গে স্বামীজীর সতর্কবাণীও ছিল। স্বামী শুদ্ধানন্দকে ১১ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে তিনি লিখেছিলেন : "জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।" অখণ্ডানন্দ তাই সেবাকার্যের সঙ্গে শিক্ষাদানের কাজও শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। কয়েক বছর পর স্বামীজী ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ তারিখের চিঠিতে তাঁকে 'সাবাস' জানাবার পরে, কর্তব্যনির্ণয় ক'রে দিয়েছিলেন :

"কতকগুলো চাষাব ছেলেমেয়েকে একটু লিখতে-পড়তে শেখাও ও অনেকগুলো ভাব মাথায় ঢুকিয়ে দাও—তারপর গ্রামে চাষারা চাঁদা ক'রে তাদের এক-একটাকে নিজেদের গ্রামে রাখবে। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং' (নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে)—সকল বিষয়েই এই সত্য। We help them to help themselves (তারা যাতে নিজেরাই নিজেদের কাজ করতে পারে, এইজন্য আমরা তাদের সাহায্য করছি)। ঐ যে চাষারা ডাল দিচ্ছে—ঐটুকু হচ্ছে আসল কাজ। ওরা যখন বুঝতে পারবে নিজেদের অবস্থা, উপকার এবং উন্নতির আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক কাজ হচ্ছে জানবে। তাছাড়া পয়সাওয়ালারা দয়া ক'রে গরিবের কিছু উপকার করবে—তা চিরন্তন হয়না এবং তা আখেরে উভয় পক্ষের অপকার মাত্র। চাষাভূষো মৃতপ্রায়, এজন্য পয়সাওয়ালারা সাহায্য ক'রে তাদের চেতিয়ে দিক—এই মাত্র। তারপর চাষারা আপনার কল্যাণ আপনারা বুঝুক, দেখুক এবং করুক।"

পূর্বোক্ত সংবর্ধনাসভার প্রতিভাষণে স্বামী ত্রিগুণাতীত রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের সূচনা বিষয়ে কিছু তথ্য জানান এবং শ্রদ্ধানিবেদন করেন এ-ব্যাপারে পূর্বসূরী স্বামী অখণ্ডানন্দকে। নিজেদের অন্নসমস্যা নিজেদেরই মিটিয়ে ফেলতে হবে—এই বিষয়ে আহ্বান জানাবার পরে তিনি বলেন:

"আমার ব্যাপারটাই ধরুন। আমি সন্ন্যাসী, পথের গরিব ভিখারীর চেয়েও গরিব—কিন্তু দেখুন কী পরিমাণে অর্থ আমার এবং আমার প্রতিষ্ঠানের কাছে এসে গেল, যাতে বাংলার বিভিন্ন স্থানে সেবাকাজ আমরা চালাতে পারি। কিভাবে ঐ ব্যাপারটা ঘটল?

"আমার সন্ন্যাসী-ভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ, তিরিশেরও অনেক নিচে তাঁর বয়স, 'নদীয়ার অবতারের' লীলাধন্য নানা পবিত্র স্থানের তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আরেকটু এগিয়ে মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক ভূমিখণ্ডে ঘটনাচক্রে হাজির হন। এখানে একদল দুঃস্থ মানুষকে দেখে এই তরুণ সন্ন্যাসীর হৃদয় বিচলিত হয়। তরুণ ঋষির পক্ষে সেই স্থান ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। সেখানেই তিনি চিন্তান্বিত হৃদয়ে বসে পড়েন। তাঁর কাছে একটা কড়িও পর্যন্ত ছিলনা। কিন্তু শুনুন! তিনি সেই অভাবীদের দুঃখ দূর করতে পেরেছিলেন। তার রহস্য কি? কপর্দকশূন্য হয়েও তিনি তাদের দুঃখমোচন করতে

পেরেছিলেন, কারণ তাঁর ছিল 'ইচ্ছাশক্তি'। 'ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়।' ঈশ্বর সেখানে ঐ ঐকান্তিক হৃদয়সম্পন্ন কর্মীকে সাহায্য করেছিলেন, সেখানকার মানুষ তাঁকে সাময়িকভাবে কিছু অর্থদান করেছিলেন। তারপর তাঁর শুভকাজের বার্তা বাতাসে ভেসে গিয়ে বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের কানে যেন চুপি-চুপি কথা বলে গেল। স্বামীজী তখন কলকাতায় ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগীরা অর্থসাহায্য করতে শুরু করলেন। অখণ্ডানন্দ ঐ জেলায় ধারাবাহিক সেবাকাজ আরম্ভ ক'রে দিলেন। কিছু সময়ের জন্য সহৃদয় বৌদ্ধ (মহাবোধি) সোসাইটি বেশকিছু সাহায্য করেছিলেন। সেখানেই শেষ নয়। সরকার যথেষ্টভাবে সাহায্য করলেন। অখণ্ডানন্দের কাজের বৃদ্ধি ঘটল। আমাদের সংঘ কলকাতায় আরেকটি সেবাকেন্দ্র খুলল। যখন আমাদের তহবিলে আরো কিছু জমল তখন আমাদের কলকাতা কেন্দ্রের কর্মকুশলী সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে আপনাদের এখানে সেবা করতে পাঠালেন। আমি আপনাদের সুজনস্বভাব কালেক্টরের কাছে হাজির হলাম। তিনি আমাকে প্রভূত উৎসাহ দিয়ে বললেন—যথাসাধ্য সাহায্য তিনি করবেন।

"বিরোল গ্রামে যখন সেবাকেন্দ্র খুলেছিলাম তখন আমার তহবিলে বিশেষ কিছু ছিলনা। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, এখানে আমাদের কাজ সফল হবে। কিন্তু সমস্ত কার্যকালে আমার ছিল শুভ ইচ্ছাশক্তি, তাই ঈশ্বর সাহায্য করেছেন। আমাদের তহবিল বেড়েছে, আমাদের সংঘ বৈদ্যনাথধামে অন্নছত্র খুলেছে এবং আমার কাছেও কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ পাঠাতে পেরেছে। কাজের বিস্তৃতি ঘটিয়ে আমি এই শহরে একটি সেবাকেন্দ্র খুলতে পেরেছি।"

ত্রিগুণাতীত নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রসঙ্গে কয়েকবার ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তের কথা বলেছেন। সন্ন্যাসী তিনি—তা বলতেই পারেন। কিন্তু তিনি আবার সাধারণ সন্ন্যাসী নন—শ্রীরামকৃষ্ণের ছোঁয়া-লাগা সন্ন্যাসী-শিষ্য। তাই তাঁর ঈশ্বর সর্বগ্রাসী। এই বক্তৃতাতেই বিশ্বের অণু-পরমাণুতে ব্যাপ্ত ঈশ্বর, বিশ্বাত্মবোধে সেই ঈশ্বরের উপলব্ধি—সে-বিষয়ে রহস্যগর্ভীর বর্ণনা আছে (যা তাঁর তিব্বত ভ্রমণকাহিনীর মধ্যেও মেলে)। আব্রহ্মস্তম্বব্যাপ্ত সেই একাত্মবোধ কিভাবে বিশ্বমানব-ভ্রাতৃত্ববোধে পৌঁছেছিল তার ভাবঘন বর্ণনা এই:

"যখন কৈলাস দর্শনের জন্য তিব্বত যাচ্ছিলাম, তখন আমার সহযাত্রিদল কোনো বিশেষ কারণে আমাকে তুষারাবৃত হিমালয়ের গিরিবর্ত্মে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ ক'রে এগিয়ে যেতে বাধ্য হন। একলা সেখানে পড়ে রইলাম, সঙ্গিদল ক্রমে চোখের আড়ালে চলে গেলেন। হতাশ হয়ে সেখানে বসে পড়লাম। চারিদিক গভীরভাবে শান্ত ও সমাহিত। কিন্তু অনিবার্য বিপদও সর্বত্র। চারিদিকে তুষারাবৃত পর্বতশিখর ভিন্ন আর কিছু নেই। সেই স্বর্গীয় পর্বতশিখরগুলিকে আমি নিজের ভাই বলে মনে করলাম। শিখরগুলি ঝলমল করছিল, যেন জীবন্ত চরিত্র তারা—আমার তো তাই মনে হতে লাগল। তাদের সঙ্গে আত্মগত অন্তরঙ্গ অধ্যাত্মকথালাপ শুরু ক'রে দিলাম। আমার সেই প্রাচীন শুভ্রশির ভ্রাতৃগণ আমার আত্মগত উক্তির প্রত্যুত্তর দিলেন—সান্ত্বনা দিলেন তাঁদের অলৌকিক মৌন বাণীতে। তাঁদের এবং আমার চোখে আর যা-কিছু পড়েছিল সকল কিছুকে আমার ভাই বলে গ্রহণ করলাম।

"কিন্তু সকল পার্থিব ও নশ্বর বস্তুর মধ্যে মানুষই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সিংহাসনের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠরূপে নির্মাণ করা হয়েছে। বলা হয়, ঈশ্বরের আদলেই মানুষ নির্মিত। আমাদের স্বর্গস্থ পিতার প্রিয়তম সন্তান এই মানুষ। তাই আপনাদের আমি সবচেয়ে প্রিয় ভ্রাতা-রূপে সম্বোধন করছি—হতে পারে তা প্রজ্ঞা থেকে, হতে পারে অজ্ঞতা থেকে।

"ঘটনা যখন এই, তখন আপনাদের যদি কোনো সাহায্য করে থাকি, তা সামান্যই। যদি আমি আমার অভাবী ভাই-বোনদের সাহায্য করে থাকি—সে তিনি হিন্দু, খ্রীস্টান বা মুসলমান যেই হোন—সে-কাজ করেছি কর্তব্যরূপেই; তার জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি আমি মণ্ডা-মেঠাই ও অন্য সুখাদ্যে ভরা থালা নিয়ে খেতে বসি, অথচ তখন আমার ভাইবোনেরা ঘাসপাতা খাচ্ছে—যদি আমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি, অথচ আমার ভাইবোনেরা অনাহারে আছে—তাহলে তো আমি মানুষই নই, একেবারে পশু।...সেক্ষেত্রে নিজেকে মনুষ্যগুণসম্পন্ন বলবার অধিকার হারিয়ে যাবে, আমি পাপী হয়ে দাঁড়াব, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের কঠিন দণ্ডাঘাত সইতে হবে আমাকে।

"এই জেলার ভাইবোন আপনারা, এরপরেও যদি ভালবেসে বা কৃতজ্ঞতাবশে আমাকে এবং আমাদের সংঘকে ধন্যবাদ দিতে চান, তাহলে আমি বলব—হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ! কদাপি ওকথা মুখে উচ্চারণ করবেন না।"

॥ পাঁচ ॥

ত্রিগুণাতীতের ভাষণে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল, যেখানে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে। তিনি বিস্তৃতভাবে দুর্ভিক্ষের রূপ, হেতু ও নিরাকরণের উপায় বর্ণনা করেছিলেন। অনেক সংবাদ তিনি ঐতিহাসিক তথ্য ও সমকালীন নথিপত্র থেকে সংকলন করেছিলেন, তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—সর্বোপরি তাতে প্রাণসঞ্চার করেছিল স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত আত্মনির্ভরতার বাণীশক্তি। বহু তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক লেখাটি, এমনকি তার সারাংশও এখানে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। কেবল দু-একটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

ত্রিগুণাতীত অর্থাগমের দ্বিতীয় উপায় শিল্পায়নের প্রসঙ্গ এখানে একেবারেই আনেন নি। গ্রামবাংলায় তিনি কৃষির বিষয়েই মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছিলেন, কারণ প্রধানত কৃষির দ্বারাই তখনকার ভারতবর্ষে অন্নাগম হতো।

গোড়ায় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একাধিক ভ্রান্ত ধারণার দূরীকরণের চেষ্টা তিনি করেছিলেন। ঈশ্বরবিশ্বাসী তিনি, কিন্তু কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে গররাজি। যেমন শাস্ত্রবচন বলে কথিত কিছু কুসংস্কারাত্মক ধারণা—দৈবনিগ্রহে দুর্ভিক্ষ হয়। আরেকটি ধারণা—ঠিকমত যাগযজ্ঞ না করলে দুর্ভিক্ষ হয়। এইসব নির্বোধ ধারণাকে খণ্ডন ক'রে, যথোচিত অবজ্ঞার সঙ্গে সেসব আবর্জনায় নিক্ষেপ করেছেন। তারপরে দুর্ভিক্ষের যথার্থ কারণ নির্ণয় করেছেন—যা রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, কৃষিগত এবং বৈজ্ঞানিক। রাজনৈতিক কারণের মধ্যে আছে—(১) বিধ্বংসী যুদ্ধ, (২) খাদ্যশস্যের রপ্তানী ও আমদানী সম্পর্কে ক্ষতিকর আইন, (৩) ক্ষুদ্রতর

স্থানে অতিরিক্ত লোকসমাগম, (৪) অপরিণামদর্শী প্রশাসন। ব্যবসায়িক কারণ—(১) ব্যবসায়ীদের সাংগঠনিক ত্রুটি এবং সংরক্ষণ ও বণ্টন ব্যাপারে দূরদর্শিতার অভাব, (২) খাদ্যশস্য চলাচলের ক্ষেত্রে সামর্থ্যের অভাব, (৩) গৌণ কারণে মুখ্য পণ্যের অপব্যবহার। কৃষিজ কারণ— (১) খরা কিংবা জলসেচের বন্দোবস্ত না থাকা, (২) জলপ্লাবন কিংবা নদী বা সমুদ্রতটে উপযুক্ত বাঁধ না থাকা, (৩) অতিবৃষ্টি এবং জলনিকাশী ব্যবস্থা না থাকা, (৪) জমিকে উর্বর করার উপযুক্ত পদ্ধতি বিষয়ে অজ্ঞতা, (৫) একই জমিতে হিসাব না ক'রে অন্য শস্যের চাষ, (৬) আহার্য হিসাবে কেবল এক ধরনের খাদ্যশস্যের ওপর অত্যধিক নির্ভরতা। বৈজ্ঞানিক কারণ—(১) বনাঞ্চলের সম্পূর্ণ বিনাশ যা অনাবৃষ্টি ডেকে আনে, (২) ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের উপদ্রব, (৩) অত্যধিক তুষারপাত ইত্যাদি।

ত্রিগুণাতীত উল্লিখিত কারণগুলির সঙ্গে প্রমাণ হিসাবে দৃষ্টান্ত যোগ করেছিলেন। অনেকখানি অংশ নিয়ে তিনি বাংলার ১৭৭০, ১৭৭৫, ১৭৯৩, ১৮৬১, ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের বিবরণ দিয়েছেন। বৃহত্তর ভারতের দুর্ভিক্ষের বর্ণনাও তিনি করেছেন, যেমন মাদ্রাজে ১৭৩৩, ১৭৮৩, ১৮০৫, ১৮১৪, ১৮২৪, ১৮৫৪, ১৮৭৭; বোম্বাইয়ে ১৮৭৭; উড়িষ্যায় ১৮৬৬; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৮৬১ এবং ১৮৩৮ সালে। এইসব দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ মরেছে, যথাসর্বস্ব হারিয়ে তারা ক্ষুধার জ্বালায় পশুবৎ আচরণ করেছে, সম্পন্ন জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

ত্রিগুণাতীতের ইতিহাসবোধ সুপ্রাচীনকালের দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করতে তাঁকে প্রণোদিত করেছে এবং তিনি বহির্ভারতের দুর্ভিক্ষের কথাও বলেছেন।

দুর্ভিক্ষ কেন হয়, তার সম্বন্ধে একটি প্রচলিত ধারণাতে তাঁর সায় ছিলনা। খাদ্যশস্য রপ্তানী করলেই দুর্ভিক্ষ হয়, তা তিনি মানতে পারেন নি। রপ্তানীর ওপর দেশের ধনবৃদ্ধি নির্ভর করে এবং বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়। খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হলে, রপ্তানী না থাকলে শস্যাদির দাম পড়ে গিয়ে কৃষকের আর্থিক ক্ষতি হয়, সে পরিশ্রমের মূল্য পায় না। ত্রিগুণাতীত চেয়েছেন, ভারতবর্ষ অযথা আত্মতৃপ্তির সুখনিদ্রা ছেড়ে বিশ্বব্যাপক প্রতিযোগিতার মধ্যে নেমে পড়ুক, জেনে নিক অপর জাতির সমৃদ্ধির রহস্য, সেই জ্ঞানকে প্রয়োগ ক'রে লাভবান হোক ঐহিক দিক থেকে, যাতে ভারতের পূর্বতন ঐশ্বর্যশালী সভ্যতার প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে।

ত্রিগুণাতীত অনেকখানি অংশ নিয়ে ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতিতে কিভাবে কৃষির উন্নতি ঘটানো যায় তার পর্যালোচনায় নিয়োজিত ছিলেন। সেচের প্রশ্নে তিনি অপ্রচুর খালের ওপর নির্ভরতার পরিবর্তে ব্যাপকভাবে কূপখননের পরামর্শ দিয়েছেন—তার কারণও জানিয়েছেন। তার সঙ্গে এনেছেন কৃষির সঙ্গে জড়িত জমি, কৃষক ও জমিদারদের প্রসঙ্গ। জমির উন্নতি না ঘটিয়ে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয়। যারা অন্নদাতা জমির উন্নতিতে মনোযোগী নয়—তাদের সমূহ ধিক্কার দিয়েছেন। "কি উদ্ভট এবং হাস্যকর আমাদের প্রয়াস। আমরা এখনো শিখিনি কিভাবে আমাদের খাদ্যবস্তুকে উপযুক্ত উপায়ে উৎপাদন, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করতে হয়—অথচ আমরা রাজনীতি এবং জ্ঞানের অন্য ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে বড় বড় বচন আওড়াচ্ছি। জমির উন্নতিই আমাদের প্রথম মনোযোগের লক্ষ্য হওয়া উচিত—জমিই আমাদের প্রধান অন্নদাতা, আমাদের ধন-সম্পদের উৎস।" জীবনের নানা দিক আছে—শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক। ত্রিগুণাতীতের

বিবেচনায়, জীবনের অন্য দিকগুলির উন্নতি নির্ভর করে কৃষির উন্নতির ওপরে। কৃষিই ভিত্তি। তা নষ্ট হয়ে গেলে অন্য সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। "অনুপযুক্ত ভিত্তির ওপরে কিছু নির্মাণ করা মানে শূন্যে সৌধনির্মাণ। তেমন করা হলে বাতাসের এক ঝাপটে শত শত বৎসর ধরে তৈরি করা সৃষ্টবস্তু ডালপালা-সুদ্ধ উপড়ে পড়বে—১৭৭০ সালে বাংলায় তেমন এক দুর্ভিক্ষ, কিংবা ১৮৭৮ সালে চীনের দুর্ভিক্ষ— সারা দেশের উন্নত সভ্যতা ধ্বংস ক'রে আবর্জনায় পর্যবসিত করতে পারে।"

এই কারণে ত্রিগুণাতীত কৃষির স্থায়ী উন্নতির নানা পন্থা নির্দেশ করেছেন। তার মধ্যে প্রতি জেলায় সরকারের তরফে 'কৃষি-সমিতি' স্থাপন, কৃষিবিষয়ে দেখাশোনার জন্য 'ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচারিস্ট' নিয়োগ, জমির উন্নতির জন্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পৃথক ট্যাক্স বলবৎ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কলেজে কলেজে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যবস্থা। "প্রথমে শিক্ষা দিতে হবে কৃষিবিজ্ঞান, ভূমিবিজ্ঞান, শ্রম ও মূলধন-বিজ্ঞান।...সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে গণিত যেমন প্রাথমিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হলো কৃষি, ভূমি, শ্রম এবং মূলধন-বিজ্ঞান। ভারতের রাজধানীর (অর্থাৎ কলকাতার) অনেক গ্র্যাজুয়েট ও আন্ডার-গ্র্যাজুয়েটের মুখে শুনেছি—ধানগাছ থেকে বড় বড় কাঠের তক্তা হয়। আহা, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কী-সব পণ্ডিতই প্রসব করেছেন!"

কৃষির ক্ষেত্রে শ্রম ও শ্রমজীবীর গুরুত্বের কথা বারেবারে ত্রিগুণাতীত বলেছেন :

> "সম্পদ সৃষ্টির মূলে আসল শক্তি হলো শ্রম। সে-শ্রম পবিত্র। হায়, আমাদের দেশে শ্রমের গুণগৌরবের বোধই নেই। আমেরিকা আজ এত ধনী দেশ কেন? কারণ, সেখানে শ্রমকে পবিত্র জ্ঞান করা হয়। আমেরিকা যে সভ্যতার এত উন্নতি ঘটিয়েছে তার মূলেও ঐ কারণ রয়েছে। শ্রম যে প্রকারের হোক না কেন, আমেরিকায় তাকে ঘৃণা করা হয়না; তেমনি কোনো স্তরের শ্রমিকই সেখানে অবজ্ঞা বা ঘৃণার পাত্র নয়। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক তার উলটো, আমরা শ্রমের দাম দিইনা, শ্রমিকদের নিচু চোখে দেখি, তাদের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করিনা। অপরদিকে অলস গদীয়ান লোকগুলোকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে আকাশে তুলে দিই—যাদের ধনসম্পদ কিন্তু ঐ অসহায় দরিদ্র শ্রমিকদের অবিরাম ঘাম-ঝরানো শ্রমের ফলেই সম্ভব হয়েছে।"

কৃষি, জমি ও কৃষকের দুর্দশার জন্য দায়ী কে? সে-প্রসঙ্গে যাদের মূল দায়িত্ব, তাদের বিষয়ে তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে যথেষ্ট কঠিন কথা ত্রিগুণাতীত বলতে পারেন নি। সেজন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের সরাসরি নিন্দা তাঁর ভাষণে ছিলনা—বরং সহৃদয় কিছু প্রশাসকের মঙ্গলকর্মের প্রশংসা ছিল। কিন্তু পুরো সমালোচনা বাদ দিতে পেরেছিলেন কি? পারেন নি :

> "আপনারা দেখলেন, কেবল ভারতবর্ষ কতবার দুর্ভিক্ষ-কবলিত হয়েছে। আপনাদের তো বলেছি—ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষের বড় প্রিয় বাসভূমি—আর স্থায়িভাবে তা দূরীকরণের কোনো চেষ্টা করা আমরা প্রয়োজন বোধ করিনি। যে-ভারতবর্ষ একদা ঐশ্বর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, জগতের সামনে কল্পলোক—সেই ভারতবর্ষ কেন আজ প্রত্যেকের দরজায়

ঘুরছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে—একমুঠো চাল কি এক ঘটি জলের জন্য? আমরা হলুম গৌরবান্বিত ব্রিটিশ প্রজা!—কেন আমাদের বাঁচতে হবে অপরের দয়ার দানে? সুসভ্য ব্রিটিশ সরকারের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে থেকেও ভারতবর্ষকে দুঃখ-দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের জন্য বিখ্যাত হয়ে পড়তে হচ্ছে—এটা কি অগৌরবের বিষয় নয়? কেউই ক্ষণেকের জন্য একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, ব্রিটিশ শাসনে রেল, রাস্তা, খাল, বেতার ইত্যাদি হয়েছে। তাতে উন্নতি ঘটেছে। খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষের সময়ে সরকার চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করে এবং খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য বড় আকারের জোরালো সংগঠন গড়ে তোলে। তাও বিতর্কের বিষয় নয়। সে-কাজ সরকার করে দুর্ভিক্ষ এসে গেলে। কিন্তু প্রশ্ন—সুসভ্য ব্রিটিশ জাতি, বিরাট সাম্রাজ্যের গর্বিত মালিক, যে-সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায়না—কেন সেই সুসভ্য ও শক্তিশালী জাতি দুর্ভিক্ষের স্থায়ী নিরাকরণব্যবস্থা করতে পারেনা?...কেন সরকারকে দ্বারে দ্বারে আমাদের জন্য দান সংগ্রহে যেতে হয়? কেন সরকার কেবল ভিক্ষা নেওয়া শেখায়, তার দ্বারা আমাদের অলস ক'রে তোলে এবং আমাদের জমি সম্বন্ধে যত্নের ব্যাপারে কোনো চেষ্টাই করেনা? পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সভ্যতার স্বাদ পাওয়ার পরেও কি আমাদের পরের দয়ার দানে বাঁচতে হবে?"

প্রশ্নগুলির মধ্য দিয়ে ত্রিগুণাতীত কিছু বলতে বাকি রাখেন নি।

ত্রিগুণাতীতের খাঁড়ার ঘা গিয়ে পড়েছিল কৃষি ও কৃষকের সাক্ষাৎ শত্রু জমিদারের ওপরে।—

"গর্বান্ধ জমিদার, রাজা, মহারাজা ও জমির অন্যান্য বড় বড় মালিকদের জন্যই আমাদের দেশের মানুষের এত কষ্ট। 'রাজা', 'মহারাজা'—এইসব বড় বড় খেতাবের কী দাম আছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে বা কৃষির ক্ষেত্রে তাদের কী গুরুত্ব—যদিনা তারা নিজেদের প্রজাদের উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে? জমিদার বা রাজাদের কী প্রয়োজন যদি তারা রায়তদের অবস্থার উন্নতি বা কৃষিজমির উন্নতি করতে না পারে? রপ্তানি আমাদের দেশকে নিঃশেষিত করছে না—ঐসব অহঙ্কারী রাজা মহারাজারা দেশের সম্পদ শুষে দেশকে ছিবড়ে ক'রে দিচ্ছে অথচ প্রজাদের সম্বন্ধে ওদের ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল প্রেমপূর্ণ দায়িত্বশীল পিতার মতো। সেই প্রাথমিক দায়-দায়িত্ব ভুলে গিয়ে তারা রায়তদের নিংড়ে পয়সা আদায় করছে, সেই টাকা বিলাসব্যসনে নয়-ছয় করছে, কিংবা সিন্দুকে ভরছে। অথচ প্রত্যেকেরই মনে রাখা দরকার, ব্যক্তির ধনসম্পদ জাতীয় সম্পদ ভিন্ন কিছু নয়—সেইজন্য তা পবিত্র বস্তু। বস্তুতপক্ষে আমাদের দেশে সম্পদকে দেবী লক্ষ্মীরূপে পূজা করা হয়।"

ত্রিগুণাতীত আরো নানাভাবে শোষিত রায়ত এবং শোষক জমিদারদের বিষয়ে বলেছিলেন। সংশ্লিষ্ট সকলেরই কর্তব্যকর্মের রূপ নির্ধারণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে সন্ন্যাসীদের কর্তব্যের কথা বলতেও তিনি ভোলেন নি। ঋষি বা সাধুদের তপস্যার এক-চতুর্থাংশ গৃহীদের প্রাপ্য। তার উল্লেখের পরে, তাঁর সকল শ্রম ও সাধনার যিনি উৎস তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেন :

"যদি আপনারা মনে করেন যে, আপনাদের জেলায় আমি কিছু ভাল কাজ করেছি, তাহলে বলব, বস্তুতপক্ষে তা আমার কাজ নয়—আমার মহিমান্বিত আচার্যদেবের কাছ থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যে শক্তি-স্ফুলিঙ্গ লাভ করেছি, এই কাজ তারই ফল-পরিণতি।"

শতাধিক বৎসর পূর্বের এই রচনা এক সন্ন্যাসীর—বাস্তব মানুষের প্রতি গভীর প্রীতি এবং চিন্তাশীলতার স্বাক্ষর যা বহন করেছে—তার কিছু-কিছু বিধান স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও পালনীয়।

ছয় ॥

স্বামী ত্রিগুণাতীত বাঙলায় রামকৃষ্ণ মিশনের একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে চাইলেন। এ বিষয়ে তাঁর নেতা বিবেকানন্দের প্রবল ইচ্ছার কথা জানতেন। স্বামীজী, ত্রিগুণাতীতকে এই কাজে যোগ্য মনে করতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের তখন আর্থিক অবস্থা যে-রকম তাতে ঐ প্রয়াস কার্যত দুঃসাহসিক। সুতরাং যদি এমন কেউ থাকে, যে সামান্য ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে, স্বভাবে জেদি এবং কর্তব্যপরায়ণ, যার চিন্তা করার ও লেখার ক্ষমতা আছে—তাকেই ভারার্পণ করা যায়। ত্রিগুণাতীত তেমন একজন পুরুষ—যা প্রমাণিত হয়ে গেছে। অবশ্যই মানুষটি খেয়ালি, কিন্তু যখন নির্দিষ্টভাবে কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ে তখন কঠোরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা মান্য করেন।

ত্রিগুণাতীতের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধেও স্বামীজী অবহিত ছিলেন। সন্ন্যাসজীবনের সূচনাপর্বে নরেন্দ্রনাথের কাছে সারদা-মহারাজের পড়াশোনা করার কিছু স্মৃতিকথা মহেন্দ্রনাথ দত্ত নিবেদন করেছেন :

"নরেন্দ্রনাথের যখন পাথুরীর অসুখ, তখন ৭ নং রামতনু বসু গলির বাড়িতে সারদা-মহারাজ শুশ্রূষার জন্য আসিয়া থাকিতেন। তিনি 'ক্যাসেলের' মুদ্রিত ছবিওয়ালা শেক্সপীয়ারের গ্রন্থগুলি পড়িয়া নরেন্দ্রনাথকে শুনাইতেন এবং নরেন্দ্রনাথ একটু সুস্থবোধ করিলে সারদা-মহারাজকে শেক্সপীয়ারের নানা গ্রন্থ ও কাব্যের বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। বালক সারদা-মহারাজ সম্মুখে বইখানি খুলিয়া রাখিয়া একমনে নরেন্দ্রনাথের নিকট শেক্সপীয়ারের কাব্যের সহিত সংস্কৃত কাব্যের কোথায় মিল ও কোথায় বৈষম্য আছে—সেই সমস্ত স্থির হইয়া বসিয়া শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে সারদা-মহারাজের মুখে ধ্যানের ভাব ফুটিয়া উঠিত। তখন তিনি আর পড়িতে পারিতেন না, বইখানি বন্ধ করিয়া স্থিরমনে জপ করিতেন। তিনি যখন বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তখনও ঠিক এইরকম এক-মন-প্রাণ হইয়া পড়িতেন। বিকাল হইল, সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু সারদা-মহারাজের কোন হুঁশ থাকিত না। অন্ধকার হইয়া আসিলে আলো জ্বালিয়া আবার পড়িতে বসিতেন এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত পাঠ করিতেন। এইরূপে তিনি সংস্কৃত ও ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিশেষরূপে শিখিয়াছিলেন।"[৮]

ত্রিগুণাতীতের অপরিসীম পাঠনিষ্ঠার অন্য প্রমাণও আছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের এবং রামকৃষ্ণ ভাবধারার পত্র-পত্রিকা স্বামীজী একান্তভাবে চেয়েছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহ তিনি। বিপক্ষ দল থেকে অবিরাম নিন্দা, কুৎসা ও ভ্রান্ত প্রচার, এবং স্বদলের মধ্যে গতানুগতিক ধর্মাচরণের মধ্যে আবর্তিত থাকার প্রবণতা—এর ভিতর থেকে পথ কেটে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসত্য অর্থাৎ নিত্যসত্য এবং ভারতীয় ধর্ম এবং সভ্যতার মর্মবাণীর পতাকা তুলে ধরে—এই তাঁর জীবনব্রত। পত্র-পত্রিকা এই ব্রতসাধনে অন্যতম সহায়ক।

সন্ন্যাসজীবন গ্রহণের আগেই নরেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' পত্রিকার (এবং পরবর্তী কালে সাপ্তাহিক 'বসুমতী' পত্রিকা) ব্যাপারে সাহায্য করেছেন যথোচিত উৎসাহ দিয়ে।* আমেরিকা যাওয়ার পর থেকে স্বামীজী রামকৃষ্ণ সংঘের ইংরেজী, সেইসঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা—যেমন হিন্দি, তামিল, তেলুগু, কানাড়ি, মালয়ালম প্রভৃতিতে পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহ দেখিয়েছেন, বাঙলা ভাষায় তো নিশ্চয়ই। দ্বিভাষী পত্রিকার কথাও তাঁর মনে এসেছিল। বাঙলা পত্রিকা প্রসঙ্গে তাঁর চিঠিপত্র থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক :

১৮৯৪-এর ২৫ সেপ্টেম্বর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছেন:

"তোমাদের একটা কিনা কাগজ ছাপাবার কথা ছিল, তার কি খবর?...একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit করতে হবে, আদ্দেক বাঙলা, আদ্দেক হিন্দি—পার তো আরেকটি ইংরেজীতে।" (স্মর্তব্য, তখনো মাদ্রাজ থেকে 'ব্রহ্মবাদিন' বেরোয়নি।)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ১৮৯৫ সালের এক চিঠিতে :

"সারদা (ত্রিগুণাতীত) কি বাঙলা কাগজ বার করবে বলছে? সেটার বিশেষ সাহায্য করবে, সে-মতলবটা মন্দ নয়। কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। Criticism (বিরুদ্ধ সমালোচনা) একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয়, সকলকে সাহায্য করবে।"

রামকৃষ্ণানন্দকে ১১ এপ্রিল ১৮৯৫ তারিখে লেখা :

"মাস্টারমহাশয় প্রভৃতি ও তোমরা এককাট্টা হয়ে একটা কাগজ যাতে বার করতে পার, তার চেষ্টা কর দিকি।"

১৮৯৬-এর জানুয়ারিতে ত্রিগুণাতীতকে লেখা :

"তোর কাগজের idea অতি উত্তম বটে এবং উঠে-পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ৫০০ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেব, ভাবনা নেই টাকার জন্য। আপাতত এই চিঠি দেখিয়ে কারুর কাছে ধার নে।...কোনো আরবীজানা মুসলমানভায়া ধরে যদি পুরনো আরবী গ্রন্থের তর্জমা করাতে পার ভাল হয়। ফারসী ভাষায় অনেক Indian History আছে। যদি সেগুলো ক্রমে ক্রমে তর্জমা করাতে পার, একটা বেশ regular item হবে। লেখক অনেক চাই। তারপর গ্রাহক যোগাড়ই মুশকিল, উপায়—তোরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াস, বাঙলা ভাষা যেখানে যেখানে আছে, লোক ধরে কাগজ গতিয়ে দিবি।...চালাও কাগজ, কুছ্ পরোয়া নেই। শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে (অর্থাৎ সকলে মিলে) লিখতে আরম্ভ কর।...তুই খুব বাহাদুরি করেছিস। বাহবা সাবাস!"

স্বামীজী ত্রিগুণাতীতের ভিতরে অগ্নিশর ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, যার আনন্দ ও যন্ত্রণা দুই-ই ছিল—"গুঁজগুঁজেগুলো পেছু পড়ে থাকবে হাঁ করে, আর তুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি।" সারদার 'লম্ফ' যাতে বন্ধ না হয়, তার জন্য স্বামীজী তাঁকে আরো "লেগে যাও" বাণী পাঠিয়েছেন (১৭ জানুয়ারি ১৮৯৬), অপরকেও প্রণোদিত করেছেন সারদাকে মাতিয়ে রাখবার জন্য—যেমন স্বামী তুরীয়ানন্দকে। (২৪ জানুয়ারি ১৮৯৬ তারিখে লেখা তাঁর চিঠি)।

স্বামীজীর উৎসাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিন্তু তাঁর হাতে টাকা জুটছিল না। ১৪ এপ্রিল ১৮৯৬ ডাঃ নাঞ্জুন্ডা রাওকে জানালেন, তাঁর ভাণ্ড কার্যত শূন্য, সেজন্য কলকাতায় কাগজের জন্য টাকা পাঠাবেন বললেও তা করতে পারছেন না। ঐ বছর ২৭ এপ্রিল রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিতে বাঙলা কাগজের দায়দায়িত্ব যেন সকলে ভাগ ক'রে নেয়—এমন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন স্বামীজী : "সারদা যে কাগজ বার করতে চেয়েছে, সে উত্তম কথা বটে, কিন্তু সকলে মিলেমিশে করতে পারো তো আমার সম্মতি আছে।" বস্তুতপক্ষে স্বামীজীর টাকার অনেকখানি অংশ চলে গিয়েছিল মাদ্রাজের ইংরেজী পত্রিকার প্রকাশনায়।

কিন্তু স্বামীজী ছাড়বার পাত্র নন, বিশেষত সারদার মতো নাছোড় গুরুভাইকে যখন পেয়ে গিয়েছিলেন। ওঠা-পড়ার মধ্য দিয়ে বাঙলা পত্রিকার পরিকল্পনা এগোতে লাগল। ভারতে ফেরার পরে স্বামীজী শুদ্ধানন্দকে ১১ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে লিখলেন : "ব্রহ্মানন্দকে বলবে, সে যেন অভেদানন্দ ও সারদানন্দকে...লেখে—যে-বাঙলা কাগজটা বার করবার কথা হচ্ছে, তার জন্য যেন তারা প্রবন্ধ ও প্রয়োজনীয় উপাদান মঠে পাঠায়। গিরিশবাবু কি কাগজটার জন্য যোগাড়যন্ত্র করছেন?"

এরপরেও যখন কয়েকমাস পত্রিকা বেরোল না, তখন স্বামীজী নৈরাশ্য ও অভিমানের সঙ্গে ১১ অক্টোবর ১৮৯৭ তারিখে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন : "সারদা বেচারিকে অনেক গাল দিয়েছি। কি করব?...আমি গাল দিই, কিন্তু আমারও বলবার ঢের আছে।...আমি হাঁপাতে-হাঁপাতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওর প্রবন্ধ লিখেছি।" (প্রবন্ধটি সম্ভবত 'উদ্বোধন'-এর বিখ্যাত 'প্রস্তাবনা'।)

অর্থকষ্ট 'উদ্বোধন'-এর প্রকাশকালকে আরো দেড় বছর টেনে নিয়ে গেল। স্বামীজীর কিন্তু বাঙলা মুখপত্র খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল আক্রমণ সবেগে চলেছে, তাঁর ব্যাখ্যাত বেদান্তধর্মকে বাঙালীদের সামনে বাঙলা ভাষায় উপস্থিত করার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বাংলাদেশেই—সুতরাং বাঙলা ভাষায় পত্রিকা চাই-ই। ২৯ এপ্রিল ১৮৯৮, মিস ম্যাকলাউডকে সাহায্য করতে অনুরোধ জানিয়ে স্বামীজী চিঠি লিখলেন : "আমি কলকাতায় একখানা কাগজ চালাব। তুমি যদি ঐ কাগজ চালু করতে আমাকে সাহায্য করো, তবে খুবই কৃতজ্ঞ হবো।" ম্যাকলাউড অবশ্যই যথাসাধ্য সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন।[১০] স্বামীজী ব্রহ্মানন্দকে কিছুদিন পরে (২০ মে) লিখলেন : "কাগজের জন্য টাকার চেষ্টা হইতেছে। যে ১২০০ টাকা তোমায় কাগজের জন্য দিয়েছি, তাহা ঐ হিসাবেই যেন থাকে।" তবু বাধা। প্রায় একমাস পরে ব্রহ্মানন্দকে তিনি লিখলেন : "সারদার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এইমাত্র যে, বাঙলা ভাষায় ম্যাগাজিন paying করা মুশকিল, তবে সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া subscriber যদি যোগাড় করা যায় তো সম্ভব। এ-বিষয়ে তোমাদের যে-প্রকার মত হয় করিবে। সারদা

বেচারা একেবারে ভগ্নমনোরথ হইয়াছে। যে-লোকটা এত কাজের এবং নিঃস্বার্থ, তার জন্য ১০০০ টাকা যদি জলেও যায় ক্ষতি কি?"

অবশেষে 'উদ্বোধন' আত্মপ্রকাশ করল ১ মাঘ ১৩০৫ সন (১৪ জানুয়ারি ১৮৯৯)। পাক্ষিক পত্ররূপে তার আত্মপ্রকাশ। কিছুদিনের মধ্যে তা মাসিক পত্রের রূপ ধরে। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, 'উদ্বোধন' দৈনিক পত্র হয়। স্বামীজীর ইচ্ছার অশ্বমেধের অশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দৌড়ানো সম্ভব নয়, কিন্তু অশ্বখুররেখা ধরে ধ্রুবগতিতে অগ্রসর হওয়ার মতো মানুষ জন্মেছেন—একশ বছর ধরে সেই 'পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি' 'উদ্বোধন' চলেছে এবং চলবেও।

॥ সাত ॥

'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ

উদ্বোধন।

॥ উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

বাঙ্গালা-পাক্ষিক-পত্র,
ধর্মনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান,
কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ
প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ক।

প্রথম বর্ষ
১৩০৫ মাঘ হইতে ১৩০৬ পৌষ।
স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।
স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক সম্পাদিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—২।
কলিকাতা, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কম্বলেটোলা, ১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেনস্থ
উদ্বোধন-প্রেস হইতে সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[এছাড়া টাইটেল পেজ-এ সংবাদ ছিল: উদ্বোধনের প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দুই আনা মাত্র।...
এই প্রেসে পুস্তক, চেক, বিল প্রভৃতি নানাপ্রকার ছাপা কার্য সুলভ মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সুসম্পন্ন করা হয়।]

সূচী

প্রথম বর্ষের অন্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, স্বামী শুদ্ধানন্দ (ধারাবাহিক তিব্বত ভ্রমণকথা লিখেছেন), প্রবোধচন্দ্র দে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র বসু, স্বামী বিরজানন্দ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন, স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীম (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৯ম সংখ্যা থেকে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়েছে)। এছাড়া সম্পাদকের লেখা, এবং রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ বেরিয়েছে। ধারাবাহিক লেখাগুলি প্রথম বর্ষ ছাপিয়ে পরের বছরেও গেছে।

পত্রিকা হাতে পেয়ে স্বামীজী ত্রিগুণাতীতকে নিঃস্বার্থ অক্লান্ত কাজের 'বাহবা' যেমন দিয়েছেন, তেমনি রাগের চোটে গালাগালিও কম দেননি: "সারদাকে অনেক গাল দিয়েছি।" সেই গালাগালির তোড়ে পড়লে পাহাড় উলটে যাবে। আবার ভালবাসার টানে ওলটানো পাহাড় সোজা হয়ে গিয়েই দণ্ডদাতা ও দণ্ডগ্রহীতার গলাগলিও ঘটবে।

তারই একটি ছবি, প্রত্যক্ষদর্শী শচীন্দ্রনাথ বসুর পত্র থেকে :

"গত সোমবার [৬ নভেম্বর ১৮৯৮]...স্বামীজী ও আমি বাগবাজারে আসিলাম।...[বলরামবাবুর বাড়ির] হলঘরে [স্বামীজী] বসিলেন, আমরাও বসিলাম—কেবল আমি ও রাখাল মহারাজ। কিছু পরে শরৎ চক্রবর্তী আসিল। নানাবিধ কথা হইতেছে, এমন সময় সারদা-মহারাজ টলিতে টলিতে আসিয়া হাজির—জ্বর হইয়াছে।

স্বামীজী যখন আলমোড়াতে তখন হইতে ত্রিগুণাতীত-মহারাজ তাঁহাকে বারবার চিঠি লেখেন—ভাই, আমি work করিব। তুমি আমাকে ২০০০ টাকা দাও, আমি প্রেস করিব, কাগজ চালাইব। স্বামীজী তাঁহাকে ১০০০ টাকা দিয়াছেন, বাকি ১০০০ টাকা ধার করিয়াছেন। মাসে ১০ টাকা সুদ লাগে। ১৫০০ টাকায় দুটি ভাল প্রেস কিনিয়াছেন, কিন্তু কিনিলে কি হইবে, কোনো কাজ নাই; ঠায় বসিয়া আছেন। বড়বাজারের এক গুদামে ৮ টাকা ভাড়া দিয়া রাখা হইয়াছে। সুধীরের [শুদ্ধানন্দ] রাজযোগ বইখানি [স্বামীজীর বইয়ের অনুবাদ] ছাপাইবার সঙ্কল্প হইয়াছে, কিন্তু পয়সা নাই, কাগজ আসিবে কোথা হইতে?...আমি একবার ত্রিগুণাতীত-মহারাজকে বলিয়াছিলাম, 'মহারাজ, ও কাজ [প্রেসের কাজ] বড় nefarious [হীন], আপনার কর্ম নয়। অপর লোকের করা উচিত।' তখন ভারী spirit। বলিলেন, 'না any work is sacred। আমি কাজ পেলে খুশি, কাজ করতে আমি নারাজ নই।' আমি চুপ করিয়া গেলাম। এখন রোজ ৬টার সময়ে প্রেসে যান, সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া হয়। আর আসেন রাত ৮টার পর। রোজ সন্ধ্যার পর জ্বর হয়।

স্বামীজী ও রাখাল-মহারাজ একসঙ্গে ত্রিগুণাতীতজীকে অভ্যর্থনা করিলেন—'কি বাবাজী, এস, আজকের খবর কি? প্রেসের কতদূর? বলো। বসো, বসো, বসো।'

ত্রিগুণাতীত (নাকি সুরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে)—আঁর ভাই, আর পাঁরিনা। ওসব কাঁজ কি আঁমাদের পোঁষায় ভাই?...সারাদিন তীর্থির কাকের মতন বসে থাকতে হয়; না আছে একটা কাজ, না আছে কিছু। একটা job work পাওয়া গেছে, তাতে কি হবে? আট আনা বড় জোর পাওয়া যাবে। আমি প্রেস বিক্রি ক'রে ফেলার চেষ্টা করছি।

স্বামীজী—বলিস কিরে? এরই মধ্যে তোর সব শখ মিটে গেল? আর দিন-কতক দেখ, তবে ছাড়বি। এইদিকে প্রেসটা নিয়ে আয় না, কুমারটুলির কাছে আমরা সকলে দেখতে পেতুম।

ত্রিগুণাতীত—না ভাই, সেইখানেই থাক। দিনেক দুদিন দেখা যাক। ১৫-২০ টাকা লোকসান ক'রে বেচে দেব।

স্বামীজী—ও রাখাল, বলে কি? ওর যে খুব ট্রায়াল হলো দেখছি। তোর এরই মধ্যে সব গুঁড়িয়ে গেল। Patience রইল না।

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর চক্ষু ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন ও গর্জিয়া বলিলেন, 'বলিস কিরে। দে, প্রেস বিক্রি ক'রে দে। আমার টাকার ঢের দরকার আছে। এই বেলা বিক্রি কর—১০০-১৫০ টাকা লোকসান করেও বেচে ফেল।...কাজের নামটি হলেই এদের সব বৈরাগ্যি উপস্থিত হয়—আঁর ভাঁই পাঁরিনি, ওঁসব কাঁজ কি আঁমাদের? কেবল খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি উপুড় ক'রে শুয়ে থাকতে পারে। যাদের কোন কাজে patience নেই তারা কি মানুষ?...তুই তিনদিন এখনো প্রেস করিস নি। যাঃ যাঃ তোর ঢের experiment হয়েছে—তোর বড় আস্বা হয়েছিল। কে তোকে প্রেস করতে সেধেছিল? তুই-ই তো আমাকে লিখে লিখে টাকা আনালি। নিয়ে আয় না তুই তোর প্রেস এখানে, সেখানে রাখবার তোর মানে কি? এই তোর জ্বর-জ্বর হচ্ছে, তুই শরীরটা দেখছিস না?

ত্রিগুণাতীত—আট টাকা ভাড়া দিতে হবে, এক মাসের এগ্রিমেন্ট হয়েছে।

স্বামীজী—দূর-দূর, ছি-ছি! এ বলে কি? এসব লোক কি কোনো কাজ করতে পারে? আট টাকার জন্য পড়ে আছিস?' তোদের এ ছোটলোকপনা কিছুতেই যাবেনা। তুই আর হরমোহনটা সমান। তোদের কখনো কোনো business হবে না। সেও এক পয়সার আলু কিনতে পঞ্চাশ দোকানে ঘুরবে আর ঠকে মরবে।...দে প্রেস আমাদের মঠে পৌঁছে—আমাদেরও তো একটা প্রেস চাই। দেখ, কত লেকচার দিয়েছি, কত লিখেছি, তার অর্ধেকও ছাপা হলো না। তুই আমাকে work দেখাস? রাখাল, মনে কর, সে আজ কত দিনের কথা—আজ সে বার-তের বছরের কথা—সেই গঙ্গার ধারে বসে আমরা কয়জনে তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁদছি। আমি বললাম, তাঁর অস্থি গঙ্গার ধারে রাখা উচিত, গঙ্গার ধারেই মন্দির হওয়া উচিত। কারণ, তিনি গঙ্গার ধার ভালবাসতেন।...আমার কথা শুনল না। তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁকুড়গাছির বাগানেতে রাখল। আমার প্রাণে বড় ব্যথা বেজেছিল। রাখাল, মনে কর, আমি কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আজ বার বছর bull-dog-এর মতন সেই idea নিয়ে তামাম দুনিয়া ঘুরেছি, একদিনও ঘুমাইনি। আজ দেখ, তা সফল করলাম। সেই idea আমাকে একদিনও ছাড়েনি।...

ত্রিগুণাতীত—ভাই, তোমার brain-টি কেমন! তোমার brain-টি আমায় দিতে পার?
এই কথায় খুব হাসি পড়িয়া গেল, কারণ বলিবার তারিফ ছিল। পরে ত্রিগুণাতীত বলিলেন, এ জ্বরের উপর সকালে একটু সাবু খাইয়াছিলেন; এ বেলা এক সের রাবড়ি, আধ সের কচুরি ও তদুপযুক্ত তরকারি আহার করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া স্বামীজী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'শালা! তোর stomach-টা দে দেখি—দুনিয়াটার চেহারা একেবারে বদলে দিই। লাহোরে সুরজলাল বলেছিল, স্বামীজী, তোমার নানকের brain আর গুরুগোবিন্দের heart এসে গিয়েছে—কেবল জগমোহনের [খেতড়ির দেওয়ান] মতো পেটটি চাই।'"[১১]

স্বামীজীর গালাগালি শিবের আশীর্বাদ—গুরুভাইরা ও শিষ্যরা তাই মনে করতেন। এবং জানতেন যে, স্বামীজীর ইচ্ছার শেষপ্রান্ত ছোঁয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তব জীবনে তাঁরা অসম্ভবের প্রান্তরে যথাসম্ভবের ধ্বজা পুঁতেছেন। ত্রিগুণাতীতের 'উদ্বোধন'-সংক্রান্ত কার্যাবলী থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। প্রত্যক্ষদর্শী কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতিকথা এইরকম :

" 'উদ্বোধন' প্রকাশের দিন এখনো স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কি অদম্য উৎসাহ, কি মহোচ্চ আদর্শ, কি বৈদ্যুতিক প্রেরণা এবং কি অনাবিল আনন্দ কতিপয় শিক্ষিত বাঙালি যুবকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। স্বামীজী-লিখিত প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া তাঁহাদের নয়ন-সম্মুখে বাংলা তথা ভারতের এক সমুজ্জ্বল ছবি উদিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পাক্ষিক পত্রিকা, সামান্য পুঁজি, পরগৃহে অফিস ও ছোট কারখানা—তবুও ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনায় প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ...আজ মনে পড়ে 'উদ্বোধন'-এর সর্বপ্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কথা। তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাতা বলিলাম, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে, উপদেশে এবং সহায়তায় তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে 'উদ্বোধন প্রেস' এবং 'উদ্বোধন পত্রিকা'র সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব একাকী বহন করিয়াছিলেন। ...দেখিয়াছি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় কতদিন তিনি অনাহারে, অর্ধাহারে প্রেস ও পত্রিকার কার্য দেখিতেছেন। শুধু পরিদর্শকভাবে দেখাশুনা নহে, আজ কম্পোজিটর অনুপস্থিত, তাঁহাকে নিজে সন্ধান করিয়া নূতন লোক সংগ্রহ করিতে হইতেছে; কাল প্রেসম্যান অসুস্থ, কোথায় প্রেসম্যান পাওয়া যায় তাহার সন্ধানে নানা স্থানে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; কোথায় সস্তায় প্রেসের কোন্ উপকরণ পাওয়া যায়, সেই তথ্য লইবার জন্য কখনো ছুটাছুটি করিতেছেন, আবার কখনো-কখনো প্রেসে লোকজনের কাজে সাহায্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া তাঁহাকে প্রবন্ধ সংগ্রহ এবং প্রবন্ধ রচনা করিতেও হইত। ঠিক সময় পত্রিকা প্রকাশ না হইলে স্বামীজীর নিকট তিরস্কৃত হইতেন। ইহা ছাড়া ছাপাখানার কাহারও ব্যারাম হইলে তাহার চিকিৎসা ও পথ্যের আয়োজন তাঁহাকেই করিতে হইত। নানাদিকে এইসব কঠোর পরিশ্রমেও তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত—ক্লান্তির কোনো কালিমা দেখা যাইত না। বেশির ভাগ কম্পোজিটর ও প্রেসম্যান বস্তিতে বাস করিত। তিনি বিনা সঙ্কোচে বস্তির মধ্যে যাইয়া তাঁহাদের খোঁজ করিতেন। কতদিন দেখিয়াছি—শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ও ভক্ত স্বর্গীয়

মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে অপরাহ্ণকালে তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি জল পান করিতেছেন এবং তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার তখনও স্নানাহার হয় নাই। মণীন্দ্রকৃষ্ণ মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র এবং তাঁহার দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদনা তিনি নিজেই করিতেন। তাঁহার 'প্রভাকর প্রেস' নামক একটি প্রেস ছিল, সুতরাং সন্ধান লইতে সেখানে তিনি অনেক সময়ে যাইতেন। এদিকে পত্রিকায় কোনোপ্রকার ভ্রমপ্রমাদ বা প্রুফ দেখিতে ভুলত্রুটি থাকিলে কিংবা অশুদ্ধ শব্দ বা ভাবের প্রয়োগ করিলে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে বিশেষভাবে তিরস্কার সহ্য করিতে হইত। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একদিন এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। অধ্যাপক মোক্ষমূলর ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীস্বামীজীর লিখিত একটি প্রবন্ধ তখন 'উদ্বোধন'-এ সদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে স্বামী ত্রিগুণাতীত বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়াই 'উদ্বোধন'-এ তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের ভ্রমপ্রমাদের উল্লেখ করিয়া তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা রাখিলেন না। স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিলেন, 'কি রকম মূর্খ নিয়ে কাজ করতে হয় তা তো বুঝতে চাও না।' স্বামীজী বলিলেন, 'ওসব কথা রেখে দে। তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন তাতে গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করেছিস? এদেশের লোকই কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের ওপর ওজর তোলে। ওদেশে কম্পোজিটররাও বিদ্বান নয়। যারা ম্যানেজার, যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, তারা কাজটি নিখুঁত করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ নির্ভুল না হয় ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা। এদেশে দেখি—ছাপা হলেই হলো, তাতে ভুল-ত্রুটি থাকে থাকুক। একটি শব্দের এদিক-ওদিক হলে লেখার ভাব বা অর্থ একেবারেই উলটে যায়। কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয়। তোরা কাগজে যদি ভুল-ভ্রান্তি ছাপবি, তবে উন্নতিটা কি হলো বল?' স্বামী ত্রিগুণাতীত নিরুত্তর রহিলেন। প্রেস ও পত্রিকা—দুটির জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছে, বিশেষ—কম্পোজিটর প্রভৃতির সন্ধানে তাঁহাকে বস্তিতে-বস্তিতে ঘুরিতে হইতেছে শুনিয়া স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেসটি বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও জিদ করিলেন। অবশেষে প্রেস বিক্রয় করা হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তখন পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করিলেন। কখনো কখনো তিনি 'উদ্বোধন'-এর জন্য বাগবাজার পল্লীর যুবকদের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন।[১২]

প্রকাশনার উচিত রূপ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তার কিছু অংশকে প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে আদর্শ-নীতি রূপে গ্রহণ করা যায়। তবু এই কথাটা মনে না উঠে পারেনা, স্বামী ত্রিগুণাতীতের 'লাঞ্ছনা' তিনি একটু বেশিরকম করেছিলেন, বিশেষত যখন জানতেন যে, কোন্ পরিস্থিতিতে ওঁকে কাজ করতে হচ্ছিল। আরো মনে রাখব, যাঁর লাঞ্ছনা করছেন, তিনি স্বামীজীর গুরুভাই। এবং কী আশ্চর্য, উক্ত গুরুভাই স্বামীজীর বাক্যের চড়চাপড় প্রায় নীরবে সহ্য ক'রে গেলেন। কী অপরিসীম শ্রদ্ধা ও আনুগত্য নেতার প্রতি। এখানে আরেকটি আদর্শের চেহারা আমরা দেখতে পেলাম। যিনি স্বচ্ছন্দে বেপরোয়া হয়ে 'ধুত্তোরি' বলে বেরিয়ে পড়তে পারতেন—বেপরোয়া জীবনে

কাশীপুরে স্বামীজী, ১৮৮৬। ঐ সময়ে তিনি গভীর ধ্যান-তপস্যা এবং আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতায় ছিলেন, যা
চাইতেন।

কলকাতা, বোসপাড়া লেন, ১৮৯৭; বামদিক থেকে, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, শিবানন্দ, বিবেকানন্দ, তুরীয়ানন্দ। নীচে, স্বামী সদানন্দ (বিবেকানন্দ-শিষ্য)।

বরাহনগর মঠে, ১৮৮৭, স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইরা। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পরে বরাহনগরের ভাঙা বাড়িতে এঁরা প্রায় অনাহারে কোন্ কঠোর সাধনার জীবন কাটিয়েছিলেন, তার কিছু আভাস ছবিটিতে মেলে। দাঁড়িয়ে, বামদিক থেকে, স্বামী শিবানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, বিবেকানন্দ, প্রেমানন্দ (?), দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম), ত্রিগুণাতীতানন্দ, মুস্তাফি (দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের মামা)। বসে, বামদিক থেকে, নিরঞ্জনানন্দ, সারদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ (মতান্তরে হুটকো গোপাল), অভেদানন্দ।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ, মাদ্রাজ ১৮৯৩। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের অগণিত সাধু-সন্ন্যাসী ভারতের পথে পথে পরিব্রাজক। তার শেষ শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বিবেকানন্দ, তিনিই প্রথম ক্যামেরায় ধরা পড়েছেন। 'দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী' এই সন্ন্যাসী [illegible]দের প্রতীক রূপে এক প্রবন্ধে আলোচিত।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দের আর একটি ছবি। সম্ভবত জয়পুর ১৮৯১, মতান্তরে সম্ভবত বেলগাঁও-এ তোলা, অক্টোবর ১৮৯২।

১৮৯৩ সেপ্টেম্বর শিকাগো। স্বামীজীর বিখ্যাত বীরমূর্তি। আমেরিকায় বহুল প্রচারিত পোস্টার। একটি প্রবন্ধে আলোচিত।

স্বামীজীর ধ্যানমূর্তি, লন্ডন ১৮৯৬। বুদ্ধের পরেই বিবেকানন্দের ধ্যানমূর্তি ভারতে শ্রেষ্ঠ। এক প্রবন্ধে আলোচিত।
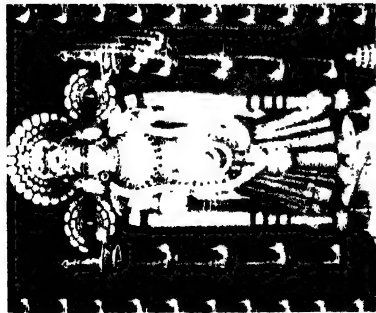
কন্যাকুমারিকার সমুদ্রগর্ভে শিলাখণ্ড, বিবেকানন্দ-মন্দির স্থাপনের পূর্বে গৃহীত চিত্র। এই শিলার উপর স্বামীজীর দীর্ঘ গভীর ধ্যান, বিষয়—ভারতবর্ষ, তার অতীত ও বর্তমান। এই ধ্যান স্বামীজীর জীবনে ক্রান্তিকারী সিদ্ধান্তের কারণ হয়। ক্রিসমাস সপ্তাহ, ১৮৯২। ইনসেট: দেবী কন্যাকুমারী

কলকাতা বীডন স্ট্রীটে ক্লাসিক থিয়েটারে ২২ এপ্রিল ১৮৯৯, বক্তৃতারত স্বামীজী। বিষয়, প্লেগ-সেবা।

র‍্যাডিক্যাল সমাজতন্ত্রী ফরাসি-আমেরিকান মেরী লুইস স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাস নেন, নাম হয় অভয়ানন্দ। জীবনকালে ভারতে বেদান্ত প্রচারে আসেন। কলকাতার মেট্রোপলিটান কলেজ-হলে বক্তৃতারত।

তো তিনি অভ্যস্ত, মোটামুটি সুখের জীবন তাঁর জন্য সাজানো ছিল—সেই তিনি সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়ার জীবন বেছে নিয়েছিলেন! একমাত্র সান্ত্বনা, তৎসহ গৌরব এইখানে—তিনি ভূতের কিল খাচ্ছিলেন না—তা স্বয়ং ভূতনাথের কিল!!

অধিকন্তু, স্বামীজী এদেশে ইদানীং প্রচলিত একটি জীবননীতির বিপরীত কাজটি করছিলেন। প্রচলিত রীতি হলো—কোনো ব্যক্তির সামনে যৎপরোনাস্তি তার প্রশংসা করো, আর আড়ালে তাকে নরকে পাঠাও। অপরপক্ষে স্বামীজী সামনে যার সমালোচনা করতেন, অন্তরালে অনুরাগে শ্রদ্ধায় তারই অর্চনা করতেন যদি যে যোগ্যপাত্র হয়।

'উদ্বোধন' প্রকাশিত হওয়ার পর 'শিষ্য' শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মঠে গেছেন এবং প্রকাশিত প্রথম সংখ্যাটির প্রশংসা করছেন। বলছেন : "স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।" সেকথা শুনে স্বামীজী সানন্দে ও সগৌরবে বলেছিলেন :

> "তুই বুঝি মনে করছিস, ঠাকুরের এইসব সন্ন্যাসী-সন্তানেরা কেবল গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে জন্মেছে? এদের যে যখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক হবে। এদের কাছে কাজ কি ক'রে করতে হয় শেখ। এই দেখ, আমার আদেশ পালন করতে ত্রিগুণাতীত সাধনভজন ধ্যানধারণা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কাজে নেমেছে। একি কম sacrifice-এর কথা! আমার প্রতি কতটা ভালবাসা থেকে এ কর্মপ্রবৃত্তি এসেছে বল দেখি! Success ক'রে তবে ছাড়বে!!"[১৩]

॥ আট ॥

অন্যান্য শক্তিতে 'উদ্বোধন' যতই বলীয়ান হোক, প্রথম পর্বে একটি কঠিন ব্যাধি ছিল—অর্থকৃচ্ছ্রতা। অর্থাভাবে পত্রিকা চালানো দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে রসদদার স্বামীজীর কাছে আবেদনপত্র নিয়ে প্রায়ই উপস্থিত হতেন। চটে গিয়ে স্বামীজী ১০ অগস্ট ১৮৯৯ লন্ডন থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন:

> "সারদা বলে, কাগজ চলে না।... আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত খুব advertise ক'রে (বিজ্ঞাপন দিয়ে) ছাপাক দিকি—গড়গড় ক'রে subscriber (গ্রাহক) হবে। খালি ভটচায্যিগিরি তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে?"
>
> "যাহোক, কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে, মনে জেনো যে, আমি গেছি।... 'টাকাকড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত দাদার ভরসা' হইলেই সর্বনাশ আর কি! কাগজটার পর্যন্ত টাকা আমি আনব, আবার লেখাও আমার সব—তোমরা কি করবে?... একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা প্রচার করবার কেউ নেই,... এক লাইন লিখবার... ক্ষমতা কারুর নেই—সব খামকা মহাপুরুষ।"

উদ্ধৃত চিঠিতে স্বামীজী কিন্তু 'উদ্বোধন'-এর সংকট অবস্থার জন্য কেবল ত্রিগুণাতীতকে

দায়ী করেন নি—পত্রিকাটিকে সংঘের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা ক'রে সমষ্টিগত দায়িত্বের কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

এখন দেখে নেওয়া যেতে পারে, প্রচারের ব্যাপারে ত্রিগুণাতীত কী করেছিলেন। একেবারে প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রে পত্রিকাটিতে প্রকাশযোগ্য বিষয়ের যে-তালিকা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে এমনকি 'রাজনীতি' পর্যন্ত ছিল। সেখানে লেখকদের মধ্যে একমাত্র স্বামীজীর নাম ছাপা হয়েছিল—এবং রীতিমত বড় অক্ষরে। (চতুর্থ বর্ষের দশম সংখ্যা থেকে করা হয়—"প্রধান লেখক—শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ"।)

এইবার কয়েকটি বিজ্ঞাপন সরাসরি উদ্ধৃত করব—ইতিহাসমনস্ক পাঠকদের কাছে আকর্ষক মনে হবে, এই বিবেচনায়।

'উদ্বোধন'-এর দ্বিতীয় বর্ষের সূচনায় এই বিজ্ঞপ্তি ছিল :

উদ্বোধন

যাহার মাহাত্ম্যে আজ ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি জড়বাদিদেশ-সমুদয় পর্যন্তও মুগ্ধ, সেই মহত্তোমহীয়ান সনাতন হিন্দু ধর্মের বহুল প্রচার করাই উদ্বোধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। উদ্বোধনের দ্বারা বঙ্গীয় ধর্ম-সাহিত্য ও সমাজে যে কতদূর উপকার সাধিত হইতেছে তাহা দুই এক কথায় বলিয়া শেষ করিবার নহে, কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র পৃথক হ্যান্ডবিলে দেখিতে আজ্ঞা হয়। আশা করি, হৃদয়বান গ্রাহক-মহোদয়গণ এবং অপরাপর বন্ধুবর্গ, এই মহৎকার্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কোন মতে ত্রুটি করিবেন না। নিজ নিজ আত্মীয় বন্ধুবর্গকে উদ্বোধনের গ্রাহক হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে, এই মহাপুণ্য-কর্মে যার-পর-নাই সাহায্য করা হইবে, এবং তাহাতে আমাদিগের দেশ যথেষ্ট উপকৃত হইবে, ও আমরাও পরম বাধিত হইব। আমাদিগকে উৎসাহপ্রদানার্থ যদ্যপি কোন মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক নূতন ৫টি গ্রাহক করিয়া দেন তাঁহার সম্মানার্থ উপহার স্বরূপে—বর্তমান বর্ষের সমগ্র উদ্বোধন কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার হস্তে অর্পণ করিব; এবং তিনি ইচ্ছা করিলে, উদ্বোধনের অবৈতনিক 'এজেন্ট'-এরও পদ গ্রহণ করিতে পারেন।

দ্বিতীয় বর্ষের নূতন ও পুরাতন গ্রাহকগণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আগামী জন্মোৎসবের মধ্যে, রাজযোগ লইতে ইচ্ছা করিলে, এক টাকা দশ আনা স্থলে আট আনায় পাইবেন; ডাকমাশুলাদি দুই আনা ও ভিপি খরচ দুই আনা পৃথক।

প্রথম বর্ষের উদ্বোধন দুই টাকা; কাপড়ে হাফ বাঁধাই দুই টাকা চার আনা; ডাকমাশুলাদি চার আনা, ভিপি দুই আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের 'বিলাতযাত্রীর পত্র' (পরে 'পরিব্রাজক') সম্বন্ধে দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন :

স্বামী বিবেকানন্দ ইহার প্রতি সংখ্যায় তাঁহার নিজের 'বিলাত যাত্রা' অতি সরল চলিত বাংলায় লিখিতেছেন। ভাষার মাধুর্য ও সারল্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইবেন

এবং ইহাতে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য জ্ঞাতব্য বিষয় পাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

একই বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল :

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ, নানাবিধ ভাল ভাল প্রবন্ধ, গীতাশাঙ্কর ভাষ্যানুবাদ সমূল সটীক, বেদান্তরামানুজ-ভাষ্যানুবাদ সমূল, পাণিনীয় মহাভাষ্যানুবাদ সমূল বাহির হইতেছে। এই সকল অমূল্য গ্রন্থ উদ্বোধন হইতে খুলিয়া পৃথক বাঁধাইবার সুবিধা আছে।

স্বামী ত্রিগুণাতীত 'উদ্বোধন'-এর প্রচারে ত্রুটি করেন নি। নানা জায়গায় হ্যান্ডবিল পাঠিয়েছিলেন, সেইসঙ্গে অনুরাগিবৃন্দের কাছে অনুরোধ-পত্রও। ঢাকা-নিবাসী যতীন্দ্রচন্দ্র দাসকে ১৯ পৌষ ১৩০৫ তারিখের পত্রে লিখেছিলেন :

"যতীন্দ্রবাবু... আগামী ১লা মাঘ হইতে কাগজ বাহির হইবে। ছাপা হইয়া গিয়াছে। আগামী সংখ্যাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি আছে :

১। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা';
২। স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত 'রাজযোগের' ইংরেজী হইতে শুদ্ধানন্দ কর্তৃক অনুবাদ;
৩। মুকুন্দমালাস্তোত্র—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক অনুবাদিত;
৪। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের উপদেশ;
৫। স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক বক্তৃতা;
৬। বিবিধ

আপনি যথার্থই নিঃস্বার্থ কার্য—হিন্দুধর্মের জন্য করিতেছেন; নচেৎ 'উদ্বোধনের জন্য এত পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। ঢাকার যাবতীয় কলেজ, স্কুল ও আফিসে এবং স্টেশনে হ্যান্ডবিল বিতরণ করাইবেন। তাহার দরুন পৃথক হ্যান্ডবিল অদ্য পাঠাইলাম।

ইতি—ত্রিগুণাতীত।"

ত্রিগুণাতীত ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ তারিখে একই ব্যক্তিকে লেখেন :

My dear Jatin Babu,

অদ্য ডাকে এক হাজার হ্যান্ডবিল আপনাকে পাঠাইয়াছি। প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন। আপনাকে পদে পদে কষ্ট দিতেছি, [কিছু] মনে করিবেন না। আপনাদিগের দ্বারাই পূর্ববঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ প্রচারকার্য হওয়া সম্ভব এবং হইতেছেও। আপনার ন্যায় উদ্যোগী ও পরিশ্রমী লোক যদি আমরা সব জেলায় পাইতাম তো আমাদের আজ ভাবনা কি ছিল। যাহা হউক, ঢাকায় প্রত্যেক হিন্দুর বাটীতে এক-একখানি হ্যান্ডবিল দিয়া 'উদ্বোধনে'র গ্রাহক হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিবেন। হ্যান্ডবিলে কি আছে তাহা সকলকেই খুব

দায়ী করেন নি—পত্রিকাটিকে সংঘের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা ক'রে সমষ্টিগত দায়িত্বের কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

এখন দেখে নেওয়া যেতে পারে, প্রচারের ব্যাপারে ত্রিগুণাতীত কী করেছিলেন। একেবারে প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রে পত্রিকাটিতে প্রকাশযোগ্য বিষয়ের যে-তালিকা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে এমনকি 'রাজনীতি' পর্যন্ত ছিল। সেখানে লেখকদের মধ্যে একমাত্র স্বামীজীর নাম ছাপা হয়েছিল—এবং রীতিমত বড় অক্ষরে। (চতুর্থ বর্ষের দশম সংখ্যা থেকে করা হয়—"প্রধান লেখক—শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ"।)

এইবার কয়েকটি বিজ্ঞাপন সরাসরি উদ্ধৃত করব—ইতিহাসমনস্ক পাঠকদের কাছে আকর্ষক মনে হবে, এই বিবেচনায়।

'উদ্বোধন'-এর দ্বিতীয় বর্ষের সূচনায় এই বিজ্ঞপ্তি ছিল :

উদ্বোধন

যাহার মাহাত্ম্যে আজ ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি জড়বাদিদেশ-সমুদয় পর্যন্তও মুগ্ধ, সেই মহতোমহীয়ান সনাতন হিন্দু ধর্মের বহুল প্রচার করাই উদ্বোধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। উদ্বোধনের দ্বারা বঙ্গীয় ধর্ম-সাহিত্য ও সমাজে যে কতদূর উপকার সাধিত হইতেছে তাহা দুই এক কথায় বলিয়া শেষ করিবার নহে, কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র পৃথক হ্যান্ডবিলে দেখিতে আজ্ঞা হয়। আশা করি, হৃদয়বান গ্রাহক-মহোদয়গণ এবং অপরাপর বন্ধুবর্গ, এই মহৎকার্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কোন মতে ক্রুটি করিবেন না। নিজ নিজ আত্মীয় বন্ধুবর্গকে উদ্বোধনের গ্রাহক হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে, এই মহাপুণ্য-কর্মে যার-পর-নাই সাহায্য করা হইবে, এবং তাহাতে আমাদিগের দেশ যথেষ্ট উপকৃত হইবে, ও আমরাও পরম বাধিত হইব। আমাদিগকে উৎসাহপ্রদানার্থ যদ্যপি কোন মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক নূতন ৫টি গ্রাহক করিয়া দেন তাঁহার সম্মানার্থ উপহার স্বরূপে—বর্তমান বর্ষের সমগ্র উদ্বোধন কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার হস্তে অর্পণ করিব; এবং তিনি ইচ্ছা করিলে, উদ্বোধনের অবৈতনিক 'এজেন্ট'-এরও পদ গ্রহণ করিতে পারেন।

দ্বিতীয় বর্ষের নূতন ও পুরাতন গ্রাহকগণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আগামী জন্মোৎসবের মধ্যে, রাজযোগ লইতে ইচ্ছা করিলে, এক টাকা দশ আনা স্থলে আট আনায় পাইবেন; ডাকমাশুলাদি দুই আনা ও ভিপি খরচ দুই আনা পৃথক।

প্রথম বর্ষের উদ্বোধন দুই টাকা; কাপড়ে হাফ বাঁধাই দুই টাকা চার আনা; ডাকমাশুলাদি চার আনা, ভিপি দুই আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের 'বিলাতযাত্রীর পত্র' (পরে 'পরিব্রাজক') সম্বন্ধে দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন :

স্বামী বিবেকানন্দ ইহার প্রতি সংখ্যায় তাঁহার নিজের 'বিলাত যাত্রা' অতি সরল চলিত বাংলায় লিখিতেছেন। ভাষার মাধুর্য ও সারল্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইবেন

এবং ইহাতে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য জ্ঞাতব্য বিষয় পাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

একই বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল :

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ, নানাবিধ ভাল ভাল প্রবন্ধ, গীতাশাঙ্কর ভাষ্যানুবাদ সমূল সটীক, বেদান্তরামানুজ-ভাষ্যানুবাদ সমূল, পাণিনীয় মহাভাষ্যানুবাদ সমূল বাহির হইতেছে। এই সকল অমূল্য গ্রন্থ উদ্বোধন হইতে খুলিয়া পৃথক বাঁধাইবার সুবিধা আছে।

স্বামী ত্রিগুণাতীত 'উদ্বোধন'-এর প্রচারে ত্রুটি করেন নি। নানা জায়গায় হ্যান্ডবিল পাঠিয়েছিলেন, সেইসঙ্গে অনুরাগিবৃন্দের কাছে অনুরোধ-পত্রও। ঢাকা-নিবাসী যতীন্দ্রচন্দ্র দাসকে ১৯ পৌষ ১৩০৫ তারিখের পত্রে লিখেছিলেন :

"যতীন্দ্রবাবু... আগামী ১লা মাঘ হইতে কাগজ বাহির হইবে। ছাপা হইয়া গিয়াছে। আগামী সংখ্যাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি আছে :

১। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা';
২। স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত 'রাজযোগের' ইংরেজী হইতে শুদ্ধানন্দ কর্তৃক অনুবাদ;
৩। মুকুন্দমালাস্তোত্র—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক অনুবাদিত;
৪। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের উপদেশ;
৫। স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক বক্তৃতা;
৬। বিবিধ

আপনি যথার্থই নিঃস্বার্থ কার্য—হিন্দুধর্মের জন্য করিতেছেন; নচেৎ 'উদ্বোধনের' জন্য এত পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। ঢাকার যাবতীয় কলেজ, স্কুল ও আফিসে এবং স্টেশনে হ্যান্ডবিল বিতরণ করাইবেন। তাহার দরুন পৃথক হ্যান্ডবিল অদ্য পাঠাইলাম।

ইতি—ত্রিগুণাতীত।"

ত্রিগুণাতীত ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ তারিখে একই ব্যক্তিকে লেখেন :

My dear Jatin Babu,

অদ্য ডাকে এক হাজার হ্যান্ডবিল আপনাকে পাঠাইয়াছি। প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন। আপনাকে পদে পদে কষ্ট দিতেছি, [কিছু] মনে করিবেন না। আপনাদিগের দ্বারাই পূর্ববঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ প্রচারকার্য হওয়া সম্ভব এবং হইতেছেও। আপনার ন্যায় উদ্যোগী ও পরিশ্রমী লোক যদি আমরা সব জেলায় পাইতাম তো আমাদের আজ ভাবনা কি ছিল। যাহা হউক, ঢাকায় প্রত্যেক হিন্দুর বাটীতে এক-একখানি হ্যান্ডবিল দিয়া 'উদ্বোধনে'র গ্রাহক হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিবেন। হ্যান্ডবিলে কি আছে তাহা সকলকেই খুব

ভালরূপ বুঝাইয়া দিবেন, নচেৎ কেহ হ্যান্ডবিল বুঝিতে পারিবে না। রীতিমতো লেকচার দেওয়ার মতো হ্যান্ডবিলে কি কি বিষয় আছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন। আমাদের ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানিবেন।

ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী ত্রিগুণাতীত"[১৪]

দুঃখের বিষয়, 'উদ্বোধন'-এর জন্য প্রথম প্রচারিত ওই হ্যান্ডবিলের বিষয়বস্তু পেয়েছি কিন্তু মূল হ্যান্ডবিলটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

'উদ্বোধন' কিছুটা পায়ে দাঁড়াবার পরে বিস্তৃতভাবে নিয়মাবলী প্রকাশ করা হয়েছিল। তৃতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় (১৫ বৈশাখ ১৩০৮) দেখতে পাচ্ছি, দুই পৃষ্ঠাব্যাপী তেরটি নিয়ম মুদ্রিত। নিয়মাবলী থেকে পত্রিকার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তথ্য মেলে। যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে নিয়মগুলি জানালেও ভিতরে ছিল নিজ নীতি সম্বন্ধে শান্ত দৃঢ়তা। ঐসকল নিয়মের কয়েকটি উপস্থিত করছি :

২। উদ্বোধনের নববর্ষ প্রতিবৎসরের বাঙলা ১লা মাঘে আরম্ভ হয়। বৎসরের অন্য সময়ে গ্রাহক হইলেও এই ১লা মাঘ হইতেই কাগজ লইতে হইবে।

৬। 'উদ্বোধন পাক্ষিক-পত্র'। ইহার অর্থ সর্ব সাধারণে অনুগ্রহপূর্বক যেন এইরূপ বুঝেন যে, ইহা প্রতি বাঙলামাসে দুইখান বাহির হয় মাত্র; যদিচ ইহাতে মাসের ১লা বা ১৫ই তারিখ লেখা থাকে, তত্রাচ বাহির হইবার কোন নির্দিষ্ট তারিখের প্রত্যাশা যেন কেহ না করেন। ঠিক ঠিক সময়ে যাহাতে পত্রিকা বাহির হয় তাহার চেষ্টা আমরা যৎপরোনাস্তি করিয়া থাকি; যদি কোন অভাবনীয় বা অনিবার্য কারণবশত কৃতকার্য না হই, আমাদের অপরাধ যেন কেহ গ্রহণ না করেন।

৭। বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়েই হউক এক মাস উদ্বোধন বন্ধ থাকিবে। এইরূপ ছুটি লইবার পূর্বে বা পরে গ্রাহক মহাশয়দিগের জ্ঞাপনার্থে উদ্বোধনের একস্থানে ছুটির সংবাদ ছাপাইয়া দিব।

৮। পোস্ট আফিসের দোষে মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণ কাগজ না পাইলে আমরা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি-পূরণ করিতে বাধ্য হইব না। কেননা আমরা 'ইন্সিওরান্স ফি' লই না, কেবলমাত্র ডাক-খরচা লই। কাগজ আমাদের সম্মুখে প্যাক করান হয়; আমরা স্বয়ং গ্রাহক বহি ধরিয়া প্রত্যেকের নামের সহিত চেক করিয়া দিই; এবং আমাদের অতি বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা অতি সাবধানতার সহিত পোস্ট করান হয়; ইহাতেও কাগজ না পৌঁছিলে আমরা কোন মতে সম্পূর্ণ দায়ী হইব না। এরূপ স্থলে উদ্বোধন না পাইলে গ্রাহক মহাশয়গণকে আমাদের নিকট হইতে উহা পৃথক ক্রয় করিয়া লইতে হইবে; তবে, অর্ধ মূল্যে (অর্থাৎ প্রতিসংখ্যা এক আনা মূল্যে) দিব স্বীকৃত রহিলাম। এই মূল্য কিন্তু অগ্রিম না পাইলে, ঐরূপ নষ্ট বা অপ্রাপ্ত কাগজ পাঠাইতে বাধ্য হইব না।

১২। উদ্বোধন পাক্ষিক-পত্র হইলেও ইহার কাপীরাইট রিসার্ভ করা। ইহাতে যে-সকল প্রবন্ধ বাহির হইবে, সে-সকল আর কেহ উদ্বোধন স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের বিনা অনুমতিতে অনুবাদ করিতে, উদ্ধৃত করিতে, ছাপাইতে, বা প্রকাশ করিতে পারিবেন না। যদি কেহ করেন তো আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৩। আমাদের বিশেষ নির্দিষ্ট লেখকগণের প্রবন্ধ ব্যতীত অপর কাহারও প্রবন্ধ উদ্বোধনে প্রকাশ করা হয় না।

'উদ্বোধন-কার্য্যাধ্যক্ষ' কর্তৃক ১৫. ১. ১৩০৮ তারিখে প্রচারিত এই নিয়মাবলীর একটিতে পোস্ট অফিসের গাফিলতিতে 'উদ্বোধন' না পাওয়ার বিষয়টি পর্যালোচিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, পোস্ট অফিসের গাফিলতির রোগটি পুরনো এবং দুশ্চিকিৎস্য।

বিশেষ লক্ষণীয় ১২ সংখ্যক নিয়মটি। সাময়িক পত্রিকার লেখা এদেশে সাধারণত কপিরাইটের অধীন করা হতো না (এখনো তা করা হয়না), বিশেষত যখন লেখকদের দক্ষিণা দেওয়ার রীতি প্রায় ছিলনা। এক্ষেত্রে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত রচনাদি বিষয়ে কপিরাইটের অত কড়াকড়ি করার কারণ কি? সঠিক উত্তর জানিনা, তবে অনুমান করতে পারি। 'উদ্বোধন'-এর প্রধান সম্পদ স্বামী বিবেকানন্দের রচনা। সেই রচনা যদি বড় অংশে অন্য পত্রিকায় সংকলিত হতে থাকে তাহলে 'উদ্বোধন'-এর বিক্রয় মার খেতে বাধ্য। স্বামীজীর রচনা, তাহলে তো পাঠকরা কিছু সময় অপেক্ষা ক'রে, অন্য পত্রিকা থেকে পড়ে নিতেই পারেন। ইংরেজী পত্রিকাদিতে স্বামীজীর রচনার অনুবাদও প্রকাশিত হচ্ছিল—যাতে রামকৃষ্ণ সংঘের প্রকাশনার ক্ষতি। তাছাড়া স্বামীজীর রচনা প্রসঙ্গ-বিচ্যুত ক'রে উদ্ধৃত করা হচ্ছিল, কটু সমালোচনা করার প্রয়োজনে। সেজন্যও সাবধানতার প্রয়োজন ছিল। এই বিষয়টি 'উদ্বোধন'-কর্তৃপক্ষের কাছে এমনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, ১২ নং নিয়মটি 'উদ্বোধন'-এর তৃতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় (১ আষাঢ় ১৩০৮) বড় অক্ষরে আলাদা করে ছাপা হয়।

উদ্বোধনের

বিশেষ বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উদ্বোধনের কোন প্রবন্ধ বা তদংশ, উদ্বোধনের স্বত্বাধিকারীর বিনা অনুমতিতে কোন সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র বা অন্য কেহ যদ্যপি উদ্ধৃত, অনুবাদিত বা প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে তিনি আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন। উদ্বোধনের কাপীরাইট সর্বতোভাবে রিসার্ভ করা। ইতি

উদ্বোধন-স্বত্বাধিকারী।

'উদ্বোধন'-এর যথাকালে প্রকাশিত না হওয়ার একটি কারণ—মহামারী। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ তারিখে 'উদ্বোধন'-এর এই মর্মে একটি 'বিশেষ বিজ্ঞাপন' বেরিয়েছিল :

কলিকাতায় প্লেগের দরুন ছাপাখানার কম্পোজিটর প্রেসম্যান প্রভৃতি পাওয়া বড়ই দুষ্কর হইয়াছে; প্রায় সকলেই দেশে পলায়ন করিয়াছে, আজও প্রত্যাগমন করে নাই। আমরা সেই জন্য বর্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ মাহার দুই সংখ্যা উদ্বোধন বাহির না করিয়া, যাহাতে একেবারে আগামী আষাঢ় মাস হইতে, পুর্বেকার মতো অতি নিয়মিতরূপে ইহা প্রকাশিত হয় এমত বন্দোবস্ত করিতেছি। একমাস উদ্বোধন বন্ধ থাকিলে, গ্রাহক মহাশয়গণ এই বৎসরে সর্বসমেত ২২ খান উদ্বোধন পাইবেন। ইহাতে যেন তাঁহারা

অসন্তুষ্ট না হন; কেননা—আবশ্যক বোধ হইলে, উদ্বোধনের নিয়মাবলীর ৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে, বৎসরের মধ্যে আমরা উর্ধ্ব সংখ্যা এক মাস পর্যন্ত ছুটি লইতে পারি। ১ম বর্ষ উদ্বোধনের ২১শ, ২২শ, ২৩শ, ও ২৪শ সংখ্যায়, এবং বর্তমান বর্ষ উদ্বোধনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় 'উদ্বোধনের নিয়মাবলী' দেখুন। ইতি

ম্যানেজার
উদ্বোধন-কার্য্যালয়।

॥ নয় ॥

১৯৬৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকীর সময়ে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে স্বামীজীর রচনাবলী মূল ও অনুবাদসহ দশ খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' নামে প্রকাশিত ঐ রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন'-এ (পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী, ১৩৬৯; জানুয়ারি ১৯৬৩) প্রকাশক জানান :

"স্বামীজীর নির্দেশে গুরুসেবার অঙ্গরূপে স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা ও পত্রাবলীর বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। স্বামীজী কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া এগুলি ধারাবাহিকভাবে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়; পরে স্বামীজীর গুরুভ্রাতা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী সারদানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় সেগুলি বিভিন্ন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং এখনও হইতেছে।"

'বাণী ও রচনা'য় প্রভূত পরিমাণে অনূদিত রচনা গৃহীত হয়েছে। তার বড় অংশ স্বামী শুদ্ধানন্দ-কৃত। তিনিই বাঙলায় স্বামীজীর রচনার প্রথম অনুবাদক। বহুল প্রচারের ফলে অনেকের ধারণা সেগুলি স্বামী বিবেকানন্দের মূল রচনা।

'উদ্বোধন'-সূত্রে আমাদের পক্ষে লক্ষ্য করবার বিষয়—স্বামীজীর রচনাবলীর এই বিখ্যাত অনুবাদক ঠিক কোন্ কোন্ রচনা অনুবাদ ক'রে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করেছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত-সম্পাদিত 'উদ্বোধন' আমাদের আলোচনার বিষয় বলে সেই পর্বের মধ্যে প্রাপ্ত এই বিষয়ক কিছু তথ্য নিবেদন করব।

স্বামী শুদ্ধানন্দের 'স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি'র মধ্যে পাই—১৮৯৭ সালে স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে, ই টি স্টার্ডি-প্রকাশিত স্বামীজীর জ্ঞানযোগ সম্বন্ধীয় বক্তৃতাবলী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে মঠে আসছিল; সকলে সেসব পড়ে মোহিত, কিন্তু বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল ইংরেজী জানতেন না বলে তাঁকে পুস্তিকাগুলির বিষয়বস্তু বাঙলায় অনুবাদ ক'রে স্বামী শুদ্ধানন্দ শোনাতেন। এই অনুবাদ শুদ্ধানন্দ লিখিতভাবে করেছিলেন, নাকি মুখে-মুখে করেছিলেন তা তাঁর লেখা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়না। পরে কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দের অনুরোধে আরো কয়েকজনের সঙ্গে স্বামী শুদ্ধানন্দ কোনো একটি বা একাধিক পুস্তিকার অনুবাদ শুরু করেন। স্বামী প্রেমানন্দ ঐসব অনুবাদের কথা স্বামীজীকে জানান। স্বামীজী কিছু কিছু অনুবাদ শোনেন ও প্রয়োজনমত সংশোধনী মন্তব্য করেন। "একদিন স্বামীজীর কাছে কেবল আমিই [স্বামী শুদ্ধানন্দ] রহিয়াছি। তিনি হঠাৎ আমায় বলিলেন: 'রাজযোগটা তর্জমা কর না।' আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্বামীজী কেন করিলেন?... যাহা

হউক, স্বামীজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা প্রভৃতি কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।"

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থে সংকলিত স্বামী বিরজানন্দের উক্তির মধ্যে পাই—স্বামী ত্রিগুণাতীত আমেরিকা যাওয়ার পরেও স্বামী শুদ্ধানন্দ "স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা ও রচনাবলীর চমৎকার বঙ্গানুবাদ" ক'রে গেছেন এবং সেসব বেরিয়েছে 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় ও স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে।

এই ধরনের কথা অন্যান্য স্মৃতিকথাতেও থাকতে পারে, কিন্তু 'রাজযোগ' ভিন্ন স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর আর কোন্-কোন্ রচনা অনুবাদ করেছিলেন, তাদের বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য প্রকাশিত রচনাদিতে নেই, বা আমি তাদের সন্ধান পাইনি। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ—কে অনুবাদ করেছিলেন?

সুখের বিষয়, ত্রিগুণাতীতের সম্পাদনাকালে 'উদ্বোধন' পত্রিকার অন্তর্গত বিজ্ঞপ্তিতে এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনে কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ মিলেছে।

'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় রাজযোগের অনুবাদ কিয়দংশে প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকারূপে নিম্নের অংশ বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে সম্পাদক-কর্তৃক লিখিত হয়েছিল :

> আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ, রাজযোগ সম্বন্ধে কতিপয় ইংরেজী বক্তৃতা দেন; এবং পাতঞ্জল যোগসূত্রের ইংরেজী ভাষ্য করেন। সেই বক্তৃতাগুলি ও ইংরেজী ভাষ্য,, একত্রে সঙ্কলন করিয়া পুস্তকাকারে, ইংলন্ডস্থ লংম্যান কোম্পানীরা বাহির করেন। পুস্তকের নাম দেওয়া হয়—রাজযোগ। ইংলন্ডে ও আমেরিকায় রাজযোগের অনেক সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। ইউরোপের যাবতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ স্বামী বিবেকানন্দকৃত রাজযোগের বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। কলিকাতাতে নিউম্যান ও থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানীরা যতবারই বিলাত হইতে উক্ত রাজযোগ আনয়ন করিয়াছেন, ততবারই দিনকতকের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ মহোদয়ের আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ, অতি সুন্দর বাঙলা ভাষায় রাজযোগ অনুবাদ করিয়াছেন। পাঠক মহাশয়গণের তৃপ্তিসাধনের জন্য, সেই অনুবাদিত রাজযোগের ১ম অধ্যায় হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে উদ্বোধনের প্রবন্ধ স্বরূপে দিলাম। রাজযোগের বিজ্ঞাপন উদ্বোধনের কভারে (মলাটের উপর) দেওয়া গেল, তাহা পাঠ করিলে এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় জ্ঞাত হইবেন।

'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে—

প্রাণায়াম

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত রাজযোগের অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত ইংরাজী 'রাজযোগ'-এর শুদ্ধানন্দ-কৃত বঙ্গানুবাদ বঙ্গীয় পাঠকগণের তৃপ্তির জন্য ১ম সংখ্যায় কিয়দংশ দিয়াছিলাম। এই রাজযোগ স্বামীজীর গভীর সাধনা এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তির ফল-স্বরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রীয় তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞান-সাহায্যে কেমন সহজে বুঝান যায়, ইহা স্বামীজীর

রাজযোগ পাঠে অবগত হওয়া যায়। আমরা এ সংখ্যায়ও উহার কিয়দংশ দিলাম। ইহাতে অনেকে সাধন-বিষয়ে নূতন আলোক পাইবেন, ও রাজযোগ যে কি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে, তাহার আভাস পাইবেন।

রাজযোগ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরে বইটির বিজ্ঞাপন উদ্বোধনের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় :

রাজযোগ

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত; শুদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদিত। স্বামী বিবেকানন্দ ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া মুক্তিতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব, অলৌকিক চিকিৎসাপ্রণালী, অলৌকিক শক্তি, দেহতত্ত্ব, ষট্‌চক্রভেদ, কুণ্ডলিনীর জাগরণ, বিশ্বাস, পূজা-পাঠাদি নানাবিধ বিষয় প্রাঞ্জল ও বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে সাধকের গভীর সাধনা, পণ্ডিতের অগাধ পাণ্ডিত্য, যুক্তিবাদীর প্রবল যুক্তির একত্র সমাবেশ। মূল্য এক টাকা দশ আনা; কাপড়ে বাঁধাই দুই টাকা।
ঠিকানা—১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কম্বুলেটোলা, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যার গোড়ায় বিজ্ঞাপনের মধ্যে ভক্তিযোগের বিজ্ঞাপন ছিল। অনুবাদক স্বামী শুদ্ধানন্দ।
ভক্তিযোগের বিজ্ঞাপন এই :

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত।

ভক্তিযোগ

মূল ইংরেজী হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক অতিসুন্দর বঙ্গানুবাদিত। এক্ষণে যন্ত্রস্থ। মূল্য এক টাকা; ডাঃ মাঃ দুই আনা। আগামী মাহার মধ্যেই অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে অর্ধমূল্যে পাইবেন (ডাকটিকিট পাঠাইলে হইতে পারে)।

এই গ্রন্থে কি কি বিষয় আছে দেখুন:—

ভক্তির লক্ষণ।	বৈরাগ্য।
ঈশ্বরের স্বরূপ।	প্রেমই বৈরাগ্যের প্রসূতি।
প্রত্যক্ষ ঈশ্বর সাক্ষাৎ।	ভক্তিযোগ স্বাভাবিক।
গুরুর আবশ্যকতা।	ভক্তির অভ্যন্তর রহস্য।
গুরু শিষ্যের লক্ষণ।	ভক্তির বিভিন্নরূপ।
অবতার তত্ত্ব।	সর্ব্বভূতে প্রেম।
মন্ত্রতত্ত্ব।	জ্ঞান ও ভক্তি এক।
প্রতিমা রহস্য।	প্রেমভক্তির বিবিধরূপ।
ইষ্ট দেবতা।	পঞ্চবিধ ভাব।
ভক্তির সাধন।	শান্ত, দাস্য, সখ্য ও মধুর।

—প্রভৃতি বিবিধ বিষয়, স্বামী বিবেকানন্দ এই গ্রন্থে, প্রবল পাশ্চাত্য যুক্তি এবং অতি বিচক্ষণতার সহিত বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে

জ্ঞানীর ভক্তকে এবং ভক্তের জ্ঞানীকে আপনার বলিয়া বোধ হইবে। নিরাকার-বাদী সাকারবাদীকে এবং সাকার-বাদী নিরাকারবাদীকে ভাল বাসিবেন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের বিবাদ ভঞ্জন হইবে। অনেকে সাময়িক উত্তেজনাকেই চরম ভক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন; পক্ষান্তরে, অনেক জ্ঞানাভিমানী, ভক্তিকে দুর্বলতা অজ্ঞতা প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক নামে অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইঁহাদিগের পক্ষেও এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী।

ঠিকানা—উদ্বোধন প্রেস, পোঃ বাগবাজার কলিকাতা।

কোনো গ্রন্থের বিষয়পরিচয় আর বেশি কি হতে পারে ওপরের বিজ্ঞাপনের তুলনায়?—সেইসঙ্গে গ্রন্থটির মূল চিন্তাপ্রকৃতির সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুষ্ঠু উল্লেখও পাই।

'উদ্বোধন'-এর দ্বিতীয় বর্ষের মধ্যে ১ কার্ত্তিক সংখ্যা থেকে জ্ঞানযোগের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। সূচনায় বেরিয়েছিল স্বামী শুদ্ধানন্দ-কৃত স্বামীজীর *The Song of the Sannyasin* কবিতার বঙ্গানুবাদ 'সন্ন্যাসীর গীতি' নামে। মোট অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছিল চতুর্থ বর্ষে। ১৫ আশ্বিন সংখ্যায় তার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। স্বামী শুদ্ধানন্দ-লিখিত সেই লেখাটির মধ্যে উৎকৃষ্ট বিষয়পরিচয়, পাশ্চাত্যের বুধমণ্ডলীতে জ্ঞানযোগের সমাদর, অদ্বৈতবাদের গুরুত্ব, জ্ঞানযোগের মধ্যে অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও বস্তুবিজ্ঞানতত্ত্বের সমন্বয় এবং কর্ম, ভক্তি এবং যোগ—এই যোগত্রয়ের সমাবেশ চমৎকারভাবে লিখিত হয়েছিল। সেই রচনা এই :

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত

জ্ঞানযোগ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ নামক ইংরাজী পুস্তকত্রয়ের বঙ্গানুবাদ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগের বঙ্গানুবাদ ১লা কার্ত্তিক হইতে উদ্বোধনের প্রতি সংখ্যায় এক ফর্মা করিয়া দিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। উদ্বোধনের গ্রাহক মহাশয়গণ উহা খুলিয়া যাহাতে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাঁধাইতে পারেন, এইরূপ ভাবে উদ্বোধনে উহা সন্নিবিষ্ট থাকিবে। জ্ঞানের চর্চা বঙ্গদেশে অতি বিরল। অনেকের আবার জ্ঞানের উপর বিজাতীয় বিদ্বেষ দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ—জ্ঞান কি, সাধারণে সেই বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। এই জ্ঞানের ভিতর যে অতি সুন্দর কবিতা আছে, তাহা স্বামীজী তাঁহার অপূর্ব ব্যাখ্যার দ্বারা ইউরোপীয় ও আমেরিকান বুধমণ্ডলীর নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এইসকল বক্তৃতার সময়ে বক্তা অনেক সময় এতদূর উত্তেজিত হইতেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী আপনাদের সভ্যতাসুলভ অভিমান ভুলিয়া প্রবল অশ্রু বিসর্জন করিতেন, কখনো বা আপনারদের হৃদয়স্থিত ব্রহ্মকে করামলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইতেন। হে বঙ্গভাষাভিজ্ঞগণ, আপনারাও যাহাতে সেই সকল তত্ত্বামৃত সম্ভোগ করিতে পারেন, যাহাতে আপনারাও সেই মায়াবাদের যুক্তিপূর্ণ গভীর রহস্য, মুক্তির প্রকৃত তত্ত্ব, সংসার ও সন্ন্যাসের সম্বন্ধ, অদ্বৈতবাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা, উহার যুক্তি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অদ্বৈতজ্ঞান [-এ] কিরূপে কার্য করা যাইতে পারে, অর্থাৎ

অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া কিরূপে কার্য করা যাইতে পারে তাহার তত্ত্ব—মোট কথা, জ্ঞানযোগ-সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় সমুদয় প্রাচীন শাস্ত্রীয় তত্ত্ব বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকে অতি সহজভাবে বুঝিতে পারেন, যাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা অতি সামান্য মনঃসংযোগেই শাস্ত্রীয় জটিল ও কূট তত্ত্ব সকলও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তজ্জন্য আমাদের এই উদাম। এই জ্ঞানযোগ কর্ম, যোগ ও ভক্তির চূড়াস্বরূপ। অথচ ইহা এত সরল যে, কেবল পাঠমাত্র করিলেই হৃদয়ে অপূর্ব উদ্দীপনা উপস্থিত হইবে—বৈরাগ্যের ভাবে হৃদয় উদ্বেল হইবে এবং অদম্য কার্যকারিতা উপস্থিত হইবে।

জ্ঞানযোগ যে স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক অনূদিত—একথা স্বামী ত্রিগুণাতীতের কার্যকালে বিজ্ঞাপিত হয়েছে বলে আমাদের চোখে পড়েনি। স্বীকার্য যে, 'উদ্বোধন'-এর যেসব সংখ্যা দেখেছি, সেগুলির শরীর এমনই জীর্ণ যে, বোঝা মুশকিল কোথাও বিজ্ঞাপনের জীর্ণপত্র স্খলিত হয়ে পড়েছে কিনা। তবে জ্ঞানযোগের অনুবাদ যে শুদ্ধানন্দের করা তার অল্পবিস্তর প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় বর্ষের বর্ষসূচীতে দেখতে পাই, 'জ্ঞানযোগ' রচনাটি শুদ্ধানন্দ-কৃত। তৃতীয় বর্ষের বর্ষসূচীতে পাই, 'অপরোক্ষানুভূতি', 'অমৃতত্ব', 'আত্মার মুক্তস্বভাব', 'কর্মজীবনে বেদান্ত', 'জগৎ', 'বহুত্বে একত্ব', 'ব্রহ্ম ও জগৎ', 'মানুষের যথার্থ স্বরূপ', 'মায়া ও ঈশ্বর-ধারণার ক্রমবিকাশ', 'মায়া ও মুক্তি', 'সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন'—শুদ্ধানন্দ-কৃত। এইসকল নিয়েই স্বামীজীর জ্ঞানযোগের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

তার আগে দ্বিতীয় বর্ষের ১৩ সংখ্যার (১ ভাদ্র ১৩০৭) গোড়ায় 'কর্মযোগ'-এর এই বিজ্ঞাপন ছিল :

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত

কর্মযোগ

(মূল ইংরেজী হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক অতিসুন্দর বঙ্গানুবাদিত।)

ছাপা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এক মাসের মধ্যেই বাহির হইবে। উদ্বোধনের গ্রাহক হইলে অথবা বাহির হইবার পূর্বে অর্ডার দিলে অর্ধমূল্যে অর্থাৎ পূর্ণমূল্য এক টাকা চার আনা স্থলে দশ আনা মূল্যে পাইবেন।...

॥ দশ ॥

'উদ্বোধন'-এর জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে প্রয়োজন ছিল এবং স্বামী বিবেকানন্দেরও প্রয়োজন ছিল 'উদ্বোধন'কে। স্বামী ত্রিগুণাতীত দুই প্রয়োজনের সেতুস্বরূপ হয়েছিলেন দেহ-মন-সত্তাকে নিবেদন ক'রে।

'উদ্বোধন'কে কেন স্বামীজীর প্রয়োজন, তার কিছু কারণ আগে বলেছি, যার মূল কথা—শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বেদান্তকে জনগোচর করা, রামকৃষ্ণ মিশনের অভূতপূর্ব জীবনাদর্শের উপস্থাপনা ইত্যাদি। 'আচারের মরুবালুরাশির' মধ্যে ক্রমনিমজ্জিত সমাজজীবনকে সবলে

আবর্জনামুক্ত ক'রে এক বীর্যময় জীবনের ভাবরূপ ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কী প্রচণ্ড তাঁর সেই 'প্রস্তাবনা' রচনাটি, যেখানে রুদ্রনায়ক জ্বলন্ত ভাষার তরবারিকে উন্মোচন ক'রে আহ্বান করেছেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত! চরৈবতি চরৈবতি!—

"যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিতদৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।...
"যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়, ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়—ভয় হয় পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হইয়া যাই—
"এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাঁহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে, ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর—তাহার নাশ কে করে?"

অসাধারণ এই 'প্রস্তাবনা' রচনাটি। ঘনীভূত জ্ঞানরাশি সূর্যকরপাতে বিগলিত হয়ে অনুভূতি-প্রপাতের রূপ ধরে আছড়ে পড়ছে। কোনও পত্রিকা তার সূচনায় এহেন সুমহৎ উচ্চারণ লাভ করেনি—অন্তত করেছে বলে জানিনা।

স্বামীজীর আরো প্রয়োজন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন মানে নতুন জীবন এবং তার নতুন ভাষা—যেকথা তিনি শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন। স্বামীজী কিভাবে সাধু ক্রিয়াকে অবলম্বন ক'রে বাঙলা ভাষায় দার্ঢ্য এবং গতি সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন,.সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করেছি।[১৪] উল্লিখিত প্রস্তাবনা রচনাটি সাধু ক্রিয়ায় রচিত। প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় তাঁর লেখা 'জ্ঞানার্জন', এবং ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'বর্তমান ভারত' (যা দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় শেষ হয়, মধ্যে মধ্যে ছাড় দিয়ে) সাধু ক্রিয়ায় রচিত। স্বামীজীর সাধু ক্রিয়ার রচনা সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত বা সমালোচিত হয়। নিজ গোষ্ঠীতেও সাধু ক্রিয়ার রচনা অতিকাঠিন্যের জন্য অনেকে পছন্দ করেন নি। স্বামীজী কিছুটা আশাহত হয়েছিলেন। কিন্তু অবশ্যই বুঝেছিলেন—সেইখানেই তাঁর চলমান ইতিহাসের নাড়িজ্ঞান—সাধু ক্রিয়ার দিন শেস, প্রত্যক্ষ জীবনের মধ্যে জাতীয় সাহিত্যকে প্রবেশ করতে হলে জীবনগত ভাষাকেই গ্রহণ করতে হবে। প্রথম বর্ষের দশম সংখ্যাতে তাঁর চলিত ভাষায় লেখা 'ভাববার কথা'-র কিছু অংশ বেরল, যাতে লেখকের নাম ছিলনা। এই লেখা পরবর্তী চতুর্দশ সংখ্যাতেও বেরিয়েছিল। তারপরেই পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে বেরতে লাগল চলিত ভাষায় তাঁর নাম-সহ 'বিলাতযাত্রীর পত্র' (তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে নাম বদলে করা হয়, 'পরিব্রাজক')। এই ধারাবাহিক লেখাটির সঙ্গে সংখ্যান্তরে

বেরতে শুরু করে আরেকটি ধারাবাহিক চলিত ভাষার রচনা, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'। এই রচনা-দুটি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ক্রান্তিকারী—কেন, তার আলোচনাও এখানে আনার প্রয়োজন নেই।[১৮] তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নতুনের আবির্ভাব অর্চিত হয় অর্ঘ্য ও লোষ্ট্র—দুইয়ের দ্বারাই। পত্র-পত্রিকায় লোষ্ট্রবর্ষণই বেশি হয়েছিল। সে-সংবাদ অবশ্যই পৌঁছে যায় পাশ্চাত্যে স্বামীজীর কাছে। তখনই এসেছিল একটি পত্র, বা পত্রপ্রবন্ধ—স্বামীজী ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০০, লস এঞ্জেলস থেকে সেটি লিখেছিলেন—চলিত ভাষার পক্ষে মহাসনদ। সে-লেখার মধ্যে উত্থাপিত যুক্তিগুলির উল্লেখ না ক'রে কেবল উদ্ধৃত করব কয়েকটি লাইন, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগের প্রাণচেতনা শিখায়িত :

> "যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়।... যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ি ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।"

চলিত ভাষায় লেখা তো সম্পাদক ত্রিগুণাতীত ছাপলেন—(অবশ্য এর আগে প্রথম বর্ষের নবম সংখ্যাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের একটি অধ্যায়—রামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, যার সংলাপ-অংশ চলিত ভাষায় রচিত। এইসঙ্গে উল্লেখ্য, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত 'পরমহংসদেবের উপদেশ' যা পুরো চলিতে রচিত এবং 'উদ্বোধন'-এর প্রথম সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল)—কিন্তু একই কীর্তির জন্য নিন্দার ঝড় স্বামীজীর উপরই এসে পড়েছিল। চলিত ভাষার পক্ষে কলম ধরতে যখন কেউ এগিয়ে এলেন না, তখন সে-কাজ ত্রিগুণাতীতকেই করতে হয়েছিল। তিনি ১ পৌষ ১৩০৬ থেকে কয়েক সংখ্যায় 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সমালোচনা' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, যার মধ্যে চলিত ভাষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ছিল। সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিষদের বার্ষিক সভায় যে-দীর্ঘ ভাষণ দেন, ত্রিগুণাতীতের রচনাটি সেই সূত্রেই। বাংলা ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার ইতিহাসে ত্রিগুণাতীতের এই রচনার যোগ্যস্থান থাকা উচিত। এর মধ্যে ভাষার নানা শ্রেণীভেদ করা হয়েছিল, তারপর জোরালো সমর্থন জানানো হয় সাহিত্যে চলিত ভাষার ব্যবহার বিষয়ে। স্বামীজীর চলিত গদ্যের চমৎকার কিছু প্রয়োগ-নমুনা তিনি ঐ রচনায় সংকলন ক'রে দেন এবং মারাত্মক রকম প্রগতিশীলতা দেখিয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ক'রে স্বতন্ত্র বাংলা ব্যাকরণ গড়ে তোলার পক্ষে সওয়াল করেন : "যেরূপ লাটীন ও ইংরাজি, তদ্রূপ সংস্কৃত ও বাঙলা সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেলে এমন কি ক্ষতি হইবে? বরং স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দরুন বাঙলা ভাষার কি বিশেষ উন্নতি হইবে না?" অতীব আধুনিক মনের ঐ সন্ন্যাসী বাংলায় তিন 'শ' বর্জন ক'রে একটি 'শ' রাখার প্রস্তাব করেন। 'বর্ণমালার সংশুদ্ধির' এবং যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জনের সুপারিশও করেছেন। 'উদ্বোধন'—'উদ্‌বোধন' হোক, তাঁর আপত্তি নেই, তাতে

অন্তত 'উদ্দোধন' উচ্চারণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষার ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গের আলোচনাও করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেসব ভারী ভারী পরিভাষা তৈরি করেছিলেন, সেগুলির পরিবর্তে সহজ ভাষায় সহজে উচ্চার্য কিছু পরিভাষা তিনি নিজে রচনা ক'রে দেন নমুনা হিসাবে।" চিন্তার আধুনিকতায় স্বামী বিবেকানন্দের অনুবর্তী হওয়ার শক্তি ছিল স্বামী ত্রিগুণাতীতের।

ত্রিগুণাতীত সাধারণভাবে সাধু ক্রিয়াতে লিখতেন, যদিও ঢঙটা ছিল চলিতের। কিন্তু স্বামীজীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চলিত ভাষাতেও তিনি দুটি লেখা লিখেছেন—প্রথম বর্ষের আঠার এবং উনিশ সংখ্যায়—'আনন্দময়ীর আগমন' এবং 'বিজয়া'। লেখা-দুটির মধ্যে মাতৃতত্ত্বের আলোচনা অবশ্যই ছিল, কিন্তু মূল ব্যাপার মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক-কথা। প্রাণের রঙে রাঙানো লেখা-দুটি থেকে বেশ খানিক অংশ উদ্ধৃত করব। প্রথমে 'আনন্দময়ীর আগমন' থেকে :

"মা আবার আমাদের দেখতে আসছেন। প্রিয়তম সন্তানদিগের নিকট স্নেহভরে ধেয়ে ধেয়ে আসছেন।—স্মরণ করলে আনন্দে হৃদয় ভরে যায়। মা আমাদের কত দয়াময়ী! কতই স্নেহময়ী!... বেশি দিন ছেলেকে না দেখে কি থাকতে পারেন? তাই মায়ের অত সজল নয়ন। স্নেহময়ী স্নেহে এত ভরা না হলে কি এসকল অস্ফুট শুষ্ক সন্তানদিগের ভিতরে স্নেহের উদ্রেক ক'রে দিতে পারেন?...

"মা আসবেন; দরিদ্র ও ধনী সমভাবে আনন্দে মত্ত হতেছেন। ধনীর প্রতিও যেমন স্নেহ, দরিদ্রের প্রতিও মার তেমনি স্নেহ।... গরিব, মায়ের কানে কানে বলে দিলেন, 'মা, আবার আমার ঘরে এসো'। 'আমার গরিব ছেলের আমি ছাড়া আর কেহই নাই'—ঠিক বৎসর যেতে না যেতে মা আবার স্নেহভরে এসে উপস্থিত। গরিব খেতে পায় না; তত্রাচ—মায়ের এমনি কৃপা—গরিব, মায়ের সাধের পূজা কেমন সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হন।

"আমাদের মা, অপরের চোখে, মাটির মা হতে পারে; ভক্তের চোখে 'সচ্চিদানন্দময়ী'—চিদ্‌ঘনমূর্তি। মা সর্বব্যাপী—শূন্যে থাকতে পারেন, মানুষের ভিতরে থাকতে পারেন; গাছের ভিতরে, ইট কাঠের ভিতরে, এমন কি সেই ক্ষুদ্র বালুকণার ভিতরেও থাকতে পারেন; আর আমার মা, আমার হাতের গড়া এত সাধের আনন্দময়ী প্রতিমায় থাকবেন না—এ কখনই হতে পারে না। আমার যদি ভক্তি থাকে, বিশ্বাস থাকে; আমি যদি অন্তরের সহিত মাকে ডাকি; প্রাণের সহিত মার কাছে কেঁদে বলি; মার জন্য যদি সত্যই আমার প্রাণ ছটফট করে, মাকে না দেখতে পেলে মহা অশান্তি বোধ করি, প্রাণ বেরিয়ে যায় এমন যদি হয়—নিশ্চয়ই বলছি, মা আসবেনই আসবেন; এই মাটির প্রতিমার ভিতরেই আসবেন। যেখানে বলব সেইখানেই আসবেন। যেমন ক'রে হলে আমার এই ক্ষুদ্র মন তাঁকে বুঝতে পারবে, তেমনি করেই তিনি আমার কাছে আসবেন। মা সত্য আছেন, মা নিত্যই আছেন; মা সত্যই অন্তর্যামী, সত্যই ভক্ত-বৎসল, সত্যই স্নেহময়ী জননী।"

'বিজয়া' রচনার কিছু অংশ :

"মা বাড়ি আলো ক'রে ছিলেন। কত গমগমে ছিল, কত জাঁক-জমক ছিল, কতই আনন্দোৎসব হতেছিল। আজ ঘর আঁধার ক'রে, মন আঁধার ক'রে চলে গেলেন। মাকে পাঠাইয়া, মাকে পৌঁছিয়া দিয়া আসিয়া, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি—চারিদিক ফাঁকা; সকলেই বিমর্ষ; কেহ কেহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন; কেহ কেহ বসে কাঁদিতেছেন। শোকে সকলেই কাতর; কেবল বাটীর লোক নয়—আত্মীয়-বন্ধুগণ, পাড়া-পড়শীগণ, অতিথি-অভ্যাগতগণ, অপরাপর লোকগণ—সকলেই শোকতপ্ত। মা! আবার কবে আসবে?"

অক্লান্ত পরিব্রাজক ত্রিগুণাতীত খুব নিকট থেকে মানুষ ও মানুষের সমাজ দেখেছেন। তাঁর গ্রহিষ্ণু মনে অভিজ্ঞতার স্থায়ী ছাপ পড়ে গিয়েছিল। নিরীক্ষার সঙ্গে পরীক্ষাও তিনি করেছেন। সেই শক্তিতে হয়ে উঠেছিলেন সমাজবিজ্ঞানী। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তাঁর রচনা থেকে তাঁর সে-পরিচয় ইতিমধ্যে কিছুটা পেয়েছি। দূরপ্রসারী দৃষ্টি তাঁর—কিন্তু নিকট-দৃষ্টিরও অভাব ছিলনা। তাঁর কলম থেকে—সন্ন্যাসীর কলম থেকে—সেই কাছের চোখে দেখা বস্তুর ওপরে লিখিত একটি উপাদেয় লেখা পেয়েছি। তাঁর পক্ষে অভাবিত বিষয়—'আড্ডা'। নিবিড় পর্যবেক্ষক এই মানুষটি বাঙালী সমাজের একটি বিশেষ জীবনাচারের ছবি আপাত হালকা চালে তুলে ধরেছেন, ভিতরে ছিল অন্তর্দৃষ্টি এবং মননশীলতা।

প্রথমত বাঙালীর সর্বজনীন আড্ডাসক্তি ও আড্ডার চরিত্র (দ্বিতীয় বর্ষের উনিশ সংখ্যায়),

"এমন পাড়াই নাই, যে পাড়ায় কোন না কোন রকমের আড্ডা নাই। এক প্রকার ধরিতে গেলে, আড্ডাই আমাদিগের দেশের জাতীয়ত্বের এবং নিজের নিজের মনুষ্যত্বের হ্রাস-বৃদ্ধির, মঙ্গল-অমঙ্গলের, উন্নতি ও অবনতির মূল কারণ। হেলায় বৃথা সময় কাটাইয়া মনুষ্যত্বের হানি করিতে আড্ডা যেমন মজবুত, এমন আর কিছুই নহে।... আড্ডা মানে—গল্পের স্থান; আড্ডা মানে অযথা বিরামের স্থান, অথবা খেলার স্থান, অযথা ফূর্তির বা রগড়ের স্থান, যে-স্থানে যাইবার জন্য অনেক সময়ে ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়, যে-স্থানে যাইবার, বসিবার, কথা কহিবার, বা কোনও প্রকারের কোন নিয়মাদি বিশেষ কিছু নাই; যে-স্থানে প্রত্যহই বা সর্বদাই যাইয়া থাকি; যে-স্থানে কয়েকটি অতি ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া, প্রায় আর কেহ আসেন না, যদি বা আসেন তো অতি অল্পক্ষণের জন্যই।"

সংবাদ উৎপাদনে ও বণ্টনে আড্ডার ক্ষমতা :

"এই সকল স্থানে নানাপ্রকার চর্চা হইয়া থাকে। আড্ডায় যদি একটা কথা উঠিল, তাহা অযথা বা মিথ্যাই হউক, আর যাহাই হউক, অমনি তৎক্ষণাৎ সে-কথা পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া যাইল। আড্ডায় যদি কেহ একটা 'মতলব' করিলেন, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, অমনি তৎক্ষণাৎ সকলে তাহাতে হাঁ করিয়া দিলেন। আড্ডার কথা বেদবাক্য; আড্ডা হইতে যে-কথা শুনিয়া আসিব, সে-কথা যদি প্রকৃতই মিথ্যা হয় এবং তাহার বিপক্ষে যদি দশ হাজার সৎলোক সাক্ষ্য প্রদান করেন তবুও আড্ডার কথা কোন মতে অবিশ্বাস করিতেছি না।"

আড্ডার মুখ্য শ্রেণীবিভাগ :

"(১) মজলিশী, আজগুবী বা খোশ গল্পের আড্ডা। আফিম-আশী বৃদ্ধ বা মোসাহেব মহাশয়গণই সচরাচর এই সকল আড্ডার প্রধান সভ্য।

"(২) খেলার আড্ডা। সতরঞ্চ, পাশা, তাস প্রভৃতি এই সকল আড্ডায় আদরের দ্রব্য। যুবা বা বৃদ্ধ উভয় দলই এই আড্ডায় সমান আকৃষ্ট হন।

"(৩) গান বাজনার আড্ডা। এখানে যুবা বা বৃদ্ধ সকলই প্রায় আনন্দ পাইয়া থাকেন। আজকাল কিন্তু যুবক দলের ভিতরেই এই সকল আড্ডা বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য, ভাল ভাল কন্সার্ট-পার্টি, থিয়েটার-পার্টি, যাত্রার দল প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিতেছি না; কেননা, তথায় অনেক বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। সে সকল—রেগুলার মিটিং, ক্লাব বা এ্যাসোসিয়েশন (অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত বা নিয়মিত সভা) নামে পরিগণিত হইতে পারে।

"(৪) ফূর্তির আড্ডা। অল্প স্বল্প পাঁচ রকম ইয়ার্কি, পরচর্চা, ঠাট্টা তামাসা, গুড়ুক সেবন, গল্প প্রভৃতি হরেক রকমে, এই সকল আড্ডায় সময় অতিবাহিত হয়। ইহাতে যুবার ভাগই বেশি।

"(৫) নেশার আড্ডা। কোন কোন ভদ্র এবং শিক্ষিত লোককেও দেখিতে পাওয়া যায়—গুলি গাঁজা বা চরশ প্রভৃতি নীচ নেশায় রত। তাঁহারা গোপনে গোপনে ঐসকল আড্ডায় যাইয়া নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করিয়া আসেন; মনে করেন, যেন কেহই টের পাইল না।

"(৬) মিশ্রিত আড্ডা। অর্থাৎ, এ-সকল আড্ডায় পূর্বোক্ত সকল রকমেরই রস অল্পবিস্তর আছে।"

ত্রিগুণাতীত মেয়েদের আড্ডার উল্লেখও করেছেন। তাছাড়া আরো অনেক রকমের ভাল আড্ডা আছে এবং মন্দ আড্ডা—যাদের উল্লেখ 'অনাবশ্যক' অথবা 'অযোগ্য'।

আড্ডার কাহিনী লিখেছিলেন অন্য কেউ নন, স্বামী ত্রিগুণাতীত। সুতরাং আদর্শের কথাটা এসে যায়ই। বাঙালীরা আড্ডা দেবেই, সেখান থেকে তাদের সরানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে উপায়—ত্রিগুণাতীত ভাবলেন—যদি ঐসব আড্ডার মধ্যে কিছু ভাব ও আদর্শ ঢুকিয়ে দিয়ে তার প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটানো যায়! বৈষ্ণব মতে যেমন কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করা, তেমন ঘটাতে পারলে আড্ডাগুলি লোকসেবা কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। ত্রিগুণাতীতের প্রসারিত শুভকল্পনার রূপ এই :

"আড্ডা যেন দীন দরিদ্র, অনাথ-অনাথাগণের আশ্রয় হয়; আড্ডা যেন বিপন্নগণের একমাত্র শরণ-স্থল হয়; যেন দুষ্টের পরিবর্তন ও শিষ্টের আদরস্থান হয়; ধনী নির্ধন, গুণী ও নির্গুণ, মহৎ এবং ক্ষুদ্র, বালক বা বৃদ্ধ, সকলকারই যেন প্রিয় কুটীর হয়। আড্ডা যেন পল্লীর শান্তিনিকেতন হয়। আড্ডা যেন যাবতীয় লোককে একতাবন্ধনে বদ্ধ করিতে পারেন। দেশের জাতীয়ত্ব বজায় রাখিতে পারেন এবং ভারতের নষ্টদ্রব্য উদ্ধার করিয়া স্বজাতির জীবন রক্ষা করিতে পারেন। নিজ মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন।"

বাস্তবে, আদর্শে, স্বপ্নে এবং সাধনায় মেশানো ছিল ত্রিগুণাতীতের জীবন।

এই আড্ডার প্রসঙ্গ ত্রিগুণাতীতের আরেকটি রচনায় আছে। সেখানে নিছক পরচর্চামুখী আড্ডাধারীদের বিষয়ে ধিক্কার দেখা যায়। নাতিহ্রস্ব সেই লেখাটি—"অনাথ-আশ্রম ও জাতীয় উপকারিতা" (১ কার্তিক ১৩০৭)—এক মহান প্রেমিক হৃদয়ের যন্ত্রণাদীর্ণ ভাবাবেগে পূর্ণ। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের ইতিহাসে এটি প্রথম পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য

রচনা। প্রথম অনুচ্ছেদে খ্রীস্টান মিশনারিদের ত্রাণকার্যের মূল্য (যদিও উদ্দেশ্যমূলক), অপরদিকে এদেশীয় মানুষদের অসারচিত্ততার উল্লেখ :

"হিন্দু-সমাজ কর্তৃক পরিচালিত অনাথাশ্রম বাঙলাদেশে তো কুত্রাপি নাই, সমগ্র ভারতবর্ষেও আছে কিনা সন্দেহ। যদিও দুই একটি মাত্র থাকে, তাহা অতি ক্ষুদ্র এবং স্থানীয় কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত; তাহাতে ভারতের যাবতীয় প্রদেশের অনাথ বালক-বালিকাগণ (হিন্দু হইলেও) স্থান পায়না। সুতরাং খ্রীস্টানগণ আমাদের দেশের অনাথ বালক-বালিকাগণকে কিছুদিন লালনপালন করিয়া অনায়াসে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লয়েন। ইহাতে খ্রীস্টান মিশনারিগণেরও দোষ নাই; অনাথ বালক-বালিকাগণেরও দোষ নাই। দোষ আমাদিগের আধুনিক স্বদেশের। নীচ জাতীয় দরিদ্র দেখিলেই তো আমরা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিই। তাহারা হিন্দু হইলেও, তাহাদিগকে শূদ্র, অস্পৃশ্য ও অগণ্য জ্ঞানে আমরা অবহেলা করিয়া থাকি। তাহারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেও আমরা কিছু ক্ষতি মনে করিনা। যদি একান্তই দয়ার্দ্রচিত্ত হইলাম, মনে যদি একান্তই দেশহিতৈষিতারূপ প্রগাঢ় সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল, তাহাদিগকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিলাম, বা একখানি ছিন্ন বস্ত্র দিলাম, বা বড় জোর, বাটীতে ভৃত্য করিয়া রাখিলাম। তাহাদিগকে যত্নসহকারে লালনপালন করা, লেখাপড়া ও ভদ্রোচিত আচার ব্যবহার শিখানো, অন্তরে প্রকৃত মনুষ্যত্বের ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কর্তব্যজ্ঞান কখনো আমাদিগের মনে উদয় হয়না। সুতরাং নীচবংশোদ্ভব নিরাশ্রয় অনাথগণ পেটের জ্বালায় স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহারা যত্ন ক'রে তাহাদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে, তাহাদিগের কথা শুনিতে, এবং তাহাদেরই ধর্ম পালন করিতে বাধ্য হয়।"

তারপর :

"কি আশ্চর্য! কাহাদের ধন কাহারা ভোগ করে দেখুন; কাহাদের লোক কাহারা লইয়া যায়। কেনই-বা না লইয়া যাইবে। আমরা নিজেরাই যে ঘরের লক্ষ্মী বাহির করিয়া দিতেছি!.. আমরা জাত্যভিমান ও ধনগর্বাদিতে মুগ্ধ হইয়া বুঝিতে পারিতেছি না যে, যাহাদিগকে আমরা ঘৃণা করিতেছি, তাহারাই আমাদিগের দেশের লক্ষ্মী; তাহাদিগের হইতেই আমাদিগের ধন, মান, সুখ, ঐশ্বর্য প্রভৃতি সমস্তই। তাহারা যদি না থাকিত, আজ আমরা অমরাবতী তুল্য শহরে রাজপ্রাসাদোপরি দুগ্ধফেননিভ শুভ্র ও পুষ্পরেণুসম কোমল শয্যাদির সুখ ভোগ করিতে পারিতাম না। যাহাদিগকে ঘৃণা করি, আজ তাহারা যদি না থাকিত, আমাদিগকেই তাহাদিগের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইত; আমাদিগকেই আজ তাহাদিগের ন্যায় লাঙল স্কন্ধে বহন করিয়া ধান্যক্ষেত্রে দৌড়াইতে হইত, রৌদ্রে বা বারিপাতে অনাহারে অনবরত শস্য রোপণাদি কার্য করিতে হইত, গৃহ নির্মাণ জন্য ঘর্মাক্ত কলেবরে কোদাল দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে হইত; স্বাস্থ্যরক্ষা নিমিত্ত মস্তকে করিয়া ময়লা লইয়া 'ধাবার' মাঠে ফেলিয়া আসিতে হইত। মনে করুন, যাহাদিগকে ঘৃণা করি, তাহাদিগের অবর্তমানে আমাদিগের কতদূর দুর্দশা হওয়া সম্ভব।"

এই দেশে তথাকথিত নীচ বংশোদ্ভবদের দুর্দশার মর্মন্তুদ চিত্র ত্রিগুণাতীত উপস্থিত করেছেন। সেইসঙ্গে জমিদারদের নিষ্ঠুর শোষণচিত্রও। এদেশীয় কাব্য-পুরাণে পরহিতের যে-সকল অসামান্য দৃষ্টান্ত আছে, সেগুলির দু-একটির উল্লেখও করেছেন। সেইসঙ্গে নিকট কালের পরোপকারী মানুষের কাহিনী শুনিয়েছেন। একবার প্রবল বন্যার সময়ে এক ব্যক্তি

ভাসমান একটি বৃক্ষ অবলম্বন ক'রে প্রাণরক্ষা করছিলেন, সেইসময়ে আরেকটি ডুবন্ত মানুষকে দেখতে পান। তাঁকে তাঁর অবলম্বনের বৃক্ষটিতে তুলে নিয়ে নিজে বন্যায় ভেসে যেতে থাকেন। শেষে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। ২০ ক্রোশ দূরে, তাঁর অজ্ঞান দেহকে তটে পড়ে থাকতে দেখে লোকে তাঁকে উদ্ধার ক'রে অনেক কষ্টে তাঁর প্রাণ বাঁচায়।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও ত্রিগুণাতীত বলেছেন :

"বৎসর সাতেকের কথা হইল; পদব্রজে অযোধ্যা যাইতেছিলাম। সঙ্গে কেহ বা কিছুই ছিলনা; একা মাত্র, ও একবস্ত্র তাহাও অর্ধাংশ। একদিবস পথে গ্রাম বা বসতি কোন প্রকার পাওয়া গেল না; দিবা প্রায় অবসান; সমস্ত দিবসই অনাহার। পূর্বদিবস মধ্যাহ্নে যৎসামান্য ভিক্ষা পাওয়া গিয়াছিল মাত্র। পূর্ব অপরাহ্নে পাঁচ ক্রোশ ও সে-দিবস প্রায় সাত ক্রোশের পথশ্রম। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে দূরে গুটিকতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝুপড়ি দেখিতে পাওয়া গেল। নিকটে যাইয়া বুঝিলাম, লোকগুলি সাঁওতাল অথবা ধাঙ্গড় জাতীয়, অতি গরিব; আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ক্যা মাংতা'; বলিলাম, 'খানেকো ভিক্‌ষা মাংতা।' 'হামারা ভাত খায়েগা?' 'হাঁ জি খায়েগা।' 'বয়ঠো।' হাত দেড়েক লম্বা ও আধহাতটাক মোটা একখণ্ড বৃক্ষের শাখা উপবেশনার্থ দিলেন। তাঁহাদিগের একখানি ঝুপড়ি; হাত চারেক চওড়া ও প্রায় ৮ হাত লম্বা; কোথাও পাতা, কোথাও চারিটি খড়, কোথাও বেনা বা উলু, কোথাও বা কাটিমুটি, কোথাও বা একটু চট দিয়া মাত্র আবৃত। যেমন চাল, তেমনি দেওয়াল। সম্মুখে হাত আষ্টেক জমি একটু পরিষ্কার করা উঠানের মতো। উপরে বিমল চন্দ্রালোক। চতুর্দিকে ময়দান; মধ্যে মধ্যে এক-একটি খর্বাকৃত বৃক্ষ। দাতার পরিবারের মধ্যে—তাঁহারা দুইজন উজ্জ্বল কৃষ্ণকায় স্ত্রী পুরুষ, এবং তদনুরূপা একটি কুমারী কন্যা। সন্ধ্যার পূর্বেই রন্ধন হইয়া গিয়াছিল। হাঁড়ির ভিতর হইতে তিনটি গোল গোল পাকানো ডেলা বাহির করিলেন—দুইটি বড় ও একটি ছোট; তিনটি ভাঙ্গিয়া চারিটা করা হইল; রাখিবার স্থান নাই, বোধহয় তাঁহাদের আবশ্যকও করে না, মাটিতেই রাখিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে, আমাকে হাত পাতিতে বলিলেন। সেই চারিটি লাড্ডু হইতে একটি আমার হাতে দিলেন; তাঁহারাও তিন জনে একেকটি লইয়া বসিলেন। লাড্ডুগুলি অতি নিকৃষ্ট আউস-চাউলের খুদ সিদ্ধ; একেকটিতে ৫।৭ গ্রাস হইবে মাত্র; তাহাই তাঁহাদিগের খাদ্য; দুইবেলা এইরূপ এক এক লাড্ডু জুটিলেই পরম ভাগ্য মনে করেন।"

সেই লাড্ডুলাভ ক'রে প্রাণরক্ষা করেছিলেন ত্রিগুণাতীত। তেমনই করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভাই ও শিষ্যেরা। তাই বিবেকানন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে পেরেছিলেন—মুচি মেথর আমার রক্ত, আমার ভাই।

ত্রিগুণাতীতের লেখা আরো এগিয়েছে। বাঙালীর আড্ডায় একদিন তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার সমালোচনা শুনেছিলেন :

"একটি আড্ডার কথা আমাদিগের স্মরণ পড়িতেছে; সেদিন রাস্তা দিয়া আসিতেছিলাম, একটি আড্ডায় শুনিতে পাইলাম, 'উদ্বোধন' এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অনাথাশ্রম সম্বন্ধে কথা হইতেছে—'উদ্বোধনের এই কয় সংখ্যায় আমাদিগের পড়বার বেশি কিছু নাই, কেবল

অনাথ-আশ্রম, দুর্ভিক্ষ-মোচন এবং প্লেগনিবারণ প্রভৃতি নিজেদের কার্যাদি দিয়াই কাগজখানি পূর্ণ করিয়াছেন'; 'এ-সকল তো নিজেদেরই বিজ্ঞাপন'।"

বড় দুঃখে ত্রিগুণাতীত লিখেছেন :

"দেখুন একবার; অপরাধ কি না, রামকৃষ্ণ মিশন কিরূপ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ভারতের অনাথগণকে কুড়াইয়া আনিয়া লালন-পালন করিতেছেন, এবং অনাথগণ তাঁহাদিগের আশ্রমে থাকিয়া কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাহাই দুই একবার কিছু উদ্বোধনে বলা হইয়াছিল। অপরাধ কি না, রামকৃষ্ণ মিশন কিরূপ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া প্রাণপণে ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন; অপরাধ কি না, রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রতধারিগণ কিরূপ জীবন সমর্পণ করিয়া প্লেগাক্রমণ হইতে স্বদেশবাসিগণকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; তাহাই এক আধবার কিছু উক্ত কাগজে লেখা হইয়াছিল।

"এসকল দেশহিতকর কার্যের কথা যদি না লিখিব, তো কাগজ-পত্রের আবশ্যক কি? কেবল গল্প দিয়াই যদি কাগজ ভরিয়া দিলাম, তো মাসিক পত্রের পরিবর্তে, উপন্যাস-ভাণ্ডার বা দারগার-দপ্তর লিখিলেই তো ছিল ভাল? যে পত্রে, হৃদয়বান দেশহিতৈষিগণের কার্য যদি জনসাধারণের নয়নপটে চিত্রিত করিয়া তাঁহাদিগের অন্তরস্থ প্রসুপ্ত সদুদ্যম বা সদ্বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা না করিলাম, তো সে পত্রের 'উদ্বোধন' নাম রাখিবার প্রয়োজন কি?"

এর পরে ত্রিগুণাতীত মুর্শিদাবাদে স্বামী অখণ্ডানন্দ এবং রাজপুতানায় স্বামী কল্যাণানন্দের সেবাকাজের বিষয়ে কিছু সংবাদ দিয়েছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ কিভাবে কেবল দান বিতরণ না ক'রে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশমতো (নিজ প্রেরণাতেও) অনাথদের যথার্থ আত্মনির্ভর ও 'মনুষ্যত্বশালী' করতে সচেষ্ট ছিলেন, ত্রিগুণাতীত তা দেখিয়েছেন স্বামী অখণ্ডানন্দের একটি পত্র উদ্ধৃত ক'রে :

> "গত জুলাই মাস হইতে অনাথ-আশ্রমের স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। আশ্রমে প্রাতে ৩ ঘণ্টাকাল যে স্কুল, তাহাতে আশ্রমের ছাত্র ১১টি, আর বাহিরের ৯।১০টি। আশ্রমের স্কুলে আপাতত লোয়ার প্রাইমারি ক্লাস খুলিয়া তদুপযুক্ত পুস্তকাদি ধরানো গিয়াছে। অন্যান্য টেকনিক্যাল শিক্ষার (শিল্পবিদ্যার) সহিত ইহাদিগকে ইউনিভার্সিটি-এডুকেশনও আমরা দিব। এবং বালকগণকে রীতিমতো পরীক্ষা দিতে পাঠাইব।
>
> "উক্ত স্কুল ছাড়া আবার একটি নৈশবিদ্যালয় (নাইট-স্কুল) খুলিয়াছি। ইহাতে আশ্রমের বড় ছেলে কয়টিকে ইংরেজী পড়াইয়া, বাকি কয়টিকে, যে যা পড়ে, পড়াইয়া, বাহিরের ৬।৭টি যুবা চাষী ছাত্রকে একটু একটু লেখাপড়া শিখাইয়া থাকি। গত মাস হইতে কয়েকটি চাষী বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত নিয়মপূর্বক পড়িতে আসিতেছে দেখিয়া আমি বড়ই উৎসাহিত হইয়াছি। রাত্রের ১০।।.টা [সাড়ে দশটা] পর্যন্ত পড়াইয়া থাকি।
>
> "টেকনিক্যাল-এডুকেশনের মধ্যে আপাতত, তাঁতের, ছুতারের ও দরজির কাজ শিখাইতেছি। আশ্রমের ছেলেরা 'স্টীলপেনের হ্যান্ডল' অতি সুন্দর তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে। বহরমপুর শহরে ইহার বড় আদর হইয়াছে। সেদিন শহরে কতকগুলি লইয়া যাওয়াতে, তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকটি দুই পয়সা করিয়া সবগুলি বিক্রয় হইয়া গেল।

কাশীমবাজারের মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া ২০০ কলমের অর্ডার দিয়াছেন। বার্নিশ করিয়া দিলে, তিনি প্রত্যেক কলম তিন পয়সা করিয়া লইবেন, বলিয়াছেন। আমরা যোগাইতে পারিলে, তাঁহার সদর ও মফঃস্বল কাছারিতে এই কলমই চালাইবেন বলিয়াছেন। আরও ২।১টি জমিদারের নিকট হইতে কলমের অর্ডার পাইয়াছি। বালকেরা একটি ছোট টেবিলের নমুনা দেখিয়া অতি সুন্দর একখানি টেবিল প্রস্তুত করিয়াছে। সেইরকম আরেকখানি টেবিলেরও অর্ডার পাইয়াছি।

"রেশম-কীট প্রতিপালন করিবার জন্য আমরা সমস্ত আয়োজন করিতেছি। বোধহয় শীঘ্রই সফল হইব।"

কোন্ পথ ধরে রামকৃষ্ণ মিশনের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সূচনার সেই পথ-সংবাদ এখানে কিছু মিলেছে।

॥ এগারো ॥

রক্ত জল-করা পরিশ্রমে ত্রিগুণাতীত 'উদ্বোধন' পত্রিকা গড়ে তুলেছিলেন—সেই 'উদ্বোধন' তাঁকে ছেড়ে যেতে হলো—যেমন ছেড়ে যেতে হয়েছিল তাঁর জ্যেষ্ঠ এক গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে—নিজের বুক দিয়ে আগলে-রাখা রামকৃষ্ণ মঠকে, যেখানে রয়েছে 'আত্মারামের কৌটা'। রামকৃষ্ণানন্দ গিয়েছিলেন মাদ্রাজে—স্বামীজীর ইচ্ছায়—শ্রীরামকৃষ্ণের বীজ নতুন এক ক্ষেত্রে বপন করার জন্য। আর ত্রিগুণাতীত গেলেন মার্কিন মুলুকে—সান ফ্রান্সিসকোয়, ঠাকুরকে বহন ক'রে। রামকৃষ্ণ মঠ তৈরি হওয়ার পরে তার সাধুরা সাধারণ পরিব্রাজক জীবন ছেড়ে মঠ-মিশনের কেন্দ্রে কেন্দ্রে পরিব্রাজক।

১৯০২ সালেই স্বামীজী ত্রিগুণাতীতকে সান ফ্রান্সিসকোয় প্রচারকার্যের জন্য পাঠাবার মনস্থ করেন; কারণ, স্বামী তুরীয়ানন্দ সেখানকার কাজ থেকে অব্যাহতি চাইছিলেন। ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে ত্রিগুণাতীত সান ফ্রান্সিসকোয় পৌঁছান। সেখানে ১২ বছর কাজ করেন এবং সেখানেই দেহত্যাগ করেন। তাঁর এই ১২ বছরের অদ্ভুতকর্মা জীবনের তথ্যনিষ্ঠ অথচ গভীর ভাবাত্মক কাহিনী রচনা করেছেন মেরী লুইস বার্ক (সিস্টার গার্গী) তাঁর *Swami Trigunatita: His Life and Work* গ্রন্থে। প্রচণ্ড কর্মশীলতা, কঠোর নিয়মনিষ্ঠা, অপরিসীম ধৈর্য, সংকটে ভয়হীনতা এবং নিরন্তর সাধনা—আশ্চর্য তাঁর জীবন। সেখানে তিনি অব্যাহতভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে গেছেন, বেদান্ত আশ্রমকে দৃঢ় ভিত্তি দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছেন, *Voice of Freedom* নামে পত্রিকা শুরু করেছেন, নির্মাণ করেছেন 'পাশ্চাত্ত্যে প্রথম হিন্দুমন্দির'। সর্বোপরি যাঁরা গ্রহিষ্ণু তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছেন চরিত্র ও ধর্মকে। তাঁর ধর্ম বেদান্ত। সেই বেদান্তের প্রতীক হিসাবেই নির্মাণ করেছিলেন হিন্দুমন্দির, যা কোনমতেই নিছক হিন্দুমন্দির নয়—সর্বধর্মের মহামিলনস্থান সেটি। ৭ জানুয়ারি ১৯০৬ তারিখে মন্দিরটি উৎসর্গ করা হয়, সেই উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে স্বামী ত্রিগুণাতীত বলেছিলেন : "এই ক্ষুদ্র স্থানটি ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গীকৃত। কোনো বিশেষ মানুষ, কোনো বিশেষ সমিতি, কোনো বিশেষ ধর্ম, কোনো

বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এই মন্দির উৎসর্গ করা হয়নি—সকল ধর্মের মানুষের জীবনচর্যার স্থান এটি। এখানে পাপবাদ নেই, বিশেষ গুণের ধারণাও প্রচার করা হয়না। সকলেই এক। সকলেই ভ্রাতা ও ভগিনী—সকলের বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিকাশ-সাধনার এই ভূমি। সেই হলো এর চরম লক্ষ্য।... আপনারা সকলে সেই পরম পিতার সন্তান। আপনারা প্রত্যেকে যে সম্প্রদায়েরই হোন, আপনারা—তরুণ অথবা বৃদ্ধ, ধনী অথবা দরিদ্র, জ্ঞানী অথবা অজ্ঞান, ধার্মিক অথবা অধার্মিক, পুণ্যবান অথবা পাপী—সকলেই এখানে স্বাগত। আপনারা সকলেই ফিরে যাবেন আমাদের একমাত্র সেই পিতার কাছে, যিনি আপনাদের এখানে এনেছেন।”

সকলেই স্বাগত। ঠিক। অনেকেই আসত, থাকত, আবার ছেড়ে চলেও যেত। কারণ—ত্রিগুণাতীত একটি জায়গায় অনড় ছিলেন—সত্যে। সত্যরক্ষায় তিনি সুকঠিন। এবং নিয়মরক্ষাতেও। তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় (৩০ জানুয়ারি ১৯১৬) কার্ল পিটারসন বলেছিলেন : “বিস্ময়ের কিছু নেই যে, তাঁর মতো প্রচণ্ড শক্তিধর মানুষের শত্রু থাকবে। কেন? কারণ আমরা কেউ চাইনা আমার বিষয়ে সত্যকথাটা বলা হোক। তা বললে আমাদের অহং ধাক্কা খায়। আর সেইখানেই পাচ্ছি স্বামী ত্রিগুণাতীতের মহান শিক্ষা—খাড়া থেকে সত্য বলবার শক্তি অর্জন করো।”

এমন মানুষকে মার খেতেই হবে। যাঁরা তাঁর সত্যকার অনুগামী তাঁদেরও বরাতে একই জিনিস জুটবে। ২৪ ডিসেম্বর ১৯১৪, ত্রিগুণাতীত তাঁর শেষ শিক্ষাদানের ক্লাসে বিশ্বস্ত ছাত্র ধীরানন্দকে বলেছিলেন :

> “সেই সময় একেবারে কাছে এসে গেছে যখন তোমাদের ভয়ানক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে— তোমাদের সমালোচনা করা হবে, ধিক্কার দেওয়া হবে, ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, কারণ আমি দেখেছি—নানা লোকে নানাভাবে নানারকম বজ্জাতি শুরু করেছে, তোমাদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ঈর্ষা জেগেছে। তারা যে যা বলে বলুক, তাতে মন দিও না। কোনমতেই নিজের ঘাঁটি ছেড়ে নড়বে না। তখন অপ্রত্যাশিত মহল থেকে সাহায্য আসবে—সর্বোপরি ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন।”

জীবনের শেষ পর্বে ত্রিগুণাতীত কয়েক বছর বিশেষ অসুস্থ ছিলেন। অসহ্য যন্ত্রণা শরীরে। ঘনিষ্ঠ মানুষরা অবাক হয়ে দেখতেন, কিভাবে তিনি শরীররক্ষা করছেন। ত্রিগুণাতীত বলেছিলেন : “অসহ্য যন্ত্রণার ক্ষণে কতবার ভেবেছি, শরীরটা যায় যাক। ঐ চিন্তা যখনই মনে এসেছে তখন আরেকটি চিন্তাও এসেছে—মায়ের কাজ তো থামবে না। তা এই শরীরকে টেনে টেনে যতদিন পারি মায়ের কাজ করে যাব।”

প্রভু—প্রভু—প্রভু—। মা—মা—মা—! শেষের দিকে বক্তৃতার সময় গলা কাঁপত। তার জন্য সমালোচনাও হয়েছে। অশক্ত শরীরে বক্তৃতা করতে গেলে যখন গলা কাঁপে তখন আর কেন! না, গলা সেজন্য কাঁপেনি। কেঁপেছিল অনিবার্য আবেগে। তিনি বলেছিলেন : “গলার কাঁপন নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, যাতে তা শ্রোতাদের কানে না পৌঁছায়। কিন্তু ইদানীং যখন বক্তৃতামঞ্চে উঠি মহামায়া আমার সামনে এসে দাঁড়ান, এমনই স্নেহ-ভালবাসায় ভরিয়ে দেন যে, নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনা। দারুণ চেষ্টা ক'রে নিজেকে

সামলালেও গলার স্বরে কাঁপনটুকু থেকে যায়। একদিকে স্বর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা, অন্যদিকে যে মহামাতার উপস্থিতি জন্য ভাববন্যা; তাকে সামলানো অসম্ভব।"

সুতরাং আসন্ন হয়েছিল বিদায়ক্ষণ। এবং তাঁর শেষ আশাও পূরণ হয়েছিল। 'Martyr' (শহীদ) শব্দটির অর্থ তিনি জানতেন না—তাঁর জীবনের প্রথম পর্বে। অর্থটি বুঝিয়ে বলা হলে ত্রিগুণাতীত বলেছিলেন—তাঁর বড় ইচ্ছা 'শহীদ' হবেন।

শারীরিকভাবে শহীদ হওয়া বোধহয় 'দরকার' ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যরা ঠাকুরের কাজ করতে করতে বুকের রক্ত তুলে মরেছেন—কিন্তু আক্ষরিকভাবে শহীদ না হলে অবতারলীলার ছন্দটা পূরণ হয়না। সে-দায়টা গিয়ে পড়েছিল ত্রিগুণাতীতের ওপরে।

১৯১৪ সালের ক্রিসমাস। ঐদিন ত্রিগুণাতীত ১৫ ঘণ্টার উপাসনার ব্যবস্থা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতেও তাই করে থাকেন। ক্রিসমাসের দিন সকালে এক তরুণ শিষ্যকে বললেন : "যদি আমার কিছু হয় তাহলে দেখো, মৃত্যুর পরে যেন আমার মস্তিষ্কটা নষ্ট না ক'রে বৈজ্ঞানিকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।" ত্রিগুণাতীতের বিশ্বাস ছিল—যোগীদের মস্তিষ্কের সঙ্গে সংসারী মানুষের মস্তিষ্কের পার্থক্য থাকে, তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধরা পড়বে। তাঁর এই ইচ্ছা অবশ্য পালিত হয়নি।

ক্রিসমাসে ১৫ ঘণ্টার উপাসনার অন্তে স্বামী ত্রিগুণাতীত উদ্দীপ্ত হয়ে বলেছিলেন : "আমি হিন্দু—আমি নত হচ্ছি তাঁর চরণতলে যিনি মানুষের প্রতি প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।"

তিনদিন পরে, রবিবারের অপরাহ্ণে তিনি যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন ভাব্‌রা নামে একটি ছোকরা প্ল্যাটফর্মের কাছে গিয়ে, মাথার টুপির ভিতর থেকে কিছু-একটা বার ক'রে, তিনবার সেটি আছড়ালো। তৃতীয় বারে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল—সেই জায়গাটি প্রায় চুরমার, ভাব্‌রার মৃত্যু হলো সঙ্গে সঙ্গে। স্বামী ত্রিগুণাতীত ছিটকে গিয়েছিলেন, গুরুতরভাবে আহত হন। কিন্তু মাথাটি অক্ষত থাকে। "মাথায় যে আঘাত লাগেনি, তার কারণ, মা আমার হাত ধরে ফেলেছিলেন"—ত্রিগুণাতীত বলেছিলেন।

ভাব্‌রা ছোকরাটি আশ্রমে একেবারে অপরিচিত ছিল না। কিছুদিন আগে সে অস্থিরচিত্তে ত্রিগুণাতীতের কাছে এসেছিল, কিন্তু বেশি সময় থাকেনি, শারীরিকভাবে তখনই সে ভারসাম্যহীন। কেন তার ঐ কীর্তি কিছুই জানা যায়নি।

ত্রিগুণাতীতকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন। কিন্তু বলেছিলেন : "বেচারা ভাব্‌রা এইভাবে মরল! না, তার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।"

আঘাত ও মৃত্যুর মধ্যে কয়েকদিনের ব্যবধান। যে গুরুভাই তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার বড়ই বাসনা তাঁর হয়েছিল। সে-বছর (১৯১৫) স্বামীজীর জন্মতিথি পড়েছিল ১০ জানুয়ারি। ঐদিনই তাঁর শরীর যাবে—একথা বলেছিলেন সেবারত এক শিষ্যকে।

মৃত্যুর চেহারা স্বামী ত্রিগুণাতীতের অপরিচিত নয়। পথে-প্রান্তরে পর্বতে-অরণ্যে অনেক মৃত্যুর ঢেউ ঠেলে তিনি এগিয়েছেন। বহুদিন আগে তিব্বতে মানস সরোবরের পথে একটি মৃত্যুর সভাগৃহ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কিন্তু বড় আনন্দে সেই সময়টি কাটিয়েছিলেন। আলমোড়া থেকে যাত্রাকালে সেখানকার এক সহৃদয় মানুষ লালা বদ্রী শা

তাঁকে গরম জামা, কম্বল, জুতো ও প্রয়োজনীয় নানা জিনিসপত্র দেন। একটা কুলিও সঙ্গে দেন। কঠিন পথে চলবার সময়ে বোঝার ভার দুর্বহ মনে হচ্ছিল। এধারে কুলিরও কম্বল দরকার ছিল। সে কম্বলাদি নিয়ে উধাও হয়ে গেল। ত্রিগুণাতীত স্বস্তিবোধ করলেন, বোঝার দায় থেকে মুক্তি! ভাবলেন, কুলি কেন বাকি জিনিসগুলোও নিয়ে গেল না! দুর্গম দুরারোহ পথ। সেই পথে নিজের বোঝা বয়ে তিনি ১৬ মাইল এগোলেন। তারপর আর পারলেন না, বসে পড়লেন।

"রাত্রি ঘনাল—গভীর অন্ধকার কিন্তু নয়, তবে তীব্র ঠাণ্ডা।... মনোহারী তুষারশৃঙ্গ বেশি দূরে নয়। পাহাড়গুলির ওপরে অনেক উঁচুতে মাথা তুলে আছে ধব্ধবে শিখরগুলি। আমার চতুর্দিকে উপত্যকা ও তুষারশৃঙ্গ ছাড়া আর কিছু নেই। সুমহান দৃশ্য! নিম্নে সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে কত শুভ্র রেখা—সেগুলি পার্বত্য নির্ঝরিণীর ধারা—মনে হলো শুভ্র উপবীতধারী ব্রাহ্মণরা বসে আছেন। ওপরে অপূর্ব স্বচ্ছ নীল আকাশ—ঝক্‌ঝকে তারায় ভরা। জলপ্রপাতের মধুর শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। কী গম্ভীর! ধ্যানে বসলাম। প্রভু রামকৃষ্ণ ও মহামাতার ধ্যান। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ধ্যান। মুক্ত আকাশের নিচে কেটে গেল সারারাত্রি। জীবনের সবচেয়ে আনন্দের রাত্রি সেটি।"

আহত হবার পরবর্তী পনেরো দিনের অপরিসীম যন্ত্রণার মধ্যেও, ঐ একদা অপার রাত্রিতে রামকৃষ্ণ ও মহামাতার ধ্যান, স্বামী ত্রিগুণাতীতকে ঘিরে রেখেছিল। দেহ থেকে মুক্তি তিনি বেশ কিছুদিন চাইছিলেন। আটকে রেখেছিল 'মায়ের কাজে'র চিন্তা। মায়ের হাতের বজ্র সেই চিন্তাকে চূর্ণ ক'রে দিল। এবার বিদায়। নেতা ও ভ্রাতা বিবেকানন্দের নির্দেশে 'উদ্বোধন' শুরু করেছিলেন ভারতবর্ষে। বিবেকানন্দেরই ভাবধারার অনুসরণে আমেরিকায় গিয়েছেন মানবের মুক্তির জন্য অনন্ত মুক্তির বাণী প্রচার করতে। সেখানে আরম্ভ করেছিলেন—*Voice of Freedom*। এবার নিজের জন্য মুক্তির বাণী শুনলেন। বিবেকানন্দের জন্মদিনটিকে বেছেছিলেন নিজের মুক্তিদিন হিসাবে—বিবেকানন্দের কণ্ঠের সঙ্গীতটি তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিল তাঁর ভিতরে—"মন চল নিজ নিকেতনে"।

১৯১৫ সালের ১০ জানুয়ারি স্বামী ত্রিগুণাতীতের দেহান্ত হলো।

[তথ্যসংগ্রহে সাহায্য করেছেন স্বামী প্রভানন্দ, শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ, শ্রীবিমলকুমার ঘোষ, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বড়াল। 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের আনুকূল্যে সম্পাদকীয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি।]

উল্লেখপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. স্বামী গম্ভীরানন্দ, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা' ২য় ভাগ ১৯৮৯, পৃ. ১৫-১৬।

২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৯৬৩, পৃ. ২১০।

৩. ঐ, পৃ. ২১৫।

৪. স্বামীজী, সারদাপ্রসন্নকে নিজেই 'ত্রিগুণাতীতানন্দ' নাম দিয়েছিলেন, আবার নামের বহর দেখে, অর্থাৎ নিজ কীর্তির চেহারা দেখে, আঁতকে উঠে ত্রিগুণাতীতকে নিউ ইয়র্ক থেকে ১৭ জানুয়ারি ১৮৯৬ তারিখে লিখেছিলেন :

"তোর নামটা একটু ছোটখাট কর দেখি বাবা, কি নাম রে বাপ। একখানা বই হয়ে যায় এক নামের গুঁতোয়। ঐ যে বলে হরিনামের ভয়ে যম পালায়, তা 'হরি'—এই নামে নয়। ঐ যে গম্ভীর গম্ভীর নাম, 'অঘভগনরকবিনাশন, ত্রিপুবমদভঞ্জন, অশেষনিঃশেষকল্যাণকব' প্রভৃতি নামের গুঁতোয় যমের চৌদ্দপুরুষ পালায়।—নামটা একটু সরল করলে ভাল হয় না কি? এখন বোধহয় আব হবে না, ঢাক বেজে গেছে, কিন্তু কি জাঁহাদাবি যমতাড়ানে নামই করেছ।" (বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২১৫)।

'ত্রিগুণাতীতানন্দ' নিজ নাম থেকে 'আনন্দ' ছেঁটে দিয়ে কেবল 'ত্রিগুণাতীত' হয়েছিলেন।

৫. শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ২য় ভাগ, পৃ. ১০।

৬. বাণী ও বচনা, ৫ম খণ্ড, ১৯৬৩, পৃ. ৪৬৫-৪৬৬।

৭. এই লেখা-দুটি সঙ্কলিত হয়েছে মেরী লুইস বার্ক প্রণীত *Swami Trigunatita: His Life and Work* গ্রন্থে। (দ্র. ১৯৯৭ সং, পৃ. ৪৬, ৩৩৫-৩৬২)।

৮. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—৫ম খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, পৃ. ৫১।

৯. ঐ, পৃ. ৫৬-৬৩।

১০. ঐ, পৃ. ৯৭।

স্বামীজীব আবেদনে সাড়া দিয়ে মিস ম্যাকলাউড আটশ ডলার দিয়েছিলেন এবং তাতে 'উদ্বোধন'-এর প্রেস কেনা হয়েছিল—একথা মিস ম্যাকলাউড তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন। (দ্র. *Reminiscences of Swami Vivekananda* by His Eastern and Western Admirers, 1961, p. 245)।

মেরী লুইস বার্ক তাঁব ত্রিগুণাতীত-জীবনীতে 'উদ্বোধন'-এর জন্য মিস ম্যাকলাউডের আটশ ডলার দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ কবলেও যেন ঈষৎ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—ঐ টাকায় প্রেস কেনা হয়েছিল কিনা! (তাঁর বচনা বুঝতে আমাদের ভুল হতে পারে)। সন্দেহের কারণ হিসাবে তিনি শচীন্দ্রনাথ বসুর রচনার উল্লেখ করেছেন (সে-রচনাটি কিছু পরেই উদ্ধৃত করব), যাতে স্বামীজী ত্রিগুণাতীতকে এক হাজার টাকা দিয়ে বাকি প্রয়োজনীয় এক হাজার টাকা ধার করতে বলেন। এক্ষেত্রে স্বামীজীর দেওয়া ঐ হাজার টাকা মিস ম্যাকলাউডের দেওয়া টাকা হতে বাধা কোথায়? স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা স্বামীজীর চিঠিতে পাই (পরে উদ্ধৃত হবে) তিনি 'উদ্বোধন'-এর জন্য বারশ টাকা দিয়েছিলেন। জানিনা, তখনকার মুদ্রামানে আটশ ডলার কত টাকা হতো? তা কি বারশ টাকা হওয়া সম্ভব? মনে হয় তা আবো বেশি।

১১. ঐ, পৃ. ৫৩।

১২. ঐ, পৃ. ৫৩-৫৪।

১৩. 'বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪।

১৪. 'উদ্বোধন', ৫০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৫, পৃ. ৩৯৪।

১৫. 'সমকালীন ভারতবর্ষ', ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪-২০৫।

১৬. বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'সমকালীন ভারতবর্ষ'-এর ৫ম খণ্ডের ২০৫-২৩৪ পৃষ্ঠা পঠিতব্য।

১৭. 'সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের ২১২-২১৬ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

[উদ্বোধন পত্রিকার '১০০ বর্ষ' মাঘ ১৪০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত]

মাদ্রাজের ‘হিন্দু’ পত্রিকায় স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৯৩-১৯০২)

॥ এক ॥

অধ্যাপক কে সুন্দররাম আয়ার তাঁর বিবেকানন্দ-স্মৃতিকথায় ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় স্বামীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মাদ্রাজ শহরের উত্তাল উন্মাদনা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে যখন ‘হিন্দু’ পত্রিকার মুখ্য সম্পাদকীয়ের উল্লেখ করলেন, তখন একথা অনুমান করা শক্ত নয়, মাদ্রাজের সচেতন জনচিত্তে পত্রিকাটির কোন্ বিপুল প্রভাব ছিল। “পাশ্চাত্যে স্বামীজীর কার্যাবলী সম্বন্ধে গোড়ায় সর্বোচ্চ উদ্দীপনার ভাষায় গুণগান করার পরে ‘হিন্দু’ [অধ্যাপক আয়ার লিখেছেন] পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ শেষের দিকে প্রবল আবেগের উত্তাপে যেন বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃপক্ষে এখনো সুস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, শিক্ষিত নেতৃবৃন্দের অনেকেই উক্ত রচনার শেষের কথাগুলি কিভাবে উদ্ধৃত করতেন এবং প্রশ্ন করতেন—এমন কে থাকতে পারেন যিনি মানবসমাজের মঙ্গলসাধনে এবং তার অগ্রগতিতে স্বামীজীর মহান কার্যের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পারবেন?”[১]

বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিরা ‘দ্য লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ’ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড (১ম সংস্করণ) এবং ‘বেদান্ত কেশরী’ পত্রিকায় প্রকাশিত (পরে ‘দ্য রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ’ গ্রন্থে সংকলিত) অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের দুটি তথ্যপূর্ণ সুলিখিত রচনার সঙ্গে পরিচিত। মাদ্রাজের বুদ্ধিজীবীমহলে অধ্যাপক আয়ার পরিচিত চরিত্র। মাদ্রাজের সরকারি শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, শিক্ষাবিভাগই তাঁকে ত্রিবাঙ্কুরের প্রথম রাজকুমার মার্তণ্ড বর্মার গৃহশিক্ষক করেছিল। ত্রিবান্দ্রামে ১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। তাঁর মনীষা ও রচনাশক্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রদর্শনবিদ্ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, “কে সুন্দররাম আয়ারই (১৮৫৪-১৯৩৮) হলেন শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত প্রথম ব্যক্তি, যিনি ১৯ শতকের শেষ ১৫ বৎসরকালে সংগঠিত সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সংস্থা ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস’-এই নামটির ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন রাষ্ট্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে।” অধ্যাপক আয়ারের আপত্তির কারণ, ইউরোপীয় দেশসমূহে যেখানে ‘ন্যাশন্যাল মুভমেন্ট’ হয়েছে সেখানে স্বভূমি থেকে বিদেশী অধিকারীদের উৎখাত করে স্ব-শাসন প্রবর্তন করার সংগ্রাম করা হয়েছে; কিন্তু ভারতে ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস’-এর তেমন কোনও লক্ষ্য নেই; তাঁরা রাজনৈতিক বিপ্লব চান না; নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দ্বারা কিছু রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা পেলেই তুষ্ট, ইত্যাদি। জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে

অধ্যাপক আয়ার এই সমালোচনা অতি কঠিন ভাষাতে করেছিলেন তাঁর *Four Political Essays* (মাদ্রাজ, ১৯০৩) বইয়ের মধ্যে—সেই বইটি তিনি উৎসর্গ করেন "আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ"-এর নামে। আমরা ধরে নিতে পারি, এই কাজ করার সময়ে অধ্যাপক আয়ার কংগ্রেস এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণার বিষয়ে অবশ্যই অবহিত ছিলেন।[২]

অধ্যাপক আয়ারের যে-দুটি বিবেকানন্দ-স্মৃতির উল্লেখ উপরে করেছি, তাদের প্রথমটি ১৮৯২ সালের শেষভাগে, অর্থাৎ আমেরিকায় যাবার আগে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে কিছু মূল্যবান সংবাদবাহী বলে মূল্যবান। সাধারণে অপরিচিত পরিব্রাজক ভিক্ষুক এক তরুণ সন্ন্যাসীকে যে তিনি অন্য অনেকের মতোই মহাশক্তিধর রাজকীয় মহিমাসম্পন্ন পুরুষরূপে দর্শন করেছিলেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। স্বামীজীর সঙ্গীত-ঝঙ্কারিত কণ্ঠস্বর, বিশাল উজ্জ্বল নয়ন, বিতর্কে পটুতা, কখনো ঝলসানো বাক্য কখনো মধুকোমল শান্ত বাণী—এসবই পরিব্রাজক বিবেকানন্দের অন্য স্মৃতিকথাগুলি থেকে পেয়ে যাই, পেয়ে যাই বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক-বিচারের কথাও, তৎসহ ঈশ্বর-নির্ভরতার কথা; কিন্তু সামাজিক প্রশ্নে স্বামীজীর মনোভাবের বিষয়ে যেসব কথা এখানে পাই তাদের বিশেষ মূল্য আছে একটি প্রশ্নের মীমাংসায়—ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে স্বামীজীর চাঞ্চল্যকর একাধিক সামাজিক বক্তব্য সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হয়—সে সকলই কি তাঁর পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার ফল? কথাটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। একথা বলা যাবে অধ্যাপক আয়ারের স্মৃতিকথার সাহায্যে, এবং ট্রিপ্লিকেন লিটারারি সোসাইটিতে প্রদত্ত পরিব্রাজক স্বামীজীর বক্তৃতার যে-রিপোর্ট দক্ষিণ ভারত থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম—তার সাহায্যেও। শেষোক্ত রিপোর্টের আলোচনা আমরা 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে করেছি। অধ্যাপক আয়ারের স্মৃতিকথায় দেখতে পাচ্ছি, স্বামীজী ধর্মক্ষেত্রে জাতিভেদের বিরোধী, কেবল হিন্দুধর্মের অন্তর্গত জাতিসমূহের ক্ষেত্রে নয়, মুসলমানদের ক্ষেত্রেও তাঁর 'ছুঁই-ছুঁই' বাতিক ছিল না; তিনি দুদিন বিনা আহারে কাটিয়ে পদব্রজে যখন এক মুসলিম পিয়ন সঙ্গীকে নিয়ে ত্রিবান্দ্রমে অধ্যাপক আয়ারের বাড়িতে পৌঁছেছিলেন, তখন উক্ত সঙ্গীকে আগে আহার না করিয়ে নিজে কোনো আহার্য গ্রহণে স্বীকৃত হননি। অধ্যাপক আয়ারের বাড়িতে আলোচনাকালে তিনি ধর্মের নামে ক্ষতিকর কতকগুলি দেশাচার আঁকড়ে থাকার প্রবণতার কঠোর সমালোচনা করেন। ঐ ব্রাহ্মণ-বাড়িতে বসে দ্বিধাহীন কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, অন্য বর্ণগুলির মতো ব্রাহ্মণদের ধমনীতেও বইছে মিশ্র রক্তের ধারা। বলেছিলেন, হিন্দুসমাজের অপ-স্মৃতিশাস্ত্রের শিকার শূদ্র ও নারীর অবশ্যই আছে সর্বশ্রেণীর গ্রন্থপাঠে এবং সর্বোচ্চ সংস্কৃতিতে অধিকার; আত্মনিয়ন্ত্রণে তারা সম্পূর্ণ অধিকারী। সম-অধিকার না থাকার কারণে জাতীয় জীবন কিভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে সে-কথাও তিনি বলেছেন। সেইসঙ্গে তিনি আঘাত করেছেন কূপমণ্ডূকতাকে, সমর্থন করেছেন হিন্দুর সমুদ্রযাত্রাকে।[৩]

॥ দুই ॥

'হিন্দু' পত্রিকায় বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে ওপরের কথাগুলি বলার বিশেষ কারণ—পত্রিকাটি, বিশেযত তার সম্পাদক জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার, সামাজিক প্রশ্নে বিশেষভাবে সংস্কারপন্থী। আমেরিকায় স্বামীজীর সাফল্যের জয়গান যখন 'হিন্দু' করেছিল, তার মূলে স্বামীজী কর্তৃক জাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির গৌরববৃদ্ধি তো ছিলই, সেইসঙ্গে ছিল সমাজ বিষয়ে তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি।

অধ্যাপক সুন্দররামের দ্বিতীয় স্মৃতিকথায় পাই, জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার গোড়ায় ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু, বৈদিক আচারাদি নিষ্ঠাভরে পালন করতেন; পরে সম্পূর্ণ উলটোদিকে ঘুরে যান, রীতিমত বৈপ্লবিক সংস্কারপন্থী হয়ে পড়েন, যখন তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার বালবৈধব্য ঘটে এবং সেই বালিকার সামনে ছিল হৃদয়হীন সামাজিক অনুশাসনের বাধ্যতামূলক অনুসরণ। অন্য সূত্র থেকে আমরা জেনেছি, সমাজের রোষদৃষ্টিকে পরোয়া না ক'রে সুব্রহ্মণ্য আয়ার তাঁর বালবিধবা কন্যাটির বিয়ে দিয়েছিলেন। মাদ্রাজে ১৮৯৭ সালে স্বামীজীর বক্তৃতাকালে সুব্রহ্মণ্য আয়ারের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অধ্যাপক সুন্দররাম লিখেছেন :

> "পরদিন শনিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি, স্বামীজী পচেয়াপ্পা হল-এ 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন। হল কানায় কানায় ভর্তি। আমি ছিলাম প্ল্যাটফর্মের ওপর। আর ঠিক আমার পাশে বসেছিলেন 'হিন্দু'র সম্পাদক মিঃ জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার। বক্তৃতার মাঝখানে একসময়ে স্বামীজী তাঁর সামনে উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ ক'রে বলেন, কেবল 'গীতা, গীতা, গীতা' বলে চেঁচিও না। গীতার শিক্ষা তোমরা কদাপি ঠিক-ঠিক বুঝতে বা কাজে লাগাতে পারবে না, কারণ এই তো তোমাদের দুর্বল শরীর, পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করতে করতে অকালে তোমাদের প্রাণশক্তি ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। যাও—ফুটবল খেল গে, পেশী শক্ত করো, শক্তিশালী হও; তখনই তোমরা গীতার শিক্ষা উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করবে। মিঃ জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার এখন সুযোগ পেয়ে গেলেন—কাছাকাছি যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের উদ্দেশে তিনি, স্বামীজী তখনো বক্তৃতা দিচ্ছেন, তারই মধ্যে—সোচ্চারে বলে উঠলেন, 'এই একই কথা আমি প্রায় বলি, কিন্তু কেউ কান দেয় না—এখন স্বামীজী যখন বলছেন, তোমরা তো সকলে হাততালি দেবেই।' 'শক্তি' ও 'নির্ভীকতা' প্রসঙ্গে স্বামীজী যখন বললেন—ঐ দুই গুণ না থাকলে কেউ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির শিখরে উত্থিত হতে পারবে না—তখন মিঃ সুব্রহ্মণ্য আয়ার ভাবাবেগে একেবারে বিহ্বল। স্বামীজীর এই কথাগুলি কাঁপিয়ে মাতিয়ে দিয়েছিল—'বিশ্বাস কর, তোমরা কেবল শরীর ও মন নও, তোমরা স্বয়ং আত্মা; আর সেই বিশ্বাস এলে তোমরা উপনিষদের শিক্ষাকে উপলব্ধি ও প্রচার করার পক্ষে প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জনের প্রথম সোপানে পদক্ষেপ করবে।' "

অধ্যাপক সুন্দররাম এর পরে যেকথা লিখেছেন তাতে জি সুব্রহ্মণ্য আয়ারের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যাবলী সম্বন্ধে চকিত আলোকপাত ঘটেছে : "মিঃ জি সুব্রহ্মণ্য আয়ারের উদ্দীপনা ও ভাবাবেগ কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল যখন স্বামীজী জাতিভেদ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

ও বস্তু কেবল ভারতে নয়, তিনি পৃথিবীর যেসব জায়গা দেখেছেন, সেই সকল জায়গাতেই রয়েছে।'"[৪]

'হিন্দু' পত্রিকার সূচনার কাহিনী এবং প্রতিষ্ঠাতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় গ্রহণ করলেই অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের মন্তব্যের ব্যাখ্যা আমরা পেয়ে যাব।

॥ তিন ॥

'হিন্দু' পত্রিকার ছোট-বড় যে-কোনো ইতিহাসেই দেখা যায়—এটি ছয়টি 'রাগী যুবক'-এর সৃষ্টি। এঁদের অগ্রগণ্য জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার, তাঁর ঠিক পাশেই ছিলেন এম বীররাঘবাচার্য। বাকি চারজন হলেন টি টি রঙ্গাচার্য, পি ভি রঙ্গাচার্য, ডি কেশব রাও পন্থ এবং এন সুব্বা রাও পুন্টুলু। এঁরা সকলেই প্রগতিশীল সামাজিক সংস্থা ট্রিপ্লিকেন লিটারারি সোসাইটির সঙ্গে জড়িত।[৫]

'রাগী যুবকেরা' (কেউ কেউ বলেন 'দুঃসাহসী অভিযাত্রী যুবকেরা') প্রতিবাদ জানাতে পত্রিকাটি শুরু করেন। টি মুথুস্বামী আয়ারকে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত করা হলে সাহেবী কাগজগুলি দারুণ রকম রাগারাগি শুরু করে। এক্ষেত্রে ভারতীয় পক্ষে প্রতিবাদ জানানো প্রয়োজন ছিল। সেই উদ্দেশ্যে উক্ত যুবকেরা ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ তারিখে ১ টাকা ১২ আনা ধার ক'রে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা ৮০ কপি ছাপিয়ে ফেললেন, দাম ৪ আনা, প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় বেরুবে, নাম—'হিন্দু'। প্রতিষ্ঠাতা ছোকরাদের বয়স অল্প, কিন্তু উৎসাহ প্রচুর এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ। ইতিমধ্যে দেশীয়দের হাতে যে-দুএকটি সংবাদপত্রের জন্ম এবং অকালমৃত্যু ঘটেছিল ('নেটিভ পাবলিক ওপিনিয়ন', 'পীপলস ফ্রেন্ড', 'ম্যাড্রাসী'), সেই সম্ভাব্য শোকজনক ভবিষ্যতের চিন্তা এঁদের বিচলিত করতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যে উক্ত ছয়জনের শেষ চারজন বৃত্তিজীবনে প্রবেশ ক'রে পত্রিকাটির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেও প্রথম দুজন (দুজনই শিক্ষক) বজায় রইলেন, তাঁরাই হলেন পত্রিকার মালিক। তাঁদের প্রথম জন অর্থাৎ জি সুব্রহ্মণ্য আয়ারের ছিল বেপরোয়া সাহস, তেজ এবং রচনাশক্তি, আর দ্বিতীয় জন এম বীররাঘবাচার্যের ছিল সংগঠনশক্তি ও ব্যবসায়বুদ্ধি।[৬] লড়াই ক'রে বেঁচে থাকা এবং বেড়ে ওঠার স্মরণীয় ইতিহাস 'হিন্দু' সৃষ্টি করেছিল। যেখানে তার প্রায় কোনো আর্থিক সামর্থ্য নেই, পাঠক-সংখ্যা নগণ্য, সেখানে তাকে যুঝতে হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত সাহেবী কাগজ 'মাদ্রাজ মেল' ও 'মাদ্রাজ টাইমস'-এর সঙ্গে। নিতান্ত অসমান সেই লড়াই। "অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলি ভারতীয় পত্রিকার তুলনায় অবশ্যই অধিক শক্তিশালী, অধিক সম্পন্ন, অধিক প্রভাবশালী [সুব্রহ্মণ্য আয়ার লিখেছেন]। তাঁরা তাঁদের ব্যবসা বুঝতেন; তাঁরা যেসব সুযোগ-সুবিধা পেতেন আমরা তা পাইনি। ইংরেজের কাছে সাংবাদিকতা ব্যবসার জিনিস, তা গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়, কিন্তু ভারতীয়দের কাছে সাংবাদিকতা তারও অনেক বেশি ঐকান্তিক ব্যাপার, যা দেশস্বার্থের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।"[৭]

'হিন্দু'র অগ্রগতি থামেনি। ১৮৮৩ সালে তা সপ্তাহে তিনদিন বেরুতে শুরু করে, তারপরে ১৮৮৯-এর ১ এপ্রিল থেকে ১২ পৃষ্ঠার সান্ধ্য দৈনিক।[৮] 'হিন্দু' ইতিমধ্যে কিছু প্রভাবশালী

ব্যক্তির সমর্থন ও সাহায্য পেয়েছে, কয়েক বছর পরে কয়েকজন লেখককর্মীর সাহায্যও, যেমন কে সুব্বা রাও, সি করুণাকরণ মেনন, কে নটরাজন ('ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার' কাগজের দীর্ঘকালের সম্পাদক)।[৯] তবু দেখা যাবে, সম্পাদক জি সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে সম্পাদকীয় রচনার অতিরিক্ত পত্রিকা অফিসের নানা কাজ করতে হচ্ছিল, যার মধ্যে ছিল প্রচুর চিঠিপত্র লেখা। সম্পাদকীয় রচনার বিরাট দায়িত্বের কথাও স্মরণ করতে হবে, যা কার্যত তিনি একাই করতেন এবং বড় মাপে তা করতে হতো, যেহেতু সংবাদপত্রটিতে 'সংবাদের তুলনায় মতবাদ' প্রাধান্য পেত।[১০] 'হিন্দু' প্রধানত মাদ্রাজের, অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের সংবাদপত্র, অচিরে তা দক্ষিণ ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত প্রভাবশালী সংবাদপত্র হয়ে উঠেছিল—কিন্তু প্রথমাবধি তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চরিত্রগ্রহণেও সচেষ্ট ছিল। তাতে থাকত 'লন্ডন লেটার্স', 'অ্যাংলো-ব্রিটিশ টপিক্স', ভারতীয় ও ইংরেজী সংবাদপত্রের সংবাদ সংকলন, 'ক্যালকাটা লেটার্স' (এককালীন লেখক বিপিনচন্দ্র পাল, যিনি কিছুদিন 'লন্ডন লেটার'ও লিখেছেন), 'বম্বে লেটার্স' এবং অবশ্যই বহুসংখ্যক 'লেটার্স টু দ্য এডিটর'—যা দেশের নানা দিক থেকে আসত।[১১] লোকমান্য তিলকের সহযোগী, পুনার সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকা 'মরাঠা'র সম্পাদক এন সি কেলকার, 'ইন্ডিয়ান জার্নালিজম ইন দ্য নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী' নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধের ('ইন্ডিয়ান রিভিউ' থেকে 'মরাঠা' পত্রিকায় ২৭ জানুয়ারি ১৯০১ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত) মধ্যে 'হিন্দু' সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা ক'রে বলেছেন, "কয়েকটি শিক্ষিত যুবক. যাদের পয়সা নেই কিন্তু মেধা ও কামড়ে থাকার শক্তি আছে, তারা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কী করতে পারে—'হিন্দু'র সাফল্য তারই জ্বলন্ত নিদর্শন। এই দৈনিক পত্রটিকে ভারতীয়রা নিজেদের সাংবাদিক মর্যাদা এবং সামর্থ্যের উত্তম নমুনা হিসাবে হাজির করতে পারে।" 'হিন্দু' যখন 'লিমিটেড' হল তখন 'মরাঠা' ১৬ জুন ১৯০১ তারিখে সম্পাদকীয়তে পুনশ্চ পত্রিকাটির প্রশংসা করল। 'হিন্দু'র সূচনা থেকে অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার কালে সে জানাল : "হিন্দু'র আদি সাফল্য ঘটেছে মিঃ জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও মিঃ বীররাঘবাচার্যের যৌথ উদ্যোগের ফলে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রথম জনের সামর্থ্য এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় জনের সামর্থ্যের জন্য তা সম্ভব হয়েছে। ভারতের দেশীয় ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে অগ্রগণ্য এক সংবাদপত্র হবার যোগ্য চরিত্র তাঁরা 'হিন্দু'র জন্য নির্মাণ করেছেন।" পত্রিকা-জগতে অবিস্মরণীয় 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জি সুব্রহ্মণ্য আয়ারের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীর পর্যালোচনা ক'রে লেখেন : "একথা অনেকেরই জানা নেই যে, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, (স্যার) ফিরোজ শা মেটা, ইয়ার্ডলে নর্টন এবং উইলিয়ম ডিগবি মিঃ আয়ারের সম্পাদনাকালে 'হিন্দু' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন।" তিনি আরও লেখেন : "সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে সঙ্গতভাবেই মাদ্রাজের সাংবাদিকতার জনক বলা হয়েছে।"[১২]

॥ চার ॥

'হিন্দু' শুরু হয়েছিল পরাধীন ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্রে ভারতীয়দের অধিকার-প্রতিষ্ঠার দাবি-সূত্রে। অর্থাৎ তা রাজনৈতিক প্রয়োজন। জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার অত্যন্ত রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তি ছিলেন; শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রথম প্রস্তাবের উত্থাপক তিনিই।[১৩] পরবর্তী কালে তিনি বহু রাজনৈতিক সম্মেলনে নেতৃত্ব করেছেন। এইসঙ্গে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত, রাজনৈতিক ধারণায় তিনি ছিলেন মডারেট, ইংরেজ-বর্জিত ভারত—এই চিন্তার প্রশ্রয় তিনি দেননি এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সশ্রদ্ধায় মেনে নিয়েছিলেন। 'হিন্দু'র প্রথম সম্পাদকীয়তে লেখা হয় : "আমরা যথাসম্ভব রাজনীতি প্রসঙ্গে নিজেদের আবদ্ধ রাখব।" পাশ্চাত্য সভ্যতার ও শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রে তাতে বলা হয় : "আমরা সেই শ্রেণীর অন্তর্গত নই যাঁরা পাশ্চাত্য শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে সরকারের যে-কোনও কাজের দোষ ধরেন।" তবে যাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে পুরো গা ভাসিয়ে দেন, পত্রিকাটি তাদের দলেও নয়—একথাও জানানো হয়।[১৪] 'হিন্দু' ক্রমান্বয়ে বলতে থাকে, তার সংঘর্ষ সরকারের সঙ্গে নয়—সংঘর্ষ অন্যায়কারী আমলাতন্ত্রের সঙ্গে। অপরপক্ষে রাজানুগত্য ঘোষণাতেও সে সর্বদা সোচ্চার। পৃথিবীর নিয়তি "ইউরোপ, বিশেষত ব্রিটেনের দ্বারা শাসিত হওয়া।" ১৮৯৪ সালে 'হিন্দু' লিখেছিল : "মানবজীবনকে, যা কিছু অর্থবহ করে—যার অন্তর্গত সুখ মর্যাদা এবং প্রগতিচেতনা—সেই সবকিছুর জন্য ভারতীয়রা ব্রিটিশ শাসনের কাছে কী-না বিপুল পরিমাণে ঋণী!"[১৫] বহু বছর ধরে 'হিন্দু' এই মনোভাব বজায় রেখেছিল।

ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে গাঁটছড়াবাঁধা খ্রীস্টান মিশনারিদের বৃহৎ অংশ সম্বন্ধে 'হিন্দু' ছিল প্রশংসাকাতর। পত্রিকা-সূচনার সম্পাদকীয়তে 'হিন্দু' বলেছিল : জাতীয় প্রগতির সঙ্গে যেটুকু রক্ষণশীলতা সঙ্গতিপূর্ণ আমরা ততটুকুই রক্ষণশীল, তাই বলে মিশনারিদের অযথা সমালোচনা করতে রাজি নই। "ধর্মব্যাপারে ইদানীংকালে কখনো-কখনো এক শ্রেণীর মিশনারির আচার-আচরণ সম্বন্ধে [ভারতীয় মহলে] তিক্ততাপূর্ণ সন্দেহের মনোভাব দেখা যাচ্ছে; এক্ষেত্রে আমরা কঠোরতম নিরপেক্ষতা অবলম্বন করব, কোনও সাম্প্রদায়িক বিতর্ককে আমরা কদাপি আমাদের পত্রিকার স্তম্ভে স্থান দেব না।"[১৬] কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে দেখা যাচ্ছিল, মিশনারিদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ সমাদরে ক্রমেই পত্রিকাটির পৃষ্ঠা পূর্ণ।

রাজনীতি অপেক্ষা হিন্দুসমাজ-সংস্কার 'হিন্দু' পত্রিকায় কম গুরুত্ব পায়নি। 'হিন্দু' পত্রিকার তরুণ প্রতিষ্ঠাতারা ট্রিপ্লিকেন লিটার‍্যারি সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেখানে প্রগতিশীল ভাবধারার উপর আলোচনাদি হতো। 'হিন্দু' পত্রিকার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা পত্রিকাটির এই বিষয়ে মতামতের ওঠাপড়া লক্ষ্য করেছেন। 'হিন্দু' গোড়ায় উগ্রভাবে সমাজসংস্কারের এবং সংস্কারের ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু ক্রমে বিধবাবিবাহের পক্ষে এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ প্রচারক হয়ে পড়ে। যে-কোনো উপায়ে সংস্কারের সমর্থন সে করতে থাকে। তার সমর্থিত প্রধান সংস্কারগুলি ভারতের অন্য স্থানের সংস্কার-আন্দোলনের লক্ষ্যের অনুরূপ ছিল—বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং জাতিভেদ। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে প্রাধান্য

পেয়েছিল সমুদ্রযাত্রা ও দেবদাসী প্রথা। ১৮৯২ সাল থেকে 'হিন্দু'-সম্পাদকের কলম হিন্দুসমাজের ওপর আক্রমণে খরশান হয়ে ওঠে। ১৮৯৩-এর জানুয়ারিতে অতি কঠিন এক রচনায় তিনি লেখেন : "হিন্দুজাতি এমন কোনো বিরাট পুরুষ সৃষ্টি করতে সমর্থ নয় যিনি [অন্য জাতির] গৌরবময় বীরপুরুষদের সঙ্গে তুলনায় দাঁড়াতে পারেন—যাঁর আছে বিপুল মৌলিকতা, নৈতিক শক্তি, অদম্য উদ্যোগ—যেসব গুণ অর্জন ক'রে ইউরোপের পুরুষেরা ইউরোপকে পৃথিবীর রানী ক'রে তুলেছে। হিন্দুজাতি সেরকম চরিত্র সৃষ্টি করতে পারবে না যতদিন পর্যন্ত না সে চারিদিকে ছড়ানো বাধাকে ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে আসতে পারছে ব্যক্তিজীবনের উন্মুক্ততর স্বাধীনতার পরিবেশের মধ্যে।"[১৭] একই বছরে 'হিন্দু' জাতিভেদ প্রশ্নে খোলাখুলি বলে—পারিয়াদের কোনো উন্নতি যখন হিন্দুসমাজ করতে পারবে না তখন তাদের ভালোর জন্য তাদের মিশনারিদের হাতে তুলে দেওয়াই ভালো। "আমাদের ধর্মের যত গুণগানই করা হোক তা ঐসব দরিদ্র লোকদের সামাজিক মুক্তি আনবে না। সে-কাজ করতে পারেন কেবল খ্রীস্টান মিশনারিরাই. তাঁরাই পারিয়াদের শিক্ষা দিয়ে সর্ববিধ পার্থিব অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিতে পারেন।"[১৮] বলা বাহুল্য, 'হিন্দু'র এই ধরনের কথাবার্তায় শিক্ষিত হিন্দুমহলে চাঞ্চল্য পড়ে যায় এবং নানাবিধ প্রতিবাদ হতে থাকে। 'হিন্দু' কিন্তু তার লেখা থামায় নি।

আমাদের আলোচ্য কালের (১৮৯৩-১৯০২) মধ্যে 'হিন্দু'র সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কি বদলেছিল?

সে-কথার আগে বলে নেওয়া ভালো, আমরা এই পর্বের সন্ধানকালে 'হিন্দু'র সব সংখ্যা পাইনি। সবচেয়ে ক্ষতিকর হয়েছে আমাদের গবেষণার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সংখ্যাগুলির অধিকাংশ না-পাওয়া, এবং যেগুলি পাওয়া গেছে সেগুলিরও বড় অংশ ছিন্নভিন্ন থাকা। তবু শেষপর্যন্ত যা সংগ্রহ করা গেছে তার পরিমাণও অল্প নয়।

'হিন্দু' সম্পর্কে ইদানীং-রচিত গ্রন্থাদিতে বা গ্রন্থভুক্ত অধ্যায়ে বা বিভিন্ন প্রবন্ধে যেসব আলোচনা আমরা দেখেছি, খুবই বিস্ময়ের কথা, সে-সকলের মধ্যে 'হিন্দু'র উপর প্রভাববিস্তারকারী শক্তি হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের নাম নেই। অথচ কয়েক বছর ধরে স্বামী বিবেকানন্দ 'হিন্দু'তে সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আলোচিত এবং বন্দিত চরিত্র। পরবর্তী কালে 'হিন্দু'র বিষয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মন রাজনীতির দ্বারা ভুক্ত; আর যদি-বা তাঁরা সমাজপ্রসঙ্গ এনেছেন সেখানে পাশ্চাত্যপন্থী সমাজসংস্কারকদের বাঁধাধরা পথের বাইরে যেতে গররাজি। স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা সম্বন্ধে মনোযোগ দেবার সময় বা উৎসাহ তাঁরা বোধ করেন নি। এই পর্বের 'হিন্দু' তাঁরা সরাসরি কতখানি দেখেছেন, তাও স্পষ্ট নয়।

১৮৯৩ সালের গোড়ায় হিন্দুসমাজ সম্পর্কে 'হিন্দু'-সম্পাদকের অতি তিক্ত মনোভাবের এবং একই সঙ্গে খ্রীস্টান মিশনারিদের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত আবেগের কথা বলেছি। মাদ্রাজের বহুমানিত শিক্ষাবিদ্ রেভারেন্ড জন হেনরি মিলার ১৮৯২ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রস্তাবিত শিকাগো পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নের সংবাদ জানিয়ে রক্ষণশীল হিন্দুদের ঐ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান 'হিন্দু' পত্রিকায় এক পত্রের মাধ্যমে। এই সূত্রে 'হিন্দু'-সম্পাদক লিখে বসেন : "আধুনিক সমাজজীবনের বাস্তব সমস্যাসমূহের উপরে

ব্রহ্মণ্যধর্ম যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারে না।" 'হিন্দু'তে এই নিয়ে নানা পত্র বেরোয়। তার মধ্যে সংস্কারপন্থীরা সদর্পে বলেন : "**হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। তার জীবন নিঃশেষিত, গতি স্তব্ধ, তার শেষ বক্তব্য বহু পূর্বেই বলা হয়ে গেছে। হিন্দুসমাজ যথার্থই এক শ্বেতশুভ্র সমাধিভূমি, যার তলায় চাপা আছে মানুষের পক্ষে সম্ভবপর সকল পাপের পুঞ্জ।**"[১২] নানাদিক থেকে এইসব কথার প্রতিবাদ হলো। 'ডন সোসাইটি'-খ্যাত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যখন শুনলেন, 'হিন্দু'-সম্পাদককে হিন্দুদের প্রতিনিধি ক'রে শিকাগো ধর্মমহাসভায় পাঠাবার কথা হচ্ছে, তখন তিনি আপত্তি জানিয়ে বললেন : "সম্ভবত পত্রিকাটির নাম ধর্মমহাসভার সংগঠকদের চোখে ধুলো দিয়েছে।" 'কর্নাটক প্রকাশিকা' ৩ অগস্ট ১৮৯৩ সংখ্যায় 'হিন্দু'-সম্পাদকের খ্রীস্টান মিশনারি-প্রীতির উল্লেখ ক'রে রূঢ়ভাবে লেখে : "এই যাঁর মত, তাঁর উচিত, ন্যায়ের খাতিরে হয় পত্রিকাটির নাম বদলে দেওয়া, নচেৎ পদত্যাগ করা। তা যদি তিনি না করেন তাহলে বুঝতে হবে, ধাপ্পাবাজি করতেই তিনি চান।"[১৩]

'হিন্দু'-সম্পাদক সত্যিই পদত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু ১৮৯৮ সালের আগে নয়। তার আগে কয়েক বছরে (১৮৯৩-১৮৯৭) তিনি এবং তাঁর পত্রিকা স্বামী বিবেকানন্দকে কিভাবে দেখেছে ও প্রকাশ করেছে, বিবেকানন্দ-নামক আবির্ভাব সম্পাদকের চিন্তাজগতে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল কিনা, তাই আমরা এরপরে লক্ষ্য করব। তার পূর্বে জানিয়ে রাখা ভালো, 'হিন্দু'-সম্পাদকের উগ্র সামাজিক মত 'হিন্দু'র ব্যবসায়িক ক্ষতি ঘটাচ্ছিল। তাঁর সরে যাওয়ার অন্যতম কারণ তাই। তাছাড়া তিনি স্বাধীনভাবে তামিল পত্রিকা 'স্বদেশমিত্রম' সম্পাদনা করতেও চাইছিলেন।

॥ পাঁচ ॥

সন্দেহ নেই, 'হিন্দু'-সম্পাদক ১৮৯৩-এর শেষে বিশ্বমঞ্চে বিবেকানন্দের আবির্ভাব এবং কয়েক বছর পরে ভারতে তাঁর প্রত্যাবর্তনের আলোড়নকারী ঘটনাবলীতে বিশেষভাবে নাড়া খেয়েছিলেন। হিন্দুধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে যে গভীর নৈরাশ্যে তাঁর মন পূর্ণ ছিল, সেখানে কিছুটা আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হয় এবং সমাজসংস্কার সম্বন্ধে একমুখী মনোভাবকে কিছুটা বাস্তবমুখী করতে সমর্থন হন। 'হিন্দু'র পূর্বতন বক্তব্য ও পরবর্তী বক্তব্যের কিছু অংশকে পাশাপাশি রেখে তা দেখা যেতে পারে।

১৮৯২ এবং ১৮৯৩-এর গোড়ায় 'হিন্দু' পত্রিকার রচনাদিতে দেখা যায়, আগেই সেকথা বলেছি—হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান অসম্ভব, তা এমন এক "সমাধিভূমি" যার নিচে আছে "পাপের পুঞ্জ"। সেই একই 'হিন্দু' অল্প কয়েক মাসের ব্যবধানে উচ্ছ্বসিত ভাষায় হিন্দুধর্মের নবজাগরণের কথা ঘোষণা করল। সে-ব্যাপারে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির উল্লেখ সামান্য মাত্রায় করলেও আসল গুণগৌরব অর্পণ করেছিল স্বামীজীর উপরেই। ১৮৯৪-এর ১ মে, 'হিন্দু' এক দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে সেকথা খোলাখুলি বলল। তার আগে এই পত্রিকায় স্বামীজী সংক্রান্ত আমেরিকান সংবাদপত্রের উচ্চপ্রশংসাপূর্ণ বহু সংবাদ সংকলিত হয়েছে। যথা— ১৮৯৩-এর ১৭ নভেম্বর 'বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট'-এর বর্ণনা, ১৮৯৪-এর ১৬ জানুয়ারি

বিবেকানন্দের ধর্মসমন্বয়ের মহাবাণীর উদ্ধৃতি, ঐ বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি 'লন্ডন স্পেকটেটর'-এর বিবরণ, ৬ মার্চ ধর্মমহাসভার বিজ্ঞান শাখার সভাপতি মারউইন-মেরি স্নেলের বিবেকানন্দ-স্তুতি। এর মধ্যে ৬ মার্চ অভ্যস্ত সতর্কতাবশে বিবেকানন্দ সম্পর্কে 'হিন্দু' নিজে মন্তব্য না ক'রে উদ্ধৃত করেছে 'ইন্ডিয়ান মিরার'-এর ভাবাবেগপূর্ণ দীর্ঘ সম্পাদকীয়, যা কার্যত তার নিজ মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি। তারপর সে প্রকাশ করল মাদ্রাজে বিবেকানন্দের অভিনন্দন-সভার দীর্ঘ বিবরণী—৩০ এপ্রিল ১৮৯৪। ঘটনাটি ছিল বিস্ময়কর। বহুদূরে সমুদ্রপারে অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ প্রেম ও শান্তির ধর্ম প্রচার করেছেন। সে এমন ধর্ম, যা ঈশ্বরের সমীপে মানুষকে নিয়ে যায়, মানুষকে ঈশ্বর ক'রে তোলে, সমগ্র মানবজাতিকে আবদ্ধ করে একসূত্রে। আর সংবাদপত্রে তার বার্তা পড়ে ভারতে এমন আলোড়ন ঘটল যে, দেশের গণ্যমান্যরা বিরাট সভা ক'রে অভিনন্দন পাঠালেন। 'মিরার'-সম্পাদক বিবেকানন্দের কুসংস্কার-ভাঙা সাহস ও শক্তির বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। তার সঙ্গে সমাজসংস্কারক জি সুব্রহ্মণ্য আয়ারের দৃষ্টিভঙ্গির ঘনিষ্ঠ ঐক্য ছিল। কয়েক মাস আগে 'হিন্দু' পত্রিকাতেই মিশনারিদের তরফ থেকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল—গোঁড়া হিন্দুদের সাধ্য কি যে সমুদ্রযাত্রা করে! এই পত্রিকাতেই হিন্দুধর্মের বা হিন্দুসমাজের অজস্র কুৎসা প্রকাশিত হয়েছে। সে-দৃষ্টি একেবারে উলটে দিয়েছেন স্বামীজী, তার স্বীকৃতি 'মিরার'-এর দীর্ঘ সমাদরসূচক সম্পাদকীয়টি উদ্ধৃত করার মধ্যেই 'হিন্দু' পত্রিকা দেখিয়ে দিল। এর পরে, ৩০ এপ্রিল বেরোল পচেয়াপ্পা হল-এ অনুষ্ঠিত মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সমাবেশে বিবেকানন্দকে ধন্যবাদ সভার বিস্তৃত বিবরণ। মাদ্রাজ শহরের প্রধান প্রধান ব্যক্তির উপস্থিতিতে (যথা—রাজা স্যার এস রামস্বামী মুদালিয়র, এম বেঙ্কটরাম চেট্টি, পি আর সুন্দররাম আয়ার, টি ভি শেষগিরি আয়ার, এম এ শ্রীরঙ্গাচার্য, ভি কৃষ্ণস্বামী আয়ার, দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও প্রমুখ) ঘোষিত হয়েছিল : "ভারত তার সুপ্রাচীন ধর্মের সত্যই যোগ্য প্রতিনিধি [শিকাগোয়] পাঠাতে সমর্থ হয়েছে।" পচেয়াপ্পা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেছিলেন : "বাল্যকাল থেকেই দর্শন সম্বন্ধে আমার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা; মীমাংসার জন্য বহুদূর ভ্রমণ করেছি, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ভিন্ন এমন কারো দর্শন পাইনি, যিনি আমার উদ্দেশ্য পূরণ করতে সমর্থ। স্বামীজী কেবল হিন্দুধর্মশাস্ত্রেই ব্যুৎপন্ন তাই নন, তিনি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র, বাইবেল এবং কোরানের চর্চাও করেছেন।" "বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীর সামনে দেখিয়ে দিয়েছেন, হিন্দুধর্ম অন্য ধর্মের পাশে নিজ মর্যাদা রক্ষা করতে পারে।"—গৃহীত প্রস্তাবে তাও বলা হয়েছিল।

মাদ্রাজের এই সভার আবেগতরঙ্গ সম্ভব করল ১ মে ১৮৯৪ তারিখে 'হিন্দু' পত্রিকার উৎকৃষ্ট সম্পাদকীয় রচনাটি—বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 'হিন্দু'র সেই প্রথম সম্পাদকীয়। সম্পাদকীয়টি দেখিয়ে দেয়—হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে 'হিন্দু' পত্রিকার পূর্ব বক্তব্য আমূল বদলে দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর বিপুল জয়-কোলাহলের মধ্যে যে দু-একটি ভিন্ন কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল, তার মোকাবিলায় সম্পাদক অগ্রসর হন (যুদ্ধটা তাঁর নিজের সঙ্গেও ছিল) ঐ রচনায়। দু'একজন প্রশ্ন করেছিলেন—বিবেকানন্দ এমন কী করেছেন যে, তাঁর সম্বন্ধে এত হৈচৈ? সম্পাদকের প্রত্যয়দৃঢ় স্পষ্ট উত্তর : "**শিকাগো ধর্মমহাসভা যেমন পৃথিবীর ইতিহাসে যুগচিহ্নিত ঘটনা, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে তেমনই এক যুগসৃষ্টিকারী ঘটনা আমেরিকায় স্বামীজীর বার্তাবহনের কীর্তি।**" এত বড় একটা কথা 'হিন্দু' হঠাৎ বলে ফেলল কেন, তার হেতু সে জানিয়েছিল। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে 'হিন্দু' খড়গহস্ত ছিল এইজন্য যে, তা

আত্মসঙ্কুচিত অনড় কুসংস্কারের পুঞ্জ। বিবেকানন্দ ভেঙেছেন সেই কুসংস্কার, তিনি বৃহৎ বিশ্বে পদক্ষেপ করেছেন এবং হিন্দুধর্মের সত্য রূপকে নিজ প্রতিভায় উদ্ধার করেছেন। 'হিন্দু'র বিবেকানন্দ-বন্দনার মূল কারণ তাই। "**কয়েক মাস আগে স্বামীজী যখন বোম্বাইয়ে স্টীমারের ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, তখনই তিনি সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার কুসংস্কারের মুণ্ডকে পায়ে থেঁতলে দিয়েছিলেন।**" হিন্দু আরও লিখেছিল : "**একজন সন্ন্যাসী স্বদেশের শ্বাসরোধী কুসংস্কারের এতই উর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন যে, তিনি কেবল কালাপানি পার হয়ে ধর্মপ্রচার করতে যাননি, একই সঙ্গে স্বীয় আচরণের দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছেন যথার্থ হিন্দুধর্ম কী। এই ঘটনার যথার্থ তাৎপর্য বর্তমানে কেবল সূক্ষ্মদর্শী পর্যবেক্ষকদের দ্বারা উপলব্ধ হবে এবং ভবিষ্যতে তা ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করবে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা।**" বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে প্রেম, সমন্বয় ও শান্তির ধর্ম প্রচার করেছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সম্পর্কের স্বর্ণসূত্র রচনা করেছেন (যে-কথা রবীন্দ্রনাথ স্বামীজীর দেহান্তের কয়েক বছর পরে লিখবেন)—এসব কথা 'হিন্দু'-সম্পাদক যেমন লিখেছিলেন, তেমনি সেকালের অহঙ্কৃত বাঙালী সমাজকে এই খোঁচা না দিয়ে পারেননি যে, কলকাতা শহর বিবেকানন্দের জন্ম দিলেও তাঁর প্রতিভাকে উদয়কালে স্বীকৃতি দেয়নি, সেকাজ করেছে মাদ্রাজ। "মাদ্রাজ নিজেকে ধন্যবাদ দিতে পারে—নিজের উদারতার জন্য যদি নাও হয়, এইজন্য অন্তত—বিবেকানন্দের ধর্মযাত্রার গুরুত্ব বুঝে তৎপরতার সঙ্গে সে-ব্যাপারে সাহায্য করেছিল। এখন তাঁর বিরাটত্ব স্বীকৃত, তাই কলকাতা, তাঁকে দাবি করছে। তার পূর্বেই তাঁর প্রতিভার সমাদর করবার বোধ মাদ্রাজ অর্জন করেছিল। কোনো মানুষই স্বস্থানে প্রফেট বলে স্বীকৃত হন না।"

'হিন্দু' ১৮৯৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর স্বামীজীর ওপর আর একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখে। মধ্যবর্তী কালে প্রচুর বিবেকানন্দ-সংবাদ সে ছেপেছে। এক্ষেত্রে 'ইন্ডিয়ান মিরার'-এর পরেই তার স্থান। যতদূর পেয়েছি, এইসব বিদেশী সংবাদপত্র থেকে সংবাদ সংকলিত হয়েছিল : ১৮৯৪-এর ২৮ জুন—'বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট'; ২৭ অগস্ট—'ডেট্রয়েট ইভনিং নিউজ'; ১৪ নভেম্বর—'শিকাগো ইন্টার ওসান'; ১৮৯৫-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি—'ব্রুকলিন স্ট্যান্ডার্ড'। এইসঙ্গে ইংল্যান্ডে স্বামীজীর সাফল্য সংবাদ—১৮৯৬-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি, ৯ মে, ১১ মে, ৬ জুলাই, ১৯ অগস্ট, ২৬ অগস্ট ('সানডে টাইমস' থেকে), ২৬ অক্টোবর, ১২ নভেম্বর এবং ৭ ডিসেম্বর ('পল মল গেজেট' থেকে)।

এইসঙ্গে ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার সংবাদ অল্প নয়। স্বামীজীর বিষয়ে বেশকিছু মিশনারি প্রতিক্রিয়ার সংবাদ রয়েছে (বিষয়টি পরে উল্লিখিত ও আলোচিত হবে) এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সংক্রান্ত কিছু সংবাদও। ভারতীয় প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : ১৮৯৪-এর ২৭ অগস্ট কুম্ভকোনম ও ব্যাঙ্গালোরে ধন্যবাদ-সভা; ২৮ অগস্ট ব্যাঙ্গালোরে ধন্যবাদ-সভা; ১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ধন্যবাদ-সভা; ১২ ও ১৫ নভেম্বর মাদ্রাজে ধন্যবাদের সূত্রে স্বামীজীর দীর্ঘ উত্তর-পত্র; ১৮৯৫-এর ২৮ অগস্ট খেতড়ি অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজীর উত্তর-পত্র। এছাড়া 'হিন্দু'র নানা সম্পাদকীয়তে স্বামীজীর প্রাসঙ্গিক উল্লেখ এবং তাঁর বিষয়ে একাধিক পত্র। এর পরেই উল্লেখযোগ্য পূর্বে উল্লিখিত ১৮৯৫-এর ২৩ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত 'হিন্দু'র স্বামীজী বিষয়ক সম্পাদকীয়। এই সম্পাদকীয়টি নিঃসন্দেহে এই পর্বে স্বামীজী বিষয়ে শ্রেষ্ঠ রচনা। এর মধ্যে একদিকে যেমন আনন্দ ও উদ্দীপ্ত আবেগ,

অন্যদিকে তেমনি সুদৃঢ় সুস্পষ্ট চিন্তার প্রকাশ। ঠিক সেই সময়ের ভারতীয় জনজীবনের প্রাণোত্তাপ যেন এখনো অনুভব করা যায় রচনাটির শব্দে শব্দে—যার তুল্য রচনা একমাত্র 'ইন্ডিয়ান মিরার'-সম্পাদকের রচনার মধ্যেই পাওয়া গেছে। রচনাটির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ—স্বামীজীর ব্যক্তি-মহিমার ঘোষণা, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। মাদ্রাজে সেই প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে 'হিন্দু'-সম্পাদকও ছিলেন। রচনাটির সূচনা এই প্রকার :

"এই মহান পুণ্যপুরুষ—যিনি সহসা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়ে পৃথিবীর ধন্যধ্বনির লক্ষ্য হয়ে উঠেছেন—তাঁকে আমাদের পাঠকদের সকলের কাছে পরিচিত করাবার প্রয়োজন নেই, কারণ অধুনা-খ্যাত ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য শিকাগোয় যাত্রার পূর্বে তিনি এই [মাদ্রাজ] প্রেসিডেন্সিতে কিছুকাল পরিভ্রমণ করেন এবং এই প্রেসিডেন্সি শহরে [মাদ্রাজ শহরে] কিছুকাল অবস্থানও করেছিলেন—সেই সময়ে আমাদের কিছুসংখ্যক দেশবাসী তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার বিরল সুযোগ লাভ করেছেন।"

স্বামীজীর বিরাট প্রতিভা ও অনলস পরিশ্রমের দ্বারা আমেরিকায় বৈদান্তিক ভাবধারা প্রচারিত হয়েছে, সেখান থেকে ঐ বিষয়ে সমুজ্জ্বল প্রশস্তি এদেশে পৌঁছেছে। "তাতে এই দেশের অধিবাসীরা কতখানি বিস্মিত ও আনন্দিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদেশবাসী বুঝতে পেরেছে যে, হিন্দুর জাতীয় জীবন এখনো বিলুপ্ত হয়নি; আমরা যদি নিজেদের সত্য-রূপকে রক্ষা করতে পারি তাহলে বর্তমান পতন ও পরাধীনতা থেকে পুনশ্চ উত্থিত হতে পারব।"

ভারতীয় জাতি ও ভারতের ধর্ম সারা পৃথিবীতে অনাথ বালকের মতো উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত ছিল, সেসব যেন বিষাক্ত কীটের মতো পৃথিবীর পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছিল—এই যখন সাধারণে প্রচলিত ধারণা, তখন সহসা ঘটল পরমাশ্চর্যের আবির্ভাব :

"আত্মলোপ ও অপমানের অগৌরবময় জীবনের দীর্ঘ রাত্রি স্পষ্টত অবসানপ্রায়, দিগন্তে গৌরবদিনের শুভ্র ঊষাকিরণের উদ্ভাস। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বদা যা হয়ে থাকে এখানেও তাই হয়েছে। কাল পূর্ণ হলেই আবির্ভূত হন নবযুগস্রষ্টা—জাতীয় জীবনের আশা ও আদর্শ স্থাপনা করতে।"

সভ্যতার ধাত্রী ভারতবর্ষের ওপরে বর্তমানে পুঞ্জীভূত গ্লানি দূর করতে অনেক বৃহৎ পুরুষই আবির্ভূত হয়েছেন—রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, দয়ানন্দ সরস্বতী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, স্যার টি মাধব রাও, স্যার মুথুস্বামী আয়ার, কাশীনাথ তেলাঙ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক মনোহারী স্বামী বিবেকানন্দ।

"তাঁর পূর্বে এমন কোন প্রাচ্যবাসীর কথা আমাদের জানা নেই যিনি এত অল্প সময়ে পাশ্চাত্য সমাজে অমন শক্তিশালী, সুগভীর এবং স্থায়ী প্রভাব বিস্তারের কারণ হয়েছেন। তা ঘটেছে কেবল স্বামীজীর মহান ও উদ্দীপক বাগ্মিতা বা আমাদের পবিত্র শাস্ত্রাদিতে তাঁর প্রায়-অতুলনীয় অধিকারের জন্যই নয়, সেইসঙ্গে তাঁর চরিত্রের সুমহান সরলতা ও

অপরিসীম মাধুর্যের জন্যও বটে। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের যেসব পাঠকের ব্যক্তিগত পরিচয়ের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁরা নিঃসন্দেহে আমাদের এই অভিমতের সমর্থন করবেন যে, তাঁর অবলম্বিত ধর্মক্ষেত্রে তাঁর অপেক্ষা মহত্তর, যোগ্যতর এবং সত্যতর প্রতিনিধি কেউ নেই।"

শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে স্বামীজীর শিক্ষালাভ, তার পরে বছরের পর বছর নিঃসম্বল বৈরাগ্যের পরিব্রাজক জীবন—এইসব প্রসঙ্গের উল্লেখ করার পরে সম্পাদক বিশেষভাবে বলতে চেয়েছেন, ঘোর জড়বাদী ডলারের দেশ বলে পরিচিত আমেরিকার অন্তর্গহনে গভীরতর এক সত্তা রয়েছে, তাতেই নাড়া দিতে পেরেছিলেন বিবেকানন্দ। সে কোন্ বিবেকানন্দ?

"অতীতের মহান ঋষিগণ ও আচার্যগণের প্রতি পরম ভালবাসার জন্য, ভারতের দরিদ্র অবনত মানুষদের দুঃখ-যন্ত্রণার প্রতি একান্ত সহানুভূতির জন্য, স্বামীজী কোন্ অসহনীয় মর্মজ্বালা ও কায়ক্লেশ বহন করেছেন—কে জানতে পারবে সেই ইতিহাস? সূক্ষ্মদর্শী জনৈক আমেরিকান পর্যবেক্ষক তাঁর দেহাবয়ব বিশ্লেষণ ক'রে মন্তব্য করেছেন, তা বৌদ্ধধর্মের অমর প্রবর্তকের ক্লাসিক মুখাকৃতির সঙ্গে নিবিড় সাদৃশ্যযুক্ত। আমরা সাহসভরে একথা বলতে চাই—ঐ সাদৃশ্য কেবল আকারের ক্ষেত্রেই নয়, তা স্বামীজীর মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও বর্তমান—তিনি পুনর্বার পৃথিবীর সামনে নিজ চরিত্রে প্রকাশ করেছেন শাক্যমুনি এবং শঙ্করাচার্যের সুমহান ভাবাদর্শ ও প্রাণশক্তি।"

১৮৯৬-এর ১৮ ডিসেম্বর তারিখে 'হিন্দু' স্বামীজীর উপর আবার একটি পুরো সম্পাদকীয় লিখল (মধ্যবর্তী কালে কয়েকটি সম্পাদকীয়তে স্বামীজীর আংশিক প্রসঙ্গ ছিল)—"স্বামী বিবেকানন্দের আন্তর্জাতিক কর্মোদ্দেশ্য"। এই সম্পাদকীয়তে কিছু সমর্থন, কিন্তু সমধিক সমালোচনা। স্বামীজী ভারতে পাঠানো একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, তাঁর কার্যক্ষেত্রে কেবল জাতীয় নয়, তা আন্তর্জাতিকও; বহির্দেশে ধর্মসত্য প্রচারের জন্য উপযুক্ত কর্মিশিক্ষা দিতে তিনি আপাতত কলকাতা ও মাদ্রাজে দুটি কেন্দ্র স্থাপন করতে চান। সম্পাদক লেখেন, স্বামীজীর উদ্দেশ্য অবশ্যই মহান, কিন্তু এখন প্রয়োজন ভারতীয়দের শিক্ষার—পাশ্চাত্যের নয়। ঈষৎ অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার সঙ্গে তিনি আরও লেখেন: "আমরা তাঁর এই পরিকল্পনায় মোহিত হচ্ছি না। অনেকের কাছে বহুজাতিকতা কিংবা সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব—দেশপ্রেম বা দেশভ্রাতৃত্বের অপেক্ষা অধিক আকর্ষক। যখন স্বদেশবাসী অতীব সংকটাবস্থায় রয়েছে—অবনত ও অধঃপতিত—তখন সত্যকার মানবিকতাসম্পন্ন এমন দূরদর্শী ব্যক্তির অভাব নেই যাঁরা তাঁদের প্রজ্ঞা ও প্রতিভাকে পতিত দেশবাসীর উন্নয়নের বাস্তব পন্থায় চালিত না ক'রে গোটা মানবসমাজের মুক্তির স্বপ্ন দেখেন।" এই বক্তব্যই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সম্পাদকীয়টিতে লেখা হয়েছিল। এখানে কেবল বলা চলে, হায়! বিবেকানন্দকেও দেশপ্রেমের অভাবের জন্য ব্যঙ্গোক্তি শুনতে হয়েছিল, যিনি একবার সংকুচিত কণ্ঠে বলেছিলেন: "আমার বড় দোষ আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি, বড় বেশি

ভালবাসি।" সম্পাদক এক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ তথ্যের ওপর নির্ভর ক'রে চটজলদি লেখা লিখে ফেলেন। ধরে নিতে পারি, আলাসিঙ্গা প্রমুখের কাছে লেখা একটি চিঠিতে তিনি স্বামীজীর ঐ উদ্দেশ্যের কথা পড়েছিলেন। কিন্তু অপর চিঠিগুলি কি তাঁর চোখে পড়েনি, যেখানে কেবলই ভারতের জন্য কাজের কথা আছে? এবং স্বামীজীর আন্তর্জাতিক প্রচারের দ্বিমুখী উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও কি তিনি অবহিত ছিলেন না? প্রথমত অবশ্যই তা বেদান্তের (এবং শ্রীরামকৃষ্ণের) নিত্যসত্যবাণীর প্রচার, কিন্তু দ্বিতীয়ত সেই প্রচারে ভারতের ঐহিক মঙ্গলের সম্ভাবনাও স্বামীজী দেখেছেন। তিনি বারবার বিনিময়ের কথা বলেছেন, সমানে সমানে বিনিময়—ভারত দেবে অধ্যাত্মসত্য, বিনিময়ে পাশ্চাত্য দেবে ঐহিক বিজ্ঞানসত্য। পাশ্চাত্যে ভারতের ধর্মসত্যের স্বীকৃতি পরাধীন ও বিপর্যস্ত ভারতে এনে দেবে আত্মমর্যাদার চেতনা, যা সৃষ্টি করবে আকাঙ্ক্ষিত জাতীয়তাবোধ। সেই পটভূমিতেই কেবল দেশীয় উন্নয়নকার্য সম্ভবপর।

জানি না, 'হিন্দু'র এই সম্পাদকীয়টি সম্পাদকের লেখা কিনা। তাঁর কোনো উৎসাহী সহকর্মী কি বিবেকানন্দ-তরঙ্গের মধ্যে একটু বাঁকা স্রোত এনে 'হিন্দু'র পূর্বভূমিকার সঙ্গে যোগস্থাপন করতে চেয়েছিলেন? এর অল্পদিনের মধ্যে দেখা যাবে, ভারতে প্রত্যাবৃত্ত বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী আলোচ্য সম্পাদকীয়টির তুচ্ছতাকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিয়েছে।

এইকালে এবং ঈষৎ পরে 'হিন্দু' কিন্তু বিপুল সংখ্যায় বিবেকানন্দ-সংবাদ ছেপেছে। সেগুলির উল্লেখের প্রয়োজন নেই। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে, অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের উল্লিখিত ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ তারিখের সম্পাদকীয়টি, যেটি ঠিক সেই সময়ে রচিত যখন গোটা ভারত, বিশেষত মাদ্রাজ, বিবেকানন্দ-সংবাদে ভাসছে—উদ্দীপ্ত উৎকণ্ঠিত আবেগে বিজয়ী বীরকে স্বদেশে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অপেক্ষা করছে। এই সম্পাদকীয়টি সেই মহোৎসবের প্রভাতী সানাইয়ের মতো, অন্তত অধ্যাপক আয়ার সেকথা বলতে চেয়েছেন।

রচনাটির শুরু এইভাবে :

> **"আমরা শীঘ্রই মহান পুণ্যপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দকে আমাদের মধ্যে অভ্যর্থনা জানাবার আনন্দলাভ করব। ভারত ও বিশ্বের মঙ্গলসাধনে তিনি এককভাবে যে-কাজ করেছেন, তা আমাদের বিশ্বাস, ভবিষ্যৎকালে বিরাট ফলপ্রসূ হয়ে দাঁড়াবে। একথা ঠিক, এই পতনযুগেও ভারতবর্ষ এমন সব শিক্ষা সংস্কৃতি চরিত্র সাহস ও প্রতিভাসম্পন্ন মানুষের সৃষ্টি করতে পেরেছে, যাঁদের নাম বিশ্ববরেণ্যদের তালিকায় উৎকীর্ণ থাকার যোগ্য। কিন্তু তাঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ যে-ভূমিতে রাজ্যবিস্তার করেছেন, তা সম্পূর্ণত তাঁর নিজেরই আবিষ্কার—সেখানে আর কোনো পতাকা উড্ডীন নয়।"**

স্বামীজীর কণ্ঠস্বরের যাদু এবং তাঁর প্রজ্ঞার গভীরতা জয় করেছে পাশ্চাত্যের বহু মানুষের সন্দিগ্ধ মন ও মনীষাকে, তিনি সেখানে উন্মোচন করেছেন ভারতের অধ্যাত্মদর্শনের রত্নভাণ্ডার, সেই কাজে নিয়োজিত থাকার সময়ে তাঁকে কেবল কঠোর পরিশ্রম করতে হয়নি, অধিকন্তু বারবার নিষ্ঠুর নিপীড়নের শিকার হতেও হয়েছে—এইসকল কথা রচনাটিতে পাই। তাতে আরও আছে—ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রমপতনের

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তারই মধ্যে আধ্যাত্মিকতাকে রক্ষা করার জন্য নিঃশব্দ সংগ্রামের কথা। ধর্মান্তরকরণের প্রবল আঘাত এবং ধর্মহীন শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের ফলে যখন আধুনিক হিন্দুর মনে প্রাচীন মহান শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ও অশ্রদ্ধা ক্রমবিস্তৃত, যার প্রতিরোধের কিছু চেষ্টা করেছে ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনাসমাজ; থিয়জফিক্যাল সোসাইটি চেষ্টা করেছে ভারতীয় শাস্ত্রপ্রচারের; কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে-সকলই অপ্রচুর—ঠিক তখনই আবির্ভূত হলেন বিবেকানন্দ তাঁর বিপুল শক্তি নিয়ে, যা আনল নতুন আলো ও আশ্বাস। ২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৫ তারিখের সম্পাদকীয়ের মতো এখানেও 'হিন্দু'-সম্পাদক স্বামীজীর ব্যক্তিচরিত্রের মহিমার কথা এনেছিলেন—এনেছিলেন তাঁর ত্যাগ, বৈরাগ্য, সাধনা ও অতুলনীয় শাস্ত্রজ্ঞানের কথা। "এই ব্যাপারটিও স্মর্তব্য," সম্পাদক বললেন :

"যেহেতু স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ পরমহংস, পরবর্তী দিনের ভাবনা যিনি রাখেন না, সর্বদা উচ্চ ও পবিত্র চিন্তায় যিনি মগ্ন থাকেন, সত্যকার ভক্তি ও সংযম যাঁর জীবনে ধৃত—সেই কারণে তাঁর প্রকৃতিতে এসেছে এমনই হৃদয়াকর্ষক ঐকান্তিকতা, মাধুর্য ও সরলতা যে, তার চৌম্বক আকর্ষণে ধরা দিয়েছেন সকলেই, যাঁরা তাঁর পরিধির মধ্যে এসে পড়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দকে দেখেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি, শঙ্করাচার্য বা তাঁর তুল্য প্রাচীন ঋষিরা কেমন ছিলেন।"

১৮ ডিসেম্বর ১৮৯৬-এর পূর্বোক্ত সম্পাদকীয়টির ("স্বামী বিবেকানন্দের আন্তর্জাতিক কর্মোদ্দেশ্য") অশোভনতা ও অনৌচিত্য নিশ্চয় ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল; তারই সংশোধন করতে সম্পাদক লিখলেন :

"আমরা বিশ্বাস করি, বিদেশে সর্বপ্রকার কর্মব্যস্ততার মধ্যেও স্বামীজীর হৃদয় থেকে ভারতের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের চিন্তা মুহূর্তের জন্য সরে যায়নি। তাদের সম্বন্ধে তিনি ঐ দেশের বহু মানুষের সহানুভূতি লাভ করতে পেরেছেন। এক মহান আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য স্বামীজী স্বদেশে ফেরার পরে, দেশে ও বিদেশে বেদান্ত-ধর্ম ও দর্শন প্রচারের উদ্দেশ্যে একাধিক কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করবেন। সেইসঙ্গে এদেশের দুঃখ-দারিদ্র্যে ক্ষতবিক্ষত বিপর্যস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্লেশ নিবারণের পরিকল্পনাও তাঁর আছে। পাশ্চাত্যে যে-সহানুভূতি তিনি সংগ্রহ করেছেন, তাকে যদি তিনি এদেশে বাস্তব খাতে প্রবাহিত করতে পারেন, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের ওপরে তাঁর অনপনেয় প্রভাব মুদ্রিত হয়ে থাকবে।"

লেখাটি শেষ হয়েছিল এই কথাগুলি দিয়ে :

"স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এই সকলই শুনে এবং দেখে তাঁর স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি তাঁকে হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করবেন না? এমন কে আছেন যিনি স্বামীজী যে-পবিত্র ধর্মসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত তাকে তার প্রাপ্য নমস্কার জানাবার গৌরব অর্জন করতে চাইবেন না?—যে-মহান কর্মে তাঁর প্রতিভা, শক্তি ও ত্যাগময়

জীবন নিয়োজিত, সেই কর্মের সঙ্গে যুক্ত হবার আনন্দবোধ করতে চাইবেন না, অথবা যে ঋষিগণের উত্তরপুরুষ বলে আমরা গর্ববোধ করি, যাঁদের আরব্ধ কর্ম স্বামী বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছেন, সেই কর্মধারাকে অগ্রসর করার কাজে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হতে এগিয়ে আসবেন না, যত সামান্য সামর্থ্যই তাঁর হোক—আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি?"

স্বামীজীর মাদ্রাজ শহরে পদার্পণের ঠিক পূর্বক্ষণে প্রকাশিত এই লেখাটি শিক্ষিতমহলে কোন্ প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার উল্লেখ করেই এই রচনা শুরু করেছি। অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার কিন্তু 'হিন্দু'র পূর্ববর্তী আরও দুটি সম্পাদকীয়ের (১ মে ১৮৯৪ এবং ২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৫) উল্লেখ করেন নি, যেগুলি বক্তব্যে বা রচনাগুণে নিম্নপর্যায়ের ছিল না। তবে যজ্ঞে আহুতিকালের মন্ত্রধ্বনির কথাই মনে থাকে, প্রস্তুতি-পর্বের কথা নয়। অধ্যাপক আয়ারের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল।

এর পরে মাদ্রাজ শহরে স্বামীজীর প্রবেশ, ভাবোন্মত্ত জনগণের অভ্যর্থনা ("দলে দলে নরনারী ছুটে এল গৃহদ্বার খুলি/লয়ে বীণা বেণু/মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি/ছুঁড়ি পুষ্পরেণু।") ইত্যাদির বিস্তৃত কাহিনী রচিত হয়েছে 'হিন্দু'র পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় (দুঃখের বিষয়, সব কয়টি পৃষ্ঠা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।); মাদ্রাজ শহরে স্বামীজী তাঁর সর্বোত্তম কয়েকটি বক্তৃতা করেছেন, ঘোষণা করেছেন তাঁর 'সমরনীতি', যা পরাধীন ভারতের সমরনীতি হয়ে দাঁড়াবে—'হিন্দু' সোচ্ছ্বাস মন্তব্যসহ বক্তৃতাগুলি প্রকাশ করেছে। ভিক্টোরিয়া পাবলিক হল-এ প্রদত্ত স্বামীজীর 'আমার সমরনীতি' বক্তৃতা সম্বন্ধে একটি খণ্ডিত সম্পাদকীয়তে পাচ্ছি, সে-বক্তৃতা শুধু অসাধারণ বাগ্মিতায় ভূষিত নয়, তা একইসঙ্গে "শিক্ষাপ্রদ, গভীর চিন্তা-বিষয়ে পূর্ণ এবং বক্তার ব্যক্তিত্বের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অধিকৃত।" "তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল ঘন-গাঢ়ত্ব, ছন্দ এবং সঙ্গীত", যদিও স্বর খুব উচ্চগ্রামে উঠত না। "ভাষার সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য এবং ভঙ্গির ঐকান্তিকতা এমনই ছিল যে, আর বেশি কিছু চাইবার থাকতে পারে না।" "বাগ্মিতাশক্তির এমন মনোহারী প্রকাশ ঘটেছিল যে, প্রত্যেকে উৎকর্ণ মনোযোগে তাঁর কথা শুনেছে, যাতে একটি শব্দও না হারিয়ে যায়।"

স্বামীজীর আরেকটি মাত্র বক্তৃতার বিবরণ ও তার ওপর খণ্ডিত সম্পাদকীয় আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি।

'আমার সমরনীতি' বক্তৃতায় স্বামীজীকে যুযুধান অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। তাতে তিনি বহু অপ্রিয় সত্য বলেছিলেন—থিয়জফিক্যাল সোসাইটি, খ্রীস্টান মিশনারি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা-সম্পাদক, এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সম্বন্ধে। সমাজসংস্কারকদের উদ্দেশ্য ক'রে সময়োচিত সতর্কবাণী ও সংশোধনী মন্তব্যও তিনি করেছিলেন। ফলে 'উৎকর্ণ ও সম্মোহিত' শ্রোতৃবৃন্দের একাংশ বিচলিত ও বিপর্যস্তও হয়েছিল। স্বামীজী ঐ বক্তৃতায় শক্তিস্ফুরিত দেশপ্রেমের নতুন আকার তুলে ধরেন—চাই শিক্ষা, চাই লোকশক্তি, চাই জাতীয় ধারায় সংস্কার, যুবশক্তির জাগরণ, সামগ্রিক উত্থান, আত্মবিশ্বাস, সাহস, ত্যাগ ও সংগ্রামস্পৃহা। সেজন্য 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' বক্তৃতার ওপরে 'হিন্দু'র মন্তব্যের (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭) সূচনায় বলা হয়েছিল—আগের বক্তৃতার মধ্যে স্বামীজীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল আগুনের ঝলক—মানবসমাজকে যা-কিছু অন্ধকারে দাসবৎ বেঁধে রাখে

তার বিরুদ্ধে ঘটেছিল প্রচণ্ড ঘৃণার বিস্ফোরণ। আর 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' বক্তৃতা পৃথক প্রকারের।

"এই বক্তৃতায় স্বামীজী সত্যসত্যই যেন নিজেকে অতিক্রম ক'রে গেছেন—উপস্থিত হয়েছেন নতুন আলোকে। ইতিহাসের পটে উন্নীত হবার মহিমময় শক্তিতে পূর্ণ তাঁর উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি, চিত্রকল্পময় বর্ণনার অসামান্য শক্তি তাঁর আয়ত্তে, সেইসঙ্গে উদার সহানুভূতির উদ্ভাস তাঁর ভাষণে—যার সম্মিলনেই কেবল 'দিব্যদর্শনের শক্তি' বিচ্ছুরিত হয়, যার বিহনে অতীতের রত্নভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচিত হতে পারে না।"

স্বামীজীর শরীর ভাল নয়; শীতের দেশ থেকে প্রখর গ্রীষ্মের দেশে এসে ক্রমাগত সংবর্ধনা, বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনায় তিনি বিধ্বস্ত; তবু তাঁকে বাঁচতেই হবে ভারতের মঙ্গলের জন্য—যে-পরিকল্পনা তিনি করেছেন তাকে সার্থক ক'রে তোলার জন্য। এসব কথা লেখাটির মধ্যে ছিল। এই স্বীকৃতির দ্বারা কিন্তু শতাংশের একাংশও প্রকাশিত হবে না,—পত্রিকাটি লিখেছিল—স্বামীজী শ্রোতাদের ওপরে কোন্ সম্মোহন বিস্তার করেছিলেন :

"সর্বজনীন ধারণা এই, স্মরণকালের মধ্যে স্বামীজীই মাদ্রাজে দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ['আমার সমরনীতি' বক্তৃতা প্রসঙ্গে] আমরা মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দ্বিধা ও সতর্কতা দেখিয়েছিলাম [দুঃখের বিষয়, সেই অংশ খণ্ডিত থাকায় আমরা দেখতে পাইনি], কিন্তু গত রাত্রে শ্রোতাদের ওপর ছিল স্বামীজীর যাদুদণ্ডের স্পর্শ—ওহেন পাণ্ডিত্য, কল্পনাশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি, সহানুভূতি, চিত্রকল্প রচনার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, স্মরণকালে কদাচিৎ দেখা গেছে, ঠিকভাবে বলতে গেলে দেখাই যায়নি।"

॥ ছয় ॥

'আগুনের ঝলক' 'হিন্দু'র পৃষ্ঠাগুলিতে সত্যিই লেগেছিল, বিশেষত থিয়জফিক্যাল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ এবং থিয়জফিতত্ত্বের ওপর স্বামীজীর শস্ত্রাঘাতের ব্যাপারটি নিয়ে। ঐকালে মাদ্রাজই ছিল থিয়জফি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র (মাদ্রাজেই উক্ত সোসাইটির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র) এবং মাদ্রাজে ও ভারতের একাধিক শহরে থিয়জফি আন্দোলন বিশেষ রকম উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। থিয়জফি আন্দোলনের উৎপত্তি, তার স্রষ্টা মাদাম ব্লাভ্যাটস্কির বিচিত্র জীবন ও রহস্যময় রচনা (*Isis Revealed*), তিব্বতবাসী 'ঘুমন্ত ও প্রয়োজনে জাগরিত' মহাত্মাগণ ও নির্বাচিত ব্যক্তিগণকে নির্দেশযুক্ত পত্রপ্রেরণ—এসকলই পরাধীন ও লাঞ্ছিত জাতির কাছে চিত্তচমৎকারা। মহাত্মাগণের পত্র জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে, ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় খ্রীস্টান মিশনারি ও অন্যান্যরা তা নিয়ে হৈচৈ ফেলেছেন, কিন্তু তাতেও বহু শিক্ষিত ভারতবাসী বিশ্বাসে অটল ছিলেন; কারণ নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি তাঁদের নেই, সেক্ষেত্রে তিব্বতের মহাত্মারা এসে ভারত-উদ্ধারের ব্যবস্থা ক'রে

দেবেন—সেই মধুর স্বপ্নদর্শনের সুখ ত্যাগ করি কেন। ভারতবর্ষের মন লুঠ ক'রে নিয়েছিলেন অ্যানী বেশান্ত। একদা নীতি-ধর্ম-সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, অসাধারণ বাগ্মী সেই মহিলা যখন মাদাম ব্লাভ্যাটস্কির প্রভাবে কেবল থিয়জফিস্টই হলেন না, হিন্দু পর্যন্ত হয়ে পড়লেন, (প্রতিষ্ঠাত্রী ব্লাভ্যাটস্কি এবং মূল সংগঠন-সম্পাদক কর্নেল অলকট ছিলেন বৌদ্ধ), এমন ঘোর হিন্দু যে, হিন্দুদের কুসংস্কারাদিও তাঁর কাছে স্বীকার্য হয়ে পড়ল, তখন ভারতে ধন্য ধন্য রব। ১৮৯৪ সালে তাঁর ভারত-ভ্রমণ ও বক্তৃতাবলী বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, তাঁর রূপালী কণ্ঠস্বর থেকে ভারতীয় শাস্ত্রাদির সোনালী ব্যাখ্যায় তখন এদেশ মাতোয়ারা। এইসকল ব্যাপারের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে।

স্বামীজীর পক্ষে গোটা ব্যাপারটি অসহ্য। 'আমার সমরনীতি' বক্তৃতায় তাঁর থিয়জফি-আক্রমণ অংশটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তার দুটি দিক—প্রথমত তিনি বন্ধুর ছদ্মবেশধারী কিছু থিয়জফিস্টের, বিশেষত তার প্রধান নেতা কর্নেল অলকটের, মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, এখন দেখতে পাচ্ছি, ভারতে থিয়জফিস্টরা দাবি করছেন আমেরিকায় তাঁর পথ ওঁরাই পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিলেন। একদম বাজে কথা। সেখানে পদে পদে ওঁরা তাঁর প্রচারে বাধা সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার জন্য সেখানকার থিয়জফিস্টদের নিষেধ করেছেন। এর মূল কারণ, তিনি থিয়জফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদানে গররাজি ছিলেন। ভারত থেকে অপরিচিত দরিদ্র সন্ন্যাসিরূপে আমেরিকায় যাত্রার আগে যখন তিনি কর্নেল অলকটের কাছ থেকে একটা পরিচয়পত্র চেয়েছিলেন, কেননা ওঁরা নিজেদের 'ভারতবন্ধু' বলে দাবি করতেন, তখন উক্ত কর্নেল পূর্বশর্ত হিসাবে তাঁদের সোসাইটিতে যোগ দিতে বলেন। স্বামীজী রাজি হননি। ফলে অলকটের আক্রোশ এতদূর পৌঁছেছিল যে, আমেরিকায় পৌঁছে স্বামীজী যখন প্রায় নিঃস্ব, শীতে মরণাপন্ন, কাতরভাবে মাদ্রাজের শিষ্যদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন, তখন সেই সংবাদ জেনে উক্ত ভদ্রলোক এক চিঠিতে লিখেছিলেন, শয়তানটা মরলেই ভাল। এই ব্যক্তিগত দিকের সঙ্গে জড়িত ছিল আরেকটি বিষয়—থিয়জফিস্টগণ কর্তৃক বেদান্ত আন্দোলনের গৌরব আত্মসাতের অপপ্রয়াস। কিন্তু আরও গভীর কারণ ছিল স্বামীজীর আক্রমণের পিছনে। তাঁর মতে, গুপ্ত রহস্যবাদের ওপর নির্ভরশীল থিয়জফি-মত ভারতের পক্ষে সর্বনাশা। স্বামীজী বারবার বলেছেন, গুপ্তরহস্যবাদ ধর্মকে দুর্বল ক'রে ধ্বংস ক'রে ফেলে; ধর্মের উজ্জ্বল সত্যরূপের ওপর তা ঘোলাটে ছায়া। ভারতবর্ষের জাগরণের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে-বস্তু, সেই আত্মনির্ভরতার তা প্রতিবন্ধক। ভারতবাসী যদি মনে করে—নিজের উদ্ধার নিজে করবে না, তাদের হয়ে তা ক'রে দেবেন তিব্বতবাসী কিছু মহাত্মা এবং তাঁদের বার্তাবহ কিছু বিদেশী পুরুষ ও মহিলা, তাহলে ভারতবর্ষের মুক্তি সুদূরপরাহত। স্বামীজীর মূল বাণীই হল আত্মশক্তির—ওঠো জাগো, নিজের উদ্ধার নিজেই করো। সেক্ষেত্রে থিয়জফি-মতের বিপরীত প্রান্তে তিনি দাঁড়িয়ে। তাছাড়া স্বামীজী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, লৌকিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ পতিত হলেও ধর্মক্ষেত্রে সে সর্বশীর্ষে। বহু সহস্র বছরের সাধনার ঐতিহ্য তার আছে। সেখানে সাধনার ভূমিকাহীন কিছু বিদেশী নারী বা পুরুষ ভারতের গুরুর আসন অধিকার ক'রে বসবেন, আর তাকে ভারতবর্ষ মেনে নেবে, তাহলে আত্মহত্যার বাকি রইল কি!

ম্যাক্সমুলার-কথিত 'রিয়্যাল মহাত্মা' শ্রীরামকৃষ্ণের নয়, উড্ডীয়মান তিব্বতী মহাত্মাদের শরণ নেবে ভারতবর্ষ—হা হতোস্মি!

এইখানে কিছু সরল বিশ্বাসী ভারতীয় প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিলেন। তাঁরা স্বামীজীর মুখে সুমোহন প্রেম ও মৈত্রীর বাণী শুনে গদ্‌গদ হবেন, এই ছিল প্রত্যাশা—সেখানে এ কোন্ রূঢ়ভাষী যোদ্ধপুরুষ, শান্তির নিদ্রার বিঘ্নকারী উৎপাত! স্বামীজী ঐ একটি বক্তৃতায় দুটি কাজ করতে পেরেছিলেন। প্রথমত তিনি নিজের জনপ্রিয়তার উর্ধ্বসীমাস্পর্শী পারদকে তৎক্ষণাৎ টেনে নিচে নামালেন, দ্বিতীয়ত তিনি থিয়জফিক্যাল সোসাইটির প্রবল বেগকে মন্দীভূত ক'রে দিলেন। তাঁর এই বক্তৃতার পরে থিয়জফিক্যাল সোসাইটির পূর্বাবস্থা বজায় ছিল না।

তৎকালীন মাদ্রাজে থিয়জফিক্যাল সোসাইটির প্রভাবের রূপ কিছুটা বোঝা যাবে 'হিন্দু'র মতো সংস্কারবাদী পত্রিকার সন্ত্রস্ত রূপ দেখলে। পত্রিকার কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত মত যাই হোক-না কেন, জনমতের চাপ ছিলই। দেখা যায়, 'হিন্দু' এর পরে বিবেকানন্দ-স্তুতির ব্যাপারে বেশ কিছুটা গুটিয়ে গেছে এবং বেশ কয়েকটি বিবেকানন্দের সমালোচনামূলক চিঠি ছেপেছে। স্বামীজীর সমর্থক পত্রলেখকও অবশ্য ছিলেন।

'মাধব দাস'—এই ছদ্মনামে এক পত্রলেখক ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত চিঠিতে আদ্যন্ত স্বামীজীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন। বড় আশা নিয়ে তিনি এসেছিলেন—"অনেকের মতোই স্বামীজীকে দর্শনের, তাঁর কণ্ঠস্বর শোনার এবং তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য অনুভব করার তীর্থযাত্রায়"—কিন্তু তীর্থদেবতা তাঁকে কোমল মধুর নয়, ভয়ানক মুখই দেখালেন। ইনি গোঁড়া থিয়জফিস্ট, সুতরাং সমসাময়িক কালের সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ উড়িয়ে দিয়ে বললেন, স্বামীজীর অভ্যর্থনার যে-দৃশ্য এখন দেখছি, মাদাম ব্লাভ্যাটস্কি ও কর্নেল অলকটের সারা ভারতব্যাপী ভ্রমণ অনুরূপ জমজমাট ছিল, হয়তো অধিক জমজমাট। ব্লাভ্যাটস্কি ও অলকট এদেশে ও বিদেশে কর্ম, পুনর্জন্ম, গীতা-তত্ত্ব ইত্যাদি প্রচার করেছেন। অজ্ঞ লোকেরাই ব্লাভ্যাটস্কি সম্বন্ধে কুকথা বলে। এদেশের মস্ত মস্ত লোক অ্যানী বেশান্তকে ঋষি ও সরস্বতী বলেছেন। বেশান্তের বক্তব্যের অপেক্ষা অধিক নতুন কথা স্বামীজীর ভাষণে পাওয়া যায়নি। স্বামীজী যাই বলুন, এঁরাই পাশ্চাত্যে স্বামীজীর পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছেন। স্বামীজী সন্ন্যাসী ঠিকই, তবে লোকচক্ষুর অন্তরালে এদেশে অনেক বড় বড় সন্ন্যাসী আছেন ইত্যাদি। মাধব দাসের লেখায় বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় স্বামীজীর বক্তব্যের সেই অংশ, যেখানে তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বেশান্তের ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞানকে ভাসা-ভাসা বলেছিলেন। মহাত্মাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ, এঁর মতে—অ্যানী বেশান্ত তো বলেছেন তাঁরা আছেন! তিব্বতী মহাত্মাদের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করার অসহ্য ঔদ্ধত্য বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন, ধর্মে গুপ্ত রহস্যবাদের ক্ষতিকারকতার কথাও তিনি বলেছেন। মাধব দাসের বক্তব্য—আরে, রহস্যবাদ না মানলে ধর্মই টেকে না, আর সেক্ষেত্রে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম-প্রচারকই হতে পারেন না। শেষকালে এই সতর্কবাণী ইনি উচ্চারণ করেছিলেন, থিয়জফিস্টদের চটিয়ে বিবেকানন্দ হারালেন অনেক কিছু; তিনি থিয়জফিক্যাল সোসাইটির ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন না, মাঝখান থেকে খোয়ালেন বহুসংখ্যক খাঁটি হিন্দুর আনুগত্য।

১৫ ফেব্রুয়ারি 'ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ'-লিখিত পত্রে একই ধরনের কথা। একই তারিখে সি আর

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের (ইনিও থিয়জফিক্যাল সোসাইটির সভ্য, 'এফ-টি-এস') চিঠির বক্তব্যও অনুরূপ। ইনি অধিকন্তু জানিয়েছেন, আমেরিকা-যাত্রার আগে স্বামীজীর সঙ্গে অলকটের যেসব কথাবার্তার কথা স্বামীজী বলেছেন, অলকট তা স্মরণ করতে পারছেন না। ১২ মার্চের 'হিন্দু' পত্রিকায় অলকটের এক চিঠি বেরোল। অতিশয় সতর্ক কৌশলী চিঠি। তিনি জানালেন, কথাবার্তার যে-বিবরণ স্বামীজী দিয়েছেন তা পড়লে মনে হয় অত্যধিক উত্তেজনায় স্বামীজীর স্মৃতিভ্রান্তি ঘটেছে। স্বামীজী যে তাঁর কাছে পরিচয়পত্র চেয়েছিলেন, সেকথা অলকটের বিন্দুমাত্র মনে নেই; তবে (কিছুটা আত্মখণ্ডন ক'রে অলকট বললেন), ঐ সাক্ষাৎকারে বিবেকানন্দ—ব্লাভ্যাটস্কি, থিয়জফিক্যাল সোসাইটি এবং মহাত্মাদের (যাঁদের সঙ্গে অলকটের ব্যক্তিগত মোলাকাত প্রায়শই হয়) সম্বন্ধে যে-ধরনের 'শীতল ও সহানুভূতিহীন মনোভাব দেখিয়েছিলেন তাতে পরিচয়পত্র না দেওয়াই ছিল স্বাভাবিক।' আমেরিকায় স্বামীজী সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে তাঁর চিঠি পাঠানোর ব্যাপারটি অলকট পুরো অস্বীকার করলেন (সে-চিঠি হাতে পেলেই তবে তিনি মানবেন) এবং ফলাও ক'রে জানালেন, স্বামীজীর অভ্যর্থনার জন্য তিনি ভারতে কতখানি উদারহস্ত প্রসারিত করেছেন। ভারতীয়দের সহানুভূতি কাড়বার জন্য বেশান্ত-প্রসঙ্গ এনে বললেন, বেশান্তের পাণ্ডিত্যকে হেয় করার চেষ্টা বড়ই হৃদয়বিদারক।

অলকটের চিঠিতে যথেষ্টই মুরুব্বিয়ানা ছিল। ২২ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত 'জনৈক হিন্দু'র চিঠিতে ছিল উপদেশ। স্বামীজী কাজের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চাইছেন। তার দরকার কী, থিয়জফিক্যাল সোসাইটি তো আছে; ভারত ও পৃথিবীতে বহুসংখ্যক শাখা যার, আর রয়েছে ভারতে প্রচুর মঠ। এদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করলেই সবদিকে সুরাহা হয়।

'হিন্দু'তে স্বামীজীর সমর্থনে প্রকাশিত দুটি চিঠির সন্ধান আমরা পেয়েছি—২ মার্চ ও ১২ মার্চ। টি এস শেষাইয়ারের পত্রটি দীর্ঘ। এর মধ্যে তিনি মাধব দাসের পত্রের প্রতিটি বক্তব্য খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। বেশান্ত সম্বন্ধে প্রযুক্ত 'ঋষি' বা 'সরস্বতী' অভিধাগুলি অবশ্যই আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করবার জন্য কথিত হয়নি—একথা বলে ইনি যোগ করলেন—বেশান্তের বক্তব্যের পাশে রাখলে দেখা যাবে, স্বামীজীর বক্তব্য রীতিমত মৌলিক। ধারালো প্রশ্ন তাঁর—গত কুড়ি বছর ধরে থিয়জফিক্যাল সোসাইটি তো পাশ্চাত্যে বেদ, উপনিষদ্ এবং মহাত্মা-তত্ত্ব প্রচার করছে, কিন্তু সেখানে সেগুলি কেন জনপ্রিয় হয়নি, আর স্বামীজীর প্রচারই বা অত জনপ্রিয় হলো কেন? পাশ্চাত্যের মানুষ মহাত্মা সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ হতেই পারে, যাঁদের নিয়মিত দর্শনধারী অবশ্য অলকট ও বেশান্ত! অলকট তো ভারতে অপরূপ এক বক্তৃতায় বলেছেন, ভগবান বিষ্ণু তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন রুমাল নাড়িয়ে, আর দেখা যে দিয়েছেন তার প্রমাণরূপে রুমালটি তিনি উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন—সেই উপহৃত রুমালটি নাড়িয়ে অলকট শ্রোতাদের দেখিয়ে দেন!! স্বামীজী পাশ্চাত্যে তাঁর কাজের সঙ্গে থিয়জফিকে যুক্ত করতে চাননি, তার কারণ, তা করলে তাঁর কাজ সত্যই ধ্বংস হয়ে যেত! যে-অলকট স্বামীজী সম্বন্ধে চিঠিতে লিখতে পারেন—'শয়তানটা মরবে এবার'—সেই অলকটের 'সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ' রইল কোথায়? থিয়জফিস্টদের মতে, 'যোগ' হলো গুপ্ত রহস্যময় ব্যাপার—নতুন কথা বটে! না তা নয়, যোগসাধনায় আলোকলাভ হয়, ওটা রহস্যাচ্ছন্ন কিছু নয়, রহস্যময় ব্যাপার হলো থিয়জফির ম্যাজিক। যাঁরা স্বামীজীর কাছে নম্রতা চাইছেন, তাঁরাই আবার নিজেদের নম্রতা ঘুচিয়ে তাঁকে হুমকি দিচ্ছেন। মাধব দাস

অনেক গুহাবাসী মহাপুরুষদের কথা বলেছেন, যাঁরা নাকি স্বামীজীর থেকে অনেক বড়! কিন্তু হায়, তাঁরা কোথায়, তাঁদের দেখা তো মেলে না! অপর পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীতে আদর্শ পুরুষরূপে বর্তমান আছেন।

১২ মার্চ 'ব্রাহ্মণ'-লিখিত এক পত্রে তীক্ষ্ণ ভাষায় থিয়জফিস্টদের বক্তব্য খণ্ডন ক'রে স্বামীজীর পক্ষে দৃঢ় সমর্থন জানানো হয়েছিল। পত্রলেখক পরিষ্কার জানান, থিয়জফিক্যাল সোসাইটির কিছু কর্মকর্তার কাণ্ড উদ্‌ঘাটন ক'রে স্বামীজী কোনো অন্যায় করেন নি, এক্ষেত্রে তিনি মোটেই অহেতুক ব্যক্তি-নিন্দার গহ্বরে পড়েন নি। থিয়জফিক্যাল সোসাইটি "মহাত্মাদের সাক্ষাৎ নির্দেশে চালিত" এবং "অজ্ঞাত অথবা অজ্ঞেয় ব্যক্তিগণের অনুগামী ব্যক্তিদের কাছ থেকে আদেশগ্রহণ ক'রে থাকে। সেই কাজ অবশ্যই দাসত্বের চিহ্নবাহী!" কেবল স্বামীজী নন, পত্রলেখক বললেন, যে-কোনো চিন্তাশীল মানুষের কাছে ব্যাপারটা গা-ঘুলিয়ে-ওঠা কাণ্ড। বিভিন্ন হিন্দুমঠের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে পত্রলেখকের বক্তব্য : স্বামীজী চাইছেন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও পারিয়া সমভাবে বেদান্তসত্যের অধিকারী হোক—এই নীতি কি মঠ-কর্তৃপক্ষগণ গ্রহণ করবেন? "সুতরাং শেষতঃ এই কথা বলি, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভারতীয় জনগণের কিছু অংশ বেদান্তসত্যের দ্বারা দীক্ষিত হচ্ছে এবং বর্তমানে বলবৎ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা মুছে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্বোক্ত পত্রলেখক-কথিত প্রস্তাবগুলি স্বামীজীর পক্ষে গ্রহণ করা অবাস্তবোচিত এবং অসম্ভব কাজ হবে।"

জনপ্রিয়তার ভাসমান কিছু বুদ্বুদ ফেটে যাওয়ায় স্বামীজী মোটেই বিচলিত হননি। কলকাতায় ফেরার পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, দরকার হলে ঐ কাজ তিনি আবার করবেন। কেবল একটা জায়গায় তাঁকে কাঁটা বিঁধেছিল। বিতর্কের মধ্যে এসে গিয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ। ম্যাক্সমূলার প্রচণ্ড থিয়জফিস্ট-বিরোধী। অলীক মহাত্মাদের সঙ্গে তফাত দেখাতে তিনি 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকায় (১৮৯৬) শ্রীরামকৃষ্ণকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'খাঁটি মহাত্মা' বলে। 'ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ' তাঁর ১৫ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে বিদ্রূপ ক'রে বলেছিলেন : স্বামীজী তাঁর গুরুর গুণগান করেছেন, কিন্তু "কেবল তাঁর গুরুই কি মহাত্মা-কুলে এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষ—অ-আ-ক-খ থেকে বর্ণমালার শেষপর্যন্ত অধিকার ক'রে বসে আছেন?" স্বামীজী কষ্ট পেয়েছিলেন, তাঁর গুরুর পবিত্র নাম এই কদর্য কোলাহলের মধ্যে উচ্চারিত হওয়ায়। পাছে শিষ্য সম্বন্ধে কোনো কল্পিত দোষ গুরুর ওপর বর্তায় তাই তিনি কলকাতা-অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন : "যদি কায়মনোবাক্যে আমি কোনো সৎকার্য ক'রে থাকি, যদি আমার মুখ থেকে এমন কোনো কথা বের হয়ে থাকে, যাতে জগতের কোনো ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হয়েছে, তাতে আমার কোনো গৌরব নেই—তা তাঁরই। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখনো অভিশাপ বর্ষণ ক'রে থাকে, যদি আমার মুখ থেকে কখনো কারও প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বেরিয়ে থাকে, তবে তা আমার—তাঁর নয়।" এই কথাগুলিকে অলকট থেকে শুরু করে অনেকেই স্বামীজীর পূর্বোক্ত বক্তৃতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ধরে নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অনুভূতিতে এ-জিনিস ধরা পড়া সম্ভব ছিল না যে, গুরুর শুভ্র নামের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্যই স্বামীজী ঐ কথাগুলি বলেছিলেন, নচেৎ নিজ বক্তব্যের যাথার্থ্যে তাঁর ধারণা বদল হয়নি। তাঁর ঐ অসামান্য সাহস ও শক্তির প্রকাশ দূর ইংল্যান্ডে অবস্থিত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে অভিভূত করেছিল। তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন : "সত্য ও মানবতার জন্য স্বামীজী যখন তাঁর বিরাট

জনপ্রিয়তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, তখন কী-যে শিহরণ বোধ করেছিলাম!" (৫.৪.১৮৯৯ তারিখে লেখা নিবেদিতার চিঠি দ্রষ্টব্য)

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ ছাড়া আর বিশেষ কেউ বিচলিত হননি। ঐ গোষ্ঠীরই বিপিনচন্দ্র পাল তখন 'হিন্দু'তে 'ক্যালকাটা লেটার' লিখতেন। ১৩ মার্চের 'লেটার'-এ তাঁর ক্ষোভের কথা পাচ্ছি। যে-প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কাছে বিবেকানন্দ শিক্ষার জন্য অল্পবয়সে যেতেন, তাঁর বিরুদ্ধে ঐ প্রকার কঠোর বাক্য অনেকেই পছন্দ করেন নি, এই কথা বিপিন পাল লিখেছিলেন। কিন্তু লিখতে ভুলে গিয়েছিলেন, মিথ্যা কুৎসা যিনি করেন তাঁর বিষয়ে কোন্ মধুবাক্য বলা সম্ভব?

॥ সাত ॥

'হিন্দু' পত্রিকায় বিবেকানন্দ-সূত্রে খ্রীস্টান মিশনারি-প্রসঙ্গ কিন্তু পরিমাণে অল্প নয়। সূচনাপর্বে 'হিন্দু'র মিশনারি-প্রীতির উল্লেখ করেছি। সমাজসংস্কারকদের রীতি অনুযায়ী আত্মনিন্দার উত্তেজনায় মিশনারিদের সম্বন্ধে অতি প্রশংসার ঝোঁক এই পত্রিকার ছিল। বিবেকানন্দ গোটা পরিস্থিতির বদল ঘটালেন। 'হিন্দু' পত্রিকায় অতঃপর মিশনারিদের উত্তম কাজের স্বীকৃতি কিছুটা বজায় রইল, কিন্তু তাঁদের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, হিন্দুধর্ম-শাস্ত্রাদির অযথা কুৎসার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা শুরু হয়ে গেল এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়।

৯ জানুয়ারি ১৮৯৪ তারিখে 'হিন্দু'র সম্পাদকীয়তে ডঃ পেন্টিকস্টের উদ্ভট কথাকে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাত করা হয়। আমেরিকায় স্বামীজী বারবার মিশনারিদের মুখে শুনেছেন খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের সাম্রাজ্যমহিমার কথা, তখন তিনি উলটো কথা শুনিয়েছিলেন—সাম্রাজ্যবিস্তারকারী উক্ত খ্রীস্টানরা মদ্যসহ কোন্ কোন্ আনুষঙ্গিক পাপ বিজিত দেশে নিয়ে গেছে। ডঃ পেন্টিকস্ট প্রতিবাদে বললেন : জন্মসূত্রে কেউ হিন্দু, বৌদ্ধ বা মুসলমান হয়, সে ভাল বা মন্দ দুইই হতে পারে, কিন্তু অপরদিকে কেউ যদি মদ্যপ, মিথ্যাবাদী, বেশ্যাসক্ত, চোর, খুনী হয় তাহলে খ্রীস্টান থাকতে পারে না। ডঃ পেন্টিকস্টের এই অতিশয় 'সুবিধাজনক' সিদ্ধান্তকে তথ্যযুক্তি দ্বারা নস্যাৎ করার পরে সম্পাদক বলেছিলেন, স্বধর্মী ও বিধর্মীদের মাপবার জন্য দু'রকম মাপকাঠি ব্যবহারেব এই পেন্টিকস্টীয় রীতি সত্যিই বাহবার যোগ্য। কয়েকদিন পরে, ১৯ ফেব্রুয়ারির এক সম্পাদকীয়তে পুনশ্চ হিন্দুদের বিরুদ্ধে মিশনারি সমালোচনার একপেশে রূপ খুলে ধরলেন সম্পাদক। শ্রীরঙ্গম মন্দিরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের মীমাংসায় সরকারি হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছিল। তাতে বিদ্রূপে ফেটে পড়ে একটি মিশনারি সংবাদপত্র বলেছিল, কোথায় রইল এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের স্বধর্মের পক্ষে হামবড়াই এবং ধর্মক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য সরকারের কাছে হিন্দুদের দাবি? বোঝাই যাচ্ছে, হিন্দুধর্ম ধ্বংসের পথে। 'হিন্দু'-সম্পাদক উত্তরে বললেন, এরকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভ্রান্ত উক্তি অল্পই দেখা যায়। কোথায় যেন দুটি গোষ্ঠীব মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে—তাতেই হিন্দুধর্ম লয় পেয়ে গেল!! আর সরকারের কাছে মঠগুলির সাহায্যপ্রার্থনা? ও-কাজ করা হয়েছিল শৃঙ্খলারক্ষার জন্য, যার দায়িত্ব সরকার নিজের হাতে রেখেছেন। অপরদিকে চার্চ অব ইংল্যান্ড চলছে সরকারের সমর্থনে ও অর্থসাহায্যে। লজ্জার

কথা, হিন্দু ও মুসলমান করদাতাদের পুষতে হচ্ছে সেইসব চার্চকে, যারা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মকে নিন্দা করাই মুখ্য কাজ বলে গ্রহণ করেছে। গোড়া থেকেই খ্রীস্টধর্মপ্রচারের পিছনে আছে রাজশক্তির সাহায্য। যারা ঘৃণার বিষ ছড়াচ্ছে ধর্মের নামে, তারা যে ধর্ম থেকে বহু দূরে আছে—একথা 'হিন্দু' পত্রিকা উক্ত মিশনারি পত্রিকার জবাবে স্পষ্ট ক'রে বলেছিল। সংবাদ হিসাবে 'হিন্দু'তে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ তারিখে রেভারেন্ড জে ই স্লেটার-এর বক্তৃতাংশ ছাপা হয়, যার মধ্যে তিনি অ্যানী বেশান্ত ও স্বামী বিবেকানন্দের সমালোচনা ক'রে বলেছিলেন : এঁরা ভারতবর্ষকে পুরানো যুগে পিছিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। বলা বাহুল্য, স্বামীজী সম্বন্ধে অল্পজ্ঞান, ভ্রান্তজ্ঞান, অথবা বিকৃত বোধ থেকেই ঐ ধরনের মন্তব্য করা সম্ভব।

প্রধানত বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে কোন্ বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে, তার সম্বন্ধে সুষ্ঠু বিচারমূলক দীর্ঘ একটি সম্পাদকীয় 'হিন্দু' লেখে ৩১ অক্টোবর ১৮৯৪—'নিও হিন্দুইজম'। এর মধ্যে বলা হয়, মিশনারিরা দেখে হতভম্ব ('মেথডিস্ট টাইমস' প্রভৃতি পত্রিকার রচনায় যা প্রকাশিত) যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে দীক্ষিত হিন্দুরা কোথায় স্বধর্মকে ঘৃণায় সরিয়ে দিয়ে খ্রীস্টধর্মের ভজনা করবে, তা নয়, নিজ ধর্মকেই তারা সজোরে আঁকড়ে ধরছে! অর্ধশতাব্দী ধরে খ্রীস্টান সরকার ও মিশনারিদের আপ্রাণ চেষ্টার একি শোচনীয় পরিণতি!! আরও মারাত্মক, হিন্দুরা নিজ ধর্ম থেকে কুসংস্কার ছেঁটে ফেলে যুক্তিবাদের নিরিখে যাচাই ক'রে তাকে গ্রহণ করছে! সম্পাদক জানালেন, গোড়ার দিকে পাশ্চাত্যশিক্ষিত হিন্দুদের সংশয়বাদকে মিশনারিরা খ্রীস্টধর্মাসক্তির অবশ্য-লক্ষণ বলে ধরেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক শিক্ষা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জন্ম দিল জাতীয় কংগ্রেসের আর ধর্মক্ষেত্রে নব্যহিন্দুধর্মের। এতে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ মিশনারিদের কাছে 'হিন্দু'-সম্পাদকের সুমিষ্ট প্রশ্ন, আহা, হিন্দুদের বুঝি আত্মসংস্কারের অধিকার নেই? বিদেশীয় মিশনারিরা যাই বলুন, সম্পাদক লিখলেন, এদেশীয় মিশনারিদের একজন অন্তত—রেভারেন্ড কালীচরণ ব্যানার্জী—হিন্দুদের আত্মোদ্ধারের চেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এর ফলে সমুদ্রযাত্রা সমস্যার সুখদায়ক সমাধান হয়েছে (যা ঘটেছে স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে ও উক্তিতে)। তবে মিশনারি হিসাবে তিনি (রেভারেন্ড ব্যানার্জী) অগত্যা এই আশা পোষণ না ক'রে পারেন নি, হিন্দুরা যতই শিক্ষার আলোক পাবে ততই বিচারশীল হয়ে তুলনার দ্বারা খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করবে। 'হিন্দু'র সম্পাদকীয় শেষ হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের মহাবাণী দিয়ে ("সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু-আচার্যের ভাষায় যা উচ্চারিত") : "প্রত্যেক ধর্মের পতাকার ওপর লেখা হবে : 'বিবাদ নয়—সহায়তা; বিনাশ নয়—পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়—সমন্বয় ও শান্তি।"

রেভারেন্ড জে হাডসন এক দীর্ঘ প্রবন্ধে স্বামীজীকে যথেষ্ট তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার পরে, ধর্মতত্ত্বক্ষেত্রে তাঁর মোকাবিলার জন্য খ্রীস্টতত্ত্বের নানা কথা এনে, বেদান্তমতকে খণ্ডনের চেষ্টা করেন। তাঁর সেই রচনা 'হিন্দু'তে বেরোয় ২৯ নভেম্বর ১৮৯৪। এই লেখা প্রথমে মিশনারি পত্রিকা 'হার্ভেস্ট ফিল্ড'-এ, তারপর 'স্টেটসম্যান'-সহ অন্যান্য পত্রিকাতেও বেরিয়েছিল। বিবেকানন্দ নামধারী বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্তের আমেরিকায় সাফল্য নিয়ে সারা ভারতের হিন্দুরা নাচানাচি করছে, সেটা যে চোরাবালির ওপরে নাচ, তা দেখিয়ে দেবার সাধু চেষ্টা করেন রেভারেন্ড। অধিকাংশ ভারতীয়ই তো ইংল্যান্ড-আমেরিকায় যায়নি, গেলে

বুঝতে পারত, ঐ ধরনের সংবর্ধনার আসল অর্থ কি! এই তো সেদিন সিস্টার হোল্ডসওয়ার্থ, হ্যারোগেট থেকে লিখে পাঠিয়েছেন, সেখানে রাজকুমারী অ্যালিক্স ও মিসেস হোল্ডসওয়ার্থের ভারতীয় আয়া—দু'জনই প্রধান কৌতূহলের বিষয়। আরেকটি চিঠিতে উনি জানিয়েছেন, একটি বড় জনসভায় পশ্চিম আফ্রিকাবাসী এক বক্তার (অর্থাৎ নিগ্রো বক্তার) পরে বক্তৃতা জমাতে তাঁকে কতই কষ্ট পেতে হয়েছে। কারো গায়ের রঙ যদি কালো হয় এবং যদি সে স্বদেশীয় পোশাক পরে থাকে, তাহলে সে হিন্দু বা নিগ্রো যাই হোক—প্রাদেশিক নগরগুলিতে বহুসংখ্যক মানুষ টানবেই। আর কলকাতার বক্তাটি বেশ ভালভাবেই জানেন, কোন্ 'পোজ্' দিলে সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টি করা যাবে। ঐ লোকটি জানেন, কোট ও ট্রাউজার পরা মিস্টার এন এন দত্ত, বি-এ অপেক্ষা ঝোলা পোশাকে অঙ্গ-ঢাকা হিন্দু-ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক ইত্যাদি। মিশনারিসুলভ এহেন শালীন সুসভ্য ভূমিকার পরে, ব্যবহারিক আদবকায়দা রপ্ত করার ব্যাপারে স্বামীজীর পারদর্শিতা, গড়গড় ক'রে ইংরেজী বলা ও বিষয়বস্তুকে হৃদয়গ্রাহী করার ক্ষতিকর ক্ষমতা, ইত্যাদির উল্লেখ, তারপরে হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত স্বামীজীর বক্তব্যকে খণ্ড খণ্ড করার পাণ্ডিত্যপূর্ণ চেষ্টা করেছেন উক্ত রেভারেন্ড; আর মাঝে মাঝে তত্ত্বকথাকে নীরসতা থেকে মুক্ত করার জন্য হিন্দুদের আচার-আচরণের দুর্নীতি ও নোংরামির রসালো কথাও উপহার দিয়েছেন। তবে তত্ত্বক্ষেত্রে রেভারেন্ড ডঃ হাডসন যে মোটেই মজবুত জমিতে দাঁড়ান নি, তা ৭ ডিসেম্বর ১৮৯৪ তারিখে জনৈক 'টি আর' এক দীর্ঘ পত্রে ওঁকে নাড়া দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। একই প্রয়াস দেখা গেল কুম্ভকোনম থেকে লেখা ১০ ডিসেম্বরের 'হিন্দু'তে প্রকাশিত কে নারায়ণস্বামী আয়ারের দীর্ঘতর পত্রে। বোঝা গেল, ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে হিন্দুরা আর পড়ে মার খেতে রাজি নয়। ইট খেলে পাটকেল ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা তারা রাখে।

খ্রীস্টধর্মের পক্ষে এই সময়ে আসরে এক বিস্ময়কর আবির্ভাব ঘটল, যাঁকে বিপরীত ভূমিকাতে দেখবার জন্য ভারতবর্ষ অপেক্ষা করছিল। শিকাগো ধর্মমহাসভার সংগঠক-সম্পাদক হিসাবে রেভারেন্ড জন হেনরি ব্যারোজের নাম তখন শিক্ষিত ভারতবাসীর মুখে মুখে। ধর্মমহাসভায় বিভিন্ন ধর্মাচার্য পাশাপাশি অবস্থান ক'রে স্বধর্মকথা বলবেন এবং অন্যধর্মের কথা শুনে গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য বিচারের দ্বারা আত্মশোধন-সহ আত্মোন্নয়নের চেষ্টা করবেন, মিলিত হবেন ধর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধে—এর আয়োজনের প্রধান কর্তা ডঃ ব্যারোজ আদর্শ পুরুষ হিসাবে তখন ভারতে স্বীকৃত ও কীর্তিত। কিন্তু এঁর উদারতার আচ্ছাদনের নিচে ভিন্ন ধরনের একটি অভিপ্রায় লুকিয়েছিল। অন্য ধর্মগুলি যতই জ্বলুক, সে হলো খদ্যোতের আলো, তার পাশে খ্রীস্টধর্ম অবশ্যই প্রতিভাত হবে পূর্ণিমার চন্দ্ররূপে! ডঃ ব্যারোজকে কিন্তু পূর্বেই নানা খ্রীস্টীয় মতবাদী সংস্থা ওহেন সভা সাজাতে নিষেধ করেছিল। আত্মপ্রত্যয়ী তিনি তা গ্রাহ্য করেন নি, কেননা তাঁর পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব ছিলনা—পরাধীন ভারতবর্ষে জাত কোন্ এক রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ পূর্ব দিগন্তের সূর্যরূপে উদিত হতে পারেন। ফলে ঝলসে গেলেন তিনি ও তাঁর মতপন্থীরা। যাঁরা আগে থেকে নিষেধ করেছিলেন, তাঁরা দ্বিগুণ বেগে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আহত ডঃ ব্যারোজ শেষ সংগ্রাম করতে চাইলেন—একেবারে শত্রুপুরীতে ঢুকে, অর্থাৎ বিবেকানন্দের দেশ ভারতবর্ষে গিয়ে। এটুকু আত্মবিশ্বাস তিনি রক্ষা করেছিলেন—যদি একবার তাঁর মুখে ভারতবাসী খ্রীস্টধর্মকথা শুনতে পায় তাহলে রণক্ষেত্রে

বিবেকানন্দের পতিত দেহের ওপরে তিনি জয়পতাকা ওড়াতে পারবেন। সুযোগ এসে গেল ক্যারোলিন ই হ্যাস্‌কেল নামক এক আমেরিকান ভদ্রমহিলার বদান্যতায়। তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুল অর্থ জমা দিলেন প্রাচ্যদেশে খ্রীস্টধর্মবিষয়ক বক্তৃতাদি করার জন্য। 'হ্যাস্‌কেল বক্তৃতামালা' নামে তা চিহ্নিত হলো এবং ডঃ ব্যারোজ তার প্রথম বক্তা নির্বাচিত হলেন (স্বনির্বাচিত বক্তা!)। তিনি কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি নানা জায়গায় বক্তৃতা ক'রে বেড়ালেন, যথাস্থানে অর্থাৎ খ্রীস্টান মিশনারি এবং ব্রাহ্ম গোষ্ঠীর মধ্যে যথেষ্ট প্রশংসা পেলেন, কিন্তু হিন্দু সংবাদপত্রগুলি তাঁর বক্তৃতাকে একেবারে কাটাছেঁড়া ক'রে শেষ করে দিল। ডঃ ব্যারোজ ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গেলেন। অন্য অনেক মিশনারির মতোই এখন তিনি স্থির করলেন, হিন্দুধর্মকে এবং তার মুখ্য প্রবক্তাকে শেষ করার মোক্ষম অস্ত্র, তর্কযুক্তি বা তত্ত্বকথা নয়, তা হলো কুৎসা—অবিরাম কুৎসা। করুণ সেই মূর্তি, উদারতার পালিশ চটে গিয়ে আসল রঙ বেরিয়ে পড়েছে, মুখ দিয়ে সাধুবচনের পরিবর্তে বেরুচ্ছে গ্লানি-গরল!! এই ইতিহাস আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে।

বোম্বাই ও কলকাতার সাধারণ হিন্দু সংবাদপত্রগুলি যেভাবে ব্যারোজের বক্তৃতার সমালোচনা করেছিল, মাদ্রাজের 'হিন্দু' তার থেকে তো পিছিয়ে রইলই না, বরং অনেক বেশি এগিয়ে গেল। সম্পাদকীয় কলমে ব্যারোজের প্রতিটি বক্তৃতাকে, প্রত্যেক বক্তব্যকে, তুলোধোনা ক'রে সেগুলি কত অন্তঃসারশূন্য এবং গোঁড়ামির দাবিতে পূর্ণ, তা দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করা হলো। ঠিক এই সময়ের 'হিন্দু' পত্রিকার বেশ কিছু সংখ্যা আমরা পাইনি। যেগুলি পূর্ণত বা অংশত পেয়েছি, তাদের মধ্যে ব্যারোজের বক্তৃতা সম্বন্ধে এই সকল সম্পাদকীয় আছে : ৭ জানুয়ারি ১৮৯৭—*"Dr. Barrows on the Claims of Christianity—The Argument from Numbers"*; ১১ জানুয়ারি—*"Dr. Barrows on the Claims of Christianity and the Necessity for the Man of Historical Christianity"*; ২৯ জানুয়ারি—*"Dr. Barrows' Lecture;"* ২৪ ফেব্রুয়ারি—*"Dr. Barrows' Last Lecture"*। এছাড়া ডঃ ব্যারোজের আগমন, তাঁর সংবর্ধনা ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ, সম্পাদকীয় মন্তব্য ও চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। 'হার্ভেস্ট ফিল্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত ভারত ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ডঃ ব্যারোজের সাক্ষাৎকার 'হিন্দু' পুনর্মুদ্রিত করেছিল ১০ মার্চ। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ ব্যারোজের আগমন উপলক্ষে লিখিত সম্পাদকীয়তে তাঁকে সাদর সংবর্ধনা জানিয়ে বলা হয় : ভারতের প্রাচীন ধর্মের মর্মবাণী সহিষ্ণুতা—ডঃ ব্যারোজ তা এদেশে লাভ করবেন; সহানুভূতিই সহানুভূতি জাগায়; ডঃ ব্যারোজ যে-পরিমাণে সহানুভূতি দেখাবেন তা ফিরে পাবেন সমপরিমাণে; তাছাড়া তিনি ধর্মমহাসভার প্রধান কর্মকর্তারূপে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছেন, তাও তাঁকে আবশ্যিক ধন্যবাদের পাত্র ক'রে তুলেছে। 'হিন্দু' পত্রিকার এইসব কথার মধ্যে একটু বক্র ইঙ্গিত ছিল—ডঃ ব্যারোজ নিজে যদি সহানুভূতি দেখান তবেই ফেরত পাবেন, নচেৎ নয়। এর মূলে ছিল বোম্বাই ও কলকাতায় ব্যারোজের ধর্মীয় গোঁড়ামিপূর্ণ বক্তৃতাগুলি। ব্যারোজ কিন্তু তাঁর পূর্বভূমিকা ত্যাগ করলেন না। বিবেকানন্দ-সূত্রেই ব্যারোজের খাতির ভারতবর্ষে (স্বামীজী ব্যারোজকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আবেদনপত্র প্রকাশ করেছিলেন)—সেই ব্যারোজ দক্ষিণ ভারতের পালামুথায় বক্তৃতাকালে যখন স্বামী বিবেকানন্দের নামটুকুও উচ্চারণ করলেন না, তখন

শ্রোতারা অতীব বিস্মিত হয়েছিল (৮ মার্চের সংবাদ)। তার আগে ব্যারোজের মাদ্রাজ-বক্তৃতাবলীর কি ধরনের সমালোচনা 'হিন্দু' করেছিল তার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি যখন খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে পৃথিবীর নানা দেশে ঐ ধর্মের বিস্তার এবং খ্রীস্টধর্মাবলম্বীর বহুল সংখ্যাকে নির্ণায়ক মানদণ্ড বলে উপস্থিত করলেন, তখন সেই কথাগুলি হাস্যকর ও বোধহীন বলেই সম্পাদকের মনে হয়েছিল। কোন্ অপমূল্যে খ্রীস্টধর্মের বিস্তার তা নানা ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণসহ সম্পাদক দেখিয়ে দেন (৭ জানুয়ারি ১৮৯৭)। হিন্দুধর্ম সনাতন সত্যনির্ভর, তা বিশেষ কোনো ব্যক্তির মতবাদের ওপর নির্ভরশীল নয়, শ্রীকৃষ্ণাদি এঁর স্রষ্টা নন, তাঁরা হিন্দুধর্মের আচার্যপুরুষ—স্বামী বিবেকানন্দের এই দাবির প্রতিরোধে ডঃ ব্যারোজ বলতে চেয়েছিলেন, খ্রীস্টধর্মের ভিত্তি যেহেতু ঐতিহাসিক পুরুষ যীশুখ্রীস্টের উপর তাই তা অভ্রান্ত সত্যরূপে গ্রহণযোগ্য। এই ঐতিহাসিক সত্যতার দাবি তথ্যের আলোকে কিভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তা 'হিন্দু' দেখিয়ে দেয় (১১ জানুয়ারি)। খ্রীস্টধর্মের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ডঃ ব্যারোজের দাবির খণ্ডনে জনৈক পত্রলেখক (এস রামস্বামী আয়ার) পূর্বতন বৌদ্ধধর্ম এবং ইদানীন্তনকালে বিবেকানন্দ-প্রচারিত বেদান্তধর্মের ব্যাপক বিশ্বস্বীকৃতির কথা তুলে ধরেন (২১ জানুয়ারি)। ব্যারোজের মাদ্রাজ-বক্তৃতাবলীর ওপর সম্পাদকীয়সমূহের উপসংহার টানতে গিয়ে সম্পাদক বলেন (অত্যন্ত খণ্ডিত আকারে সেটি পেয়েছি): "আমরা এইভাবে লিখে যেতে পারি, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। আমাদের বিশ্বাস, আমরা এই কথাটা পরিষ্কার ক'রে তুলতে পেরেছি যে, খ্রীস্টধর্ম, তা গোঁড়ামিপূর্ণ বা ঐতিহাসিক যেরূপেই হোক না কেন, ভারতবর্ষের হিন্দুমনকে আবাদযোগ্য ভূমি হিসাবে পাবে না।" সম্পাদক বলেন, সমাজ-সংগঠনাদির ক্ষেত্রে আমরা পাশ্চাত্য দেশ থেকে শিক্ষা নিতে পারি—যে-কথা স্বামীজী বলেছেন; এক যুগের সামাজিক রীতিনীতি অন্য যুগে অচল; কালধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজকে চলতে হয়—এসব বিষয়ে ডঃ ব্যারোজের কথাবার্তা আমরা ধৈর্য ধরে শুনব, "কিন্তু তিনি যে-ধরনের খ্রীস্টধর্মকে হাজির করেছেন, ভারতের পক্ষে অন্তত তা গ্রহণযোগ্য নয়। তার লড়াকু আত্মঘোষণা, মতবাদের অতৃপ্তিকর রূপ, হিন্দুমনকে বিচলিত ও মোহিত করার যোগ্য ভাবকল্পনাময় দর্শনের অভাব, ত্যাগ-তপস্যাকে বর্জন ক'রে ভোগ-বিলাসকে প্রশ্রয় দেবার প্রবণতা"—এর জন্য ব্যারোজের প্রচারিত ধর্মমত গ্রাহ্য হবে না (২৯ জানুয়ারি)।

আরও অনেক মিশনারি প্রসঙ্গ আছে 'হিন্দু'তে। তার মধ্যে রেভারেন্ড জন মার্ডকের কুৎসা-প্রসঙ্গও পাই। এসব বিষয়ে আলোচনা থেকে এখানে বিরত থাকছি।

॥ আট ॥

সমাজসংস্কার বিষয়ে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তারিত আলোচনা আমরা করব না। তথাপি 'হিন্দু'-সম্পাদক এবং তাঁর পরিচালনাধীন 'হিন্দু' পত্রিকা যেহেতু প্রথমাবধি সমাজসংস্কারের সমর্থক এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রথম লিখিত সম্পাদকীয়তে তাঁর সমুদ্রযাত্রার বিধি-নিষেধ লঙ্ঘনকে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে চিহ্নিত করেছিল, তাই 'স্বামীজী, সমাজসংস্কার ও হিন্দু পত্রিকা' প্রসঙ্গ কিছুটা এসে যায়ই। সংক্ষেপে বলতে গেলে, স্বামীজী

খুচরো সংস্কার অপেক্ষা মূলগত সংস্কারের ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন। আমেরিকা-যাত্রার পূর্বে অপরিচিত তরুণ সন্ন্যাসী তিনি, ট্রিপ্লিকেন লিটার‍্যারি সোসাইটির এক আলোচনাসভায় এ-বিষয়ে খোলাখুলি মত প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত তাঁর ধন্যবাদ-সভা থেকে তাঁকে অভিনন্দনপত্র পাঠানো হয়। তার উত্তরে সজোরে তিনি সমুদ্রগমনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে বলেন; এবং কূপমণ্ডূকতা ঘুচিয়ে সারা পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে ভারতবাসী কোন্ প্রগতিশীলতার পথে অগ্রসর হবে, তা অসাধারণ স্বচ্ছ ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপস্থিত করেছিলেন। স্বামীজীর ভাষা অবশ্যই 'হিন্দু'-সম্পাদকের আয়ত্তে থাকার কথা নয়, কিন্তু ২৩ মে ১৮৯৪ তারিখে সমুদ্রযাত্রা প্রসঙ্গে যে-সম্পাদকীয় তিনি লেখেন তার সঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্যের ছিল সমূহ ঐক্য। সমুদ্রযাত্রা সমস্যার সমাধান প্রায় হয়ে গেছে—এই আনন্দ প্রকাশ করার পরে সম্পাদক তখনো অবশিষ্ট মানসিক দ্বিধার ওপর খোঁচা দিয়ে বলেন, যাঁরা শিকাগোয় যাওয়ার জন্য স্বামীজীর প্রশংসা করছেন কিংবা অ্যানী বেশান্তের ভারতে আগমনের জন্য পুলকিত, তাঁরা কি ক'রে একই নিঃশ্বাসে সমুদ্রযাত্রাকে অশাস্ত্রীয় পাপাচার বলেন?

২৮ অগস্ট ১৮৯৫ তারিখে 'হিন্দু'-তে বেরোয় রাজা অজিত সিং-এর অভিনন্দনপত্রের উত্তরে স্বামীজীর দীর্ঘ এক পত্র। রাজপুতানার অন্তর্গত খেতড়ির এই রাজা উন্নত চরিত্রের মানুষ, স্বামীজীর প্রভাবে বিজ্ঞানমনস্ক, স্বামীজীর পাশ্চাত্য-যাত্রার তিনি সমর্থক ও সহায়ক। এঁর কাছে স্বামীজী আনন্দে ও আবেগে যে-পত্র লিখেছিলেন, সেটিকে সমাজ বিষয়ে তাঁর প্রথম 'ম্যানিফেস্টো' বলা যায়, পরবর্তী কালে যার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটেছে 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে। অসাধারণ এই রচনাটির মধ্যে স্বামীজী ভারতে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জাতি-সংঘর্ষ, সমন্বয়, পুনশ্চ পতন এবং উত্থানের পথনির্দেশ করেছিলেন। ক্ষত্রিয়দের অত্যাচারী ভূমিকার কথা তিনি বলেছেন, উলটোপক্ষে অধ্যাত্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের শুভকর সাধনার কথাও, কিন্তু কঠোরতম নিন্দা করেছেন পুরোহিততন্ত্রের দ্বারা অবনমিত ব্রাহ্মণত্বের। ক্ষত্রিয়রা মুক্তি দিয়েছে সেই বন্ধন থেকে। ক্ষত্রিয় কৃষ্ণ ও বুদ্ধ জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন ক'রে দিয়েছিলেন সর্বশ্রেণীর নরনারীর জন্য। ক্ষত্রিয়রা বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার সমর্থক, কুসংস্কারের বিরোধী, উগ্র পুরোহিততন্ত্রের শত্রু। স্বামীজী আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, শেষপর্যন্ত কিন্তু দেখা যায়, উচ্চবর্গীয় সকলেই জনগণের শোষক। জনগণের মুক্তির ওপর নির্ভর করছে ভারতের মুক্তি। বেদান্ত এনেছে সেই বার্তা, যা সর্ববস্তুর সাম্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে, বলেছে—অজ্ঞতা, অসাম্য ও অধিকারস্পৃহা মানব-দুঃখের কারণ। আর্তকণ্ঠে স্বামীজী প্রশ্ন করেছেন—কেন একজন মানুষ নিজেকে অপর মানুষের চেয়ে উচ্চাধিকারী ভাববে? তিনি আহ্বান করেছেন এই বলে—অন্ধকার যুগের অবসান হয়েছে, খুলে গেছে দ্বার, প্রবেশ করো আলোকের জগতে।

এই ধরনের একটি রচনা প্রকাশ করার সৌভাগ্য অর্জন ক'রে 'হিন্দু'-সম্পাদকের উল্লাসের পরিমাণ অনুমেয়। তাঁর বা তাঁর প্রগতিশীল সহকর্মীদের বহু চিন্তার উজ্জ্বল সমর্থন এর মধ্যে ছিল। ২৬ মার্চ ১৮৯৬-এর সম্পাদকীয়তে 'হিন্দু' সানন্দে লিখল, ভারতের গোষ্ঠীবদ্ধতা ভাঙছে, কেননা পৃথিবীর সর্বত্র শ্রমজীবী শ্রেণী ঐহিক উন্নতির জন্য সর্ববিধ কাজ গ্রহণ করছে, তার পারিশ্রমিকও পাচ্ছে; ভারতের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে দেশের বাইরে গিয়ে ব্যবসায় ও বৃত্তিমূলক কর্মে লিপ্ত হবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে; ধর্মক্ষেত্রে স্বয়ং বিবেকানন্দের মতো মানুষ বিদেশে গিয়ে এমনভাবে ভারতীয় ধর্মসত্য প্রচার করছেন যে, পাশ্চাত্য ধর্মের

ওপর তার প্রভাব পড়বেই। 'হিন্দু'-সম্পাদক বোঝাতে চেয়েছিলেন, ঐহিক ও পারমার্থিক ক্ষেত্রে আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে নতুন সভ্যতার সূচনা হচ্ছে। একই প্রসঙ্গ এলো ৮ জুন ১৮৯৬-এর সম্পাদকীয়তে। ভারতের পার্শীরা বহির্বাণিজ্য ক'রে শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতখানি অগ্রসর হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সম্পাদক শিকাগোর বিশ্বমেলা এবং ধর্মমহাসভার কথা আনলেন।

> **"শুধু একবার ধর্মমহাসভার কথা চিন্তা ক'রে দেখুন, যার প্রাণ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।... এই ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ যে-প্রকার মহত্তম, উজ্জ্বলতম এবং সর্বাধিক ঘনগৌরবময় দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল, তার তুল্য কিছু পৃথিবী পূর্বে দেখেনি। কী অপূর্বভাবে এই মহাসভা একত্রে এনেছিল খ্রীস্টান ও হীদেনকে, চীনা পুরোহিত ও বৌদ্ধ পুরোহিতকে, স্বামী বিবেকানন্দ ও আমীর আলিকে! এই মহাসভা পরিষ্কারভাবে এক কাব্যিক আদর্শকে বাস্তবায়িত করার সম্ভাবনা দেখিয়ে দিয়েছিল, সে হলো—'মানবের মহাসভা এবং পৃথিবীর মহামিলনসভা'।"**

১৮৯৭ সালের গোড়ায় ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যাবর্তন এবং দক্ষিণ ভারতে বিপুল আলোড়নের বিষয়ে এইকালের 'হিন্দু' পত্রিকা থেকে যেটুকু সংবাদ উদ্ধার করা গেছে, তার দ্বারাই এই ঘটনার যুগপট-পরিবর্তনকারী রূপ কিছুটা বোঝা সম্ভব। সেই কাহিনীতে এখানে প্রবেশ করব না। কিন্তু বিচক্ষণ সন্দিগ্ধ মানুষের অভাব ছিল না। স্বামীজীর নামে বিহ্বল মানুষদের আচরণের অসঙ্গতি খুলে ধরতে এস শিবনাথ শাস্ত্রী ২০ জানুয়ারি 'হিন্দু'-তে যে-পত্রটি লিখেছিলেন, তার কথা উল্লেখ করতে হয়। তিনি প্রশ্ন করেন—স্বামীজীর সম্মানে কি কোনো 'পাবলিক ডিনারে'র ব্যবস্থা মাদ্রাজে করা হচ্ছে? তাতে কি অভ্যর্থনা সমিতির ব্রাহ্মণ সদস্যারা অংশ নেবেন? যদি নেন তাহলে তাঁদের নাম কি প্রকাশ করা হবে? ইত্যাদি। এখানে বিবেকানন্দ-কথিত 'ভাতের হাঁড়ির ধর্ম'কে ফুটো ক'রে দেওয়ার চেষ্টা। স্বামীজীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা যায়, তাই করা হয়েছিল, কিন্তু সমুদ্রযাত্রাকারী কায়স্থ সন্ন্যাসীর সঙ্গে একত্রে অন্নগ্রহণ—'কদাপি ন, কদাপি ন'! শিবঠাকুরকে পূজো করতে বাধা নেই, কিন্তু সেজন্য তাঁকে সরিয়ে এনে মন্দিরের মধ্যে স্থাপন করতে হবে—শ্মশানে ভূতপ্রেতের মধ্যে তাঁর সঙ্গে ভিক্ষান্ন ভোজন করা সম্ভব নয়!

স্বামীজীর মাদ্রাজ-বক্তৃতাবলী 'হিন্দু' অবিলম্বে প্রকাশ করেছিল। সেখানকার শিক্ষিত সমাজে সর্বাধিক প্রচারিত ও প্রভাবশালী এই পত্রিকা থেকে অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়েছিল স্বামীজীর মহাবাণী—যাতে উন্মোচিত হয়েছিল ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পূর্বতন মহান রূপ, বর্তমান অধোগমন ও ভাবী উন্নতির উপায়ের কথা। দেশপ্রেম কাকে বলে—কাকে বলে তার জন্য সত্যকার আত্মোৎসর্গ—তা ভারতবাসী জেনেছিল। অধ্যাত্ম-সভ্যতার ধাত্রীজননীরূপে ভারতবর্ষ অবশ্যই 'পুণ্যভূমি', কিন্তু যাদের সাধনা এই দেশকে পুণ্যভূমি করেছে তাদের উত্তরপুরুষদের শোচনীয় অবস্থার কথা উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল বক্তৃতাগুলিতে। উচ্চারিত হয়েছিল এই নতুন বার্তা : দেশের মানুষ বলতে গুটিকয়েক উচ্চবর্ণের মানুষ নয়, কোটি কোটি সাধারণ মানুষ নিয়েই দেশ—যারা দুর্ভিক্ষে মহামারীতে মরছে, অশিক্ষায় অন্ধ,

যাদের গায়ে 'অস্পৃশ্য' এই ছাপ মেরে পশুরও অধম জীবনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, যাদের শোষণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সভ্যতার সৌধ। এই সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ওপর ভারতের উন্নতি নির্ভর করছে। কখনো যন্ত্রণার রক্তাক্ত ভাষায়, কখনো অশ্রুভেজা কণ্ঠস্বরে, কখনো বজ্ররবে স্বামীজী বিদীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন। মাদ্রাজে 'হিন্দু' পত্রিকা বহুলাংশে সেই মহাবাণীর বাহক হতে পেরেছিল, যা পরবর্তী কালে বহু দেশপ্রেমিকের কাছে সাধনা ও সংগ্রামের গীতাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। সমাজসংস্কারপন্থী 'হিন্দু' পত্রিকা জেনেছিল সত্যকার সংস্কার কাকে বলে। ওপর থেকে প্রলেপ দেওয়া নয়, ভিতর থেকে উত্থান। একেই স্বামীজী বলেছিলেন 'আমূল সংস্কার'। 'হিন্দু'-র সংবাদে পাই, স্বামীজী 'মাদ্রাজ সোস্যাল রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন'-আয়োজিত সংবর্ধনাসভায় গিয়েছিলেন এবং সমিতির কার্যাবলীতে সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭)। ১৫ মার্চ 'হিন্দু' পত্রিকা 'হিন্দু সোস্যাল রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন'-এ কামাক্ষী নটরাজন ('সোস্যাল রিফর্ম' পত্রিকার সম্পাদক) কর্তৃক পঠিত একটি প্রবন্ধের সারমর্ম প্রকাশ করে। নটরাজন অবশ্য 'সোস্যাল রিফর্মারদের ওপর-ওপর জোড়াতালি দেওয়া সংস্কার-কর্মের চেষ্টা সম্বন্ধে স্বামীজীর সমালোচনাকে পছন্দ করেন নি, কিন্তু স্বীকার করেছিলেন, স্বামীজী সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে গতিবেগ এনে দিয়েছেন। কে সুন্দররমন তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন, কোনো আন্দোলনকে সফল হতে হলে দুটি জিনিসের দরকার—নীতি ও নেতা। তিনি ভাবাবেগের সঙ্গে বলেন, সংস্কারের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম নীতি হলো বেদান্ত এবং সর্বোত্তম নেতা বেদান্তপ্রবক্তা বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল আক্রমণ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। অল্পকালের মধ্যে তিনি যথেষ্ট শত্রু সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। মিশনারিগণ, ব্রাহ্মসমাজীরা এবং থিয়জফিস্টরা তো পুরনো বিরোধীপক্ষ; এখন তার সঙ্গে যুক্ত হলো রক্ষণশীল সমাজ। বিবেকানন্দ তাঁদের পক্ষে ভয়াবহ কিছু কথায় ও কাজে লিপ্ত। তিনি অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের কঠোর নিন্দা করছেন, পুরোহিততন্ত্রকে বলছেন পাপের আকর, কায়স্থ হয়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন, কালাপানি পারে ম্লেচ্ছদেশে গিয়ে ম্লেচ্ছদের মধ্যে কেবল ধর্মপ্রচার করেন নি—ম্লেচ্ছদের সন্ন্যাস পর্যন্ত দিয়েছেন; তিনি প্রকাশ্যে ম্লেচ্ছদের সঙ্গে আহারাদি ক'রে থাকেন। পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের মহাকীর্তিও কিন্তু এইসব 'কুকীর্তি'কে রক্ষণশীলদের চোখে সহনীয় করার মতো শক্তিশালী ছিলনা। রক্ষণশীলদের কিছু কিছু আক্রমণের কথা 'হিন্দু'-তে প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন, ২৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় পত্রলেখক গোবিন্দ দাস জানালেন, বিবেকানন্দ যে বলছেন তিনি ক্ষত্রিয়, তা মোটেই সত্য নয়, তিনি কায়স্থ, সুতরাং শূদ্র। সেজন্য তাঁর সন্ন্যাসে অধিকার নেই; তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী নন—গৃহী ছিলেন। তাঁরও বিবেকানন্দকে সন্ন্যাস দেবার অধিকার ছিল না। স্বামীজী যখন পঞ্জাবে বক্তৃতাদি করছিলেন, তখন বৈদিক কর্মমার্গী আর্যসমাজের তরফে তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলা হয়, বিবেকানন্দের 'নয়া বেদান্ত' আসলে বৌদ্ধ বেদান্ত; সে-বস্তু আমেরিকায় চললেও ভারতে চলবে না। বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রচারে বিচলিত আর্যসমাজী পণ্ডিত আর্যমুনি, আর্যসমাজের রীতি অনুযায়ী শঙ্করাচার্য ও রামানুজাচার্য সম্বন্ধে বিরোধিতা ত্যাগ ক'রে বলেছিলেন, বিবেকানন্দের বেদান্ত মহর্ষি ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র, শঙ্করাচার্যের শারীরক ভাষ্য,

বৌধায়ন বা রামানুজের বেদান্তভাষ্য নয়। শঙ্করাচার্য একদা যে-বৌদ্ধধর্মকে বিতাড়িত করেছিলেন, তাকেই বিবেকানন্দ পুনঃপ্রবর্তিত করতে চাইছেন। ('হিন্দু', ৪ ডিসেম্বর ১৮৯৭)। বিপিনচন্দ্র পাল তখনো স্বদেশী নেতা হননি, ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-লেখক। তিনি 'হিন্দু'-র কলকাতা-সংবাদদাতা ছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে নিরপেক্ষতার ঈষৎ দায় তাঁর ছিল, কিন্তু অধিক পরিমাণে ছিল স্বগোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য, যা কৌশলে বিবেকানন্দ-বিরোধী সংবাদ পরিবেশনে তাঁকে প্ররোচিত করত। 'হিন্দু'-র ৫ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত রচনায় তিনি জানালেন, বিবেকানন্দকে স্টেশনে অভ্যর্থনা জানাতে হাজার হাজার মানুষ জুটলেও 'হিন্দু কলকাতা' তাঁর সম্বন্ধে মুখ বাঁকিয়েইছিল। এই সূত্রে তিনি রক্ষণশীল 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায়, কায়স্থ হয়েও সন্ন্যাসী-সাজা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ধারাবাহিক আক্রমণের উল্লেখ করলেন। বিবেকানন্দ হিন্দুদের কুসংস্কারকে, 'ভাতের হাঁড়ির ধর্ম'কে, আক্রমণ করেছেন, সেজন্য রক্ষণশীলদের রাগ হতে পারে—একথাও অবশ্য তিনি জানিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের অভ্যর্থনায় সমবেত জনতা সত্যই 'বৃহৎ'—এইকথা বলে যোগ করলেন—বিবেকানন্দের গাড়ির সামনে কীর্তনদল চলছিল, এতে নাকি ভক্তপ্রাণে আঘাত লেগেছে। নাম ও নামী যখন এক, তখন কোনো এক মনুষ্যের সম্মানে আয়োজিত শোভাযাত্রায় ঈশ্বরের নামগান হবে—কি অন্যায়!! ১৩ মার্চ সংখ্যায় ইনি কলকাতার 'বিবেকানন্দ সপ্তাহের' বর্ণনায় জানালেন যে, গত লেখায় তিনি কেবল রক্ষণশীলদের বিরোধিতার কথা বলেছেন, তার সঙ্গে এই সংখ্যায় যোগ করতে হবে থিয়জফিস্ট ও মজুমদার-পন্থীদের বিরোধিতার কথাও। বিবেকানন্দের কলকাতা-ভাষণ তাঁর প্রশংসা পেল, কারণ তাতে স্বামীজী নিজেকে 'কলকাতার ছেলে' বলে চিহ্নিত করেছিলেন, কিন্তু সমালোচিত হলো স্টার থিয়েটারে তাঁর বেদান্ত-বক্তৃতা। বেদ-উপনিষদ-জানা মানুষদের বক্তৃতাটি খুশি করেনি (যদিও বক্তৃতাটির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অন্য সাক্ষ্য আছে) এবং লেখকও খুশি হননি, যেহেতু দ্বৈত অদ্বৈতের সমন্বয়ের যে-চেষ্টা স্বামীজী করেছেন, তা 'অসঙ্গতিপূর্ণ'। নিজের সংস্কৃতজ্ঞানের ওপর নির্ভরতা না রেখে বিপিন পাল প্রামাণ্য হিসাবে বেদান্তসূত্র ও শারীরক ভাষ্যের অনুবাদক ডঃ থীবটের মতামতের উল্লেখ করেছিলেন—নিজ বক্তব্যের সমর্থনে। শোভাবাজার রাজবাটীর সংবর্ধনাসভায় বিপুল জনাসমাগম হলেও টিকিট কেটে ঢুকতে হবে বলে স্টার থিয়েটারের বেদান্ত-বক্তৃতাসভায় তেমন লোক হয়নি—একথাও তাঁর লেখা থেকে জেনেছি এবং সমালোচনার দুমুখো ছুরি ব্যবহার ক'রে জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাঙালীরা পয়সা খরচ ক'রে ভালো কাজ করতে নারাজ, অপরদিকে ইঙ্গিত—বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তায় টান ধরেছে। কিছু ভালো কথা তিনি বলেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে 'শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব মেলা' সম্বন্ধে, যা কলকাতার "সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসবের অন্যতম", সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যগণ অক্লান্ত আতিথ্য দেখান, এবং সেখানে জাতির বেড়া ভেঙে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এক পঙ্ক্তিতে বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

প্রচলিত রীতির সমাজসংস্কার সমর্থনের ব্যাপারে 'হিন্দু' ক্রমে আরও গুটিয়ে যায়। আগেই বলেছি, মতভেদের কারণে পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক এবং প্রধান লেখক জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার অক্টোবর ১৮৯৮-এ 'হিন্দু'-র সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ক'রে তামিল পত্রিকা 'স্বদেশমিত্রম'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঐ কালের পরে স্বামীজীর সমাজসংস্কারমূলক কার্যাবলী নিয়ে আলোচনাদির বিশেষ সুযোগও ছিল না, কারণ

স্বামীজী তখন রামকৃষ্ণ-সংঘ গঠন, লোকসেবাকর্ম ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন—ভারতে বক্তৃতাদিতে ছেদ টেনে দিয়েছিলেন। তারপরে বৎসরাধিক পাশ্চাত্য-ভ্রমণ, প্রত্যাবর্তন এবং জীবনের অবশিষ্ট সময় পূর্বোক্ত কার্যধারাকে প্রসারিত করার প্রয়াসেই তিনি নিয়োজিত ছিলেন।

॥ নয় ॥

বিবেকানন্দ থেকে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে এলে দেখব, 'হিন্দু' পত্রিকা এ-ব্যাপারে সংবাদ পরিবেশনে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছে। স্বামীজী নিজের নামে সংঘের নামকরণ করেন নি, গুরুর নামেই করেছিলেন; কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তিনি যন্ত্র, তাঁর গুরুই যন্ত্রী—গুরুই শিষ্যের বাণীর বীণাপাণি। শ্রীরামকৃষ্ণের নামে নির্মিত সংঘ-যন্ত্রটিকে চালিত করার প্রাথমিক কাজ বিবেকানন্দ শুরু করলেও তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজ করেছেন তাঁর গুরুভাইরা এবং শিষ্যরা। এই গুরুভাইদের সকলে লোকচক্ষুর সামনে আসেন নি; যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ। অন্তরালের পরিচালক স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামীজীর শিষ্যদের মধ্যে প্রথমেই আসেন নিবেদিতা। বক্তা, লেখক ও কর্মী হিসাবে এঁর নাম অল্পকালের মধ্যে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কিছুকাল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন স্বামীজীর এক আত্মগর্বী বিদ্রোহী শিষ্যা অভয়ানন্দ (মেরী লুইস)। স্বামীজীর 'গণেশ' বলে চিহ্নিত, তাঁর সেবক ও শিষ্য, বিখ্যাত সঙ্কেতলিপিকর, জে জে গুডউইন ভারতেই দেহত্যাগ করেন। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, ভারতে তাঁরও দেহান্ত হয়। তাঁর সহধর্মিণী মিসেস সেভিয়ার বহু বছর ধরে ভারতবাস করেছেন। আর ছিলেন সিস্টার ক্রিস্টিন, স্বামীজীর অভীপ্সিত নারীশিক্ষার কাজ নিয়ে তিনি ভারতবাসী। এঁদের কয়েকজনের এবং স্বামীজীর অন্য অনেক সহায়কের বিষয়ে সংবাদ 'হিন্দু'-তে এই পর্বে ছাপা হয়েছে। এর মূলে অনেকগুলি কারণ ছিল। সর্বাধিক কারণ অবশ্য স্বামীজীর প্রভাব, যার পরিমণ্ডলের ভিতরে ছিলেন 'হিন্দু'-র সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের কেউ কেউ। এঁদের সঙ্গে স্বামীজীর একান্ত অনুগামী আলাসিঙ্গা পেরুমল প্রমুখের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। এর ওপর, ত্যাগে বৈরাগ্যে জ্বলন্ত অসাধারণ সন্ন্যাসী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে কাজ করতে শুরু করেন স্বামীজীর নির্দেশে। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং আধ্যাত্মিক শক্তি অনেককেই অভিভূত করেছিল। এইসব জড়িয়ে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের আদিপর্বের অনেক বিক্ষিপ্ত সংবাদ 'হিন্দু'-র পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ 'হিন্দু'-তে সবিশেষ নমস্কৃত পুরুষ। খুবই বিস্ময়ের কথা, যখন সবে বিবেকানন্দ-সংবাদ আমেরিকা থেকে আসতে শুরু করেছে, বিবেকানন্দের গুরু হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ তখনো পরিচিত নন, ঠিক সেই সময়ে—২১ নভেম্বর ১৮৯৩-এ 'হিন্দু' প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'থীস্টিক কোয়ার্টারলি রিভিউ'-এ প্রথম প্রকাশিত অসামান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিতাখ্যানটি পুনর্মুদ্রিত করে। ম্যাক্সমূলার এই প্রবন্ধটি থেকেই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবহিত হন। ভারততত্ত্ববিদ্ বেদ-সম্পাদকরূপে বহুমান্য ফ্রেডরিক ম্যাক্সমূলারের তখন বিশ্বজোড়া নাম—ভারতে তিনি তো 'ম্লেচ্ছদেশে জাত ভারতীয় ঋষি'

বলে কথিত এবং কার্যত অর্চিত। সে হেন ম্যাক্সমূলার যখন 'নাইনটিস্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকায় 'এ রিয়্যাল মহাত্মন্' নামে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা লিখলেন তখন 'হিন্দু'-সম্পাদক বিশেষ রকম উদ্বুদ্ধ হয়ে ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬-এ একটি সম্পাদকীয়ই লিখে ফেললেন। "আধুনিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেদান্তাচার্যের [শ্রীরামকৃষ্ণের] জীবন, চরিত্র ও বাণীর কথা পাশ্চাত্যজগতের গোচর ক'রে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার গোটা হিন্দুসমাজকে বিপুল ঋণ ও কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন"—'হিন্দু' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকীয়ের সূচনা হয় এইভাবে। পত্রিকার সম্পাদক জানালেন : এদেশে আচার্যের অভাব হয়নি, কিন্তু সাধারণ মানুষ তাঁদের উপদেশের শাঁসের বদলে খোসা নিয়ে মাতামাতি করেছে। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে গতি ও বিস্তার। অবশ্য কাল বদলেছে, এখন নতুন আলোকে বস্তুবিচার করতে শুরু করেছে এদেশের মানুষ, হিন্দুধর্মের যথার্থ প্রকৃতি বিচারের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, সত্যসন্ধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্যাভিমানীরা পুরাতনী ধারার আচার্যদের পাদমূলে বসতে দ্বিধা করছেন না। এক্ষেত্রে প্রথমে স্মরণে আসেন দয়ানন্দ সরস্বতী ও শ্রীরামকৃষ্ণ। সম্পাদক সানন্দে জানালেন শ্রীরামকৃষ্ণের স্বতন্ত্র মহিমার কথা, যাঁর বাণীতে বিপুল ঐশ্বর্যের জগতে অবস্থিত মানুষেরা পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই পরম বিস্ময়ের পাত্র। স্মরণ করা যায় যে, কেশবচন্দ্র সেনের তুল্য সমাজসংস্কারকরাও জীবনের শেষপর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা আপ্লুত ছিলেন। এখন একই ধারায় দেখা যাচ্ছে ম্যাক্সমূলারকে—যাঁর লেখনী সৃষ্টি করেছে 'এ রিয়্যাল মহাত্মন্' প্রবন্ধ। 'হিন্দু'-সম্পাদক অতঃপর ম্যাক্সমূলার-উপস্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তির বৈশিষ্ট্যের দিক তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। প্রথমত ঐসব বাণী হীরামণিমুক্তার মতোই বর্ণোজ্জ্বল ও মূল্যবান; দ্বিতীয়ত, তাদের মধ্যে আছে পৃথিবীর পক্ষে সবচেয়ে দরকারী—অপূর্ব উদারতা। ধর্মদ্বেষের প্রথম শিকার—সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী দ্বন্দ্বরহিত সত্যের উন্মোচক। শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল "দূরবিস্তারী প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি"। তাঁর বিষয়ে ম্যাক্সমূলার বলেছেন, ঐ মহাত্মা হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান-ধর্মের মধ্যে মিলনসূত্র রচনা করেছেন। সবই তিনি করেছেন বেদান্তসত্যের ভিত্তিতে। সম্পাদক এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন, ঈশ্বর নিশ্চয় "কোনো সাক্ষী না রেখে তাঁর সত্যরূপের প্রকাশ করেন না।" বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সাক্ষিপুরুষ। "যে-আলো শ্রীরামকৃষ্ণ জ্বেলেছেন, আমরা যেন সেই আলোকের পথে চলি।... আচার্যদেবের সাক্ষাৎ পরিমণ্ডলের মধ্যে না এলেও তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের যাদু আমরা অনুভব করেছি।"

দুই বছর পরে প্রকাশিত ম্যাক্সমূলারের 'রামকৃষ্ণ অ্যান্ড হিজ সেইংস' বইয়ের ওপরে 'হিন্দু' যখন ২৩ জানুয়ারি ১৮৯৯ তারিখে আরেকটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখল তখন কিন্তু পূর্ব সম্পাদকীয়ের তুল্য ভাবাবেগ ছিলনা। বিরাট ভাষাতাত্ত্বিকরূপে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রেরণাদাতা হিসাবে ম্যাক্সমূলারের গুরুত্বের কথা স্বীকার করার পরে, সম্পাদক উক্ত গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী সংকলনের অসাধারণ মূল্যের কথা বললেন। 'ব্রহ্মবাদিন' ইত্যাদি পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী প্রকাশিত হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যরাও পাশ্চাত্যে প্রাসঙ্গিকভাবে সে-বাণী উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু সে-সকলের দ্বারা ঐ মহাবাণী পাশ্চাত্যে যথেষ্ট প্রচারলাভ করেছে কিনা সন্দেহ। ম্যাক্সমূলারের বই সেই কাজটি করবে। দ্বিতীয়ত তা সাহায্য করবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শুভকর বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে। অহঙ্কৃত,

ভোগবিলাসে মত্ত, বিলাতী শাসকেরা বইটিকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না। (তা যে পারেনি তার প্রমাণ 'স্টেটসম্যান', 'টাইমস অব ইন্ডিয়া', 'ম্যাড্রাস মেল', 'পায়োনীয়ার' প্রভৃতি সাহেবী পত্রিকায় বইটির ওপর দীর্ঘ সম্পাদকীয় অথবা প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল।) রাজনৈতিক পত্রিকা হিসাবে 'হিন্দু'-র বিশেষ প্রত্যাশা—আনকোরা কাঁচা 'সিভিলিয়ান'রা এদেশে এসে বইটি পড়ার সুবাদে এখানকার সংস্কৃতিকে কিছুটা শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবে ইত্যাদি। 'হিন্দু' কিন্তু বইটির অবিমিশ্র প্রশংসা করতে পারেনি। বইটির মধ্যে ম্যাক্সমুলার সন্ন্যাস, বৈরাগ্য, সমাধি, যোগসিদ্ধি, অলৌকিকতা ইত্যাদি বিষয়ে যেসব বিরূপ মন্তব্য করেছেন, সেগুলি "তাঁর উচ্চ মর্যাদার যোগ্য নয়"। ম্যাক্সমূলার উপেক্ষাভরে বলেছেন : "ইউরোপে কিন্তু ভারতীয় সন্ন্যাসধর্মের অনুসৃতি ঘটবে না।" 'হিন্দু'-সম্পাদক বললেন (এখন অবশ্য জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার 'হিন্দু'-র সম্পাদক নন) : ম্যাক্সমূলারের ঐ কথাগুলি এখানকার মতো ঠিক, কেননা ইউরোপ সবে ভারতকে জানতে শুরু করেছে, ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী বুঝতে তার আরও অনেক শতাব্দী লাগবে, "কিন্তু আমরা সর্বাংশে এই ধারণা পোষণ করি, একমাত্র হিন্দুধর্মই বিশ্বধর্ম হয়ে উঠতে পারে, এবং কোনো একদিন, যত দূরবর্তী দিনই হোক, এই ধর্ম ইউরোপ থেকে বিশেষ অনুরক্ত অনুগামীদের লাভ করবে এবং পৃথিবীকে ইউরোপ তখন দান করবে সত্যকার সন্ন্যাসী।"

ম্যাক্সমূলারের গ্রন্থের অংশবিশেষ সম্বন্ধে 'হিন্দু'-র সমালোচনায় যুক্তি আছে একথা সত্য। স্বামীজী তাঁর 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' প্রবন্ধে যেকথা বলেছেন—"'প্রকৃত মহাত্মা' নামক প্রবন্ধে যে-অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, এবার তাহা অতি যত্নে আবরিত"—উক্ত প্রবন্ধের সেই 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গ' গ্রন্থমধ্যে কেন 'আবরিত', তার কারণও স্বামীজী একই প্রবন্ধে জানিয়েছেন, যার বিষয়ে 'হিন্দু'-সম্পাদক সম্ভবত যথেষ্ট অবহিত ছিলেন না। সে-কারণটি হলো, 'প্রকৃত মহাত্মা' প্রবন্ধ ব্রাহ্ম ও মিশনারি মহলে বিশেষ অন্তর্দাহের কারণ হয়, "উভয় পক্ষ হইতে বহু ভর্ৎসনা, বহু কঠোর বাণী, অধ্যাপকের ওপর আসে"; সেজন্য "এ-জীবনীতে সভয় ঐতিহাসিকের প্রত্যেক কথাটি যেন ওজন করিয়া লেখা।" তাঁকে "একদিকে মিশনারি, অন্যদিকে ব্রাহ্ম-কোলাহল—এই উভয় আপদের মধ্য দিয়া" নৌকা চালাতে হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে 'হিন্দু'-সম্পাদক জি সুব্রহ্মণ্য আয়ারের একটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বেরিয়েছিল 'হিন্দু'-র ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৪ সংখ্যায়। তিনি ব'লেন, যথার্থ ইতিহাস-স্রষ্টা হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মানুষেরাই, যাঁরা অত্যুচ্চ আদর্শকে অক্ষরে অক্ষরে জীবনে রূপায়িত ক'রে থাকেন। ওঁরা "বিশ্ব-ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার।" শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে মাননীয় বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ার এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বক্তৃতার বিবরণও 'হিন্দু'-তে বেরিয়েছে (১৭ জানুয়ারি ১৮৯৮)। ১৮৯৪ সাল থেকে এই পত্রিকা মাঝে মাঝে কলকাতা, মাদ্রাজ ও ভারতের অন্য শহরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের সংবাদ দিয়েছে। (যথা—৯ মার্চ ১৮৯৪, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮, ১ মার্চ ১৮৯৯)। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিষ্য বা অনুগামীদের দেহান্তের সংবাদও 'হিন্দু'-তে বেরিয়েছে, যথা—ডাঃ রামচন্দ্র দত্তের (২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯), স্বামী যোগানন্দের (১০ এপ্রিল ১৮৯৯), সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়রের (৩ অক্টোবর ১৯০১) এবং বিলিগিরি আয়েঙ্গারের (৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০২)। সংবাদ পেয়েছি রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-আন্দোলন (১৬ এপ্রিল ১৯০১), মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০২) ও কলকাতা রামকৃষ্ণ

সমাজ সম্বন্ধে (২৩ নভেম্বর ১৮৯৯)। প্রধানত বিবেকানন্দের দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গের ফলরূপে 'ইয়ং মেনস হিন্দু অ্যাসোসিয়েশনস'-এর সংবাদ প্রায়ই বেরিয়েছে (যথা—৩ আগস্ট ১৮৯৭, ৩ জানুয়ারি ১৮৯৯)। স্বামী সারদানন্দের সংবাদ (২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬), এবং মাদ্রাজকে যিনি নিজ কর্মক্ষেত্ররূপে বরণ করেছিলেন, সেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অনেক কথা (যথা—১৭ জানুয়ারি, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২৭ মে, ২৮ অক্টোবর ১৮৯৯, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০২) পাওয়া গেছে। স্বামী অভয়ানন্দের ভারত-ভ্রমণকালে ১৮৯৯ সালে তাঁর বিষয়ে প্রচুর সংবাদে 'হিন্দু'-র পৃষ্ঠা পূর্ণ ছিল। সিস্টার নিবেদিতা সম্বন্ধে দীর্ঘ ও নাতিদীর্ঘ বহু সংবাদ 'হিন্দু' পরিবেশন করেছে। স্বামী অভয়ানন্দ ও নিবেদিতা সম্বন্ধে এতকিছু প্রকাশের কারণ—তাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারাকে পাশ্চাত্যে বহন করছেন, এই ধারণা। একই কারণে 'হিন্দু' অভ্যর্থনা জানিয়েছিল রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের মুখপত্র 'ব্রহ্মবাদিন'-এর আবির্ভাবকে (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫)। 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর প্রথম সম্পাদক রাজম আয়ারের মৃত্যুতে দুই মাস বন্ধ থাকার পরে পত্রিকাটি যখন সরাসরি রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র হিসাবে পুনরাবির্ভূত হলো তখন সে-সংবাদ 'হিন্দু'-তে পত্র লিখে গোচর করেন স্বামী সদানন্দ (২৮ জুন ১৮৯৮)।

॥ দশ ॥

স্বামীজী বিষয়ে নানা ধরনের যেসব সংবাদ 'হিন্দু'-তে বেরিয়েছিল তাদের সবকিছুর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসব স্বামীজীর দেহত্যাগে 'হিন্দু'র সম্পাদকীয় এবং সারা ভারতের সংবাদপত্রে ঐ দেহত্যাগ কিভাবে দেখা হয়েছে, তার উল্লেখের মধ্যে। শেষোক্ত বিষয়ে কলকাতার 'ইন্ডিয়ান মিরারে'-র মতো মাদ্রাজের 'হিন্দু' সংবাদভাণ্ডার হয়ে উঠেছিল। দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বামীজীর প্রয়াণ একেবারে জাতীয় বিপর্যয়রূপে গৃহীত হয়। ছোট-বড় বহু সভায় শোকপ্রকাশ করা হয়। অনেক সমিতি, গ্রন্থাগার বা সভাগৃহ স্বামীজীর নামাঙ্কিত করা হয়। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় স্থাপিত হয় 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'গুলি। কয়েক বছরের মধ্যে নিবেদিতা 'সাজেশনস ফর দ্য ইন্ডিয়ান বিবেকানন্দ সোসাইটিজ' প্রবন্ধের সূচনায় বলেছেন : "ভারতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তের মধ্যে, বিশেষত দক্ষিণ প্রেসিডেন্সিতে, শহর এবং গ্রামে, বিবেকানন্দ সোসাইটিগুলি দেখতে পাওয়া যায়।"[২১] নিঃসন্দেহে বলা যায়, স্বামীজীর দেহত্যাগে দাক্ষিণাত্যে যে ব্যাপক শোকোচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল, তার অনুরূপ কিছু সেইকালে বঙ্গ প্রেসিডেন্সিতে বা ভারতের অন্যত্র দেখা যায়নি। স্বামীজীর ওপর নিজের অধিকারবোধ দাক্ষিণাত্যের ছিল। তদনুযায়ী তাঁর বিহনে শূন্যতাবোধও।

স্বামীজীর দেহান্তের পরে ৮ জুলাই ১৯০২ যে দীর্ঘ সম্পাদকীয় 'হিন্দু' লেখে তার শুরুতেই বলা হয়, তাঁর দেহান্ত কঠিন আঘাতের মতো বেজেছে, যদিও একথা জানা ছিল যে, পাশ্চাত্যে কয়েক বছর অপরিসীম পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে। "মৃত্যুর নিকটে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়," তবু 'হিন্দু' সে-চেষ্টা কিছুটা করেছিল, যাতে সেই 'সার্বভৌমিক সন্ন্যাসী'র মহিমা, আত্মত্যাগ ও উদ্দীপ্ত দেশপ্রেমে ভরপুর জীবন

থেকে মানুষ শিক্ষা নিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে তাঁর ভাব সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট হতে পারে।

বিস্ময়ের কথা, এই সম্পাদকীয়তে প্রয়াত বিবেকানন্দ অপেক্ষা তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ কম গুরুত্ব পাননি।—"ইংরেজী-শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল যখন নবোদ্ভূত ব্রাহ্মধর্মের ভাবধারা নিয়ে আন্দোলিত, যখন কেশবচন্দ্র সেন তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা ও উদার সহানুভূতিতে গ্রহিষ্ণু মনগুলিকে মোহিত ক'রে ফেলেছেন, ঠিক তখন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বিরাট শহর কলকাতার প্রান্তে নীরবে ক্রিয়াশীল থেকে আকর্ষণ করছিলেন কিছু তরুণকে, যাদের মনের অস্থিরতা তাঁর কাছে ঐকান্তিক আন্তরিকতার নিশ্চিত নিদর্শন বলে প্রতিভাত হয়েছিল। আর, স্বয়ং কেশবচন্দ্র যে সুমহান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে বহু প্রেরণা পেয়েছিলেন, একথা তো ইতিহাসের স্বীকৃত সত্য।" ব্রাহ্মধর্ম বা ইসলামের মতো কোনো নতুন বার্তা শ্রীরামকৃষ্ণ আনেন নি। তিনি বেদান্তের পুরাতনী ধারারই ভগীরথ। "কেবল তাঁর বেগবাহিত ধারা অতীতে যা কখনো ঘটেনি এমন সর্বগ্রাসী আকার নিয়ে ছুটে চলেছিল।" ধর্মসমন্বয় তাঁর মহান শিক্ষা। ধর্মজগতে গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসকল সংঘর্ষ চলেছে তার থেকেই বোঝা যাবে ঐ শিক্ষার মূল্য কতখানি। "সকল সত্য আবদ্ধ হয়ে আছে কোনো একটি বিশেষ ধর্মে, কিংবা কোনো একটি ধর্ম সর্বাংশে সত্য আর অন্যগুলি অংশত মাত্র সত্য, কিংবা কিছু মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে বিভিন্ন ধর্মের ভূষির ভিতর থেকে আসল শস্যদানা খুঁজে নিয়ে খারাপ অংশগুলি বর্জনের দ্বারা বাছাই-করা একটি ধর্মমত তৈরি ক'রে নেবে (যা কেশবচন্দ্র করেছিলেন)—'হিন্দু'-সম্পাদক জানালেন—এই সকলের উদ্ভট রূপ বেশি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয় এই চরিত্রের নয়। তিনি বেদান্তের আচার্য, যা মনে করে, ধর্ম হলো সভ্যতাবিধায়ক শক্তি—মানবচরিত্রের মধ্যে যতই তার অনুপ্রবেশ ঘটবে ততই মানুষ অধিকতর আলোকিত হয়ে উঠবে এবং বিভিন্ন ধর্মের সত্যরূপকে স্বীকার করবে। এই বেদান্ত—ধর্ম ও দর্শন দুই-ই। দর্শনক্ষেত্রে তা মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যকে প্রারম্ভিক স্তরে মেনে নেয় এবং সর্বোন্নত পর্যায়ে পৌঁছাবার পরেও প্রারম্ভিক স্তরগুলিকে অস্বীকারের প্রয়োজনবোধ করে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, সাধনা ও শিক্ষার সঠিক তাৎপর্য বুঝবার ক্ষমতা তরুণ বিবেকানন্দের ছিল—একথা বলার পরে সম্পাদক বিবেকানন্দের জীবনের তিন বিশাল কর্মতরঙ্গের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন : এক, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে; দুই, সকল মানুষকে, বিশেষত তাঁর দেশবাসীকে অনুভব করাতে হবে যে, মূলগতভাবে সে দিব্যচরিত্র; তিন, প্রত্যেক নরনারীকে তার অন্তর্গত দেবত্বকে জীবনের নানা ইচ্ছা ও কর্মের মধ্যে প্রতিফলিত করার জন্য প্রণোদিত করতে হবে।

এই লেখায় পেয়েছি, ধর্মমহাসভার পূর্বে ভারতে অবস্থানকালেই বিবেকানন্দের অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় তাঁর পরিচিতজনেরা পেয়েছিলেন। "কিন্তু ধর্মমহাসভাই বিবেকানন্দকে তাঁর মাতৃভূমির কাছে উন্মোচন করেছে।" মাদ্রাজে যে অভূতপূর্ব সংবর্ধনা তাঁকে দেওয়া হয়, তা যোগ্যপাত্রেই অর্পিত। অপরদিকে স্বামীজী তাঁর সকল গৌরব অর্পণ করেছেন বেদান্তধর্ম ও নিজ গুরুর ওপর। স্বামীজীর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অসুবিধা হলো—তিনি বড় নিকটকালে অবস্থিত। মানুষ অপরের বিচার করে তাঁর বা তাঁদের দ্বারা রোপিত

বীজের ফলরূপায়ণ দেখে। সেই কালব্যবধান আসেনি। কিন্তু সম্পাদক তাঁর রচনা শেষ করেছিলেন এই নিশ্চিত প্রত্যয়ে :

> **"স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী—বিশ্বমানবের প্রয়োজনসাধনে নিয়োজিত তাঁর দিব্যভাবমণ্ডিত জীবনের অবসান ঘটেছে শান্ত সুগম্ভীর মৃত্যুতে। তা নিয়ে অভিযোগ করার কারণ নেই। তিনি জীবনকে প্রস্তুত করেছিলেন যে-ব্রত সাধন করতে, তার সমাধা করেছেন অপূর্বভাবে—শোধ করেছেন পৃথিবীতে জন্মের ঋণ। আজ আমরা গর্বিত এই ভেবে যে, ভারত তাঁর জন্ম দিয়েছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তিনি মাতৃভূমির মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছেন। সত্যই, মানবসমাজের ইতিহাসে সর্বোত্তমদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় স্মরণের যোগ্য পুরুষ তিনি।"**

উল্লেখপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. *Reminiscences of Swami Vivekananda*, by His Eastern and Western Admirers, 1st edition, pp. 79-80. Advaita Ashrama Kolkata

২. Bimanbehari Majumder, *Militant Nationalism in India*, 1966, pp. 1 2

৩. স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে ত্রিচিনোপল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার (তিনি তখন কুম্ভকোনম গভর্নমেন্ট কলেজের অধ্যাপক)। সভাপতির ভাষণে তিনি "স্বামীজীর সুমহান শুভকর স্মরণীয় অমর জীবনের" বিষয়ে যা বলেন, তার সংক্ষিপ্তসার বেরিয়েছিল ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯০২ তারিখে 'হিন্দু' পত্রিকায়। তার মধ্যে শিকাগো-গমনের আগে ত্রিবান্দ্রামে অধ্যাপক আয়ারের বাসভবনে স্বামীজীর কয়েকদিন অবস্থানের প্রসঙ্গ আছে। "স্বামীজীর প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অতিরিক্ত তাঁর ওপব দ্যুতি-বিকীর্ণকারী মহিমময় ও মহত্ত্বপূর্ণ গুণাবলীর বিষয়ে" জানবার অনেক সুযোগ বক্তা পেয়েছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট অনেক ঘটনার উল্লেখ করেন—সে-সকলের দ্বারা দেখা যায়, স্বামীজীর চরিত্রে আত্মলোপ ও আত্মঘোষণার অতীব মঙ্গলকর সম্মিলন ঘটেছিল। "কয়েক মিনিট কথাবার্তার মধ্যেই স্বামীজী নিজ মহিমার ছাপ স্থায়িভাবে অপরের মনে মুদ্রিত ক'রে দিতে পারতেন, এবং তাঁর সান্নিধ্যে আগত মানুষগুলিকে তাদের আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষা দিয়ে উন্নীত ক'রে তোলার বিরল ক্ষমতা তাঁর ছিল। স্বামীজী চিরসন্ন্যাসী—অতীতের মহান বৈদান্তিক আচার্য শঙ্করাচার্যের মতোই। সারা জগতে বেদান্তপ্রচার এবং স্বদেশে সামাজিক উন্নয়নের যে-কাজই তিনি করুন, কখনই তিনি এদেশের মহীয়ান ঋষিদের বিরাট ঐতিহ্যকে লঙ্ঘন করেন নি।"

৪. *Reminiscences*, pp. 102-103.

৫. পরিব্রাজক পর্বে স্বামীজীর মাদ্রাজ-জীবনে ট্রিপ্লিকেন লিটারারি সোসাইটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। এইখানে সভাদের সামনে বক্তৃতা করেই তিনি মাদ্রাজের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর মাদ্রাজী অনুগামীদের অনেকেই এই সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িত ছিলেন।

মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ-আন্দোলন সম্পর্কে গবেষক-লেখক পি এস মানি এই সংস্থা সম্পর্কে নিম্নের সংবাদগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন :

১৮৬৮ সালে ইংরেজী-শিক্ষিত কিছু ব্যক্তি সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনাদির জন্য সংস্থাটির প্রবর্তন করেন। ১৮৭৪ সালে এটি পুনর্গঠিত হয়। ১৮৮৪ সালের একটি রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, সংস্থাটির ঠিকানা—৮, থুলাসিং পেরুমল কয়েল স্ট্রিট, ট্রিপ্লিকেন। এইকালে সোসাইটি রাজনৈতিক ব্যাপারেও আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং 'মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশনে'র সহযোগে নিজের প্রতিনিধি পাঠাতে থাকেন মফঃস্বল শহরে—স্থানীয়

স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে স্থানীয় মানুষদের কাছে বক্তৃতা করার জন্য। শিক্ষাসমস্যার বিষয়ে এই সংস্থার পূর্বাবধি আগ্রহ। ১৮৮৪ সালে সোসাইটির কার্যকরী সমিতির সদস্যরা ছিলেন :

আর রঘুনাথ রাও, দেওয়ান বাহাদুর—সভাপতি; ভি কৃষ্ণমাচারী এবং পি অনন্তচার্লু, বি এল—দুই সহ-সভাপতি; এ রাজাবাহাদুর মুদালিয়র, বি এ—সম্পাদক; ভি এম পার্থসারথি আয়েঙ্গার—কোষাধ্যক্ষ। সদস্যগণ: জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার, বি এ; এম বীররাঘবাচার্য, বি এ; টি বরদা রাও, বি এ, বি এল; টি এস সদাশিব আয়ার, বি এ, বি এল; টি ভি শেষগিরি আয়ার, বি এ; সি গোপাল রাও, বি এ; ডি কেশব রাও; টি আর বেঙ্কটস্বামী নাইডু, বি এ এবং দাস কৃষ্ণ বাও।

৬. Rangaswami Parthasarathy, *A Hundred Years of the Hindu*, pp 1-6 (এরপর থেকে *Hundred Years*)

৭. Rangaswami Parthasarathy, *Journalism in India*—1991, p. 58

৮. S Muthiah, *Madras Discovered* 1987, p. 68

৯. *Hundred Years*, pp. 5-6

১০. *Madras Discoverd* p. 68

১১. *Hundred Years*, p. 5

১২. *Modern Review*, March 1909

১৩. *Journalism in India*, p 226

১৪. *Hundred Years*, p. 3

১৫. *Madras Discovered*, p 67

১৬. *Hundred Years*, p. 4

১৭. *Ibid*, p 73

১৮. *Ibid*, p 75

১৯. 'সমকালীন', ১ম খণ্ড, পৃ ২০-২১

২০. ঐ, পৃ. ২১

২১. *Complete Works of Sister Nivedita*, Vol IV 1st Edn 1968 p. 380

[উদ্বোধন পত্রিকার আশ্বিন ১৪০১ সংখ্যায় প্রকাশিত।]

লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় বিবেকানন্দ-সংবাদ এবং সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিবেকানন্দ-স্মৃতি

॥ এক ॥

স্বাধীনতা-পূর্বে লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকা উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে ভারতীয়-পরিচালিত প্রধান সংবাদপত্র, একথা সর্বসম্মত। মাদ্রাজের ইন্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকার জুলাই ১৯১০ সংখ্যায় দেখি—ট্রিবিউন ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১-তে শুরু হয় সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে।[১-ক] ১৬ অক্টোবর ১৮৮৬ থেকে সপ্তাহে দুবার, জানুয়ারি ১৮৯৮ থেকে সপ্তাহে তিনবার এবং ১৯০৬ সাল থেকে দৈনিক পত্র হিসাবে ট্রিবিউন বেরোতে থাকে। স্বামীজীর সময়কার সংবাদ বেরোবার কালে (১৮৯৩-১৯০২) পত্রিকাটি প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পর্বে সপ্তাহে দুবার, তারপরে সপ্তাহে তিনবার হিসাবে বেরিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, পত্রিকাটির ১৮৯৮ সালের কোনো সংখ্যাই কোনো গ্রন্থাগারে পাইনি।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই পত্রিকার সূচনা ব্যাপারে পূর্বভারতের বাঙলার একটা ভূমিকা ছিল এবং পত্রিকার খ্যাতি প্রধানত যেসব সম্পাদকের উপর নির্ভরশীল ছিল তাঁরা তিনজনই বাঙালী—শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং কালীনাথ রায়। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী কিন্তু পঞ্জাবের বিখ্যাত প্রগতিশীল শিখ—সর্দার দয়াল সিং মাজিতিয়া। ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসমূলক বিভিন্ন গ্রন্থে ট্রিবিউন আরম্ভের পিছনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণার কথা বলা আছে। তাঁরা সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী থেকে এই ব্যাপারে তথ্যসংগ্রহ করেছেন।[১খ] আমরা এক্ষেত্রে সরাসরি সুরেন্দ্রনাথের রচনা ব্যবহার করব।

সরকারি চাকরি থেকে অন্যায়ভাবে পদচ্যুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকতাকে বৃত্তি করেছিলেন কিন্তু আন্দোলন ছিল তাঁর স্বভাবে, তা বৃদ্ধি পেয়েছিল সরকারের অবিচারে। সেই আন্দোলন সংগঠনের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ছিলনা জমিদারদের স্বার্থ-প্রহরী 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ এবং আনন্দমোহন বসু প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', (২৬ জুলাই ১৮৭৬), যা প্রথম উল্লেখযোগ্য আন্দোলন করে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার বয়স একুশ থেকে কমিয়ে উনিশ করার বিরুদ্ধে। এই আন্দোলন সারা ভারতে শিক্ষিত মহলে সাড়া জাগায়। ফলে একই মঞ্চে সারা ভারতের প্রতিনিধিদের সমবেত করার সম্ভাবনা দেখা যায় এবং সেই উদ্দেশ্যে বক্তৃতা সফর করতে সুরেন্দ্রনাথকে স্পেশাল ডেলিগেট মনোনীত করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে কলকাতার শিক্ষিতসমাজে মাৎসিনী ও

ইতালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে বক্তৃতাদি ক'রে বাগ্মী খ্যাতি পেয়েছেন—(সুরেন্দ্রনাথের মাৎসিনী অবশ্য বহুলাংশে নিরামিষ-চরিত্র কারণ মাৎসিনীর দেশপ্রেমটুকু নিয়ে বিপ্লবের অংশটুকু সরিয়ে রাখা হয়েছিল,[২] নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর এসব বক্তৃতার শ্রোতা ছিলেন কিন্তু সেই জ্বলন্ত যুবকটি এই ছাঁটাই মাৎসিনীকে গ্রহণ করেছিলেন কিনা সন্দেহ)—ফলে তিনি কার্যসিদ্ধি করতে পারবেন, ধরে নেওয়া হয়। ভারতের নানাস্থানে তাঁর বক্তৃতাসফর সফল হয়, পঞ্জাবেও তাই। সেখানে গঠিত হয় 'লাহোর ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। তারপর সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "পঞ্জাবে আমি অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলাম,...যা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মহাসম্পদরূপে রক্ষা করেছি। পঞ্জাবেই সর্দার দয়াল সিং মাজিতিয়া-র সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। সে-পরিচয় দ্রুত প্রাণোত্তপ্ত ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের রূপ নেয়। এতাবৎ আমার দেখা সত্যকার খাঁটি মহৎ মানুষদের মধ্যে তিনি অন্যতম।...আমি যে-কাজের ভারপ্রাপ্ত তার সমর্থনে তিনি সক্রিয়ভাবে নেমে পড়লেন। লাহোরে একটি সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য তাঁকে আমি প্রভাবিত করতে পেরেছিলাম। তাঁর ট্রিবিউন কাগজের জন্য প্রথম মুদ্রাযন্ত্র আমিই কলকাতা থেকে কেনবার ব্যবস্থা করেছি। প্রথম সম্পাদক নির্বাচনের ভারও তিনি আমার উপর দেন। এই পদের জন্য ঢাকার প্রয়াত শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নাম সুপারিশ করি। প্রথম সম্পাদক হিসাবে তাঁর সাফল্য আমার নির্বাচনের যথার্থতা দেখিয়ে দিয়েছে।...ট্রিবিউন দ্রুত জনমত প্রকাশের শক্তিশালী বাহন হয়ে দাঁড়ায়।"[৩]

প্রথম পর্বের ট্রিবিউন সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ 'হিস্টরি অব ট্রিবিউন' গ্রন্থ থেকে উপস্থিত করা যায়। এই সংবাদগুলির সঙ্গে ট্রিবিউনের বিবেকানন্দ-মূল্যায়নের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক আছে।

সর্দার দয়াল সিং ব্রাহ্ম-আন্দোলনের প্রভাবে এসেছিলেন। তাঁর প্রগতিশীলতা কিন্তু উদারনৈতিক। সেজন্য পঞ্জাবে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও তিনি উভয় সমাজের মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলতে চেষ্টা করেছেন। স্বামী দয়ানন্দের সংস্কারমুক্ত কার্যাবলী তাঁর পত্রিকার সমর্থন পেয়েছে। শিখ-স্বার্থের সপক্ষতা করলেও তাঁর পত্রিকা শিখদের মধ্যে হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল।[৪] কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, তিনি ব্রাহ্মসমাজের দিকেই ঝুঁকছেন, বিশেষত যখন আর্যসমাজ 'আর্য পত্রিকা' নামে ইংরেজী কাগজ শুরু করল। ১৮৯১ সালে বেরুল 'পঞ্জাব পেট্রিয়ট' নাম সাপ্তাহিক কাগজ, যার উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল ট্রিবিউন এবং ট্রিবিউনের বাঙালী সম্পাদককে কটু ভাষায় নিন্দা করা। এই পত্রিকার মূল অভিযোগ ছিল, ট্রিবিউন আসলে বাঙালী কাগজ। ১০ জুন, ১৮৯৫ তারিখে এক সম্পাদকীয়তে *(A Reptile Press)* ট্রিবিউন বলে : ট্রিবিউন বাঙালী কাগজ কিনা, এবং সে পঞ্জাবের সেবা করছে কিনা, সে বিচারের ভার পাঠকদের উপর। তবে একথা বলা যায়, 'পঞ্জাব পেট্রিয়ট' বেরোবার পরে ট্রিবিউনের প্রচারসংখ্যা কমেনি বরং বেড়েছে। এখানে শুধু এই প্রশ্নই করতে পারি, 'পঞ্জাব পেট্রিয়ট' কি পঞ্জাবী কাগজ, নাকি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কাগজ? মনে তো হয় যে, একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কাগজ ভারতীয় পোশাক গায়ে চাপিয়ে ঘোরাফেরা করছে।[৫]

প্রকাশ আনন্দ্ তাঁর ট্রিবিউনের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, ট্রিবিউন প্রথমাবধি স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, ১৯০০-১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ

বা তাঁর অনুবর্তীদের মত সম্বন্ধে এই কাগজে রীতিমত সমালোচনার সুর। তার আগে মার্চ ১৮৯৯ তারিখের সম্পাদকীয়তে ('Europeans and the Natives Under their Control') শিক্ষিত বাঙালীদের নিয়ে কটু ব্যঙ্গ করা হয়েছে।[৬] নগেন্দ্রনাথের জীবনচিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি ১৮৯১-এর মাঝামাঝি ট্রিবিউনের সম্পাদনা গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৯ সালের গোড়ায় তা ত্যাগ করেন। ১৯১০ সালে আবার ট্রিবিউনে ফিরে গিয়েছিলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক অধিকাংশ লেখা নগেন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালে প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৮৯৯-তে নগেন্দ্রনাথের বিদায়ের পরেই বাঙালী-নিন্দায় ট্রিবিউন ফেটে পড়ে। পরবর্তী বাঙালী সম্পাদক, বিখ্যাত কালীনাথ রায় ঠিক কোন্ সময় থেকে সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছিলেন, আমরা বলতে পারব না। ধরে নিতে পারি, তখন বাঙালী-দূষণে ঘাটতি পড়েছিল।

ট্রিবিউনের অগ্রগতিতে নগেন্দ্রনাথের ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যায়ন করেছিল এলাহাবাদের নামী কাগজ 'লীডার' ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪০ তারিখে, তাঁর মৃত্যুর পরে। নগেন্দ্রনাথ এলাহাবাদের 'ইন্ডিয়ান পীপল্'-এর সম্পাদনা করেছেন, সে পত্রিকাটি 'লীডার' পত্রিকার সঙ্গে সম্মিলিত হলে, কিছুকাল তার সম্পাদনাও। 'লীডার' উক্ত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে অন্যান্য কথার সঙ্গে লিখেছিল : "মিঃ গুপ্ত প্রসিদ্ধ সাংবাদিক। করাচীর 'ফিনিক্স' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবেই তিনি প্রথম জনসমাজে পরিচিতি লাভ করেন । লাহোর ট্রিবিউনের সম্পাদক হিসাবেই তাঁর খ্যাতিপথে আরোহণ, যে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী সর্দার দয়াল সিং মাজিতিয়া তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। মিঃ গুপ্তের সম্পাদনাকালে ট্রিবিউন এমনই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে, একবার স্থানীয় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদপত্র 'সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট' প্রশ্ন করে—এই প্রদেশ এখন শাসন করছেন কে, স্যার ডেনিস ফিৎসপ্যাট্রিক, নাকি ট্রিবিউনের সম্পাদক?...মিঃ গুপ্তের রচনারীতি সুন্দর সাহিত্যগুণান্বিত এবং তিনি রাজনৈতিক বিষয় অপেক্ষা সাহিত্য বিষয়ে লেখাতেই অধিক পারদর্শী ছিলেন। এই সঙ্গে তিনি ছিলেন গল্পলেখক, কবি ও শিল্পী।"[৭]

শেষোক্ত প্রসঙ্গে বলা যায়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের খ্যাতি যদিও ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে, বাঙলায় তিনি কিন্তু খ্যাতিলাভ করেছেন বাঙালী সাহিত্যিক হিসাবেই। ইংরেজীনবিশ হিসাবেও তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন—রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতার ইংরেজী ভাষান্তর ক'রে। তিনি মাসিক 'প্রদীপ' ও সাপ্তাহিক 'প্রভাত' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন, ইংরেজী ও বাঙলায় নানা ধরনের প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন, প্রথম পর্যায়ে বাঙলা ছোটগল্পের বিশিষ্ট লেখক তিনি, অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ ও উপন্যাসেরও রচয়িতা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের সমঝদার, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-সুহৃদ, কেশবচন্দ্র সেন তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়।[৮]

॥ দুই ॥

সারা ভারতের বহু বিখ্যাত মানুষের নিকটবর্তী হবার সুযোগ পেলেও, নগেন্দ্র গুপ্তের বিভিন্ন লেখা থেকে মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর সর্বোচ্চ ভক্তির পাত্র। স্বামী বিবেকানন্দও উপযুক্ত মাত্রায় তাঁর শ্রদ্ধালাভ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী সংকলন ও অনুবাদ ক'রে উৎকৃষ্ট ভূমিকা-সহ তিনি প্রকাশ করেছেন—*Sayings of Paramhansa Ramakrishna* (April, 1936)। তাঁর *Reflections and Reminiscences* (১৯৪৭), *Noble Lives* (১৯৫০), *Place of Man and Other Essays* প্রভৃতি গ্রন্থে দীর্ঘ রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ আছে, বিবেকানন্দ প্রসঙ্গও। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর কিছু লেখা একত্র ক'রে বোম্বাই রামকৃষ্ণ মঠ ১৯৩৩ সালে প্রকাশ করেছিল *Ramakrishna-Vivekananda* গ্রন্থ। রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে তাঁর সকল বক্তব্য বলবার স্থান এ নয়, তবে নির্দ্বিধায় বলা যায়, রামকৃষ্ণ-উক্তির শ্রেষ্ঠ মূল্যায়নকারীদের মধ্যে তিনি পড়েন। ঈষৎ প্রসঙ্গ-বহির্ভূত হলেও কথক রামকৃষ্ণের একটি প্রত্যক্ষদৃষ্ট রূপচিত্র নগেন্দ্রনাথের লেখা থেকে অনুবাদে উপস্থিত করব, বিশেষত এইজন্য যে, নগেন্দ্রনাথের কাছে বিবেকানন্দ বহুলাংশে রামকৃষ্ণের আলোকপ্রাপ্ত চরিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে কেশবচন্দ্র সেন গঙ্গাবক্ষে স্টিমার ভ্রমণের আয়োজন করেছিলেন—সেখানে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম)-সহ নগেন্দ্র গুপ্তও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা এই প্রকার :

"রামকৃষ্ণের ভাবোন্মদনা যখন বেড়ে উঠল তখন তিনি কেশবের আরও নিকটে সরে এলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর জানু কেশবের কোলের উপর স্থাপিত হলো। আমি তাঁদের একেবারে পাশে প্রায় কেশবকে স্পর্শ ক'রে বসেছিলাম। পরমহংস স্টিমারে প্রায় আট ঘণ্টা ছিলেন। অল্প যে কিছুক্ষণ সমাধিতে ছিলেন, তা বাদ দিলে, তাঁর কথা বলার বিরাম ছিলনা। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সময়ে (১৮৮২-১৯৩৩) অপর কোনো মানুষকে তাঁর মতো ক'রে কথা বলতে শুনিনি। বাক্যবিনিময় বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু ঘটেনি। এই দীর্ঘ আট ঘণ্টা সময়ে অসাধারণ বাগ্মী ও বিশিষ্ট পণ্ডিত কেশব ডজনখানেক বাক্যও বলেছেন কিনা সন্দেহ। দীর্ঘ ব্যবধানে কখনও একটা প্রশ্ন বা কখনও বুঝিয়ে বলার জন্য অনুরোধ—এইমাত্র করেছিলেন। রামকৃষ্ণই ছিলেন একমাত্র বক্তা—তাঁর বাক্যধারা অবিরাম বয়ে গিয়েছিল, যেমন ক'রে আমাদের নীচে বয়ে যাচ্ছিল তরঙ্গভঙ্গে গঙ্গার ধারা। তখন তাঁর সেই মধুর কোমল ঐকান্তিক কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছু শুনিনি, তপঃকৃশ দেহটি ছাড়া আর কিছু দেখিনি—যিনি আমাদের সামনে অর্ধমুদিত নেত্রে, কোলের উপর দুখানি হাত রেখে বসেছিলেন। তাঁর কম্পমান ওষ্ঠ থেকে সহজতম উক্তি নির্গত হচ্ছিল—কিন্তু তার অন্তর্গত ভাবের চেয়ে ঊর্ধ্ববিহারী বা গভীরে অবগাহনকারী আর কোন্ ভাব সম্ভবপর! প্রতিটি চিন্তাই দিব্যসত্যের উন্মোচক; প্রতিটি উপমা, রূপকল্প বা কাহিনী পরমাশ্চর্যের দ্যোতক। তিনি কত কথাই না বলেছিলেন—মানুষের মুখ দেখে কিভাবে তার চরিত্র বোঝা যায় সেকথা, নানা অধ্যাত্মপথ সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা, পরম সত্তার স্পর্শলাভের কালে অনন্ত অপরিমেয় অনুভূতিলাভের কথা। যখন তিনি নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলেছেন, তখন সমাধিমগ্ন। তাঁর মুখে তখন

দিব্যানন্দের আলোকচ্ছটা।...শরীর আড়ষ্ট, স্থির, পেশী বা স্নায়ুর কম্পন নেই। কোলের উপর ন্যস্ত হাতের আঙুলগুলি একটু বাঁকা, অপূর্ব পরিবর্তন মুখমণ্ডলে, ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক, তার মধ্য দিয়ে সাদা দাঁতের ঝিলিক, যেন হাসছেন, নেত্র অর্ধমুদিত, অক্ষিতারকা ঈষৎ ব্যক্ত, আর সমস্ত মুখের উপর পবিত্রতম ঐশ্বরিক ভাবের অনির্বচনীয় দ্যুতি। নীরবে সসম্ভ্রমে আমরা তাঁর দিকে কিছু সময় তাকিয়ে রইলাম। তারপর কেশবচন্দ্রের সম্প্রদায়ের সঙ্গীতাচার্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল যন্ত্রসহযোগে গান শুরু করলেন। কিছু পরে পরমহংস ধীরে চোখ মেললেন।"

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে মহাকালের বিচারের কথা নগেন্দ্রনাথের রচনায় :

"যেসব মানুষ পরমহংস রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এমন কেউই নেই যিনি ধর্মের ইতিহাসে বা সমুচ্চ আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে তাঁর সমস্তরের। যেসব ধনী ব্যক্তি তাঁর সাক্ষাতে গিয়েছেন কিংবা যাঁদের বাড়িতে তিনি গিয়েছেন, তাঁদের কাউকেই প্রায় কেউ মনে রাখবে না—যদি রাখে তার একমাত্র কারণ, ঘটনাচক্রে রামকৃষ্ণ-কথামৃতে তাঁদের নাম উল্লিখিত হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই ইতিমধ্যে বিস্মৃত, তাঁদের খেতাব আর অর্থসম্পদ ধুলোয় বিলীন। কেউ-কেউ তাঁকে খ্যাপা মানুষ বলে দেখেছেন, অন্য অনেকের কাছে তিনি নিছক কৌতূহলের বস্তু। এইসব লোক বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন, অপরদিকে মহাকাল মানবসংসারের মহান আচার্যদের সারিতে রামকৃষ্ণের স্থান সুনির্দিষ্টভাবে স্থির ক'রে দিয়েছে। যে কতিপয় তরুণকে তিনি নিজের কাছে আকর্ষণ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই বিরাট আধ্যাত্মিক মহিমার অধিকারী হয়েছেন। আর তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও বন্দিত শিষ্য বিবেকানন্দ—দেশপ্রেমিক, আচার্য, স্বদেশীয় জনগণ ও প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এবং মহান বার্তাবহরূপে অবিনশ্বর খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন।"[১]

॥ তিন ॥

১৮৯৩ সাল থেকে ট্রিবিউনের বিবেকানন্দ-সংক্রান্ত সংবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পত্রিকাটিতে অন্য নানা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সারাংশ প্রকাশ করা হয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩-এর কাগজে শিকাগো ধর্মমহাসভার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ বেরোয়, ভুল বানানে স্বামীজীর নাম-সুদ্ধ (Vurkenanda), তা সম্ভবত কলকাতার ব্রাহ্ম পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলিত, কারণ হুবহু একই সংবাদ বেরিয়েছিল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের 'মিনিস্টার' কাগজে, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩। ২২ নভেম্বর তা প্রকাশ করে বিবেকানন্দের পূর্বপরিচয়, মিরার থেকে সংগ্রহ ক'রে। ৬ ডিসেম্বর বেরোয় 'শিকাগো ট্রিবিউনের' বিবেকানন্দ-প্রশস্তি। ১৮৯৪-এর ৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ইংল্যান্ডের বিখ্যাত 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকার ধর্মমহাসভা-সম্বন্ধীয় এই মন্তব্যের উল্লেখ সে করেছিল—"ধর্মমহাসভা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নবযুগসৃষ্টিকারী ঘটনা"। একই সংখ্যায় বিবেকানন্দকে আমেরিকার কাগজপত্র যে

'ব্রাহ্মণ' বলেছে এবং সেটি যে ভুল, আসলে তিনি কায়স্থ শূদ্র, এই সংবাদটি জানায়। ২১ মার্চ 'পায়োনীয়ার' থেকে মারউইন মেরী স্নেলের পত্র উদ্ধৃত করে, যাতে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অত্যুচ্চ শ্রদ্ধা প্রকাশিত। ১৮ এপ্রিল, প্রাপ্ত সংবাদসূত্রে সে জানায়, বিবেকানন্দ আমেরিকায় বহু মানুষকে নিজ মতের দ্বারা প্রভাবিত করেছেন। ২১ জুলাই পত্রিকাটি ভারতে দুর্ভিক্ষের সুযোগে খ্রীস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট মিশনারিদের পৃষ্ঠপোষক আমেরিকানদের মোহভঙ্গ ঘটছে, একথা তৃপ্তির সঙ্গে লেখে। ৮ সেপ্টেম্বর, কলকাতায় বিবেকানন্দকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন সভা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ঐ সভার প্রস্তাবাবলী, ১০ নভেম্বর, মাদ্রাজে ধন্যবাদ সভার উত্তরে স্বামীজীর মহান উত্তর-পত্রের সংবাদ পাই। ১৮৯৫ সালে নানা ধরনের টুকরো সংবাদের মধ্যে মিশনারি ট্র্যাক্ট-এ বিবেকানন্দ-নিন্দা (১৫ মে), খেতড়ির রাজাকে স্বামীজীর উদ্দীপক পত্র (৪ সেপ্টেম্বর), ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকায় বিবেকানন্দ-সংবাদ (১৯ অক্টোবর), লন্ডনে বিবেকানন্দের সাফল্য (৬ নভেম্বর, ২০ নভেম্বর) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আর উল্লেখ করা যায়, ৯ মার্চ সংখ্যায় রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সংবাদ। রামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্র সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত নগেন্দ্র গুপ্তের এই লেখাটিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্পর্শ অনুভব করা যায়, যেখানে তিনি বলেছিলেন : "এই ঋষিতুল্য হিন্দু-ভক্ত শত শত শিক্ষিত সংশয়বাদীকে বিশ্বাসী ক'রে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। কেশব তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, বিবেকানন্দ তাঁর অন্যতম শিষ্য।"

১৮৯৬ সালের ২৫ জুলাই পুনশ্চ রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ এসে গেল। ম্যাক্সমূলার সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদিন্-এ বিবেকানন্দ যে প্রবন্ধ লেখেন তার সারাংশ উপস্থিত করা হয়েছিল, বিশেষত সেই অংশটি যেখানে ম্যাক্সমূলার রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-নিবেদন করেছেন :

> "শুনিয়াছ কি, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 'নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং যদি উপযুক্ত উপাদান পান, তবে আনন্দের সহিত তাঁহার জীবনী ও উপদেশের আরও বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ-সংবলিত একখানি গ্রন্থ লিখিতে প্রস্তুত আছেন। কী অসাধারণ ব্যক্তি এই অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার! আমি দিনকয়েক পূর্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কারণ যে-কোনও ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসেন—তিনি নারীই হউন, পুরুষই হউন, তিনি যে-কোনও মত, সম্প্রদায় বা জাতিভুক্ত হউন—তাঁহাকে দর্শন করিতে যাওয়া আমি তীর্থযাত্রাতুল্য জ্ঞান করি।...স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে হঠাৎ গুরুতর পরিবর্তন কী শক্তিতে সাধিত হইল, অধ্যাপক প্রথমে তাহাই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন। তারপর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন ও ঐগুলির চর্চা আরম্ভ করেন। আমি বলিলাম, 'অধ্যাপক মহাশয়, আজকাল সহস্র সহস্র লোকে রামকৃষ্ণের পূজা করিতেছে।' অধ্যাপক বলিলেন, 'এরূপ ব্যক্তিকে লোকে পূজা করিবে না তো কাহাকে করিবে?' অধ্যাপক যেন সহৃদয়তার প্রতিমূর্তি। তিনি মিঃ স্টার্ডি ও আমাকে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং আমাদিগকে অক্সফোর্ডের কতকগুলি কলেজ ও বোডলিয়ান লাইব্রেরি দেখাইলেন। রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিলেন। আমাদের জন্য এতকিছু কেন করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'প্রত্যেক দিন তো আর রামকৃষ্ণ পরমহংসের এক শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হয় না'?" ['বাণী ও রচনা'র দশম খণ্ডভুক্ত অনুবাদের অনুসরণে]

স্বামীজীর সুরচিত রচনার এই বিশেষ অংশটি ট্রিবিউনে উপস্থিত করার মধ্যে সাংবাদিকের উপযুক্ত নির্বাচনক্ষমতার পরিচয় আছে এবং আভ্যন্তর প্রমাণে এই অংশ যে নগেন্দ্র গুপ্তের নির্বাচন, তাও ধরে নেওয়া যায়। প্রথমত, এর মধ্যে প্রয়োজনীয় উৎসাহজনক এই সংবাদ আছে, ম্যাক্সমূলার কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের উপর একটি প্রবন্ধ লেখেন নি, পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লিখতেও ব্রতী। এই সংবাদ ভারতীয় পাঠকদের মনে সবিশেষ ঔৎসুক্য-সঞ্চারক। দ্বিতীয়ত, কেশবচন্দ্র সেনের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব ব্যাপারটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। কেশবপন্থীরা ঐ প্রভাবকে লঘু ক'রে দেখাতে চেষ্টা করেছেন, সেখানে নগেন্দ্র গুপ্তের ধারণা ভিন্ন প্রকার। কেশবের উপর রামকৃষ্ণের বিপুল প্রভাবের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। উক্ত প্রভাবকে ম্যাক্সমূলার বিশেষভাবে স্বীকার করেন, বিবেকানন্দের উদ্ধৃত রচনাংশের মধ্যে তা দেখা গেল। তৃতীয়ত, নগেন্দ্র গুপ্ত রামকৃষ্ণকে সাধারণ একজন ধর্মপ্রচারক মনে করতেন না—সে আবির্ভাব দিব্য। তারই ঘোষণা ছিল বিবেকানন্দের কথায় এবং কার্যত ম্যাক্সমূলারের উক্তিতে। অংশটি নগেন্দ্র গুপ্তের মনঃপূত।

১৮৯৬ সালে ট্রিবিউন আরও বিবেকানন্দ-সংবাদ ছেপেছে, যথা লন্ডনে স্বামীজীর সাফল্য (১ অগস্ট, ১২ অগস্ট), স্বামীজীর দুই গুরুভাই সারদানন্দ ও অভেদানন্দের পাশ্চাত্যগমন ও কার্যাবলী (৪ মার্চ, ১৪ নভেম্বর), স্বামীজীর রাজযোগ প্রকাশ (২৬ সেপ্টেম্বর), মহীশূরের মহারাজকে জনকল্যাণ-মূলক কাজে স্বামীজীর প্রেরণা (৯ সেপ্টেম্বর), ইত্যাদি। এর মধ্যে ট্রিবিউনের দুটি উদ্ধৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। পাশ্চাত্যে প্রচাররত বিবেকানন্দের দ্বারা সৃষ্ট সর্বভারতীয় উন্মাদনার উৎকৃষ্ট প্রমাণ দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশীয় সংবাদপত্র 'হিন্দু'-র ২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৫ তারিখের উদ্দীপ্ত সম্পাদকীয়টি— ট্রিবিউন ১ জানুয়ারি ১৮৯৬ তারিখে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছিল—সেখানে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ট্রিবিউন-সম্পাদকের ব্যক্তিগত ধারণার প্রতিধ্বনি ছিল সন্দেহ নেই :

> "ভারতবাসীর জীবনের আত্মলোপ ও অগৌরবের দীর্ঘরাত্রি স্পষ্টত অবসানপ্রায়—দিগন্তে গৌরবদিনের শুভ্র ঊষাকিরণের উদ্ভাস। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বদা যা হয়ে থাকে এখানেও তা হয়েছে। কাল পূর্ণ হলেই আবির্ভূত হন নবযুগের স্রষ্টা—জাতীয় জীবনক্ষেত্রে আশা ও আদর্শ স্থাপনা করতে।...তাঁর [বিবেকানন্দের] পূর্বে এমন কোনো প্রাচ্যবাসীর কথা আমাদের জানা নেই যিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্যসমাজে অমন শক্তিশালী, সুগভীর এবং স্থায়ী প্রভাববিস্তারের কারণ হয়েছেন। তা ঘটেছে কেবল স্বামীজীর মহান ও উদ্দীপক বাগ্মিতা বা আমাদের পবিত্র শাস্ত্রাদিতে তাঁর প্রায়-অতুলনীয় অধিকারের জন্যই নয়, সেইসঙ্গে তাঁর চরিত্রের সুমহান সরলতা ও অপরিসীম মাধুর্যের জন্যও বটে। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের যেসব পাঠকের ব্যক্তিগত পরিচয়ের অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাঁরা নিঃসন্দেহে আমাদের এই অভিমতের সমর্থন করবেন যে, তাঁর গৃহীত ধর্মক্ষেত্রে তাঁর অপেক্ষা মহত্তর, যোগ্যতর এবং সত্যতর প্রতিনিধি আর কেউ নেই।"

স্বামীজীর সঙ্গে ট্রিবিউন-সম্পাদক নগেন্দ্র গুপ্তের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল।

ভারতীয় পুনর্জাগরণের সম্ভাবনায় উচ্চকিত ও উল্লসিত ট্রিবিউন ২৫ জুলাই ১৮৯৬,

'ইন্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার রচনাংশ উপস্থিত করেছিল : "এমন শত শত শিক্ষিত মানুষ আমাদের মধ্যে আছেন যাঁরা রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম পর্যন্ত শুনেছেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু তিনি অক্সফোর্ডের জার্মান অধ্যাপকের (ম্যাক্সমূলারের) সজাগ ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র। কেবল আজকের দিনেই এ-জিনিস সম্ভব, পঞ্চাশ বছর আগে তা অসম্ভব ছিল।"

১৮৯৭ সালের নভেম্বর মাসে স্বামীজী লাহোরে পৌঁছোন এবং নগেন্দ্র গুপ্তের অনুরোধে তাঁর বাড়িতে আতিথ্য নেন। পঞ্জাবের নানা স্থানে স্বামীজী বক্তৃতাদি করেন। এই সময়ে এবং পূর্বের মাসগুলিতে ট্রিবিউনের পৃষ্ঠা বিবেকানন্দ-সংবাদে পূর্ণ। যথা, লন্ডনে বিবেকানন্দের বিদায়-সংবর্ধনা (১৬ জানুয়ারি); স্বামীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তন ও দক্ষিণভারতে কল্পনাতীত সংবর্ধনা (৩০ জানুয়ারি); মাদ্রাজ স্ট্যান্ডার্ড ও হিন্দু-র সংবাদ-সংকলন (৩, ১০, ১৩ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি); বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদন (১৭ ফেব্রুয়ারি); স্বামীজীর বাগ্মিতা বিষয়ে হিন্দু-র মন্তব্য ('স্মরণকালের মধ্যে মাদ্রাজে বিবেকানন্দই সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী' (২০ ফেব্রুয়ারি); কলকাতায় প্রত্যাবর্তন (২৭ ফেব্রুয়ারি); আলমোড়ায় সংবর্ধনা (২২ মে) এবং আরও নানা টুকরো সংবাদ। ১৭ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজের কাগজে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে স্বামীজী একদিকে পাশ্চাত্যে তাঁর প্রচারকার্যের কথা বলেছিলেন (ইংল্যাণ্ডে বেদান্তপ্রচারের ব্যাপারে ভবিষ্যতে অধিক সাফল্য-সম্ভাবনা; আমেরিকায় ব্যাপক সমাদরের সঙ্গে স্বার্থাহত মিশনারিদের কুৎসা-বন্যা; হারবার্ট স্পেনসার থেকে ম্যাক্সমূলার পর্যন্ত পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বেদান্তসত্যের প্রবেশ ইত্যাদি)—তেমনি খুলে ধরেছিলেন সমকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক অধোগতির রূপ (কূপমণ্ডূকতার জন্যই ভারতের পতন, ভারতে এখন 'ভাতের হাঁড়ির' ধর্ম ইত্যাদি)। উল্লেখযোগ্য, খেতড়ির মহারাজের স্বীকারোক্তির সূত্রে ৬ নভেম্বর হিন্দু-র বোম্বাই-সংবাদদাতার মন্তব্যের উদ্ধৃতি। খেতড়ির রাজা বলেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দই তাঁকে জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যায় আকৃষ্ট করেছেন। তাঁর এই স্বীকারোক্তির সূত্রে মন্তব্য করা হয়েছিল :

> "এতেই বোঝা যাচ্ছে, কী অসাধারণ মানুষ এই স্বামী বিবেকানন্দ! কোনো রাজপুত রাজার মধ্যে পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করা কম কথা নয়, বিশেষত যখন একথা জানাই আছে যে বিবেকানন্দ ঐ দুই বিদ্যার কোনটিতেই বিশেষজ্ঞ নন। তবে তিনি অবশ্যই বিষয়-দুটি ভালভাবে জানেন। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য তো ধর্ম ও দর্শন। তাই এই ব্যাপারটা দেখিয়ে দিচ্ছে, অপরের মধ্যে নিহিত প্রবণতা লক্ষ্য ক'রে, সেইসব শক্তির বিকাশে তাদের প্রণোদিত করার অসাধারণ গুণ বিবেকানন্দের আছে। ইংরেজ ও আমেরিকানদের উপর তিনি যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছেন, তার কিছু কারণ এখানে পেয়ে যাই।"

এইকালে কোনো কোনো মহলে ফ্রেনোলজির ('শিরোমিতি-বিদ্যা') চর্চা ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-জীবনীতে (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ষষ্ঠ খণ্ড) দেখা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বিদ্যার 'রীতিমত চর্চা' করতেন, এ-বিষয়ে বাঙলায়

প্রবন্ধাদিও লিখেছেন ১৮৮৫ সাল ও পরবর্তী কালে। তাঁর আগেই ১৮৪৫ সালে কলকাতায় ফ্রেনোলজিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়ে গেছে এবং পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি থেকে সংকলন ক'রে রাধাবল্লভ দাস ১৮৫০ সালে বাঙলায় 'মনতত্ত্ব সারসংগ্রহ' প্রকাশ করেছেন। স্বামীজী প্রসঙ্গে এইসব তথ্যের উল্লেখের কারণ, তিনিও ফ্রেনোলজি পরীক্ষার উপাদান হয়েছেন— বিদেশে এবং এদেশে। ইন্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় ৫ অক্টোবর ১৮৯৫ সংখ্যায় নিউইয়র্কের 'ফ্রেনোলজিক্যাল জার্নাল'-এ প্রকাশিত স্বামীজী সম্বন্ধীয় পর্যবেক্ষণাত্মক প্রবন্ধটি উৎকলিত হয় (অন্য কয়েকটি ভারতীয় পত্রিকাতেও তা করা হয়), তার মধ্যে জীবনীকারদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু সংবাদ ছিল—স্বামীজীর উচ্চতা ও ওজন কী, মাথার মাপ কী, মাথার অন্য অংশগুলির অবস্থানগত সৌষম্য কী প্রকার, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারতবর্ষেও স্বামীজীকে দৃষ্টি-পরীক্ষার মধ্যে টেনে আনা হয়েছিল, বাংলায় নয়, পঞ্জাবে, এবং ট্রিবিউন কাগজে সেই পরীক্ষাফল প্রকাশিত হয়—১৮৯৭-এর ৬ নভেম্বর। ট্রিবিউনের সম্পাদক যেহেতু কথাশিল্পী এবং সেই ভুবনে রূপপতিদের বিশেষ সমাদর, তাই ঐ তারিখের আগেই ১৭ ফেব্রুয়ারি স্বামীজীর দেহসৌন্দর্যের এক কথাচিত্র উৎকলিত হয়েছিল :

"স্বামী বিবেকানন্দ পুরুষ-সৌন্দর্যের আদর্শবিগ্রহ। তাঁর চেহারার রূপরেখা এই : আকার—শক্তিশালী ও আজ্ঞাপ্রদ; বক্ষ—সিংহতুল্য প্রশস্ত ও গভীর; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—বিরাট কিন্তু সুঠাম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ; দেহভঙ্গি—স্বচ্ছন্দ সুন্দর; সম্মুখ-ললাট—উচ্চ ও বিস্তৃত; চক্ষু—বিশাল, কোমল এবং অন্তর্লীন, যেন স্থির জলে ভাসমান পদ্ম; নাসিকা—বৃহৎ কিন্তু বেমানান নয় অন্য অঙ্গাদির তুলনায়; অধরোষ্ঠ—সুন্দরভাবে খোদাই; চোয়াল—ভারী; সমস্ত মুখটি—কোমল কিন্তু মর্যাদা-মহান। কণ্ঠস্বর মধুর, গরীয়ান এবং ঝঙ্কারিত। সব জড়িয়ে মহামহিম মূর্তি—মানবজাতির জন্মসিদ্ধ নেতা।"

অন্তর্বিজ্ঞানে আমাদের সবিশেষ আসক্তির কারণে বহির্বিজ্ঞান মার খেয়েছে। সে-কারণে, স্বামীজীর অসাধারণ সুন্দর চেহারার বর্ণনার জন্য আমাদের প্রধানত বিদেশী কাগজের উপরই নির্ভর করতে হয়। ব্যতিক্রমও আছে, যেমন ট্রিবিউনে উল্লিখিত বর্ণনাটি। এছাড়া জনৈক ভারতীয় শরীরলক্ষণতাত্ত্বিকের একটি বর্ণনাও ৬ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল। তার অংশ :

"স্বামীজীর মুখমণ্ডল তাঁর অনন্যসাধারণ শক্তির চমকপ্রদ নির্দেশক। তাঁর অবয়বের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র বোঝা যায়, তিনি পুরুষোত্তম। তাঁর সামগ্রিক দেহভঙ্গি দেখে প্রথমেই ধারণা জন্মে—মহান প্রশান্তির মানুষ তিনি, যা সৌন্দর্যের কিংবা অনির্বচনীয় বিরাটের ধ্যানে নিমগ্ন চিত্তের অবর্ণনীয় নির্লিপ্ত সন্তোষের অনুরূপ।...তাঁর কোমল 'কমলনয়ন' অবিলম্বে 'সর্বাত্মক পর্যবেক্ষণের' এবং অন্তদর্শনের ক্ষমতা দেখিয়ে দেয়। দ্বিতীয় শক্তি প্রথমটির চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে বর্তমান। অক্ষিপুটের স্ফীত অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বাগ্মিতাশক্তির নিশ্চিত নির্দেশক।...উচ্চ নাসিকা অগ্রভাগে প্রশস্ত, মস্ত ভারী চৌকশ চোয়াল—অসাধারণ দৃঢ়তা, প্রতিজ্ঞাশক্তি এবং পৌরুষের সূচক।...তাঁর মাথার গড়নে সর্বোচ্চ ধরনের মানব-বিকাশ লক্ষিতব্য। ললাটের অর্ধগোলাকৃতি সুন্দর আকার থেকে

তাঁর তীক্ষ্ণ রসবোধ বোঝা যায়। দৃঢ় খোদাই সুন্দর ঠোঁট দেখিয়ে দেয়, লেগে-থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার চেহারাকে।...পেশীর স্বতঃস্পষ্ট শক্তির সঙ্গে কিন্তু চলাফেরার অলস মন্থরতা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সব জড়িয়ে এই হলো মানবজাতির স্বতঃসিদ্ধ নায়কের আকার, কিন্তু তা [ভারতীয়] আর্য ধরনের। অর্থাৎ, আমি বলতে চাই—আর্যজাতির পাশ্চাত্য অংশে শ্রেষ্ঠ মানবের বৈশিষ্ট্য-রূপে যে-প্রাণশক্তি ও তেজঃশক্তির খেলা, সংঘাত-সংগ্রামের জন্য অস্থির আকাঙ্ক্ষা, বাধার বিরুদ্ধে প্রতিঘাত, সদাসতর্ক যুযুধান প্রবৃত্তি ইত্যাদি দেখা যায়—তা তাঁর মধ্যে নেই।...স্বামীজীর সকল গুণের শ্রেষ্ঠ গুণ হলো—ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে প্রশান্ত থাকার ক্ষমতা।..."

ফ্রেনোলজি বিদ্যার যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করার অভিপ্রায় আমার নেই, স্বামীজীর চেহারা থেকে তাঁর চরিত্রগুণ নির্ণয় করা হয়েছে, নাকি তাঁর চরিত্রগুণ ভালভাবে জেনে নিয়ে তা তাঁর মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের উপর আরোপ করা হয়েছে, সংশয়ীর মনে সে প্রশ্ন উঠবে। আমরা কেবল আনন্দিত এই কারণে যে, স্বামীজীর দেহরূপের একটি বিশ্লেষণমূলক বিবরণ এখানে রয়েছে।

স্বামীজী সম্বন্ধে ট্রিবিউনে প্রথম সম্পাদকীয় লেখা হয় ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭—তাঁর দক্ষিণভারতীয় সংবর্ধনার বিবরণ প্রকাশিত হয়ে যাবার পরে। ভারতের দক্ষিণ অংশের আবেগতরঙ্গ দূর পশ্চিম ভারতকে কিভাবে নাড়া দিয়েছিল, তার নিদর্শন এই সম্পাদকীয়টি। ট্রিবিউনের রীতি অনুযায়ী সম্পাদকীয়টি নাতিদীর্ঘ, মন্তব্য সংযত, তারই মধ্যে ট্রিবিউন-সম্পাদক স্বামীজীর সমূহ গৌরবগান করেছেন। মাদ্রাজের অভূতপূর্ব সংবর্ধনার উল্লেখের পরে, তিনি মন্তব্য করলেন : "এ সকলই দেশবাসীর কাছ থেকে বিবেকানন্দের প্রাপ্য, এমন কি তার বেশিও প্রাপ্য, কারণ তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তারাজি সম্বন্ধে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সংস্কৃতিজগতের বহুসংখ্যক বিশিষ্ট মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগাতে সমর্থ হয়েছেন।" সম্পাদক স্পষ্টভাবে বললেন, স্বামীজীর আগে কয়েকজন ভারতীয় পাশ্চাত্যে গেছেন (ইচ্ছে ক'রেই সম্পাদক তাঁদের নামোল্লেখ করেন নি) কিন্তু তাঁরা ধর্মব্যাপারে পাশ্চাত্যভাবের আনুগত্য ক'রে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। অপরপক্ষে, বক্তব্য প্রকাশের ব্যাপারে বিবেকানন্দ বিদেশী ভাষার সাহায্যে খাঁটি আর্যধর্মের তত্ত্বপ্রচার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, যে-বেদান্তের উপর হিন্দুধর্মের ভিত্তি, তা উদ্ভট কল্পনার ঊর্ধ্ববিহার নয়, যেকথা কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলে থাকেন, কিংবা মানসিক উদ্‌ভাবন-ক্ষমতার চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্তও নয়, ফলাও ক'রে যা অনেকে বলতে ভালবাসেন; পরন্তু তা হলো একমাত্র দর্শন যা অধ্যাত্মসত্যের সত্যকার সন্ধানী অনতিসংখ্যক আলোকপ্রাপ্ত মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে সমর্থ। ইতিহাসে বিবেকানন্দের স্থাননির্ণয়ের প্রযত্নে সম্পাদক ভিক্টর হুগো-র এই উক্তি উদ্ধৃত করলেন—"যে ব্যক্তি স্বীয় প্রচেষ্টার দ্বারা তাঁর মাতৃভূমিকে বিদেশীয়দের দৃষ্টিতে অধিকতর সম্মানের পাত্রী ক'রে তুলতে পারেন, তিনি দেশের খাঁটি সন্তান এবং দেশবাসীর পক্ষে প্রদেয় সম্ভবপর সকলপ্রকার সম্মান লাভের যোগ্য পুরুষ।" এর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ট্রিবিউন-সম্পাদক বললেন, "অন্য কোনও কারণে যদি নাও হয়, কেবল উক্ত কারণেই তরুণ বাঙালী সন্ন্যাসীর প্রত্যাবর্তন স্বদেশের সর্বত্র যে সর্বজনীন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে, তা ঘটেছে যোগ্য মানুষের জন্যই।"

এর পরেই রাওয়ালপিণ্ডি ও শিয়ালকোটে বক্তৃতাদি শেষ ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবেশ করলেন লাহোরে—নভেম্বর মাসের গোড়ায়। ৬ নভেম্বরের সংবাদে জানা যায়, স্বামীজী শিয়ালকোটে কেবল ইংরেজীতে নয়, হিন্দীতেও ভাষণ দিয়েছিলেন। "শিয়ালকোটে স্বামীজীর অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ হলো—কেবল পুরুষরা নন, মহিলারাও দলে দলে এই পরমশ্রদ্ধেয়, বহুবিস্তৃত খ্যাতিসম্পন্ন স্বামীজীর দর্শনে এসেছিলেন।"

লাহোরে স্বামীজীর অভ্যর্থনার বিপুলতায় বিস্মিত ট্রিবিউন সম্পাদক ১০ নভেম্বর লিখলেন : "স্বামী বিবেকানন্দ লাহোরে 'সাদর অভ্যর্থনা' লাভ করেছেন—একথা বললে শহরের উন্মাদনার অতি ক্ষীণ পরিচয় দেওয়া হয়। প্রথম বক্তৃতায় চার হাজারের বেশি লোক উপস্থিত ছিল—দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত না থাকায় অনেককে ফিরে যেতে হয়েছিল।" আমরা জেনেছি, রাজা ধ্যান সিংয়ের হাভেলিতে আয়োজিত সেই বক্তৃতায় দূর-দূর থেকে মানুষ এসেছিল, নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে থেকেই ঐতিহাসিক ভবনটি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অপেক্ষমাণ জনতাকে তুষ্ট করতে বাইরের অঙ্গনে বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে হয়, তার জন্য আধ ঘণ্টার মতো সময়ে বিশৃঙ্খলা চলে ইত্যাদি। বক্তৃতার বিষয় ছিল—'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ।'

স্বামীজীর তৃতীয় এবং সর্বশেষ বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে ট্রিবিউন ১৭ নভেম্বরে লেখে :

> "[বেদান্ত বিষয়ে] এই বক্তৃতায় স্বামীজী যেন নিজের বিরাট ক্ষমতাকেও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর ভারতীয় বক্তৃতার সবকটি পড়েছেন এবং যাঁরা তাঁর কোনো কোনো বক্তৃতা শুনেছেন, তাঁদের মত হলো—গত জানুয়ারি মাসে কলম্বোয় অবতরণের পরে তিনি যত বক্তৃতা করেছেন, তাদের মধ্যে এই বক্তৃতাতেই অদ্বৈতদর্শনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ঘটেছে।"

ছাত্ররা বক্তৃতার ব্যবস্থাপনা এমন সুচারুভাবে করেছিল যে, "দুই ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ সকলে স্বচ্ছন্দে উপবেশন ক'রে পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে।"

॥ চার ॥

১০ নভেম্বর ১৮৯৭ ট্রিবিউন-সম্পাদক সম্পাদকীয় মন্তব্যে যা বলেছিলেন, তার শেষাংশ উপস্থিত করিনি, এবার তা করা যাক :

> "যাঁরা তাঁকে দেখেছেন এবং জেনেছেন, তাঁরা এটুকু বুঝে নিয়েছেন—বাগ্মী হিসাবে তাঁর বিরাট ক্ষমতা তাঁর সামগ্রিক ক্ষমতারাজির মধ্যে সবচেয়ে গৌণ বস্তু।...কোন্ শিক্ষা এবং আত্মশাসন স্বামী বিবেকানন্দকে এহেন অনন্যসাধারণ মানুষ করে তুলেছে, সে কাহিনী এখনও লেখা হয়নি। দেখা যাবে, মূলত তা ভারতীয় কাহিনী—যাতে আছে বহু বৎসরের স্থৈর্যযুক্ত ধ্যানসাধনা, ঐকান্তিক আত্মজিজ্ঞাসা, স্বেচ্ছাগৃহীত দারিদ্র্য ও কৃচ্ছ্রসাধনা। এ-জিনিস ভারতীয় ফকিরদেরই সাধ্য। বহু বৎসরের কঠিন আত্মশাসন এবং নিজ মহান

গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করার মধ্যেই আছে তাঁর ব্যক্তিত্বের অপূর্ব চৌম্বকশক্তির রহস্য। যে-আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক শক্তি ইউরোপ ও আমেরিকার বিস্ময় ও শ্রদ্ধা সবলে আকর্ষণ করেছে—তার সৃষ্টিরহস্য এখানেই মিলবে।"

লেখাটি থেকে বোঝা যায়, 'যাঁরা তাঁকে দেখেছেন এবং জেনেছেন', তাঁদের একজনেরই এই লেখা। সেই একজন কিন্তু কখনই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভিত্তি ছাড়া বিবেকানন্দ-সৌধের কথা ভাবতে পারেন না। লেখাটিতে অধিকন্তু কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্পর্শ আছে। পরবর্তী কালে আমরা জেনেছি যে, লাহোরে নগেন্দ্র গুপ্তের বাড়িতে স্বামীজী অতিথি হয়েছিলেন। সেখানে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। বিভিন্ন সময়ে স্মৃতিকথায় নগেন্দ্র গুপ্ত তা লিখেছেন । সংক্ষেপে তা উপস্থিত করব।

নগেন্দ্র গুপ্ত দাবি করেছেন, স্মৃতিকথনকালে তিনি বিবেকানন্দের কাছ থেকে সরাসরি যা জেনেছেন, তার বাইরে যাননি : "তাঁর জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনার প্রয়োজন নেই [নগেন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন], তা তাঁর শিষ্যদের দ্বারা প্রস্তুত চারখণ্ড জীবনীতে ভালভাবে বলা হয়েছে। আমি তাঁকে সরাসরি যেভাবে দেখেছি সেইসব ব্যক্তিগত কথাই যতদূর সম্ভব স্মরণ ক'রে বলব। আমি বলব, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু বৃহৎ তাৎপর্যবাহী কিছু ঘটনার কথা এবং তাঁর চরিত্রের যেসব লক্ষণাবলী চতুষ্পার্শ্বের মানুষদের মধ্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে সূচিত ক'রে অসাধারণ আকারে তাঁকে প্রতিভাত করেছিল—সেই সকলের কথা। তাঁর সঙ্গে একই কলেজে পড়তাম। সেই অখ্যাত, সাধারণ এক ছোকরার কথা আমি জানি; আবার আমেরিকা থেকে খ্যাতি ও গৌরবের পূর্ণ ঝলক নিয়ে ফিরে-আসা স্বামী বিবেকানন্দকেও জেনেছি। আমার [লাহোরের] বাড়িতে কয়েকদিন তিনি কাটিয়েছিলেন। সেই সময়ে, মধ্যে যে কয়েক বৎসর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি সেইকালের ঘটনাবলীর কথা রাখ-ঢাক না রেখে আমাকে বলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা তাঁর দেহত্যাগের পূর্বে কলকাতার নিকটবর্তী বেলুড় মঠে। তাঁর বিষয়ে আমি যা লিখছি, তা অপরের কাছ থেকে শুনে নয়—তাঁর নিজের মুখে শুনে।"[১০]

মডার্ন রিভিউ পত্রিকার মার্চ ১৯৩০ সংখ্যায় একই ধরনের কথা তিনি বলেছেন। লাহোর স্টেশনে স্বামীজী পৌঁছলে বিরাট সংবর্ধনার ফাঁকে নগেন্দ্র গুপ্ত স্বামীজীকে বলেন, আপনার হয়তো বিশ্রামের দরকার, সেক্ষেত্রে আমার বাড়িতে চলুন। নগেন্দ্র গুপ্তের বাড়িতে স্বামীজীর শিষ্য শুদ্ধানন্দ তখন ছিলেন। অপর এক শিষ্য স্বামী সদানন্দকে নিয়ে স্বামীজী সেই রাত্রেই গুপ্তের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন এবং লাহোরে অবস্থানের পুরো সময়ে স্বামীজী গুপ্তের বাড়িতেই ছিলেন।

"দিনের পর দিন, যখনই আমি কাজের মধ্যে ফাঁক পেতাম তখন এবং গভীর রাত্রেও, আমরা কথা বলেছি। অবাক হয়ে ভেবেছি, কলেজে আমার জানা সেই মোটামুটি চুপচাপ-থাকা এবং কোনো মতেই প্রদীপ্ত ছাত্র নয় এমন একজন, কিভাবে এহেন এক দারুণ বিচ্ছুরিতশক্তি ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়ালেন, পরমাশ্চর্য যাঁর কথাবার্তার ক্ষমতা এবং সকল মানুষকে তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ ক'রে কাছে এনে ফেলার মতো চৌম্বকশক্তি!! যে-কোনো সমাবেশেই নিজের ভূমিরক্ষার সামর্থ্য তাঁর ছিল। অত্যুজ্জ্বল অগ্নির মতো জ্বলন্ত তাঁর উদ্দীপনা।"

নগেন্দ্র গুপ্ত একই লেখায় আরও বলেছেন : "তাঁর মেজাজের অন্যদিকও ফুটে উঠত যখন তিনি উচ্চাঙ্গের রসিকতা এবং ঠাট্টা-তামাশা ক'রে প্রাণখুলে হাসতেন। তিনি চমৎকার গায়ক এবং ওস্তাদ বাদক। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে আসার পরে যেসব অভিজ্ঞতা ঘটেছিল সে সকলের কথা একেবারে খোলাখুলি আমাকে তিনি বলেছিলেন।"[১১]

আরও অগ্রসর হবার আগে, নগেন্দ্র গুপ্তের একটি মন্তব্য নিয়ে অল্প নাড়াচাড়া করা যায়। কলেজ জীবনের বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে দুটি কথা বলেছেন, উনি সাধারণ ছাত্র, দীপ্তপ্রতিভা নন এবং মোটামুটি নীরব থাকতেন। পরবর্তী কালে বিবেকানন্দের কল্পনাতীত ঔজ্জ্বল্যের অপরূপতা ফোটাতে প্রথম বয়সের অনুজ্জ্বলতার কথা বলার মূলে রচনাগত কৌশল থাকতে পারে—সাহিত্যিকরা এই কৌশল নিয়েই থাকেন। এতে অভাবিত পরিবর্তনের চেহারাটা ভালভাবে আঁকা যায়। নগেন্দ্র গুপ্ত হয়তো সেই পদ্ধতি নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রথম বয়সের নরেন্দ্র দত্ত সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য তথ্যসম্মত নয়। এখানে দুটি প্রশ্ন—নগেন্দ্র গুপ্ত কোন্ সময়ে কলেজে কিভাবে নরেন্দ্র দত্তকে দেখেছেন? নিকট থেকে ঘনিষ্ঠভাবে যে দেখেন নি তা স্পষ্ট, কারণ ঐ সময়ের কথা তিনি আদৌ বলেন নি। উভয়ে এক শ্রেণীতে পড়েন নি বলেই মনে হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বোক্ত নগেন্দ্র-জীবনীতে বলেছেন, "১৮৭৮ সনের গোড়ায় তিনি [নগেন্দ্র গুপ্ত] কলিকাতায় আসিয়া জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ্ ইনস্টিটিউশনে প্রবিষ্ট হন এবং ঐ বৎসর এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পারিবারিক আবহাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষালাভে অন্তরায় হওয়ায় নগেন্দ্রনাথের ভাগ্যে কোনো ডিগ্রিলাভ ঘটে নাই। জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত (জে এন গুপ্ত, আই-সি-এস) তাঁহার স্মৃতিকথায় জ্যেষ্ঠতাতপুত্র নগেন্দ্রনাথের বাল্যজীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি— " '...[মেজদা] জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে পড়তেন। জগৎ-আলোক বিবেকানন্দ হয় তাঁহার সহপাঠী, নয় সেই কলেজের সহাধ্যায়ী ছিলেন। সেকথা মেজদা নিজেই একটা প্রবন্ধে বলেছেন।' "

ব্রজেন্দ্রনাথের রচনা অনুসারে নগেন্দ্র গুপ্ত ১৮৭৮ সালেই মাত্র জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ্ ইনস্টিটিউশনে এনট্রান্স-পর্বে ছাত্র ছিলেন। স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী অনুযায়ী স্বামীজী ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে এনট্রান্স পাস করেন। ১৮৮০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ এ পড়া শুরু করে, সেই কলেজ ত্যাগ ক'রে, ১৮৮১ সালে জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ্ ইনস্টিটিউশনে গিয়ে এফ এ পাস করেন। সেক্ষেত্রে নগেন্দ্র গুপ্ত ও নরেন্দ্রনাথ কাছাকাছি সময়ে জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ্ ইনস্টিটিউশনে পড়েছিলেন, এইটুকু মাত্র মানা যায় এবং নগেন্দ্র গুপ্ত কেবল দূর থেকে নরেন্দ্রনাথকে দেখেছেন। কলেজী পরীক্ষায় নরেন্দ্রনাথ অবশ্যই বিশেষ-রকম কৃতিত্বের পরিচয় দেননি, সে-ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের প্রকট অভাব ছিল, কিন্তু তিনি 'সাধারণ ছাত্র' ছিলেন, বা 'ব্রিলিয়ান্ট' যুবক ছিলেন না—একথা কোনোমতেই বলা যাবেনা এবং তিনি 'নীরব' থাকার পাত্রও ছিলেন না। তাঁর মজলিশী স্বভাব, সঙ্গীতপ্রতিভা, বাক্‌পটুতা, স্বভাবগত নেতৃত্ব, বিদ্যার দীপ্তি (প্রিন্সিপ্যাল হেস্টি-র মতো বিরাট পণ্ডিতের কাছেও তিনি 'জিনিয়াস', ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর দর্শনজ্ঞানের সাক্ষী) সম্বন্ধে এতরকম সাক্ষ্য আছে যে, সে-সম্বন্ধে অনবহিত থাকা ব্যাপারটি দেখিয়ে দিচ্ছে, ঐ সময়ে নগেন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কত ভাসাভাসা রকমের। এমন হতে

পারে, এর কিছু বছর পরে নরেন্দ্রনাথ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ প্রভাবের অধীন হয়ে ঈশ্বর-অন্বেষণে অধীর এবং অন্য সবকিছু সম্বন্ধে গভীরভাবে উদাসীন, সেই সময়ে মাঝে মধ্যে তাঁকে নগেন্দ্র গুপ্ত দেখেছেন এবং তখনকার ধারণা পূর্বকালের উপর চাপিয়েছেন।

পূর্ব প্রসঙ্গে অর্থাৎ ট্রিবিউনের ১০ নভেম্বরের সম্পাদকীয়ের বক্তব্যে ফেরা যাক। ওখানে প্রথমে লাহোরে বিবেকানন্দের সংবর্ধনার কথা আছে। দ্বিতীয়ত বাগ্মিতার কথা। তৃতীয়ত অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, মোহময় আকর্ষণীশক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব এবং কঠোর সাধনার কথা। এইসকল বিষয়ে স্মৃতিকথায় নগেন্দ্র গুপ্ত আরও বেশি কিছু সংবাদ পরিবেশন করেছেন।

লাহোর অভ্যর্থনার কথাই ধরা যাক। লাহোরে অবস্থান করার সময়ে নগেন্দ্র গুপ্ত শুনলেন, স্বামীজী পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস ধর্মশালা থেকে জম্মু ও কাশ্মীর গেছেন। সেখান থেকে তিনি লাহোরে এলেন। "লাহোরে জনসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল [নগেন্দ্র গুপ্ত মডার্ন রিভিউ-এর স্মৃতিকথায় লিখেছেন] বহুসংখ্যক লোক তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন—সেখান থেকে শোভাযাত্রা ক'রে শহরের একটি বৃহৎ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমিও সেখানে ছিলাম।" 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' গ্রন্থে নগেন্দ্র গুপ্ত স্টেশনের একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা লিখেছেন :

"রেল স্টেশনে ট্রেন পৌঁছলে একজন ইংরেজ মিলিটারি অফিসার প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে নেমে সম্ভ্রমের সঙ্গে ভিতরকার কারো জন্য দরজা খুলে দাঁড়ালেন—আর পর মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দ সেখান থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লেন। অফিসারটি নত হয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে যাচ্ছেন, স্বামীজী তাঁকে থামিয়ে সাদরে করমর্দন ক'রে অল্পকথায় বিদায়কালীন সম্ভাষণ জানালেন। পরে প্রশ্নের উত্তরে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে অফিসারটিকে চেনেন না। কম্পার্টমেন্টে প্রবেশের পরে অফিসারটি স্বামীজীকে জানান যে, তিনি ইংল্যান্ডে স্বামীজীর কয়েকটি আলোচনাসভায় উপস্থিতি ছিলেন, এবং তিনি ইন্ডিয়ান আর্মির একজন কর্নেল। জম্মুর লোকেরা বিবেকানন্দকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে দিয়েছিল, তাই সেই শ্রেণীতে ভ্রমণ করেছিলেন।"

পরাধীন ভারতের রেল স্টেশনে একজন নেটিভ সন্ন্যাসীকে শত শত নেটিভের সামনে এক ইংরেজ কর্নেলের এই প্রকাশ্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের তাৎপর্য কী, তা কেবল পরাধীন ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত মানুষদের পক্ষেই বোঝা সম্ভব। স্মরণ রাখতে হবে, ঘটনাটা ১৮৯৭ সালের—ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম তখন দূরের ব্যাপার।

নগেন্দ্র গুপ্তের লাহোরের বাড়িতে অবস্থানকালে আর একটি ঘটনায় জাতি-সংস্কারশূন্য মুক্তপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় :

"এক পঞ্জাবী ভদ্রলোক, বক্‌শী জৈসী রামের সঙ্গে পঞ্জাবের ধর্মশালায় বিবেকানন্দের আলাপ হয়েছিল। তিনি বিবেকানন্দ ও আমাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বিবেকানন্দকে ধূমপানের জন্য নূতন চমৎকার হুঁকা দেওয়া হয়েছিল। হুঁকাটি ব্যবহারের আগে বিবেকানন্দ গৃহস্বামীকে বললেন, 'জাতি-ব্যাপারে আপনার যদি গোঁড়ামি থাকে

তাহলে হুঁকাটি আমাকে ব্যবহার করতে দেবেন না, কারণ আগামী কাল যদি কোনো ঝাড়ুদার আমাকে তার হুঁকা সেজে দেয়, আমি তা আনন্দের সঙ্গে টানব। আমি জাতিসীমার বাইরে আছি।' গৃহস্বামী বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, স্বামীজী হুঁকাটি ব্যবহার করলে তিনি ধন্যবোধ করবেন। ভারতে পরিব্রাজক জীবনেই অস্পৃশ্যতার সমস্যা স্বামীজী নিজের জন্য সমাধান ক'রে ফেলেছিলেন। উচ্চবর্ণ স্পর্শও করবে না এমন দরিদ্রতম দীনতম মানুষের দেওয়া আহার্য তিনি গ্রহণ করেছেন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন তাদের আতিথ্য।"

"তাই বলে", নগেন্দ্র গুপ্ত বিবেকানন্দের মহামহিম ব্যক্তিত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলেছেন, "বিবেকানন্দ কোনমতে ন্যাতানো নীচু স্বভাবের মানুষ ছিলেন না। তাঁর সর্বোচ্চ ভাষণের অন্যতম লাহোরের 'বেদান্ত' বক্তৃতাকালে মস্তক উন্নত ক'রে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত ক'রে, তিনি বলেছিলেন, 'এ পৃথিবীতে সর্বাধিক গর্বিত জীবিত মানুষদের আমি একজন।' এ কোনো অপদার্থের অহঙ্কার নয়—এ হলো নিজের বিরাট ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন এক পুরুষের সুমহান গর্ব—যার মধ্যে ছিল দেশের চরম অধোগতি ঘটিয়েছে যে-ধরনের অতিবিনয়ের নাটুকেপনা, তার বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণার বিস্ফোরণ।"

লাহোরে স্বামীজীর অবস্থানকালে [মডার্ন রিভিউ-এর রচনায়] একটি বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনার কথা নগেন্দ্র গুপ্ত বলেছেন যা, অলৌকিকতার ধার ঘেঁষে যায়। লাহোরের নাগরিকরা গোলবাগের টাউন হলে বিবেকানন্দের জন্য গার্ডেন পার্টির আয়োজন করেন।

"আমার বিশেষ পরিচিত [গুপ্ত লিখেছেন] এক পার্শী ভদ্রলোক গোলবাগের অপরদিকে বাস করতেন। গোলবাগে ভিড় জমেছে— প্রবেশপথের কাছে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক লক্ষ্য করছিলেন। সেইসময়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেন, উনি পার্শী কিনা? কোথা থেকে এসেছেন—বোম্বাই না কলকাতা? পার্শী ভদ্রলোক জানালেন, বোম্বাই থেকে। দুজনের মধ্যে আরও দু-চার কথা হলো, তারপর স্বামীজী ধীরগতিতে উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করলেন। পার্শী ভদ্রলোক স্বামীজীকে জানতেন না, পরেও স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। [এখানে স্মর্তব্য, সেকালের কাগজে কদাচিৎ ছবি ছাপা হতো, বিশেষত ভারতীয়দের ছবি, এবং সাধারণ একজন পার্শী ভদ্রলোক তৎকালীন জাতীয় জাগরণের নেতা সম্বন্ধে অবহিত না থাকতেই পারেন, বিশেষত তাঁর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপের মানুষটি যে স্বামী বিবেকোনন্দ, তাও তিনি না বুঝতে পারেন]। স্বামীজীর নাম অবশ্য তিনি পরে শুনেছিলেন। দু-এক বৎসর পরে ভদ্রলোক, উনি এখনও আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, বোম্বাই ফিরে গিয়ে ব্যবসায়ে নেমে পড়লেন। আরও কিছু বছর গেল, তারপর তিনি ধারাবাহিক স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন, তাতে অদ্ভুতরকমের দৃশ্যাদি দেখে খুবই বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। সেসবের মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলেন না। তিনি প্রায়ই দেখতেন—একটি কালো মূর্তি, তার চারধারে আরও কয়েকটি মূর্তি। স্বপ্নে মনে হতো, তিনি সবসময়ে উত্তরদিকে হাঁটছেন। এই কাহিনী আমি স্বয়ং তাঁর মুখে শুনেছি। কোনই সন্দেহ নেই, এই সুস্পষ্ট এবং প্রায়শ-সংঘটিত স্বপ্নে তিনি বিশেষরকম বিচলিত হয়েছিলেন। চার কি পাঁচ বছর আগে [এই লেখা প্রকাশের সময় মার্চ ১৯৩০] বোম্বাইয়ের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি একটা

দোকানের শো-কেসে স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী রক্ষিত দেখতে পান। তৎক্ষণাৎ দোকানে ঢুকে বইগুলি কিনে ফেলেন, পড়েন এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর গোটা জীবনের ধারা বদলে যায় এবং বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনে বেশ কয়েক হাজার টাকা দান করেন, কিন্তু তাঁর নাম যেন কোনভাবে এ-ব্যাপারে প্রকাশিত না-হয় সে সম্বন্ধে দৃঢ় নিষেধ করেন।"

ঐতিহাসিক তথ্যমূলক এই রচনার স্বাদবৃদ্ধির জন্য নগেন্দ্র গুপ্তের মতো সতর্ক বা সন্দিগ্ধ, বিচারশীল লেখক-পরিবেশিত এই 'স্বপ্নমঙ্গলকথা' উপস্থিত করলাম।

রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতার যেসব কথা নগেন্দ্র গুপ্ত বিবেকানন্দের মুখে শুনে লিপিবদ্ধ করেছেন, তাদের অধিকাংশই স্বামীজীর জীবনীতে বিস্তৃতভাবে লিখিত ও ব্যাখ্যাত। যথা, অখ্যাত এক ছোকরা নরেন্দ্র সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের অতিকায় ভবিষ্যৎবাণী, যা সমকালে হাস্যকর কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে বাস্তবাধিক বাস্তব। স্থায়ী সমাধিলাভের জন্য নরেন্দ্রের ব্যাকুল প্রার্থনা ও রামকৃষ্ণের নিষেধাত্মক উত্তর; তবে মাঝে মাঝে তাঁর সমাধির আকাঙ্ক্ষা পূরণ। প্রথম পর্বে নরেন্দ্রের এই সংক্রান্ত একটি অভিজ্ঞতার কথা, যা জীবনীতেও আছে, নগেন্দ্র গুপ্তের স্মৃতিকথায় তার রূপ এই—রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে স্পর্শ করলেন। তারপর—"বিবেকানন্দের মুখ থেকে আমি (গুপ্ত লিখেছেন) স্বকর্ণে শুনেছি"—"সেই মুহূর্তে বালকটি সহসা দেখল চোখ-ধাঁধানো আলোর ঝলক, অনুভব করল, তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পৃথিবীর মাটি থেকে উপড়ে। আতঙ্কে সে কেঁদে উঠল—'আমাকে নিয়ে এ কী করছ তুমি? আমার যে, মা ভাইয়েরা আছে।' পরমহংস তার পিঠ চাপড়ে ঠাণ্ডা ক'রে বললেন, 'হয়েছে হয়েছে! এখন এতেই হবে'।"

বিবেকানন্দের মুখ থেকে তাঁর পরিব্রাজক-জীবনের নানা ঘটনা নগেন্দ্র গুপ্ত শুনেছিলেন, তার মধ্যে স্মরণ ক'রে তিনি দু-একটির কথা বলেছেন, যার বেশির ভাগ আবার স্বামীজীর জীবনীতে পাই। যেমন, একটি ঘটনা, যার মধ্যে আছে—পরাধীন ভারতে পুলিশী প্রতাপ, পথচারী সাধুদের নানা দুর্দৈব, বিবেকানন্দের তৎপর বুদ্ধি ও অপরাজেয় রসবোধের নমুনা। তাঁর বিহারে থাকাকালে দারুণ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি ছিল। অনেক জেলায় দেখা গেল, শস্য লাগানো, সিঁদুর মাখানো এক তাল মাটি আম গাছগুলির গুঁড়িতে চাপড়ানো রয়েছে। সাম্রাজ্যরক্ষী সরকারের দুষ্ট মনে ভয় ঢুকে গেল, তবে কি পূর্বতন মিউটিনির চাপাটি-সংকেতের মতো এ কোনো বিদ্রোহের ঘোষণা? গাঁয়ে গাঁয়ে সশস্ত্র পুলিশ ভরে গেল। সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা একবাক্যে বলল, কে বা কারা ও-জিনিস করেছে তা তারা জানে না। তখন সন্দেহ গিয়ে পড়ল পথচারী সাধুদের উপর। কিন্তু তখনও বর্তমানের (অর্থাৎ স্বদেশী যুগের পরবর্তী কালের) মতো বিনা বিচারে কয়েদের নানা আইনকানুনের জাল দেশে ছড়ায় নি। যাই হোক, তখন বিবেকানন্দের দৈনন্দিন কাজ—খুব ভোরে উঠে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে, কিংবা কোনো গ্রাম্য পথ ধরে হাঁটা, যতক্ষণ পর্যন্ত-না কেউ তাঁকে কিছু খাদ্যবস্তু দেয়, কিংবা তিনি তীব্র গরমে পথের ধারে কোনো গাছতলায় বিশ্রাম করতে বাধ্য হন। একদিন সকালবেলা পথ ধরে হাঁটছেন, পিছনে প্রচণ্ড হাঁক—'ঠারো!' ফিরে দ্যাখেন, ঘোড়ার পিঠে পুলিশ অফিসার, মুখে দাড়ি, গায়ে জমকালো পোশাক, হাতে চাবুক, পিছনে পুলিশের পাল। সে ব্যক্তি সুপরিচিত পুলিশী রাসভমধুর কণ্ঠে হাঁক দিলেন—'কে তুমি?' বিবেকানন্দ

বললেন : 'দেখতেই পাচ্ছেন খানসাহেব—আমি সাধু।' গাঁ-গাঁ ক'রে মহাবিচার ঘোষণা করলেন উক্ত সাব-ইনস্পেকটার—'সব সাধু বদমাশ।' এই সিদ্ধান্তের উপর আপীল নেই কারণ ভারতের পুলিশ সত্য বই মিথ্যা বলেনা। তারপরেই গর্জে উঠলেন, 'চলো হামারা সাথ। তোমাকে জেলে ঢুকিয়ে তবে ছাড়ব।' শুনে বিবেকানন্দ একেবারে বিগলিত, 'কতদিনের জন্য খানসাহেব?' সাহেবের সুগম্ভীর উত্তর, 'পনের দিনের জন্য হতে পারে, মাসখানেকের জন্যেও হতে পারে।' বিবেকানন্দ আর থাকতে পারলেন না, খানসাহেবের একেবারে গায়ের কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, কণ্ঠে যতখানি সম্ভব অনুনয়ের কাতরতা ঢেলে দিয়ে বললেন, প্রায় কাঁদো-কাঁদো ভাবে—'খানসাহেব, মাত্র একমাসের জন্য? ওটাকে ছয় মাস, নিদেন তিন কি চার মাস করতে পারেন না?' পুলিশ অফিসারের চক্ষু ছানাবড়া—গাল ঝুলে পড়ল—'এক মাসের চেয়ে বেশি জেলে কাটাবার ইচ্ছে কেন তোমার?' বিবেকানন্দ একান্ত নির্ভরতার স্বরে ফিসফিস ক'রে বললেন : 'এই জীবনের চেয়ে জেলের জীবন অনেক ভালো। এখন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে মরছি, প্রতিদিন খাবার জোটেনা, না খেয়ে পড়ে থাকতে হয়। জেলে তো দু'বেলা পেট পুরে খাবার জুটবে। সাহেব, যদি কৃপা ক'রে কয়েক মাস জেলবাসের সুযোগ ক'রে দেন, বড়ই কৃতজ্ঞ থাকব।' খানসাহেব যতই শুনছেন ততই হতাশা ও বিরক্তিতে তাঁর মুখ কালো হয়ে উঠছে। মুখ ফিরিয়ে পুনশ্চ গর্জন ক'রে বললেন, 'ভাগো হিঁয়াসে।'

আর একটি পুলিশী অভিজ্ঞতার কথা স্বামীজী বলেছিলেন, সেটা বরাহনগর-মঠের ব্যাপার। স্বামীজীদের পারিবারিক বন্ধু এক বড়দরের পুলিশ কর্মচারী (সি আই ডি-র এস পি) স্বামীজীকে নিজের বাড়িতে রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু খাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই করেন নি, উল্টে চাপ দিয়ে জানতে চান, বরাহনগর-মঠে যারা জুটেছে তারা কী ধরনের রাজদ্রোহের কাজ করছে, কারণ সেইরকম খবরই তাঁর কাছে আছে। 'আর তুমিই তাদের লীডার। সবাইকে পাকড়াও করা হবে, তবে তুমি যদি অ্যাপ্রুভার হও, তাহলে ছাড়ান পাবে।' লোকটির অসভ্য ব্যবহারের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য স্বামীজী উঠে পড়ে, প্রথমে দরজাটি বন্ধ করলেন, তারপর নিজের ব্যায়ামপুষ্ট শক্তিশালী চেহারাটি মেলে ধরে, পুঁচকে চেহারার ক্ষীণজীবী পুলিশ অফিসারকে বললেন: "ছল ক'রে আমাকে বাড়িতে ডেকে এনে আপনি রাজ্যের মিথ্যে অভিযোগ আমার এবং আমার বন্ধুদের বিরুদ্ধে করছেন। এই হলো আপনার চাকরির প্রকৃতি। অপরপক্ষে আমার প্রকৃতি হলো অপমান হজম না-করা। আমি যদি ষড়যন্ত্রকারী বা অপরাধী হতাম তাহলে এখনি, আপনি কাউকে ডাকার আগেই, আপনার ঘাড় মটকে দিতাম, বাধা দিত কে? যাই হোক, আপনাকে ছেড়ে দিলাম।" অফিসারটি ভয়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপছেন, স্বামীজী দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

জীবনীতে আছে এমন একটি হাস্য-করুণ ঘটনার কথাও স্বামীজীর মুখে নগেন্দ্র গুপ্ত শুনেছেন। পরিব্রজ্যাকালে স্বামীজী একবার ব্রত নিয়েছিলেন, সারাদিন তিনি সামনের দিকে হাঁটবেন, পিছন ফিরবেন না এবং কারো কাছে ভিক্ষা চাইবেন না। যদি কেউ স্বেচ্ছায় তাঁকে খাদ্য দেয় তবেই থামবেন। এই পর্যায়ে কখনও কখনও তাঁকে চব্বিশ ঘণ্টা, এমনকি আটচল্লিশ ঘণ্টা পর্যন্ত অনাহারে কাটাতে হয়েছে। একবার সন্ধ্যার মুখে তিনি এক ধনী ব্যক্তির আস্তাবলের কাছ দিয়ে এগোচ্ছিলেন, সেখানে সহিস একা দাঁড়িয়েছিল, স্বামীজী দুদিন খাননি, তাঁকে খুবই ক্লান্ত ও দুর্বল দেখাচ্ছিল। তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে, সহিসটি

সেলাম ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সাধুবাবা, আজ কি আপনার আহার হয়েছে?' স্বামীজী জানালেন, না, সারাদিন কিছু খাননি। সহিস তাঁকে আস্তাবলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে, হাত-মুখ ধোয়ার জল দিয়ে, নিজের খাবারটি তাঁর হাতে তুলে দিল—কয়েকটি চাপাটি ও একটু লঙ্কার চাটনি। স্বামীজী পরিব্রাজক পর্বে (বরাহনগর-মঠেও) খুব ঝাল লঙ্কা খেতে অভ্যস্ত ছিলেন, অনেক সময়ে তাই ছিল ভাতের সঙ্গে একমাত্র তরকারি। নগেন্দ্র গুপ্ত তাঁকে পরমানন্দে মুঠোভর্তি কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে খেতে দেখেছেন। সে-হেন বিবেকানন্দ চাপাটি ও চাটনি খেলেন কিন্তু তার পরেই বিপর্যয় কাণ্ড—পেটের যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল, ভিতরে আগুন জ্বলতে লাগল, অসহ্য কষ্টে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তা দেখে সহিসের কষ্টের সীমা রইল না, মাথা চাপড়ে বলতে লাগল, 'এ আমি কী করলাম, সাধুকে মেরে ফেললাম!' যন্ত্রণাটা নিশ্চয় ঘটেছিল দীর্ঘসময় খালিপেটে থেকে তীব্র ঝাল লঙ্কার চাটনি খাওয়ার জন্য। ঠিক সেই সময়ে ঝুড়ি-মাথায় একটি লোক যাচ্ছিল, সহিসের কাতরোক্তি শুনে থেমে পড়ল। স্বামীজী যখন শুনলেন, তার ঝুড়িতে তেঁতুল আছে, তখন বললেন, 'আঃ, ঠিক ঐ জিনিসটিই আমার দরকার।' সেই তেঁতুল-গোলা জল খেয়ে তবে তাঁর পেটের যন্ত্রণা যায়। বাঘা ঝালের মুখে পড়েছিল বাঘা তেঁতুল।

হিমালয়ে ভ্রমণকালীন অনেক অভিজ্ঞতার কথা নিশ্চয় স্বামীজী নগেন্দ্র গুপ্তকে বলেছিলেন। আফসোসের কথা, সেসব গুপ্ত লিখে যাননি। কেবল সারসংক্ষেপ করেছেন এই বলে: "হিমালয়ের ভিতরে দূর অঞ্চলে বিবেকানন্দ নানাপ্রকার বিপজ্জনক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি। অতীব সাহস এবং জীবনীশক্তিসহায়ে তিনি অধ্যাত্মসাধনার নীতিনিয়ম পালন ক'রে গেছেন। সহ্যশক্তির দীর্ঘস্থায়ী পরীক্ষা, অখণ্ড আত্মশাসন, নিবিড় ধ্যান এবং নিরন্তর ঈশ্বরসান্নিধ্যের বোধ—এই ছিল তাঁর ব্রতসাধনা।"

স্বয়ং তীক্ষ্ণবুদ্ধি বহুদর্শী সাংবাদিক ও লৌকিক জীবনের কথাশিল্পী হলেও নগেন্দ্র গুপ্ত বিবেকানন্দের চরিত্রায়নের কালে বারে বারে তাঁর অধ্যাত্মচরিত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কোন্ শক্তিতে স্বামীজী অকূল সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, লড়াই করেছিলেন উত্তাল তরঙ্গমালার সঙ্গে, তার কারণও তিনি একই দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন: "পরিব্রাজক জীবনের অভিজ্ঞতাই এই বন্ধুহীন, অর্থসামর্থ্যহীন সন্ন্যাসীকে আমেরিকার বিরূপ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামের শক্তি দিয়েছিল— যাঁর সম্বল নিজের বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি।"

বিবেকানন্দের মুখে নগেন্দ্র গুপ্ত আমেরিকায় বিখ্যাত হয়ে যাবার পরে চূড়ান্ত খাতিরের কাহিনী শুনেছেন, তবে স্বামীজী সেসব নিয়ে মজাও করেছেন। তিনি রাশি রাশি প্রেমপত্র পেয়েছেন, দাঁতের ডাক্তার তাঁর তত্ত্বাবধান করতে, এবং বিউটি-পার্লারের মালিক তাঁর নখের ঔজ্জ্বল্যবিধানে কী প্রকার উৎসাহী ছিলেন, তাও বলেছেন। কিন্তু সব মজা হারিয়ে যেত যখন ভারতপ্রসঙ্গ আসত। স্বপ্ন-সাধ-সাধনা ও যন্ত্রণার ভারত তাঁর:

> "স্বদেশের প্রতি বিবেকানন্দের ব্যাকুল ভালবাসা ও তীব্র অনুভূতিই আমাকে সবচেয়ে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর মধ্যে ঘটেছিল আধ্যাত্মিক উন্মাদনা ও অন্তর্ভেদী মনীষার নিখুঁত মিশ্রণ। বহু সমস্যার আসল রূপ তিনি যথাযথ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং

অধিকাংশের সমাধানের উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। ভবিষ্যদর্শনের অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'ভারতের মধ্যবিত্ত সমাজের শক্তি নিঃশেষিত। তাদের মধ্যে দৃঢ়সংকল্প ও ধারাবাহিক প্রয়াসের তাগিদ নেই। ভারতের ভবিষ্যৎ—জনগণের হাতে।' এক অপরাহ্ণে ভাবমগ্ন মুখে তিনি ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে বললেন, 'আমি জেলে গেলে যদি দেশের কোনরকম উপকার হয়, তাহলে আমি প্রস্তুত।' আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তখনও তাঁর ললাটের জয়তিলক শুকোয় নি—সে সম্বন্ধে উল্লেখমাত্র না ক'রে তিনি স্বেচ্ছায় জীবনের আকাঙ্ক্ষিত পরিণতিরূপে কারাগারে প্রবেশের কথা ভাবছেন, যার দ্বারা হয়তো তাঁর দেশের ক্ষুদ্র কোনো উপকার ঘটতে পারে। তাই বলে শহীদের মুকুট পরার অভিলাষ তাঁর ছিলনা, ওসব ভান একেবারেই ছিলনা তাঁর মধ্যে, তাঁর মন নিঃসন্দেহে পাক খাচ্ছিল একটি ভাবনায়—আত্মত্যাগের দ্বারা যদি আসে দেশের মুক্তি।"

একই প্রসঙ্গ:

"জাপান দেখার পরে জাপানী জাতির দেশপ্রেমের রূপ তাঁর মনকে পূর্ণ করেছিল একান্ত বিস্ময় ও শ্রদ্ধার আবেগে। উৎসাহে উজ্জ্বল মুখে তিনি বলেছিলেন, জাপানীদের কাছে তাদের দেশই ধর্ম। জাপানের জাতীয় ধ্বনি—'জয় জাপান!' সবার উপরে তাদের দেশ। দেশের মর্যাদা ও সংহতি রক্ষার জন্য কোনো ত্যাগই তাদের কাছে বড় ত্যাগ নয়।"

নগেন্দ্র গুপ্ত ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত (ঠিক কোন্ সময় পর্যন্ত জানি না) ট্রিবিউনের সম্পাদক ছিলেন। আগেই বলেছি, ১৮৯৮ সালের ট্রিবিউনের পুরাতন সংখ্যা পাওয়া যায়নি। অথচ ঐ সময়ে স্বামীজীর সঙ্গে নগেন্দ্র গুপ্তের দেখা হয়েছে। সে-বিষয়ে গুপ্তের দু-এক টুকরো স্মৃতিকথা উপস্থিত করতে পারি।

১৮৯৮ সালের মে মাসে আলমোড়ায় থাকাকালে স্বামীজীর সঙ্গে অ্যানী বেশান্তের সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। স্বামীজীর ২০ মে-র চিঠি থেকে জানা যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর (ধর্মমহাসভায় ইনি থিয়জফিক্যাল সোসাইটির প্রতিনিধিত্ব করেন) স্ত্রীর (ইনি পরবর্তীকালে যশোদা মাতা নামে পরিচিত) নির্বন্ধে পড়ে তিনি বেশান্তের সঙ্গে দেখা করেন। শ্রীমতী চক্রবর্তী গাজিপুরের গগনচন্দ্র রায়ের কন্যা। পরিব্রজ্যাকালে এঁর বাড়িতে স্বামীজী কিছুদিন ছিলেন—সেইসময়ে বালিকা কন্যাটিকে স্বামীজী খুবই স্নেহ করতেন। আলমোড়ায় তাঁর অনুরোধ এড়াতে না পেরে স্বামীজী অ্যানী বেশান্তের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হন। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, কিছু-বেশি এক বছর আগে স্বামীজী কঠোরভাবে থিয়জফিক্যাল সোসাইটির কিছু কর্তার দুমুখো আচরণের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করেছিলেন, সেইসঙ্গে থিয়জফি-মত সম্বন্ধেও বিরূপ ধারণার কথা বলেন। তবে ব্যক্তিগতভাবে অ্যানী বেশান্ত শ্রদ্ধেয় মহিলা, এও জানান। এই পটভূমিকায় বেশান্তের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎকারে আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে স্বামীজী তাঁর চিঠিতে যে-কথা লিখেছেন, তাঁর পূর্বতন জীবনীগুলিতে তার অতিরিক্ত কোনো কথা নেই। তবে 'যুগনায়ক' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (পৃ. ২৪৯) স্বামী গম্ভীরানন্দ নগেন্দ্র গুপ্তের 'স্মৃতিকথা' থেকে সাক্ষাৎকার ঘটনাটির কথা

বলেছেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু কী ধরনের কথাবার্তা অ্যানী বেশান্তের সঙ্গে হয়েছিল, তার উল্লেখ করেন নি। স্বামীজীর পত্রে পাই, সাক্ষাৎকালে "এনি বেসান্ট আমাকে অনুনয় ক'রে বললে যে, আপনার সম্প্রদায়ের সহিত যেন আমার সম্প্রদায়ের পৃথিবীময় প্রীতি থাকে, ইত্যাদি।" এক্ষেত্রে একমাত্র অতিরিক্ত কথা পাই নগেন্দ্র গুপ্তের স্মৃতিকথায়। তাঁর কথিত 'বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ইংরেজ মহিলা' নিঃসন্দেহে অ্যানী বেশান্ত। সেজন্য বিবেকানন্দ-অনুসন্ধিৎসুদের কাছে তার মূল্য আছে। নগেন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন:

> "একবার আলমোড়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন (স্বামীজীর চিঠিতে আছে, তিনিই দেখা করতে যান; বেশান্ত ফিরতি-দেখা করেন; ইংরেজী জীবনীর প্রথম সংস্করণে উভয়ের দু'বার সাক্ষাতের কথা আছে) বিশিষ্ট ও বিখ্যাত এক ইংরেজ মহিলা। হিন্দুধর্মের আচার্যের ভূমিকা নিয়েছেন বলে বিবেকানন্দ সেই মহিলার সমালোচনা করেছিলেন। মহিলা জানতে চান, ঠিক কোথায় তিনি আপত্তির হেতু হয়েছেন? বিবেকানন্দ উত্তরে বলেন, 'তোমরা ইংরেজ— কেড়ে নিয়েছ আমাদের দেশ, হরণ করেছ স্বাধীনতা, স্বভূমিতে আমাদের দাসজাতিতে পরিণত করেছ, তোমরা শোষণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছ আমাদের সব সম্পদ। তাতেও সন্তুষ্ট নও—এখনও এদেশে অবশিষ্ট আছে যে ধর্ম, তাও কেড়ে নিতে চাও—আমাদের ধর্মগুরুর আসনে বসবার মতলব তোমাদের'!"

এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, স্বামীজী এই সাক্ষাৎকারের আগেই ১১ মার্চ ১৮৯৮, স্টার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত নিবেদিতার এক বক্তৃতাসভায় সভাপতির ভাষণে অ্যানী বেশান্তের ভারতপ্রীতির প্রশংসা করেছিলেন।

স্বামীজী সম্পর্কে নগেন্দ্র গুপ্ত লিখিত ১৮৯৮ সালের একটি উপভোগ্য স্মৃতিকথা উপহার দেব। আষাঢ় ১৩০৮ প্রবাসীতে নগেন্দ্র গুপ্ত উৎকৃষ্ট কথাচিত্র-সমন্বিত এবং তথ্য সম্বলিত কাশ্মীর ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন—সেই সময়কার কাশ্মীরের প্রকৃতি ও মানুষের বিষয় জানতে হলে লেখাটি উপকারে লাগবে। এখানে তার থেকে স্বামীজী-সংশ্লিষ্ট অংশটি তুলে ধরছি:

> "অন্যান্য সামগ্রীর মতো কাশ্মীরের কলহও প্রসিদ্ধ। মারামারি প্রায় কখনই হয়না, কিন্তু গালাগালির বৈচিত্র্য ও ঘটা এমন নাকি আর কোথাও নাই! ঝগড়াতে রূপকের ছড়াছড়ি। একটা ঝগড়ার বর্ণনা করিয়া এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ শেষ করি।...
>
> "এক দিবস সূর্যোদয়ের কিছু পরে পবপারে তুমুল কোলাহল শুনিয়া নৌকা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। নদী অপ্রশস্ত, এক পারে চীৎকার করিলেই অপর পারে শুনিতে পাওয়া যায়। দেখিলাম, একজন পক্ককেশ কিন্তু বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি বসিয়া পাথর ভাঙিতেছে; একটা স্ত্রীলোক ও দুই-তিনজন পুরুষ তাহাকে ঘিরিয়া ভয়ানক চীৎকার ও আস্ফালন করিতেছে। সকলেই মুসলমান। নৌকার একটা মাঝিকে ডাকিয়া ব্যাপারখানা জানিলাম। যে পাথর ভাঙিতেছে, স্ত্রীলোকটা তাহারই স্ত্রী; অপর দুইজন স্ত্রীর ভাই; ভাই ভগিনী একদিকে, আর সেই পাথর-ভাঙা বৃদ্ধ একদিকে। তাহাকে বৃদ্ধ বলা অন্যায়, কারণ

তাহার নগ্নদেহ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার শরীরে বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে। সে ব্যক্তি যেন কিছুই শুনিতেছে না, লোহার হাতুড়ি দিয়া এক মনে পাথর ভাঙিতেছে। সহসা স্ত্রীলোকটি দৌড়িয়া তাহাঁদের নৌকায় প্রবেশ করিল—নৌকা ছাড়া অনেকের অন্য গৃহ নাই—ও কতকগুলা মলিন, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড আনিয়া স্বামীর সম্মুখে রাখিল। এ প্যান্টোমাইমের [মূকাভিনয়ের] অর্থ এই যে, যখন তুমি আমায় বিবাহ করিয়াছিলে, তখন তোমার এইরূপ দুর্দশা ছিল, অঙ্গে বস্ত্র জুটিত না, আমার জন্য এখন তুমি পরিতে পাও। ষাঁড় যেমন লাল ন্যাকড়া দেখিলে রাগিয়া ওঠে, ময়লা ন্যাকড়াগুলা দেখিয়া তাহার স্বামী সেইরূপ জ্বলিয়া উঠিল। হাতুড়ি ফেলিয়া, লাফাইয়া উঠিয়া, সকলকে গালি পাড়িতে লাগিল। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

"আমার নৌকার পাশে প্রথিতযশা বিবেকানন্দ-স্বামীর নৌকা বাঁধা ছিল। এইসময়ে তাঁহাকে ডাকিলাম। তিনি বাহির হইয়া আমার নৌকায় আসিলেন। সে ব্যক্তি আবার পূর্বের মতো পাথর ভাঙিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী আবার নৌকায় গিয়া কতকগুলো হাঁড়ি লইয়া আসিল—অর্থ, তোমার এইরকম শুধু হাঁড়ি ছিল, পেটে ভাত জুটিত না, এখন আমার জন্য খাইতে পাইতেছ। কিছুকাল এইরকম রূপক-যুদ্ধের পর এক শ্যালক আসিয়া, ভগিনীপতির মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গালি দিতে লাগিল। বৃদ্ধ তখন ক্রোধসংবরণ করিতে না পারিয়া শ্যালককে চপেটাঘাত করিল। অমনি শ্যালকদ্বয়, ভগিনী ও ভগিনীপতি জড়াজড়ি করিয়া ভাঙা পাথরের উপর পড়িল। পাশে অনেক লোক দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল কিন্তু ছাড়াইবার জন্য কেহ অগ্রসর হইল না। বৃদ্ধের বাহুতে এমন শক্তি যে, সে শ্যালকদ্বয় ও স্ত্রীকে প্রহার করিয়া, সরিয়া গিয়া বসিল। তাহারা তিনজন তিনরকম সুরে কাঁদিতে লাগিল।

"বিবেকানন্দ-স্বামী ও আমি ডিঙ্গিতে করিয়া পার হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। এক শ্যালকের পিঠে পাথর ফুটিয়া রক্ত বহিতেছে। বিবেকানন্দ-স্বামী বৃদ্ধকে বলিলেন, 'স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিস, তুই এত বড় পাষণ্ড!' সন্ন্যাসীর ক্রোধ দেখিয়া সকলে ভীত হইল। আমি মাঝিকে দিয়া স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করাইলাম, কি হইয়াছে? সে তাড়াতাড়ি লোহার হাতুড়িটা তুলিয়া লইয়া বলিল, আমাকে এই হাতুড়ি দিয়া মারিয়াছে। কথাটা বাড়াইয়া বলিল কিন্তু আমরা তাহা অবিশ্বাস না করিয়া, তাহার স্বামীকে বলিলাম, 'আয়, আমাদের নৌকায় আয়, তোকে পুলিশে দিব।'

"তৎক্ষণাৎ স্বামীর স্ত্রী-বিদ্বেষ অন্তর্হিত হইল। শ্যালকরাও মিনতি করিতে লাগিল, যেন অপরাধীকে ধরিয়া না-লইয়া যাওয়া হয়। আমরা কোনো কথা শুনি না দেখিয়া স্ত্রী নৌকায় গিয়া একটি শিশুকে কোলে করিয়া আনিয়া স্বামীর কোলে দিল—যেন জন্মের শোধ সে একবার স্ত্রী-পুত্রকে দেখিয়া লইবে। সকলের নিকট বিদায় লইয়া বুড়ো আমাদের নৌকায় উঠিল। আমাদের যে কী ক্ষমতা তাহাকে লইয়া যাই, সেকথা কেহ একবার জিজ্ঞাসা করিল না। একজন সন্ন্যাসী, আর একজন পরিব্রাজক, আমাদিগকে যদি মারিয়া হাঁকাইয়া দেয় তো কোনো উপায় নাই, কিন্তু কেহই কোনো কথা বলিল না, কেহ বৃদ্ধকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল না। তাহাকে পারে লইয়া আসিয়া, খানিক বসাইয়া রাখিয়া, ধমক দিয়া আবার ছাড়িয়া দিলাম।"

নগেন্দ্র গুপ্তের এই বিবরণের তথ্যগত নয়, ব্যাখ্যাত্মক অংশ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা যায়। দৃষ্টি আকর্ষণ করি, নারীর উপর উৎপীড়নের ক্ষেত্রে স্বামীজীর কঠোর মনোভাবের দিকে। স্বামী ও স্ত্রী—দুই পক্ষের ঝগড়া তিনি, তাঁর যে-রকম মজাদার স্বভাব, তাতে খুবই উপভোগ করছিলেন, ধরে নেওয়া যায়। এমনকি পুরুষদের অল্পমাত্রায় মারামারির শরীর-প্রতিযোগিতায় আপত্তি থাকার কথা নয়, কিন্তু যে-মুহূর্তে নারীর গায়ে হাত উঠল সেই মুহূর্তে তিনি অগ্নিমূর্তি। আর একটি কথা, নগেন্দ্র গুপ্ত যে বলেছেন, বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী আর তিনি ভ্রমণকারী, এই যখন তাঁদের পরিচয় তখন তাঁরা যখন পুলিশে দেবার কথা বললেন, তখন কেনই-বা লোকগুলি তা মেনে নিয়ে, পুরো বিয়োগান্ত একটি নাটকীয় দৃশ্য সৃষ্টি করল? নগেন্দ্র গুপ্ত কি তখনকার কাশ্মীরের পরিস্থিতি একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন? ১৮৯৮ সালে সংঘটিত ঘটনাটির কথা নগেন্দ্র গুপ্ত ১৯০১ সালে লিখেছেন, যার মধ্যে স্বামীজীর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—'প্রথিতযশা বিবেকানন্দ-স্বামী'—সেই বিবেকানন্দ ঐ সময়ে কাশ্মীরে স্থানীয় মাঝিমাল্লার কাছে সুপরিচিত, সম্ভ্রমের পাত্র। ১৮৯৭ সালে স্বামীজী যখন প্রথম কাশ্মীরে এসেছিলেন, কাশ্মীরের রাজা সে সময়ে জম্মুতে থাকার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা না হলেও, রাজাভ্রাতা ও সেনাপতি শ্রীনগর দরবারে তাঁকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করেছিলেন, রাজমন্ত্রীদের অনেকে তাঁর অনুরাগী হয়ে ওঠেন। প্রথমে তিনি আতিথ্য নিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে, পরে, নিজেই চিঠিতে লিখেছেন (১৫.৯.১৮৯৭): "কাশ্মীর গভর্নমেন্ট আমাকে তাঁদের একখানি বজরা ব্যবহার করতে দিয়েছেন। বজরাটি বেশ সুন্দর, আরামপ্রদ। তাঁরা জেলার তহশিলদারদেরও উপর আদেশ জারি করেছেন। এদেশের লোকেরা আমাদের দেখবার জন্য দল বেঁধে আসছে, আমাদের সুখে রাখবার জন্য যা-কিছু প্রয়োজন সবই করছে।" পরবৎসর স্বামীজী যখন আবার কাশ্মীরে গেলেন তখন অবস্থার পরিবর্তন তো হয়ই-নি, অধিকন্তু তাঁর সঙ্গে পাশ্চাত্য নারীরা রয়েছেন, মানে মেমসাহেবরা, যাঁদের সম্বন্ধে স্থানীয় মানুষরা একেবারে তটস্থ। স্বামীজী শ্রীনগরের নানা স্থানে এঁদের নিয়ে ঘুরতেন এবং স্থানীয় স্থাপত্য ও শিল্প নিদর্শন দেখাতেন। মিসেস বুল চা-পানের আয়োজন ক'রে এক ইউরোপীয় ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করেছিলেন, স্বামীজীর সঙ্গে মাঝেমাঝেই দেখা করতে আসতেন আমেরিকার কনসাল-জেনারেল, জেনারেল প্যাটারসন—স্থানীর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তো আসতেনই। এই পর্বের সাধারণ মানুষদের ভালবাসা সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন: "তাঁকে ভালবাসতেন শুধু পণ্ডিতেরা, প্রাজ্ঞরা কিংবা রাজনৈতিকের দল? না—অজ্ঞান যারা তারাও। মাঝি প্রতীক্ষা করত জলের দিকে তাকিয়ে—কখন ফেরেন তিনি! কোলাহল করত ভৃত্যেরা, কাড়াকাড়ি করত—কে তাঁর সেবা করবে তাই নিয়ে। সকলের—সকল কিছুর—মধ্যে তিনি।" নগেন্দ্র গুপ্ত এ সকলই জানতেন, তা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত কথাগুলি প্রবাসীতে যদি লিখে থাকেন (তিনি একজন সন্ন্যাসী এবং আমি ভ্রমণকারী, সুতরাং আমাদের কথায় বৃদ্ধ মুসলমানটি জেলে যাবার বিষয়ে কেন সুনিশ্চিত হলো বোঝা যায়না, ইত্যাদি)—তাহলে বুঝতে হবে সেটা লেখার কৌশল ছাড়া কিছু নয়, ঘটনার বর্ণনায় বৈপরীত্যের চেহারা ফোটাবার জন্যই কৃত। এ-ধরনের কাজ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে তিনি আগেও করেছেন, আমরা দেখেছি। যাই হোক, কাশ্মীরে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে আর বেশি কথা নেই, তুলনায় নিবেদিতা বিষয়ে অনেকখানি কথা আছে মডার্ন রিভিউ-এর লেখাটিতে:

"শ্রীনগরেই তাঁর (নিবেদিতার) সঙ্গে প্রথম দেখা। স্বামী বিবেকানন্দ যে-ডোঙ্গায় ছিলেন, তার কাছেই একটি হাউসবোটে আমি ছিলাম। আমরা অনেকটা সময়ে একত্র কাটাতাম। কাশ্মীরের মহারাজার গেস্ট হাউসের কাছাকাছি আমাদের বোট বাঁধা ছিল। একটু উজিয়ে, রেসিডেন্সি পেরিয়ে, ঝিলামের উপর একটি বোটে স্বামী বিবেকানন্দের তিন শিষ্যা থাকতেন—নিবেদিতা তাঁদের একজন। এক সকালে পায়চারি সেরে বিবেকানন্দের বোটে উঠে দেখলাম—সেখানে তিন মহিলা উপস্থিত। আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। দেখলাম—নিবেদিতা তরুণীবয়স্কা, খুবই সুদর্শনা, পুরন্ত গড়ন, চড়া রঙ। তাঁর চোখ খুবই উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হলেও তাঁকে পাণ্ডিত্যগর্বী বিদুষী বা মনস্বিনী বলে মনে হয়নি, (অথচ অনেকের কাছে প্রথম দর্শনেই নিবেদিতাকে তাই মনে হয়েছে!!), কিন্তু প্রথম দেখার সিদ্ধান্ত প্রায়শই ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়।

"নৌকার তলা দিয়ে তরঙ্গভঙ্গে বয়ে চলছিল ঝিলাম। প্রভাতের শীতল নির্মল বাতাসের আঘাতে ভাঙা ঢেউয়ের উপরে ফেনার পুঞ্জ। দূরে উঁচুতে তক্ত-ই-সুলেমানের স্তম্ভ। নদীতটে পপ্লার, চিনার—সেইসঙ্গে ফলভারপূর্ণ আপেল ও নাশপাতি বৃক্ষরাজি। বাইরের সৌন্দর্যগরিমায় ভরা প্রকৃতিতে মন রেখে বা না-রেখে আমরা উৎসাহিত কথাবার্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলাম। সিস্টার নিবেদিতার কণ্ঠস্বর সঙ্গীতময়; উদ্দীপ্ত ঐকান্তিকতার সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন। অজস্র বিষয়ে সংবাদ তাঁর চাই। স্বামী বিবেকানন্দ আমার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে হেসে নিবেদিতাকে বললেন, 'ঠিক, ঠিক, ওঁর মস্তিষ্কে খোঁচা মেরে যত সংবাদ পারো আদায় ক'রে নাও; তোমার যা দরকার, সব উনি সরবরাহ করবেন।' বিদায় নেবার সময়ে বয়স্কা মহিলাদের একজন আমাকে পরদিন অপরাহ্ণের চা-পানে আমন্ত্রণ জানালেন।

"চা-পানের পরে তাঁরা চলে গেলে, বিবেকানন্দ সিস্টার নিবেদিতা সম্বন্ধে অনেক কিছু আমাকে বললেন—নিবেদিতার মস্ত মস্ত কাজের কথা, তার বিস্তৃত জ্ঞান ও ভারতবর্ষের প্রতি ব্যাকুল ভালবাসার কথা। তারপর তিনি আমাকে ছোট একটি কাহিনী শোনালেন। তাঁরা সবে কাশ্মীরে তুষাবতীর্থ অমরনাথ দর্শন ক'রে শ্রীনগরে ফিরে এসেছেন। অমরনাথে যাবার সময়ে বিবেকানন্দ অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে হেঁটে গিয়েছিলেন। তরুণ বয়সে পরিব্রাজক জীবনে তিনি ভারতের অনেকখানি অংশ হেঁটে অতিক্রম করেছেন। [তাই হাঁটা তাঁর অভ্যাসের মধ্যে]। সিস্টার নিবেদিতার জন্য কিন্তু ডাণ্ডি ছিল। যখন ভ্রমণের কয়েকটি পর্যায়মাত্র অতিক্রম করেছেন, তখন নিবেদিতা দেখেন যে, যাত্রীদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা আছেন, বড় কষ্টে লাঠি ধরে তিনি ঠুক্-ঠুক্ ক'রে হাঁটছেন। তাই দেখে নিবেদিতা তখনই ডাণ্ডি থেকে নেমে বৃদ্ধাকে তার উপরে তুলে দিলেন—তারপর অমরনাথ গুহা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন এবং গোটা পথ পায়ে হেঁটেই ফিরে এলেন। পরবর্তী কালে এ-সম্বন্ধে যখন আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, তখন নিবেদিতা বলেছিলেন, তাঁর তো দুটি কম্বল ছিল, [তাই পেতে এবং গায়ে দিয়ে] ভূমিতে শুয়েছিলেন। জীবনে অতখানি তৃপ্তি আর কখনো পাননি।"

র আরও কিছু স্মৃতিকথা নগেন্দ্র গুপ্ত বলেছিলেন, সেগুলির সঙ্গে স্বামীজীর

সরাসরি যোগ নেই বলে বাদ দিচ্ছি। এই প্রসঙ্গে গুপ্তের 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' গ্রন্থমধ্যে কথিত আর একটু অংশ উপস্থিত করব:

"যাঁরা স্বচক্ষে না দেখেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন না—আমেরিকান ও ইংরেজ শিষ্যদের উপর স্বামী বিবেকানন্দের কোন্ বিপুল প্রভাব ও আধিপত্য ছিল। আলমোড়ায় ভগিনী নিবেদিতা ও অপর পাশ্চাত্য মহিলাদের রন্ধনাদির জন্য যে সরলস্বভাব মুসলমান পাচকটি ছিল, সে পর্যন্ত ঐ ব্যাপারটি দেখে চমৎকৃত। লাহোরে সে আমাকে বলেছিল, 'স্বামীজীর প্রতি এইসব মেমসাহেবরা যে-ধরনের ভক্তিশ্রদ্ধা দেখান তা আমাদের মুর্শিদদের [ধর্মগুরুদের] প্রতি মুরিদদের [শিষ্যদের] ভক্তির তুলনায় অনেক বেশি। মোটা চামড়ার ভারতীয় জুতো এবং সাদামাটা পোশাকপরা এই ভারতীয় সাধু উপস্থিত হলেই তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যরা—তাঁদের মধ্যে কলকাতায় অবস্থানকারী আমেরিকার কনসাল জেনারেলও ছিলেন—অতিশয় সম্ভ্রমের সঙ্গে উঠে দাঁড়াতেন এবং তিনি কথা শুরু করলে তা শুনতেন গভীরতম মনোযোগ ও সম্ভ্রমের সঙ্গে। তাঁর সামান্যতম ইচ্ছাও আদেশতুল্য জ্ঞান ক'রে তৎক্ষণাৎ পালিত হতো। বিবেকানন্দ কিন্তু সেই একই মানুষ—সহজ, সরল, ভঙ্গিহীন, ঐকান্তিক, ভাবগম্ভীর এবং মহাপ্রাণ।"

আর এক-টুকরো স্মৃতিকথা দিয়ে ১৮৯৮ পর্ব শেষ করব:

"[কাশ্মীর থেকে] কলকাতায় ফেরার পথে বিবেকানন্দ লাহোরে আমার বাড়িতে কয়েকদিন ছিলেন। এই সময় তাঁর মনে মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ববোধ জেগেছিল। নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে তিনি আমাকে বললেন, 'আমি আর তিন বছর বাঁচব। যে-চিন্তা আমাকে কেবল বিচলিত করছে তা হলো—এই সময়ের মধ্যে আমার সকল ভাবকে কাজে রূপ দিয়ে যেতে পারব কিনা?' প্রায় ঠিক তিন বছর পরে তাঁর দেহান্ত হয়।"

॥ পাঁচ ॥

খুবই আক্ষেপের বিষয়, ১৮৯৮ সালের ট্রিবিউন দেখার সুযোগ পাইনি—যে-অবধি নগেন্দ্র গুপ্ত পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। হয়তো স্বামীজী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ স্মৃতিজাত কিছু তাৎপর্যপূর্ণ লেখার নিদর্শন তাতে মিলত।

১৮৯৯ সাল থেকে ট্রিবিউনের বেশ কয়েকটি লেখায় বিবেকানন্দ ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে রীতিমত ঝাঁঝ। এই সময়ে যিনি সম্পাদক, তিনি যদি বাঙালী হনও (কে সম্পাদক জানি না) তবু বিশেষ বিবেকানন্দ-অনুরাগী নন। তাছাড়া পত্রিকার মালিক ব্রাহ্মসমাজী, এবং আর্যসমাজের বিশেষ প্রভাব ঐ অঞ্চলে। এই দুই সমাজীরা বিবেকানন্দকে পথ ছেড়ে দেবেন না। নগেন্দ্র গুপ্ত সম্পাদক থাকাকালে যা করা যায়নি, তাঁর অবর্তমানে ক্ষেত্রবিশেষ তাই করা হলো, বিবেকানন্দ ও বিবেকানন্দপন্থীদের কিছু মতের কঠোর সমালোচনা বেরুল, যাদের মধ্যে ছিল, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে আর্যসমাজের ধারণার স্পষ্ট প্রভাব এবং 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র এক

লেখকের কিছু অসতর্ক মন্তব্যের উপর মাত্রাতিরিক্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আরোপ ক'রে সমালোচনা। তবে বিবেকানন্দ ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে অবিতর্কিত, ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসাযুক্ত, সংবাদও বেরিয়েছে।

যথা, বাংলায় উদ্বোধন পত্রিকার সূচনা, যার মধ্যে ধর্ম থেকে রাজনীতি, এমনকি যন্ত্রশিল্প পর্যন্ত আলোচিত হবার প্রতিশ্রুতি (২৪ জানুয়ারি ১৮৯৯); ইন্ডিয়ান মিরার থেকে রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সংবাদ যাতে কিছু খ্রীস্টান ও মুসলমানও আহার্যগ্রহণ করেছেন (২০ মার্চ ১৯০০); স্বামীজীর ভগ্নস্বাস্থ্য এবং তুরীয়ানন্দ-স্বামী ও নিবেদিতাদি-সহ পাশ্চাত্য যাত্রা-কথা (৮ জুলাই ১৮৯৯); ভারতীয় নারীবিষয়ে নিবেদিতার উক্তি এবং স্বামীজীর 'Angels Unawares' কবিতার মুদ্রণ (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯); অদ্বৈত আশ্রম সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এবং স্বরূপানন্দের আবেদনপত্র প্রকাশ (১২ নভেম্বর, ১৮৯৯); পুনার মরাঠা পত্রিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের সংবাদ (১১ মে ১৮৯৯); কিষেনগড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ (২৬ মে ১৯০০); রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ-সেবার রিপোর্ট, ফেমিন কমিশনার মেজর ডানলপ স্মিথ কর্তৃক মিশনের কাজের প্রশংসা (২৯ মে ১৯০০); প্রবুদ্ধ ভারতে স্বামীজীর সাক্ষাৎকার (১৭ জুন ১৮৯৯); আমেরিকার 'ইউনিটি' পত্রিকায় বিবেকানন্দের উচ্চ প্রশংসা (৫ জুলাই ১৯০০); বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যা, পূর্বাশ্রমে র‍্যাডিক্যাল সমাজতন্ত্রী, মারী লুইস, বর্তমানে স্বামী অভয়ানন্দের ভারতে আগমন, তাঁর আত্মঘোষিত কিছু ইন্টারভিউ-সহ কয়েকটি সংবাদ, (৯ মার্চ ১৮৯৯, ১৬ মার্চ ১৮৯৯) ইত্যাদি। তাছাড়া প্রবুদ্ধ ভারতে আর আরামুথু আয়েঙ্গারের একটি হিন্দুধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল—সেটি ট্রিবিউন পুরোপুরি উৎকলন করেছিল ২৭ জুলাই ১৮৯৯ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধে আয়েঙ্গার বলেন, সারা পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম বিষয়ে আগ্রহের নানা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, ভারতেও সচেতনতা এসেছে। এই জাগরণ একটা বাস্তব ঘটনা। কিন্তু এই উদ্দীপনাকে ঠিকভাবে কর্মে রূপান্তরিত করার পথ গ্রহণ করা হয়নি। লেখক দু-একটি পথের নিশানা দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর মূল আক্ষেপ, জনসাধারণের মধ্যে ঠিকভাবে ধর্মপ্রচার করা হয়নি। হিন্দুধর্ম এখন ইসলাম ও খ্রীস্টধর্ম, এই দুই শক্তিশালী ধর্মের আক্রমণের সম্মুখীন। হিন্দুদের বহিষ্কারনীতি তাদের দুর্বল করেছে এবং তার দ্বারা লাভবান হচ্ছে অপর ধর্মগুলি। কিভাবে কেবল প্রোটেস্টান্ট মিশন হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করেছে তার হিসাব লর্ড নরফোকের বিবরণ থেকে ইনি তুলে ধরেন। এর মধ্যে ক্যাথলিক মিশনের অনুরূপ কার্যাদির বিবরণ নেই। ১৮৫১ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে দেশী পাদরীর সংখ্যা কুড়ি থেকে বেড়ে হয় আটশ, গৃহী এজেন্টদের সংখ্যা পাঁচশ থেকে বেড়ে তিন হাজার পাঁচশ; খ্রীস্টীয় সম্মেলনের সংখ্যা দুশ পঞ্চাশ থেকে বেড়ে পাঁচ হাজার; ধর্মান্তরিতের সংখ্যা সত্তর হাজার থেকে বেড়ে ছয় লক্ষ সত্তর হাজার। এই প্রবন্ধের সূত্রে ট্রিবিউন পত্রিকার ৫ অক্টোবর ১৮৯৯ সংখ্যায় ইংল্যান্ড থেকে বিমলচন্দ্র ঘোষ এক দীর্ঘ সমর্থক প্রবন্ধ লিখে পাঠালেন। সাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে তিনি জোর দিলেন কথকতার উপরে, তারপরে দরকার ল্যান্টার্ন লেকচার। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপন, প্রচার ফান্ড তৈরি ক'রে চতুর্দিকে প্রচারক প্রেরণের ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হোক। এসব কাজে বাধাগুলির বিষয়ে আলোচনাও তিনি করেছিলেন। আর্যসমাজী,

ব্রাহ্মসমাজী ও মুসলমানদের দলে টেনে কাজ করতে হবে—এমন বহুতর উপদেশ-নির্দেশ তিনি দুর ইংল্যান্ডে বসে ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে দান করেছিলেন।

ট্রিবিউনের তৎকালীন সম্পাদক ১৯০০ সালে একেবারে ছুরি শানিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন প্রবুদ্ধ ভারতের জনৈক সন্ন্যাসী লেখকের উপর—পরোক্ষে তা অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দের উপর আঘাত। মনের সমস্ত জ্বালা ঢেলে দিয়েছিলেন তিনি একাধিক লেখায়।

প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত 'পঁয়ত্রিশ বৎসর পরিব্রাজকের' একটি রচনার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গসহ প্রতিবাদ করা হয় ট্রিবিউনে ১৭ জুলাই ১৯০০-র সম্পাদকীয়, *Rubbing Oil on the Annointed Head* এবং ৩১ জুলাই-এর সম্পাদকীয়, *Latter-day Sannyasins*-এর মধ্যে। ১৭ জুলাইয়ের সম্পাদকীয়তে পূর্বোক্ত 'পরিব্রাজকের' বক্তব্য নিজের মতো ক'রে তুলে ধরা হয়। গোড়াতেই ছিল শ্লেষাত্মক আক্রমণ—'সারভাইভ্যাল অব দি ফিটেস্ট' থিয়োরির প্রসঙ্গ এনে। উক্ত থিয়োরিতে শক্তিমান কর্তৃক দুর্বলকে পীড়নের সাফাই ছিল। (স্বামীজী তাঁর মাদ্রাজ বক্তৃতাবলীতে আরও তীব্র ভাষায় এই থিয়োরিকে আক্রমণ করেছেন)। দুর্বল একমাত্র করুণার সাহায্যটুকু নিয়ে বেঁচে থাকে। সেই পটভূমিকায়, ট্রিবিউন-সম্পাদক তিক্তভাষায় লিখলেন: "যাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে সংসারত্যাগ করেছেন, দারিদ্র্য ও আত্মত্যাগের ব্রত নিয়েছেন—তাঁদেরও মধ্যে কখনো-কখনো দেখা যাচ্ছে দুর্বল ও দরিদ্রদের বঞ্চিত ক'রে শক্তিমানের সেবা করার প্রয়াস!" এহেন ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণের কারণ, প্রবুদ্ধ ভারতে উক্ত 'পরিব্রাজক'-লেখক পাশ্চাত্যের ধর্মপ্রাণ মানুষদের আহ্বান করেছিলেন কুমায়ুন পাহাড়ে অবস্থান ক'রে বেদান্তচর্চা করতে—আর যদি তেমন ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ধনী না হন তাহলে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁরা কুমায়ুনের সস্তা জমিতে কৃষিকাজ করতে পারবেন। পরিব্রাজকের এই আমন্ত্রণ প্রথম বেরিয়েছিল উদ্বোধন পত্রিকায়। সেখানে তিনি বলেন, সেইসব পাশ্চাত্যবাসী ভারতে আসুন, যাঁদের বাড়ির আবহাওয়া অনুকূল নয়, আয় সীমাবদ্ধ। তাঁরা কুমায়ুনে চমৎকার আবহাওয়া পাবেন, জিনিসের দরদাম কম, জমি সস্তা, শ্রম সস্তা, চাষবাসের সহজ সুযোগ আছে, উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ ক'রে অধিক ফলন ঘটাতে পারবেন, স্থানীয় মানুষেরা সেই প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করতে পারবে ইত্যাদি। ট্রিবিউন-সম্পাদক পরিব্রাজকের এই প্রস্তাবের মধ্যে বিপজ্জনক রাজনৈতিক গন্ধ শুঁকলেন। তিনি বললেন, পাশ্চাত্যবাসী তো সারা পৃথিবী শোষণ করছেন, ভারতের সেরা জিনিসগুলি তাঁদের আহার্য, তাঁরা এখানকার শিল্পবাণিজ্য খেয়ে ফেলেছেন, আর এঁদের জন্যই কিনা হিমালয়বাসী তপস্বীদের করুণা!! আসলে এ তো ভারতীয়দের জমি কেড়ে নেওয়ার প্ররোচনা। একবার যদি ওঁরা হাজির হন তাহলে এখানকার কৃষকদের কী অবস্থা দাঁড়াবে, তা কি মাথায় এসেছে?

ট্রিবিউন ৩১ জুলাই, সম্পাদকীয়ের মধ্যে প্রবুদ্ধ ভারতের পক্ষ থেকে পাঠানো 'জনৈক সন্ন্যাসী'র 'উত্তেজিত' উত্তর প্রকাশ করল। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, ট্রিবিউন পত্রিকায় আগেকার মতো ধীরতা নেই। (এখানে সম্পাদক বদলের স্পষ্ট ইঙ্গিত)। ট্রিবিউনে যেভাবে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে তা কেবল ভুল নয়, অভিসন্ধিপূর্ণ। সম্পাদক ভালো ক'রে উদ্বোধনের দুটি প্রবন্ধ পড়েন নি—তাদের মধ্যে কেবল ভারতীয়দের কুমায়ুনে বসতি করতে বলা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত 'পরিব্রাজকের' বক্তব্যের অংশমাত্র ট্রিবিউনে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বর্জিত অংশে আছে—দরিদ্র ভারতীয় ভ্রাতৃগণের উপকারের

জন্যই কিছু পাশ্চাত্যবাসীকে আসতে বলা হয়েছিল। পার্বত্য অঞ্চলে উপযুক্ত শিক্ষা নেই, তাই সেখানে জীবনসংগ্রামে নামবার মতো শিক্ষা চাই—শিল্পবিজ্ঞানের শিক্ষা—সেই শিক্ষা বিস্তারের কাজে পাশ্চাত্যের ভারতপ্রেমিক মানুষরা নামতে পারবেন। (ধরা যাক, যে-কাজ করেছিলেন পরবর্তী কালে শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রানুরাগী এলমহার্স্ট)। পরিব্রাজক আরও বলেছিলেন, কেবল সেইসব পাশ্চাত্যবাসী আসুন, যাঁরা দৈনন্দিন জীবনের ঘানিটানায় ক্লান্ত, সংসারের বন্ধন ছিন্ন করতে চান, অধিকন্তু স্বামীজীর শিক্ষাগ্রহণের দুর্লভ সুযোগ তাঁরা পাবেন, নিজেদের প্রস্তুত করবেন ত্যাগের জন্য—তাঁদেরই জন্য অদ্বৈত আশ্রম। 'পরিব্রাজক' আশ্বাস দিয়ে বললেন, সন্ন্যাসীরা দেশকে কম ভালবাসেন না।

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী কিন্তু তাঁর রচনার শেষে একটি অংশে ট্রিবিউন-সম্পাদকের হাতে মারাত্মক অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন এবং সে-কাজ তিনি নিজের অজান্তে করেছেন—সাংবাদিকতা নামক ব্যাপারটায় কত কৌশলী চোরাগলি থাকে তা তাঁর জানা ছিলনা। তিনি লেখেন, আমরা ঠিক কোন্ উদ্দেশ্যে ঐ ধরনের লেখা লিখেছি, তা সম্পাদক আমাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে জেনে নিতে পারতেন, তাহলে তো এত তর্কবিতর্কের প্রয়োজন হতো না! এ-ই তো! ট্রিবিউন-সম্পাদক সুযোগ পেয়ে গেলেন। মূল বিষয় ছেড়ে দিয়ে তিনি ঐ শেষের কথাগুলি নিয়ে পড়লেন। বললেন, এমন অদ্ভুত কথা তো শুনিনি কখনো—যেখানে প্রবুদ্ধ ভারতে ওঁরা প্রকাশ্য রচনায় নিজ বক্তব্য বলছেন সেখানে ট্রিবিউন-সম্পাদক তাঁদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে জেনে নেবেন আসল কথাটি কি!! দুমদাম্ ক'রে এই ধরনের লেখার ব্যাপারে সন্ন্যাসীদের সাবধান হওয়া উচিত। প্রবুদ্ধ ভারতে বলা হয়েছিল, গোটা পরিকল্পনা ভালভাবে লেখা হয়েছে বাংলা উদ্বোধন পত্রিকায়। ট্রিবিউন-সম্পাদক চাঁচা-ছোলা ভাষায় জানালেন, অন্যত্র ওঁরা কি লিখেছেন, তা জানার দায় আমাদের নেই—এখানে কী লিখেছেন সেটাই বিবেচ্য। আর সেটা পাশ্চাত্যের লোককে হিমালয়ে কলোনি করতে প্রলুব্ধ করা ছাড়া আর কিছু নয়। 'পঁয়ত্রিশ বৎসরের পরিব্রাজকের' প্রাণ কাঁদছে পাশ্চাত্যের দরিদ্র মানুষদের জন্য—তার ফলে যে, দরিদ্রতম ভারতবাসীর জীবন অধিকতর কষ্টকর হবে, এমনকি, তাদের উৎখাত হবার সম্ভাবনা, তা তাঁর খেয়াল নেই। তাছাড়া, প্রশান্ত হিমালয়ের উপরে বসবাসকারী সন্ন্যাসীরা মাথা গরম ক'রে প্রবন্ধ লিখবেন, এটা বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁরা বড় বেশি সাংসারিক ব্যাপারে জড়াচ্ছেন। তাঁরা ত্যাগব্রত নিয়ে সেবাকাজে লিপ্ত থাকুন, কিন্তু দরিদ্র পাহাড়ী মানুষের মুখের অন্ন কাড়বার ব্যবস্থা যেন না করেন। আর যদি কলোনি গড়ে ওঠে, তাহলে সাধুদের 'তত্ত্বমসি', 'ওঁ তৎ সৎ', কি ক'রে চলবে? সম্পাদক তৃপ্তিভরে রচনা শেষ ক'রে বললেন, আমরা গোঁড়া মানুষ নই, তাহলেও হিমালয়ের প্রতি ভারতবর্ষের বহুযুগের শ্রদ্ধার কথা জানি, তাই সেখানে পাশ্চাত্যবাসীদের স্বার্থের জন্য লণ্ডভণ্ড কাণ্ডকে সমর্থন করতে পারি না।

প্রবুদ্ধ ভারতের কর্তৃপক্ষ ঝানু সাংবাদিক ছিলেন না, তাঁদের লেখায় অসতর্কতা ছিল, তথাপি এই সংক্রান্ত তাঁদের রচনার ভিতরকার উদার আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য এবং ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কল্যাণেচ্ছার কথা বুঝতে অপরাপর পত্র-পত্রিকার অসুবিধা হয়নি, অথচ ট্রিবিউন ঐ প্রকার নিষ্ঠুর আক্রমণ ক'রে বসল! বুঝতে অসুবিধা হয়না, তাঁরা সুযোগ খুঁজছিলেন।

আক্রমণ অব্যাহত রইল। এবার সরাসরি বিবেকানন্দের বক্তব্যকে আক্রমণ। স্বামীজীর

বাংলা রচনা 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে কিছু কিছু ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল, তার একাংশে ছিল মাংসাহারের ঔচিত্যপ্রসঙ্গ। এরই সূত্রে ট্রিবিউনের ১ অগস্ট, ১৯০১ সংখ্যার সমালোচনামূলক সম্পাদকীয় *Animal vs Vegetable Diet*। আমিষাহার সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য তখন (এখনও) সুপরিচিত এবং সেজন্য তিনি নানা মহলে ধারাবাহিকভাবে নিন্দিত। স্বামীজী তাতে পরোয়া করেন নি। তিনি স্বয়ং আমিষাহারী, সেকথা কখনও গোপন করেন নি। বরং মাঝে মাঝে উস্কানি দেবার জন্য আগ বাড়িয়ে তা জানিয়ে দিয়েছেন। পরিব্রাজক-জীবনে এর জন্য তাঁকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে, এবং বিখ্যাত হয়ে ভারতে ফেরার পরেও সে-প্রশ্ন থামেনি। রক্ষণশীলেরা এই সূত্রে তাঁর বিশেষ দোষদর্শন করেছেন, প্রগতিশীলেরাও পিছিয়ে থাকেন নি। তাঁর দেহান্তের পরে বালগঙ্গাধর তিলক যখন কেশরী পত্রিকায় তাঁর ভূমিকার সঙ্গে শঙ্করাচার্যের ভূমিকার তুলনা ক'রে তাঁকে দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য বলেছিলেন, তখন পুনার সমাজসংস্কারকদের শীর্ষ-পত্রিকা 'সুধাকর' বলেছিল—ছোঃ, একজন মাংসাহারী কিনা শঙ্করাচার্য!! অন্য সংস্কারপন্থী পত্রিকারও একই দৃষ্টিভঙ্গি। পঞ্জাবের আর্যসমাজীরাও এই প্রশ্নে স্বামীজীর মত খণ্ডনের চেষ্টা করল। স্বামীজী অবশ্য নির্বিচারে আমিষাহার সমর্থন করেন নি। তিনি বলেছিলেন—পরিবেশ, জাতি, বৃত্তি ও ব্যক্তিভেদে খাদ্যরূপ নির্ধারিত হয়। সেই কথায় ট্রিবিউনের আপত্তি ছিলনা। আপত্তি জানাল, স্বামীজী যখন বললেন, ভারতের সাধারণ মানুষের পক্ষে মাংসাহার অত্যাবশ্যক কারণ তারা নিছক নিরামিষ ভোজনের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ছে, জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে গেলে তাদের উপযোগী খাদ্য গ্রহণ করতে হবে, বিদেশে বলবান জাতি মাংসাহারী, ভারতের সাধারণ মানুষকে যদি তাদের সঙ্গে লড়াই ক'রে এগোতে হয় তাহলে শরীরে বলসঞ্চারের জন্য মাংসাহার করা প্রয়োজন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, সমাজে যতদিন দুর্বলের উপর বলবান জয়ী হতে থাকবে, ততদিন দুর্বলকে মাংসাহার ক'রে যেতে হবে, যাতে সে পদতলে পিষ্ট না-হয়। এসব কথায় ঘোর আপত্তি জানালেন ট্রিবিউন-সম্পাদক। নিরামিষ না আমিষ—কোন্ আহার উচিত এ নিয়ে তর্কবিতর্ক আরও পূর্ব সময় থেকে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সর্বত্র চলে আসছে। ট্রিবিউন-সম্পাদক নিরামিষ আহারের পক্ষে যেসব যুক্তি সাজালেন, সেগুলি ঐ তর্কধারা থেকেই গৃহীত এবং এই ধরনের লেখায় কোনই আপত্তি করা যায়না, কেননা মত থাকলেই মতভেদ থাকবে এবং তা ব্যক্ত করাও হবে। আপত্তি মুরুব্বিয়ানায়। ট্রিবিউন-সম্পাদক ধর্মনেতা বিবেকানন্দকে ঐ লেখায় কিঞ্চিৎ ধর্মশিক্ষা দিয়েছিলেন: "ধর্মপ্রচারক এমন জীবনচর্যা ও চিন্তাপ্রকৃতির পক্ষে প্রচার করবেন যাতে বস্তুর উপর আত্মার বিজয় ঘোষিত হয়। তাঁর কাছে তাই প্রত্যাশিত। মানুষের পশুসত্তার উপরে দিব্যসত্তার আধিপত্য স্থাপনের কথাই তো তিনি বলবেন। পৃথিবীর সকল ধর্মই ঐ উদ্দেশ্যমুখী। মানুষের মধ্যে নিম্নতর পশুভাব ও পার্থিবতা যেমন আছে, তেমনই আছে আধ্যাত্মিকতার উর্ধ্বতর জীবন—আর ধর্মীয় পুরুষের কাজ হলো, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে শেষোক্ত ভাবের বৃদ্ধিতে সাহায্য করা। স্বামী বিবেকানন্দ তো নিজেই স্বীকার করেছেন, 'মাংসাহার বর্বরতা' এবং যাঁরা নিছক আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতে চান তাঁদের পক্ষে নিরামিষ আহারই উপযোগী। যে অবস্থার প্রকোপে শক্তিশালী দুর্বলের উপরে জয়ী হয় সেই সেই অবস্থা কোনো ত্যাগধর্মী সাধু বা সন্ন্যাসীর কাম্য হওয়া উচিত নয়।"

বিবেকানন্দের ভাগ্য, রাজনৈতিক পত্রিকা ট্রিবিউনের দ্বারা তিনি ধর্মব্যাপারে উপদিষ্ট

হলেন! তথাপি তাঁর চৈতন্যোদয় হয়েছিল কিনা সন্দেহ। তাঁর পক্ষে কি পুনশ্চ হিন্দী দোহাটি শোনানোর দরকার হয়ে পড়েছিল, যার মধ্যে আছে—গরু ঘাসপাতা খায় তবু গরুই থাকে, বাঁদর ফল-পাকড় খায় তবু বাঁদরই থাকে—কিংবা শিষ্যদের যেকথা তিনি বলতেন—'তোরা খুব ক'রে মাংস খাবি, পাপ যদি হয় সে আমার হবে।' হিংসা-অহিংসা প্রশ্নে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে তো তিনি বৌদ্ধ ও জৈনদের অহিংসার চর্চায় ভারতের কোন্ সর্বনাশ হয়েছে, তা বলার পরে, শ্রীকৃষ্ণের সমন্বিত জীবনাদর্শ গৃহী মানুষের পক্ষে গ্রাহ্য বলে নির্দেশ করেছিলেন। (স্মর্তব্য, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমিষাহারী ছিলেন)। বস্তুতপক্ষে আধুনিক ভারতে বিবেকানন্দের প্রফেট ভূমিকা অনুধাবনে ভ্রান্তিই ঐসব সমালোচনার মূলে। তিনি জাতীয় জীবনের সর্বাত্মক পুষ্টি চেয়েছেন। মানবসংসারে আধ্যাত্মিক জীবনের মতো দেহজীবনও রয়েছে। সাধারণ মানুষ দৈহিক শক্তি বিকাশের দ্বারা যতদিন-না অধিকারভোগী শক্তিমানের সমস্তরে ওঠে, ততদিন ভারতের মুক্তি নেই—এই বিশ্বাস থেকেই স্বামীজী মাংসাহার সমর্থন করতেন। সেকথা জানবার ও মানবার মতো ব্যাপক দৃষ্টি ছিলনা তৎকালীন ট্রিবিউন-সম্পাদকের, যিনি স্বামীজীকে প্রচলিত ধারার একজন ধর্মপ্রচারকের ভূমিকাতেই দেখতে চেয়েছিলেন।

॥ ছয় ॥

এই লেখার এক বৎসরের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের দেহান্ত হয়। ১০ জুলাই ১৯০২ তারিখের সম্পাদকীয়তে ট্রিবিউন পত্রিকা স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্র ও কীর্তির মূল্যায়নের যে চেষ্টা করেছিল স্বীকার করতে হবে তা তা বহুলাংশে যথাযথ। ভারতীয় ইতিহাসে বিবেকানন্দের ভূমিকার উপযুক্ত স্বীকৃতি তার মধ্যে আছে। আবার তার একাংশে সীমাবদ্ধ দৃষ্টির অসম্পূর্ণতাও দেখা যায়। প্রথমোক্ত রূপটি আগে উপস্থিত করি:

> "দার্শনিক হিন্দুধর্মের প্রচারক এই ইংরেজী-শিক্ষিত তরুণ ভারতীয় নিজ ব্যক্তিত্বের প্রবল শক্তিতে অপরিচয়ের অন্ধকার জগৎ থেকে এক ঝটকায় খ্যাতির শিখরে উত্থিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা তাঁর পূর্বপুরুষদের বহুলাঞ্ছিত ধর্মবিশ্বাসকে পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল মানুষদের ধারণালোকে সমুচ্চস্থানে স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল।...সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে তিনি যা সম্পন্ন করেছেন তা মোটেই সামান্য নয়। অন্য যে কোনো পণ্ডিত অথবা ধর্মপ্রচারক অপেক্ষা তিনি পাশ্চাত্যের মানুষদের কাছে দার্শনিক হিন্দুধর্মের অপূর্ব ও সুনিশ্চিত প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হয়ে, তাকে সশ্রদ্ধ মনোযোগ ও সতর্ক অনুশীলনের বস্তু প্রতিপন্ন করেছেন। আর স্বদেশে তাঁর প্রতিভা, তাঁর পূজনীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বশেষ অবতাররূপে কেন্দ্রে রেখে, নির্দিষ্ট মত ও পন্থার প্রবর্তন ঘটিয়েছে, সৃষ্টি করেছে বাস্তব লোকসেবার আন্দোলন, যা স্মরণ করিয়ে দেয় অতীতের মহান সন্ন্যাসীদের কথা, যাঁরা মানবসেবার মন্ত্র প্রচার করতেন ও জীবনে তার রূপায়ণ ঘটাতেন। ভারতে রামকৃষ্ণ মিশন এখন সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান, যাঁর সদস্যরা দুর্ভিক্ষ ও প্লেগাক্রান্ত স্থানে উপস্থিত হয়ে ধীরস্থিরভাবে দুঃখী দুর্গতদের সেবা ক'রে যাচ্ছেন। স্বামীজী বেলুড়, মায়াবতী ও অন্য

কয়েকটি স্থানে মঠ স্থাপন করেছেন, যেসব জায়গায় সংসারত্যাগী শিক্ষিত মানুষেরা তাঁদের আচার্যের দ্বারা প্রবর্তিত মানবসাধারণের সেবার কাজে এবং শ্রীগুরু রামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির চর্চায় নিয়োজিত। বিবেকানন্দের প্রতিভাই আধুনিক কালে সন্ন্যাসধর্মকে নূতন এবং অনন্য আকার দিতে সমর্থ হয়েছে—অবশ্য তাঁর পূজনীয় গুরুর অধ্যাত্মভাবরাজি এর পিছনে উদ্দীপক শক্তিরূপে বর্তমান ছিল। রামকৃষ্ণ—অসাধারণ, তাঁর বাণীর জন্য, যা বাংলা ভাষায় নূতন প্রবচনের সৃষ্টি করেছে; বিবেকানন্দ—অসাধারণ, কর্মশক্তি ও সংগঠনী শক্তির জন্য। আর কর্মবীরদের যেমন পৃথিবীর সংস্রবে আসার ফলে দ্বন্দ্বসংঘাতে পড়তে হয়, তেমনই বিবেকানন্দের ভাগে যদিও তা পুরোপুরি জোটেনি, যদিও গতানুগতিক বিচারে তাঁর ইতস্তত ত্রুটি ধরা পড়বে কিন্তু তাঁর কঠিনতম সমালোচকও অস্বীকার করতে পারবেন না যে, বিবেকানন্দ এক অসাধারণ পুরুষ—এক মহাবীর চরিত্র—যাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কর্মশক্তি আত্মস্বার্থে নয়—নিয়োজিত ছিল পতিত দেশবাসীর উন্নয়নে।"

বিবেকানন্দের কীর্তি যখন কেবল তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত, তাঁর প্রবর্তিত আন্দোলনের যখন একেবারে শৈশবাবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সন্দেহের অধীন, যখন তিনি নানা সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের শরলক্ষ্য, তখন পঞ্জাবের একটি কাগজের এই ভারসাম্যযুক্ত রচনার প্রশংসাই করতে হয়। অসুস্থ বিবেকানন্দ যখন নিজেকে বহির্জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে, পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত মনুষ্যসৃষ্টিতে একান্তে নিয়োজিত এবং সেই নীরবতার কারণে শত্রুদল উল্লসিত হয়ে ভাবছে, ইতিহাস তাঁর উপরে চিরসমাপনের দাঁড়ি টেনে দিয়েছে—ঠিক তখনই ঘটল তাঁর মৃত্যু। "আচার্য যখন শিষ্যবৃন্দের মধ্য থেকে বিদায় নিলেন—[নিবেদিতা লিখেছেন]—শ্মশানের অগ্নিশিখার সামনে সমালোচকের গুঞ্জন যখন স্তব্ধ হয়ে গেল, তখন শোনা গেল স্বাধীনতার বিশাল কণ্ঠ অব্যাহত মহিমায় নিনাদিত—আর সারা জাতি সাড়া দিল একস্বরে।"

যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ট্রিবিউন-সম্পাদক ছিলেন। কে তিনি? অবশ্যই নগেন্দ্র গুপ্ত নন। লেখার মধ্যে কিন্তু নগেন্দ্র গুপ্তের ভঙ্গি অনেকটা আছে। তবে কি তিনি লেখাটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং তা পরিবর্তিত ক'রে বা না-ক'রে সম্পাদকীয় রচনা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল? এ-কথায় সায় দেবার বিরুদ্ধে আছে স্বামীজী সম্পর্কে নগেন্দ্র গুপ্তের পরবর্তী রচনাদি। ট্রিবিউনের শোক-সম্পাদকীয়ের যে-অংশ উদ্ধৃত করিনি, তার প্রতিটি অংশের প্রতিবাদ ঐসব লেখায় নগেন্দ্র গুপ্ত করেছেন। সে-কথায় আসার আগে বাদ-দেওয়া অংশ হাজির করা যাক:

"নিন্দুকরা তাঁর চরিত্র ও শিক্ষার ত্রুটি সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন।...জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যাপকতর হলে—গভীরতর আধ্যাত্মিকতায় অবগাহন করতে পারলে—তিনি দেশবাসীকে ধর্মীয় ও সামাজিক মুমূর্ষু অবস্থা থেকে উত্তোলনের ব্যাপারে অঘটন ঘটাতে পারতেন। তাঁর জীবন দীর্ঘায়িত হলে তা ঘটতে পারত। কিন্তু অতীব সম্ভাবনাময় এই জীবনে অকালে ছেদ ঘটল—পুরো জ্বলে ওঠার আগেই নিভে গেল দীপ।"

এ ছাড়া পূর্বের উদ্ধৃত অংশে পেয়েছি, "গতানুগতিক বিচারে তাঁর ইতস্তত ত্রুটি ধরা পড়বে।"

প্রথমেই বলে নেওয়া যাক, ১৯০০-১৯০১ সাল পর্যন্ত সময়ে ট্রিবিউন-পত্রিকা বিবেকানন্দ ও তাঁর কর্মনীতির অন্যতম নিন্দুক সমালোচক। 'প্রবুদ্ধ ভারতে' প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং স্বামীজীর মাংসাহার বিষয়ক বক্তব্য সম্বন্ধে সাধারণ প্রতিবাদের অতিরিক্ত প্রচুর অযথা কটু কথা ট্রিবিউন-সম্পাদকই লিখেছেন, যা বাদ-প্রতিবাদের স্বীকৃত ভদ্রসীমাকে অতিক্রম করেছিল।

স্বামীজীর স্বভাব ও শিক্ষা সম্বন্ধে নিন্দার উল্লেখ সম্পাদক করেছেন। মনে হয় ট্রিবিউনের লেখার এই অংশ সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হয়ে নগেন্দ্র গুপ্ত পরবর্তী কালে উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। নিন্দুকদের একজন—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। তিনি আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতবর্ষের এক 'ভ্যাগাবন্ড' বলে প্রচার করেছিলেন। সমসাময়িক নগেন্দ্র গুপ্ত সে কথা জানতেন। সেই সূত্রে তিনি লিখেছেন:

"অভিযোগ ক'রে বলা হয়েছিল, বিবেকানন্দ ভারতে ভ্যাগাবণ্ড পার্টির অন্তর্ভুক্ত। ভ্যাগাবণ্ড শব্দটিকে অনিকেত পরিব্রাজক ধরে নিলে সেই কথা অনন্তকালের বক্ষে ক্লান্তিহীন পরিক্রমণরত জ্যোতির্ময় চরিত্রগুলির সম্বন্ধে সত্য। আর, মানবসমাজের মধ্যে যাঁরা অবতারপুরুষরূপে লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বারা স্বীকৃত ও পূজিত—তাঁরাও ভ্যাগাবণ্ড। কী বলব সেই মানুষটির সম্বন্ধে যিনি নিজ রাজ্যপাটকে হেলায় সরিয়ে দিয়ে ভিক্ষাপাত্র তুলে নিয়েছিলেন এবং বরণ করেছিলেন ভ্যাগাবণ্ডের ভ্রাম্যমান জীবন? অন্য একজনকেই বা কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যাবে, সেই মহান মানবপুত্রকে, যিনি বলেছিলেন, শৃগাল তার বাসের জন্য গর্তের আশ্রয় পায়, পাখির আছে নীড়, কিন্তু মানবপুত্রের নেই মাথাগোঁজার ঠাঁই! আমাদের এই ভারতীয় সন্ন্যাসীটির [বিবেকানন্দের] নাম বুদ্ধ খ্রীস্টের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষ তাই করেছিল। ইংরেজদের ধারণা—আমেরিকানরা নিরেট ব্যবসায়ী হলেও তাদের স্বভাবে রয়েছে মিস্টিক ভাবের ছোঁয়া, তাই তারা সহজেই বিবেকানন্দের প্রভাবে ধরা পড়েছে। কিন্তু তারপর বিবেকানন্দ যখন অ্যাটলান্টিক পার হয়ে ইংল্যান্ডে উপস্থিত হলেন তখন তার ফল কিন্তু কম আশ্চর্যজনক হলো না। 'লন্ডন ডেইলি ক্রনিক্‌ল' পত্রিকায় লেখা হলো—বিবেকানন্দের মুখাবয়বের সঙ্গে বুদ্ধের ক্লাসিক মুখের অদ্ভুত সাদৃশ্য। পরবর্তী কালে এক ইংরেজ মহিলা, সিস্টার নিবেদিতা, লিখেছিলেন—আত্মমগ্ন অবস্থায় অথবা ধ্যানকালে ঐ হিন্দুসন্ন্যাসীর মুখচ্ছবিতে যে-কোমলতা ও মহিমার মিশ্রণ দেখা যেত, তার অনুরূপ এঁকেছেন [রাফায়েল] সিস্টিন চাইল্ডের [শিশু যীশুর] ললাট ফলকে।"

এই সূত্র ধরেই নগেন্দ্র গুপ্ত খানিক জায়গা নিয়ে ব্যাখ্যাসহ জানালেন, বুদ্ধ বা খ্রীস্টের সমকালীন কোনো প্রতিমূর্তি নেই, তাঁদের সম্বন্ধে যে সহস্র সহস্র চিত্র বা মূর্তি তৈরি করা হয়েছে সেসব অনেক পরবর্তী কালের। তাঁদের আকারের সমকালীন বর্ণনা পর্যন্ত নেই। তাই তাঁদের মূর্তি আদর্শায়িত রচনা—সেসব হলো 'আর্য ও সেমিটিক দেহাবয়বের সুন্দরতম আদর্শ রূপ'। অপরপক্ষে বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষদৃষ্ট চেহারা—নগেন্দ্র গুপ্ত বোঝাতে চাইলেন—ঐসকল আদর্শ রূপের তুল্য। সেই আদর্শ দেহবিগ্রহের আধারে ধৃত ছিল কোন্ চরিত্র এবং তা বাঙ্ময় হয়েছিল কিভাবে, সে-প্রসঙ্গও নগেন্দ্র গুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন:

"যদি বলি, তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যে শ্রোতারা প্রভাবিত হয়েছিল, তাহলে অধিকন্তু বলতে হবে, তারা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছিল তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে। তাঁরা তখন কোনো প্রাচ্য-স্বাপ্নিক, বাস্তববোধহীন মিস্টিককে দেখছিলেন না—তাঁরা দেখছিলেন সেই পুরুষপ্রবরকে যিনি পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে অতীব সজাগ, যাঁর নখাগ্র পর্যন্ত প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত, যিনি অতি বিচক্ষণ পর্যবেক্ষক ও নির্ভীক সমালোচক।"

শিক্ষাদাতা বিবেকানন্দের চেহারা এই। একেও ছাপিয়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ-জ্বলিত বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব:

"বিবেকানন্দের প্রদত্ত শিক্ষা অপেক্ষা প্রবলতর ও প্রভাবশালী ছিল তাঁর বিরল ব্যক্তিত্ব—তা প্রাণদ্যুতিময়, গতিশীল, চৌম্বকধর্মী, অপরিচিত-প্রকৃতি, প্রচণ্ড শক্তিশালী, উদ্দীপক এবং অনিবার্যবেগে আকর্ষক।"

ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের আবির্ভাব সম্বন্ধে মাতোয়ারা বর্ণনাগুলি যখন আমেরিকা থেকে এসে ভারতে উপস্থিত হয়েছিল, তখন নগেন্দ্র গুপ্ত ট্রিবিউনের সম্পাদকীয় ডেস্কের সামনে আসীন। তারপরে তিনি লাহোরে, কাশ্মীরে, সেই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ দেখেছেন। তাই তাঁর সাহিত্যিকের লেখনী আনন্দিত রেখায় ফোটাতে চেয়েছে সেই আবির্ভাবের 'শ্বাসরোধী রোমান্সের' পর্বটিকে:

"যখন শেষ পর্যন্ত তিনি [ধর্মমহাসভায়] ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়ালেন, তখন প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশার তীব্র মুহূর্ত। সকল দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মঞ্চে দণ্ডায়মান একটি জ্যোতির্ময় দৃশ্যের উপর—সেখানে অনবদ্য পৌরুষের অসাধারণ রূপময় এক মূর্তি—তাঁর অঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সন্ন্যাসীর কমলা রঙের উজ্জ্বল-মসৃণ লম্বিত পোশাক। তাঁর সুবৃহৎ অত্যুজ্জ্বল দুই আঁখির চাহনি যখন বিপুল দর্শকশ্রেণীর উপর দিয়ে সঞ্চরণ ক'রে যেতে লাগল, তখন সূক্ষ্ম চৌম্বকশক্তির তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে এবং শ্রোতৃবৃন্দ রোমাঞ্চিত হলো কোনও এক অজ্ঞাত আবেগের শিহরনে। তারপর উচ্চারিত হলো সহজ ও নিবিড় সম্বোধন—'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ'—আর তাইতেই ঘটল সম্মোহনের চূড়ান্ত—সভাগৃহে আছড়ে-আছড়ে পাক খেতে লাগল করতালির শব্দতরঙ্গ।"

পরমাশ্চর্য বিবেকানন্দকে 'ভ্যাগাবন্ড' বলার স্পর্ধা নগেন্দ্র গুপ্তের কাছে সহ্যাতীত। তিনি পুনশ্চ লিখলেন:

"শঙ্খধ্বনির মতো তাঁর কণ্ঠস্বর যখন বেজে উঠেছিল, তখন ধর্মমহাসভার নাড়ির গতি দ্রুততর—উজ্জ্বলতর তখন মনস্বীদের চক্ষু। কারণ তাঁর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে গহন স্বর, যা দীর্ঘদিন নীরব থাকলেও নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। এখন তা ঝঙ্কারিত নবজীবনের মন্ত্রগানে। সেই বিদ্বজ্জনদের সমাবেশে এই তরুণ সন্ন্যাসী অপেক্ষা উচ্চতর পরিচয়পত্র কার ছিল—ঐ যাঁর বীর্যঘোষিত উন্নত আকার, অসাধারণ সৌন্দর্যময় মুখ,

জ্বলন্ত চক্ষু, মন্দ্রিত ভরাট কণ্ঠস্বর?...তাঁর ভিতরে যে-আগুন জ্বলছিল, প্রতি পদক্ষেপে তাই যেন ঝলকে ঝলকে বিচ্ছুরিত হয়ে সমবেত মানুষদের হতচেতন ক'রে ফেলেছিল অপরিসীম বিস্ময়ে।"

নগেন্দ্র গুপ্ত শেষ ক'রে আনলেন:

"এশিয়ার মাতৃহস্ত চিরদিনই প্রজ্ঞাপুত্রদের শৈশবের দোলনা দুলিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ—পাশ্চাত্যের প্রতি প্রাচ্যের চ্যালেঞ্জ—পৃথিবীর শিক্ষক হবার পক্ষে প্রাচ্যের প্রাচীন অধিকারের পুনর্ঘোষণা। সুদূর পাশ্চাত্যে তিনি গিয়েছিলেন নামহারা অজ্ঞাতপরিচয় এক মানুষ হিসাবে, তারপর তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আধুনিককালের সর্বোত্তম প্রামাণ্য আচার্যদের অন্যতম।...ভারতের প্রাচীন আর্য ঋষিগণের সকল বিদ্যা ও প্রজ্ঞা আয়ত্ত করেও তিনি একেবারে আধুনিক। তিনি সেই মানুষ যিনি সমকালীন পৃথিবীতে নতুন আকারে ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহকে বিশাল সহানুভূতির দ্বারা পরীক্ষা ক'রে, প্রয়োজন মতো তাদের সমাদর করতে প্রস্তুত ছিলেন।"

এই সমস্ত কথার পরে নগেন্দ্র গুপ্তের প্রশ্ন—"এই তরুণ পরিব্রাজক তাহলে কে?—এঁকে কি ভ্যাগাবণ্ড বলব?"

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ট্রিবিউনের শোক-সম্পাদকীয়তে আর একটি মুরুব্বিবচন শোনানো হয়েছিল—বিবেকানন্দ যদি অকালে চলে না যেতেন, যদি বেঁচে থেকে আরও অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-অর্জন করতেন, তাহলে সেই প্রবীণ পরিপক্ক বিবেকানন্দ ভারতের আরও অনেক হিত ক'রে যেতে পারতেন। বিবেকানন্দের অকাল-মৃত্যু সম্বন্ধে দুঃখ জানাবার ফাঁকে, তাঁর তারুণ্যের অপরিপক্কতা সম্বন্ধে কটাক্ষ ঐ লেখায় গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। এ-ধরনের কথা আরো কেউ কেউ বলেছেন। স্বামীজী তাঁর দেহান্তের মাত্র কয়েক মাস আগে বেলুড়ে মিস ম্যাকলাউডকে বলেছিলেন, 'I shall never see forty'—চল্লিশ বছর পূরণ হওয়া পর্যন্ত আমি থাকছি না। স্বামীজীর কথার ধ্রুবরূপ সম্বন্ধে সচেতন মিস ম্যাকলাউড গভীর বেদনার সঙ্গে বলেছিলেন—সে কি, কেন বুদ্ধ তো চল্লিশ বৎসর বয়সেই প্রচার শুরু করেন। স্বামীজী বলেছিলেন, আমি তো আমার বাণী দিয়ে দিয়েছি। তাহলে আর থাকারই বা প্রয়োজন কি? আগামী বহু শত বৎসর ঐ বাণী সক্রিয় থাকবে। তাছাড়া আমি থাকলে অন্যরা বিকশিত হবেনা—বড় গাছের তলায় ছোট গাছ বাঁচেনা। মিস ম্যাকলাউডের প্রশ্নের মূলে ছিল বিচ্ছেদবেদনার স্পর্শ, নচেৎ তিনি স্বামীজীকে ঈশ্বরপুত্র বলেই মনে করতেন, বয়সের মাপে যাঁর মাপ হয়না, যাঁর সম্বন্ধে নয় বৎসর আগেই বলা হয়েছিল—'ইনি বয়সে ত্রিশ কিন্তু সভ্যতায় সুপ্রাচীন।'

নগেন্দ্র গুপ্ত, ১৯০২ সালের ট্রিবিউন সম্পাদকের প্রবীণ ও পাকা কথার উত্তর দিয়েছেন এইভাবে—সেই উত্তর উপস্থিত করেই সাঙ্গ করব এই নিবন্ধ:

"তরুণ বয়সেই বিবেকানন্দের দেহান্ত হয়। কিন্তু দীর্ঘতর আয়ু তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিক

দৈর্ঘ্য ঘটাত না কিংবা তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি শব্দও যোগ করত না। বয়সের দীর্ঘতার হিসাব কষে জীবনের উদ্দেশ্যাসিদ্ধির মাপ আমরা করিনা। এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনে ঘটেছে পূর্ণ সিদ্ধির পরিণতি।...

"মাত্র দুই কি তিন বৎসর তিনি প্রচার করেছিলেন। তাঁর সেইসব শিক্ষা নানা গ্রন্থের আধারে ধৃত। বইগুলিতে তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ মনীষা, আলোকিত ভাষা, ঘনসংহত যুক্তি এবং বীর্যময় ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্ত প্রকাশ।

"যতদিন যাচ্ছে, তরুণ প্রজন্মের উপর তাঁর প্রভাব প্রবলতর হচ্ছে। সারা ভারতে বিবেকানন্দ এখন আধ্যাত্মিক শক্তি, দেশপ্রেম এবং বীর্যের প্রতিভূ। তাঁর সমস্ত বাণীর মধ্যে অবিরাম এই নির্ঘোষ—'শক্তিশালী হও! মুক্ত হও'!"

উল্লেখপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. (ক) প্রকাশ আনন্দ-রচিত 'এ হিস্টরি অব দা ট্রিবিউন' গ্রন্থে (ট্রিবিউন ট্রাস্ট কর্তৃক ১৯৮৬-তে প্রকাশিত) কিন্তু পত্রিকা সূচনার তারিখ দেওয়া আছে ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১।

১. (খ) Prakash Anand, *A History of the Tribune*, (The Tribune Trust, 1986) M Chalapathi Rau, *The Press* (National Book Trust, India, 1974) Rangaswami Parthasarathy, *Journalism in India*, (Sterling Publishers Private Limited, 1991) Prem Narayan, *Press and Politics in India* (Munshiram Monoharlal, 1970)

২ সুরেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন: "Upon my mind the writings of Mazzini had created a profound impression The purity of his patriotism, the loftiness of his ideals, and his all-embracing love for humanity ..moved me as I had never before been moved. *I discarded his revolutionary teachings as unsuited to the circumstances of India and as fatal to its normal development, along the lines of peaceful and orderly progress . I lectured upon Mazzini, but took care to tell the young men to abjure his revolutionary ideals* "

"Between the students and myself there grew up an attachment which I regarded as one of my most valued possessions. Amongst those who regularly attended the meetings in those days were Mr B Chakravarti, Swami Vivekananda, Mr Nanda Kishore Bose, Mr S K Agasti and others "

(Sir Surendranath Banerjea, *A Nation in Making*, Humphrey Milford, 1927, pp 35, 43)

৩. Ibid., pp 46-47.

৪. 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ৫ম খণ্ড, "শিখরা কি হিন্দু?—এই প্রশ্নে বিবেকানন্দ" নামক উপ-অধ্যায়। পৃ. ৩৭২-৭৫। এই উপ-অধ্যায়ে ট্রিবিউন পত্রিকা বিশেষভাবে বাবহৃত হয়েছে।

৫. প্রকাশ আনন্দ, পৃ. ৩৭-৩৮।

৬. ১৪ মার্চ ১৮৯৯ তারিখের ট্রিবিউন পত্রিকায় বাঙালী-নিন্দা "The quaking, salaaming, fawning Babu, with his broken English, flowing robes, patiently submissive gestures and repeated protestations of loyalty to 'Your Honour' was a perennial source of amusement and therefore a constant recipient of favours " "Now the educated Babu is in existence everywhere, keeps Herbert Spencer in his desk, discusses politics, amuses himself with a course of theology after office hours, lauds regulations and precedents at the heads of European superiors, and sometimes dresses and comports himself as a 'gentleman'."

এসব রচনার মূলে ঈর্ষা এবং তা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুই-ই। কলকাতা ভারতের রাজধানী হওয়ায়, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রথম গ্রহণ করার জন্য, বাঙালীরা সরকারী দপ্তরে, এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি-জগতে সারা

ভারতে একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, সেটা অন্য প্রদেশগুলির স্বার্থে ও আত্মাভিমানে আঘাত করছিল। আর তা শেষ পর্যন্ত আঘাত করেছিল বৃটিশ স্বার্থেও। প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাঙালীর ইংরেজী শিক্ষার সহায়তা ইংরেজ করেছিল গোড়ার দিকে, কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, বাঙালীর শিক্ষাই তাকে রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তখন বহু ইংরেজের কলমে বাঙালী সম্বন্ধে ঘৃণা উপচে পড়েছিল। বড়ই ভারতপ্রেমিক বলে একদা খ্যাত শ্রমিকনেতা রামজে ম্যাকডোনাল্ড, যিনি পরে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হন, তাঁর রচনা থেকে এক টুকরো 'প্রেমবচন' আমাদের উপহার দিয়েছেন প্রকাশ আনন্দ:

"The Babu is the devil incarnate He has a nimble mind, and no conscience; he is crooked as sin, and in his hands simple-minded Westerners like myself are as clay under the moulding thumb of the potter. He is, in addition, a mean-spirited coward who sneaks through life doing mischief, because he likes it." (p. 40)

এই কথাগুলি ম্যাকডোনাল্ড অ্যাওয়ার্ড নামক জাতিভেদসৃষ্টিকারী, কূটবুদ্ধি বৃটিশ রাজনৈতিকের কলমের উপযুক্ত সৃষ্টি, সন্দেহ নেই।

৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত', (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা-র ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত জীবনী পৃ. ৭২)।

৮. ঐ, পৃ. ৬৭-৭৫, ৭৯-৮০।

৯. 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর কথামৃত', প্রকাশক. রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া ১৯৮৩, পৃ. ৩৯-৪৩।

১০. Nagendranath Gupta, *Ramakrishna-Vivekananda*, Ramakrishna Math, Khar, Bombay, 1933, p 55.

১১. Nagendranath Gupta, "*Reminiscences of Swami Vivekananda and Sister Nivedita,*" *Modern Review*, March 1930.

[শ্রীসারদা মঠ কর্তৃক শিকাগো ধর্মমহাসভা: শতবর্ষ স্মারক-রূপে প্রকাশিত 'মহিমা তব উদ্ভাসিত' গ্রন্থে (১৯৯৪) প্রকাশিত।]

নটেশনের 'ইন্ডিয়ান রিভিউ' পত্রিকায় স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ-আন্দোলন

॥ এক ॥

স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পরে, স্বামীজীর স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন মাদ্রাজের যে তিন সুপরিচিত নাগরিক, তাঁদের অন্যতম 'ইন্ডিয়ান রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক জি এ নটেশন—অন্য দুইজন হলেন ভি কৃষ্ণস্বামী আয়ার, বিএ, বিএল এবং মাদ্রাজের পচাইপ্পা ট্রাস্টের সম্পাদক জি বেঙ্কটরঙ্গ রাও। ভি কৃষ্ণস্বামী আয়ার পরবর্তী কালে কেবল মাদ্রাজের নয়, সারা ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনে উচ্চস্থান অর্জন করেছিলেন। প্রয়াত স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য ২৫ জুলাই ১৯০২, পচাইপ্পা হল-এ যে বিরাট সভা হয়, তাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের অনেকের খ্যাতি মাদ্রাজের সীমা অতিক্রম করে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন, পি আনন্দ চার্লু, টি ভি শেষগিরি আয়ার, সি ভি কৃষ্ণস্বামী শাস্ত্রী, এ সি পার্থসারথি নাইডু, ভি সি শেষচারী, অধ্যাপক রঙ্গচারী, অধ্যাপক পি আর সুন্দররাম আয়ার, ভি ভি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী উপরি-উক্ত তিন ব্যক্তি আবেদনপত্রটি প্রচার করেছিলেন। তার মধ্যে ছিল এই ঘোষিত উদ্দেশ্য:

"মাদ্রাজ শহরে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে, যেখানে এমন সন্ন্যাসীরা আশ্রয় ও আহার্য পাবেন যাঁরা জানেন না আগামী কাল তাঁদের বরাতে কী জুটবে। এই প্রতিষ্ঠানে লোকজনকে বেদান্তপ্রচারের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা দেওয়া হবে।...বিভিন্ন সময়ে আহূত বিভিন্ন সম্মেলনে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের নিয়ে আসা হবে বৈদান্তিক সত্যের আলোচনা ও ব্যাখ্যাদি করার জন্য। প্রতিষ্ঠানটি নিজ কর্তৃত্বাধীনে বিভিন্ন দল গঠন ক'রে নিরাশ্রয় দরিদ্রদের দুঃখমোচন এবং গণশিক্ষার ব্যবস্থা করবে।"

পরিকল্পনাটি বৃহৎ এবং উচ্চাশয়ী। কিন্তু আবেদনপত্রের স্বাক্ষরকারীরা এই ভেবে আশ্বস্ত ছিলেন যে, তাঁদের পিছনে আছে 'স্বামী বিবেকানন্দের সুমহান নাম।' স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন গঠন করেছেন, যার অন্তর্ভুক্ত "মহান ঋষি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যগণ কাজ ক'রে যাচ্ছেন।...তাঁরা এই পৃথিবীতে মহত্তম মানুষ, কেননা কোনপ্রকার স্বার্থ সম্পর্কের কলুষস্পর্শ না রেখে তাঁরা সেবাধর্মে নিয়োজিত।" স্বাক্ষরকারীরা এইসব কারণে স্বতঃই অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করেছিলেন। বিশেষত তাঁরা দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে "পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আট বৎসর ধরে (আসলে পাঁচ বৎসর) কর্মরত, যিনি তরুণদের মধ্যে বেদান্ত সত্য সঞ্চারিত ক'রে দিচ্ছেন এবং তাঁদের প্রণোদিত করছেন দরিদ্র-দুঃস্থদের জন্য সমবেদনা বোধ করতে।"[১]

তখনকার পরিবেশে অতিমাপের এই পরিকল্পনাটির সফলতা ছিল বিধাতৃ-নির্দিষ্ট। বুকের রক্ত ঢেলে ভূমি প্রস্তুত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবীর সন্তান রামকৃষ্ণানন্দ (কথাটা প্রায় আক্ষরিক সত্য; কঠোর পরিশ্রম ও শরীর-নিগ্রহে যক্ষ্মা হয়ে, রক্তবমন ক'রে, তিনি দেহত্যাগ করেন); তারপর ক্রমান্বয়ে মাদ্রাজের কাজে এসেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্ট সন্ন্যাসীরা; তাঁরা সহায়ক পেয়েছেন স্বামীজীর আত্মত্যাগী মাদ্রাজী ভক্তদের (যথা বিখ্যাত 'রামকৃষ্ণ স্টুডেন্টস হোম'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক সি রামস্বামী আয়েঙ্গার এবং সি রামানুজাচারিয়ার—আলাসিঙ্গা পেরুমল ও তাঁর বন্ধুগণ তো ছিলেনই), গড়ে উঠেছে মাদ্রাজ শহরের বিভিন্ন স্থানে শতাব্দীকালের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচুর প্রতিষ্ঠান-সমন্বিত 'জীবনজাল'। জি এ নটেশন এই কর্মপ্রচেষ্টার এককালীন প্রধান সমর্থক।

॥ দুই ॥

সর্বভারতীয় পত্রপত্রিকার ইতিহাসে জি এ নটেশন (১৮৭৩-১৯৪৯) চিহ্নিত হয়ে আছেন 'ইন্ডিয়ান রিভিউ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হিসাবে। "বিশ শতকের প্রথমার্ধে (এম চলপতি রাও লিখেছেন) গণ্য সাময়িকপত্র বলতে ছিল সচ্চিদানন্দের (সিংহ) হিন্দুস্থান 'রিভিউ', জি এ নটেশনের 'ইন্ডিয়ান রিভিউ' এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মডার্ন রিভিউ'।[২] এখানে উল্লেখযোগ্য, পত্রিকা স্থাপন ও পরিচালনার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িত থাকলেও সেকালের পরাধীন ভারতবর্ষে তাঁরা অবশ্যই দেশপ্রেমে চালিত ছিলেন। উল্লিখিত সম্পাদকেরা সেইভাবেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ভারতবাসীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বক্তব্যকে ব্যক্ত করার কাজে ব্যাপৃত ছিল তাঁদের পত্রিকা।

জি এ নটেশন যে মাদ্রাজের এক প্রধান পুরুষ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃচরিত্র, তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন স্বয়ং স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার—বহুধা বিস্তৃত যাঁর কর্ম ও কীর্তির পরিচয়। রামস্বামী আয়ার রাজনৈতিক, শিক্ষাবিদ, লেখক, প্রশাসক এবং স্বাধীনতা-পূর্বে এক সময়ে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল-সদস্য। যাই হোক, অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত জি এ নটেশনের পরিচয়-মধ্যে পাই: তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেছেন; সাংবাদিকতাকে বৃত্তি করেছিলেন এবং কর্মজীবন শুরু করেন মাদ্রাজ টাইমস-এর সুপরিচিত সম্পাদক, জাতিতে আইরিশ, গ্লীন বার্লো-র অধীনে। ক্রমে আরম্ভ করেছেন নিজের প্রকাশন সংস্থা। "প্রকাশ ক'রে চলেন—ছোট বড় বই। বিখ্যাত ভারতীয়দের এবং বিদেশী ভারতবন্ধুদের জীবনী, তাঁদের ভাষণ ও রচনাদি, কংগ্রেসে প্রদত্ত নেতৃগণের ভাষণ, ধর্মক্ষেত্রে বিশ্বশিক্ষকদের রচনাবলী, ভারতের ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্যের উপর ব্যাখ্যাত্মক রচনা ইত্যাদি।" নটেশনের স্বাধীন সাংবাদিকতার সূচনা হয় তাঁর ভ্রাতার সাহায্যে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান পলিটিক্স' থেকে। সংবাদপত্র জগতে তিনি সত্যকার খ্যাতি অর্জন করেন ইন্ডিয়ান রিভিউ শুরু করার পর থেকেই। ইংল্যান্ডে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গুরুস্থানীয় উইলিয়ম স্টেডের 'রিভিউ অব রিভিউজ'-এর আদলে নটেশন তৈরি করেছিলেন তাঁর পত্রিকাটি।[৩]

শিকাগো ধর্ম্মমহাসভাকালে বিবেকানন্দ। শিকাগো ১৮৯৩।

ধর্ম্মহাসভাকালে বিবেকানন্দ। শিকাগো সেপ্টেম্বর ১৮৯৩।

স্বামীজী, লণ্ডনে। ডিসেম্বর ১৮৯৬।

সমাজনেত্রী সারা ফার্মার আমেরিকাব উত্তর-পূর্বে মেইন শহর-সন্নিহিত গ্রীনএকরে তুলনামূলক ধর্মসম্মেলনেব আয়োজন করেন। অগস্ট ১৮৯৪, স্বামীজী তাতে যোগদান কবেন। সেখানে সকলে অধিকাংশ সময়ে খোলা মাঠের নীচে আলোচনা ও ধ্যানাদিতে কাটিয়েছেন। গ্রীনএকরে বৃক্ষতলে আনন্দময় সহাস্য বিবেকানন্দ।

সম্ভবত কলকাতায় গোপাললাল শীলের উদ্যানবাড়িতে তোলা। ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭। স্বামীজী যেমন সহাস্য তেমনি মাঝে মাঝে কঠোব গাম্ভীর্যে থাকতেন, যখন কেউ কাছে এগোতে সাহস করত না।

কাশ্মীরে স্বামীজী, ১৮৯৮। গ্রুপ ছবিতে দাঁড়িয়ে, (বাম থেকে দক্ষিণে) মিস ম্যাকলাউড, স্বামীজী, নিবেদিতা। উপবিষ্ট মিসেস ওলি বুল।
এই কাশ্মীর-পর্ব স্বামীজীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই তাঁর অমরনাথে দিব্যদর্শন, ক্ষীরভবানী মন্দিরে ভয়ঙ্করী মাতৃদর্শন। এই কাশ্মীর ভ্রমণের কাহিনী রচনা করেছেন ভগিনী নিবেদিতা।

কাশ্মীর, ১৮৯৭। চেয়ারে উপবিষ্ট, বামদিক থেকে, স্বামী সদানন্দ. বিবেকানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, ধীরানন্দ।

প্যাসাডেনায় স্বামীজী, ১৯০০, মীড-ভগিনীদের ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে।

Waterfown Daily Times

THE WEATHER
Tonight - Clear cool
Tuesday Sunny mild
Complete report Page 14

Copyright 1983 Watertown Daily Times | Phone 782-1000 | Monday, July 25, 1983 | Last Edition | 30 Cents

This house on Wellesley Island's Thousand Islands Park is considered 'holy ground' to millions of Indian followers of a swami

'The Swami's House'

A Very Special Spot

By Thomas J. Martello
Times Staff Writer

THOUSAND ISLAND PARK Nestled on a hill in this quaint summer community, the cottage known by locals as "the Swami's house" doesn't look much different from the others.

Like most of the cottages here, it bustles with life in the summer and begins a winter-long slumber once the leaves have fallen. Its 19th century architecture also doesn't distinguish it from the other cottages; this type of building is so prevalent in Thousand Island Park that the entire community is on the National Register of Historic Places.

But the cottage of Swami Adiswarananda, spiritual leader of a New York City-based Hindu Center, is considered a very special spot by millions of Indians living 10,000 miles from the Thousand Islands.

"The Indian people look to this place with reverence," said

See SWAMI — Pg 9

Swami Adiswarananda

ওয়াটারটাউন ডেইলি টাইমস পত্রিকার জুলাই ১৯৮৩ সংখ্যায় থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে বিবেকানন্দ হাউসের বিশেষ বিবরণী। ডানদিকে স্বামীজীর ছবির নীচে নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দের ছবি। এক প্রবন্ধে আলোচিত।

'তিনি সুপুরুষের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ।' ক্যালিফোর্নিয়া, ১৮৯৯। এক প্রবন্ধে আলোচিত।

ওফেলিয়ার ভূমিকায় এমা কালভে। উনিশ শতকে পাশ্চাত্যে অপেরার স্বর্ণযুগের শ্রেষ্ঠ গায়িকা-অভিনেত্রী। স্বামীজীর বিষয়ে এঁর অনবদ্য স্মৃতিকথা আছে।

নটেশনের বিপুল প্রাণশক্তি কেবল পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনা সংস্থা পরিচালনাতেই আবদ্ধ ছিল না—তা অধিকন্তু প্রবাহিত হয়েছিল একাধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মধারাপথে। জনপ্রিয় একটি পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি তাঁর কালের প্রায় সকল বিখ্যাত ভারতীয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। তাঁদের অনেকের সঙ্গে তাঁর গাঢ় বন্ধুতা গড়ে ওঠে। মাদ্রাজের জনগণের কাছে ১৯১৬ সালে মহাত্মা গান্ধীকে হাজির করার মূল ভার তিনিই নিয়েছিলেন। অ্যানী বেশান্তের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ অনুরাগ ছিল, যদিও স্বয়ং মডারেট হওয়ায় এবং 'ইন্ডিয়ান লিবারাল ফেডারেশন'-এর প্রথম সাধারণ সম্পাদক হওয়ার জন্য, তিনি বেশান্তের ঈষৎ অধিক চরমপন্থাযুক্ত 'হোমরুল মুভমেন্ট'-এর সমর্থন করতে পারেন নি। সেইভাবেই সমর্থন করেন নি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন। নটেশন 'কাউন্সিল অব স্টেট'-এর মনোনীত সদস্য, মাদ্রাজ কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, মাদ্রাজের শেরিফ, 'ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ড'-এর সদস্য, ইত্যাদি অনেক কিছুই হয়েছিলেন জীবনের বিভিন্ন পর্বে। "তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অভিনিবিষ্ট পাঠক... ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা সুমার্জিত...জীবনদৃষ্টিতে রক্ষণশীল...কিন্তু হরিজনদের উন্নয়নে ও সামাজিক অসাম্যের অপনোদনে সক্রিয় কর্মী।"[8]

পূর্বে উল্লেখিত তিনটি রিভিউ-এর মধ্যে ইন্ডিয়ান রিভিউ-ই প্রকাশিত হয় সর্বাগ্রে—জানুয়ারি ১৯০০। প্রথম সংখ্যার টাইটেল পেজ এই:

The Indian Review

A Monthly Journal

Edited by G.A. Natesan, B.A.

S.A. Natesan & Co. Printers, Esplanade Row. Madras.

পত্রিকাটি প্রায় পঞ্চাশ বছর বেঁচেছিল। তবে বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে এর প্রভাব হ্রাস পায়—যখন থেকে নটেশন ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে কেবল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ের প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ান। প্রথম পনেরো বৎসরই এর প্রভাব প্রতিপত্তির কাল। ঐ পর্বেই স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর ভাবধারা সারা ভারত, বিশেষ দক্ষিণ ভারতে ও বাংলায়, প্রবলবেগে বহমান ছিল।

সি পি রামস্বামী আয়ার তাঁর 'বায়োগ্রাফিক্যাল ভিস্‌টাস' গ্রন্থে জি এ নটেশনের চমৎকার জীবনচিত্র দিয়েছেন। নটেশন 'সুদৃঢ় ধারণাবিশিষ্ট আত্মনির্মিত পুরুষ,' যিনি আদর্শ ও নীতির ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার আপসে প্রস্তুত ছিলেন না। এইভাবে তাঁকে চিহ্নিত করার পরে, রামস্বামী আয়ার একই সঙ্গে জানিয়েছেন—উত্তপ্ত হৃদয়, ঐকান্তিক উদ্দেশ্য এবং অপরকে প্রভাবিত করার ক্ষমতার দ্বারা নটেশন সম্পূর্ণ ভিন্নমতাবলম্বী, কঠিনস্বভাব ব্যক্তিগণের কাছ থেকেও নিজ পত্রিকার জন্য নিয়মিত রচনাদি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন অ্যানী বেশান্ত, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, স্যার ফিরোজ শা মেটা, সি ওয়াই চিন্তামণি, এমনকি মহাত্মা গান্ধী। ইন্ডিয়ান রিভিউ-এর লেখকদের মধ্যে ছিলেন এমন দুইজন যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দকে আমেরিকা যাত্রার পূর্বে জানতেন—একজন হলেন জি বেঙ্কটরঙ্গ রাও (ইনি স্বামীজীর দেহান্তের পরে প্রচারিত আবেদনপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী),

"ইতিহাস ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ব্যাপারে যিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কঠোর বিচারশীল ব্যক্তি"; অন্যজন হলেন—"দারুণ মেজাজী অথচ উদার আইনজীবী এবং জনহিতৈষী ভি কৃষ্ণস্বামী আয়ার।" সি পি রামস্বামী আয়ারের মতে, "মিঃ কৃষ্ণস্বামী আয়ার কেবল যে, অত্যন্ত প্রতিযোগিতাসঙ্কুল আইনজগতের নেতা ছিলেন, তাই নয়, তিনি কংগ্রেসের আদিপর্বে মাদ্রাজের রাজনীতির অন্যতম গঠনকর্তাও। তিনি ও নটেশন এক ধরনের রাজনৈতিক অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন।...মিঃ কৃষ্ণস্বামী আয়ারের যেমন ছিল আইনজ্ঞান এবং বাগ্মিতাশক্তি, তেমনি হঠাৎ চড়ে-যাওয়া মেজাজ এবং ন্যায্য ক্রোধ প্রকাশের প্রবণতা। এইসব কারণে তাঁর ধারে-কাছে ঘেঁষা শক্ত ছিল। আর তারই ফলে, তাঁর মধ্যে নিঃসন্দেহে অবস্থিত সবিশেষ মানবিক গুণাবলী সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা অনেকেই পোষণ করতেন।"[৫]

এই সূত্রে অতিরিক্ত বলে নিতে পারি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কর্নাটকের প্রবাদ-পুরুষ ডঃ ডি ভি গুণডাপ্পার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে ১৯৭২ সালের গোড়ায় আমরা যখন সাক্ষাৎ করেছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন: "ভি কৃষ্ণস্বামী আয়ার ধারালো কটু কণ্ঠের জন্য প্রসিদ্ধ; তাঁর সান্নিধ্যে সকলে খুবই অস্বস্তিতে থাকতেন, এমনকি তাঁকে ডরিয়ে চলতেন, কিন্তু যখনই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলতেন তখন কোমল হয়ে আসত তাঁর কণ্ঠ, আর্দ্র হয়ে উঠত চোখ।"

নটেশন সম্বন্ধে স্যার সি পি রামস্বামী আয়ারের মূল বক্তব্য এই: "নটেশন নানাদিক দিয়ে সাহসের সঙ্গে দেশের সেবা ক'রে গেছেন।...আধা-আধি কোনো ব্যাপারে তিনি বিশ্বাস করতেন না। বিরোধিতার ক্ষেত্রে তিনি সুকঠোর ও আপসহীন। যেসব মানুষ সম্বন্ধে ও তাঁদের নীতি ও কার্যাবলী সম্বন্ধে তাঁর আস্থা ছিল, তাঁদের সম্পর্কে ছিল তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন।...সব জড়িয়ে বলা যায়, নটেশন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী প্রয়াসের দ্বারা নিজ প্রজন্মের উপরে সত্যকার দাগ রেখে যেতে পেরেছেন।"[৬]

এই সূত্রে আরও বলে নেওয়া যায়, নটেশন প্রমুখের মতো রামস্বামী আয়ারও স্বামীজীকে দেখেছেন। স্বামীজী বিষয়ক তাঁর একটি রচনার মধ্যে প্রত্যক্ষ স্মৃতিকথার অংশ এই:

> "মাদ্রাজে থাকাকালে স্বামীজী নিয়মিত গীতা-ক্লাস নিতেন। ঐ সব পাঠকালে আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার সঙ্গী ছিলেন সি রামস্বামী আযেঙ্গার, যিনি পরে ময়লাপুরে 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্টুডেন্টস হোম' স্থাপনের মূলে। স্বামীজীর সেইসকল আলোচনাকালে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের পক্ষে গভীরভাবে প্রভাবিত না-হয়ে উপায় ছিলনা। সে প্রভাব কেবল তাঁর বৈদ্যুতিক ব্যক্তিত্ব ও অনিবার্য আকর্ষক কণ্ঠস্বরের জন্যই নয়, ততোধিক, আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপর তাঁর স্বচ্ছন্দ আধিপত্য, উদ্দীপক ভাষ্য এবং সহজে বোধগম্য ভাষার জন্যও বটে। এই সকলের দ্বারা তিনি গীতার মূল প্রতিপাদ্য এবং বেদান্তের কেন্দ্রীয় সত্যকে প্রাত্যহিক জীবনে কার্যকর করার সম্ভাবনাকে প্রতীয়মান করে তুলতেন।"[৭]

॥ তিন ॥

'রিভিউ অব রিভিউজ-এর আদলে গঠিত' ইন্ডিয়ান রিভিউ ভারত ও বিশ্বের নানাস্থানে প্রকাশিত সংবাদ ও রচনা সংক্ষেপিত আকারে উপস্থিত করত। এর দ্বারা পাঠকগণ একটি পত্রিকা থেকে সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও চিন্তাধারার বিষয়ে কিছুটা অবহিত হতে পারতেন। তাছাড়া এর মধ্যে সম্পাদকীয় রচনা ও মৌলিক প্রবন্ধাদিও থাকত। সম্পাদকের মনোভাব সাধারণভাবে অদলীয় হওয়ার জন্য নানা মত ও পথের মানুষদের বক্তব্য এতে স্থান পেয়েছে। বিজ্ঞান থেকে সমাজ-বিজ্ঞান, সম্পাদকের আগ্রহের লক্ষ্য। বিশ্ববিজ্ঞানক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বসুর আবির্ভাবকে সংবর্ধনা জানিয়ে, তাঁর সম্বন্ধে প্রায়ই সংবাদ বেরিয়েছে। যথা, জুলাই ১৯০১, মে ১৯০২, মে ১৯০৩ তারিখে। বসুর প্রথম দিকে প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের ভাষাগঠনে ভগিনী নিবেদিতার বিশেষ সাহায্য ছিল—ফলে তাদের রচনারীতি প্রশংসা পেয়েছে। বসুর প্রথম গ্রন্থ, *Response in the Living and Non-Living*-এর রচনাগুণের বিষয়ে এম শ্রীনিবাস রাও এই পত্রিকার মে ১৯০৩ সংখ্যায় লেখেন: "যদিও আমরা তাঁর (বসুর) সকল মতের সমর্থন করি না, কিন্তু তিনি এযাবৎ কার্যত-অকর্ষিত যে ভূমিতে কাজ করেছেন, সেই গবেষণার মূল বিষয় সম্বন্ধে সমাদরের ক্ষেত্রে আমরা কারও থেকে পিছিয়ে থাকতে রাজি নই। লেখকের খ্যাতি অনুযায়ী তাঁর রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং ব্যাপক পরিধিযুক্ত তো বটেই, সেটা প্রত্যাশিত; সেইসঙ্গে বলব, প্রশংসনীয় এর রচনারীতি এবং বহুস্থানে তা আনন্দের সঙ্গে পড়ে যাওয়া যায়।"

সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, বহুবিধ সামাজিক কল্যাণকর্মে সক্রিয়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের মৃত্যুর পরে, তাঁর জীবন ও কার্যাবলীর কথা গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়েছে (এপ্রিল ১৯০৪)। *Industrial Regeneration of India* নামে জি সুব্রহ্মণ্য আয়ারের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বেরিয়েছে (জুন ১৯০১)। বিশ্বরাজনীতি ও মতাদর্শ-বিষয়ক রচনাদিও পেয়েছি, যেমন, ডবলিউ হাওয়ার্ড ক্যাম্বেল-লিখিত *Progress of Socialism* (অক্টোবর ১৯০২), লা কিরওয়ান-লিখিত *The Revolutionary Outbreak in Russia* (ফেব্রুয়ারি ১৯০৫)। বেরিয়েছে, মহামনীষী বালগঙ্গাধর তিলকের *Ariatic Home of the Vedas* গ্রন্থের উপর লেখা, (ডিসেম্বর ১৯০৩; স্বামী বিবেকানন্দ বইটির সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন), কিংবা রমেশচন্দ্র দত্তের *Decline of Buddhism in India* (অক্টোবর ১৯০৭) সম্বন্ধে আলোচনা। কলাশিল্প সম্বন্ধে সম্পাদকের আকর্ষণের অনেক দৃষ্টান্ত পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলিতে ছড়িয়ে আছে। উনিশ শতকের ভারতে চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম আলোড়ন সৃষ্টিকারী শিল্পী রবি বর্মার কীর্তিকাহিনীর অনেক পরিচয় ও সমাদরের কথা এই পত্রিকাতে পাই। যেমন, *Ravi Verma: The Indian Artist* (এইচ বেঙ্কোবা রাও-লিখিত, এপ্রিল ১৯০৩); *Ravi Verma, the Indian Artist* (ফেব্রুয়ারি ১৯০৫); *The Late Raja Ravi Verma* (অক্টোবর ১৯০৬); *A Great Indian Artist: Ravi Verma* (জিও জোসেফ লিখিত, নভেম্বর ডিসেম্বর ১৯১১)। রবি বর্মার বিপরীত ধারাসৃষ্টিতে সচেষ্ট ই বি হ্যাভেল ও ভগিনী নিবেদিতার শিল্পবিষয়ক রচনা, সেইসঙ্গে উক্ত ভাবানুগামী বাংলার চিত্রশিল্পীদের কলাসৃষ্টির বিষয়টিকে পত্রিকাটি অগ্রাহ্য করতে পারেনি—যার পিছনে নিবেদিতার প্রেরণা অনুমান করা যায়। যথা, *The New Indian School of Painting* (অগস্ট ১৯০৮);

National Literature and Art (সি এফ এন্ডরুজ লিখিত, নভেম্বর ১৯০৮); *Indian Sculpture And Painting* (হ্যাভেলের বইয়ের আলোচনা, এপ্রিল ১৯০৯); *Indian Administration and Art* (হ্যাভেলের প্রবন্ধ, এপ্রিল ১৯০৯); *A Modern School of Painting* (উডরফের রচনা, মে ১৯০১); *The Revival of Indian Architecture and Fine Arts* (অক্টোবর ১৯০৯)।

সেকালের পরাধীন ভারতবর্ষে কালপ্রয়োজনে জাতীয়তা প্রচার ও প্রসারে অংশগ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য বলে গ্রহণ করেছিল পত্রিকাটি—সেইসঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক আন্দোলন সংক্রান্ত সংবাদ। এটি মাসিক পত্রিকা বলে, দৈনন্দিন রাজনীতি অপেক্ষা আন্দোলনের মূল সূত্রসম্বন্ধীয় সংবাদ পরিবেশনেই তা নিয়োজিত থাকত। এই ব্যাপারে আশু প্রয়োজন উপস্থিত করেছিল বাংলার স্বদেশী আন্দোলন। এর সম্বন্ধে মোটামুটি কাহিনী এই: শাসনতান্ত্রিক সুবিধার অজুহাতে লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে বিভক্ত করেন—কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালিদের মধ্যে রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য যে আন্দোলন ক্রমবর্ধমান, তার ভিতরে সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা সৃষ্টি ক'রে তাকে দুর্বল ক'রে দেওয়া। এর বিরুদ্ধে যে সক্রিয় প্রতিবাদ শুরু হয়, তা স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহারে জনগণকে প্রণোদিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বিদেশী দ্রব্য বয়কট করা পর্যন্ত পৌঁছয়। সেখানেও না থেমে, দু-এক বৎসরের মধ্যে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘাতের রূপ নেয়। আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের নানা স্থানে, ফলে তা সর্বভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ ধরেছিল। এই আন্দোলনের কর্মবিধায়িকা শক্তি যে-জাতীয়তা, ইন্ডিয়ান রিভিউ তার প্রচারক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রেরণা ছিল মূলত বিবেকানন্দের, তা প্রসারিত হয়েছিল নিবেদিতা, অরবিন্দ, তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, লাজপত রায় প্রমুখের রচনায় এবং কার্যাবলীতে। ইন্ডিয়ান রিভিউ তার নিজ আদর্শে মডারেট, 'লয়্যালটি'-র একটা আচ্ছাদন তার উপরে ছিলই, পত্রিকার প্রচ্ছদে ছাপা হত রানী ভিক্টোরিয়ার ছবি, তবু চরমপন্থী রাজনীতির প্রতি একটা ভিতরের টান এড়াতে পারেনি। এক্ষেত্রে নিবেদিতার প্ররোচনা ছিল, তা ধরে নেওয়া যায়। আমরা আরও লক্ষ্য করি, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার পক্ষে গান্ধী-সৃষ্ট আন্দোলনের প্রতি সমর্থন এই পত্রিকা প্রথমাবধি জানিয়েছে।

স্বদেশী আন্দোলন-সূত্রে সঙ্কলিত বা মৌলিক যেসব রচনাদি এতে প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে আছে: *Lord Curzon on Indian Character* (ফেব্রুয়ারি ১৯০৫); *The Swadeshi Movement* (সেপ্টেম্বর ১৯০৫); *Mr. A M Bose on the Bengal Federation* (অক্টোবর ১৯০৫); *Bande Mataram* (বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম সঙ্গীতের ইংরেজী অনুবাদ); *The Empire and the Slavery* (ফ্রেডরিক হ্যারিসন রচিত, জুলাই ১৯০৬); *The Ideal of Swaraj* (বাঙলা সংবাদপত্র থেকে অনূদিত সংবাদ, মার্চ ১৯০৭); *Rishi Bankim Chandra* ('বন্দে মাতরম' পত্রিকা থেকে, মে ১৯০৭); *Unrest* (কবিতা. জুন ১৯০৭); *Religion, and Swadeshi* (অক্টোবর ১৯০৯); *The Indian Renaissance* ('লীডার' পত্রিকা থেকে, ডিসেম্বর ১৯০৯)।

॥ চার ॥

উপরের তালিকায় ভগিনী নিবেদিতার রচনার নাম উপস্থিত করিনি। এই পত্রিকা অপরপক্ষে বেশ কিছু নিবেদিতার লেখা ছেপেছে—-মৌলিক অথবা সংকলিত। যতদূর দেখেছি, একক মানুষের প্রকাশিত রচনার হিসাব ধরলে এতে নিবেদিতার রচনার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। কারণ একাধিক। প্রথমত, স্বদেশী আন্দোলনের জাতীয়তা-তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ লেখিকা নিবেদিতা। দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রত্যক্ষ প্রেরণা-পরিধির মধ্যে সম্পাদক ছিলেন। তদুপরি জাতীয় আন্দোলনের পিছনকার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবশক্তির কেন্দ্রীয় পুরুষ যে বিবেকানন্দ (সম্পাদক এই মত নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতেন)—নিবেদিতা জাতীয় জীবনে সেই ভাবেরই প্রচারক। স্বদেশী আন্দোলন কালে এই পত্রিকায় প্রকাশিত নিবেদিতার কয়েকটি লেখা: *The Swadeshi Movement* (মার্চ ১৯০৬); *The Task of National Movement* ('মাইসোর রিভিউ' পত্রিকা থেকে, জুলাই ১৯০৬); *Indian Nationality* (নভেম্বর ১৯০৯)।

ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির মর্মসন্ধানে নিয়োজিত ছিল নিবেদিতার প্রখর মননশীল ও সংবেদনশীল মন এবং তার প্রকাশে অক্লান্তভাবে সক্রিয় ছিল তাঁর লেখনী। এ-সম্বন্ধে তাঁর একাধিক গ্রন্থ ও প্রচুর প্রবন্ধ আছে। নিবেদিতা মনে করতেন, এই কাজে তিনি স্বামীজীর দ্বারা আদিষ্ট এবং তাঁর চিন্তাসূত্র ধরেই কাজ করছেন। সে রকম কয়েকটি লেখা এই পত্রিকায়: *The Eastern Mother* ('ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট' পত্রিকা থেকে, জুন ১৯০৩); *The Ideal of Indian Women* (প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকা থেকে, নভেম্বর ১৯০৩); *Aggressive Hinduism* (এই পত্রিকায় ফেব্রুয়ারি ১৯০৫ থেকে কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত); *What Books to Read* (সেপ্টেম্বর ১৯০৫)।

নিবেদিতার একাধিক বইয়ের উপর আলোচনা এই পত্রিকায় বেরিয়েছে। ১৮৯৩-১৯০২ পর্বের মধ্যে বেরিয়েছিল নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' বইয়ের উপর আলোচনা। "এই ক্ষুদ্র অথচ অসাধারণ বইটি," সম্পাদক লেখেন, "সুনিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে, কিভাবে ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের উপর প্রাচ্যদেশ ধীরে, নিঃশব্দে, প্রভাববিস্তার ক'রে যাচ্ছে।" সম্পাদক আরও বলেন: "নিবেদিতার কালীতত্ত্বের ব্যাখ্যা বাস্তবিক সুগভীর" এবং "তাঁর রচিত রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণের ছোট আকারের জীবনীচিত্রগুলি পড়ে আমরা যেভাবে হৃদয়ে আলোড়িত হয়েছি, এমন আর কোনো কিছু পড়ে হইনি।"

নিবেদিতার রচনাদির উপরে আরও যেসব আলোচনা এই পত্রিকায় বেরিয়েছে, সে সকলের মধ্যে অসংশয়িতভাবে স্বীকৃত হয়েছে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যাতারূপে নিবেদিতার শ্রেষ্ঠত্ব। নিবেদিতার 'ক্র্যাডল টেলস অব হিন্দুইজম'-এর উপর সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রথম অনুচ্ছেদেই তেমন মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে:

> "ভারতীয় বিষয়ে অন্য যে কোনো লেখক অপেক্ষা ভগিনী নিবেদিতার লেখা আমাদের অধিকতর আকর্ষণ করে। তাঁর সহানুভূতি এমনই বিপুল, এবং ভারতীয় ভগিনীদের প্রতি তাঁর সুকোমল অন্তঃকরণের প্রেম এমনই স্বতঃপ্রকাশ যে, মনে হয়, ভারতবর্ষ এই অসামান্য নারীর মধ্যে সত্যতম মিত্রকে লাভ করেছে, যেমনটি সে পূর্বে কখনও পায়নি। বাইরের জগতের কাছে ভারতীয় আদর্শ ব্যাখ্যার জন্য তাঁর প্রথম প্রয়াস 'দ্য ওয়েব অব

ইন্ডিয়ান লাইফ' নামক অসাধারণ গ্রন্থ। তার অসাধারণত্ব রয়েছে—অভিব্যক্তির প্রাঞ্জলতায়, রচনারীতির স্বচ্ছতায়, এবং অনুরাগতপ্ত হৃদয়ের সঞ্চারে, যা প্রতিটি বাক্যকে ক'রে তুলেছে প্রাণসঞ্জীবিত।" (ফেব্রুয়ারি ১৯০৮)।

একই প্রকার মুগ্ধ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল মাননীয় টি ভি শেষগিরি আয়ার-কৃত নিবেদিতার 'স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম' গ্রন্থের আলোচনায়। (ডিসেম্বর ১৯১৩)। এই লেখক নিবেদিতার 'ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ', গ্রন্থের আলোচনাও করেছিলেন। সেই বইয়ের সঙ্গে রচনারীতি ও মনোভাবের ক্ষেত্রে আলোচ্য বইয়ের পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টাও করেছেন। "এখানে পূর্বতন বইটির তুলনায় তাঁর ভাষা কোমলতর; অধিকতর ভালবাসায়, ক্ষমায় এবং বিগলিত মধুরতায় পূর্ণ তাঁর সত্তা।" সমালোচক স্বীকার করেছেন, ভারতীয় গুণাবলীর অন্তর্নিহিত প্রকৃতি নিবেদিতা যথার্থই অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং ভারতীয় উৎসবগুলির প্রাণকেন্দ্রে নিসর্গপ্রকৃতির প্রাণস্পন্দনের ছন্দ তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন অতুলনীয়ভাবে। তাঁর আছে সেই প্রতিভা, যা "বৃক্ষের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, চোখ মেলে দেখতে পারে কলনাদিনী নির্ঝরিণী নিশিদিন কোন্ গ্রন্থরচনা ক'রে যাচ্ছে, এবং প্রস্তরখণ্ড উচ্চারণ করছে কোন্ ধর্মবাণী।" "নিবেদিতা বিভিন্ন ভারতীয় অনুষ্ঠানাদির উপর অনুপম যেসব কথাচিত্র এঁকেছেন, তাদের মধ্যে তাঁর প্রত্যক্ষদর্শনের ছাপ রয়েছে। এমনই তাঁর চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা যে, পাঠককে তিনি যেন উৎসবগুলির মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেন। তাঁর রচনার এমনই গুণ যে, [সমালোচকের মতে] উপর-উপর মন্তব্য ক'রে গেলে তার পুরো রস পাওয়া যাবেনা—প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের রসচর্বণা ক'রে যেতে হবে ধীরে ধীরে।"

নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে এই পত্রিকায় তাঁর উপরে দীর্ঘ দুটি রচনা প্রকাশ করেছিলেন একই লেখক (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১১ এবং জুন ১৯১২)। প্রথম লেখাটিতে ইনি নিবেদিতার রচনার ভিতরে কোন্ প্রাণশক্তি নিহিত তারই রহস্য সন্ধানের ও ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছিলেন। "মনস্বিতার ক্ষেত্রে লোকান্তরিত ভগিনী [শেষগিরি লেখেন] মহাকায় প্রতিভার মাপে গঠিত। তাঁর গ্রন্থ বা রচনাদি পড়বার সময়ে কেউই অনুভব না ক'রে পারেন না যে, তিনি সম্মুখীন হয়েছেন এক অসামান্য মৌলিক, সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী মনের। অথচ তাঁর অপূর্ব বৌদ্ধিক গুণাবলী তাঁর মহিমার গৌণ অংশমাত্র। তাঁর বিশ্বকোষতুল্য বিদ্যাও নয়, তাঁর সর্বাতিক্রমী সাহিত্যশক্তিও নয়, এমনকি তাঁর রচনা যে-সকল গরিমাময় কবিকল্পনার বর্ণদ্যুতি বিকীর্ণ করত, যা সেগুলিকে ভরিয়ে তুলত বিচিত্রভাবে ব্যাকুল-করা অনুভূতিতে—না, সে সকলও নয়, তাহলে কী ছিল তাঁর রচনায় যা আমাদের ও-হেন গভীরভাবে আলোড়িত করত? কোথায় ছিল তাদের প্রেরণামূল?" উত্তর সমালোচকই দিয়েছেন। প্রেরণা ছিল 'আত্মা-অংশে।" এই শক্তিতে সম্পন্ন নিবেদিতা হয়ে উঠেছিলেন "দেশপ্রেমিকদের মধ্যে পরম দেশপ্রেমিক, ভারতীয় জনগণের কাছে বার্তাবহদের মধ্যে পরম বার্তাবহ।" কিন্তু কার বার্তা নিবেদিতা বহন করেছিলেন? মাননীয় শেষগিরি আয়ার তাও জানিয়েছেন একই প্রবন্ধে: "তিনি (নিবেদিতা) এমন এক আচার্যের শিষ্যা হবার অসাধারণ সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, যিনি অনেকের মতে, ভারতীয় নবজাগরণের পুরোধা ও নেতা।"

ইন্ডিয়ান রিভিউ নিবেদিতার অমর গ্রন্থ 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম'-এর উপর আলোচনাও করেছে (সেপ্টেম্বর ১৯১০)। এই বইটি, স্মরণ করা যায়, শ্রীঅরবিন্দের মতে, স্বামীজী সম্বন্ধে সব-সেরা লেখা। এই সমালোচনাটিতে কিন্তু যথেষ্ট গভীরতা ও চিন্তাশীলতা ছিল না—যদিও লেখক মাঝে মাঝে খুবই প্রশংসা করার চেষ্টা করেছেন। সমালোচক ঈষৎ ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বলেন, নিবেদিতার এই লেখা তাঁর প্রত্যাশা পূরণ করেনি। এর মধ্যে তিনি নিবেদিতার 'ব্যক্তিক অনুভূতির' অভাব দেখেছেন, যা "তাঁর মতো অভিজ্ঞ লেখিকা স্বামীজীর চরিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করতে পারতেন।" নিবেদিতার রচনাশক্তির মোটামুটি প্রশংসাকালে তিনি এমন কথাও বলেছেন যে, পুরনো ভারতীয় কাহিনীগুলি বলার সময়ে সেগুলিকে "এহেন অনুপম ভাষার সৌন্দর্যে আচ্ছাদিত করতেন যে, মনে হতো, মূল রচনার অপেক্ষা নিবেদিতার অনুবাদ সমধিক চিত্তাকর্ষী।" লেখকের মতে, ঐসকল গুণের কিছু অভাব আলোচ্য গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে। এখানে আমাদের প্রশ্ন, সমালোচক কি 'দ্য মাস্টার' গ্রন্থটির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন? তিনি যে 'ব্যক্তিক অনুভূতির' অভাবের কথা বলছেন, তা কিছুদিনের মধ্যে প্রকাশিত নিবেদিতার 'নোটস্ অব সাম ওয়ান্ডারিংস্ উইথ দ্য স্বামী বিবেকানন্দ' বইটির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেখা যাবে—কারণ সে-গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল পৃথক। যাই হোক, সমালোচক 'দ্য মাস্টার' গ্রন্থমধ্যে দেখেছেন: "নিবেদিতার আচার্য (উত্তরভারত) ভ্রমণকালে এবং হিমালয়ে অবস্থানকালে, নিবেদিতাকে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শন করিয়েছিলেন, তার চিত্রণে নিবেদিতার সৃষ্টি সত্যই রুচিসুন্দর।" স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগিবৃন্দ এই গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলিতে দেখতে পাবেন: "গত শতাব্দীর সর্বোচ্চ মনীষাধর পুরুষদের অন্যতম বিবেকানন্দ কিভাবে রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসীদের শুভকর্মপথে প্রেরণা দিয়ে লালিত করেছিলেন।" শেষে তিনি বলেন: "শিষ্যার অসীম শ্রদ্ধার বর্ণে চিত্রিত স্বামী বিবেকানন্দ এই গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলিতে ভারতের সবচেয়ে খাঁটি দেশপ্রেমিকদের অন্যতম রূপে প্রতিভাত, যাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—নিজ দেশকে উন্নীত ক'রে, বিশ্বরাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে সর্বাগ্রে স্থাপন করা।'

এখানে একটা কথা আবার বলতেই হয়, সমালোচক একথা অনুধাবন করতে পারেন নি যে, নিবেদিতার রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল— স্বামীজীর উজ্জ্বল স্মৃতিকথন নয় কিংবা তথ্যবহুল জীবনকথাও নয়—চেয়েছিলেন বিবেকানন্দের জীবন ও চিন্তাকে বিশ্বভূমিকায় স্থাপন ক'রে চিরকালের পটে অঙ্কন করতে। সেইজন্যই এই গ্রন্থকে অধ্যাপক টি কে চেইনী-র মতো বিখ্যাত খ্রীস্টতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ স্থাপন করেছেন মূল গস্‌পেল প্রভৃতির ঠিক নিম্নে, এবং ঐ গস্‌পেলের মূল বার্তাবহদের জীবনাখ্যানের সঙ্গে একই সারিতে।

নিবেদিতা সম্বন্ধে আরও দুটি লেখা 'ইন্ডিয়ান রিভিউ' সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলন করেছিল (জানুয়ারি ১৯১২)—একটি 'মডার্ন রিভিউ' থেকে এস কে র‍্যাটক্লিফের লেখা, অন্যটি 'পজিটিভিস্ট রিভিউ' থেকে এস এইচ সুইনি-র লেখা। সুইনি ভারতবর্ষের জন্য নিবেদিতার আহ্বানবাণীর উল্লেখ করেছিলেন, যা ভারতীয় ভাবধারায় ভারতবাসীর অগ্রগতির উপর জোর দিয়েছে, যার মধ্যে ভারতের জাতীয় প্রবণতার জয়পতাকা উড্ডীন থাকবে। সে-বাণী নিবেদিতার অফুরন্ত আবেগ ও আনন্দে নির্গলিত। এই কথা বলার পরে নিবেদিতা সম্বন্ধে যে সমালোচনা উঠতে পারে, উঠেছিলও, তার উত্তর

দিয়েছেন পাশ্চাত্যের এই নামী সমাজবিজ্ঞানী, ভারতের মহীয়সী সমাজবিজ্ঞানী সম্বন্ধে:

"তাই বলে নিবেদিতা কোনমতে জ্ঞান-পথে বাধাসৃষ্টিকারী চরিত্র নন (সুইনি বলেছেন)। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে যে, সমগ্র মানবজাতিকে গ্রহণ করতে হবে, একথা তিনি অবশ্যই স্বীকার করেছেন। কোমত্ এবং লা প্লে-র রচনাদির নিবিষ্ট পাঠানুশীলন তিনি করেছেন এবং ভারতীয় সমস্যাসমূহকে যে সমাজদর্শনের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে, সে প্রয়োজনও অনুভব করেছেন। ভারতীয়দের বিশ্বাস অর্জনে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন; অনেক ভারতীয় তরুণ তাঁর কাছ থেকেই প্রথম ব্যাপক দেশপ্রেমের প্রেরণা পেয়েছেন। তিনি একদিকে যেমন ভারতীয়দের কাছে প্রেরণাদাত্রী, অপরদিকে তেমনি পাশ্চাত্যের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যাতা। 'দ্য ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থ আমাদের শিক্ষা দিয়েছে—খ্রীস্টান মিশনারিদের দ্বারা বহুনিন্দিত ভারতীয় পরিবারজীবনে কোন্ সৌন্দর্য আছে এবং ভারতীয় নারীজীবন বহন ক'রে চলছে কোন্ মর্যাদা। তাঁর অপরাপর রচনার অন্তর্ভুক্ত ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা যা তাঁর অনবদ্য বোধশক্তির দৃষ্টান্ত, যার মধ্যে রয়েছে যেমন অন্তর্দৃষ্টি তেমনি রচনার প্রাঞ্জল গতি।" (পুস্তিকাটির নাম—*Glimpses of Famine and Flood in East Bengal in 1906*)

॥ পাঁচ ॥

পাঠক-পাঠিকারা লক্ষ্য করবেন, ইন্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকার আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা নির্ধারিত ১৮৯৩-১৯০২ পর্বকে অতিক্রম ক'রে আরও এক দশক এগিয়ে গেছি। এমন করার বিশেষ কারণ, স্বামীজীর দেহান্তের পরে কিভাবে দক্ষিণভারতে স্বামীজীর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাঁকে কোন্ গভীর শ্রদ্ধায় ভারতের নবজাগরণের নায়ক বলে স্বীকার করা হয়েছিল, তার প্রমাণ মিলবে এই পত্রিকার ঐকালীন রচনাবলীতে। একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, বিবেকানন্দের জীবন, কার্যাবলী ও ভাবধারা প্রচারকে এই পত্রিকা নিজের আদর্শ-কৃত্য বলে গ্রহণ করেছিল। লক্ষণীয়, কেবল বিবেকানন্দ নন, রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সঙ্গে প্রথম পর্বে যুক্ত কয়েকটি প্রধান চরিত্রের কার্যাবলীর সংবাদও পত্রিকাটি যথাসম্ভব প্রকাশ করেছে।

একেবারে সূচনায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দক্ষিণ ভারতীয় কাজকর্মের বিষয়ে পত্রিকাটির সমাদরসূচক মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি। রামকৃষ্ণানন্দের *'Sri Krishna, the Pastoral and the King Maker'* বইয়ের আলোচনায় বইটি থেকে বেশ কিছু অংশ উৎকলন করার পরে, আলোচক মন্তব্য করেছিলেন: "এধার ওধার থেকে কিছু অংশ উপস্থিত করলে বইটির যথোপযুক্ত পরিচয় দেওয়া যাবেনা, কেননা সেটি ইঙ্গিতবাহী গভীর চিন্তায় পূর্ণ।" (জুন ১৯০৯)

বেদান্ত-প্রচারক হিসাবে স্বামী অভেদানন্দ যেহেতু আমেরিকায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং দার্শনিক বোধ ও ভাবপ্রকাশের ক্ষমতাযুক্ত ছিল তাঁর বক্তৃতাদি, তাই সে সকলের বিবরণ একাধিকবার এই পত্রিকায় বেরিয়েছে। যথা, *'Women's Place in Hindu Religion'*

(সেপ্টেম্বর ১৯০১, ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকা থেকে): *'What is Vedanta'* (মে ১৯০২, প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকা থেকে), *'Vedanta, the Divine Heritage of Man'* (মে ১৯০৪)। শেষোক্ত লেখাটি বস্তুতপক্ষে অভেদানন্দ-প্রদত্ত আটটি বক্তৃতার এক সংকলন-গ্রন্থের উপর আলোচনা। পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচারে বিবেকানন্দের ধারা তাঁর উত্তরসূরী অভেদানন্দ কিভাবে বজায় রেখেছেন তার প্রসঙ্গে বলা হয়, "প্রাচ্যের ভাবধারাকে পাশ্চাত্যের সামনে উন্মোচন করার মহান ব্রতে নিয়োজিত স্বামী অভেদানন্দ যোগ্যতার সঙ্গে প্রতীচ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মোদ্দেশ্য সফল করছেন।" বিবেকানন্দের সঙ্গে অভেদানন্দের তুলনা অতঃপর এসে গিয়েছিল: "একথা সত্য, ঐ যে বিরাট পুরুষের (বিবেকানন্দের) পবিত্র বহির্বাস (অর্থাৎ দায়ভার) এই সন্ন্যাসীকে (অভেদানন্দকে) ধারণ করতে হয়েছে, তাঁর তুল্য দার্শনিক কল্পনা এবং কাব্যিক ভাবোন্মাদনা এঁর মধ্যে ছিলনা।" আলোচক তারপর যোগ করেছেন: "কিন্তু ধারণার স্বচ্ছতা ও উপস্থাপনের স্পষ্টতার ক্ষেত্রে এঁর কোনো ঘাটতি ছিলনা। ইনি খ্রীস্টীয় ধর্মতত্ত্বে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন এবং বৈদেশিক একটি ধর্মের অধ্যাপকগণের সমক্ষে ভাষণ দেবার মতো খ্রীস্টীয় দর্শনসমূহকেও আয়ত্ত করতে পেরেছেন।" অভেদানন্দ এবং রামকৃষ্ণের অপর প্রচারক শিষ্যদের সাফল্য আলোচককে পরিতৃপ্তির সঙ্গে এই ঘোষণায় প্রণোদিত করেছিল: "আমাদের বিশ্বাস, স্বামী বিবেকানন্দ যে-আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার মধ্যে এমন প্রাণশক্তি আছে যাতে সে তার পতাকাতলে নতুন নতুন মানুষকে সমবেত করতে পারে। তার ভাবধারা ভারত ও পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যে এমনভাবে সংক্রামিত হতে পারে যে তার জন্য ভাবী প্রজন্মগুলি দক্ষিণেশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের উদ্দেশ্যে এই ধন্যধ্বনি করবে—তিনি ছিলেন এমন একটি মতের প্রবক্তা যা সুসভ্য মানবসমাজের বৌদ্ধিক ও আবেগাত্মক প্রয়োজন সমূহের পূরণে সমর্থ।"

স্বামী অভেদানন্দ ১৯০৬ সালে আমেরিকা থেকে কিছু সময়ের জন্য ভারতে ফিরে আসেন। ইন্ডিয়ান রিভিউ সেই সূত্রে ১৯০৬ জুলাই মাসে অভেদানন্দের চিত্রসহ একটি বিবরণ লিখেছিল, যেটি বস্তুতপক্ষে পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের তদবধি বেদান্ত-প্রচারের সংক্ষিপ্ত কাহিনীবিশেষ। এর মধ্যে গঙ্গাতীরে হাওড়ায় কেন্দ্রীয় বেলুড়মঠ ও হিমালয়ের মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রমের উল্লেখ ছিল। উল্লেখ ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবাদিন্ ও প্রবুদ্ধ ভারত, এই দুই উৎকৃষ্ট পত্রিকার, এবং আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকো, বস্টন, ব্রুকলিন ও নিউ ইয়র্কে স্বামী ত্রিগুণাতীত ও স্বামী বোধানন্দের কার্যাবলীর। সান ফ্রান্সিসকোয় রামকৃষ্ণ মিশন সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেছে, নিউ ইয়র্কে তার নিজ ভবন হতে যাচ্ছে, এইসব সংবাদও পাই। বেদান্তপ্রচার শুরু করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, একথা সত্য, কিন্তু তাঁর দেহান্তের পরে আন্দোলন মরে যায়নি। "একথা সুপরিচিত হয়ে গেছে যে, এই গৌরবময় কাজের সূচনা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। [রচনাটিতে লেখা হয়েছিল], তাঁর প্রস্থানের পরেও তাঁর কর্মকীর্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের অভাব হয়নি।...আমেরিকায় তাঁর কর্মভার গ্রহণ করেছেন স্বামী অভেদানন্দ, শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর সুবিখ্যাত গুরুভ্রাতার উদ্দেশ্যকে অগ্রসর ক'রে দিচ্ছেন।" ভারতে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে অভেদানন্দকে প্রদত্ত মানপত্রে তাঁর পাশ্চাত্য গুণমুগ্ধরা লেখেন: "নয় বৎসর ধরে আপনি আমাদের মধ্যে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, সহ্য করেছেন কঠোর ক্লেশ, বিরোধিতা, এমনকি শত্রুতা, কিন্তু সেসব গ্রাহ্য না

ক'রে এগিয়ে গেছেন নিজের পথে অপ্রতিহত বেগে।" মানপত্রে আরও লেখা হয়: "রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কঠিন পরিশ্রমের ফলে...টেক্সাস থেকে কানাডার উত্তরের শেষ সীমারেখা, আটলান্টিক মহাসাগরের তট থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের তট, অর্থাৎ আমেরিকায় এমন কোনো রাজ্য বা প্রদেশ নেই যেখান থেকে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি বেদান্ত সাহিত্যের জন্য অর্ডার পায়নি বা সোসাইটির দ্বারা প্রদত্ত শিক্ষা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদের পত্র পায়নি।" স্বামী অভেদানন্দের *'India and Her People'* বইটিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নিষ্ঠুর শোষণের বর্ণনা ছিল বলে এদেশের সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়েছিল। সেই বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়: "যাঁরা সুপণ্ডিত সন্ন্যাসীর [অভেদানন্দের] ভাষণাদি শুনেছেন এবং তাঁর ভাষণের সহজতা ও স্বচ্ছন্দ প্রবাহে মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁদের কাছে বক্তৃতাগুলির এই সংকলন সাদরে গৃহীত হবে।" অভেদানন্দ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রাচীনতা ও মহিমার বিষয়ে চ্যালেঞ্জের সুরে কথা বলেছিলেন। "তিনি দেখিয়েছেন, এই দেশের দর্শন—যার ভাবধারা ধীরে ধীরে পাশ্চাত্যদেশে অনুসৃত হচ্ছে—তা পাশ্চাত্যবাসীরা অসভ্য অবস্থা থেকে সভ্যাবস্থায় উত্তীর্ণ হবার বহু শতাব্দী পূর্বে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রূপ গ্রহণ করেছিল। বিদ্বান সন্ন্যাসিবর দেখিয়েছেন যে, জড়বাদীরা তাঁদের মত সংগ্রহ করতে পারেন ভারতের বৈশেষিক দর্শন থেকে।"

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় প্রবর্তিত মাদ্রাজের দুই প্রখ্যাত সাময়িকপত্র ব্রহ্মবাদিন্ ও প্রবুদ্ধ ভারত থেকে প্রচুর সংবাদ এই পত্রিকা সংকলন করেছে, যা শিক্ষিত-সাধারণের গোচর করেছে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্মের মহিমা এবং রামকৃষ্ণ আন্দোলনের গুরুত্ব ও ক্রমপ্রসারের রূপ। স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকের প্রকাশক হিসাবে এই পত্রিকার পক্ষে যেসব বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল সেগুলি থেকে আদি পর্বে বিবেকানন্দ সাহিত্যের রূপ ও প্রকৃতি বুঝতে পারা যায়। এর মধ্যে দক্ষিণ-ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা, বাঙ্গালোর মঠ স্থাপনের সংবাদ পেয়েছি। ঐ সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ভাষণ দিয়েছিলেন মহীশূরের দেওয়ান ভি পি মাধব রাও, সিস্টার দেবমাতা এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। "যখন শ্রীরামকৃষ্ণের বৃহৎ একটি প্রতিকৃতির আবরণ প্রেসিডেন্ট [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] কর্তৃক উন্মোচিত হয়, সেই সময়ে মহীশূরের সর্বাধিক রক্ষণশীল পণ্ডিতগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন।" আমরা জেনেছি যে, প্রধানত এম এ নারায়ণ আয়েঙ্গারের (পরে স্বামী শ্রীবাসানন্দ) সক্রিয় ও উদার সাহায্যের ফলেই এই নূতন মঠ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল।

॥ ছয় ॥

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখা এই পত্রিকায় পেয়েছি মার্চ ১৯১০ সংখ্যায়, *'Ramakrishna Mission: The Scope and the Method of its Work.'* রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নীতি ও কর্মরীতির সুস্পষ্ট ঘোষণাযুক্ত এই রচনার কিছু অংশ প্রণিধানযোগ্য। এর মধ্যে প্রথমেই বলা হয়: "সমগ্র মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রদত্ত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা" এবং "বিশ্বখ্যাত স্বামী

বিবেকানন্দই প্রথম বৃহত্তর মানবসমাজের কাছে সেই শিক্ষা উপস্থিত করেছিলেন।"—

"বেদাদিশাস্ত্রে উন্মোচিত শাশ্বত ও সর্বজনীন ধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ স্বামীজীর ঐ আচার্যপ্রবর। তাঁর শিক্ষা স্বামীজী কর্তৃক প্রচারের ফলে পৃথিবীতে ধর্মীয় প্রচারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট রীতিগত পরিবর্তন দেখা গেছে—তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, প্রতিটি ধর্মের চিন্তাশীল অনুগামীদের বক্তব্যের মধ্য থেকে ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে।"

যে-কাজ স্বামীজী শুরু করেছিলেন, তাঁর উত্তরসূরীরা সে-কাজ যোগ্যতার সঙ্গে কঁরে যাচ্ছেন: "সারা পৃথিবীতে ধর্মবিষয়ে তাঁদের যথার্থ শিক্ষক মনে করা হয়।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের আলোচ্য লেখায় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়—বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন ধর্ম বলতে কী বোঝেন। এখানে বস্তুতপক্ষে বিবেকানন্দ-প্রচারিত 'মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব' বিষয়ক বাণীসমূহের সুচারু সারসংক্ষেপ ছিল। স্বামীজীর ধর্মাদর্শের আর একটি অংশ ধর্মসমন্বয়। অন্য যে কোনো ধর্মনেতা-প্রচারিত ধর্মসমন্বয়ের সঙ্গে বিবেকানন্দের ধর্মসমন্বয়ের পার্থক্য হলো—প্রথমোক্তেরা যেখানে বিভিন্ন ধর্মের শ্রেষ্ঠ অংশের সারসংকলন করাকেই ধর্মসমন্বয় মনে করেন, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পন্থানুসারী বিবেকানন্দ বললেন, প্রতিটি ধর্মই পরম লক্ষ্যে অগ্রসর, প্রতিটি ধর্মের অনুগামীদের পক্ষে নিজ ধর্মপথ অবলম্বন করেই চরম উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব। এই প্রত্যয়ই ধর্মসমন্বয়ের ভিত্তি।

এইজন্য রামকৃষ্ণ মিশন ধর্মান্তকরণের বিরোধী—এ কথা স্পষ্টভাষায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ জানিয়েছিলেন। [এ-বিষয়ে অধিক মন্তব্য 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' প্রবন্ধের মধ্যে আছে]।

রামকৃষ্ণ মিশন এইসঙ্গে ধর্মক্ষেত্রে অলৌকিকতার বিরোধী:

"It (The Mission) advocates no mysticism which is apt to make fool of a man by making him believe in all sorts of absurdities, and thus instead of giving him religion, makes him an irreligious mystic absolutely ignorant of truth."

রামকৃষ্ণ মিশন যে স্বীয় ধর্মভিত্তি বেদান্তকে পৃথিবীর পূর্বাপর সকল ধর্মের সাধারণ ভূমি মনে করেন এবং আধুনিক বিজ্ঞানও যে অংশত বেদান্তসত্যের অনুধাবনে সহায়ক, তার ঘোষণা ক'রে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন:

"It (The Mission) shows that Vedanta (the Upanishads) is the common basis of all religions of the past, the present, and the future and regards modern science as helpful to a certain extent in understanding the truths imbedded therein."

এই ধরনের নানা বৈশিষ্ট্যের কারণে রামকৃষ্ণ মিশন অন্য সকল ধর্মীয় মিশন থেকে পৃথক। সেই স্বাতন্ত্র্যের সুস্পষ্ট ঘোষণা এই প্রকার:

"Thus Sri Ramakrishna Mission is distinct from all the other religious missions of the past and the present as it only has discovered the harmony, the common basis, and the necessity of all the various religions, whereas each of the other religious missions of the world asserts its infalliability, perfection and supremacy over all the rest."

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী চরিত্র এবং বিশাল ভাবধারার মধ্যে নানাপ্রকার ভাবের এমনকি আপাতভাবে বিপরীত ভাবেরও, সম্মিলন ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে নির্দিষ্টভাবে গ্রহণীয় ও পালনীয় মতাদর্শ ঘোষণা করার প্রয়োজন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অতিপ্রিয় শিষ্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতা, অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী স্বামী ব্রহ্মানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে এই রচনায় সেই কাজ করেছেন। **সে হিসাবে এটিকে রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্মাদর্শের 'ঘোষণাপত্র' বলা চলে।**

॥ সাত ॥

ইন্ডিয়ান রিভিউ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি লেখা ১৯০২-১৪-এর মধ্যে প্রকাশ করেছে। এপ্রিল ১৯০২ সংখ্যায় 'থিয়জফিক্যাল রিভিউ' পত্রিকা থেকে উৎকলন করেছিল এরিক হ্যামন্ড-লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক একটি চমৎকার প্রবন্ধ *'A Modern Hindu Saint'*. এরিক হ্যামন্ড এবং তাঁর স্ত্রী নেল হ্যামন্ড স্বামীজীর ইংরেজ ভক্ত বা শিষ্য। এরিক হ্যামন্ড লেখক হিসাবে কিছুটা পরিচিতি লাভ করেছিলেন। স্বামীজী এবং নিবেদিতার সম্বন্ধে এঁর স্মৃতিকথা আছে। নেল হ্যামন্ড নিবেদিতার বান্ধবী—ইংল্যান্ড থেকে প্রথম ভারতে আসার পরে এদেশে নিজ জীবন ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে নিবেদিতা এঁকে একাধিক চিঠি লিখেছেন।

ইন্ডিয়ান রিভিউ জুলাই ১৯০২ সংখ্যায় ম্যাক্সমূলরের *"The Life and Sayings of Ramakrishna"* বইয়ের তেলুগু অনুবাদের সংবাদ দিয়েছিল। মার্চ ১৯০৩ সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত জি বেঙ্কটরঙ্গ রাওয়ের ভাষণের কথা পাই। অক্টোবর ১৯০৫ সংখ্যায় পত্রিকাটিতে ব্রহ্মবাদিন্ প্রেস থেকে প্রকাশিত *The Sayings of Sri Ramakrishna Paramhansa'* গ্রন্থের আলোচনাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছিল.

"গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলি থেকে পাঠকগণ আমাদের (অর্থাৎ ভারতবর্ষের) ধর্মবিষয়ে এমন উৎকৃষ্ট ধারণা লাভ করবেন যা বহুসংখ্যক পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার মধ্যে মিলবে না। এই পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা ধর্মের বাস্তবায়িত রূপের কথা পাই, সহজ ভাষায় যা কথিত, কিন্তু সমুচ্চ আদর্শের উচ্চারণে মন্দ্রিত।"

জানুয়ারি ১৯০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণের একটি দীর্ঘ জীবনচিত্র।

'স্বত্বসংরক্ষিত' এই লেখাটি শেষ হয় এই বলে:

> "এই প্রকারই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সুমহান জীবন এবং অপূর্ব শিক্ষার প্রকৃতি। আমাদের এই সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক দেশে তিনি এখন জীবন্ত ধর্মশক্তি—এবং তাঁর প্রভাব সমগ্র পৃথিবীতে অবশ্যই বিস্তারিত হবে। আমাদের ঋষিগণের শেষ প্রতিভূ তিনি। মানবসমাজের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের আসনে তিনি ভারতবর্ষকে সগৌরবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"

॥ আট ॥

১৯০০ সালের জানুয়ারিতে ইন্ডিয়ান রিভিউ-এর শুরু আর ১৯০২ জুলাই-এ স্বামীজীর দেহত্যাগ—এই কালপর্বে পত্রিকাটিতে অধিক বিবেকানন্দ-সংবাদ আশা করা যায় না, কারণ স্বামীজী ঐ গোটা সময়টিতে অসুস্থ ছিলেন এবং তিনি বাইরের কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, রামকৃষ্ণ সংঘের আভ্যন্তরীণ সংগঠনে প্রধানত ব্যাপৃত ছিলেন। ফলে এই পত্রিকাকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ-আন্দোলন সংক্রান্ত ইতস্তত সংবাদ প্রকাশ করার পরে, কিছুদিনের মধ্যে লিখতে হয়েছিল তার পক্ষে মর্মান্তিক সংবাদ—স্বামীজীর আকস্মিক মহাপ্রয়াণ। শোকমন্তব্যের মধ্যে সম্পাদক বলেছিলেন: চরম বেদনার কালে তিনি উপযুক্তভাবে স্বামীজীর মূল্যায়ন করতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে কালব্যবধান ঘটলে সে চেষ্টা করবেন। পরবর্তী এক দশকের কিছু বেশি সময়মধ্যে সে-কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন স্বয়ং লিখে অথবা স্বামীজী বিষয়ে নানা রচনা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে। ঐ সকল রচনার মধ্যে লেখক-নামহীন রচনাগুলি সম্পাদকের নিজের লেখা বলেই মনে হয়।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা 'হিন্দু'-তে লেখেন: *'The National Significance of the Swami Vivekananda's Life and Work'*. সেকালে সুখ্যাত এবং একালের বিচারেও মূল্যবান এই প্রবন্ধে নিবেদিতা লিখেছিলেন: "আচার্য যখন শিষ্যবৃন্দের মধ্য থেকে বিদায় নিলেন, শ্মশানের অগ্নিশিখার সামনে সমালোচকের গুঞ্জন যখন স্তব্ধ হয়ে গেল," ইত্যাদি—তাঁর সেকথা বহুলাংশে সত্য হলেও সর্বাংশে নয়, তা মিশনারি ও তাঁদের সমদৃষ্টির পত্রিকাদির শোক-নিবন্ধ থেকে দেখা যায়। স্বামীজী সম্বন্ধে পূর্ণ পরিচয়ের অভাবে বিবেচক পণ্ডিত ব্যক্তিও কী প্রকার বিচারভ্রান্তি দেখাতে পারেন, তার নিদর্শন পুনার ডেকান কলেজের অধ্যাপক জে নেলসন ফ্রেজারের *'Swami Vivekananda: A Criticism'* প্রবন্ধ, যা জানুয়ারি ১৯০৩-এ বিহারের 'হিন্দুস্থান রিভিউ' ও এলাহাবাদের 'কায়স্থ সমাচার' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। অধ্যাপক ফ্রেজার এই লেখাটিতে অনেকখানি জায়গা নিয়ে প্রমাণ করতে সচেষ্ট ছিলেন—তিনি স্বামীজী সম্পর্কে কত কম জানেন এবং যেটুকু জানেন তাও কতখানি ভুলে ভরা। স্বামীজীর বিশ্ববাণীর ইনি কোনও খোঁজ রাখেন নি। তারই জোরে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, প্রধানত দেশবাসীর জন্যই বিবেকানন্দের বাণী। আর সেই বাণীগুলিতে অধ্যাপক ফ্রেজারের মনঃপূত বিষয়গুলি নেই, যেমন সোশ্যাল রিফর্ম প্রসঙ্গ; নেই রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা; ব্যক্তির আত্মগঠন ও বিকাশের কথা; জনগণের দারিদ্র্যের

কথা; জাতীয়তার কথা—আছে কেবল ধর্মকথা—বেদান্ত, বেদান্ত আর বেদান্ত। ঐ ধর্মকথা তো আগেও শোনা গেছে, ওর দ্বারা ভারতের অগ্রগতি হবে কি? স্বামীজী বিজ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত নন, ধনসম্পদকে পাপ মনে করেন। তিনি হিন্দুধর্মের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাও একটি মাত্র ধারায় আবদ্ধ; তাঁর সর্বমতের সামঞ্জস্য বিধানের তত্ত্ব মানুষকে সবকিছু মানিয়ে নেবার শিক্ষা দিয়ে নিষ্ক্রিয় ক'রে ফেলবে, কোনো একটি মতকে পাকড়ে ধরে একবগ্‌গা হয়ে ছুটতে প্রেরণা দেবেনা। তাছাড়া স্বামীজী পাশ্চাত্যে শিক্ষা দেবার সময়ে সেখানকার বাহ্য ধনলোলুপতাই কেবল দেখেছেন, সে সভ্যতার বহুমুখী জটিলতা অনুধাবনের সামর্থ্য দেখান নি। অধ্যাপক জানালেন, নিজেদের সভ্যতার পুরোনো গৌরব সম্বন্ধে ধারণা রাখা ভালো কিন্তু আধুনিক কালের মানুষ তাকে ঝেড়ে ফেলে সামনে ছুটতে চাইছে কর্মবাদ অবলম্বন ক'রে—বিবেকানন্দের শিক্ষা তার প্রতিবন্ধক।

নিশ্ছিদ্র অজ্ঞতায় পুষ্ট এহেন সাবলীল লেখনী-বিস্তার কদাচিৎ দেখা যায়। আশ্চর্য, অধ্যাপক ফ্রেজার কি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছুই পড়েন নি—এমনকি বিবেকানন্দের হাড়-শত্রু মিশনারিরা স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে কী লিখেছিল, তাও? সোশ্যাল রিফর্মের ভক্ত এই অধ্যাপক কি তখন বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'সোশ্যাল রিফর্মার' পত্রিকার পাতাগুলিও ওল্টান নি? স্বামীজীর বিখ্যাত ভারতীয় বক্তৃতাবলী এবং সে সকলের সংকলন গ্রন্থ *Lectures from Colombo to Almora*-র কথা জানতেন না? না, সেসব তিনি পড়েন নি, কিন্তু অবশ্যই পড়েছেন, অন্তত একটি বই—"জনৈক সুপরিচিত ব্যক্তি-লিখিত পরলোকগত স্বামী বিবেকানন্দের একটি জীবনী।" তার রচনার উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল সেই বইটি এবং উক্ত সিদ্ধান্তগুলি জানাতে তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার সম্পাদক স্বামী স্বরূপানন্দ এই ভ্রান্তিভিত্তিতে স্থাপিত অট্টালিকার সৌন্দর্য দেখে মোহিত হলেন না—দীর্ঘতর প্রবন্ধে, অধ্যাপক ফ্রেজারের প্রতিটি কথাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটলেন, আর মিথ্যার টুকরোগুলিকে গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দিলেন। এর জন্য তাঁকে বিরাট গবেষণা করতে হয়নি। কেননা স্বামীজীর রচনাগুলি এবং জীবনতথ্য মোটামুটি সকলের গোচর অবস্থাতেই ছিল—যদিও স্ব-গোচর করার অভিপ্রায় সকলের ছিল না। 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রিকার পরের সংখ্যাতেই (ফেব্রুয়ারি ১৯০৩) স্বরূপানন্দের লেখাটি বেরুল—*'Swami Vivekananda': A Rejoinder*'। এই লেখা এলাহাবাদের 'কায়স্থ সমাচার' পত্রিকাতেও বেরিয়েছিল। এখানে স্বরূপানন্দের রচনার বিষয়-প্রসঙ্গে আসার প্রয়োজন নেই। আমরা কেবল ইন্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকার প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করব। পত্রিকাটির সম্পাদক নটেশন, অধ্যাপক ফ্রেজারের যুক্তিহীন প্রবন্ধে আহত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিবাদ করেন নি, সে কাজটা স্বরূপানন্দই যোগ্যতার সঙ্গে করেছিলেন। ইন্ডিয়ান রিভিউ-এর মার্চ ১৯০৩ সংখ্যায় নটেশন লিখলেন:

"আমাদের মতে, স্বামী স্বরূপানন্দ প্রমাণসহ খুবই সন্তোষজনকভাবে, সন্দেহাতীতভাবে, দেখিয়ে দিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অধ্যাপক ফ্রেজারের সমালোচনা কতখানি অসার। স্বরূপানন্দ এই লেখায় স্বামীজীর বহুতর রচনা ও ভাষণ থেকে প্রচুর অংশ উদ্ধৃত ক'রে খুবই ভাল কাজ করেছেন। তার দ্বারা তাঁর এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, স্বামী বিবেকানন্দ সমাজসংস্কারের পক্ষ-সমর্থক, দরিদ্র মানুষের প্রাণের বন্ধু এবং কিছু মানুষের ভ্রান্ত ধারণা-মতো তিনি নৈষ্কর্ম্যের পক্ষে প্রচারক ছিলেন না।"

অধ্যাপক নেলসন ফ্রেজারের সপক্ষে বলতে হবে, তিনি যথার্থই শিক্ষিত মানুষ, সৎ মানুষ, ভদ্রলোক। তাই যখন সুনিশ্চিত তথ্যের সম্মুখীন হলেন, তখন সেসব সম্পর্কে আগে খোঁজ নেননি বলে লজ্জাবোধ করলেন এবং ত্রুটি স্বীকারে দেরী করলেন না। হিন্দুস্থান রিভিউ পত্রিকার মার্চ সংখ্যাতেই তিনি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে লিখলেন, তাঁর ভ্রান্তির মূলে ছিল বিবেকানন্দ বিষয়ে একাশি পৃষ্ঠার একটি বই, যা "স্বামীজীর অনুরাগী বলে আত্মঘোষিত এক ব্যক্তির লেখা।" সেই বইয়ের ভিত্তিতেই তিনি নিজ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি আরও বললেন:

"স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আপনাদের (হিন্দুস্থান রিভিউ) পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আমি যা লিখেছিলুম, তার প্রতিবাদে লিখিত স্বামী স্বরূপানন্দের প্রবন্ধের প্রচণ্ড শক্তির কথা আমি স্বীকার করছি। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আমি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সুবিচার করিনি।...আমার বক্তব্যকে যেসব ক্ষেত্রে আমি সংশোধন করতে পারি, সেগুলির উল্লেখ ক'রে এই লেখাটিকে দীর্ঘতর করতে পারতুম। তাতে পাঠকগণ সম্ভবত ক্লান্তিবোধ করবেন। যাই হোক, আমি এই যে কথাগুলি বললুম, তাতে স্বামী স্বরূপানন্দ যে তৃপ্তিবোধ করবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

ইন্ডিয়ান রিভিউ-এ সমাজসংস্কার বিষয়ে একটি প্রবন্ধের (*'Hindu Social Reform', May 1903*) লেখক কে সুদর্শন রাও—মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকার তুলনা করেছিলেন। লেখকের মতে: "উভয়েরই সূক্ষ্ম মননচেতনা, উদার সর্বজনীন সহানুভূতি এবং উভয়ই লৌহকঠিন দৃঢ়তাসম্পন্ন পুরুষ।...উভয়েরই ছিল মাতৃভূমির জন্য সীমাহারা ভালবাসা।...উভয়ের কাছেই ভারত পুণ্যভূমি এবং পরম প্রাপ্তিভূমি।...উভয়ের কাছেই সমাজসংস্কার মানে জাতীয় ধারায় সামাজিক অগ্রগতি।" বিচারপতি রানাডে "সোশ্যাল কনফারেন্স-কে প্রিয় সন্তানবৎ পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন—সেক্ষেত্রে সবিশেষ যত্ন ও বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। বাস্তববুদ্ধিযুক্ত ধৈর্যশীল কর্ম এবং দীর্ঘকালীন প্রচারকার্য তিনি এই উদ্দেশ্যে ক'রে গেছেন।" অপরদিকে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন:

"দিব্যাধিকারপ্রাপ্ত বার্তাবহ। অন্য মানুষের পক্ষে যে কাজ করতে একশো বছর লেগে যেত, সেই কাজ তিনি দশ বছরে সমাধা করেছেন। যে পথ ধরে আমরা অগ্রসর হব, সেই পথ তিনি দেখিয়েছেন; কোন্ ভাবপ্রেরণায় কাজ ক'রে যেতে হবে, তার চেতনা দান করেছেন। আদর্শ ও কর্মের বহিঃরেখা তিনি অভ্রান্ত দৃঢ় রেখায় অঙ্কিত ক'রে গেছেন—যাতে বাকি খুঁটিনাটি কাজগুলি ভারতবাসী ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে যথাসাধ্য সম্পন্ন ক'রে যেতে পারে।"

কালীনাথ রায় লাহোর ট্রিবিউন কাগজের সম্পাদক ও লেখক হিসাবে একদা সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইন্ডিয়ান রিভিউ-এ জুলাই ১৯০৩ সংখ্যায় তিনি *The Late Swami Vivekananda* নামে একটি মোটামুটি বড় আকারে প্রবন্ধ লেখেন। তখনকার পরিস্থিতিতে, যখন "ভারতবাসী স্বামী বিবেকানন্দের কর্মজীবনের বিষয়ে

অল্পই পরিজ্ঞাত", তখন বিচারশীল এই লেখকের মনে হয়েছিল: "স্বামীজীর জীবন যতখানি সম্ভাবনাদ্যোতক ততখানি কর্মপরিণত নয়, তাঁর অল্পবয়সে লোকান্তরের জন্য।" এতৎসত্ত্বেও তখনি তাঁর জীবন যেভাবে প্রতিভাত ছিল, তার মধ্য থেকে কয়েকটি বিশেষ দিক বেছে নিয়ে কালীনাথ সেসব সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।

প্রথম প্রসঙ্গ, আধ্যাত্মিক পুরুষ এবং ধর্মপ্রবক্তা বিবেকানন্দ। "স্বামীজীর জীবন ঈশ্বরের উপলব্ধি এবং আত্মদর্শনের নিবিড় প্রয়াসে নিয়োজিত ছিল। এইসঙ্গে ছিল ধর্মবার্তা বহনের জন্য উন্মাদনা, যা তাঁকে গৃহগত সুস্থির জীবন যাপন করতে দেয়নি। যে সত্য তিনি লাভ করেছেন তাকে ঈশ্বরের নামসহায়ে বহু দূরবর্তী নূতন নূতন স্থানে প্রচারের প্রচণ্ড তাগিদ তিনি বোধ করেছিলেন। ঐ সত্যের নতুন বপনক্ষেত্র তাঁর চাই-ই।" এই ভূমিকায় তিনি হিন্দুদের চিরাচরিত পথ পরিহার করেছিলেন, ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, তাঁর বেদান্ত নিছক পুঁথিগত নয়, পরন্তু নিরতিশয় প্রায়োগিক। "বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে প্রায়ই অভিযোগ ক'রে বলা হয়, তা ওই তত্ত্বকে জীবনে ব্যবহার করার কোনো নির্দিষ্ট বাস্তব উপায় দেখায় না, তা নিছক বিমূর্ত তত্ত্বে আবদ্ধ—স্বামী বিবেকানন্দ এই ধারণার বিরুদ্ধে জীবন্ত প্রতিবাদ। তাঁর জীবন দেখিয়ে দিয়েছে, আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত ভৌতিক জগতের অন্তরালবর্তী নিত্যসত্যের বোধ তাঁর ছিল এবং তিনি বস্তুজগৎকে মায়া মনে না ক'রে নিত্য সত্যের অভিব্যক্তি বলেই মনে করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে দেশ ও জাতি...শাশ্বত অনন্ত চৈতন্যের বিশেষ ক্ষণ ও পর্ব।"

তৃতীয়ত, তিনি শ্রেষ্ঠ অর্থে মহান দেশপ্রেমিক। "আমাদের কাছে তিনি সর্বদাই বেদান্ত-প্রচারক অপেক্ষা অধিক কিছু। তিনি দেশপ্রেমিক—পরমার্থে দেশপ্রেমিক। যে ঐকান্তিক আবেগময় ভক্তির সঙ্গে তিনি দেশকে ভালবাসতেন, তাতে মনে হয়, সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবেশ থাকলে তিনি কোনো এক ওয়ালেস, বা ব্রুস বা হ্যাম্পডেন বা ক্রমওয়েল বা মাৎসিনী হয়ে দাঁড়াতেন।...তবে ভারতকে ভালবাসলেও তিনি ইংল্যান্ড বা আমেরিকাকে ঘৃণা করতেন না। ভারত যদি ন্যায়পথে থাকে, তখন তার পক্ষে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুত তিনি, কিন্তু যদি ভারত অধর্মের লড়াই শুরু করে, তাহলে কোনো স্বার্থের তাগিদেই তাঁকে ভারতের সমর্থনে এক পাও নাড়ানো সম্ভব নয়।"

চতুর্থত, তিনি বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। "একই সঙ্গে তিনি ভক্ত এবং জগৎমঞ্চে অভিনেতা, দেশপ্রেমিক এবং লোকহিতৈষী, জীবনমুখী আবার অতি গভীর অর্থে সংসারত্যাগী।"

পঞ্চমত ও শেষত, তিনি সন্ধিক্ষণে দেশকে চালিত করার মতো গুণসম্পন্ন মানুষ। "স্বামী বিবেকানন্দের মতো প্রায় কেউই এই প্রজন্ম বা পূর্ববর্তী প্রজন্মে ছিলেন না, যিনি নিজ জন্মগত গুণাবলী ও শিক্ষালব্ধ শক্তির দ্বারা তরুণ ভারতের নেতা হবার যোগ্য। ভারত এখন যে ক্রান্তিকালের মধ্যে দিয়ে চলেছে সেই কালের আদর্শ যুগ-প্রতিনিধি তিনি।...তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিমত্তা, দর্শনসহ অন্যান্য বিষয়সমূহের অনুশীলন, আত্ম-বলিদানের জীবনব্রত, গভীর ধর্মপ্রাণতা—সকল কিছুই দেখিয়ে দেয়, কোন্ কোন্ শক্তির দ্বারা তিনি মানুষের নেতা ও পথপ্রদর্শক হতে পেরেছিলেন।"

নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক চরিত্রালোচনা—স্বামীজীর দেহত্যাগের কিছুদিনের মধ্যে যেটি লিখেছিলেন মননশীল এক সাংবাদিক। পরবর্তী নব্বই বৎসরের ইতিহাসচর্চা দেখিয়ে দেয়,

লেখক-কথিত গুণাবলীর অধিকারী তো স্বামীজী ছিলেনই, আরও অনেক কিছুই তাঁতে বর্তমান ছিল, যা খুব নিকটকালে অবস্থানের জন্য লেখক ধরতে পারেন নি।

বেশ কয়েক বৎসর পরে জি এ চন্দ্রাভারকর *Vedic Magazine*-এ দয়ানন্দ ও বিবেকানন্দের তুলনা ক'রে যে প্রবন্ধ লেখেন তার থেকে ইন্ডিয়ান রিভিউ প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় সংকলন করেছিল জুলাই ১৯১৪ সংখ্যায়। চন্দ্রাভারকরের মতে, "স্বামী দয়ানন্দ ও বিবেকানন্দ, উভয়েই হিন্দু প্রোটেস্টান্ট মুভমেন্টের (প্রতিবাদী সংস্কার আন্দোলন) পুরোধা এবং আক্ষরিকভাবে দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী।" তাঁদের পার্থক্য থাকলেও ঐক্যের ক্ষেত্রই অধিক। পৃথিবীকে দয়ানন্দ শিক্ষা দিয়েছেন—"বেদের ধর্ম সর্বোচ্চ ধর্ম", আর বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন, "মানবমন সর্বোচ্চ এবং মহত্তম যে-নৈতিকতার ধারণা করতে সমর্থ বেদান্ত সেই নীতিবিজ্ঞানই দান করেছে।" "তাঁদের কাছে বেদ অথবা বেদান্ত, প্রত্যাহার অথবা নৈষ্কর্ম্যের দর্শন নয়। ধর্মকে তাঁরা সর্বজনীন সত্য মনে করতেন, যা মানবসমাজের উন্নয়নকারী অসীম সম্ভাবনায় পূর্ণ।"

এই পত্রিকা মে ১৯১৪ সংখ্যায় কলকাতার 'বেঙ্গলী' পত্রিকা থেকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিবেকানন্দ-বিষয়ক বক্তৃতার অংশ উৎকলন করেছিল। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করেন। "নরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন অপরিচিত এক ছোকরা ছাত্র ছাড়া কিছু নন, তখনই রামকৃষ্ণ উপস্থিত শ্রোতাদের সকলকে নরেন্দ্রের সম্বন্ধে বলতেন, 'ওর দিকে ভালো ক'রে নজর করো। ও হলো শতদল পদ্ম—একেবারে নিখুঁত; ও পরে শিক্ষা দেবে।' পরবর্তী কালে পরমহংসদেব প্রায়ই বলতেন, নরেন্দ্রকে অনেক কাজ করতে হবে, বিলেতের লোক ওর কথা খুব শুনবে। লোকজন তখন শুধু অবাক হয়ে শুনত। কিন্তু কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণীই এর মতো সত্য বা নির্ভুল প্রতিপন্ন হয়নি।"

॥ নয় ॥

এই পত্রিকার বিভিন্ন রচনায় স্বামী বিবেকানন্দকে আরও নানা ভূমিকায় দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। জুন ১৯০৪ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকা থেকে *'A Sketch of Swami Vivekananda's Life'*। প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় নিবেদিতা তাঁর *'The Master as I Saw Him'* গ্রন্থ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তার থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ নির্বাচন ক'রে এতে পুনঃপ্রকাশ করা হয়। (যথা: 'Her First Meeting with the Swami', May 1906; 'Swami Vivekananda in London', June 1906; 'Swami's Teachings that Influenced Her,' August 1906; 'Swami's Thoughts on Gita', October 1908; 'Swami on the Ideal Hindu Women', February 1909; 'Closing Days of the Swami', May 1910)। এপ্রিল ১৯১২ সংখ্যায় প্রবুদ্ধ ভারত থেকে সংকলন করা হয় আর এন বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে প্রবন্ধের অংশ।

পত্রিকাটি নিজস্ব-ভাবে স্বামীজীর জীবনের কথাচিত্র প্রকাশ করে মে ১৯০৭ সংখ্যায় *'Swami Vivekananda: His Life and Teachings*। 'স্বত্ব সংরক্ষিত' এই লেখার

উপ-শিরোনামগুলি এই: Introduction; Early Life; Discipleship; Travels, The Parliament of Religions; England; Return to India; Vivekananda, the Man; Some Aspects of his Genius; Message to India; Message to the West; His Teachings; Conclusion.

সুলিখিত এই জীবনচিত্রটি পড়লেই মনে হয়, স্বামীজীকে দেখেছেন এবং তাঁর কথা শুনেছেন, এমন একজনের দ্বারা এটি রচিত এবং তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং সম্পাদক। 'বিবেকানন্দ দি ম্যান' প্রসঙ্গের গোড়ায় বলা হয় স্বামীজীর প্রচণ্ড প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের কথা। "ক্রিয়াশীল সেই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁকে আচার্যগণের প্রথম সারিতে স্থাপন করেছিল এবং যেসব মানুষ তাঁর দর্শন পেয়েছিল ও তাঁর কাছ থেকে হিন্দুশাস্ত্রের অভ্যন্তরে আবৃত থাকা নিত্য সত্য শিক্ষার বিরল সুযোগ পেয়েছিল, তারা ভাবাচ্ছন্ন ছিল চিরকালের জন্য।" স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের অনেকগুলি বিষয়ের উল্লেখের পরে লেখক যে মন্তব্য করেন তা স্পষ্টতই তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা-চিহ্নিত:

> "এই সকল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যদি স্মরণ রাখি, যুক্ত হয়েছিল তাঁর চমকপ্রদ দেহাবয়ব, দুই অত্যুজ্জ্বল নেত্রে আলোকিত মুখমণ্ডল এবং ঘনৈশ্বর্যযুক্ত সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর—তাহলে তাঁর ব্যক্তিত্বের অপূর্ব যাদুশক্তির ব্যাপারটি কিছুটা বোঝা সম্ভবপর হবে।"

লেখাটির গোড়ায় ছিল স্বামীজীর পরিত্রাতা-ভূমিকার মুক্ত স্বীকৃতি:

> "সেই সকল সুমহান সত্তা, যাঁরা চতুর্দিকে আমাদের বেঁধে-ফেলা বিষাদ ও নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার করেন, আমাদের নিয়ে যান পরম লোকে—তাঁরা হঠাৎ ছিটকে-পড়া কোনো চরিত্র নন। পৃথিবী যখন তাঁদের জন্য গভীর প্রত্যাশায় ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করে—তাঁরা আবির্ভূত হন তখনই। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মকালে ভারতবর্ষ অন্তর্যাতনায় দগ্ধ মনপ্রাণ নিয়ে অপেক্ষা করছিল তাঁর মতো বিরাট প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের জন্য।"

স্বামীজীর নিজের লেখা বা তাঁর বিষয়ে লেখা পুস্তকাবলীর বিষয়ে যেসব আলোচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের মধ্যেও ছিল বিপুল শ্রদ্ধার শিহরণ। স্বামীজীর বাংলা বই 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে মাদ্রাজের ব্রহ্মবাদিন্ অফিস থেকে বেরিয়েছিল। সেই বইয়ের উপর আলোচনাকালে এই পত্রিকা (এপ্রিল ১৯১০) যদিও সংবাদ হিসাবে ভুল ক'রে বলে যে, সেটি স্বামীজীর 'বক্তৃতাবলীর' অনুবাদ, কিন্তু সঠিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোনই ভুল করেনি। সেই রচনায় পাই, বইটি "বিশেষভাবে উপাদেয় পাঠ্য", "জ্বলন্ত ভাবাবেগে পূর্ণ", "দৃঢ় বিচক্ষণ মন্তব্যে সমৃদ্ধ।" "বইটি ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যদেশের পৃথক অবস্থা ও অবস্থানের বিষয়ে আমাদের বিরল অন্তর্দৃষ্টি লাভের সুযোগ দেয়, যার অন্তর্গত ধর্মীয় আদর্শ, নৈতিক অভিপ্রায়, সামাজিক নীতি ও সাধারণ ভাবাবেগ, সেইসঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিককালের বিভিন্ন ধরনের মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে রুচিভেদ।" এই মূল্যায়ন সংক্ষিপ্ত হলেও যথাযথ।

আর একটি পুস্তক, স্বামীজীর '*Inspired Talks*'। আমেরিকার থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড

পার্কে প্রায় দু মাস স্বামীজী দিব্য ভাবাবস্থায় ছিলেন। সেই উচ্চভূমি থেকে উচ্চারিত কিছু কথা লিখে রাখেন অ্যালান ওয়ালডো। সেখানে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত বারোজন শিষ্য-শিষ্যা স্বামীজীর সেই প্রেরণাময় দিনগুলির প্রত্যক্ষদর্শী। অ্যালান ওয়ালডো-র সংকলিত স্বামীজীর উক্তিগুলিই 'ইনস্‌পায়ার্ড টকস্' (বাংলা অনুবাদ 'দেববাণী') নামে প্রকাশিত হয়। ইন্ডিয়ান রিভিউ-এর ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ সংখ্যায় জনৈক 'পাশ্চাত্য শিষ্য' বইটির বিষয়ে আলোচনা করেন। "যে-কোন মাপে বা মানে এটি সুমহান পুস্তক...যার প্রতিটি পৃষ্ঠায় জ্বলছে স্বামীজীর প্রেরণার অগ্নি"—এহেন মন্তব্যের সমর্থনে আলোচক বইটির বেশ কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন। যথা, ঈশ্বরাবতার সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছিলেন, "যেহেতু অসীম অনন্তকে পূজা করা সম্ভব নয়, তাই অর্চনা করতে হয় বাহ্যত আমাদেরই মতো কোনো মানুষের মধ্যে তাঁর অভিব্যক্তির।" ঈশ্বরাবতার ও বার্তাবহদের (প্রফেট) মধ্যে তফাত দেখিয়ে বলেন, "বার্তাবহরা ধর্মের প্রচার করেন, আর যীশুখ্রীস্ট, বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণের মতো অবতাররা ধর্মদান করেন—তা করার জন্য একটু স্পর্শ বা একটি চাহনিই যথেষ্ট।" আজন্ম খ্রীস্টীয় ভাবনায় লালিত পাশ্চাত্য শিষ্যটির কাছে বিভিন্ন অবতারের মধ্যে যীশুখ্রীস্ট সম্বন্ধীয় স্বামীজীর বক্তব্য বিশেষ মনোহারী মনে হয়েছিল। "বাইবেলের অনেক অংশ স্বামীজী আশ্চর্যপ্রকার মৌলিক ও আলোকময় রূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন কিন্তু," আলোচক এইসঙ্গে যোগ করেন, "স্বামীজী নিছক 'পুস্তক-পূজা' সম্বন্ধে কোনোই সহানুভূতি দেখান নি!" "ও হলো অতি বিকট অত্যাচার—প্রোটেস্টান্ট বাইবেলের অত্যাচার"—স্বামীজী বলেছিলেন। তিনি আরও বলেন, "খ্রীস্টানদের দেশে প্রতিটি মানুষের মাথায় চাপানো আছে একটি বিরাট গির্জা, যার চূড়োয় একটি বই—বাইবেল।" ভিতর থেকে বিকাশই স্বামীজীর মূল বাণী। এই কথাটির পক্ষে আলোচক বইটি থেকে যেসব অংশ উৎকলন করেছিলেন তাদের একাংশ এই:

"খ্রীস্ট ও বুদ্ধগণ কেবল প্রচ্ছদপট, যার উপর আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি রূপায়িত হতে পারে।...নিজেকে দুর্বল ভাবাই সবচেয়ে বড় পাপ।...উঠে দাঁড়াও। বলো, আমি প্রভু, সমস্ত কিছুর প্রভু। শৃঙ্খল রচনা করেছি আমরা, আমরাই তাকে ছিঁড়তে পারি।...বস্তু-জগতের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তবে তাকে আমরা প্রাণময় ক'রে তুলতে পারি, নচেৎ নিজস্ব-ভাবে তা মৃত, জড়। আমরা তাদের জীবন দিই, অথচ কি বিচিত্র, তাদের দেখে কখনো ভয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকি, কখনো-বা তাদের ভোগ করতে প্রলুব্ধ হই।"

এই ধরনের নানা উক্তি উদ্ধার করার পরে আলোচক এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন:

"পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে স্বামীজীর বাণী আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেছে উচ্চ থেকে উচ্চতর লোকে, যে পর্যন্ত-না চূড়ান্ত নৈরাশ্যগ্রস্ত মানুষ পেয়েছে আশা, দুর্বলতম মানুষ হয়েছে শক্তিমান।...কেউই একথা অস্বীকার করতে পারবেন না, যে, 'ইনস্‌পায়ার্ড টকস্' জীবনযুদ্ধে নিয়োজিত মানবসমাজের কাছে এক বিরাট পুরুষের উত্তরাধিকার। পৃথিবী সমৃদ্ধতর হয়েছে এই গ্রন্থ প্রকাশে।"

জি এ নটেশন তাঁর কোম্পানির পক্ষ থেকে *'Swami Vivekananda: An Exhaustive and Comprehensive Collection of His Speeches and Writings'* নামক ছয়শ বাহাত্তর পৃষ্ঠার বই প্রকাশ করেন, আর তার উপর এক দীর্ঘ আলোচনা করেন কে এস রামস্বামী

শাস্ত্রী, ইন্ডিয়ান রিভিউ-এর ডিসেম্বর ১৯০৫ সংখ্যায়। "ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজনের এই রচনাবলীতে ওতঃপ্রোত অক্ষয় সৌন্দর্যের" সম্বন্ধে আলোচনাকালে সমালোচক আত্মশাসন ক'রে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বললেন: "এমন একটা সময় ছিল যখন স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য মানুষের দৃষ্টিকে এমনই ঝলসে দিয়েছিল যে, তাঁর সঠিক মূল্য নির্ণয় করা অসম্ভব ছিল। সকলেই যাঁকে আরাধনা করতে উদ্‌গ্রীব—কঠিন ছিল তাঁর সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা। সর্বোচ্চ প্রশস্তির ভাষা ছাড়া যাঁর সম্বন্ধে কিছুই ব্যবহৃত হতো না, তাঁর বিষয়ে বুদ্ধিসম্মত সমালোচনাও ছিল যেন চিন্তার অতীত। কিন্তু সেই অন্ধ স্তুতির দিন এখন অবসিত। লোকে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, কে সেই মানুষটি যিনি কথার যাদুতে আমাদের সম্মোহিত ক'রে রাখতেন? জনগণের মনের উপরে কিভাবে তিনি ওহেন মুগ্ধমায়া বিস্তার করতেন? চিন্তাজগতে তাঁর দান কি?"

এইরকম ফলাও একটা ভণিতার পরে আমরা স্বতঃই আশা করেছিলাম, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রামস্বামী শাস্ত্রীর কলম থেকে সৎ সমালোচনার কিছু নমুনা আমরা পাব, কেননা আমরা তো বুদ্ধিজীবীদের বয়ান থেকে জেনেই ফেলেছি, কোনো মানুষ, যত বড়ই হোন না কেন, ত্রুটি দুর্বলতার অতীত নন। রামস্বামী শাস্ত্রীর দীর্ঘ লেখাটির মধ্যে খুঁজেছি এবং খুঁজেছি, কিন্তু হায়, সে বস্তুর কোনো সন্ধান পাইনি। পরিবর্তে পেয়েছি সমুচ্চ সমাদরের ভাষায় বিবেকানন্দের চরিত্র ও কার্যাবলীব বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণ, উপযুক্ত উদ্ধৃতিসহ। এই রচনাটিকে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তানায়ক ভূমিকার বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের খসড়া-রূপ বলা যায়।

রচনাটির প্রথমে রয়েছে স্বামীজীর চৌম্বক ব্যক্তিত্বের এবং অন্তর্গত চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ। তারপর ভারতের জন্য তাঁর একান্ত তীব্র ভালোবাসার কথা। "পরম প্রিয় নামটির—ভারত নামটির—উল্লেখমাত্রে তাঁর চোখে জ্বলে উঠত নতুন আলোক, সৌন্দর্যময় দেহাবয়ব শিহরিত ও আন্দোলিত হয়ে উঠত নতুন আবেগে।" তারপর ক্রমান্বয়ে আছে তাঁর পূর্ণ নির্ভীকতা এবং প্রতিভার অসাধারণ বহুমুখিতার কথা। স্বামীজীর ভিতরে ছিল বাগ্মিতার প্রবাহ, অভিব্যক্তির উৎকৃষ্ট ভঙ্গি, সংস্কৃতসহ অন্য কয়েকটি ভাষায় ব্যুৎপত্তি, সঙ্গীতে দক্ষতা, অপূর্ব কণ্ঠস্বর, মাতৃভাষার সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য দান, ঝলসানো ব্যঙ্গ-বাক্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের সিদ্ধান্তকে আয়ত্ত করার ক্ষমতা, শিষ্যস্নেহ, পরাক্রান্ত প্রাধান্য, প্রকৃতির উপর নিজেকে উত্তোলিত করার শক্তি, আত্মার বিরাটত্ব, হিমালয়প্রমাণ পবিত্রতা, এবং জ্যোতির্ময় আধ্যাত্মিকতা। তাঁর রচনাবলী সম্বন্ধে রামস্বামীর বক্তব্য:

(১) শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের ধারায় সর্বশ্রেষ্ঠ এক আচার্য তিনি; প্রাচীন ধর্মভাবনাকে সুন্দরতম ভাষায় মণ্ডিত করেছেন এবং আধুনিক চিন্তাধারার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন সেই পুরাতনী প্রজ্ঞাকে। "ভারত পৃথিবীকে যেসব শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর চিন্তারাজি দান করেছে, সে সকল পাওয়া যাবে তাঁর রচনাবলীতে। সেসব রচনার ভঙ্গি তাঁর নিজস্ব, যা আধুনিককালের সবচেয়ে অগ্রসর বিজ্ঞানবিদ্‌দের স্বীকৃতি লাভ করতে সমর্থ।" (২) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের অমরবার্তার বাহক তিনি—যা ঘোষণা করেছে, সকল ধর্মমতই সত্যের মন্দিরে প্রবেশের স্বর্ণদ্বার: ঈশ্বরের সবচেয়ে সহজ অর্চনা মাতৃরূপে: উপলব্ধি ছাড়া ধর্ম নেই। (৩) প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে: কোনোজাতিরই সেই আদর্শকে ত্যাগ করা উচিত নয়। (৪) আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রভূমি হওয়াই পৃথিবীর ক্ষেত্রে ভারতের শ্রেয় কর্ম; ধর্মই

ভারতের মুক্তিক্ষেত্র। (৫) মায়াবাদ সম্বন্ধে স্বামীজীর ব্যাখ্যা মৌলিক। (৬) দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে সমূহ পার্থক্য নেই; অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদেরই পরিণতি। (৭) অধ্যাত্মক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবীই অখণ্ড। (৮) বেদান্তেই আছে সত্যকার নৈতিকতার ভিত্তি। (৯) যথার্থ কর্ম নির্ভর করে ত্যাগের উপর। (১০) অশুভের সম্পূর্ণ ধ্বংস সম্ভবপর নয়; কালগতি তরঙ্গায়িত, উত্থানের পরেই তার পতন। (১১) ধর্মবিষয়ে প্রয়োজন পূর্ণ স্বাধীনতা; "প্রত্যেক মানুষই যেন মুক্তির আলোক পায়—বিকাশের একমাত্র শর্ত তাই।" (১২) সবকিছুর উপরে সত্যের স্থান; সমাজ তার আনুগত্যের নমস্কার জানাবে সত্যকে, নইলে তার ধ্বংস অনিবার্য। (১৩) সাধারণ মানুষকে উন্নীত ক'রে অন্য সকলের সঙ্গে একভূমিতে আনাই প্রধান কাজ, তার জন্য প্রয়োজন সর্বজনীন শিক্ষা। (১৪) সংস্কার হবে গঠনাত্মক—ধ্বংসাত্মক নয়। (১৫) মানুষ যে অমৃতের সন্তান, পাপের সৃষ্টি নয়—মানুষের অন্তর্নিহিত এই প্রকৃতি অবশ্যই উপলব্ধি করাতে হবে।

সবকিছুর উপরে ছিল **বিবেকানন্দ মানুষটির নিত্য বর্তমানতা**। আলোচনার গোড়ার দিকে তার কথা এনেছেন রামস্বামী শাস্ত্রী:

> "মানুষ হিসাবে বিবেকানন্দ! এই প্রসঙ্গই প্রথমে আনব। তাঁর সান্নিধ্যে আসার বিরল সৌভাগ্য যাঁরা লাভ করেছেন তাঁদের কেউই তাঁর ব্যক্তিত্বের মোহন আকর্ষণের কথা ভুলতে পারবেন না। তাঁর সান্নিধ্যে থাকার সময়ে দিনকে মনে হতো ঘণ্টা, ঘণ্টাকে মনে হতো মুহূর্ত। তাঁর উপস্থিতির মধ্যে ছিল বিশালের মহিমা; চমক লাগানো সৌন্দর্যে ভরা দেহগঠন; অতুলনীয় ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত দুই চোখ। শ্রোতাদের উপর অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করত তাঁর চরিত্রের যেসব গুণাবলী তাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান হলো আত্মার ঐকান্তিকতা। ভঙ্গি বা ভাণ সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধৈর্য ছিলনা। সাজানো কথা, বাক্‌চাতুরী দিয়ে তাঁকে ঠকানো সম্ভব ছিলনা। বাইরের আবরণের নীচে কী আছে তা তিনি দেখতে পেতেন, এবং তার চতুষ্পার্শ্বে বলবৎ বাহ্য রীতিনীতি ও আনুষ্ঠানিকতাকে আঁকড়ে ধরার দুঃখজনক প্রবণতাকে তিনি অভ্রান্ত বাক্যে ধিক্কার দিয়েছেন—ওসব হলো অতীতের সুন্দর জিনিসের কঙ্কালমাত্র।"

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনা ছড়িয়েছিল সারা ভারতে—সেই প্রেরণায় শুরু হয়ে যায় সর্বভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন। বাংলার ক্ষেত্রে আন্দোলনের একেবারে সূচনায় নেতৃত্ব ছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের হাতে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চরমপন্থী দলের নেতৃত্ব করেছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, লাজপত রায়। নিবেদিতা ও অরবিন্দ জাতীয়তার প্রাণাগ্নিতে ইন্ধন দিচ্ছিলেন। এই কালে নানা দিকে স্বীকৃত হয়েছিল—সবকিছুর উৎসমূলে আছেন বিবেকানন্দ। তিলকের কারাদণ্ডের পরে তাঁরই বন্ধু ও কর্মসহায়ক এন সি কেলকার তিলক-সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'মরাঠা'-র সম্পাদক হন। মরাঠা পত্রিকার ১৪ জানুয়ারি ১৯১২ সংখ্যায় লেখা হয়: **"স্বামী বিবেকানন্দই ভারতীয় জাতীয়তার সত্যকার পিতা।"** একই পত্রিকায় তাঁকে **'বর্তমান ভারতের পিতা'** বলে ঘোষণা করা হয়। অ্যানী বেশান্তের **'কমনউইল'** পত্রিকার ১৮ অগস্ট ১৯১৬ সংখ্যায় বিপিনচন্দ্র পাল লেখেন:

"বিবেকানন্দ সঙ্গতভাবেই দাবি করতে পারেন—তিনি আমাদের আধুনিক জাতীয়তার সর্বপ্রধান আচার্য ও প্রচারক। তিনিই প্রথম আমাদের দেশ ও সংস্কৃতি বিষয়ে জ্বলন্ত বাসনার তীব্র ঝঙ্কার তোলেন। গত দশকে জাতীয়তাবাদী প্রচারকার্যে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল নিবিড় অনুভূতিময় দেশপ্রেম—তার ধ্বনি তিনিই প্রথম তুলেছিলেন।"

অ্যানী বেশান্ত নিজেও এ কথা স্বীকার করছেন তাঁর ১৯১৫ সালে প্রকাশিত '*India: A Plea for Indian Self-Government*' গ্রন্থমধ্যে—"বিবেকানন্দ জাতীয়তার প্রবলতম অনুভূতির স্রষ্টা।" অরবিন্দ ঘোষের ১৯০৪ সালের পুস্তিকা (সরকার কর্তৃক যা বাজেয়াপ্ত হয়) 'ভবানী মন্দির'-এর কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হয়েছেন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। অরবিন্দ লিখেছিলেন:

"ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসের ব্যক্তিত্ব থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছিল কোন্ বাণী? সিংহ-হৃদয় বিবেকানন্দ পৃথিবীকে ঝাঁকাতে চাইছিলেন যে-বাগ্মিতার দ্বারা—তার মর্মকেন্দ্র গঠিত হয়েছিল কিসের দ্বারা?...না, ভারতবর্ষের বিনাশ নেই, বিলুপ্ত হবেনা আমাদের জাতি, কারণ পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে ভারতের জন্যই সংরক্ষিত আছে ঊর্ধ্বতম ও অপূর্বতম নিয়তিবিধানের অধিকার।...সমগ্র পৃথিবীর জন্য ভাবী ধর্মকে প্রেরণ করতে হবে ভারতকেই—সেই প্রাচ্য ধর্মে সমন্বিত থাকবে সকল ধর্মসত্য, বিজ্ঞান, দর্শন—তা মানবসমাজকে গঠন করবে অখণ্ডসত্তারূপে।...এই বিরাট কর্মের—কোনো জাতির উপর এতাবৎ ন্যস্ত হয়নি এমন সুবিশাল অনন্যপূর্ব কর্মের—শুভসূচনা করতেই ভগবান্ রামকৃষ্ণের আবির্ভাব, বিবেকানন্দ যার বার্তা প্রচার করেছেন।"

ইন্ডিয়ান রিভিউ কোনো মতে চরমপন্থীদের মুখপত্র নয়—স্বাধীনতা-আন্দোলনের উত্তাল যুগেও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বাইরে যেতে প্রস্তুত ছিল না—এহেন পত্রিকাও কিন্তু সাদরে উদ্ধৃত করেছিল মাদ্রাজের চরমপন্থীদের মুখপত্র থিরুমলাচার্য-সম্পাদিত 'বালভারত' পত্রিকার জানুয়ারি ১৯০৮ সংখ্যার বিশেষ রচনাটি—'*Vivekananda, the Real Pioneer of the New Movement*'. বালভারতের এই প্রবন্ধের শুরুতে লেখা হয়: "এই নব (জাতীয়তা) আন্দোলনের সৃষ্টি-উৎস স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিসমূহ, যিনি নিজ দেশবাসীকে—গোটা ভারতবর্ষকে—নবজাগ্রত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যে, জাগরণের কাজ করতে হবে 'ভারতের ভিতরের ও ভারতের বাহিরের প্রতিটি জাতির জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে'।" স্বামীজীর জাতীয়তাবোধকে কয়েকটি বিশেষ উক্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরে, রচনাটি শেষ করা হয়েছিল এই কথাগুলি বলে:

"দশ বৎসর আগে স্বামীজী (জাতির) চিন্তাতরঙ্গের মধ্যে এই যে সমস্ত ভাব সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছিলেন, তা নব আন্দোলনের মধ্যে ঘনায়িত আকার ধারণ ক'রে, সমগ্র উত্তর ভারতের উপর দিয়ে বন্যাবেগে প্রবাহিত হয়েছিল, সর্বত্রই

আকর্ষণ ক'রে এনেছিল অনুগামীদের, এবং শ্রেষ্ঠ প্রবক্তারূপে লাভ করেছিল—ব্রাহ্মসমাজের বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, আর্যসমাজের লালা লাজপত রায় এবং রক্ষণশীল দলের শ্রীযুত বালগঙ্গাধর তিলককে।"

॥ দশ ॥

স্বামীজীর দেহান্তের পরে লিখিত শোকপ্রবন্ধের মধ্যে সম্পাদক লিখেছিলেন যে, তখনই তাঁদের পক্ষে ঐ বিরাট পুরুষের যথোপযুক্ত মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়, পরে সে কাজ করবেন—একথা আগেই বলেছি। সেই প্রতিশ্রুতি তিনি কিভাবে রক্ষা করেছিলেন, তা পত্রিকাটির পরবর্তী এক দশকের পৃষ্ঠা থেকে যথাসম্ভব সংকলন ক'রে দেখবার চেষ্টাও করেছি। এক্ষেত্রে নিশ্চিত প্রত্যয়ে বলব, ১৯০২ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো ইংরেজী মাসিক পত্রিকাই বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারা প্রকাশে ইন্ডিয়ান রিভিউ-এর তুল্য ভূমিকা গ্রহণ করেনি। আর যে দুটি পত্রিকা ব্যাপকভাবে এই কাজে নিয়োজিত ছিল—ব্রহ্মবাদিন্ ও প্রবুদ্ধ ভারত—তারা স্বামীজীর শিষ্যগণ অথবা রামকৃষ্ণ সংঘ দ্বারা পরিচালিত এবং প্রধানত ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক ভাব ও চিন্তাপ্রচারে উদ্দিষ্ট। ইন্ডিয়ান রিভিউ অপরপক্ষে সাধারণ বিষয়াত্মক পত্রিকা, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নানামুখী প্রসঙ্গ প্রকাশে নিয়োজিত, সেজন্য শিক্ষিত-সাধারণের কাছে অধিকতর গ্রাহ্য। এখানে উল্লেখ্য, ইন্ডিয়ান রিভিউ-এর মালিক-সম্পাদক জি এ নটেশনের সম্পর্কে যে দু-একটি রচনা আমরা দেখেছি, তাদের মধ্যে, যেমন ডিক্সনারি অব ন্যাশন্যাল বায়োগ্রাফি-তে (এস পি সেন সম্পাদিত) নটেশনের জীবনচিত্রের লেখক বলেছেন, "নটেশনের অনেক বন্ধুর অন্যতম স্বামী বিবেকানন্দ"। এর থেকে ভ্রান্ত সংবাদ আর কিছু হতে পারে না। ইংরেজী মতে, 'ফ্রেন্ড' শব্দটিকে শেষ সীমা পর্যন্ত টেনে বাড়িয়েও তার মধ্যে বিবেকানন্দকে ধরানো যাবে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, নটেশনের কাছে বিবেকানন্দের তুল্য চরিত্র আর কেউই নন—তিনি নটেশনের দৃষ্টিতে দিব্যপুরুষ, যিনি দেশ ও ধর্মের পরিত্রাতারূপে আবির্ভূত। ইন্ডিয়ান রিভিউ থেকে যেসব লেখা আমরা উপস্থিত করেছি সেগুলি এই কথার সত্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করবে। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পরে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ঢেলে নটেশন যা লিখেছিলেন, পরবর্তী বৎসরগুলিতে তার থেকে তাঁর ধারণা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি—একথা অন্তত পরবর্তী এক দশকের কিছু বেশি সময় সম্বন্ধে আমি বলতে পারি—যে সময়ের সংখ্যাগুলি আমি পরীক্ষা করেছি।

১৯০২ জুলাই সংখ্যা *'The Passing of a Great Hindu Monk'* লেখাটির সূচনায় ছিল:

"বিপুল গৌরবোজ্জ্বল আলোক এখন নির্বাপিত। সমগ্র দেশের উপর নেমে এসেছে ভয়ানক নৈরাশ্য ও বিষাদের ছায়া। যে অত্যুজ্জ্বল তারকাটি দশ বৎসরাধিক কাল ধরে ঈশ্বরের মহিমা এবং মানবের ঈশ্বরত্বের কথা সর্বোচ্চ গরিমার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন—তিনি প্রস্থান করেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। ঈশ্বরের নিকট হতে যাঁর অবতরণ, ঈশ্বরের নিকটেই তাঁর প্রত্যাবর্তন। সেই মহাত্মন্—যিনি মর্ত্যের মানুষের

কাছে প্রাণপ্রিয় রূপে গণ্য বস্তুগুলিকে জীবনের সূচনাপর্বেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, অঙ্গে ধারণ করেছিলেন সন্ন্যাসের গৈরিক, হস্তে গ্রহণ করেছিলেন ভিক্ষাপাত্র, পরিভ্রমণ করেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে, লঙ্ঘন করেছেন মহাসাগর বেদান্তের মহিমা প্রচার করবার জন্য—আ-হাঃ! তিনি আর নেই।"

সাধারণত সমষ্টিবেদনার কথাই থাকে জনপ্রিয় পত্রিকার শোকপ্রবন্ধে। এই লেখাটিতে কিন্তু ছিল সম্পাদকের যন্ত্রণাদীর্ণ ব্যক্তি-হৃদয়ের রক্তরেখা:

"সেই বিরাট মহিমময় মূর্তি আর আমরা দেখতে পাবনা। আর শুনতে পাবনা ঘনৈশ্বর্যময় বাক্যধারা, যা একেবারে সম্মোহিত ক'রে রাখত প্রত্যেকটি মানুষকে, যাঁরাই তাঁর প্রভাবমণ্ডলের মধ্যে এসেছেন।"

শুধুই মধুবর্ষণ করেন নি সেই পুণ্যপুরুষ। বহু যুগ ধরে ভারতকে পতনের গহ্বরে নামিয়ে রেখেছে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি—তাদের কঠিনতম সমালোচক তিনি ছিলেন। কিন্তু যে কাজই তিনি করুন-

"তাঁর ধর্মে জাতি বা বর্ণের ভেদ ছিলনা, তাঁর দর্শনে ছিলনা নির্দিষ্ট রীতিবন্ধন বা বাক্যের ফুলঝুরি। সীমাহারা তাঁর সহানুভূতি ও প্রেম। প্রতিটি নর ও নারীকে তিনি চিনে নিয়েছিলেন নিজের ভ্রাতা ও ভগিনীরূপে। সম নিঃশ্বাসে, সম উদ্দীপনায়, তিনি হিন্দুর ব্রহ্ম, জরথুষ্টবাদীদের অহুর মজদা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ইহুদীদের জিহোবা এবং খ্রীস্টানদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবগান করতেন। কোনো ধর্ম বা উপাসনাপদ্ধতির প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিলনা।"

এই হলেন বিশ্বজনীন পুরুষ, দিব্যপুরুষ—যাঁর উদ্দেশ্যে জি এ নটেশন নমস্কারে নত হয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. আবেদনপত্রটি মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০২ তারিখে মুদ্রিত হয়।

২. এম চলপতি রাও, 'দি প্রেস', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লী (১৯৭৪) পৃ. ১৫৫-৫৬।

৩. এ রামস্বামী , 'নটেশন, জি এ', 'ডিক্সনারি অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি'র অন্তর্গত, এস পি সেন সম্পাদিত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫-৪৬।

৪. পৃ. ২৪৬।

৫. স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার, 'বায়োগ্রাফিক্যাল ভিস্টাস' (১৯৬৮), এশিয়া পাবলিশিং হাউস, পৃ. ২৫৩-৪৪।

৬. ঐ, পৃ. ২৪৪।

৭. ঐ, পৃ. ৬৮।

[প্র 'নিবোধত' পত্রিকার আশ্বিন ১৪০২ এবং পৌষ ১৪০২ সংখ্যায় প্রকাশিত।]

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'লাইট অব দ্য ইস্ট' এবং 'ডন' পত্রিকায় বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ

॥ এক ॥

ডন সোসাইটি এবং ডন পত্রিকা সূত্রে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯৪৮) বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলায় সুপরিচিত চরিত্র। ঐ সময়ের আগেও তিনি সামাজিক এবং ধর্মীয় চিন্তা ও চেষ্টায় যুবকদের নিয়োজিত করার কাজে যুক্ত ছিলেন। সেইসঙ্গে একটি ধর্মীয়-সামাজিক পত্রিকাও প্রকাশ ক'রে গেছেন।

হুগলি জেলার বানিপুরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে সতীশচন্দ্রের জন্ম। প্রথম জীবনে পিতা কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবে তিনি অগুস্ত্ কোম্‌তের 'পজিটিভিজম্' মতের প্রতি আকৃষ্ট হন। নিরীশ্বরবাদী পজিটিভিজম্-মত কেবল 'মানবতার ধর্মেই' বিশ্বাসী। সতীশচন্দ্র কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এ পাস করেন। ১৮৮৬ সালে ইংরেজিতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন—১৮৯০ সালে বি-এল। প্রথমে মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষকতা, তারপরে ১৮৮৭ সালে বহরমপুর কলেজে ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপনা।[১] কলকাতাকে নিজ কর্মকেন্দ্র করার ইচ্ছায় তিনি অধ্যাপনার চাকুরি ত্যাগ ক'রে কলকাতায় আইনব্যবসা শুরু করেন।

সমকালের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। সিদ্ধান্ত করেন—তরুণদের জ্ঞানোন্মেষ ঘটিয়ে মহৎ জীবন যাপনে তাদের প্রণোদিত করাই হবে তাঁর জীবনব্রত। সতীশচন্দ্র অতঃপর পজিটিভিজম্ মত ত্যাগ ক'রে সনাতন হিন্দু ভাবধারা গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ সালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য হন।

সতীশচন্দ্রের জীবনের ভাবরূপান্তরের প্রথম পর্বে তাঁর চিন্তা ও চেষ্টার প্রকাশ ঘটতে থাকে তাঁর সম্পাদিত 'লাইট অব দি ইস্ট' পত্রিকার মধ্য দিয়ে। পত্রিকাটির সূচনা হয় ১৮৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

॥ দুই ॥

এ সংবাদ অল্পই জানা আছে যে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বেই ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে সতীশচন্দ্রের চিন্তাজগতে পরিবর্তনের সূচনা ঘটেছিল, এবং তার পিছনে রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কোনো সংবাদ আমাদের গোচরে নেই, তবে সেই পুণ্যপুরুষ সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল—

এবং তরুণ বয়সে তিনি বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এ-বিষয়ে সতীশচন্দ্র বলেছেন:

"ইংরেজী ১৮৭৯ সাল, ষোল বছরের ছেলে নরেন্দ্রনাথকে প্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজে বুথ সাহেবের অঙ্কের ক্লাসে দেখলাম। পরিচয় করালেন শশিভূষণ বসু, আমার বন্ধু, ঐ কলেজেরই ছাত্র, অঙ্কে খুব ভালো, অধ্যাপকের পরম প্রিয়। তাছাড়া শশীর গানের চর্চা ছিল বলে নরেনের সঙ্গে তার বিশেষ হৃদ্যতা। বুথ-সাহেব তখনকার দিনে খ্যাতনামা শ্রেষ্ঠ গণিত-বিশারদ, কেমব্রিজের র‍্যাংলার। অন্য কলেজের ছাত্রদেরও স্বীয় ক্লাসে অঙ্ক শেখাতেন, এত উদার। সেইজন্যই আমি যদিও মেট্রোপলিটান কলেজের এফ-এ ছাত্র, তবু ওখানে আমার প্রায় রোজ বেলা দুটোর পরে গতিবিধি। নরেন প্রথম বার্ষিক-এ প্রেসিডেন্সিতে পড়তেন। দ্বিতীয় বার্ষিক-এ জেনারেল অ্যাসেমব্লিতে গেলেও বুথের ক্লাসে যোগ দিতেন। তাছাড়া নরেন ও শশী হেয়ার স্কুলে এক ক্লাসে পড়েছিলেন। ["নরেন্দ্রনাথের হেয়ার স্কুলে পড়ার কথা জীবনীতে একদম নাই বা সমসাময়িক মুখে ইতিপূর্বে পাই নাই। তথাপি তার সম্ভাবনীয়তা রয়েছে। একবার মেট্রোপলিটান স্কুলে এক বদরাগী মাস্টারের চপেটাঘাত ও কানমলা খেয়ে, যাতে প্রচুর রক্তপাত হয়, তিনি অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাফ বলেছিলেন, মশাই, আপনার এ-স্কুলে আর পড়বো না। হয়ত রাগ ক'রে কিছুদিনের জন্য পড়া ছেড়ে বেপাড়ার হেয়ারে গিয়ে থাকবেন।"—সংকলক স্বামী নির্লেপানন্দের যোজনা]।

"শশীর ভবানীপুর বাড়িতে নরেন ও আমি প্রায়ই যেতাম। শশীর পিতা আমাদের ভালবাসতেন। কলেজ-পাড়ায় তিনজনে মিলে গোলদিঘিতে রাত্রি নয়টা-দশটা পর্যন্ত গল্পগান চলত। গাইতে না জানলেও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলাম। ক্রমে নরেন্দ্র ব্রাহ্মভাবাপন্ন হলেন। আর আমার তখন স্বদেশসেবার দিকে ঝোঁকের জন্য তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি ঘটল।

"পরমহংসদেবের অন্তর্ধানের দুই-তিন বৎসর পর আমি বরাহনগর রামকৃষ্ণ-মঠে যাতায়াত আরম্ভ করি। তখন স্বামীজী পরিব্রাজক, ওখানে নাই। ওখানের সাধুদের সঙ্গে যথাসাধ্য জলতোলা, ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া ও অন্যান্য কাজ ক'রে তৃপ্তি পেতাম। পরে মহেন্দ্র-মাস্টার মহাশয় ও দক্ষ-মহারাজ আমাকে প্রভুপাদ বিজয় গোস্বামীর নিকট নিয়ে যান। তারপর একেবারে কাশীপুর পাড়াতেই এক বাগানবাড়িতে [মতি শীলের বাগানবাড়ি] স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁর অন্য মূর্তি তখন। বাইরের দুনিয়াফেরত জগদ্বরেণ্য আচার্য শ্রীবিবেকানন্দ। একটা বৃহৎ হলঘর, একশো আন্দাজ লোক সেখানে উপস্থিত। প্রতীচীর ভক্তরাও ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে সকলের ধর্মালোচনা চলছিল। গোঁসাইজী [বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী] আমার ভিন্নমার্গগামী মনকে ধর্মমার্গে আনয়ন করেন। আমি ঢুকেছি দেখেই স্বামীজী তাঁর চেয়ার ছেড়ে, একেবারে দরজার গোড়ায় এগিয়ে এসে, গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে একটা কৌচে নিজের অতি নিকটে বসালেন, এবং সেই পূর্বকালের নরেন্দ্রনাথের মতো, মাঝে যেন কিছুই ঘটে নাই, ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাবে বালকের ন্যায় আলাপ করতে লাগলেন।

"অত লোকের মধ্যে তাঁর প্রতি আমিও সম্ভ্রম প্রকাশ করলাম দেখে স্বামীজী অতি সহজভাবে বললেন, 'কে কি মনে করবে? ও কিছু নয়।' পরে আমার জানা একটি মেধাবী

ছাত্রের সহিত আলাপ করিয়ে দেব ইচ্ছা প্রকাশ করায় (সে ছাত্র এখন একজন প্রসিদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত জজ) স্বামীজী অম্লানবদনে বললেন—'Is he a fanatic?' আমি বললাম—'No.' তখন তিনি উত্তর করলেন—'Then I have no need of him—তাকে আমার দরকার নেই।' 'ফ্যানাটিক' অর্থে তেজীয়ান যুবক—ধর্মের ও দেশের জন্য সর্বস্ব বলি দিতে যে প্রস্তুত—স্বামীজী এইভাবে রহস্যপূর্ণ শব্দটি ব্যবহার করলেন। স্বামীজী আমাকে দেশের কাজে অধিক যোগ্য হবার জন্য আমেরিকা, জাপান, পাঠাবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু আমার অনিচ্ছায় তা সম্ভব হয়নি।"[২]

এখানে উল্লেখ্য, স্বামীজী বিশেষভাবে চেয়েছিলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম ও দর্শনে কৃতবিদ্য চরিত্রবান ভারতীয়রা জাপান বা আমেরিকায় গিয়ে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার করুন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ধর্মবোধ বিদেশযাত্রার অন্তরায় ছিল। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা বিদুষী সরলা ঘোষালকে স্বামীজী একই অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু সরলা তাঁর আত্মীয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের কর্তাদের কাছ থেকে সে অনুমতি পাননি—একথা সরলা তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন।[৩]

স্বামী নির্লেপানন্দের সংগৃহীত সতীশচন্দ্রের বিবেকানন্দ-স্মৃতির অনুরূপ স্মৃতিকথন করেছেন অধ্যাপক বিনয় সরকার, অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের কাছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন ক'রে অধ্যাপক সরকারের কাছ থেকে যা শুনেছিলেন, তার প্রশ্ন-অংশ বাদ দিয়ে আমি উপস্থিত করছি। বিনয় সরকার বলেন:

"সতীশ মুখোপাধ্যায় এখনো [১৪ নভেম্বর ১৯৪২] বেঁচে আছেন। কাশীতে থাকেন। মাসকয়েক হলো তাঁর সঙ্গে কাশীতে দেখা হয়েছে। তাঁর সার্বজনিক কাজকর্ম বোধহয় ১৯২১-২২ সনের গান্ধী-যুগের পর কেউ বড়-একটা দেখেনি। আজকাল তিনি প্রকারান্তরে সত্যি-সত্যিই 'কাশীবাসী'।...তাঁর বয়স...বোধহয় আশির কাছাকাছি। সতীশবাবু বিবেকানন্দ, ব্রজেন শীল ইত্যাদি মনীষীদের প্রায় সমান বয়সের লোক। এঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বও তাঁর ছিল।...[তাঁকে প্রথম দেখি] ১৯০২ সনে। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিকের ছাত্র। সেই হিসাবে ইডেন হিন্দু হস্টেলের বাসিন্দা। একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোককে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের ঘরে যাওয়া-আসা করতে দেখতাম। তখন বোধহয় তাঁর বয়স বছর চল্লিশেক। শুনলাম, তাঁর কারবার হচ্ছে ইস্কুল-কলেজের ভালো ভালো ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করা।...খবর পেয়েছিলাম তিনি হাইকোর্টের উকিল, কিন্তু উকিলি করেন না [?]।...তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় ইত্যাদি ছাত্রদেরকে বাড়িতে মেসে হস্টেলে গিয়ে পড়ানো।...শুনলাম, কাউকে ইংরেজিতে লিখতে সাহায্য করতেন।...কারু সঙ্গে আবার [তাঁর] দেশের কথা সম্বন্ধে আলাপ হতো।...'দেশ', 'দেশের কথা', 'স্বদেশ-সেবা', 'দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ' ইত্যাদি শব্দ আমি আগে কখনো শুনিনি। শুনলাম প্রথম সতীশবাবুর সংস্পর্শে। তখন আমার বয়স পনর।...শুনলাম, লোকটা টাকা রোজগার করেনা। পারে তো গরীব ছেলেদেরকে সাহায্যও করে।...তারপর শোনা গেল, তিনি অবিবাহিত। বিয়ে না-করাটাও আমার মাথায় একটা প্রকাণ্ড নতুন জিনিস মালুম হয়েছিল।...সতীশবাবু যে সন্ন্যাসী ফকির বা

সাধু, তা কল্পনা করব কি ক'রে? লোকটা হাইকোর্টের উকিল। জামা-জুতা, কাপড়-চোপড়, খাওয়া-দাওয়া, হাসি-ঠাট্টা, মিল-স্পেনসার, শেক্সপীয়ার-কার্লাইল ইত্যাদিতে তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো লিখিয়ে পড়িয়ে বাঙালীর ফারাক কোথায়? [না, তখন আমি লিখিয়ে পড়িয়ে বাঙালী সন্ন্যাসী দেখিনি]।...সতীশবাবুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবার পূর্বে আমি বোধ হয় বিবেকানন্দের নাম পর্যন্ত শুনিনি।... বিবেকানন্দর নাম ছাড়া কিছুই তখন আমার জানা ছিল না।...বিবেকানন্দ যে একটা অতিবড় কিছু তা আমার মগজে ঢোকেনি।...সতীশবাবুর মজলিশে শুনতাম তাঁরই মুখে বিবেকানন্দ-কথা। ১৮৯৩-৯৭ সনের বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সতীশবাবু বলতেন—'বিবেকানন্দর বক্তৃতা সম্বন্ধে আমেরিকা হতে খবর আসত, আর সেসব আমি যেখানে-সেখানে বন্ধুবর্গের ভেতর পড়ে শুনাতাম।' সতীশবাবু বলতেন, 'বিবেকানন্দ চায় কেবল ইনস্‌পায়ার্ড ফ্যানাটিক (একবগ্‌গা পাগল) লোক। যারা কোনো কিছুর জন্য ক্ষেপে না-ওঠে, তাদের দ্বারা বিবেকানন্দের মতে কোনো কাজ হয়না।' [সেকথা] শুনে মনে হতো, বিবেকানন্দ একটা জবরদস্ত কিছু বটে। চাই একবগ্‌গা ক্ষ্যাপা।...একটা নতুন দর্শন বটে। মামুলি লোক দিয়ে বড়-কিছু ঘটানো সম্ভব নয়।...বিবেকানন্দর কাজকর্ম সম্বন্ধে...সহপাঠী বন্ধুদের আড্ডায় গুলতান চলত। বোধহয় শুনে থাকব যে বিবেকানন্দর কাজ ছিল 'সর্বধর্মসমন্বয়।'...সতীশবাবুর কাছে সর্বধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে কিছু [শুনেছি] মনে পড়ছে না। সতীশবাবুর আবহাওয়ায় ধর্ম প্রধান কথা ছিল না।...সতীশবাবুর চিন্তায় ধর্মের আন্দোলন বড় ঠাঁই অধিকার করত কিনা সন্দেহ। অবশ্য শুনেছিলাম তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। এই হিসাবে তিনি বিপিন পালের, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার, আর অশ্বিনী দত্তের গুরুভাই। কিন্তু ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করতে তাঁকে কখনো দেখিনি।...[সতীশবাবুর আলোচনায়] ব্যক্তির চেয়ে জাতি বড়, এই ছিল মুদ্দা। পরিবারের চেয়ে দেশ বড়, এই মন্তরই প্রচারিত হতো নানা আকারে। কোনোদিন স্পেনসার-এর বাণী, কোনোদিন মিল-এর বয়েৎ, কোনোদিন কার্লাইল-এর বুখ্‌নি। কিন্তু যা-ই আলোচিত হোক না কেন—ডাইনে-বাঁয়ে পাঁয়তারা করতে করতে সতীশবাবু এসে দাঁড়াতেন তাঁর স্বদেশনিষ্ঠায়। প্রত্যেক দিনই ঘুরে-ফিরে হাজির হতাম স্বার্থত্যাগের দর্শনে। বুঝতে পারতাম বিবেকানন্দ বাঞ্ছিত 'একবগ্‌গা ক্ষ্যাপামির জ্যান্ত প্রতিমূর্তি সতীশ মুখোপাধ্যায়'।"[৪]

দেখা গেল, বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে 'ইনস্‌পায়ার্ড ফ্যানাটিক' শব্দগুলি সতীশচন্দ্রের মুখে এসে যেত। ডন সোসাইটিতে ১৯০২-এর পরে সতীশচন্দ্র যদিও জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনাসহ চরিত্রগঠনের শিক্ষাদানেই ব্যাপৃত ছিলেন, সেইসঙ্গে দেশাত্মবোধ উন্মেষসাধনের প্রয়াসও চলত, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তিনি তখন ধর্মচিন্তা নিয়ে বিশেষরকম মগ্ন, এবং সেখানে নানা মাত্রার ওঠা-পড়া। নির্লেপানন্দজীকে প্রদত্ত সতীশচন্দ্রের স্মৃতিকথায় তাঁর বরাহনগর-মঠে যাতায়াতের স্বীকৃতি আছে। তিনি মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (শ্রীম) সঙ্গে পরিচিত হন ১৮৯০ সাল নাগাদ। বরাহনগর-মঠে তিনি যেতে পারেন, তবে প্রধানত আলমবাজার-মঠেই তাঁর যাতায়াত ছিল, কারণ বরাহনগর-মঠের সময় ১৯ অক্টোবর ১৮৮৬ থেকে অক্টোবর ১৮৯১ আর আলমবাজার-মঠের সময় ১৮৯১ নভেম্বর থেকে ১৮৯৮ ফেব্রুয়ারি। এক্ষেত্রে সূচনায় 'ডিক্সনারি অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি' থেকে যে-তথ্য সংকলন করেছি, তাতে যদিও বলা

হয়েছে যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে সংস্রবের ফলে তাঁর পজিটিভিস্ট মতের বিদায় ঘটে, তা কিন্তু পুরো সত্য নয়। না-হলে তিনি বরাহনগর-আলমবাজার মঠে রামকৃষ্ণ শিষ্যগণের সান্নিধ্যে উপস্থিত হতেন না। সেটা ছিল তাঁর আত্মানুসন্ধানের পর্ব, যার মধ্যে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে গেছে। তিনি যে মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের অনুরাগী ছিলেন, তা তাঁর নিজের রচনাতেই আছে, যা পরে উপস্থিত করব।

সুখের বিষয়, সতীশচন্দ্রের আলমবাজার-মঠে গমনাগমনের চমৎকার কথাচিত্র পেয়েছি স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথায়। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ভবানীপুরে। নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী না হইলেও সমসাময়িক পাঠী ছিলেন। ১৮৯১ সালে ইনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন এবং শনিবার ও রবিবার, এমনকি অন্য দিনেও বিশেষ কার্য না থাকিলে আদালতের কাপড় পরিয়াই, অর্থাৎ চোগা-চাপকান পরিয়াই, আলমবাজার-মঠে চলিয়া আসিতেন। প্রায় দুই বৎসর তিনি সর্বদাই আলমবাজার-মঠে যাতায়াত করিতেন। তুলসী-মহারাজ ও শরৎ-মহারাজের সহিত ইঁহার বেশি হৃদ্যতা ছিল। ইনি কখনো-কখনো ভিতর-বাড়ির পূর্বে উত্তর-কোণের ঘরটিতে, যেখানে ঠাকুরের ভাণ্ডার ছিল, অর্থাৎ পূজার দ্রব্যাদি থাকিত, তথায় বসিয়া বেশ ভক্তিভাবে ঠাকুরের ফুলের মালা তৈয়ারী করিতেন, কখনো-কখনো চন্দন ঘষিতেন, কখনো বা তাঁহাকে দিয়া যাহা হইতে পারিত, এরূপ কার্য করিতেন। যে-কয়দিন তিনি আলমবাজার-মঠে থাকিতেন, প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন, ও ঠাকুরঘরে বসিয়া ঠাকুরের পূজার কোনো-কোনো সামগ্রী গুছাইয়া দিতেন, এবং অপর সময়টি জপ করিতেন। রাত্রে শয়নকালে তিনি বাইরের বড়ঘরের ভিতর যে ছোটঘরটি আছে তথায় শুইতেন, এবং তুলসী-মহারাজও এক-একদিন তাঁহার পাশে কম্বল বিছাইয়া শুইতেন। সতীশ মুখোপাধ্যায় এই সময় অনেক রাত্র পর্যন্ত জপ করিতেন। তুলসী-মহারাজ মাঝে মাঝে বলিতেন, 'ও সতীশ, রাত অনেক হলো, এখন একটু ঘুমাও, সমস্ত রাত জপ করলে ঘুম হবেনা।' তাঁহার আহার অতি অল্প ছিল। একটি বাটিতে একটু ঝালের ঝোল ভাত দিয়া খাইতেন, এবং এক সূর্যে দু'বার অন্ন গ্রহণ করিতেন না বলিয়া রাত্রে একটা বাটি করিয়া অল্পপরিমাণে দুধভাত খাইতেন। তখন তাঁহার স্বভাব বালকের মতো হইয়াছিল। দেহ কৃশ, রঙ উজ্জ্বল, মুখ কিঞ্চিৎ লম্বা, চলন একটু ডাইনে-বামে হেলিয়া। কথায় জিবের একটু আড় ছিল। মুখে কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো অল্প দাড়ি। তিনি কখনো-কখনো বৈকালবেলায় কোঁচার কাপড়টি কোমরে ফেট্টি করিয়া বাঁধিয়া খালিগায়ে পূর্বদিকের রান্নাঘরের উপর যে-ছাতটি ছিল তথায় মেঝের উপর শুইয়া থাকিতেন এবং স্থিরনেত্রে কোনো বিষয় ভাবিতেন। মুখে খালি সাধন-ভজনের কথা লাগিয়া থাকিত, অন্য কথা বড় কহিতেন না।

"একদিন গিরিশবাবু আলমবাজার মঠে যান। গরমকাল, রবিবার আহারের পর একটু বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করিলে উপরকার ঘরগুলো বড় গরম হওয়ায় তুলসী-মহারাজ বাইরের বড় ঘরের নীচেকার এঁদো ঘরটি পরিষ্কার করিয়া মাদুর পাতিয়া রাখিয়াছিলেন এবং একখানি বড় এড়ানি-পাখাও তথায় রাখিয়াছিলেন। অনেকেই গিয়া সেই ঘরটির ভিতর শুইয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয়ে কথা হইতে লাগিল; সতীশ মুখুজ্যে

উঠিয়া এড়ানি-পাখাখানি লইয়া সকলকে বাতাস করিতে লাগিলেন। তুলসী-মহারাজ সতীশ মুখুজ্যের কষ্ট হইতেছে বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। সতীশ মুখুজ্যে অতি বিনীতভাবে বলিলেন, 'আমি আর সকলের বিশেষ কি সেবা করিতে পারি? একটু বাতাস ক'রে লোকের সেবা করতে পারব না?' এমন সবিনয়ে কথাগুলি বলিলেন যে, সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া গেল। গিরিশবাবু শুনিয়া বলিলেন, 'সতীশ, তুমি বাতাস করো। তুলসী, তুমি ওর ভক্তির উপর হাত দিও না; যখন ভক্তি ক'রে সেবা করছে করুক।' সতীশ মুখুজ্যে তখন অতি সংযত ও ভক্তিপূর্ণ ভাবে দাঁড়াইয়া বড় এড়ানি-পাখাখানি লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

"কয়েক বৎসর পর তিনি ডন্ (Dawn) নামক মাসিকপত্র বাহির করিলেন এবং তদবধি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের সহিত আর বিশেষ কিছু সংস্রব রাখিলেন না।'"

জীবনের এই পর্বে সতীশ মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রবিধি, ব্রহ্মণ্য আনুষ্ঠানিকতা এবং শান্তরসাস্পদ সাধনার একান্ত অনুরাগী। অপরদিকে আলমবাজার-মঠের জ্বলন্ত তরুণ সন্ন্যাসীরা সামাজিক নিয়মকানুনের ভ্রূক্ষেপ করতেন না, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে পাওয়া আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অনুযায়ী নিজেদের পথ নিজেরা কেটে চলতেন। এইসব সন্ন্যাসীদের অধিকাংশই তাঁর সমবয়স্ক। তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁদের পথ সতীশচন্দ্রের পথ নয়। ধর্মজীবনে নবাগত এই মানুষটি অলৌকিক শক্তিবিশিষ্ট এমন একজনকে চাইছিলেন, যাঁর কাছে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করা যায়। তাঁর মনোবাঞ্ছা জেনে এবং বুঝে শ্রীম তাঁকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকটে নিয়ে যান, যাঁকে সতীশচন্দ্র গুরুরূপে বরণ করেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবশালী প্রচারক ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি তাঁর পারিবারিক বৈষ্ণব ধর্মমতে ফিরে যান। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ অদ্বৈতাচার্য-বংশীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা ও আশীর্বাদ তিনি পেয়েছিলেন। ব্রাহ্মদের মধ্যে সাধারণভাবে এই বিশ্বাস জেগেছিল যে, কেশবচন্দ্র সেন এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ধর্মধারণায় পরিবর্তনের মূলে তাঁদের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব। এ-ব্যাপারে স্বামী সারদানন্দের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পেয়েছি—যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্রবে আসার আগে ব্রাহ্মসমাজের অনুবর্তী ছিলেন।

সারদানন্দ লিখেছেন:

"সন ১২৮৪ সালে, ইংরাজী ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ৬ মার্চ তারিখে, শ্রীযুক্ত কেশব তাঁহার কন্যাকে কুচবিহার প্রদেশের মহারাজের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। বিবাহকালে কন্যার বয়স যে-সীমা ব্রাহ্মসমাজ ইতঃপূর্বে স্থির করিয়াছিল, কেশব-দুহিতার বয়স তদপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন থাকায় উক্ত বিবাহ লইয়া সমাজে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল এবং পাশ্চাত্যানুকরণে সমাজসংস্কারপ্রিয়তারূপ শিলাখণ্ডে প্রতিহত হইয়া এখন হইতে উহা 'ভারতবর্ষীয়' ও 'সাধারণ' নামক দুই ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকিল। ব্রাহ্মসমাজের উপর ঠাকুরের প্রভাব কিন্তু ঐ ঘটনায় নিরস্ত হইল না। তিনি উভয় পক্ষকে সমান আদর করিতে লাগিলেন এবং উভয় পক্ষের পিপাসু

ব্যক্তিগণই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্বের ন্যায় আধ্যাত্মিক পথে সহায়তা লাভ করিতে লাগিল।...

"কুচবিহার-বিবাহ লইয়া বিচ্ছিন্ন হইবার পর শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রী 'সাধারণ' সমাজের আচার্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত বিজয় ইতঃপূর্বে সত্যপরায়ণতা এবং সাধনানুরাগের জন্য কেশবের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। আচার্য কেশবের ন্যায় ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভের পরে বিজয়কৃষ্ণেরও সাধনানুরাগ বিশেষভাবে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। ঐ পথে অগ্রসর হইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহার নূতন আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসকল উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঈশ্বরের সাকার প্রকাশে তিনি বিশ্বাসবান হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পূর্বে বিজয় যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে কলিকাতায় আগমন করেন, তখন দীর্ঘ শিখা, সূত্র এবং নানা কবচাদিতে তাঁহার অঙ্গ ভূষিত ছিল; সত্যের অনুরোধে বিজয় সেইসকল একদিনে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মদলে যোগদান করিয়াছিলেন। কুচবিহার-বিবাহের পরে সত্যের অনুরোধে তিনি নিজ গুরুতুল্য কেশবকে বর্জন করিয়াছিলেন। আবার সেই সত্যের অনুরোধে তিনি এখন তাঁহার সাকার বিশ্বাস লুকাইয়া রাখিতে না পারিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে আপনাকে পৃথক করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার বৃত্তিলোপ হওয়ায় কিছুকালের জন্য তাঁহাকে অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি উহাতে কিছুমাত্র অবসন্ন হয়েন নাই। শ্রীযুত বিজয়, ঠাকুরের নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সহায়তালাভের কথা, এবং কখনো কখনো অদ্ভুতভাবে তাঁহার দর্শন পাইবার বিষয় আমাদিগের নিকট স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে উপগুরু অথবা অন্য কোনোভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, তাহা বলিতে পারি না। কারণ গয়াধামে আকাশগঙ্গার পাহাড়ে কোনো সাধু কৃপা করিয়া নিজ যোগশক্তিসহায়ে তাঁহাকে সহসা সমাধিস্থ করিয়া দেন ও তাঁহার গুরুপদবী গ্রহণ করেন, একথাও আমরা তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম। ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁহার যে অতি উচ্চ ধারণা ছিল তাহাতে সংশয় নাই।..

"ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইবার পরে বিজয়কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক গভীরতা দিন দিন প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। কীর্তনকালে ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার উদ্দাম নৃত্য ও ঘন ঘন সমাধি দেখিয়া লোকে মোহিত হইত। ঠাকুরের শ্রীমুখে আমরা তাঁহার উচ্চাবস্থার কথা শুনিয়াছি—'যে-ঘরে প্রবেশ করিলে লোকের ঈশ্বরসাধনা পূর্ণত্ব লাভ করে তাহার পার্শ্বের ঘরে পৌঁছিয়া বিজয় দ্বার খুলিয়া দিবার নিমিত্ত করাঘাত করিতেছে।' আধ্যাত্মিক গভীরতালাভের পরে শ্রীযুত বিজয় অনেক ব্যক্তিকে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের শরীররক্ষার প্রায় চৌদ্দবৎসর পরে *পুরীধামে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।...

"শ্রীযুত বিজয় নিজ অভিনব আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসকলের অনুরোধে সাধারণ সমাজ পরিত্যাগ করিলে উক্ত দলের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার উপর একান্ত বিশ্বাসবান ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার সহিত চলিয়া আসিলেন। সাধারণ সমাজ ঐ কারণে এইকালে বিশেষ ক্ষীণ হইয়াছিল। আচার্য শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রীই এখন ঐ দলের নেতা হইয়া

সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শিবনাথ ইতঃপূর্বে অনেকবার ঠাকুরের নিকটে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। ঠাকুরও শিবনাথকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। কিন্তু বিজয় সমাজ ছাড়িবার পরে শিবনাথ বিষম সমস্যায় নিপতিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের উপদেশ প্রভাবেই বিজয়কৃষ্ণের ধর্মভাব পরিবর্তন এবং পরিণামে সমাজ পরিত্যাগ—একথা অনুধাবন করিয়া তিনি এক্ষণে ঠাকুরের নিকটে পূর্বের ন্যায় যাওয়া-আসা রহিত করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই সময়ের কিছু পূর্ব হইতে সাধারণ সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন এবং শিবনাথ-প্রমুখ ব্রাহ্মগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঐরূপে সাধারণ সমাজে যোগদান করিলেও কিন্তু স্বামীজী মধ্যে মধ্যে শ্রীযুত কেশবের এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করিতেন। স্বামীজী বলিতেন, আচার্য শিবনাথকে তিনি এই সময়ে, ঠাকুরের নিকটে না-যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঘন ঘন গমন করিলে তাঁহার দেখাদেখি ব্রাহ্ম-সংঘের অন্য সকলেও ঐরূপ করিবে এবং পরিণামে উক্ত দল ভাঙিয়া যাইবে। স্বামীজী বলিতেন, ঐরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া শ্রীযুত শিবনাথ এই সময়ে তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতে বিরত হইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন।[৬]

ব্রাহ্মসমাজীরা মূর্তিপূজার প্রতি বিজয়কৃষ্ণের ক্রমবর্ধমান আসক্তি দেখে তিক্ত সমালোচনা শুরু করেন। বিজয়কৃষ্ণ উত্তরে বলেন: "যদি দেবদেবীগণের দর্শন ক'রে আমার ব্রহ্মোপলব্ধি হয় তাহলে এক্ষেত্রে অন্য কি করতে পারি?"[৭] তাঁর শিষ্য সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে একথা বলা যায়—তিনি অলৌকিক দর্শনাদিতে বিশ্বাসী হলেও, দার্শনিক ভাবনার ক্ষেত্রে শঙ্করাচার্যের মতানুগামী ছিলেন—সেইসঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রতিপাদিত জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়-পন্থার পক্ষসমর্থনও করেছেন। একথা অন্তত ১৮৯৩-১৯০০ পর্ব সম্বন্ধে সত্য। পুনশ্চ, ধর্মের কোনো কোনো নব্যপন্থার সমর্থন করলেও তিনি অনেক সময়ে কঠোর রক্ষণশীলতাও দেখিয়েছেন।

॥ তিন ॥

সতীশচন্দ্রের মাসিক পত্রিকা 'লাইট অব দ্য ইস্ট'-এর (অতঃপর পত্রিকাটি 'লাইট' নামে উল্লিখিত হবে) ১৮৯২, সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯০২, সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সংখ্যাগুলি পরীক্ষা করেছি। এর নতুন সিরিজের শুরু ১৯০২ সাল থেকে। অল্প পরে এটি বিলুপ্ত হয়। প্রথম পাঁচ কি ছয় বৎসর পত্রিকাটির উচ্চ মননশীল চরিত্র বজায় ছিল কিন্তু পরে তার অবনমন ঘটে। বিস্ময়ের কথা, যাঁরা সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন তাঁরা উপযুক্তভাবে এই পত্রিকার গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে আনেন নি। 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে নানা প্রসঙ্গে পত্রিকাটির বক্তব্যের উল্লেখ করেছি।

আমার দ্বারা পরীক্ষিত এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার টাইটেল-পেজ লুপ্ত। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় টাইটেল-পেজ এই:

THE LIGHT OF THE EAST
A Hindu Monthly Review
Edited by S. C. Mukhopadhyay M.A., Calcutta.
Published by the Proprietor and printed by J. N. Mullic,
Newton Press, 79-3 Cornwallis Street,
Rates of Yearly Subscription, Ordinary—Rs. 5-0-0.
College Students or whose pay is below Rs 100—Rs. 4.0.0.
Single Copy 0.8.0.

পরবর্তী প্রকাশস্থান বদলে হয়—১১ সিকদারবাগান স্ট্রীট, ক্যালকাটা।

ধরে নিতে পারি, সতীশচন্দ্র যখন ডন ম্যাগাজিন ও ডন সোসাইটির ব্যাপারে উত্তরোত্তর ব্যাপৃত হয়ে পড়েন, তখন তিনি 'লাইট' সম্বন্ধে আর মনোযোগ দিতে পারেননি।

॥ চার ॥

স্বদেশী যুগে ডন পত্রিকা ও ডন সোসাইটি বেশ কিছু যুবকের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ঐকালে জাতীয় শিক্ষার প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠেছিল। এই ক্ষেত্রে ডন সোসাইটির প্রশংসনীয় ভূমিকা। চরিত্রগঠনের শিক্ষা তো ছিলই, সেইসঙ্গে তরুণদের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, কলাশিল্প এবং বিজ্ঞান বিষয়ে চর্চায় প্রণোদিত করা হতো। ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বিষয়-ব্যুৎপন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বক্তৃতাদিও করতেন।

১৮৯৭ মার্চ মাসে ডন পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে ছিল বাবা মাধবদাসের চিত্র। প্রথম পৃষ্ঠায় শঙ্করাচার্যের বাণী উদ্ধৃত। তারপর মুদ্রিত হয় পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ও কর্মনীতি।

ডন-এর প্রথম পৃষ্ঠার টাইটেল-পেজ-এ ছিল:

THE DAWN
A Monthly Magazine
Dedicated to Religion, Philosophy and Science
Office—44, Lansdown Road, Bhowanipore, Calcutta

সূচনাপর্বে ডন-এর দুই সম্পাদক (পত্রিকায় লেখা হয়েছিল 'সম্পাদকগণ')—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাগবত চতুষ্পাঠীর মুখপত্র বলে পত্রিকার আয় যেত ঐ চতুষ্পাঠীতে। অজয়হরি কম-বেশি এক বৎসর সম্পাদক থাকেন। তারপর ঐ সংগঠন ত্যাগ ক'রে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ২৯ মার্চ ১৮৯৮ তারিখে স্বামীজী তাঁকে সন্ন্যাস দেন—নাম হয়, স্বামী স্বরূপানন্দ।

স্বরূপানন্দের লোকান্তরের পরে স্বামী সারদানন্দ প্রবাসী পত্রিকার ফাল্গুন ১৩২৩ সংখ্যায় (ইং, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯০৬) 'স্বামী স্বরূপানন্দ' নামে একটি শোকনিবন্ধ লেখেন, যার মধ্যে ভাগবত চতুষ্পাঠী ও ডন-পত্রিকার ব্যাপারে স্বরূপানন্দের ভূমিকার বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য ছিল। স্বামী সারদানন্দ লিখেছিলেন:

"সে আজ নয় বৎসরের কথা। তখন পুণ্যপ্রতাপ স্বামী বিবেকানন্দ অদ্ভুত গুরুশক্তি বিস্তারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ চমকিত করিয়া গঙ্গাতীরবর্তী বেলুড় গ্রামে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গুরুভ্রাতাকুল এবং শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' শিক্ষা প্রদানে নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমান মঠবাটীর নির্মাণ তখনও আরম্ভ হয় নাই, জমিমাত্র ক্রীত হইয়াছিল এবং ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে সমাগত স্বামীজীর কয়েকটি ভক্ত 'ধীরা মাতা', 'নিবেদিতা' এবং 'জয়া', সেই জমিস্থ ভগ্ন বাটীকায় অবস্থান করিতেছিলেন। ধর্মপিপাসু কতই না মানব সে সময় স্বামীজীর প্রভাবে নিত্য আকর্ষিত ও কৃপালাভে ধন্য হইয়া নবীন জীবন লাভ করিতেছিল! বৈশাখের—অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসের—অপরাহ্ণ। স্বামীজী গৈরিক বসন পরিধান করিয়া নিম্নতলস্থ গৃহ নিজপ্রভায় আলোকিত করিয়া উপবিষ্ট। অনেকগুলি লোক কলিকাতা হইতে সমাগত। তাহারা সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধর্মসংক্রান্ত নানা কূট প্রশ্ন উত্থাপিত করিতেছিল এবং সে সকলের সদুত্তর লাভে আপ্যায়িত এবং অবাক হইতেছিল, এবং ভাবিতেছিল, 'এরূপ অপূর্ব জ্ঞানের কথা, ভাবের কথায় এরূপ জ্বলন্ত অগ্নিময়ী অন্তঃস্থলস্পর্শী ভাষাপ্রয়োগ তো পূর্বে অন্য কোথাও শুনি নাই! ভগবন্! এ-সৎপুরুষের সঙ্গ যেন বহুকাল লাভে ধন্য হইতে পারি!' কয়েক ঘণ্টা ঐরূপ বাক্যালাপের পর অনেকে বাটীর বাহিরের উদ্যানে পরিভ্রমণ, শ্রীরামকৃষ্ণের পাদুকাদি দর্শন বা তামাকু সেবনাদি করিতে উঠিয়া গেল। কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীমধ্যগত যড়বিংশতি বর্ষ বয়স্ক কৃশ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ব্রাহ্মণ যুবক অন্য সকলের সহিত বাহিরে না যাইয়া একান্তে অবস্থিত স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিল এবং সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। তাহার স্থির উজ্জ্বল নয়নে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির এবং আলাপে বিদ্যা, বিনয়, ধৈর্য, অমায়িকতা এবং যথার্থ ধর্মজীবন লাভের দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় পাইয়া স্বামীজী আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে মঠে অবস্থান করিতে অনুমতি দিলেন। সদ্গুরু সচ্ছিষ্যলাভে উল্লসিত হইলেন।

"পরে জানিলাম, ঐ যুবকের নাম অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, বাটী ভবানীপুর এবং তত্রস্থ অনেক সদনুষ্ঠান তাঁহার এবং তৎসহযোগী আমাদের বন্ধু, বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। শুনিলাম, ভবানীপুর চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ইঁহাদের যত্নে নিযুক্ত হইয়া সমাগত জনগণকে ব্যাকরণ এবং ধর্মশাস্ত্রে শিক্ষাদান করিতেছেন। ঐ চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য নিয়মিত কালে চাঁদা সংগ্রহ হয় এবং 'উষা' (Dawn) নামক একখানি মাসিকপত্রও ইঁহার দ্বারা কয়েক বৎসর হইতে সম্পাদিত হইয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছে, এবং ঐ পত্র হইতে যাহা উপস্বত্ব হইতেছে তাহাও ঐ চতুষ্পাঠীর শিক্ষকের বেতন প্রদান, শাস্ত্র-গ্রন্থাদি ক্রয় এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয় নির্বাহে নিয়োজিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান বিস্তার ব্যতীত তৎপ্রদেশস্থ ছাত্রজীবনের সংস্কারও ঐ সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য এবং তদর্থ নিয়মিত

কালে সভা আহূত হইয়া তদুপযোগী বক্তৃতা, সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ, কথোপকথন এবং সদালোচনাদিও নিয়মিত রূপে হইয়া আসিতেছে। আরও জানিলাম, অজয়হরির মানসিক তেজ, উদ্যম এবং অধ্যবসায় অদ্ভুত হইলেও শরীর বহুবর্ষব্যাপী অজীর্ণ রোগাক্রান্ত এবং তজ্জন্য কঠিন পরিশ্রমে অপটু। সময় সময় হৃদ্‌গতির আতিশয্য নিবন্ধন কষ্টও পাইয়া থাকেন, একথাও যেন শুনিয়াছিলাম।"

স্পষ্টত দেখা গেল, ডন এবং ভাগবত চতুষ্পাঠী অজয়হরি ও সতীশচন্দ্রের যৌথ উদ্যোগের সৃষ্টি। স্বামী সারদানন্দের প্রদত্ত বিবরণ যদি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করি তাহলে একথা প্রতীয়মান হবে—অজয়হরি 'নামত' অন্যতম হলেও 'কার্যত' ডন-এর আসল সম্পাদক। সতীশচন্দ্র আইনব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকার জন্য, সেইসঙ্গে 'লাইট' পত্রিকা সম্পাদনার ভার বহন করার জন্য, ডন-এর জন্য বেশি সময় দিতে পারতেন না। এ প্রশ্ন ওঠেই—সতীশচন্দ্র কি অজয়হরির রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, যেখানে ঐ যোগদানের অর্থ ভাগবত চতুষ্পাঠীর ও ডন-এর কর্মত্যাগ? সঠিক উত্তর আমরা জানিনা। তবে সাধারণ বিচারে তাঁর খুশি হওয়ার কারণ নেই, যেহেতু তার ফলে তাঁদের দুটি প্রতিষ্ঠানই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল—গোটা দায়িত্ব গিয়ে পড়েছিল সতীশচন্দ্রের স্কন্ধে। এই সময়ে সতাশচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের মতে, সতীশচন্দ্রের অসুস্থতার কারণে ডন-এর প্রকাশ কিছুকাল বন্ধ থাকে। অজয়হরির সন্ন্যাসদীক্ষা হয় ২৯ মার্চ ১৮৯৮। হরিদাস মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ডন-এর বাইশ সংখ্যায় (ডিসেম্বর ১৮৯৮) পরে পত্রিকাটির প্রকাশ পাঁচ মাস স্থগিত থাকে।[৮] ১৮৯৯, জুন মাস থেকে পত্রিকাটির ঘোষিত একক সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অল্পকালের মধ্যে 'লাইট'-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এবং সতীশচন্দ্র একাংশে তাঁর কর্মনীতিরও পরিবর্তন করেন। ডন সোসাইটি তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়—এবং এর উদ্দেশ্য ও উপায়ের ক্ষেত্রে পূর্বের সঙ্গে লক্ষণীয় তফাত দেখা যায়। পূর্বতন ঘোষণা ছিল—ডন পত্রিকা 'ধর্ম, দর্শন এবং বিজ্ঞান'-এর ভাবধারা প্রচারে উৎসর্গীকৃত। এর তৃতীয় খণ্ডে কিন্তু দেখা গেল, পত্রিকাটির উদ্দেশ্য—"উচ্চতর শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বাহক হওয়া।" আগেই বলা হয়েছে, স্বদেশী যুগে সতীশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষা সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করলে (১৯০৭-০৮ সময়ে অরবিন্দ অধ্যক্ষ ছিলেন), সতীশচন্দ্র অধ্যক্ষ হন।[৯] এখানে একটি বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন—সতীশচন্দ্র কদাপি রাজনীতিতে জড়িত হননি, বা সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেননি। তাই জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটলে তিনি ক্রমে নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে নেন। ১৯১৪ সাল থেকে বারাণসীতে বাস করতে থাকেন। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের প্রতি তিনি কিছুটা আকর্ষণ বোধ করেছিলেন, গান্ধী-আশ্রমে বসবাসও করেছেন, এবং গান্ধীজীর অবর্তমানে তাঁর পত্রিকা প্রকাশনাতেও কিছুটা সাহায্য করেছেন। তবে সে সকলই অল্পকালের জন্য। বারাণসীই ছিল তাঁর বাঞ্ছিত ভূমি যেখানে অবস্থান ক'রে তিনি অধ্যাত্মসাধনায় নিমগ্ন ছিলেন—১৯৪৮ সালে নিজ দেহান্ত অবধি। মহান শিক্ষাব্রতীর ভূমিকা ত্যাগ ক'রে ফিরে গিয়েছিলেন আদিপর্বের আদর্শে—তখন তাঁর সনাতন ভারতীয় ঋষিজীবন যাপনের সাধনা।

সতীশচন্দ্র যৌবনে বিবেকানন্দকে দেখেছেন ও জেনেছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে স্বামীজীর পরবর্তী বিরাট ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। জীবনের এক পর্বে তিনি নিজেও ভারতের ধর্মীয় এবং দার্শনিক আদর্শের ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেন। তথাপি বিবেকানন্দ তাঁর মনের মানুষ নন। বিস্ময়কর মনে হলেও একথা সত্য যে, বিবেকানন্দের দেহান্তের পরে ডন পত্রিকায় কোনো কিছুই লেখা হয়নি, অথচ মহাদেব গোবিন্দ রানাডের দেহান্তে তাঁর বিষয়ে দীর্ঘ এক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল—লেখক এন এন ঘোষ—*The Late Mr Justice Ranade in one Aspect of His Character*. ডন সোসাইটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র সম্বন্ধে ধারাবাহিক রচনা ডন-পত্রিকায় বেরিয়েছে। সুতরাং মিত্র-শত্রু-নির্বিশেষে যখন বিবেকানন্দের দেহান্তে শোকমন্তব্য করেছে নানা পত্র-পত্রিকা, সেখানে ডন-এর বিস্ময়কর নীরবতার কারণ কি? অবশ্যই তা অধিক শোকে পাথর হওয়ার ব্যাপার নয়! ঠিক কারণ কি, তা অনুমানের এলাকায় রেখে দিয়ে, তথ্য হিসাবে জানানো যায়—অনেক ব্যাপারেই বিবেকানন্দ ও সতীশচন্দ্রের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে। ভারতের সাধারণ মানুষের মাংসাহারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিবেকানন্দের প্রকাশ্য ঘোষণা, গৃহীদের জন্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বৈধ হিংসার বিধান—সতীশচন্দ্রের মনঃপূত হবার কথা নয়। বিবেকানন্দ বৃটিশ শাসনের প্রতি পরাধীন ভারতবাসীর 'আনুগত্যের' সমর্থক ছিলেন না। 'দিব্য বিধানে' ইংরাজরা ভারত্শাসন করছে—এই ব্যাপারটা তাঁর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কারণ হয়েছিল। ১৮৯৭ সালে রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যকালের জুবিলী উৎসবের সময়ে শিক্ষিত ভারতবাসীরা কাড়াকাড়ি ক'রে মহারাণীর প্রতি কে কত অনুগত, তা জানাবার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিল—সেই সময়ে মহাবোধি সোসাইটির চারুচন্দ্র মিত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের মারফত স্বামীজীকে অনুরোধ করেন রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে অভিনন্দনপত্র পাঠালে ভালো হয়। সম্মতি জানিয়ে স্বামীজী ১৪ জুন ১৮৯৭ তারিখে ব্রহ্মানন্দ-স্বামীকে পত্র লেখেন, তার মধ্যে এই সতর্কবাণী ছিল—**"মহারাণীকে পাঠানো মানপত্র যেন অতিরঞ্জিত না হয়, অর্থাৎ 'তুমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি' ইত্যাদি nonsense (বাজে কথা)—যাহা আমাদের native-এর স্বভাব।"**[১০] এই ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্রের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। ডন-এর জানুয়ারি ১৯০১ সংখ্যার কুইন ভিক্টোরিয়া বিষয়ে আনুগত্যজ্ঞাপক এক দীর্ঘ কবিতা তিনি লিখেছিলেন—'Loved Mother, God's elect to reign on earth,' ইত্যাদি। পববর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রাজদ্রোহকর প্রচার ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ যখন পুরোদমে চলেছে তখন তিনি কিন্তু নিজ মতে স্থির থাকেন। সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পরে তিনি 'ডন সোসাইটিজ্ ম্যাগাজিন'-এর জুন ১৯১০ সংখ্যায় প্রাণ খুলে লেখেন: "দেশে যে বি-জাতীয়তার প্রভাব প্রবলভাবে বয়ে চলেছে, তার মধ্যে থেকেও হিন্দুরা এখনও বিশ্বাস করে যে, রাজতন্ত্র নিছক সেকুলার সংগঠন নয়, তদনুযায়ী তাদের 'লয়্যালটি' নিছক সেক্যুলার ভিত্তিতে স্থাপিত নয়। পৃথিবীতে ঐশ্বরিক রাজ্যের ধারণা এখনো সর্বাধিক সংখ্যক হিন্দুর মধ্যে বলবৎ—তা অতীত কোনো যুগের অবশিষ্টাংশ নয়—পরন্তু তা হিন্দুদের ধর্মবোধের আবশ্যিক অংশ।"[১১] বলাবাহুল্য এখানে বিবেকানন্দের ধারণার একেবারে বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়েছেন সতীশচন্দ্র। ভগিনী নিবেদিতার প্রসঙ্গও এখানে আনা যায়। ডন সোসাইটির সঙ্গে নিবেদিতার যোগ ছিল। তাঁর সহায়ক ভূমিকার প্রশংসাও সতীশচন্দ্র করেছেন। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতাদির কালে নিবেদিতা সংগ্রামী জাতীয়তার

প্রচার করতেন। ছাত্রদের দ্বারা লিখিত তাঁর বক্তৃতার সারাংশ ডন পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। সেসব কথা রীতিমতো রাজদ্রোহকর। ফলে সতীশচন্দ্রের পক্ষে রাজদ্রোহী নিবেদিতাকে এবং নিবেদিতার পক্ষে রাজানুগত সতীশচন্দ্রকে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যক্ষপদ অরবিন্দ ত্যাগ করার পরে গোটা সংগঠনটি রাজানুগত ব্যক্তিদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়ে। নিবেদিতা ২৫ নভেম্বর ১৯০৯ তারিখের চিঠিতে র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন: 'ন্যাশন্যাল কলেজ প্রতিক্রিয়াশীলদের খপ্পরে গিয়ে পড়েছে। উত্তেজনার জ্বলন্ত প্রহরে এর স্থাপনা হয়—এর জাতীয়তা কেবল শব্দমাত্র, বস্তুগত নয়—এমনকি ভাবগতও নয়,...ফলে সংকীর্ণ গোঁড়ামির গহ্বরে পড়া অবধারিত ছিল।"[১১]

॥ পাঁচ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধার প্রকাশ ডন পত্রিকায় দেখা যায়। ১৮৯৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯০২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ছয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে 'লীভস্ ফ্রম দি গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ।' শ্রীম সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সম্পাদক ডিসেম্বর ১৮৯৭ সংখ্যায় লেখেন, "মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত আড়ম্বরহীন নম্র ভদ্রলোক—উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসম্পন্ন পুরুষ।" আরও বলেন, "মহেন্দ্রনাথের সংকলিত মডার্ন গস্‌পেল-এর [কথামৃত] সর্বত্র সঞ্চারিত হয়ে আছে বিভিন্ন ধর্মমত সম্বন্ধে সুগভীর সর্বজনীন উদারতা।" রামকৃষ্ণ-গস্‌পেলের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে স্বীকৃতি জানিয়ে তিনি বলেন—"[শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিসমূহ] ডায়েরি-নোট-এর উপর নির্ভর ক'রে তা রচিত—যেসব নোট ঠিক ঘটনার দিনটিতে করা হয়।" একই সংখ্যায় দীর্ঘ এক প্রবন্ধে ['অন দ্য ভ্যালু অব শ্রীরামকৃষ্ণস গস্‌পেল'] তিনি প্রথমে অনেকখানি জায়গা নিয়ে ধর্ম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের ধারণার মধ্যে আত্মখণ্ডনের রূপ দেখিয়ে দেন—এবং প্রতিশ্রুতি দেন, পরবর্তী এক সংখ্যায় তিনি ঐ বিশৃঙ্খল খণ্ডিত ধারণাসমূহের উপরে 'ধন্য-পুণ্য রামকৃষ্ণ গস্‌পেলকে' স্থাপন ক'রে তার মহিমা দেখিয়ে দেবেন। এই প্রতিশ্রুতি অবশ্য রক্ষিত হয়নি। না হলেও, গসপেলের মূল বাংলা রূপ কথামৃতের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে, তার একটি অংশ তিনি নিজে অনুবাদ ক'রে ডন-এ প্রকাশ করেন—সেইসঙ্গে সবিনয়ে স্বীকার করেন—আচার্যের মূল বাংলা উক্তির উপযুক্ত অনুবাদ সম্ভব নয়। তাঁর মতে, **"রামকৃষ্ণ-গস্‌পেল হিন্দুর ধর্ম-দর্শন ও আচার-অনুষ্ঠানের মৌল সত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, চিত্তাকর্ষক এবং অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন রূপ।"** সতীশচন্দ্র সুস্পষ্টভাবে বলেন—**"গস্‌পেলের মধ্যে পাওয়া যাবে নিত্য সত্যের বাস্তব উন্মোচন।"**

'লাইট'—রামকৃষ্ণ গস্‌পেল এবং রামকৃষ্ণ উক্তির নানা অংশ প্রকাশ করেছিল, প্রধানত 'ব্রহ্মবাদিন্' (মার্চ-জুন ১৮৯৮) পত্রিকা থেকে সংকলন ক'রে। 'অহং' সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের কিছু উক্তি উদ্ধৃত করার পরে লাইট (জানুয়ারি ১৯০১) মন্তব্য করে: "আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে এই অংশ অতীব তাৎপর্যপূর্ণ—এর মধ্যে আছে বিপুল চিন্তার সমাহার।" সতীশচন্দ্র অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার মনে করতেন না। ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত সেইসময় স্টার থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারতত্ত্ব নিয়ে বক্তৃতা করছিলেন। সতীশচন্দ্রের মতে, রামকৃষ্ণ জীবন্মুক্ত

পুরুষ, যেমন ব্যাসদেব। বুদ্ধও জীবনমুক্ত পুরুষ, অবতার নন, কারণ বহু জন্মধারার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তিনি বুদ্ধত্ব পেয়েছেন। (লাইট, জুলাই ১৮৯৩)। এর আগে ১ মার্চ ১৮৯৩ সংখ্যায় দক্ষিণেশ্বরে বৃহৎ আকারে সংঘটিত রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের বর্ণনাসূত্রে এই পত্রিকায় লেখা হয়:

"যথার্থই বিরাট হিন্দু-ঋষি পরমহংস রামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে সমবেত হয়েছিল সকল জাতি ধর্ম ও বর্ণের হাজার হাজার মানুষ, যারা নিজেদের জাতিভেদ বা ধর্মধারণার পার্থক্য সরিয়ে দিয়ে...উক্ত ঋষির অনুগামীদের দ্বারা প্রস্তুত করা প্রসাদ গ্রহণ করেছে।...কি মহিমময় দৃশ্য—সকল স্তরের মানুষ নগ্নপদে, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দলে দলে আসছে।...সমস্ত পরিবেশ গভীর ধর্মীয় ভাবাবেগে আলোড়িত—প্রতিটি মুখচ্ছবি আনন্দের আলোকে উদ্‌ভাসিত। কেউ-কেউ ধর্মোন্মাদনায় নৃত্যরত; অন্যরা সেই দিব্যানন্দের দর্শক; আবার উন্নততর মানুষেরা মাঝে মাঝে সমাধিস্থ, মুখে তাঁদের স্বর্গীয় জ্যোতি। পরমহংস রামকৃষ্ণের মধ্যে হিন্দুধর্মের ভিত্তিস্বরূপ খাঁটি অদ্বৈততত্ত্বের প্রকাশ দেখি। তাঁর জীবন অত্যন্ত সরল কিন্তু অপরূপ সুন্দর। তিনি ধর্ম-সঙ্গীতের নিখুঁত দেহবিগ্রহ।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে মানুন বা নাই মানুন, তাঁর কথামৃতকে সতীশচন্দ্র এ-যুগের 'গস্‌পেল' বলে বারবার উল্লেখ করেছেন। 'গস্‌পেল' শব্দটি খ্রীস্টীয় অনুষঙ্গের কথা এখানে স্বতঃই মনে আনবে—ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রীস্টের বাণীকেই খ্রীস্টানরা 'গস্‌পেল' বলে চিহ্নিত করেছেন। এবং তিনি লাইট পত্রিকায় ১৮৯৩ মার্চ মাসে (তখনও শিকাগোয় বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটেনি।) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 'থীস্‌টিক কোয়ার্টারলি রিভিউ' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে অতুলনীয় প্রবন্ধ লেখেন, তা পুরোপুরি পুনর্মুদ্রণ করেন।

বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে আবির্ভাবের পরে লাইট অক্টোবর ১৮৯৫ তারিখে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ধর্মধারণার বিষয়ে তুলনামূলক মন্তব্য করে:

"পরমহংস রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর সুবিখ্যাত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ-সূত্রে ইদানীং অনেক কিছু শুনছি। এখানে উল্লেখ্য, গুরুর চরিত্র বহু ব্যাপারে শিষ্যের চরিত্র থেকে সবিশেষ পৃথক, এমনকি বলা যায় সেসব পুরোপুরি বিপরীত। একথা অবশ্য আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, উভয়েই অদ্বৈতবাদী, কিন্তু গুরু ভক্তিমার্গের মধ্য দিয়ে সেই তত্ত্বে পৌঁছতে চেয়েছেন, অপরপক্ষে শিষ্য একনিষ্ঠ জ্ঞানমার্গী। রামকৃষ্ণ তাঁর পার্থিব জীবনের শেষ অবধি প্রতি মুহূর্তে দীন ভক্তের জীবনযাপন করেছেন—সেই সমস্ত সময় পূর্ণ ছিলেন মহিমান্বিত ঈশ্বরদর্শনে—যে-ঈশ্বরকে তিনি পরম ভক্তি ও ভালবাসায় 'মা' বলে ডাকতেন। তাঁর সমগ্র ধর্মজীবনে মহামাতৃশক্তির কাছে বাধ্য পুত্রের ভূমিকা—যে-পুত্র মহামাতার পাদমূলে বলি দিয়েছিলেন সকল পার্থিব আকাঙ্ক্ষা। এক কথায় খাঁটি অর্থে তিনি ভক্ত। যদি তিনি অদ্বৈতে বিশ্বাস ক'রে থাকেন তাহলে তাকে তিনি সর্বশেষ অবস্থান বলে মনে করতেন যেখানে ভক্তিমার্গ তাঁকে পৌঁছে দেবে। জ্ঞানীর আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীভূত—রামকৃষ্ণের কাছে এ-জিনিস

বহির্বর্তী ব্যাপার, যদিও তাঁর শিষ্য ঐ পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে ধারণা করতে চাইলে আমাদের হতাশ হয়ে পড়তে হবে। রামকৃষ্ণের গৃহীত ধর্মপথ শঙ্করাচার্যের পথ অপেক্ষা শ্রীরামানুজ ও শ্রীচৈতন্যের পথের অনুরূপ, আর তাঁর শিষ্য কঠোরভাবে শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী।"

এখানে উল্লেখ্য, ১৮৯৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে সতীশচন্দ্র বিবেকানন্দের যেসব বক্তৃতাবলী পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন, তার ভিত্তিতেই উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত করেছেন। তোতাপুরীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতসাধনার রূপ তিনি জানতেন কিনা জানিনা। এবং বিবেকানন্দের পরবর্তীকালে প্রকাশিত বক্তৃতাবলী ও উক্তিসমূহের সঙ্গে পরিচিত হলে তিনি তাঁর দৃঢ় মতকে কিছুটা নমনীয় করতেন কিনা তাও বলতে পারিনা। তবে লক্ষ্য করার বিষয়, সতীশচন্দ্রের ঐকালীন বিচার ও সিদ্ধান্ত একালে অনেক দার্শনিক গ্রহণ করেছেন, আবার অনেকে বিরোধিতাও করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়নি। রামকৃষ্ণ কি দ্বৈতবাদী? বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী? নাকি অদ্বৈতবাদী? সাধারণভাবে বলতে গেলে, রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসীরা বিবেকানন্দের মতানুযায়ী রামকৃষ্ণকে অদ্বৈতবাদী মনে করেন, তার সমর্থন শ্রীমা সারদাদেবীও করেছেন। অপরপক্ষে তাঁকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রমাণ করবার জন্য কেবল প্রবন্ধাদি রচিত হয়নি, এক বিশিষ্ট দার্শনিক (অধরচন্দ্র দাস) গ্রন্থও লিখেছেন। ধর্মের পথ গুহাহিত—এছাড়া আমাদের পক্ষে এখানে আর কিছু বলা সম্ভব নয়—এবং জানি, মুনিগণ কখনই সহমত হন না।

॥ ছয় ॥

ধর্মজীবনের পরিবর্তন যুগে সতীশচন্দ্র আত্মখণ্ডনের শিকার হয়েছিলেন। বিবেকানন্দের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে দেখা যায়। একদিকে অলৌকিকতা বিষয়ে বিশ্বাসে মন ঝুঁকেছিল, অন্যদিকে তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা শঙ্করাচার্যের অদ্বৈততত্ত্বকে সর্বাপেক্ষা যুক্তিসিদ্ধ মতরূপে গ্রহণ করতে তাঁকে প্রণোদিত করেছিল। বহুপঠিত মানুষ তিনি, পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেন নি, আবার একই সঙ্গে ভারতের পুরাতনী রীতি-নীতিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

লাইট-এর প্রথম দুই-তিন বৎসরে দেখা যায়, থিয়জফি সম্বন্ধে সতীশচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ—কর্নেল অলকটের স্থূল অলৌকিক কাণ্ড-বিবরণযুক্ত লেখা ছেপে যাচ্ছেন। 'সোস্যাল রিফর্মার' পত্রিকা ৩১ জানুয়ারি ১৮৯৭ সংখ্যায় মন্তব্য করে—"কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিকপত্র 'লাইট অব দি ইস্ট' হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান কামনায় সর্বপ্রকার গাঁজাখুরি কাহিনী প্রকাশ করছে, সেসব সাহায্য করছে গুপ্তরহস্য বিদ্যার চর্চা ও প্রসারে।" সতীশচন্দ্র কালগতে অলকট-মার্কা গুপ্তরহস্য সম্বন্ধে বিশ্বাস হারান এবং যখন থিয়জফিক্যাল সোসাইটির নেতৃবর্গের ধাপ্পাবাজি ধরা পড়ে তখন তার সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েন। বিচিত্র ব্যাপার, তিনি মাদাম ব্লাভ্যাট্স্কির অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস কিন্তু রক্ষা করেছিলেন—আর তাকে হিন্দুশাস্ত্রের বিধানের দ্বারা শোধন করতে সচেষ্ট হন। থিয়জফিস্ট অ্যানী বেশান্ত

সম্বন্ধেও তাঁর ছিল অব্যাহত শ্রদ্ধা। হিন্দু পুনরুত্থান আন্দোলনে থিয়জফিক্যাল সোসাইটি ও অ্যানী বেশান্তের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু থিয়জফির উদ্ভব যেহেতু পাশ্চাত্যজগতে এবং যেহেতু রহস্যবাদী বৌদ্ধধর্ম তার ভিত্তি, তাই তাকে "সঠিকভাবে হিন্দু আন্দোলন বলা যাবেনা।" (সেপ্টেম্বর ১৮৯৪)। তিনি বিস্তৃতভাবে থিয়জফি-সংক্রান্ত বিসম্বাদ নিয়ে আলোচনাও করেছেন এবং আমেরিকার থিয়জফিস্ট-নেতা মিঃ জাজ্-এর 'মহাত্মা-পত্র' প্রাপ্তি বিষয়ে "কটু সন্দেহের" কথা জানিয়েছেন। তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল, "থিয়জফিক্যাল সোসাইটির তিন উদ্দীপ্ত নেতা—কর্নেল অলকট, মিসেস বেশান্ত এবং মিঃ জাজ্-এর মহাত্মা-সম্পর্ক ব্যাপারটির ইতি ঘটেছে।" "অ্যাডেয়ারে অনুষ্ঠিত বিগত থিয়জফিক্যাল সোসাইটির সম্মেলনে...রহস্যবাদের শেষ আগুনে ছাইচাপা দেওয়া হয়েছে। রহস্যবাদই থিয়জফি-মতকে গ্রাস করেছিল।" সতীশচন্দ্রের এইসব আশাবাদী ধারণায় জল ঢেলে কর্নেল অলকট 'থিয়জফিস্ট' পত্রিকায় "ওল্ড ডায়েরি লীভস্' প্রকাশ করতে থাকেন, "যা বাস্তব ঘটনার বিবরণ অপেক্ষা আরব্যরজনীর কাহিনীতুল্য।" তাঁর উদ্দেশ্য মোটেই 'সাধু' নয়। (ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫)। এসব সত্ত্বেও 'মহাত্মারা' সতীশচন্দ্রের হৃদয়-মনের উপর তাঁদের বাসস্থান বজায় রেখেছিলেন। শেষোক্ত সম্পাদকীয়তে তিনি হিন্দুশাস্ত্র নেড়ে মহাত্মা-তত্ত্বের চিহ্ন আবিষ্কার ক'রে ফেলেন। "শাস্ত্রে এইসব মহাত্মাকে আপ্ত বলে।...ক্রমবিকাশের ধারায় মানব ও ঈশ্বরের মধ্যে সংযোগরক্ষী এক ধরনের চরিত্রের উদ্ভব হয়ই। মহাত্মাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাসের মূলে আছে এই তত্ত্ব।" ব্লাভ্যাট্স্কিকে আপ্তপুরুষের স্তরে (যে-স্তরে তিনি বুদ্ধ ও রামকৃষ্ণকে স্থাপন করেছিলেন) তুলে দেন। তাঁর এসব কথাব বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে ব্লাভ্যাট্স্কির নৈতিক চরিত্রের নানা স্খলনের কথা উঠবেই—একথা জেনে সতীশচন্দ্র নানাভাবে ব্লাভ্যাট্স্কির কালিমায় শুভ্রবর্ণ লেপনের চেষ্টা করেছেন:

"পরলোকগত মাদাম ব্লাভ্যাট্স্কি ঐ রকম আপ্ত চরিত্র। তাঁর বিষয়ে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর প্রথম স্বামীকে ছেড়ে পালিয়ে যান। তারপর ১৮৭৫ সালে মিঃ বেটানেলিকে বিয়ে করেন। বেটানেলিকেও ছেড়ে চলে যান। সেইকারণে বেটানেলি আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন ক'রে অনুমোদন পান। ব্লাভ্যাট্স্কি কখনো-কখনো মারাত্মক মিথ্যা কথাও বলেছেন।

"এসব সত্ত্বেও একথা সত্য, মাদাম ব্লাভ্যাট্স্কি বহু বৎসর ধরে মহাত্মা কুথুমিব কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছেন। জনসাধারণ এসব কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে না জানি, কিন্তু আমরা নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন স্থিরনিশ্চয় তেমনি ঐ ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধেও, কারণ ব্যাপারটা আমরা জেনেছি এমন সূত্র থেকে যার বিষয়ে ক্ষণেকের সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারিনা।...আমাদের সঙ্গে এমন তিন ব্যক্তির জানাশোনা আছে যাঁরা থিয়জফির মহাত্মাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেন।...যে-মানুষ [অর্থাৎ মাদাম ব্লাভ্যাট্স্কি] 'সিক্রেট ডকট্রিন'-এর মতো মহান অধ্যাত্মগ্রন্থ লিখতে পারেন, তিনি সাধারণ নীতিবাদীদের স্তর থেকে বহু উর্ধ্বে অবস্থিত—পূর্বকর্মফলের জন্য এই জীবনে তাঁর পতন ঘটলেও তা সত্য।"

উপরের মন্তব্য করার সময়ে সতীশচন্দ্রকে নিজ নীতিবুদ্ধি যথেষ্ট নমনীয় করতে হয়েছিল।

অ্যানী বেশান্তের পরম অনুরাগী সতীশচন্দ্র বেশান্তের কাজকর্মের উপর প্রশংসা ঢেলে

দিয়েছেন। যখন জানা গেল যে, বেশান্ত "এলাহাবাদের এক দেবমূর্তির প্রসাদ গ্রহণ করেছেন," এবং "কুম্ভমেলার সময়ে পবিত্র গঙ্গায় স্নান করেছেন," তখন ব্রাহ্মসমাজের ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁদের সমাজের পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান মেসেনজার'-এ বেশান্তের বিচিত্র ধারণাকে "বদহজম-করা দুষ্পাচ্য বস্তুর" উদ্‌গার বলে চিহ্নিত করলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল উগ্রভাবে এমন কথাও বলেন যে, হিন্দুজাতি ভর্তি হয়ে আছে "অর্ধশিক্ষিত লোকজনের দ্বারা যারা মধ্যযুগীয় বিধ্বস্ত অবনমিত অবস্থা থেকে সদ্য মাথা তুলছে।" সতীশচন্দ্রের পক্ষে এইপ্রকার "কাপুরুষোচিত ঘৃণাপূর্ণ" রচনাকে সহ্য করা সম্ভব ছিলনা। সবিশেষ পাণ্ডিত্য ও যুক্তি-সহযোগে তিনি প্রশ্ন তুললেন, "ভারতীয় সভ্যতাকে চ্যালডীয়, ব্যাবিলোনীয়, মিশরীয় এবং গ্রীক সভ্যতার উৎসস্বরূপ ঘোষণা করা যায় নাকি?" এবং "গ্রীক দর্শন ভারতীয় দর্শনের কাছে ঋণী নয় কি?" পদার্থ-বিদ্যায় বেশান্তের অধিকার সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ সন্দিগ্ধ প্রশ্ন তুলেছিলেন। "মিঃ শীল অধ্যাপক ক্রুকস্, ওয়ালেস এবং জুলনার—এই তিন বৈজ্ঞানিককে থিয়জফিক্যাল ত্রিমূর্তি বলে ঘোষণা করেছেন, যেহেতু তাঁরা মিসেস বেশান্তের মতের সমর্থন করেন।" সব্যঙ্গে সতীশচন্দ্র বললেন, "বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ [মিঃ শীল] অধ্যাপক ক্রুকস্-এর পায়ের তলায় বসে বৎসরের পর বৎসর বিজ্ঞানশিক্ষা করতে পারেন।" (মার্চ ১৮৯৪)।

জীবনের এই পর্বে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে সতীশচন্দ্রের ধৈর্য ছিলনা। আমরা যতদূর দেখেছি, তিনি একবার তাঁর গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমর্থনে কলম ধরেছিলেন। কুচবিহার-বিবাহের পরে বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের দল ছেড়ে সাধারণ সমাজে যোগ দিয়েছিলেন (বা সাধারণ সমাজ গঠনে অংশ নিয়েছিলেন), তার উল্লেখ ইতিমধ্যে করেছি। তারপর তিনি যখন সাধারণ সমাজ ছেড়ে পুরাতন ভক্তিমার্গ অবলম্বন করলেন তখন কেশবপন্থীরা সুযোগ পেয়ে গেলেন। তাঁরা তীব্র ঘৃণাপূর্ণ রচনায় বিজয়কৃষ্ণকে আক্রমণ করতে লাগলেন। লাইট (জুন ১৮৯৪) ইনটারপ্রেটার পত্রিকা থেকে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের তেমন কিছু লেখার অংশ উৎকলন করেছিল। মজুমদার লিখেছিলেন:

"একটা জঘন্য ঘটনা ঘটছে। আমাদের কিছু ধর্মবন্ধুর মধ্যে সর্বপ্রকার সন্ন্যাসী, ফকির, সাধু এবং ভণ্ড ধার্মিকদের সম্বন্ধে বিচিত্র আকর্ষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেশবচন্দ্র সেনের প্রথম পর্যায়ের সেরা অনুগামী এক সুপরিচিত ব্রাহ্মপ্রচারকের দলত্যাগের পর থেকে এটা বিশেষভাবে ঘটছে। এই ভদ্রলোক এক বৈষ্ণব আচার্যের বংশের সন্তান। নিজ নেতার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরে, অন্য কোথাও শান্তি না পেয়ে, প্রচলিত হিন্দু ভক্তিপথ গ্রহণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টান্ত প্রথমে অনেককে একই পথে চালিত করে। তারপরে যেন হিন্দু ভক্তিমার্গের নাটকীয় ভঙ্গিমার প্রতি কুসংস্কারপূর্ণ ভক্তিপ্রদর্শনের মহামারী লেগে গেছে। সাধারণ সমাজীদের মধ্যে এই ব্যাধির প্রকোপ সবচেয়ে বেশি, তবে অন্য সমাজেও ধীরে ধীরে তার সংক্রমণ ঘটছে।"

সতীশচন্দ্র নিজ গুরুর প্রতি এই ধরনের অবমাননাপূর্ণ মন্তব্য সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর কঠিন মন্তব্য:

"[প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের] উদ্ধৃত রচনাংশে উল্লিখিত 'সুপরিচিত ব্রাহ্মপ্রচারক' আর কেউ নন, এই শহরের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তিনি তাঁর [পূর্বতন] আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের মানুষ। তাঁর বর্তমান জীবন ধারাবাহিক ধর্মোন্মাদনা এবং

অধ্যাত্মদর্শনের সমাহার। ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ খাঁটি ধর্মপ্রাণ মানুষ তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামী। উপদেশের অপেক্ষা উদাহরণ অনেক বড় ব্যাপার। তা অনুভব ক'রে ঐ ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মধর্মের প্রাণহীন উপদেশাদি পিছনে ফেলে রেখে এই অধ্যাত্মপুরুষকে আশ্রয় করেছেন। এটা তাঁদের দোষ নয়। মনের শান্তি তো যেভাবে হোক পেতে হবে!"

॥ সাত ॥

'হিন্দু পুনরুত্থান' দেখে উৎসাহিত সতীশচন্দ্র খ্রীস্টান মিশনারিদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অগ্রসর হন। এই কাজে নেমে, 'থিয়জফি-ধাপ্পাবাজি' সম্বন্ধে সচেতন থেকেও তিনি মিশনারিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে থিয়জফিস্টদের সমর্থন করতে চেষ্টা করেন। মাদ্রাজ 'ক্রিশ্চান লিটারারি সোসাইটি' কর্তৃক প্রকাশিত 'থিয়জফি একস্‌পোজড্' পুস্তিকার উল্লেখ ক'রে তিনি ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ সংখ্যার লাইট-এ লেখেন:

"আমরা জানি, খ্রীস্টান মিশনারিদের ভারতে কিংবা বহির্ভারতে সম্প্রতি সবচেয়ে বড় যে শত্রুর মোকাবিলা করতে হচ্ছে—সে হলো থিয়জফিক্যাল সোসাইটি। শিক্ষিত ভারতবাসীদের লক্ষ্য ক'রেই পুস্তিকাটি রচিত। তাঁরা কিন্তু পুস্তিকার লেখকদের আসল উদ্দেশ্য বুঝবার মতো যথেষ্টই বুদ্ধি ধরেন। যে বিপুল পরিমাণ গালগপ্প এবং উদ্ভট ব্যাপারাদি আধুনিক খ্রীস্টধর্ম নাম নিয়ে হাজির—তার প্রকৃতি বিষয়েও তারা অবহিত।"

থিয়জফিক্যাল সোসাইটি এক "উচ্চপর্যায়ের লেখক-গোষ্ঠী"—যা হিন্দু পুনরুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছে—এই কথা বলার পরে সতীশচন্দ্র তিক্তভাবে লেখেন, "মিসেস বেশান্তের কুৎসাকারীরা তাঁর পায়ের জুতোর ফিতে খোলার যোগ্য নন।"

হিন্দুধর্মের পক্ষে ধর্মযোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ ক'রে, ধর্মীয় ও দর্শনঘটিত বিতর্কে সিদ্ধহস্ত লেখক সতীশচন্দ্র জানতেন, কিভাবে অপরের লগুড় কেড়ে নিয়ে তার দ্বারা তাকেই পেটাতে হয়। শিকাগো ধর্মমহাসভায় জৈনধর্মের প্রতিনিধি বীরচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে বিশপ থর্গান-এর এক বিতর্কের বিবরণ দেবার সূত্রে লাইট (১৮৯৫) বীরচাঁদ গান্ধীর বক্তৃতার এই অংশ উদ্ধৃত করে: "অযোধ্যার রাজার রাজত্বকালে লখনৌ-এ একটিও মদের দোকান ছিলনা। এখন খ্রীস্টান শাসনে সেখানে মদের দোকানের সংখ্যা একশোরও বেশি। ১৮৯০-৯১ সালে ইংরেজ সরকার মদ্য-কর হিসাবে ৪,৯৪৭,৭৮০ টাকা আয় করে—এই অর্থের পরিমাণ আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, সাধারণ কর, বনজ সামগ্রীর কর, রেজিস্ট্রি-কর, ডাকঘরের আয় থেকে চতুর্গুণ, টেলিগ্রাফ-এর আয়ের সাতগুণ, এবং আইন আদালত থেকে আয়ের আটগুণ বেশি। প্রতি বৎসর এই আয় ৫ হাজার ডলার করে বাড়ছে।...বস্তুতপক্ষে মদ্যপান খ্রীস্টধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ।...আপনারা শুনে চমকিত হবেন যে, মিশনারিরা ধর্মান্তরকরণকে সহজ ও নিশ্চিত করবার জন্য মদ্য সরবরাহ ক'রে থাকে। ধর্মান্তরের অগ্রগামী ধ্বজা চরিত্রবিকৃতি!...যেসব মিশনারিকে ধর্মান্তর করানোর জন্য পাঠানো হয়, তাদের তুলনায় ধর্মান্তরের লক্ষ্য ঝাড়ুদাররাও সূক্ষ্ম দর্শনবোধ এবং ধর্মীয় প্রজ্ঞার অধিকারী।"

লাইট অগস্ট ১৮৯৫ সংখ্যায় 'আমেরিকান বোর্ড অব ফরেন মিশনস্'-এর সেক্রেটারি ডাঃ ক্লার্ক-এর এই স্বীকৃতি উদ্ধৃত করে: বৈদেশিক মিশনগুলি সম্বন্ধে বর্তমানে সাধারণের আগ্রহে

ঘাটতি ঘটেছে।...[ধর্মান্তরের সপক্ষে মিশনারিদের দ্বারা কথিত] অ-খ্রীস্টান জাতিসমূহের বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে নৈতিক অধঃপাত এবং চূড়ান্ত দুর্দশা সম্বন্ধীয় অপপ্রচার তার শক্তি হারিয়েছে।" লাইট 'নেশন' পত্রিকার এই মন্তব্যও উদ্ধৃত করে: "[দেশে দেশে] ভ্রমণাদি, [শিকাগোর] বিশ্বমেলা এবং ধর্মমহাসভা, নানাদিকে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের গমনাগমনের ফলে হিঁদেনদের মধ্যে অপ্রত্যাশিত চারিত্রগুণের সংবাদ আমাদের গোচর করেছে, যার কিছু কিছু গ্রহণ করলে আমরা উপকৃত হবো।" মিশনারি কার্যকলাপ ভালো মাইনের সরকারী কাজের তুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে মিশনারিদের উদ্দীপনা হ্রাস পেয়েছে—একথা বলার পরে—শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতিকে মিশনারিগণ কর্তৃক অলৌকিক রহস্যখ্যাপা বলে চিহ্নিত করার বিরুদ্ধে সতীশচন্দ্র কঠোর প্রতিবাদ করেন। মিশনারিরা এমন উদ্ভট কথাও বলেন—"খ্রীস্টজন্মের পূর্বে হিঁদেনদের মধ্যে যেসব মানুষ জন্মেছেন হাজার বছরের আগে তাঁদের স্যালভেশন লাভের কোনো উপায় নেই।" সতীশচন্দ্র মেকলের বিখ্যাত উক্তিকে উল্টোভাবে প্রয়োগ ক'রে বললেন: "গোটা বাইবেলের মধ্যে যে সত্য আছে তা পাওয়া যাবে মহাভারতের এক পাতায় এবং ধর্মপদের আধ পাতায়।" দীর্ঘ সময় ধরে ধর্ম ও দর্শনবিষয়ে বিতর্ক চালিয়ে যাবার মতো পাণ্ডিত্য সতীশচন্দ্রের ছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়) অদ্বৈত বেদান্তকে আক্রমণ করলে সে রকম বিতর্কমূলক প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন লাইট-এর অগস্ট ১৮৯৫ সংখ্যায়। কয়েক বৎসর পরে তিনি ডঃ ম্যাকডোনাল্ড এবং রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'বেঙ্গলী' কাগজে (১৯০১-০২) দীর্ঘ বিতর্কে অবতীর্ণ হন। উক্ত খ্রীস্টান পাদরীদ্বয় একদিকে নিজেদের দার্শনিক ও ধর্মীয় ধারণার মহিমাজ্ঞাপন করেছিলেন, অন্যদিকে হিন্দুধর্ম ও দর্শনের ন্যূনতার ঘোষণায় যথারীতি সোচ্চার হয়েছিলেন। রেভাঃ ডাঃ ম্যাকডোনাল্ড যত-না যুক্তিসিদ্ধ দার্শনিক মত জ্ঞাপনে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁর ততোধিক আগ্রহ ছিল বাঙালীবাবুর ঔদ্ধত্য বিষয়ে অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য করায়। এই ধরনের বাচালতায় না গিয়ে সতীশচন্দ্র সারগর্ভ যুক্তির দ্বারা দেখিয়ে দেন—কোথায় রয়েছে হিন্দুদর্শন ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি এইসঙ্গে ভারতে মিশনারি কার্যকলাপের ইতিহাস বর্ণনা করেন উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ-স্বীকৃত তথ্য সহযোগে।[২১]

॥ আট ॥

পুনশ্চ জানাই, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সতীশচন্দ্রের লেখায় প্রকট আত্মখণ্ডন। যৌবনে বিবেকানন্দকে তিনি দেখেছেন—যাঁর অনিন্দ্য চরিত্র, উচ্চ ভাব এবং দীপ্ত মনস্বিতা সম্বন্ধে তিনি অবহিত। কয়েক বৎসরের অদর্শনের পরে অকস্মাৎ বিশ্বমঞ্চে বিবেকানন্দের গৌরবোজ্জ্বল আবির্ভাবে তিনি শিহরিত। স্বামীজীর সাফল্যে তিনি অবশ্যই উদ্দীপনা বোধ করেছিলেন। সেইসঙ্গে আবার তাঁর ভিতরকার ব্রহ্মণ্য রক্ষণশীলতা বিবেকানন্দের জীবনচর্যা এবং কিছু উক্তিতে বিচলিত হয়েছিল। কিছুদিন তিনি বিবেকানন্দের সমালোচনা ক'রে গেলেন এবং বিবেকানন্দ-বিরোধী সমালোচনার প্রতি সমর্থনও জানালেন। তথাপি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন মনস্বী মানুষ হিসাবে সেই মহান সন্ন্যাসীর গুণাবলীর সমাদর না করেও

পারেন নি। সব জড়িয়ে, এই পর্বে বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য পূর্ণত অনুধাবন করতে না পারলেও তিনি সমকালের ধর্মান্দোলন সমূহের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিবেকানন্দকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন।

লাইট-এর নভেম্বর ১৮৯৩ সংখ্যায় তিনি অ্যালবার্ট ডাউটি-র বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় সমাদরমূলক রচনাটি উৎকলন করেন। সেই সময়ের আমেরিকান সংবাদপত্রের বিবরণাদির সঙ্গেও তাঁর পরিচিতি ঘটে। সে সবের উপর নির্ভর ক'রে তাঁর ধারণা হয়, স্বামী বিবেকানন্দ এবং মিঃ নরসিংহ "পাশ্চাত্য মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন।" তারপর তৎপর মন্তব্য করেন:

"ইউরোপীয় দর্শকদের কাছে এই দুই ভদ্রলোক প্রাচ্য যোগীর খাঁটি নমুনা বলে গণ্য হয়েছেন। আমরা কিন্তু ব্যাপারটিকে একই আলোকে দেখিনা। উদ্দিষ্ট যোগীরা উনিশ শতকের পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত সভ্য যোগী বলেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান। শিকাগোর মজা তাঁদের আকর্ষণ না-ক'রে পারেনি, এবং তাঁরা এমন এক দর্শকদলের কাছে উজ্জ্বল ভাষায় হৃদয়মোচন করেছিলেন, যারা অতি অবশ্যই খাঁটি যোগীর হৃদয়রহস্য অনুধাবনে অসমর্থ। খাঁটি যোগী কদাচিৎ পৃথিবীর সংস্পর্শে আসেন। আমরা যেভাবে দুর্গন্ধ থেকে নাকে চাপা দিয়ে সরে আসি, ঠিক সেইভাবে খাঁটি যোগীরা জনসংঘট্ট এড়িয়ে চলেন। তাঁরা স্ব-স্বভাবে পৃথিবী ও তার প্রয়োজন সম্বন্ধে উদাসীন—শ্যেন পাখির মতো একান্ত নৈঃসঙ্গ্য এবং দূরপ্রস্থান তাঁরা ভালবাসেন। তিনি সম্রাটগণের সমাবেশ ও কৃষক-সমাবেশকে সমদৃষ্টিতে দেখেন। এই হলো খাঁটি যোগীর নমুনা।"

খাঁটি যোগীর এহেন মাননির্ণয়ের পরে, বিবেকানন্দকে উক্ত 'খাঁটিত্ব' থেকে সরিয়ে দেবার জন্য আরও কিছু বার্তা দানের প্রয়োজন ছিল। তাঁর সে-কাজটা সারেন 'জীরো' নামধেয় এক ব্যক্তি লাইট-এ জানুয়ারি ১৮৯৪ সংখ্যায় এক দীর্ঘ নিবন্ধে—"হিন্দুজ্ অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড ফেয়ার।" নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক রচনা—উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলার ঘোর রক্ষণশীল গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি বুঝবার জন্য—এবং বিবেকানন্দ-কথিত এই 'বাম্‌নাই'-এর সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রচণ্ড সংঘাতের চরিত্র বুঝবার জন্যও বটে। আমি এখন সেই রচনার অনেক অংশ অনুবাদে উপস্থিত করব।

প্রথমেই জীরো আপত্তি জানালেন অ্যালবার্ট ডাইটির কাছে ব্যক্ত বিবেকানন্দের একটি উক্তি সম্বন্ধে: "এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি [বিবেকানন্দ] যা বলেছেন তার প্রতিবাদ না ক'রে পারছি না। তিনি যে বলেছেন—হিন্দু বা ম্লেচ্ছ, যে-কোনো মানুষের দেওয়া খাদ্যগ্রহণ করলে তাঁর জাত যাবে না, কারণ সন্ন্যাসী হিসাবে তিনি সকল জাতির ঊর্ধ্বে—তাঁর এই কথাটা মারাত্মক ভুল।"

মারাত্মক ভুল কোথায় তা লেখক খুলে দেখালেন:

"যদি তিনি সন্ন্যাসীও হতেন তথাপি যিনি চতুর্বর্ণের মধ্যে জন্মান নি এমন কারো হাত থেকে আহার্য গ্রহণ করতে পারেন না। যদি তিনি ব্রাহ্মণ হতেন—যা তিনি নন—এবং দণ্ডী সন্ন্যাসী হতেন—কেবল ব্রাহ্মণদেরই দণ্ডী হবার অধিকার আছে—ব্রাহ্মণ

দণ্ডীদেরও ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারো স্পৃষ্ট খাদ্য গ্রহণের অধিকার নেই, যদিনা তিনি সন্ন্যাসের অতি উচ্চ অবস্থায় উপনীত হন। বিবেকানন্দকে যদি সন্ন্যাসী বলেও মেনে নিই, তাহলে বলতে হবে এখনো পর্যন্ত সন্ন্যাসের সেই স্তরে তিনি পৌঁছন নি যেখানে পৌঁছলে কোনো জাতি-প্রশ্ন থাকেনা। সন্ন্যাসের চতুর্থ পর্ব যে পরমহংস অবস্থা সেখানে উন্নীত হলেই কেবল সমাজবিধির পারে যাওয়া যায়। কিন্তু এখনকার কালে সন্ন্যাসীরাই বিরল, পরমহংস তো দূরস্থান। বর্তমানে ভারতবর্ষে হাজার হাজার দণ্ডী এবং গেরুয়াপরা সাধুকে পথে পথে ঘুরতে দেখা যায় কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ যথার্থ সন্ন্যাসী কিনা জানা নেই। তাই বলে আমি বলছি না যে, পৃথিবীর এই **একমাত্র আধ্যাত্মিক দেশ ভারতবর্ষে** কোথাও খাঁটি সন্ন্যাসী মিলবে না। কেন, তাঁদের তো এখানে ওখানে, এখন তখন, দেখা যায়, হঠাৎ আলোর ঝলকানির মধ্যে আবির্ভূত হয়েই তাঁরা হঠাৎই অন্তর্হিত হন। তাঁদের এমনকি গৃহস্থদের মধ্যেও দেখা যায়—বাহ্যত তাঁরা গৃহসুখে আছেন, পার্থিব ব্যাপারে জড়িত, কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে সামান্যতম কালো ছাপ তাঁদের লাগেনি। পরমহংস অবশ্য প্রায় দেখাই যায়না—আমাদের মধ্যে তাঁদের আগমন কালে-ভদ্রে ঘটে থাকে। তাঁরা বাংলার ঘনসন্নিবিষ্ট লোকালয়ে সাধারণত পদার্পণ করেন না। তাঁদের ঘোরাফেরার প্রিয় জায়গা হিমালয় বা অন্য পার্বত্য অঞ্চল, বনবাদাড় বা শ্রীবৃন্দাবনের পবিত্র চুরাশি কোষ।"

এই ভাষণের ধাক্কায় বিখ্যাত পরমহংস রামকৃষ্ণ যখন আশ্রয়চ্যুত হবার মুখে, তখন তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে 'জীরো' লিখলেন:

"বাংলায় একমাত্র পরমহংসরূপে পেয়েছি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে। রামকৃষ্ণ অভিনব ধরনের পরমহংস কিন্তু তিনি পরমহংস ধারার খাঁটি নমুনা। আমি অধিকন্তু বলব, ভারতবর্ষে ঐ বিরল ধারার যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর তুল্য খুব কম সংখ্যাকেই পাওয়া যাবে।"

রামকৃষ্ণ পরমহংস এহেন দাক্ষিণ্য লাভের পরে মনে হয়েছিল যে, রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ বোধহয় কিছু ছাড় পাবেন। তা কিভাবে সম্ভব যখন কঠোর ন্যায়াধীশ জীরো-র হাতে কলম?

"পূর্বোক্ত বিচার অনুযায়ী বিবেকানন্দ তাহলে পরমহংস নন, আরও স্পষ্টভাষায় বলতে পারি—তিনি সন্ন্যাসীই নন। তার কারণ অনেকই। আমরা দুটি প্রধান কারণের উল্লেখ করব। তাদের ব্যাখ্যাও করব।"

অতঃপর একটি চিন্তাপূর্ণ ভাষণ কারণ-বার্তা 'জীরো' উপহার দিয়েছেন:

"সন্ন্যাসী—আর্যধর্মের, এখন যাকে সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম বলা হয়—তার সৃষ্টি। আর, যে-মানুষ হিন্দুধর্মের মধ্যে একটুও ঢুকেছেন তিনি কদাপি ম্লেচ্ছদেশে গমনের কথা ভাবতে পারেন না। প্রশ্ন হলো, ম্লেচ্ছদেশ কাকে বলব? ঠিকভাবে বলতে গেলে, ম্লেচ্ছই বা কারা?"

বিচার করতে বসলে নিরপেক্ষতার দায় নিতেই হয়। সুতরাং হিন্দুধর্মের জয়ঢাক যাঁদের কাঁধে, তাঁদের অনেকের বেতাল বাজনার সমালোচনাও জীরো-কে করতে হয়েছে। তিনি ইংরেজীশিক্ষিত হিন্দুদের ভ্রান্ত ধারণার বিষয়টি ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নি, ওরা তো ভুল করবেই, কিন্তু সংস্কৃত পণ্ডিতেরাও এমন ঘোরপ্যাঁচের ভাষায় কথা বলেন যে, ইতিমধ্যে জমে-থাকা মেঘের কালিমা আরও ঘন হয়ে যায়। তাঁরা যে প্রাণে-প্রাণে অর্থটি জানেন না তা নয়, তবে ইংরেজীনবিশ ভারতীয়দের কাছে বোধগম্য ভাষায় তা ব্যক্ত করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। তদুপরি নিজেরা যেসব শ্লোকের অর্থ জানেন না, তাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো ক'রে ফেলেন। অপরপক্ষে ইউরোপীয়রা 'ম্লেচ্ছ' শব্দটিকে গালাগালি বলে ধরে নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে কথাটা ব্যবহৃত হলে ভয়ানক চটে যান। কিন্তু ঠিকভাবে বুঝলে কথাটি গালমন্দ নয়। তাহলে ম্লেচ্ছ বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা জানানোর দায়িত্ব জীরো-কেই নিতে হলো:

"সোজা কথায়, ম্লেচ্ছ বলতে সেইসব নরনারীকে বোঝায় যারা নীচু ধরনের ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আনন্দে মশগুল—যাদের প্রধান চিন্তা, কিভাবে উদরের, সেইসঙ্গে অন্য স্থূল লালসাপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা মেটানো যায়। এই হলো ম্লেচ্ছ। ইউরোপ আমেরিকার দিকে তাকালে কী দেখি? দেখি যে, দলে দলে লোক কেবল জিহ্বা ও অন্য ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য পাগলের মতো ছুটছে। ও-ই তাদের জীবনের পরমার্থ। ঐসব আকাঙ্ক্ষা একেবারে পাশবিক—অধ্যাত্মসাধনার পক্ষে জঘন্য রকমের বাধা। প্রাচীন আর্যরা সমগ্র হিন্দুভূমি থেকে ঐ ধরনের নারী পুরুষকে বিতাড়িত ক'রে দিত, পাছে একটা খারাপ গরু পালের অন্য গরুগুলোকে খারাপ ক'রে দেয়।... আর্য রাজারা কদাপি এ-ধরনের লোককে তাঁদের প্রজাদের মধ্যে থাকতে দিতে পারেন না, দিলে অন্য প্রজাদের এবং সনাতন ধর্মের দারুণ ক্ষতি হয়ে যেত। এইরকম ছিল সত্য, দ্বাপর ও ত্রেতা যুগের বিধান। কলিযুগ বা জড়বাদী যুগের উদ্ভবে যবন ও ম্লেচ্ছদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। মহাভারতে দেখি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই পবিত্র ভূমিতেই বহু ম্লেচ্ছ ও যবনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে।... আর্যধর্মের মাপকাঠিতে বিচার করলে আমাদের একালের অনেক নিজের লোককে, মানে হিন্দুকে, ম্লেচ্ছ বলতেই হবে। এই শোচনীয় ব্যাপারটি ঘটেছে গৌরবময় বৃটিশ অর্থাৎ ম্লেচ্ছজাতির শিক্ষা-সভ্যতার সঙ্গে সংস্রবের ফলে—সর্বোপরি তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত মেলামেশায়। এই দেশ এখনও **পবিত্র** আছে, কারণ, এখনো অধিকাংশ হিন্দু ভাবে ও আচারে হিন্দুই আছে—যেসব প্রাচীন ঋষি গণনাতীত কাল ধরে এই দেশে বসবাস ক'রে একে আশীর্বাদপূত ক'রে গেছেন, তাঁদের পবিত্র আত্মা এই দেশের প্রতিটি ধূলিকণায় ওতপ্রোত হয়ে আছে।"

অসুবিধাজনক ছিল একটি সংবাদ—জীরো-দের করতলগত ভারতবর্ষ-নামক সুবৃহৎ কূপের ভিতর থেকে লাফ মেরে উপরে উঠে কিছু লোক হিন্দু রাজাদের আমলেই সমুদ্রপারে গিয়েছিল। তার পক্ষে অকাট্য তথ্যপ্রমাণ ঐতিহাসিকরা দিয়েছেন। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্য জীরো-কে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।—

"হিন্দুর সমুদ্রযাত্রার সমর্থকরা সম্প্রতি দেখিয়েছেন, হিন্দুরা আগে জাভা ও সুমাত্রায় যেতেন। কিন্তু তাঁরা কালাপানি পার হতেন—ম্লেচ্ছভূমিতে যাবার জন্য নয়, হিন্দুভূমিতে যাবার জন্যই—যেহেতু সুমাত্রা ও জাভা প্রধানত হিন্দু-অধ্যুষিত ছিল। সমুদ্রযাত্রা—সমুদ্রযাত্রা বলে আপত্তিকর ছিলনা—আপত্তি গম্যস্থান সম্বন্ধে। প্রধান আপত্তি, ম্লেচ্ছভূমিতে বাস করা নিয়ে—যে-ভূমি সেখানকার জনগণের স্থুল জড়বাদী চিন্তা ও আচরণের দ্বারা কলুষিত—সেই বিকট নিঃশ্বাসে বিযাক্ত। সেখানকার জড় মাটিতে উৎপন্ন কৃষিজ বস্তুগুলিও বিষময়। সেই কারণে, দৃষ্টান্ত হিসাবে বলতে পারি, অধিকাংশ খাঁটি হিন্দু এবং পণ্ডিত ও বিধবারা, এখনো পর্যন্ত আলু খান না, যেহেতু তার বীজ আমেরিকা থেকে এসেছে। হিন্দুদের ভয়—সে ভয় খাঁটি যুক্তি এবং বিজ্ঞানের [শুধু যুক্তি নয়, এমনকি বিজ্ঞান!!] ভিত্তিতে স্থাপিত—যে-মুহূর্তে হিন্দু স্থুল জড়বাদী মাটিতে পদার্পণ করবে, সেই মুহূর্তে তার সব আধ্যাত্মিকতা উপে যাবে। আর কেউ যদি কয়েকদিন ঐ ভূমিতে থাকে, সেখানকার লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা ও সেখানে আহারাদি করে, তাহলে তো তার ম্লেচ্ছামির যোলকলা পূর্ণ। তাকে আর কখনো হিন্দু-কোলে ফিরে নেওয়া সম্ভব নয়—হিন্দুদের কাছে সে চিরতরে ত্যাজ্যপুত্র।"

যেসব হিন্দু ম্লেচ্ছদেশে গিয়ে, স্বপাক নিরামিষ খেয়ে, হিঁদুয়ানি বজায় রাখার চেষ্টা করবেন, তাঁদের সম্বন্ধে যখন জীরো-র ঐ বিধান, তখন তিনি সেইসব বিলাতফেরতদের আস্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হতেই পারেন যাঁরা সেখানে পুরো বিলাতি মতে জীবনযাপন ক'রে, তদনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া ক'রে, (রান্নাবান্না যেখানে সাহেবরাই করছে), দেশে ফেরার পরে দাবি করেন—তাঁদের ফিরিয়ে নিতে হবে স্বজাতির মধ্যে!!

"হিন্দুসমাজ ওঁদের কথা শুনে হতবাক। ওঁদের দাবিকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করলে ওঁদের কী রাগ! এইসব বদমাশগুলো সম্বন্ধে কড়া মনোভাব বজায় রেখেছে বলেই হিন্দুধর্ম এখনো কিছুটা প্রাণাগ্নি রক্ষা করতে পেরেছে। কোনো প্রায়শ্চিত্তই বিলাতফেরত হিন্দুদের পাপ ধুয়ে পরিষ্কার করতে পারবে না—স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা ও ঔদ্ধত্যের ঐসব আণ্ডিলগুলোর কোনো সংশোধন নেই।"

এই পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দ কেবল সন্ন্যাসী-পদবী নয়, একেবারে হিন্দুত্ব থেকেই খারিজ। এর পরে বাংলার হিন্দু-আদালতে বিবেকানন্দ-বিচারকাহিনী·

"বিবেকানন্দ-স্বামীকে আমেরিকার ম্লেচ্ছভূমিতে কোন্ বস্তু আকর্ষণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, তা অনুমান করা কঠিন। যদি তিনি অন্তরে অন্তরে হিন্দু হতেন তাহলে কদাপি ঐ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতেন না। যদি তিনি খাঁটি হিন্দু হতেন তাহলে ব্রহ্মনিমজ্জন ছাড়া তাঁর আর কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকত না। যে-মানুষ ব্রহ্মসমুদ্রের সামান্য স্পর্শও পেয়েছেন, তার সৌন্দর্য দর্শন করেছেন—তাঁর পক্ষে স্বর্গ-মর্ত্যের অন্যত্র কোথাও ঐ সৌন্দর্যের কোটি ভাগের এক ভাগও আশা করা সম্ভব নয়। যে-মানুষ খাঁটি আর্য-পবিত্রতাকে কিছু পরিমাণেও লাভ করেছেন— তিনি ম্লেচ্ছস্পর্শের চিন্তায় না কুঁকড়ে গিয়ে পারবেন না।

আমি কয়েকজন সাধুকে জানি যাঁরা কলকাতার সাহেবপাড়ায় শ্বাস নিতে কষ্টবোধ করেন। তাঁদের একজনকে এই শহরের সাহেবপল্লীতে রাস্তা দিয়ে যাবার সময়ে দমবন্ধ হয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে দেখেছিলাম। যদি মিঃ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে দাবি করা হয়, তিনি ভালো বা মন্দ চৌম্বকশক্তির উর্ধ্বে অবস্থিত উচ্চতর মানের পবিত্রতার শক্তিসম্পন্ন—তাহলে আমি বলব—বিবেকানন্দের ঐ উচ্চ অবস্থার কল্পনা এসেছে ম্লেচ্ছ-অধিকৃত মস্তিষ্ক থেকে। তাহলে প্রশ্ন, কোন্ তাগিদে মিঃ বিবেকানন্দ ম্লেচ্ছভূমিতে গিয়েছিলেন? জানি না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কেবল ম্লেচ্ছভূমিতে গিয়ে, ও ম্লেচ্ছদের সঙ্গে মেলামেশা করেই নয়, মিঃ বিবেকানন্দ ম্লেচ্ছদের দ্বারা পাক-করা খাদ্য খেয়ে সকল হিন্দুভাবকে উড়িয়ে দিয়েছেন।... এই একটি কারণের জন্য বলতে পারি, সন্ন্যাস সম্বন্ধে মিঃ বিবেকানন্দের কোনো ধারণাই নেই। যে-মানুষ ম্লেচ্ছদেশে গেছেন, ম্লেচ্ছদের সঙ্গে মিশেছেন, ম্লেচ্ছখাদ্য খেয়েছেন, তিনি কদাপি নিজেকে সন্ন্যাসী বলতে পারেন না।"

'জীরো' তারপর কণ্ঠে আরও উচ্চতান তুললেন:

"আর একটি কারণে আমি তাঁকে পবিত্র সন্ন্যাসের গণ্ডীর বাইরে সরিয়ে দিতে চাই, তা হলো—শিকাগোর ধর্মমহাসভায় নিজেকে প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হতে দেখে তাঁর পরিতৃপ্তি। যে-হিন্দু খাঁটি আর্য ধর্মের ভাবে পূর্ণ (আর্য ধর্ম নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ধর্ম)—তিনি কখনই পৃথিবীর অপর কোনো ধর্মের রীতি-নীতির বিষয়ে অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা পর্যন্ত বোধ করবেন না। আর্যধর্ম পুরো বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সৃষ্টি। আর্যধর্ম-বিজ্ঞান যিনি জানেন, তিনিই মানবেন যে, অন্য সকল ধর্মই উপধর্ম বা আর্যধর্মের বিকার, সেসবই ত্রুটিপূর্ণ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনোরকম ধর্মমহাসভা—শিকাগোয় যে-রকম একটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল—তাঁর নজরেই আসবে না। অবশ্য অন্য ধর্মকে তিনি ঘৃণা করবেন, এমন বলছি না, বরং তাদের সম্বন্ধে শুভেচ্ছা বোধ করবেন, তা জ্ঞাপনও করবেন। কিন্তু কদাপি তিনি হৃদয়ের গভীরে অপর কোনো ধর্মের সঙ্গে যোগাযোগের কথা ভাববেন না—ধর্মমহাসভায় অংশ নেওয়া তো দূরের কথা। অপর সকল ধর্মই, প্রয়োজনীয় শাস্ত্রানুষ্ঠানের পরে যে-কোনো লোককে নিজেদের কোলে টেনে নিতে প্রস্তুত—অপরপক্ষে কেউই ঐভাবে হিন্দু হতে পারে না। **যে-কেউ ইচ্ছামতো খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, জৈন বা মুসলমান হতে পারে, কিন্তু হিন্দু হতে পারেনা—হিন্দু হবার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকলেও নয়। জন্মসূত্রেই মাত্র হিন্দু হওয়া যায়—হিন্দু ইচ্ছামতো তৈরি করা যায় না। অন্য ধর্মের কেউ হিন্দু হতে চাইলে তাকে অনেক কিছু করতে হবে। প্রথমত তাকে নিজ ধর্মে অবস্থিত থেকে, সর্বোচ্চসম্ভব আধ্যাত্মিকতা অর্জন ক'রে, বহু সহস্র পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। সেই কালে প্রত্যেক জন্মে নিরন্তর আধ্যাত্মিক সাধনাও করে যেতে হবে। এর পরে যদি ভাগ্যে থাকে সে হিন্দুরূপে জন্মালেও জন্মাতে পারে। এই তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি কদাপি ম্লেচ্ছভূমে যেতে চাইবেন না—রাশিয়ার জার্-এর মুকুটের বিনিময়েও নয়। জানিনা, স্বামী বিবেকানন্দকে ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে কোন্ জিনিস প্ররোচিত করেছিল! হায় রে, তিনি তো আর হিন্দু-মন, হিন্দু-হৃদয়, হিন্দু-মনীষা ফিরে পাবেন**

না—সন্ন্যাস তো দূর অস্তু। না—না—না—তাঁকে সন্ন্যাসী বলা ধর্মদ্রোহিতা—হিন্দু বলাও তাই। তিনি কী তাহলে? আপনারা কী বলেন?"
বিবেকানন্দ কী তাহলে? অন্যের হয়ে 'জীরো' উত্তর দিয়েছেন:

"বস্তুতপক্ষে এইসব চতুর লোক এখনো ইংরেজি শিক্ষার বিজাতীয় প্রভাব এড়াতে পারেন নি। পাশ্চাত্য দর্শনের বিষ এরা আকণ্ঠ পান করেছে। এদের মধ্যে যদিও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে—এক যোগ্য গুরুর প্রভাবেই তা হতে পেরেছে—এরা কিন্তু ঐ বিষ পুরো উগ্‌রে ফেলতে পারেনি। আর যতক্ষণ না ঐ বিষ পুরো ওগ্‌রানো যাচ্ছে, ততক্ষণ আর্যধর্মের ভাবের মধ্যে প্রবেশের কোনো সম্ভাবনা নেই। বর্ত্তমানে এরা সবকিছু—বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীস্টান—কিন্তু হিন্দু কদাপি নয়।"

যদি কেউ মনে করেন, কেবল জীরো-ই এই অসামান্য রচনাটির জন্মদাতা, তাহলে তাঁদের জানানো যায়, ঐকালে প্রচলিত অনেক পত্র-পত্রিকাই—'ধর্মপ্রচারক', 'অনুসন্ধান', 'দাসী', 'প্রয়াস', সর্বোপরি সর্বাধিক প্রচারিত 'বঙ্গবাসী'—ঐ চরিত্রের নানা লেখা প্রচার ক'রে গেছে। 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে তেমন কিছু সুসমাচার আমরা উৎকলন করেছি। প্রত্যক্ষদর্শী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সেইজন্য বলেছেন, স্বামীজীর মতো আর কোনো বিখ্যাত ভারতবাসীকে স্বজাতির নিন্দা-কুৎসা সহ্য করতে হয়নি।

তাই বলে জীরো শয়তানকে তার পাওনা না-দেবার মতো অনুদার ছিলেন না। নিজেকে বিবেকানন্দের সঙ্গে পূর্বাবধি পরিচিত দাবি ক'রে তিনি খোলা কলমে লিখেছেন:

"বিবেকানন্দ-স্বামীকে আমি নিজস্ব-ভাবে জানি। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র, পবিত্রতা এবং প্রতিভা সম্বন্ধে আমার সমুচ্চ শ্রদ্ধা। বহুদিক দিয়ে তিনি সুমহান রামকৃষ্ণ পরমহংসের যোগ্য শিষ্য।...

"আমি তাঁকে ভালবাসি কারণ তিনি সকল মানুষের ভালবাসা পাবার যোগ্য। চমৎকার দীর্ঘ প্রশস্ত পুরুষ; অপূর্ব সুন্দর মুখ, যা মনস্বিতায় পূর্ণ;—বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু, তা প্রসন্ন-স্থির হয়ে আছে স্নেহে ও প্রেমে, যা তোমার প্রতি আনত;—বুদ্ধির প্রভায় ঝলমলে অবয়ব—সত্যই ভালবাসার যোগ্য মানুষ—এই বিবেকানন্দ। আধুনিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবার নির্ধারিত পুরুষ তিনি। তাঁর প্রশস্ত উদার কোমল হৃদয়, তাঁর দৃঢ়তা, তাঁর আত্মত্যাগ, সকল মানুষের প্রতি ভালবাসা, সর্বোপরি তাঁর পবিত্রতা এবং উচ্চমার্গের বুদ্ধিশক্তি—এই সকলের দ্বারা যে-কোনো বহু সহস্রের সমাবেশেও তিনি অনন্য পুরুষ। তোমার প্রতি নিবদ্ধ তাঁর প্রদীপ্ত নয়নের দিকে যদি তুমি তাকাও, দেখবে যে, তার মধ্যে আছে সংকল্পশক্তির আগ্নেয়গিরি, যা ঠিক পথে চললে মাতৃভূমিতে অলৌকিক কাণ্ড ঘটাবে।"

জীরো-দৃষ্ট তরুণ বিবেকানন্দের এই দর্শন, যা আলোকিত দেবদর্শনের তুল্য—জীরো-কে অগত্যা-বিনয় দিয়েছিল। তিনি রচনা শেষে লিখেছিলেন:

"..... এবং যে-আমি আজ তাঁর বিচার করতে বসেছি, সেই আমি হয়ত একদিন তাঁর সঙ্গে একটা কথা বলতে পেলেও ধন্য বোধ করব।'

শেযোক্ত বিবেকানন্দ প্রশস্তি কিন্তু বিবেকানন্দের মাদ্রাজী অনুরাগীদের শান্ত করতে পারেনি। যে-বিবেকানন্দের অসাধারণ আকার এবং চরিত্রের প্রশস্তি জীরো করেছেন, সেই তাঁকে উজ্জ্বলতর আকারে মাদ্রাজের অনেকেই দেখেছেন, কারণ প্রথম যৌবনে বিবেকানন্দকে জীরো-র দেখার পরে বেশ কয়েক বছর ধরে বিবেকানন্দের পরিব্রাজক জীবন, নিবিড় সাধনা, তাঁর ভিতরে এমন পরিবর্তন ঘটিয়েছিল যে, তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিত গুরুভাই অখণ্ডানন্দ পর্যন্ত পরিব্রাজক-পর্বে তাঁকে দেখে চমৎকৃত হয়ে যান। যাই হোক, রক্ষণশীলতার দুর্গ বলে কথিত দক্ষিণ ভারতের কাছে গোঁড়ামির বাঁশের কেল্লা বাংলার বিদ্বেষদুষ্ট বিবেকানন্দ-নিন্দা এবং আর্যামির তারস্বরে ঘোষণা, এমনই বিরক্তিকর ঠেকেছিল যে, সেখান থেকে প্রতিবাদপত্র আসতে শুরু করে লাইট-এর দপ্তরে। জীরো-র লেখা প্রকাশ ক'রে রক্ষণশীল সতীশচন্দ্র কতখানি পরিতৃপ্ত ছিলেন বলতে পারি না, কিন্তু সম্পাদকরূপে বিচলিত হলেন দক্ষিণী পাঠকদের প্রতিবাদে। সুতরাং তাঁর কৈফিয়ত বেরুল লাইট-এ ১৮৯৪ মে সংখ্যায়:

"লাইট অব দি ইস্ট ব্যাপকতম অর্থে হিন্দু পত্রিকা। এর পৃষ্ঠায় উদারনৈতিক মতের মতোই স্থান পাবে রক্ষণশীল মত। সকল প্রকার হিন্দু-মতই এর পৃষ্ঠায় স্বাগত। তার মানে নয় যে, যে-কোনো প্রবন্ধ লেখকের মতের জন্য সম্পাদক দায়ী। হিন্দুধর্মের মধ্যে হিন্দু-রক্ষণশীলতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর, সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য ঐ রক্ষণশীলতার নেতা।"

অতঃপর সম্পাদক বিবেকানন্দকে সমুদ্রলঙ্ঘন-দোষ থেকে অব্যাহতি দিয়ে লিখলেন:
"যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, শিকাগোয় যাবার জন্য বিবেকানন্দের কোনো দোষ হয়েছে কিনা, আমরা সজোরে বলব—কোনো দোষই হয়নি, কারণ স্বামী বিবেকানন্দ নিজেকে পরমহংস বলেছেন, এবং রক্ষণশীল দৃষ্টিতে পর্যন্ত পরমহংসের পবিত্রতা কোনো কিছুতে ক্ষুণ্ণ হয়না।"

সুতরাং, সম্পাদকের মতে, কেবল হিন্দু পরমহংসরাই কালাপানি পারে যেতে পারেন শুদ্ধ হিন্দুরূপে! এই উদারতাটুকুও কিন্তু ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লিখিত তাঁর সম্পাদকীয়তে ছিলনা। সেখানে তিনি লিখেছিলেন (আগেই তা পাঠকরা জেনেছেন), খাঁটি যোগীরা জনসংস্রবে আসতে গররাজি। সম্পাদক বিবেকানন্দকে যোগী-ভূমিকা থেকে অব্যাহতি দিয়ে, পরমহংস ভূমিকায় স্থাপন ক'রে, সামঞ্জস্য আনতে চেয়েছিলেন।

কূপমণ্ডূকদের বিষয়ে বিবেকানন্দের ঘৃণা ও অবজ্ঞার কথা তাঁর রচনাবলীর, বিশেষত পত্রাবলীর পাঠকদের, জানা আছে। কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে সেসব লেখা উপযুক্ত পরিমাণে জনগোচর ছিল না। তবু যেটুকু হয়েছিল তাই রক্ষণশীলদের ভিত্ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কয়েকটি তারিখ লক্ষণীয়। আমেরিকায় বিবেকানন্দের সাফল্যে উল্লসিত দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে অভিনন্দন সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ সভা মাদ্রাজের সমবেত নাগরিকদের—পচিআপ্পা হলে ২৮ এপ্রিল ১৮৯৪। সেই সভায় বিবেকানন্দকে হিন্দুধর্মের অনন্য প্রতিনিধিরূপে ঘোষণা করা হয়। মাদ্রাজ অভিনন্দনপত্রের স্বামীজী-প্রেরিত বিখ্যাত

'উত্তর' ইন্ডিয়ান মিরার-এ প্রকাশিত হয়ে যায় ৩ নভেম্বর ১৮৯৪। এই উত্তরে হিন্দুধর্মের মৌল চরিত্রের এবং আকাঙ্ক্ষিত গতিশীল রূপের অসাধারণ প্রকাশ ছিল। কলকাতার শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের উপস্থিতিতে বিরাট অভিনন্দন সভা হয় ৫ সেপ্টেম্বর। সেখানেও বিবেকানন্দ-কৃত হিন্দুধর্মরূপকে মুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়। নিউইয়র্ক থেকে স্বামীজী ১৮ নভেম্বর ১৮৯৪ তারিখে যে-পত্র উক্ত সভার সভাপতি রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে লেখেন, তা ক্ষেপণাস্ত্রের মতো ছুটে এসে ফেটে পড়েছিল এদেশে, বিশেষত বাংলায়। পত্রটি ইন্ডিয়ান মিরার-এ যদিও ১৮ এপ্রিল ১৮৯৫ তারিখে প্রকাশিত হয়, তার বিষয়বস্তু অনেকের কাছে আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল। পত্রটি অংশত অনুবাদে এই:

"আমার দৃঢ় ধারণা—কোনো ব্যক্তি বা জাতি অপর সম্প্রদায়ের মানুষের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে বাঁচতে পারেনা। কোনো জাতি নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ববোধ, নীতিবোধ বা পবিত্রতাবোধের ভ্রান্ত অভিমান থেকে যখন তেমন চেষ্টা করেছে, তখনই ওই বিচ্ছিন্নতাকামী জাতির পক্ষে তার ফল হয়েছে মারাত্মক।

"আমার মতে, ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—জাতির চারিদিকে আচারের বেড়া দেওয়া। প্রাচীনকালে সে প্রচেষ্টার আসল উদ্দেশ্য ছিল চারিপার্শ্বের বৌদ্ধ জাতিগুলির সংস্রব থেকে হিন্দুদের দূরে রাখা। এর ভিত্তি—অপরের প্রতি ঘৃণা।

"প্রাচীন বা আধুনিক বুদ্ধিব্যবসায়ীরা যতই মিথ্যা-যুক্তির আবরণ দেবার চেষ্টা করুন—ঐ কাজের অবশ্যম্ভাবী ফল এই হয়েছে—যে-জাতি প্রাচীনকালে সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল, সে এখন অপর জাতিদের উপহাস ও ঘৃণার পাত্র। এর দ্বারা এই ধর্মনীতির অব্যর্থ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে—অপরকে ঘৃণা করলে নিজের পতন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ঐ ধর্মনীতির প্রথম আবিষ্কারক ও প্রচারক—ঐ নীতি-লঙ্ঘনের প্রথম দৃষ্টান্ত আমরাই।

"আদান-প্রদানই পৃথিবীর নিয়ম। ভারতকে যদি আবার উঠতে হয়, তাহলে তাকে নিজের ঐশ্বর্যভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে, এবং প্রতিদানে অপরে যা দেবে তাকে নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বিস্তারই জীবন, সংকীর্ণতাই মৃত্যু। প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু। যেদিন থেকে আমরা নিজেদের গুটিয়ে নিতে আরম্ভ করেছি—অপর জাতিদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি—সেদিন থেকে আমাদের মৃত্যুর সূচনা। সে মৃত্যু কিছুতে থামানো যাবেনা যতদিন-না আমরা সম্প্রসারণের জীবনকে অবলম্বন করছি। সুতরাং আমাদের পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে মিশতে হবে। ঐ যেসব কুসংস্কার ও স্বার্থপরতার পুঞ্জীভূত আবর্জনার দল রয়েছে, যাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রবাদ-কথিত কুকুরের মতো হওয়া, যে-কুকুর গোরুর জাব-পাত্রে শুয়ে থেকে নিজেও খায়না, অপরকেও খেতে দেয়না—তাদের শত শত সংখ্যার তুলনায় বিদেশভ্রমণে যায় এমন প্রতিটি হিন্দু স্বদেশের অধিক কল্যাণ করে।"

॥ নয় ॥

পরিস্থিতির বিচার ক'রে সতীশচন্দ্র জীরো-পন্থীদের সরিয়ে রেখে—বিবেকানন্দ, থিয়জফিক্যাল সোসাইটি, আর্য-সমাজ, এবং ভারত ধর্মমহামণ্ডলের দ্বারা সৃষ্ট "বিরাট হিন্দু পুনরুত্থানকে" স্বাগত জানিয়েছিলেন, যা "আলোড়িত করেছে ভারতের এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত।" জাগরণের হোতা হিসেবে তিনি বিবেকানন্দের সঙ্গে একাধিক সংস্থার নাম যুক্ত করলেও বিচারের মাপে সকল কিছুকে সমমর্যাদা দিতে পারেন নি। তাঁর মতে, "ঠিকভাবে বলতে গেলে থিয়জফিক্যাল সোসাইটির আন্দোলন হিন্দু আন্দোলন নয়, এবং তারা প্রধানত লেখক-সমবায়।" "ভারত ধর্মমহামণ্ডলের প্রভাব উত্তর-পশ্চিম ভারতের পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।" আর আর্য-সমাজ ভারতের নানা জায়গায় শাখা স্থাপন করলেও এবং তাদের ভাবধারা মোটামুটি আধুনিক যুগের ভাবধারার অনুরূপ হলেও, সেইসকল ভাবকে উপযুক্ত পরিণতির দিকে চালিত করবার যোগ্য উত্তরাধিকারী স্বামী দয়ানন্দ পাননি। অন্যদিকে একমাত্র বিবেকানন্দই তাঁর প্রচারের মধ্যে "শঙ্করাচার্য-প্রতিপাদিত উপনিষদের উচ্চতর দর্শনের যথার্থ উদ্ঘাটন করেছেন।" (সেপ্টেম্বর ১৮৯৪)।

(সতীশচন্দ্রের দর্শনজ্ঞান স্মরণ রেখেও বলব, তাঁর দার্শনিক ধারণার সঙ্গে নানা আনুষ্ঠানিক গোঁড়ামি এবং অলৌকিক বিষয়ে বিশ্বাসের প্রবণতা জড়িত ছিল; আর তাঁর তখনো সহযোগী অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কট্টর অদ্বৈতবাদী, যিনি বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব নিয়ে স্বামী স্বরূপানন্দ হবার পরেও অদ্বৈতবাদী হিসাবে মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করেন নি এবং অদ্বৈততত্ত্ব অনুযায়ী অবতারবাদ মানতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বিবেচনায় অবতার নন, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের সর্বোচ্চ পুরুষ। বলাবাহুল্য অন্য কোনো কথিত অবতারই তাঁর কাছে অবতার নন। এই অজয়হরিই কি সতীশচন্দ্রকে শঙ্করাচার্যের দার্শনিক মতের অনুগামিতার ব্যাপারে কিছুটা প্রভাবিত করেছিলেন?)।

'বিবেকানন্দ' নামক এক সম্পাদকীয়তে (জানুয়ারি ১৮৯৫), সতীশচন্দ্র বিস্তারিতভাবে দেখাবার চেষ্টা করেন, বিবেকানন্দ কেন আর্যধর্মের খাঁটি প্রবক্তা। আমেরিকায় স্বামীজীর সত্বর জনপ্রিয়তার মূলে আছে—"তিনি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদী মত প্রচার করেছেন, যা সর্বোচ্চ হিন্দুধর্ম।... এই মতের মধ্যে জড়বাদকে ভিত্তিমূলে বিচলিত করার বীজ রয়েছে।" "বিবেকানন্দ যেখানে অতীন্দ্রিয় চেতনা-লব্ধ নিত্য সত্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে আধুনিক খ্রীস্টধর্মের সম্বল কয়েকটি নীতিবাক্য মাত্র, যেমন,... 'যথেচ্ছ ঐশ্বরিক ইচ্ছা', কিংবা 'চিরস্বর্গ বা চিরনরক'।... এই সকলই পাশ্চাত্যের নৈতিক ও ধর্মীয় আবহাওয়াকে নিশ্ছিদ্র নৈরাশ্যের অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছিল। আমেরিকার এই কালিমাময় নৈতিক বিপর্যয়ের উপর সহসা উপনিষদের সুমহান শিক্ষা বিদ্যুৎঝলকের মতো আঘাত করল,... আর সেই বিচিত্র আলোকের দূত বত্রিশ বৎসরের এক তরুণ, যাঁর অভিপ্রায়, কেবল উপনিষদের প্রচার নয়, উপনিষদের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন।" এই প্রবন্ধে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, "উনিশ শতকের শেষপাদে শিকাগোর ধর্মমহাসভা নিঃসন্দেহে বিরাটতম ঐতিহাসিক ঘটনা।" 'এরিনা' পত্রিকায় ম্যাক্সমূলার ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ লেখেন, তার কিয়দংশ সতীশচন্দ্র উদ্ধৃত করেন। (সে-কথাগুলি অসামান্য ভাষায় পূর্বে-প্রকাশিত বিবেকানন্দের ভাষণের প্রতিধ্বনি ছাড়া কিছু নয়)। ম্যাক্সমূলার বলেছিলেন: "ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিতেরা ডাঁই-ডাঁই

গ্রন্থ লিখুন—ধর্ম কিন্তু খুবই সহজ ব্যাপার।... আমার বিশ্বাস, ধর্মের শাঁস অংশ প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই নিহিত আছে—যতই তাদের খোসার অংশে পার্থক্য থাক। ভেবে দেখুন তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে? তার মানে: প্রত্যেক ধর্মের উর্ধ্বে, নিম্নে, পশ্চাতে রয়েছে এক শাশ্বত সর্বজনীন ধর্ম, যার অন্তর্গত সকল মনুষ্য—তাদের রঙ কালো, শাদা, পীত বা লোহিত, যাই হোক না কেন।" সম্পাদক বিবেকানন্দের মহিমান্বিত ভাষণের সূত্রে বলেন: "ধর্মমহাসভায় উপস্থিত জনমণ্ডলী লাভ করেছিলেন এক প্রাণবন্ত, ভাববিচ্ছুরিত, গতিশীল প্রাচীন ধর্ম-দর্শনকে, অতীতে যা সৃষ্টি করেছিল ব্যাসদেব এবং শঙ্করাচার্যের মতো চরিত্রকে।"

পরবর্তী বছর-দেড়েক 'লাইট' পত্রিকা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে উচ্চ সমাদরের মনোভাব বজায় রাখে। বিবেকানন্দ-প্রণোদিত মাসিক 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকাকে "চমৎকার বৈদান্তিক পত্রিকা" বলে সে স্বীকার করে। (অক্টোবর ১৮৯৫)। প্রশংসা করে ই টি স্টার্ডির বেদান্ত বিষয়ক প্রবন্ধের, যা অবশ্য বিবেকানন্দের কথার প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু নয়। (ডিসেম্বর ১৮৯৫)। ইতস্তত মানসিক বিরূপতার কারণ ঘটা সত্ত্বেও, তখন ভারতব্যাপী বহমান বিবেকানন্দ-স্রোতকে উপেক্ষা করা পত্রিকাটির পক্ষে সম্ভব ছিলনা। বিবেকানন্দের 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থ ইংরাজি ভাষায় "ঐ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ রচনা।" বিবেকানন্দের 'দি আইডিয়াল অব ইউনিভার্সাল রিলিজন' ভাষণ, পত্রিকাটির বিবেচনায় "ঐ জটিল বিষয়ে সঠিক সত্য-পথ নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছে।" (নভেম্বর ১৮৯৬)। প্রশংসিত হয়েছিল স্বামীজীর 'কর্মযোগ' গ্রন্থ, "সহজ সাবলীল যার রচনারীতি, এবং যার সবিশেষ মূল্য কেবল পাশ্চাত্যের মানুষদের কাছে নয়, আধুনিক হিন্দুদের কাছেও স্বীকার্য।" (মার্চ ১৮৯৭)।

উক্ত দেড় বছরের মধ্যে সতীশচন্দ্র স্বামীজীর একটি কাজে অবশ্য প্রচণ্ড চোট খেয়েছিলেন। স্বামীজী, মারী লুইস-নাম্নী এক আমেরিকান নারীকে, এবং ডাঃ স্ট্রীট নামক এক আমেরিকান পুরুষকে সন্ন্যাস দেন—যাঁদের সন্ন্যাস-নাম ক্রমান্বয়ে—স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ। ব্যাপার দেখে সতীশচন্দ্রের বিরক্তি ও ক্রোধের সীমা ছিলনা। তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে তিনি লেখেন: "অপূর্ব কাণ্ড! থিয়জফিস্টদের কল্পনা অনুযায়ী—লণ্ডনবাসী কোনো বিদ্যালয়-ছাত্র সাত বছরের মধ্যে সূক্ষ্মদেহী মহাত্মায় পরিণত হতে পারে—তাকেও অসাধারণত্বে ছাপিয়ে গেছে উচ্চ আধ্যাত্মিক অধিকার সমন্বিত সন্ন্যাসের পবিত্র নামের এইপ্রকার মুক্ত বিতরণ।" ১৮৯৫-এর জানুয়ারি, এপ্রিল, মে ও জুন, এই তিন সংখ্যায় বিবেকানন্দের ঐ কাজ সমালোচিত হয়েছে। স্বামীজী যে-উদ্দেশ্যে আমেরিকায় দুই পুরুষ ও এক নারীকে সন্ন্যাস দেন—সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যের কেবল সাধুতা নয়, বৈপ্লবিকতা ঐতিহাসিক ঘটনারূপে বিবেচিত হবার যোগ্য। (বর্তমান হিন্দুসমাজে নারীর পৌরোহিত্যে অধিকার নিয়ে যে বিতর্ক চলেছে, তার পটভূমিকায় এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়)।

১৮৯৭ সালের গোড়ায় ভারতে স্বামীজীর প্রত্যাবর্তন নিয়ে লাইট-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। তাদের মধ্যে এই স্বীকৃতি ছিল:
"ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ব্যক্তিরাও স্বীকার করবেন যে, ভারতভূমে কোনো ধর্মপুরুষকে বিবেকানন্দের মতো ক'রে অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানানো হয়নি। রামকৃষ্ণ পরমহংসের এই গৃহত্যাগী পরিব্রাজক প্রচারক শিষ্য যে উদ্দীপ্ত আগ্রহের সৃষ্টি করেছেন, তার অর্ধেকও সৃষ্টি করতে পারেন নি রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, এমনকি মিসেস বেশান্ত।"

তবে সতীশচন্দ্র লাগামছাড়া আবেগে ভাসতে রাজি ছিলেন না। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতবর্ষে তখনও এমন অনেক মানুষ ছিলেন যাঁরা "আধ্যাত্মিক বিরাটত্বে বিবেকানন্দ অপেক্ষা বহু ঊর্ধ্বে আসীন।... দুঃখের বিষয়, এইসব মহাত্মারা অজ্ঞাত স্থানে অবস্থান করেন, কেননা তাঁরা স্থূলচরিত্র জনতার সংস্রব সহ্য করতে পারেন না।... এই পরিস্থিতিতে দরকার ছিল বিবেকানন্দের—যিনি জনতার মানুষ, মার্কা-মারা কর্মযোগী, যাঁর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটেছে,.... যাঁর আবির্ভাব না ঘটলে পাশ্চাত্যদেশ হিন্দুদর্শনের দীপ্তপ্রতিভাযুক্ত, সর্বাধিক বাগ্মিতাসম্পন্ন এক শিক্ষকের দর্শন পেত না।" এইসঙ্গে সম্পাদক, বিবেকানন্দকে প্রদত্ত লন্ডনের [না, আমেরিকার] অনুরাগীবৃন্দের মানপত্রের উল্লেখ করেছিলেন, যার মধ্যে বিবেকানন্দের প্রতিভার মুক্ত স্বীকৃতি ছিল, তৎসহ পাশ্চাত্য মনোজগতে বেদান্তের গুরুত্বের কথাও।

একই সংখ্যায় বিবেকানন্দ-বিষয়ে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার অতিশয় কটু সমালোচনার অনূদিত রূপ উপস্থিত করা হয়েছিল। (এই প্রসঙ্গটি এই গ্রন্থের 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে)।

রক্ষণশীলতার ক্ষেত্রে, আমরা আগেই দেখেছি, সতীশচন্দ্র 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাদির গা ঘেঁষে চলছিলেন। আর বিবেকানন্দেরও দায় ছিলনা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মনের মানুষ হয়ে ওঠার। সতীশচন্দ্র বিবেকানন্দের কাছে আমেরিকায় 'লাইট' পত্রিকা পাঠাতেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের ঠিক আগে বিবেকানন্দ সতীশচন্দ্রের পত্রিকার জন্য একটি খোলা চিঠি পাঠালেন, সেটি ডিসেম্বর ১৮৯৬ সংখ্যায় লাইট-এ প্রকাশিত হলো। বিবেকানন্দ, সতীশচন্দ্রের পত্রিকায় রক্ষণশীলতার চেহারা দেখেছেন—সেইসঙ্গে গুপ্ত রহস্যবাদের প্রতি আসক্তিও। রক্ষণশীলতা এবং কূপমণ্ডূকতা সম্বন্ধে তিনি কোন্ চড়া কথা কলিকাতা অভিনন্দনপত্রের উত্তরে শুনিয়েছিলেন—তার কথা আমরা জানি। এবার গুপ্তরহস্যবাদ সম্বন্ধে তাঁর ধারালো কিছু কথা শোনা যাক।

উক্ত পত্রে তিনি লেখেন:

"প্রিয় মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ ক'রে 'লাইট অব দ্য ইস্ট' পত্রিকার কিছু সংখ্যা আমাকে পাঠিয়েছেন, সেজন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনার পত্রিকার সাফল্য কামনা করি।

"পত্রিকার উন্নতির জন্য আপনি আমার মত চেয়েছেন। খোলাখুলি জানাচ্ছি—আমার সারা জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সর্বদাই দেখেছি যে, গুপ্তরহস্যবাদ মানবজাতির পক্ষে অতীব ক্ষতিকর এবং দুর্বলতা-বিধায়ক। আমাদের দরকার—শক্তি। অপর জাতিদের অপেক্ষা ভারতবাসীর অধিক প্রয়োজন শক্তিশালী, বীর্যশালী চিন্তা। সর্ববিষয়ে সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্মের পশ্চাদ্ধাবন—অনেক হয়েছে। বহু শতাব্দী ধরে রহস্যময় বস্তু আমাদের মধ্যে ঠেসে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে আমাদের বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক পরিপাকক্ষমতা নৈরাশ্যজনক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত—এবং এই জাতি আশাভরসাহীন জড়ত্বে নিমজ্জিত—যা পৃথিবীর অন্য কোনো সভ্য জাতির ভাগ্যে পূর্বে বা পরে ঘটেনি। যদি বীর্যশালী জাতিগঠন করতে হয় তাহলে চাই সতেজ প্রাণদায়ী চিন্তাধারা। সারা পৃথিবীকে শক্তি দেবার মতো যথেষ্টর বেশি ভাবসম্পদ

আছে উপনিষদে। অদ্বৈততত্ত্ব শক্তির অনন্ত উৎস। সেই অদ্বৈতকে ব্যক্তিজীবনে রূপায়িত করতে হবে। সেজন্য প্রথম প্রয়োজন তার শরীর থেকে পণ্ডিতিয়ানার মোটা খোলস ছিঁড়ে ফেলা। তারপর সেই নির্মুক্ত অদ্বৈততত্ত্বের সহজ সুন্দর সুমহান ভাবের বিস্তার ঘটাতে হবে দেশের এ-প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। এমনভাবে সেই ভাবকে উপস্থিত করতে হবে যাতে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি প্রয়োজনেও ব্যবহার করা যায়। খুবই বৃহৎ পরিকল্পনা, তাতে সন্দেহ নেই। তথাপি এমনভাবে সে ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন যাতে মনে হয় যেন আগামীকালই তা রূপায়িত হয়ে গেছে। একটি বিষয়ে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে—যদি কেউ যথার্থ নিঃস্বার্থ ভালবাসা নিয়ে তার মনুষ্যভ্রাতাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়, সে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর কীর্তির অধিকারী হবে।—ইতি, আপনার বিশ্বস্ত, বিবেকানন্দ।"

॥ দশ ॥

এই চিঠির আগেই সতীশচন্দ্র থিয়জফিক্যাল সোসাইটির কার্যাবলী সম্বন্ধে বিবেকানন্দের বিতৃষ্ণা এবং বিবেকানন্দের সম্বন্ধে সোসাইটির নেতৃবৃন্দের বিরূপতার বিষয়ে অবহিত হয়েছেন আমেরিকান পত্র-পত্রিকার সংবাদ সূত্রে। এই চিঠি প্রকাশের পরে ঘটেছে ভারতবর্ষে প্রত্যাবৃত্ত বিবেকানন্দ-কর্তৃক মাদ্রাজে 'আমার সমরনীতি' বক্তৃতায় থিয়জফি-নেতা কর্নেল অলকটের নীচতা-কাহিনী প্রকাশ এবং রহস্যবাদের মারাত্মক ক্ষতিকরতার রূপ উদ্‌ঘাটন। শেষোক্ত ঘটনার ফলে যে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল, সতীশচন্দ্র সে-বিষয়ে বিতর্কে না গিয়ে, 'বিবেকানন্দ এবং মিসেস বেশান্ত' নামক যে-সম্পাদকীয় লিখলেন (মার্চ ১৮৯৭), তার মধ্যে উভয়ের ভূমিকার গুরুত্ব বিশ্লেষণের চেষ্টা ছিল। "উভয়েই বিরাট ধর্মসংস্কারক—বিপুলসংখ্যক মানুষকে তাঁরা প্রভাবিত করেছেন। পাশ্চাত্য জড়বাদী শিক্ষা গ্রহণ করার পরে নিজ নিজ লক্ষ্যে উপনীত হবার পথে তাঁরা দারুণ কষ্ট স্বীকার করেছেন, সঞ্চয় করেছেন প্রভূত অভিজ্ঞতা।" বিভিন্ন দিক দিয়ে তাঁদের তুলনা সতীশচন্দ্র করেছেন। থিয়জফির মহাত্মাদের অস্তিত্ব তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। তাঁর মতে ওঁরা ব্যাস, পতঞ্জলি, কপিল, শঙ্করাচার্যদের মতো 'বিদেহ-মুক্ত'। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর পাল্লা বিবেকানন্দের দিকেই ঝুঁকেছিল, যিনি "তাঁর শিক্ষার উৎসরূপে মোরীয়, কুথুমি-র মতো আধ্যাত্মিক চরিত্রদের গ্রহণ না ক'রে শাশ্বত উপনিষদকে গ্রহণ করেছেন, যে-ঔপনিষদিক সত্যের অক্ষয় অব্যয় ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছে অপর সকল ভারতীয় দার্শনিক মতসমূহ।"

কিছুটা ওঠা-নামা করলেও থিয়জফি সম্পর্কে সতীশচন্দ্রের আসক্তি পুরোপুরি লুপ্ত হয়নি। তাই যখন 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা মিসেস বেশান্তের 'সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ' পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাল তখন তিনি সানন্দে সে-বিষয়ে মন্তব্য করলেন। তিনি ভাবলেন, তাহলে থিয়জফিক্যাল সোসাইটি সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মনোভাব বদলেছে। (সেপ্টেম্বর ১৮৯৯)। কদাপি নয়। উল্টোপক্ষে তা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়েছে। বিবেকানন্দের পত্রিকা বেশান্তের সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ পরিকল্পনাকে সমর্থন জানিয়েছিল কারণ তার

ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল, "ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে প্রদত্ত শিক্ষা অপেক্ষা উচ্চতর মানের শিক্ষাদান, এবং প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হবে জাতীয় ভিত্তিতে।" "ভারতের একান্ত প্রয়োজন প্রাদেশিক জাতীয়তাবোধ নয়, অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবোধ। শিক্ষাক্ষেত্রে এই কলেজ তা সৃষ্টি করতে দায়বদ্ধ, রাজনীতি ক্ষেত্রে যা অর্জন করতে সচেষ্ট ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস। জাতীয় ঐক্য ভিন্ন কোনোভাবেই আমাদের স্বাধীনতা সম্ভব নয়"—প্রবুদ্ধ ভারত লিখেছিল।

॥ এগারো ॥

এই পর্বে হিন্দু পুনরুত্থান সতীশচন্দ্রের মূল আগ্রহের বস্তু হওয়ার জন্য পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচারক বিবেকানন্দের দুই গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের কাজের বিশেষ প্রশংসা তিনি করেছেন। (এপ্রিল ও অগস্ট, ১৮৯৭)। আলমবাজার-মঠেই স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ঘটেছিল। তাই তৃপ্তিভরে লিখতে পেরেছেন, "বেদান্তের যোগ্য প্রবক্তা স্বামী সারদানন্দ—বিবেকানন্দের যথার্থ উত্তরাধিকারী।... বস্টনের মেটাফিজিক্যাল ক্লাবে পঠিত স্বামী সারদানন্দের প্রবন্ধটি বেদান্তের অত্যন্ত সাবলীল এবং সমর্থ উপস্থাপনা, তা পাশ্চাত্যের মানুষের বৌদ্ধিক প্রয়োজন মেটাতে পারবে।"

১৮৯৭, এপ্রিল সংখ্যার 'হিন্দু রিভাইভ্যাল' সম্পাদকীয়টিতে আবেগ ও আশার অভিব্যক্তি যথেষ্টই ছিল। সতীশচন্দ্র তাঁর পূর্বতন রক্ষণশীল মনোভাব থেকে কিছুটা সরে এসে এই জাগরণকে বিশ্বব্যাপক আন্দোলন বলে চিহ্নিত করেন।—"ভূমণ্ডলের সর্বত্র বিরাট এক পুনরুত্থানের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। আলোড়িত হয়েছে চিন্তাসাগর, জড়বাদের গহ্বর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে মানুষ—নূতন, মহান এবং একান্তই আধ্যাত্মিক আলোকের ছটা দর্শনের জন্য। বর্তমানে হিন্দু পুনরুত্থান এক অভিনব আন্দোলন, যার কেন্দ্র ভারতবর্ষে এবং যার পরিধির অন্তর্গত সমগ্র পৃথিবীর দেশসমূহ।" ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাতের ফলে ধর্ম পরিষ্কৃত হয়েছে তার নানা অনাবশ্যক অংশ ঝেড়ে ফেলে। সে কারণে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মৌল সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ঐক্যের রূপ প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। এই পুনরুত্থান সম্বন্ধে বলা যায়—"এ হলো ধর্ম-বিজ্ঞানাত্মক উত্থান—উপনিষদের শক্তির দ্বারা চালিত।... আধুনিক হিন্দু পুনরুত্থান আর কখনো শঙ্করাচার্য ও রামানুজাচার্যের সমকালীন ধর্মীয় উত্থানের পথ ধরে অগ্রসর হবেনা।... যতই চেষ্টা করা হোক এই নববিধানকে পরিবর্তিত করা সম্ভব হবেনা।" বিবেকানন্দ এই নবযুগের প্রধান বার্তাবহ। "একথা সত্য, ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাঁর বিষয়ে নানা বিপরীত ভাবাত্মক মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। রক্ষণশীল সমাজ তাঁকে অন্য শ্রেণীর হিন্দুদের মতো সমাদর ক'রে গ্রহণ করেনি, কিন্তু যাঁরা এই নবযুগের ভাবধারাকে রুখতে চান তাঁরা কালধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছেন। আজকের হিন্দুধর্ম হলো নব্য-হিন্দুধর্ম, যার মধ্যে রয়েছে নতুন সভ্যতার সকল বৈশিষ্ট্য, যেগুলি গত যুগের ভাবধারা থেকে লক্ষণীয়ভাবে পৃথক।"

১৮৯৭ অক্টোবর সংখ্যায় সতীশচন্দ্র আবার বিশ্বব্যাপক আধ্যাত্মিক নবজাগরণের প্রসঙ্গ তোলেন, তবে পূর্বের রচনাটির প্রাণোত্তাপ এই রচনায় ছিলনা। পরন্তু তিনি বিষাদের সঙ্গে বলেন, হিন্দুরা যদি পূর্বতন মোক্ষসাধনায় প্রত্যাবর্তন না করে তাহলে তাদের মুক্তি ঘটবে

না। একই মনোভাব একটু ভিন্নভাবে দেখা যায় বিবেকানন্দের 'লেকচারস্ ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া' গ্রন্থের আলোচনায়। (অগস্ট ১৮৯৭)। সেখানে যদিও তিনি বইটির অন্তর্গত দার্শনিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলির "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আধিকারিক অভিব্যক্তির" প্রশংসা করেন, কিন্তু ঐ গ্রন্থে বিবেকানন্দ যেসব সমকালীন প্রদাহী সামাজিক সমস্যার উল্লেখ ক'রে তাদের সমাধানের পথনির্দেশ করেছিলেন—সতীশচন্দ্র সেসব প্রসঙ্গে একেবারেই যাননি। বিবেকানন্দের তীব্র দেশপ্রেম, দলিত অবনমিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর প্রচণ্ড আহ্বান, যার জন্য বিবেকানন্দ 'রিভাইভ্যালিস্ট' না হয়ে নব্যভারতের বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—সে সকল বিষয় সতীশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেনি। তিনি অবশ্য বিবেকানন্দ-সূচিত কার্যাবলী সম্বন্ধে জনচিত্তের অসাড়তা নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন। দুঃখ জানিয়ে তিনি বলেন—লোকজন মিসেস বেশান্তের "অগভীর বাগ্‌বিভূতি" নিয়ে ব্যস্ত—কিন্তু যে-বিবেকানন্দ গভীরে প্রবেশ করতে পারেন, কেননা তিনি "জন্মে হিন্দু, বেদান্তশাস্ত্রের উত্তম পণ্ডিত, প্রাচীন ঋষিদের পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে অগ্রসর হচ্ছেন"—তাঁর সম্বন্ধে বাংলার মানুষ উদাসীন। "বাংলার মানুষ থিয়েটার বা নর্তকীদের জন্য হাজার-হাজার টাকা খরচ করবে, কিন্তু কোনো মহৎকাজে দান করবে না।" এইসব সহানুভূতিহীন মানুষেরা "সাহারা মরুভূমির শুকনো বালুকা ছাড়া কিছু নয়, যার অগ্নিতপ্ত ঝড়ের ঝাপটে প্রতিভার চারাগাছ জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে।" এই কারণের জন্যই সম্ভবত "বিবেকানন্দের কার্যাবলী রুদ্ধ হয়ে গেছে।" (জানুয়ারি ১৮৯৮)। সতীশচন্দ্র বিশ্বের আচার্যরূপে বিবেকানন্দের ভূমিকার গৌরব পূর্বে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি। হিন্দুধর্ম কখনো প্রচারশীল ধর্ম ছিলনা—বিবেকানন্দই তা সম্ভব করেছেন। "স্বামীজীর প্রয়াস ও পরিশ্রম ভিন্ন আমেরিকা কখনই অদ্বৈত বেদান্তের আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করত না"—একথা তিনি লিখেছিলেন এপ্রিল ১৮৯৩ সংখ্যায়। কি বিচিত্র, সেই একই মানুষ "সর্বজনীন ধর্ম" নামক বিবেকানন্দের বিখ্যাত বক্তৃতার বিষয়ে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন। (ডিসেম্বর ১৮৯৮)। স্বামীজী বলেছিলেন: "আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে নিয়ে যেতে চাই, যেখানে বেদ নেই, বাইবেল নেই, কোরান নেই। মানবজাতিকে এই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন যে, প্রচলিত ধর্মসমূহ এক **মূল ধর্মের** *[The Religion]* বিভিন্ন অভিব্যক্তি। মূল ধর্ম পরম অদ্বৈত। প্রত্যেক মানুষই [সেকথা জেনে] নিজ নিজ প্রবণতা অনুযায়ী নিজের পথ গ্রহণ করতে পারে।" সতীশচন্দ্রের মন্তব্য: "সন্দেহ নেই, অতি উত্তম বচন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মানবজাতিকে সেইস্থানে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব যেখানে বেদ, বাইবেল বা কোরান নেই। এর সঙ্গে আমরা যোগ করব—যেখানে সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, তারকা নেই। এইসব মতবাদ বলতে শুনতে বড়ই সুন্দর, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাঁচের গ্লাসের মতোই ক্ষণভঙ্গুর। যেখানে বেদ, বাইবেল বা কোরান নেই, তেমন স্থান এই কলিযুগে বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, যীশু এবং মহম্মদ একত্র হয়েও সৃষ্টি করতে পারবেন না। হায়, কলিযুগের সামান্য সময়ই কেটেছে, তাতেই কলির লক্ষণগুলি একে একে ফুটে উঠছে।"

যে-সংখ্যায় সতীশচন্দ্র-কৃত উপরের বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, সেই একই সংখ্যায় 'জনৈক হিন্দু'-র "হোয়াট ইজ্ আইডিয়াল রিলিজন" রচনা প্রকাশিত হয়, যিনি বিবেকানন্দের ভাবধারা গ্রহণ ক'রে বলেন:

"সকল ধর্মের মধ্যে যা-কিছু মহৎ, সমুচ্চ, মহীয়ান ও বিশুদ্ধ—তাকেই আমরা বেদান্তধর্ম

বলি। কেবল হিন্দুধর্মে আবদ্ধ যে-বেদান্ত তা বাস্তবিক সংকীর্ণ।... বেদান্তকে তার সার্বভৌম শিখর থেকে টেনে নামিয়ে কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ করা যেন হিমালয়কে টেনে নামিয়ে তার পদতলের সমভূমির সমান ক'রে ফেলা। কোনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ নিজ রীতিতে আবদ্ধ থেকে বেদান্তের সঠিক সমাদর করতে পারবে না। আমাদের কালে সমুদার বেদান্তধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞাত প্রবক্তা রামকৃষ্ণ পরমহংস। তাঁর সকল শিষ্য ও অনুগামীর কর্তব্য এই সর্বজনীন ভাবকে সারা বিশ্বে প্রচার করা। সন্দেহ নেই তাঁরা তা করছেন।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সতীশচন্দ্র যাকে 'হিন্দু পুনরুত্থান' বলেছেন, তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা বিমূঢ় ও দ্বিধান্বিত ছিলেন। কখনো তার গুণগান ক'রে তাকে উঁচুতে তুলে ধরেন, আবার কখনো সোজাসুজি তার সমালোচনা করেন। পুনরুত্থানের জোয়ার কিছুটা নেমে আসার পরে সতীশচন্দ্র নিরাশকণ্ঠে তার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ('হিন্দু আইডিয়াল', জানুয়ারি ১৮৯৮)। তাঁর সিদ্ধান্ত—"বিবেকানন্দ ও বেশান্ত প্রাচীন আদর্শকে ফিরিয়ে আনতে পারেন নি, যে-আদর্শ মূলগতভাবে জড়বাদের বিরোধী, যা পার্থিব অস্তিত্বের লূতাতন্তুতে আবদ্ধ থাকা ঘৃণ্য কাজ মনে করে। ইন্দ্রিয়ের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, সুখের তৃপ্তি স্বপ্ন-বই আর কিছু নয়।" এখানে স্পষ্টভাবে বলা ভালো, স্বামীজী কদাপি সতীশচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষিত প্রাচীনকে ফিরিয়ে আনতে চাননি, উল্টোপক্ষে তিনি জনগণের জন্য বস্তুজগতের সমৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। সতীশচন্দ্রের ধারণামতো বিবেকানন্দ ও বেশান্তের প্রচারের মধ্যে "প্রধানাংশে, সর্বাংশে যদি নাও হয়, ধর্মের বাস্তব অনুশীলনের কর্মকাণ্ড অনুপস্থিত ছিল।... কর্মকাণ্ড বিহনে জ্ঞানকাণ্ড নিছক দার্শনিক তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু কি?" বিশুদ্ধানন্দ, ভাস্করানন্দরাই সতীশচন্দ্রের আদর্শ ভারতের ঋষিগণ। ওঁরা দুজনই অল্প সময়ের ব্যবধানে দেহত্যাগ করেন। "ঈশ্বর একে একে আমাদের অধ্যাত্ম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকায় পুরুষদের টেনে নিচ্ছেন।" (জুলাই, ১৮৯৯)। "বারাণসীর শ্রেষ্ঠ এক বেদ-পণ্ডিত স্বামী ভাস্করানন্দ একই সঙ্গে হিন্দু ধর্মাচার্যদের মহান ধারার অন্যতম শেষ আচার্য,.. যাঁর সম্বন্ধে এই গর্ব করা যাবে যে, তিনি আমাদের ধর্মের অভেদ্য দুর্গ-প্রাকার।" বিস্ময়ের কথা, এই রচনায় সতীশচন্দ্র 'হিন্দু পুনরুত্থানের' নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে প্রশংসা ক'রে পূর্বে যা-যা লিখেছিলেন, তার সবকিছু ভুলে গিয়ে কড়া ভাষায় তাঁদের সমালোচনা করেছেন। তিনি লেখেন: "এক নতুন ধারার সন্ন্যাসীর দল উঠছেন, যাঁদের শিক্ষা আধুনিক পরিবেশে ও আধুনিক পদ্ধতিতে। এই সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আমরা সত্যই আতঙ্কিত। বর্ণাশ্রম ধর্ম যে তচ্‌নচ্ হয়ে যাবার পথে।" এই ধারাকে সর্বনাশা বলে চিহ্নিত করার পরে তিনি "ব্রাহ্মণদের আধ্যাত্মিক আধিপত্যনাশ" নিয়ে আর্তনাদ করেছেন। কারা তার জন্য দায়ী সে সম্বন্ধে বলেছেন: "যেসব নতুন সংস্থার উদ্ভব হয়েছে—যেমন দয়ানন্দ সরস্বতীর, বিবেকানন্দের, মাদাম ব্লাভ্যাটস্কির—এদের ভয়ানক বিস্ফোরণের আঘাতে অদূর ভবিষ্যতে প্রাচীন হিন্দুধর্ম গুঁড়িয়ে ভেঙে ধুলো হয়ে যাবে।"

এর পরে স্বদেশী যুগে কালধর্মে সাড়া দিয়ে সতীশচন্দ্র কিছু-বেশি এক দশক সামাজিক

ও শিক্ষাগত কাজে জড়িত ছিলেন। সেইসময়ে ডন সোসাইটি ও 'ডন ম্যাগাজিন'-এর সাহায্যে তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষা দিয়েছেন ও অনুপ্রাণিত করেছেন। কিন্তু দেখেছেন, তাঁর দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্তরা কেউই সনাতন ভারতবর্ষের অধিবাসী হতে ইচ্ছুক নয়—অন্তত ডন সোসাইটির সুপরিচিত সদস্যদের সম্বন্ধে তা সত্য। তিনি অনুভব করেছেন—এ সকলই মায়াবৎ ক্ষণস্থায়ী। তাই নিজের বাঞ্ছিত আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের জন্য কাশীবাসী হয়েছেন। বর্ণাশ্রমধর্মে তিনি বিশ্বাসী, পাশ্চাত্যে গিয়ে ধর্মপ্রচারের জন্য বিবেকানন্দের আহ্বান তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি, যদিও বাহ্যত তিনি এ-ব্যাপারে বিবেকানন্দের প্রয়াসের মূল্য স্বীকার করেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতের যথার্থ জাগরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ধারণার সঙ্গে তাঁর ধারণার মূলগত প্রভেদ ছিল।

বিবেকানন্দ ও সতীশচন্দ্র পৃথক ভূমিতে দাঁড়ালেন। পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সমাজসচেতনতা সত্ত্বেও সতীশচন্দ্র শেষপর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাব ও সাধনাকে আঁকড়ে ধরলেন। অপরপক্ষে বিবেকানন্দের জীবনোদ্দেশ্য ছিল, আধুনিক কালের নিকটে ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের শ্রেষ্ঠ অংশ উপস্থিত করা, এবং পরিবর্তিত পৃথিবী থেকে নতুন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ ক'রে ভারতবাসী এবং বিশ্ববাসীকে নবদিগন্তের অভিমুখীন করা। বিবেকানন্দ মুক্ত পৃথিবীতে নিজে বাঁচতে ও অপরকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন।

[রচনাটি পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত এবং এতাবৎ অপ্রকাশিত। রচনাকাল মার্চ-এপ্রিল ২০০৩]

উল্লেখপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. 'ডিক্সনারি অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি', এস পি সেন সম্পাদিত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৯-৭০।

২ স্বামী নির্লেপানন্দ, 'স্বামীজীর স্মৃতি-সঞ্চয়ন', কলকাতা, সন ১৩৭৪, পৃ. ১৩৪-৩৬।

৩. সরলা দেবীর আত্মজীবনী, 'জীবনের ঝরাপাতা'। 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে, পৃ. ২৩৫, উদ্ধৃত।

৪. হরিদাস মুখোপাধ্যায়, 'বিনয় সরকারের বৈঠকে', কলিকাতা, ১৯৪২, পৃ. ২৫১-৬২।

৫ মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', ২য় খণ্ড,' ২য় সংস্করণ, সন ১৩৬৬ (১ম সং সন ১৩৩২), পৃ. ৪৪-৪৬।

৬. স্বামী সারদানন্দ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ: ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', ৫ম খণ্ড, সন ১৩৪২ সংস্করণ, উদ্বোধন, কলিকাতা, পৃ. ১৬-২০।

৭. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী', (১৯৬৩ সংস্করণ), পৃ. ৮৯।

৮. হরিদাস মুখোপাধ্যায়, *Satis Chandra Mukerjee and Dawn Magazine* (1897-1913).

৯. এস পি সেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৬৯-৭০।

১০. স্বামী বিবেকানন্দ, 'বাণী ও রচনা', ৭ম, পৃ. ৩৫৩।

১১. মূল ইংরেজী উদ্ধৃতি দেওয়া আছে বর্তমান লেখকের 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, পৃ. ১৪২।

১২. *Letters of Sister Nivedita*, Vol. II, p. 1033, Edited by Sankari Prasad Basu, Nababharat Publishers, Calcutta (1982).

১৩. সতীশচন্দ্র ও রেভাঃ ম্যাকডোনাল্ডের বাদ-প্রতিবাদমূলক রচনার তালিকা দেওয়া আছে বর্তমান লেখক সম্পাদিত *Vivekananda in Contemporary Indian News*, Vol. I, গ্রন্থে, পৃ. ১২৭। গ্রন্থটি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৯৭)।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ শতকের শেষে স্বামী বিবেকানন্দ সহসা যেন কোনো এক অদৃশ্য স্থান থেকে আবির্ভূত হয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে পতিত ভারতবর্ষকে টেনে তুলে আধুনিক বিশ্ব-মানচিত্রে স্থাপন করেছিলেন। সেই কাজ করবার সময়ে তাঁকে অনেক কিছুকে দারুণ আঘাত করতে হয়েছিল—তার মধ্যে ব্রহ্মণ্যগোঁড়ামি এবং ধর্মীয় আচারসর্বস্বতাও আছে। অচিরকালে দেখা গেল, ভারতীয় জাতি স্বামীজীর নামে যখন উন্মাদনা বোধ করছে, ঠিক তখন রক্ষণশীলরা প্রতিঘাত করছে তাঁকে। বাংলাদেশে এই হিন্দু-রক্ষণশীলতার পক্ষে, বিবেকানন্দ-বিরোধী আন্দোলনে, মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল বহুল-প্রচারিত বঙ্গবাসী কাগজ। বঙ্গবাসী কাগজের ঐকালের সংখ্যা পাওয়া যায়না। অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় বঙ্গবাসীর উদ্ধৃতি থেকে আমরা ঐ বিরোধী প্রচারের কিছু রূপ অনুমান করতে পারি।

১৮৯৭ সালে স্বামীজী যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন বঙ্গবাসীর সম্পাদক ছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচকড়ি বাংলাদেশে একযুগে বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি ঐকালে এবং পরবর্তী কালে স্বামীজী সম্পর্কে অনেকবার লিখেছেন। তার অল্প অংশই উদ্ধার করতে পেরেছি। সেইসকল রচনা থেকে দেখতে পাই, রক্ষণশীলতার পক্ষে যাঁরা কলম ধরেছিলেন, তাঁরা সকলেই পুরো রক্ষণশীল ছিলেন না, এবং অনেক সময়ে তাঁদের লেখার পিছনে ব্যক্তিগত বিশ্বাস অপেক্ষা অন্নদাসত্ব বা গোষ্ঠী-দাসত্বের প্রভাব বেশি সক্রিয় ছিল।

পাঁচকড়ি সম্বন্ধে আমি দেশ পত্রিকায় ২৫ জুন, ১৯৬৬, এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলুম। পাঁচকড়ির শক্তিসামর্থ্য, পাণ্ডিত্য, তাৎক্ষণিক অনুভূতির প্রবলতা, অস্থিরতা, আত্মখণ্ডন, সুগভীর বিষাদ—যথাসম্ভব ঐ লেখায় প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিলুম। তার থেকে অল্পকিছু ভূমিকারূপে এখানে সংকলন করছি।

পাঁচকড়ির জন্ম ভাগলপুরে, ২০ ডিসেম্বর, ১৮৬৬; মৃত্যু—১৫ নভেম্বর, ১৯২৩। তিনি মেধাবী ছাত্র; সংস্কৃতে অনার্সসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেন; কাশীতে সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'সাহিত্যাচার্য' উপাধি পান; ধর্মশাস্ত্রেরও বিশেষ চর্চা করেন; এক্ষেত্রে সহায়ক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি; ভাগলপুরে প্রথম বয়স কেটেছিল বলে হিন্দী, উর্দু, ফার্সী জানতেন; ইংরেজী সাহিত্যেরও বিশেষ অনুশীলন করেন; সব জড়িয়ে অর্জনের পরিমাণ এমনই বিপুল ছিল যে, স্টেটস্‌ম্যান লিখেছিল: "Panchcowri was probably the most well informed and well read of Bengali journalists." (17. 11. 23).

সাংবাদিক হিসাবে পাঁচকড়ি অতুলনীয়—তাঁর মতো সংখ্যায় নানা ধরনের সংবাদপত্রে

আর কেউ কাজ করেন নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত পাঁচকড়ির সংক্ষিপ্ত জীবনীতে যা পাই তার সঙ্গে নূতন সংবাদ যোগ ক'রে এই দাঁড়িয়েছে:

'বঙ্গবাসী' কাগজে ১৮৯২ (?) সালে কাজ শুরু করেন, ১৮৯৫ থেকে ঐ কাগজের প্রধান সম্পাদক; ১৮৯৯ ফেব্রুয়ারি থেকে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'-র সম্পাদক; ১৯০১ থেকে 'রঙ্গালয়'-এর সম্পাদক; ১৯০৮-এ 'দৈনিক হিতবাদী'র সম্পাদক। 'বাঙ্গালী' পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন। 'স্বরাজ' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন; ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা'-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বঙ্গবাসী-গোষ্ঠীর ইংরেজী দৈনিক 'টেলিগ্রাফ'-এর সম্পাদনা করেছেন; সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সান্ধ্য সম্পাদকীয় বিভাগেও যুক্ত ছিলেন। 'ভারত মিত্র' নামক হিন্দী পত্রিকার সম্পাদক। 'কলিকাতা সমাচার' নামক হিন্দী পত্রিকা এবং 'দৈনিক পত্রিকা' নামক বাংলা পত্রিকারও সঙ্গেও যোগ ছিল। 'বেদব্যাস', 'ধর্মপ্রচারক', 'জন্মভূমি', 'অনুসন্ধান', 'বঙ্গবাণী' 'ধ্রুব', 'সাহিত্য', 'নারায়ণী', 'বিজয়া' ইত্যাদি পত্রিকার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 'প্রবাহিণী' নামক সচিত্র সাপ্তাহিকের সম্পাদনা করেছেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যুর পরে 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদনাও। আর বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত এমন কে আছেন যিনি 'নায়ক' পত্রিকার নাম জানেন না, যার দীর্ঘদিনের সম্পাদক এই পাঁচকড়ি।

এই বিস্ময়কর হিসাবও অসম্পূর্ণ বলেই আমাদের ধারণা। তাহলেও বোঝা যায়, সাংবাদিক হিসাবে কেন তাঁকে আমরা শীর্ষে স্থাপন করতে চাই। কিন্তু অতগুলি পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগ কেন? কারণ—পাঁচকড়ি বাঙলার সেরা 'পেশাদার' সাংবাদিক। কাগজে-কাগজে তিনি ঘুরেছেন পেটের দায়ে। সকালে এক কাগজে যা লিখেছেন, সন্ধ্যায় অন্য এক কাগজে তার উল্টো কথা—ঐ পেটের দায়ে। বিরাট পণ্ডিত তিনি, কিন্তু কর্মজীবনের বড় অংশে তাঁকে রঙ্গ-রসিকতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক'রে লোকরঞ্জন করতে হয়েছে। নগদ মূল্যে পাঁচকড়ি লেখা বেচেছেন আর কেঁদেছেন গভীরে—গভীরস্বভাব ঐ মানুষটি: " 'বিকায় যে—!' কথাটা রঙ্গের নহে, বড়ই ক্ষোভের ও লজ্জার। ব্রাহ্মণ আমি, আমাকে বিক্রয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাগজে কলমে এক করিতে হয়। ...ভাঁড়ামি বিকায় বলিয়া সকলে আমাকে রাখে। আমাকে দেখিয়া, আমার আমিত্বের পরিচয় লইয়া, কেহ আমার প্রতিপালন করিল না। কাজেই বলিতে হয়, আমার ক্ষুধার অন্ন আমায় নিজে অর্জন করিয়া লইতে হইতেছে।... কাঁদিলে কেহ শুনে না, বুঝে না, তাই হাসিতে হয়। হায় বিধি! হাসিও যে কত ব্যথার হাসি, তাহাও ইহারা বুঝিল না।" [প্রবাহিণী, ২৭ পৌষ, ১৩২১]।

হাসি-তামাশার লেখাতেই যে, পাঁচকড়ির একমাত্র পরিচয় আবদ্ধ ছিলনা, সে-বিষয়ে অন্য কেউ নয়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৫ শক, অগ্রহায়ণ) লিখেছিল: "তিনি যে কেবল তীব্র শ্লেষ ও রসিকতার সঙ্গে হালকা লেখাই লিখিতেন, তাহা নহে—আবশ্যক হইলে তাঁহার লেখনীমুখ হইতে গুরুগম্ভীর রচনাও অবলীলাক্রমে বাহির হইত। তিনি বাংলার সমাজ ও ধর্মের একটা প্রচ্ছন্ন ইতিহাসের ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন।" পাঁচকড়ির মৃত্যুতে ভারতী পত্রিকা লিখেছিল (১৩৩০ অগ্রহায়ণ): "তাঁর মতো চিন্তাশীল পণ্ডিত সাহিত্যসেবীকে হারাইয়া বাংলা সাহিত্য আজ প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এ দেশের পুরাণ-শাস্ত্র ও প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও তাঁর আলোচনার প্রকাশভঙ্গি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।"

প্রধানত সাময়িকপত্রেই পাঁচকড়ির লেখা বেরিয়েছে, যাদের অধিকাংশই এখন পাওয়া যায় না, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনার পরিমাণ কম—তাই পাঁচকড়ি কতখানি পণ্ডিত ছিলেন, তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখার কিছু সংকলন ক'রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে দুই খণ্ডে পাঁচকড়ি রচনাবলী বেরিয়েছে। তার মধ্যে প্রচুর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ আছে, যদিও সাময়িক পত্রের প্রয়োজনে লেখা বলে, এবং পাঠকের মনের মধ্যে সরাসরি প্রবেশ করতে তিনি উৎসুক ছিলেন বলে, সেগুলিতে অতিরিক্ত সরলতা, ক্ষেত্রবিশেষে তরলতা আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি দ্রুত লিখেছেন, ফলে রচনাশৈলীতে সময়সঞ্চিত ধীরতা ছিলনা। তবু বোঝা যায়, কতদিকে প্রসারিত ছিল তাঁর মন। এদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব সম্বন্ধে লেখাগুলিতে দেশ ও জাতির জীবনতরঙ্গের ওঠাপড়াকে প্রত্যক্ষ করা যায়; ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ', 'স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম' ইত্যাদি গ্রন্থে ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে আরও উন্নত কল্পনায় ও শ্রেষ্ঠতর রচনাশৈলীতে যে-কাজ করেছেন, পাঁচকড়ি সহজতরভাবে, অধিকতর শাস্ত্রনিষ্ঠ হয়ে, সেই কাজই করেছেন বাঙলায়। সমাজতত্ত্বে ছিল পাঁচকড়ির সহজ অধিকার, তৎসহ দেশপ্রীতি এবং ধর্মবিজ্ঞানে অনুপ্রবেশ। পুরাতন তত্ত্ব ও শাস্ত্রের নূতন অর্থ আবিষ্কারে তাঁর দক্ষতার সার্থক পরিচয়—তন্ত্রসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী।

বাঙলার আধুনিক সমাজজীবন সম্বন্ধেও পাঁচকড়ির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার শেষ ছিলনা। অজস্র সংবাদপত্রের সঙ্গে সংযোগের জন্য অজস্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, নানা স্বার্থে জড়ানো সেই জীবকুল পাঁচকড়িকে মনুষ্য-হাটের ঝানু ব্যাপারী ক'রে তুলেছিল। বাঙলাদেশের বিখ্যাত অনেক মানুষকে পাঁচকড়ি সাক্ষাতে জেনেছিলেন—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, ভূদেব, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, ইন্দ্রনাথ, আশুতোষ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ—কে নন? তালিকা স্বচ্ছন্দে বাড়িয়ে যাওয়া যায়। এক কথায় তিনি উনিশ শতকের শেষ দুই দশক এবং বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ বাঙালীকে (অর্থাৎ বাংলার মনীষার স্বর্ণযুগের সেরা বাঙালীদের) নিকটে দেখেছিলেন। এইজন্য কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি সম্বন্ধে লিখবার সময়ে তাঁকে বিচলিত বিগলিত হতে হতো না। বিচারশীল মন নিয়েই পাঁচকড়ি মনীষী-বিচার করতেন। এমন মানুষ যদি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লেখেন, অকারণ বিহ্বলতা তাঁর কাছ থেকে আশা না করাই উচিত।

১৮৯৫-৯৭ সময়ে বঙ্গবাসী পত্রিকায় পাঁচকড়ির বিবেকানন্দ-সমালোচনাত্মক লেখাগুলি বিচার করবার সময়ে উপরের কথাগুলি আমরা যেন স্মরণে রাখি। স্মরণ করিয়ে দেব আরও কয়েকটি কথা। বঙ্গবাসী পত্রিকায় পাঁচকড়ির প্রথম সাংবাদিক-জীবন বলে তখন তিনি নানা হাটে ঘুরছেন না, সেজন্য প্রথম বয়সের কিছু মতনিষ্ঠা ঐ সাংবাদিকজীবনে ছিল, আর সে মত রক্ষণশীল; পাঁচকড়ি বাঙলার রক্ষণশীল আন্দোলনের দুই প্রধান নেতা—কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এবং শশধর তর্কচূড়ামণির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। কৃষ্ণপ্রসন্নের সঙ্গেই তিনি রামকৃষ্ণ-দর্শনে একবার গিয়েছিলেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যগুরু, যিনি ব্রহ্মণ্যগোঁড়ামির আর এক শক্ত খুঁটি। ইন্দ্রনাথই তাঁকে বঙ্গবাসীতে প্রবেশ করিয়ে দেন।

১৮৯৭ সালে স্বামীজীর প্রত্যাবর্তনকালে বঙ্গবাসী যে-সম্পাদকীয় রচনাটি লেখে, তা

সমকালে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। সেই জন্য 'লাইট অব দি ইস্ট' পত্রিকা ১৮৯৭, ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সেটি অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করে। তার আগে নিম্নের মন্তব্য করে:

"That a prophet is not honoured in his own country is a saying whose truth is verified by long experience. The Bangabasi, the leading vernacular paper of Bengal, having at least lac of readers, in a leader on Swami Vivekananda says—"

বঙ্গবাসীর বাঙলা সম্পাদকীয়ের ইংরেজী অনুবাদের পুনশ্চ বঙ্গানুবাদ করছি আমরা। এটি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়েরই লেখা।—

"বিবেকানন্দ কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ইন্ডিয়ান মিরার তাঁর বিষয়ে লম্বা-লম্বা প্রবন্ধ লিখছে। অমৃতবাজার ও হিন্দু পেট্রিয়ট তাঁকে উচ্চরবে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। কিছুসংখ্যক দেশীয় পত্রিকা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। কুমার বিনয়কৃষ্ণ তাঁকে ফুলমালা ও গন্ধদ্রব্য দিয়ে পূজা করতে প্রস্তুত, এবং পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সম্ভবত এই বীরপূজার মহাপুরোহিত হবেন। জনসাধারণ এইসব সৎসঙ্গে আমোদিত হোক, প্রশস্তি করুক, বিবেকানন্দের গুণগানে ভাবাবেগে নৃত্য করুক; তারা তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে বুকে ধরে রাখুক; রাজরাজেশ্বরের যোগ্য অর্ঘ্যে তাঁকে ভূষিত করুক; সেসব অভিব্যক্তিতে আমাদের আপত্তি নেই। অপরপক্ষে আমরা বিবেকানন্দের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন। যে-ব্যক্তি হিন্দুধর্মের সত্য আমেরিকার জনগণের কাছে ঘোষণা করেছেন, তাঁকে অনুরাগিগণ সম্মান করুক, সেটা তাদের কর্তব্য। সে-কাজ না করলেই আমরা বরং দুঃখিত হব। ওসব বিষয়ে আমাদের সায় আছে। আমাদের আপত্তি অন্য ক্ষেত্রে। যখন দাবি করা হয়—বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা, তিনি সন্ন্যাসী, দণ্ডী, স্বামী, যোগী, পরমহংস—তখনই আমরা কঠোর প্রতিবাদ করতে বাধ্য হই। বিবেকানন্দকে যদি আমাদের কাছে বাবু নরেন্দ্রনাথ-রূপে উপস্থিত করা হয়, যা তাঁর পুরাতন পরিচিত নাম—তাহলে আমরা তাঁকে সর্বপ্রকার বিহিত সম্মানসহকারে সানন্দে অভ্যর্থনা জানাব। বিবেকানন্দ অদ্ভুত প্রতিভার বিকাশ করেছেন। তাঁকে সম্মান জানাতে আমাদের কুণ্ঠা হওয়া উচিত নয়। ভারতে বাশিয়ার যুবরাজ, মিঃ ব্রাড্‌লো, ডিউক অব কনট উপস্থিত হলে আমরা আনন্দপ্রকাশ করেছি। তাহলে বিবেকানন্দের বেলায় চুপ ক'রে থাকব কেন? তিনি পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম-বিজয়ের অন্তে শিরোপা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

"বস্তুতঃপক্ষে আমরা বিবেকানন্দকে দীর্ঘদিন ধরে ভালবাসি। যখন তিনি বিবেকানন্দ নাম ধরেন নি, তারও আগে থেকে তাঁর বিষয়ে আমাদের একপ্রকার শ্রদ্ধা। বি-এ পাস করার পরে তিনি যখন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, তখনো তাঁকে ভালবাসতাম। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে যখন তিনি শিক্ষক হিসাবে প্রবেশ করেছিলেন, এবং নানাবিধ তর্কযুক্তির দ্বারা হিন্দুধর্মের অসারত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করতেন, তখনো তাঁকে ভালবাসতাম, যদিও তাঁর মতামত আমাদের বিশেষ আঘাত করত। তারপর যখন তিনি হিন্দুশাস্ত্র নিষিদ্ধ খাদ্যাদি গ্রহণ করতেন, এবং অপরকে সেই কাজে প্রণোদিত করতেন, তখনো তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা যায়নি। তারপর তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য হয়েছিলেন।

"আমরা তাঁকে ভালবাসতাম কারণ, প্রখর ছিল তাঁর চিৎশক্তি, প্রবল তাঁর জীবনীশক্তি এবং নৈতিক সাহস; কারণ, সূক্ষ্ম দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনাকালে গোলমেলে জট খুলে গোটা ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য তাঁর ছিল; কারণ, পৃথিবীর বহুবিধ ধর্মবিষয়ে তাঁর সর্বাত্মক জ্ঞান ছিল; কারণ, তাঁর ছিল সম্মোহনকারী আকার আর সর্বজয়ী কণ্ঠস্বর। তাঁকে তখন যদি আমরা ভালবেসে থাকি তাহলে এখন—যাঁর হিন্দুধর্ম-ব্যাখ্যা ইংল্যান্ড আমেরিকার নরনারীর চিত্তজয় করেছে, এবং বিদেশভূমি থেকে নীতিধর্মের বিজয়ী বীর-রূপে যিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন—তাঁকে না ভালবাসা কি সম্ভব? সিজারকে তাঁর প্রাপ্য না দিয়ে পারি কখনো? আমাদের বীরের মস্তকে আশীর্বাদ বর্ষণ করব না? তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি জানাবো না? তাকি হয়? তাই, স্বাগত! স্বাগত নরেন্দ্রনাথ! মাতৃভূমির অঙ্ক আলোকিত ক'রে উপবেশন করো! হৃদয়ের ভরা পাত্রে উচ্ছলিত আনন্দ নিয়ে তোমার অনুরাগিগণ সুবর্ণমুকুট এবং হীরকখচিত সিংহাসন প্রস্তুত ক'রে রেখেছে—তাকে স্বীকার করো।"

এই লেখাটির মধ্যে বিশেষ খোঁচাটি কোথায় ছিল তা একালের পাঠক সম্পূর্ণ বুঝতে পারবেন না। বঙ্গবাসীর পক্ষে বিবেকানন্দের প্রতিভাস্বীকারে অসুবিধা ছিলনা—অসুবিধা তাঁকে পরমহংস সন্ন্যাসী বলে স্বীকার করায়। তা যদি করা হয়, তাহলে রক্ষণশীল সমাজকে বিবেকানন্দ-নির্দেশিত পথ গ্রহণ করতে হয়, যা করা অসম্ভব। প্রথমত বিবেকানন্দ কায়স্থ, রঘুনন্দনী-মতে তিনি শূদ্র, সুতরাং সন্ন্যাসে তাঁর অধিকার নেই। দ্বিতীয়ত তিনি কালাপানি পারে যাওয়ার মতো মহাপাতক-কর্ম করেছেন, তার দ্বারা সমুদ্রগর্ভে নিজেকে ডুবিয়েছেন, তথাপি প্রায়শ্চিত্ত-রজ্জুতে নিজেকে বেঁধে টেনে তুলতে গররাজি। তারপরে, যেখানে ম্লেচ্ছের ছায়াস্পর্শ পর্যন্ত নিষিদ্ধ, সেখানে তিনি ম্লেচ্ছদের সঙ্গে একত্র আহার করেছেন—মাংসাহার পর্যন্ত! এত সব পাপ করার পরে তাঁকে হিন্দুধর্মের আচার্য মানলে হিন্দুধর্ম রসাতলে যাবে—যাবেই!—এসব কথা সুগম্ভীরভাবে সমকালীন রক্ষণশীল পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছিল, আর বঙ্গবাসী ছিল তাদেরই প্রধান নেতা।

কিন্তু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিক থেকে দেখলে—যিনি বিদ্যাভিমানী, সংশয়ী, রক্ষণশীলতার দুর্গরক্ষী—উপরে উদ্ধৃত তাঁর বিবেকানন্দ বিষয়ক লেখাটিতে সমুচ্চ প্রশংসাই আছে বলতে হবে। পাঁচকড়ি যখন বিবেকানন্দকে হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা বলতে গররাজি, তখন ধরে নিতে পারি, তার মধ্যে সংবাদপত্র-মালিকের মতের প্রতিধ্বনি ছিল। কিন্তু কথাগুলি পাঁচকড়ির ব্যক্তিগত কথা হতেও বাধা নেই, কারণ তিনি পূর্বে কেবল নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামক ক্ষুরধার দার্শনিক প্রতিভাসম্পন্ন এক যুবককে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তারপরে সেই যুবক কতখানি পরিবর্তিত হয়েছেন রামকৃষ্ণ-আশ্রয়ে, কী পরিমাণে আত্মবিকশিত হয়েছেন পরিব্রাজক-জীবনে, কোন্ অভাবিতের উন্মোচন ঘটেছে তাঁর মধ্যে বহির্ভারতে—তা জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা, এবং প্রত্যক্ষ না জেনে তাকে মানাও সম্ভব ছিলনা এই বুদ্ধিদর্পিত মানুষটির পক্ষে।

স্বামীজী কলকাতায় ফিরবার পরে পাঁচকড়ি তাঁকে সাক্ষাতে আবার দেখলেন, জানলেন। এবং মুগ্ধ হলেন। ফলে তাঁর পক্ষে এক্ষেত্রে আর বঙ্গবাসীর দাসত্ব করা সম্ভব হলো না।

অন্য দিক দিয়েও পাঁচকড়ি গুটি কেটে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। অবশ্যই তাঁর

শ্রীমা সারদাদেবীর এই ছবিটি তোলা হয় ১৮৯৮, নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে, মিসেস ওলি বুল ও সিস্টার নিবেদিতার তত্ত্বাবধানে। এই ছবি বিশ্বের নানা স্থানে পূজিত। একই সঙ্গে তোলা তিনটি ছবির এটি দ্বিতীয়। এর আগে সারদাদেবীর কোনো ছবি তোলা হয়নি।

শ্রীমা সারদার ঐতিহাসিক পত্র, যাতে তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের দার্শনিক ও ধর্মীয় ভিত্তি নির্দেশ করেছেন।

গোপাল-সাধনায় সিদ্ধ তাপসী গোপালের মা, শ্রীরামকৃষ্ণকে যিনি গোপাল মনে করতেন। আচার-বিচারে কঠোর বিশ্বাসী এই বিধবা ব্রাহ্মণী শেষ অসুখের সময়ে তাঁর স্নেহকন্যা নিবেদিতার আবাসে ঠাঁই নিয়েছিলেন। গোপালের মার পাদমূলে নিবেদিতা।

THE EMPRESS

বাগবাজারে বিদ্যালয়-ভবনেব ছাতে নিবেদিতা।

বিদ্যালয়-ছাতে ছাত্রীদের সঙ্গে নিবেদিতা।

প্রথম পর্যায়ের ছাত্রীদের নিয়ে, স্কুলের সামনে নিবেদিতা।

there specially to meet him. The country was flooded by the recent rain, and as several poor-houses were under water, His Excellency urged the officials to provide the children with good light nourishment. The Nadiad Poor House and the American Mission Orphanage were visited, and in the afternoon Dhulia was inspected. On the following morning Lord Curzon and Lord Northcote visited the Chandola Irrigation Tank extension, accompanied by Mr. White, the Executive Engineer of the Northern Division, who explained the details of the scheme, which includes an extension of sixty acres, thirty of the latter being finished in March, and the additional thirty being opened in June as a monsoon work. When the work is completed the storage capacity will be increased to 88 million cubic feet, and the irrigating area increased from three to six thousand acres at a cost of one and a half lakhs of rupees including the removal of silt from the existing tank. The new work will bring in an additional revenue annually of Rs. 45,000, consequently the work is remunerative. The workers are divided into four classes, according to physical condition, and are paid in proportion, the rates of wages being ruled in accordance with the price of grain. The people live in hut camps which the Viceroy inspected, as also the works, into the most minute details of which he made enquiries.

While making a brief stay at Mehmadabad, which lies between Nadiad and Ahmedabad, His Excellency found it necessary to administer a severe rebuke to the local municipality. The Viceroy first stopped to inspect the poor-house. The people were well housed, but outside the house there were a number of hungry wanderers, and Lord Curzon enquired what arrangements had been made for them. No kitchen had been established although the Collector three weeks before, had ordered this to be done by the Municipality. In consequence, the members of that body were ordered to appear before His Excellency, who pointed out to them that they had deliberately neglected a duty which was of sufficient importance to have been taken in hand directly ordered. He trusted they would do their duty faithfully in future, in the interests of humanity, and requested that their future conduct of affairs should be reported to him. Before leaving Ahmedabad the Viceroy was driven to see the poor-house at Dholiakote, where there are 8,000 inmates, who at the time of the arrival were just receiving their meal, and the sight of so many sufferers from last year's drought was most affecting. They all seemed contented, and as happy as people in their circumstances could be. His Excellency was greeted by a large crowd with cheers, which followed him as he went away. At Jamalpore, near the Chandola Works, the Gaekwar has a palace, which is being temporarily used as a hospital for the Chandola Camp. When the Viceroy visited it the sick inmates numbered 230, chiefly dysentery and fever cases. This brought the Guzerat tour to a close, and the Viceroy returned to Simla *via* Agra. At Agra His Excellency made a halt of some hours, and visited the Taj, escorted by a detachment of the 90th Battery Royal Horse Artillery. He reached Simla on the evening of the 8th August. During the tour there were no speeches, and no public receptions of any kind and the Viceroy's arrival and departure at each station were private. A remarkable phenomenon was noticed in connexion with the visit to Dohad. Just after the Viceroy had passed over the Mahi River in the Panch Mahals, after leaving Dohad, the river was in flood, and the railway line was six feet under water. The water subsided before his return, but no sooner had Lord Curzon recrossed the Mahi, than the river again rose and all traffic on the Ujjain-Dohad section of the line had to be suspended.

[From a Photograph supplied by F. B. Stewart, Poona.]

By the 12th August the rainfall everywhere in Guzerat had been sufficiently copious to allay all fears for the present in the Panch Mahals. As a matter of course there will be practically no rice crop, as the monsoon commenced too late. The people will have to depend mainly on *bajri*, *jowari*, maize and other grains. Mr. Lely, Commissioner of the Northern Division, inaugurated a system of village kitchens everywhere, and what with liberal *tacavi* advances that have been made, and are being granted to cultivators for the purchase of bullocks, seeds, &c., the ryot has really absolutely nothing to complain of, and may look to the future with perfect equanimity. As the rain has been filling all the tanks, the relief workers were drafted on to the roads. But it is evident that the distress is not thought to be yet over, for fresh officers have recently been imported into the Panch Mahals for duty. The numbers on gratuitous relief in the middle of August were still abnormally large. There is very little, if any, *rabi* in the Panch Mahals, so that if the former crop fails, another famine there will have to be faced. A grass famine, however, it is thought has, under any circumstances, been averted.

The gradual falling off in the numbers under famine relief that has marked the last few weeks is another gratifying feature of the situation. The number is still very large, but the decrease since the

ব্রিটিশ শাসনে দুর্ভিক্ষে শ্মশান ভারত।

ব্রিটিশ শাসনে দুর্ভিক্ষে শ্মশান ভারত।

কলকাতায় প্লেগের সময়ে নিবেদিতা ও স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে সংগঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকর্মীদের সঙ্গে বস্তি পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মীরা।

শার্লট এলিজাবেথ সেভিয়ার, ক্যাপ্টেন জন হেনরি সেভিয়ারের সহধর্মিণী। স্বামীজীর ইচ্ছায় এঁরা দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করেন। ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের মৃত্যুর পরেও বহু বৎসর মিসেস সেভিয়ার মায়াবতীতে থাকেন। সন্ন্যাসী থেকে দরিদ্র পর্বতবাসী—সকলের কাছে ইনি 'মাদার'।

রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী অখণ্ডানন্দ। স্বামীজীর এই দুঃসাহসী গুরুভাই কেবল ভারতবর্ষের নানা স্থানে নয়, সেকালে অতি দুর্গম তিব্বত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে ইনি মুর্শিদাবাদের মহুলায় দুর্ভিক্ষসেবার কাজ শুরু করেন। সেবাধর্মের সিদ্ধসাধক তিনি।

কলকাতায় গোপাললাল শীলের উদ্যানবাড়িতে, মার্চ ১৮৯৭; দাঁড়িয়ে, বামদিক থেকে, শান্তিরাম ঘোষ, মিঃ টার্নবুল, প্রকাশানন্দ, অজ্ঞাত, বিবেকানন্দ, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার, শিবানন্দ, অজ্ঞাত। বসে, বামদিক থেকে, আলাসিঙ্গা পেরুমল, রামকৃষ্ণানন্দ, প্রেমানন্দ, মিসেস সেভিয়ার, অদ্ভুতানন্দ, তুরীয়ানন্দ, জি জি নরসিংহাচার্য। মাটিতে, বামদিক থেকে, অজ্ঞাত, মিঃ হ্যারিসন (কলম্বো)।

রাজস্থানের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য খেতড়ির রাজা অজিত সিং। স্বামীজীর প্রভাবে ইনি প্রগতিশীল হয়ে ওঠেন। স্বামীজীর কাজে এঁর বিশেষ সাহায্য আছে। এঁকে লেখা স্বামীজীর একটি পত্র এক প্রবন্ধে আলোচিত।

মহীশূরের মহারাজা শ্রীচামরাজা ওয়াড়িয়র। দক্ষিণ ভারতের প্রধান দেশীয় রাজ্যের এই অধিপতি স্বামীজীর বিশেষ গুণগ্রাহী। এঁকে লেখা স্বামীজীর একটি চিঠি এক প্রবন্ধে বিশেষ আলোচিত।

জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাই, রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জন্য ভারতের গ্ল্যাডস্টোন নামে খ্যাত। এঁকে স্বামীজী অনেক মূল্যবান চিঠি লিখেছেন, তার একটির বিশেষ আলোচনা গ্রন্থের এক প্রবন্ধে।

রেভাঃ উইলিয়ম হেস্টি, স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যক্ষ। ভাবাবিদ্ সুপণ্ডিত এই মানুষটি তৎকালে পৃথিবীতে খ্রীস্টতত্ত্বের এক প্রধান বিশেষজ্ঞ। তিনি অত্যন্ত গোঁড়া পাদরি, আবার তিনিই তাঁর প্রিয় ছাত্র নরেন্দ্রনাথকে সমাধির অবস্থা দেখার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতে প্রণোদিত করেন। একটি প্রবন্ধে আলোচিত।

ব্রহ্মণ্যগৌরববোধ ছিল, তার প্রাপ্য মর্যাদা তিনি বুঝে নিতে চাইতেন; কিন্তু একই সঙ্গে আবার মাত্রাতিরিক্ত আচারী ব্রাহ্মণও ছিলেন না। বঙ্গবাসীর গোঁড়ামির কলম-সৈনিক হয়ে থাকা তাই শক্ত হয়ে উঠছিল। পাঁচকড়ির দেহত্যাগের পরে অমৃতবাজার ২৭ নভেম্বর, ১৯২৩ তারিখে এ-সম্বন্ধে লিখেছিল: "কলকাতায় এসে বঙ্গবাসী কাগজে প্রথম যোগদান করলেও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার যোগ্য প্রকাশক্ষেত্র ঐ পত্রিকা ছিলনা। বঙ্গবাসী ক্রমে যে-রকম দারুণ গোঁড়া হয়ে উঠেছিল—পাঁচকড়ি ঠিক সেই রকম আপসহীন গোঁড়া ছিলেন না। 'সন্ধ্যা'র জন্ম ও নূতন জাতীয়তার উদয়ের সময় থেকে তাঁর অপূর্ব লেখনীর মুক্তি ঘটল—'সন্ধ্যা'র মধ্যে তাঁর চিত্তপ্রোথিত রক্ষণশীলতার সঙ্গে যুগ-প্রয়োজনের সমন্বয় ঘটল।"

এই নূতন জাতীয়তা বহুলাংশে বিবেকানন্দের সৃষ্টি এবং যেসব শক্তি পাঁচকড়িকে রক্ষণশীলতার গণ্ডী কাটিয়ে উদারতর মানবপ্রেমের দিকে আকর্ষণ করেছিল, তার মধ্যে প্রধান একটি—বিবেকানন্দ।

স্বামীজীর দেহত্যাগ-কালে পাঁচকড়ি বঙ্গবাসীর দাসত্ব করছিলেন না—তখন তিনি 'রঙ্গালয়' পত্রিকার সম্পাদক। এই নূতন 'দাসত্বে' বিবেকানন্দ-নিন্দা করার বাধ্যবাধকতা ছিলনা। সুতরাং বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মনের কথা খুলে লিখতে পারলেন:

> "বিবেকানন্দের তিরোভাবে বাঙালী যে-নিধি হারাইল তেমন 'সাত রাজার ধন একটি মাণিক' আর বাঙালী সহসা পাইবে না। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, রূপে-গুণে, বাক্‌শক্তিতে, তেজস্বিতায়, স্বাবলম্বনে, সাহসিকতায়, বিবেকানন্দের মতো আর কে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী আছে? আর তেমন হইতে কি পারিবে? মনে পড়ে সে সুঠাম, সুপুষ্ট, সুকান্ত দেহযষ্টি, মনে পড়ে সে কোকিলঝঙ্কারতুল্য কোমল মধুর সুকণ্ঠের সুসঙ্গীত, মনে পড়ে সে স্পর্ধা, সে মর্যাদাবুদ্ধি, সে জ্ঞানগৌরবের তেজ—আর মনে পড়ে সেই লোকমোহন সামর্থ্য, অপূর্ব সরলতা ও সাধনপ্রিয়তা। একে-একে ধীরে-ধীরে দিনে-দিনে কত কথা মনে পড়িতেছে, কত কথা আরও মনে পড়িবে। বসন্তরোগের বিস্ফোটকের ন্যায়, একে-একে সকল ঘটনা স্মৃতিপথে ফুটিয়া মনকে জর্জরীভূত করিবে। সাধারণ জীবের ভাগ্যে যাহা আছে, আমাদের তাহাই সহিতে হইবে। যে মহাপুরুষ—সে তো নিমেষের মধ্যে চলিয়া গেল।" ['রঙ্গালয়', ২৮ আষাঢ়, ১৩০৯]।

একই সংখ্যায় পাঁচকড়ি "বঙ্গবাসীর প্রলাপ" নাম দিয়ে স্বামীজীর মৃত্যুতে বঙ্গবাসীর নীরস নির্বিবেক রচনার সমালোচনা করলেন। এর মধ্যে বঙ্গবাসীর মন্তব্যের বাংলা উদ্ধৃতি পাচ্ছি। পাঁচকড়ি লিখেছিলেন:

> "অতি বড় শত্রু হইলেও তাহার মৃত্যুতে মানুষের মনে একটু দুঃখের ভাব ফুটিয়া ওঠা স্বাভাবিক। অন্ততঃ লৌকিকতার খাতিরেও পিশাচবুদ্ধি জীবেও দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। সহযোগী বঙ্গবাসী কি লিখিতেছে দেখুন:

'মঠে মৃত্যু।—২৪ পরগণা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির "রামকৃষ্ণ অনেকের পরিচিত। তাঁহার

সেই বুদ্ধিমান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত—হাবড়া বেলুড়ের মঠে—ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই নরেন্দ্রনাথ অধুনা বিবেকানন্দ-স্বামী বলিয়া অনেকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহার সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু ইঁহাকে আমরা বাহাদুর পুরুষ বলিতে কুণ্ঠিত নহি। ইনি অল্পবয়সে রামকৃষ্ণের শিষ্য হইয়া আপন মেধা ও বুদ্ধির প্রভাবে এবং বক্তৃতার মোহজালে অনেককেই আপন পথে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মার্কিন মুলুকে ইঁহার বাক্-কৃতিত্বের একটা বিজয় ঘোষণা হইয়াছিল। কোনো কোনো রমণী তাঁহারই ভাবে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহারই পথানুসরণ করিয়া, তাঁহাকে পথপ্রদর্শক গুরুরূপে ভাবিয়া, নূতন পথে আসিয়া, এক নূতন ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই বাহাদুরীর কথা। শুনিতে পাই, নরেন্দ্রনাথের বহুমূত্রের পীড়া ছিল। গত সপ্তাহের শুক্রবার সন্ধ্যার সময় তিনি বেড়াইয়া মঠে ফিরিয়া আসেন, কিয়ৎক্ষণ পর তিনি যেন কেমন একটু অসুস্থ হন। অতঃপর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।'

"মৃতশত্রুর বিষয়েও কি কোনো ভদ্রলোক এমন ভাষায় কোনো কথা লিখিতে পারে? জানিনা আজকাল ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে এমনইভাবে সকল মনুষ্যত্বের ওলটপালট হইয়া থাকিবে। বঙ্গবাসী যখন বিবেকানন্দের প্রতিকূলাচরণ করেন, তখন আমরাই বঙ্গবাসীর সম্পাদকীয় চাকুরি করিতাম। সে-সকল মতামতের জন্য আমরা দায়ী। আমরা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মণ্য বজায় রাখিবার পক্ষে আমাদের সাধ তীব্রতর হইবার কথা। কিন্তু এখন যে বঙ্গবাসী সৎশূদ্র, এখনও সেই পূর্বেকার অমর্ষ কেন ফুটিয়া বাহির হয়? মরার বাড়া গালি নাই; যে মরিয়াছে সে তো আপদ চুকাইয়া গিয়াছে—মরার উপর খাঁড়ার ঘা মানুষ দেয় কি? ইংরেজ ইংলিশম্যান যে বাঙালীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে পারে, বাঙালী বঙ্গবাসী তাহা শ্লেষের ভাষায় উড়াইয়া দেয়। ধিক্ বঙ্গবাসী।

"বঙ্গবাসীকে এখনও আমরা বড়ই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। বঙ্গবাসীর সুখ্যাতি শুনিলে এখনও আমাদের লোমহর্ষণ হয়। সেই বঙ্গবাসীর রুচিবিকার দেখিয়া আমরা এতই ব্যথিত হইয়াছি যে, এই দুঃখের সময়ও বাজে কথার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। পাঠকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।"

স্বামীজীর দেহত্যাগে বঙ্গবাসীর 'শোক-মন্তব্য' এবং তাতে শোকের অভাব ও বিদ্বেষের প্রভাব দেখে পাঁচকড়ির রুষ্ট মন্তব্য আমরা দেখলাম। এখানে বলে নিতে পারি, বঙ্গবাসী উপরের ঐ মন্তব্য ক'রে অন্যায় কিছু করেনি, কারণ সে নিজ স্বভাবরক্ষাই করেছিল—যদি কেউ বদলে গিয়ে থাকেন তিনি পাঁচকড়ি। বঙ্গবাসীর নিস্পৃহ মন্তব্যে কিন্তু স্বামীজীর শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে স্বীকৃতি যথেষ্টই আছে। বঙ্গবাসী যা বলেছিল, তার বেশি কিছু বললে মনে হতে পারত, তার স্বভাববিকার ঘটেছে। কেবল একটি অসভ্যতা ঐ লেখাটিতে ছিল—'স্বামী বিবেকানন্দকে' শেষ পর্যন্ত 'নরেন্দ্রনাথ' নামে সম্বোধন করা। বঙ্গবাসী পছন্দ করুক বা না করুক, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নাম গ্রহণ করেন, তাকে স্বীকার করতে ভদ্রজন বাধ্য। (যেমন, বঙ্গবাসী-সম্পাদকের বাল্যে যদি বিদ্ঘুটে ডাক-নাম থাকত, তাহলেও তাঁর কোনো বাল্যবন্ধু পরবর্তী কালে মুদ্রিত রচনায় সেই নামে তাঁকে পরিচায়িত করতে পারেন না।

এক্ষেত্রে মনে হয়, ভদ্ররীতিকে লঙ্ঘন করবার মতো কোনো শাস্ত্রনির্দেশ উক্ত পত্রিকার সম্পাদক পেয়েছিলেন।)

অর্থাৎ পাঁচকড়ি বদলেছিলেন। বঙ্গবাসীর পাথরের চোখ পরে সত্যই পথ চলা আর সম্ভব ছিলনা। রক্ষণশীলদের পক্ষে 'অনুসন্ধান' পত্রিকা স্বামীজীকে একদা কটু ব্যঙ্গ করেছিল। একই কাগজ স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে স্বীকার করল, বিবেকানন্দ সমুদ্রপারে যাওয়ার জন্য সমাজচ্যুত হয়েছেন, একথা লোকে ভুলে গিয়েছে।

১৯০২ সালের পরে এক দশক পাঁচকড়ি প্রচণ্ড ঘটনাবর্তের মধ্যে ছিলেন। বহু সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন এইকালে। যখন প্রভুর মতের সঙ্গে নিজের মত মিলেছে তখন সানন্দে নিজেকে খুলে ধরেছেন, যখন মেলেনি, তখন নিজের গ্লানিময় প্রতিভাকে প্রভুর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তাকে অম্লরসাক্ত ক'রে তুলেছেন। কিন্তু সব সময়েই ভেবেছেন এমন একটি পত্রিকা চালাবেন, যার মধ্যে তাঁর গভীর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। মনে করলেন, 'প্রবাহিণী' তাঁকে সেই সুযোগ দেবে। "প্রবাহিণীকে বিদ্বজ্জন-সমাজের চিত্তবিনোদিনী করাই আমাদের অভিলাষ। ধর্মকথা, সমাজকথা, কাব্যশাস্ত্রের কথা... কহিবার জন্যই আমরা কৃতসংকল্প হইয়াছি। রাজনীতির পাঁক ঘাঁটিয়া তো এতদিন কাটাইলাম।...আশা আছে 'প্রবাহিণী' এ পঙ্কাশয় হইতে অধমকে উদ্ধার করিতে পারিবে।" [প্রবাহিণী, ১৭ মাঘ, ১৩২০]। এই আদর্শ তিনি সম্পূর্ণ রক্ষা করতে না পারলেও অনেকটাই পেরেছিলেন, এবং পাঁচকড়ি রচনাবলীতে সংকলিত গভীর ভাবাত্মক রচনার বেশি অংশ প্রবাহিণী থেকেই গৃহীত। এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতে পাঁচকড়ি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিষয়ে যা লিখেছিলেন—তাকেই বলতে পারি, তাঁর পরিণত মনের সার সিদ্ধান্ত। আমরা দেখি, এর মধ্যে তিনি ঐ দুই চরিত্রকে সর্বোচ্চসম্ভব শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন। ঐ দুই চরিত্র পাঁচকড়ির কাছে অবতার ও অবতারসঙ্গী।

সে লেখার উল্লেখ পরে করব—তার আগে পাঁচকড়ির মনোভূমে আর একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। রক্ষণশীলতা এক বিচিত্র বস্তু, তার জড় যায় না। জীবনের শেষভাগে পাঁচকড়ি এমন একটি কাজ করেছিলেন, যা তাঁকে সত্যই বিপাকে ফেলেছিল—এবং মৃত্যুর আগে দেশপ্রেমিক বাঙালীর ধিক্কার নিয়ে তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল। কাজটি আর কিছু নয়—সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যুর পরে 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিয়ে তাতে অসমের গোঁড়া পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিন্দামূলক লেখাগুলি প্রকাশ করা। পাঁচকড়ি নিজেই স্বীকার করেছেন, লেখাগুলিতে 'রীষ্'-এর বিষ যথেষ্ট—তবু সেগুলি ছেপেছিলেন—কেন? পাঁচকড়ির কৈফিয়ত—তিনি বুদ্ধির মুক্তি চান। দার্শনিক আলোচনা চলুক দেশে, বিচার চলুক, সকলে যুক্তিসহ নিজের মত প্রকাশ করুক। পাঁচকড়ি জানিয়েছিলেন—'সাহিত্য' পত্রিকার প্রাণস্বরূপ স্বর্গত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যদিও বিবেকানন্দের পরম ভক্ত [এবং রামকৃষ্ণের অবতারত্বে আস্থাবান], তিনিও যুক্তিপূর্ণ সমালোচনাত্মক রচনা প্রকাশের বিরোধী ছিলেন না। বুদ্ধের বিরুদ্ধে কি শঙ্করাচার্য লেখেন নি? কিংবা শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে রামানুজ?—পাঁচকড়ি প্রশ্ন করেছিলেন।

বৃহত্তর বাঙালী সমাজের কাছে এই কৈফিয়ত যথেষ্ট মনে হয়নি। তাঁরা পদ্মনাথের রচনা প্রকাশের মধ্যে পাঁচকড়ির কুৎসা-বিক্রীর ফন্দী দেখেছিলেন এবং 'সাহিত্য' পত্রিকা বয়কটের

আয়োজন হয়েছিল। এইখানে পাঁচকড়ি হিসাবে কিছু ভুল করেছিলেন। বাঙলাদেশের সমাজজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বুঝতে পারেন নি—১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে যে-বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় যথেচ্ছ লেখা যায়, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে সেই কাজ করা যায়না, কারণ বাঙলাদেশের সংগ্রামী শক্তি ইতিমধ্যে বিবেকানন্দের প্রাণ-প্রেরণায় সংগ্রামে নেমেছে—সে আর তাঁর স্মৃতি নিয়ে বুদ্ধির চালাকি সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

কিন্তু পাঁচকড়ি কেন ঐ লেখা ছেপেছিলেন—তাঁর অনেক কারণের একটি কারণ—পূর্বাগত রক্ষণশীলতা—কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এবং শশধর তর্কচূড়ামণির প্রতি পূর্বতন আনুগত্য—যা শশধরের ভক্ত পদ্মনাথের রচনা ছাপতে তাঁকে প্রণোদিত করেছিল।

কিন্তু একই সঙ্গে পাঁচকড়ি বিবেকানন্দের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। বিবেকানন্দই তাঁকে বদলে দিয়েছিলেন বহুলাংশে। আমরা যে, এখানে পাঁচকড়ির প্রসঙ্গ বিস্তারিত তুলেছি, তার কারণ আর কিছু নয়—বিবেকানন্দ রক্ষণশীলতার দুর্গে কতখানি ভাঙন ধরিয়েছিলেন, তার রূপ আর একবার দেখিয়ে দেওয়া। বঙ্গবাসী ছেড়ে চলে আসবার সময়ে পাঁচকড়ি পিছনে তাঁর অনেক অভ্যস্ত মতও ফেলে এসেছিলেন। যেমন, বঙ্গবাসীর কুক্ষিগত যে পাঁচকড়ির কাছে সমুদ্রযাত্রা করার জন্য বিবেকানন্দ পাতকগ্রস্ত—বঙ্গবাসী ছাড়ার পরে সেই সমুদ্রযাত্রার পক্ষেই পাঁচকড়ির লেখনী সোচ্চার। বাঙলাদেশের ব্রহ্মণ্যসমাজ আর্যামিতে 'উর্ধ্বশিখ'—পাঁচকড়ি তার একদা সমর্থক—তিনিই পরবর্তী কালে বাঙলার সমাজ প্রসঙ্গে পরিষ্কার লিখেছেন (বিবেকানন্দের মতবর্তী হয়ে) বাঙলার ব্রাহ্মণের রক্ত শুদ্ধ নয়—মিশ্র। ব্রাহ্মণ পাঁচকড়ি লিখে জানিয়েছেন, বাঙলার সমাজধর্মের ক্ষেত্রে ব্রহ্মণ্যসংস্কৃতির মুখ্যত্ব নেই, ব্রহ্মণ্যসংস্কারকে বহু চেষ্টাতেও (বহু অপচেষ্টাতেও, পাঁচকড়ি বলেছেন) বাঙলার গভীরে প্রবেশ করানো যায়নি; এখানে 'ব্রাহ্মণের চাষ' (কিংবা 'আর্যামির চাষ') করতে হয়েছে, কিন্তু যথেষ্ট ফসল ফলেনি। তন্ত্রের মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে তিনি এও লিখেছিলেন, "চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত বাংলার ছত্রিশ জাতিকে একসূত্রে সমভাবে বন্ধন করিতে তন্ত্র যতটা সহায়তা করিয়াছিল, এত আর কোনো ধর্মই করে নাই।"

পরিবর্তিত পাঁচকড়ি এই নবভাবনার প্রেক্ষাপটে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে দেখতে চেয়েছিলেন। গোঁড়া পদ্মনাথ যেখানে কোনো বিশেষ সময়ের স্মৃতিশাস্ত্রের চক্মকি ঠুকে ফিন্‌কি আলোয় এক বিরাট ব্যক্তির আচরণের ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিচার-চেষ্টায় স্বর্গমর্ত্য তোলপাড় করেছেন, সেখানে পাঁচকড়ি নতুন চোখে দেখলেন—সমুদ্রলঙ্ঘনকারী, খাদ্যাখাদ্যবিচারে উদাসীন, ভারতীয় ও ইউরোপীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ, 'কায়েত সাধু' বিবেকানন্দের মধ্যে অভিনব শাস্ত্রের জন্ম হয়েছে, যা ব্যষ্টিকে গ্রাস ক'রে সমষ্টির জাগরণ ঘটাচ্ছে। পাঁচকড়ি লিখলেন, "ভবদেব এবং রঘুনন্দনের মাপকাঠিতে ইঁহাদের ধর্মকর্মকে মাপিতে চেষ্টা করিলে কুলাইবে না। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব সমাজের শাসন রঘুনন্দন করিতে পারেন নাই; সেজন্য হরিভক্তি-বিলাসের রচনা প্রয়োজন হইয়াছিল। তেমনি রামকৃষ্ণের শিষ্যশাখার কর্মের পরিমাপ রঘুনন্দনী গজে হইবে না।" (সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩২৮)।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের উল্লেখ ক'রে পাঁচকড়ি লিখলেন, "স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ যে কয়জন পুরাতন ব্যক্তি এখনো বেলুড়ে আছেন, তাঁহারা জানেন, স্বামী

বিবেকানন্দ আমাদের কতটা প্রিয়জন ছিলেন। সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা যে আমাদের হয় নাই তাহা নহে। অক্ষয়চন্দ্রের সামাজিক আলোচনা ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে আমরা বসুমতীতে চালাইয়াছিলাম। স্বামীজীও সে সময় আমাদের কার্যে যোগ দিয়াছিলেন।"

এরপরে পাঁচকড়ি তাঁর 'পুরাতন নোটবহি হইতে' স্বামীজীর সঙ্গে কথোপকথনের যে অংশ তুলেছিলেন, তার মধ্যে স্বামীজীর সমাজ ও বিশ্বভাবনার গভীর বিশাল রূপের আভাস পাওয়া যায়:

"গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৃহে বসিয়া আলোচনা হয়। স্বামী জিজ্ঞাসিলেন—পাঁচু, এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে? উত্তরে আমরা বলিলাম—ভগবান্।

"স্বামী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—দূর! খাঁটি বামুনের মতো উত্তর দিলি! তোদের বামুনের দোষই এই—তোরা কিছুতেই বাম্‌নাই ভুলিতে পারিস্‌নে। ওরে হনুমান, ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্কার ছাড়িবি কেমন করিয়া? আইকনক্ল্যাজম্-এর ঠেলায় যে ভগবানের বিশ্বাস টলিয়া গিয়াছে। ভগবান্‌টা মৌখিক আলাপের বিষয় হয়েছে।

"পাঁচু—তবে তোমরা ধর্মপ্রচারক হয়েছ কিসের জন্য? গেরুয়া পরা কেন? ধর্মে কর্মে চিন্তায় ব্যসনে সজীব ভগবানটাকে যদি আমদানী করিয়া বসাইতে না পারো, তবে আর করিলে কি? বাংলায় বা ভারতবর্ষে ভগবান্ ছাড়া কাজ হয়?

"স্বামী—কথাটা খুলিয়া বলিব। এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে—জানিস?—আমি!—'আমি' বিবেকানন্দ কেবল নহি। এই আমরা যে ছয়-সাতজন এখানে বসে আছি, আমাদের পরমাত্মা আমিটা জাগিয়া উঠিলে তবে তরঙ্গ রুদ্ধ হইবে। আমি জাগিয়া উঠিব, আমি কর্মময় হইব। কর্ম করিতে করিতে যখন আমাদের হৃদ্গত সকল আমি অন্তরে বুঝিতে পারিবে যে, আমি ছাড়া আর একটা বড় আমি আছে—সে বড় আমির শক্তি অসীম—সে অসীম শক্তির আনুগত্য না করিতে পারিলে কোন কর্ম ঠিকমতো করা চলে না—তখনই শ্রীভগবান্ আসিয়া প্রকট হইবেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে চাই আমিটাকে প্রকট করিতে। বেদান্ত ছাড়া এ কর্ম সিদ্ধ হইবে না। যাহাকে হেয় বলিয়া আমরা বামুন-কায়েত এতদিন দূরে রাখিয়াছি, তাহাদিগকে কোলে তুলিতে হইলে চাই বেদান্ত। আর সবটাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে না পারিলে—প্রত্যেক আমি জাতীয় বিশাল আমিতে পরিণত হইতে না পারিলে—কোনো কাজই হইবে না। তোমার তন্ত্রের বা বৈষ্ণবধর্মের যুক্তি-তর্ক এই ইউরোপীয় সভ্যতা-বিদগ্ধ সমাজে চলিবে না। চাই বেদান্ত—উহার সনাতন সত্যবাণীর প্রচার। কি বলিস?

"পাঁচু—তা বটে। বেদান্তটাকে, বৌদ্ধ ফিলজফির উপর উপনিষদের মহাবাক্যের সমন্বয় মনে করি। রামানুজ, শঙ্করের মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বা শূন্যবাদ বলিয়াছেন। তা, বেদান্তের সহিত বৌদ্ধ সেবাধর্মটা জড়াইয়া দিলে সকল শঙ্কা দূর হয়। ইংরাজি লেখাপড়া জানা বুদ্ধিতে এ বেদান্ত লাগছে ভালো। পরন্তু 'আমি' জাগিবে কি? দেবীসূক্তের 'আমি' ফুটাইতে পারিবে কি? তা যদি পারো, শিষ্যস্তেঽহং।" [ঐ, শ্রাবণ ১৩২৮]

পূর্বে উল্লিখিত 'প্রবাহিণী'র (২২ ফাল্গুন, ১৩২০) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক রচনার

('ভগবান্ রামকৃষ্ণ') প্রসঙ্গে আসতে পারি। রামকৃষ্ণ যে ঈশ্বরের অবতার, তা দেখাবার জন্য পাঁচকড়ি গোড়াতেই গীতার সুবিখ্যাত 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ' শ্লোক উদ্ধৃত করেন। ধর্মের গ্লানি কাকে বলে, অধর্মের অভ্যুত্থানই বা কী, তা ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, যুগের পরিবর্তন হয়েছে, সুতরাং পূর্বের ধর্মগ্লানি, বা অভ্যুত্থিত অধর্মের চরিত্রের সঙ্গে এখনকার অনুরূপ বিষয়ের আকারপার্থক্য থাকবেই। এখনকার অর্থে বিকৃতিই 'গ্লানি'। বিকৃতি সামঞ্জস্য নষ্ট করে। 'অধর্মের অভ্যুত্থানের' অর্থ তাই দুষ্ট আদর্শের প্রাবল্য। ইংরাজ আমলের সূচনায় এদেশের ধর্মে ও সংস্কৃতিতে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছিল এবং প্রবল হয়েছিল দুষ্ট আদর্শ—তখনই আবির্ভাব হয়েছিল রামকৃষ্ণের:

> "কৃপার সাগর, সমাজের দুষ্ট আদর্শকে চূর্ণ করিবার জন্য—দরিদ্রের মান বাড়াইবার জন্য—দারিদ্র্যকে স্বর্ণ-সিংহাসন দিবার জন্য, সেবাব্রতকে সকল ব্রতের সার করিবার জন্য, কাঙাল ফকিরের মধ্যে নারায়ণের অস্তিত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য—ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কর্মের পথ দেখাইবার জন্য—রামকৃষ্ণ—কৃপার অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বর্তমান যুগের ধর্মের গ্লানির সংহরণ ক্ষাত্রবীর্যে সম্ভবপর নহে। তাই তিনি দীনহীন পূজক ব্রাহ্মণের বেশে বাংলার নিত্য শ্যামায়মান পল্লীবাসের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়ার তলে, করুণা ও দয়ার, সংযম ও সন্ন্যাসের, বিনয় ও বৈরাগ্যের, ঔদার্য ও তিতিক্ষার ঠাকুররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি সামঞ্জস্যের পূর্ণাবতার। সকল ধর্মের, সকল মতের, সকল বিশ্বাসের, সকল আচারের, সকল সাধনার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি বাংলায় শান্তিরাজ্য স্থাপনের বনিয়াদ গড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহাতে তন্ত্রের ঔদার্য ও বিশ্বপ্রেম ছিল, বৈষ্ণবের মাধুর্য এবং অপরাজেয় দৈন্য ছিল। তিনি তাঁহার বিশাল যুগল বাহুর দ্বারা বিশ্বমানবতার বিরাট পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের ঈশ্বরপদে বরণ করিতে পারিয়াছিলেন। তন্ত্রের মহামন্ত্র—নারীমাত্রেই জগজ্জননীর অংশরূপিণী—এই মন্ত্রে একা তিনিই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীকে মা বলিতে শিখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঘৃণা ছিলনা, উপেক্ষা ছিলনা, অবহেলা ছিলনা—পাপী, তাপী, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ম্লেচ্ছ, যবন—সকলকেই, সকল মানুষকেই, তিনি কোল দিয়াছিলেন।"

রামকৃষ্ণ তাহলে শেষপর্যন্ত পাঁচকড়ির কাছেও অবতার! ব্রহ্মবান্ধবের কাছে কিভাবে রামকৃষ্ণ অবতার বা ততোধিক হয়ে উঠেছিলেন—সে অপূর্ব কাহিনী "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে নিবেদন করেছি। রামকৃষ্ণের অবতারত্বের একটি প্রমাণ, পাঁচকড়ির কাছে, "ইংরেজি-শিক্ষিত নবযুবকদিগের মধ্য হইতে ব্রহ্মানন্দ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণের" সৃষ্টি করা। নরেন্দ্রনাথ কী ছিলেন, পাঁচকড়ি সাক্ষাতে জানতেন। ১৮৯৭-এর বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় বিদ্রোহী যুবক নরেন্দ্রনাথের বর্ণনাও তিনি করেছেন। সেই নরেন্দ্রনাথ কিভাবে বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হলেন!!—"আমরা নরেন্দ্রনাথকে জানি, চিনি। সেই নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দে পরিণতিও জানি ও বুঝি। তাই ভগবান্ রামকৃষ্ণের মহিমায় মুগ্ধ।" সেই পরিণতির একটা ছবি, পাঁচকড়ির চোখে এই:

"একবার বিবেকানন্দের সম্মুখেই তাহার একটা বক্তৃতার সুখ্যাতি করিতেছিলাম। সে আমাদের মুখে হাত চাপিয়া মুখ বন্ধ করিয়াছিল, এবং সেইসঙ্গে বলিয়াছিল—'তোরা যদি অমন কথা বলবি তো আমি দাঁড়াই কোথা? কার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সখ্যের সাধ মিটাইব?' উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম—'দেখ দাদা, শলুই চিনিতে পারলে জাতসাপের পরিচয় অনেকটা জানতে পারা যায়। আমি তোমায় দেখে ঠাকুরের মহত্ত্ব অনেকটা চেনবার চেষ্টা করছি। তাঁকে তো দুইবারের অধিক দেখি নাই। তোমার মতো সামগ্রী যাঁহার কৃপায় তৈয়ার হইতে পারে—তিনি যে কৃপার সাগর—সর্বনিধির আধার।' বিবেকানন্দ আমার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। শেষে গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বীণানিন্দিত কণ্ঠে—

'আমি সেই ভয়ে মুদি না আঁখি
পাছে তারা-হারা হয়ে থাকি'

—এই গানটি বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে অপূর্ব ভাব মিশাইয়া গায়িলেন।"

যুগাবতারের মুখ্য সহায়ক-সঙ্গীরূপে বিবেকানন্দের ভূমিকার কথা পাঁচকড়ি লিখেছেন:

"[বিবেকানন্দের] ইংরেজী বিদ্যার বহর জানিতাম। পরে আমেরিকা ও ইউরোপে যাইয়া সে যে-বিদ্যার ও যে-তেজের পরিচয় দিয়াছিল, তাহারও অপূর্ব লীলা দেখিয়াছিলাম। ভগবান্ রামকৃষ্ণ মাতৃভাবের পলিমাটি ছড়াইয়া বাংলার যে-উর্বরতা সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মানবতার বীজ না দিলে ফসল ভালো হইবে কেন? তাই বিবেকানন্দের উপর এই রোয়া-বোয়ার ভার পড়িয়াছিল। এ কাজের জন্য যেটুকু তেজ, যেটুকু সাহস, পাকা কৃষির ভূয়োদর্শনজাত যেটুকু স্পর্ধার প্রয়োজন, সে সকলই বিবেকানন্দে পূর্ণমাত্রায় ছিল। বিবেকানন্দে ইউরোপের তেজস্বিতা, মানবতা এবং ভারতের ভক্তি, বিশ্বাস, একনিষ্ঠা, সংযম ও সাধনা পুরামাত্রায় ছিল। ...ধর্ম ও সাধনার উপর জাতীয়তার পালিশ চড়াইয়া, সেবাব্রতকে জাতীয় ধর্মে পরিণত করিয়া বিবেকানন্দ, সব্যসাচী অর্জুনের ন্যায়, ভোগবতীর জল টানিয়া শুষ্ক তৃষ্ণার্ত সমাজের উপরের স্তরগুলিকে স্নিগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গরীব-দুঃখী, মূর্খ-পণ্ডিত সবাই এখন একসূত্রে বাঁধা হইয়াছে, সবাই এক আদর্শের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছেন। যে মন্ত্রের প্রভাবে বিলাসীবাবু সন্ন্যাসী হইতে পারে, রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অহর্নিশ সেবা করিতে পারে, প্লেগে ভয় পায়না, বসন্তরোগী দেখিলে সংকুচিত হয়না, উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সাগরসঙ্গমে ঝম্পপ্রদান করিতে ইতস্ততঃ করেনা—সে মন্ত্রই বা কেমন, সে মন্ত্রীই বা কেমন—একবার ভাবিয়া দেখ দেখি!"

'নায়ক' বিবেকানন্দের চেয়ে 'মানুষ' বিবেকানন্দ পাঁচকড়িকে কম মুগ্ধ করেন নি। এইকালে তিনি যৌবন-উত্তীর্ণ পাঁচকড়ি—শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ যৌবনের স্বপ্নচ্ছবি উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন 'শুকদেব' রচনায়। (প্রবাহিণী, ১৮ মাঘ, ১৩২১)। এর মধ্যে তিনি ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন, শুকদেবের মতো আশ্চর্য পৌরাণিক চরিত্রের একমাত্র আধুনিক তুলনা বিবেকানন্দ। "যাঁহারা পুরাণ পাঠ করেন, তাঁহারা পদে-পদে উদাহরণ পাইলে ভাবটাকে

ষোল আনা ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন। ... পুত্র শুকদেবের জন্য ব্যাসের মহিমা কোটিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। যেমন ভগবান্ রামকৃষ্ণের ঐশ্বর্য স্বামী বিবেকানন্দে প্রকট, তেমনি দ্বৈপায়ন ব্যাসের মাহাত্ম্য ও দেবত্ব শুকদেবে পূর্ণতালাভ করিয়াছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ যে নরেন্দ্রনাথকে 'আমার শুকদেব' বলতেন পাঁচকড়ি অবশ্যই তা জানতেন।

পাঁচকড়ির ভাবনায়, শুকদেব পুরাণের অতুলনীয় চরিত্র। এমন চরিত্র আর আঁকা হয়নি। ঐ অপূর্বত্বের কারণ—শুকদেবে অম্লান যৌবন এবং পূর্ণজ্ঞানের সম্মিলন। পাঁচকড়ি ব্যাখ্যা ক'রে দেখিয়েছেন, যৌবনে থাকে অন্ধ আকাঙ্ক্ষা, তাই পদে-পদে ভ্রান্তি। ঠেকে-ঠেকে যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন যুবক আর যুবক নেই, সে তখন প্রৌঢ়—তখন তার অপচিত যৌবনের জন্য বৃথা দীর্ঘশ্বাস। পুরাণ তাই এমন একটি চরিত্রের কল্পনা করতে চেয়েছে যেখানে যৌবন ও জ্ঞান সমন্বিত থাকবে। শুকদেব সেই চরিত্র। "শুকদেব জ্ঞানী যুবক, স্বয়ংসিদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, অথচ তিনি সদাই নবযৌবনের আগ্রহ-সমন্বিত। সর্বসিদ্ধির সহিত যৌবনের উল্লাস প্রায়ই দেখা যায়না।... বাস্তবিক প্রৌঢ়ের বিচারশীলতা এবং যৌবনের শক্তিসামর্থ্য সম্মিলিত হইলে একটা অপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়া যায়। ...তাঁহার অক্ষয় যৌবন, অক্ষয় সৌন্দর্য, দেহ সদা রসে ঢল-ঢল করিতেছে, অন্ধ যৌবনশক্তি তাঁহার সর্বাঙ্গে সুষমা ঢালিয়া দিয়াছে, অথচ তিনি মহা জ্ঞানী-পুরুষ।... সৌন্দর্য-উপভোগের সামর্থ্য তাঁহাতে অপর্যাপ্ত আছে, বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যের অনুভূতি তিনি পলে-পলে করিতেছেন, তথাপি তিনি সংযমী।... পুরাণভরা বৃদ্ধ ঋষিমুনির দলের মধ্যে একা শুকদেবই যুবক। শুকদেব অনুশীলনের প্রতিমূর্তি, শিক্ষা বা 'কালচার'-এর সাকার দেবতা। শুকদেব আদর্শ মনুষ্য—মানবতার প্রতিমা।"

কল্পনার সঙ্গে বাস্তব অক্ষরে-অক্ষরে মেলে না। কিন্তু বাস্তবের ছায়া না থাকলে কল্পনা মনোবিকার। বিবেকানন্দের চিরযৌবনছবি যে অম্লান অক্ষরে পাঁচকড়ির মনে আঁকা ছিল, তা রঙ্গালয় পত্রিকায় বিবেকানন্দের সম্বন্ধে তাঁর লেখা শোকমন্তব্যে আমরা পূর্বেই দেখেছি।

প্রবাহিণীর পূর্বোক্ত 'ভগবান্ রামকৃষ্ণ' প্রবন্ধ থেকে বিবেকানন্দের আর একটি চিত্র উদ্ধার করব। বিবেকানন্দের সব-হারানো, সব-ভাসানো মহাভাবের রূপ এঁকেছেন পাঁচকড়ি, ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে:

> "তেমন সরল হাস্যময় মিত্র, তেমন তেজস্বী সত্যসন্ধ সহচর আর কখনও দেখি নাই। তাহাকে ফাঁকি দিবার জো-টি ছিলনা, মনের কথাটি টানিয়া বাহির করিত। তাহার কখনো অভিমান ছিলনা। আমি একজন পণ্ডিত, আমি একজন বড় বক্তা—মিত্র-সংসর্গে এ-ভাবটা তাহার কখনই ফুটিয়া উঠিত না। বিবেকানন্দ একজন বড় দরের ভক্ত ছিলেন। গোপনে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিতে-করিতে অনেক সময় তাঁহাতে মহাভাবের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু তিনি সে-ভাব চাপিয়া রাখিতেন। একবার নারদ-ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন—'না ভাই, আমায় মজাইও না। আমি তাল সামলাইতে পারিব না। আমার যে-কাজ, সে-কাজ এখনো তো শেষ হয় নাই। আমার ও-দিকটা ফুটাইও না—আমি পাগল হইব।' গান গায়িতে গায়িতে বিবেকানন্দ এক-একসময় সত্যই মূর্ছিত হইয়া পড়িতেন। একদিন আমার কন্যাকে লইয়া 'তেমনি তেমনি করে নাচো দেখি শ্যামা'—এই গানটি গায়িতে-গায়িতে, চারি বৎসরের কন্যাটিকে নাচাইতে-নাচাইতে, বিবেকানন্দ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর মেয়েটিও

তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া, তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্থির ধীর নিস্পন্দবৎ তাঁহার বুকের উপর শুইয়াছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ এ-ভাব প্রায়ই চাপিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—'দ্যাখ, এই ভাবের বাড়াবাড়ি হওয়াতেই আমরা কলা খেয়ে বসেছি। পৃথিবীতে এমন মদ নেই যাহাকে ভক্তিরসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সকল মদের সেরা ভক্তি-মদ। সেই মদ খেয়ে বাঙালী চারশো বছর মাতাল হয়েছিল। আর ও মদ চালানো ঠিক নয়।' তাই বিবেকানন্দ কর্ম-জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়া বক্তৃতা করিতেন।"

প্রসঙ্গ এখনো শেষ হয়নি। বাকি আছে পাঁচকড়ির শেষ নমস্কারের কথা। সাহিত্য পত্রিকাতেই "স্বামী বিবেকানন্দ', এই নামে পাঁচকড়ির একটি লেখা বেরিয়েছিল ফাল্গুন, ১৩২৯ সংখ্যায়। এই সংখ্যার পরে সাহিত্য পত্রিকার আর মাত্র দুটি সংখ্যা বেরিয়েছিল, তার পরেই বন্ধ হয়ে যায়। এবং পাঁচকড়িও কয়েক মাস পরে মারা যান।

ঐ প্রবন্ধের সূচনায় বলা হয়—বিবেকানন্দের মতো 'স্বরাট পুরুষ' পৃথিবীর বহু দুঃখ ও যন্ত্রণার কান্না ছাড়া আবির্ভূত হন না। তারপর পাঁচকড়ি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকৃত জাগরণের সঙ্গে পূর্ববর্তী জাগরণের তুলনা ক'রে বলেন—পূর্বের জাগরণ প্রকৃত জাগরণ নয়—জাগরণচেষ্টা মাত্র:

"রাজা রামমোহন রায় হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের কাল পর্যন্ত এই জাগরণের চেষ্টা—সে কেবল স্বপ্নেরই চেষ্টা। প্রকৃত-জাগা মানুষে [দেশকে] জাগায় নাই—মশা ছারপোকার কামড়ে নিদ্রিত একজন অপরের অঙ্গে চাপড় মারিয়াছেন, তাহার জন্য কদাচিৎ একটু পার্শ্বপরিবর্তন ঘটিয়াছে, একটু-বা নিদ্রিতের প্রলাপ শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।"

পাঁচকড়ি রামপ্রসাদের গান উদ্ধৃত ক'রে বললেন, 'যে-দেশে রজনী নাই' সেই দেশের মানুষ যদি কেউ আসেন তবেই যথার্থ জাগরণ ঘটতে পারে! রামকৃষ্ণ সেই অতন্দ্রলোকের অধিবাসী—বাঙালীকে জাগাবার জন্য তিনি আনলেন বাঙালীর 'সাধের, সোহাগের, সাধনার' ধন বিবেকানন্দকে। 'শুষ্কতোয়া ভাগীরথীর মাটি' তুলে বিবেকানন্দ-শিবকে রামকৃষ্ণ গড়লেন। সেই শিব বাঙালীর 'শ্রুতি-মূলে সিদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ' করলেন। "তাঁহার স্মৃতির ত্রিশূল ধরিয়া আজ ভারতবর্ষের যেখানে রোগ, যেখানে শোক, যেখানে বেদনা, যেখানে ভাবনা, সেইখানে বাঙালী ছুটিতেছে...ইংরেজিনবিশ বাঙালী, বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়, ব্রহ্মচারী-সেবকদল বনে দুর্গমে যাইতেছে।"

সেই 'স্মৃতির ত্রিশূল' বহন ক'রে দিকে-দিগন্তরে ছুটবার ভাগ্য পাঁচকড়ির হয়নি। কিন্তু স্মৃতি অনির্বাণ—শিখায়িত ব্যাকুল ভাষায় সেই স্মৃতির পুরশ্চরণ করলেন পাঁচকড়ি জীবনপ্রান্তে বসে। আনন্দে-বিষাদে-মাখা সেই রচনা—তারই কিছু অংশ উদ্ধৃত ক'রে প্রসঙ্গ শেষ করব:

"ঐ গঙ্গার পশ্চিমতটে, বেলুড়ের মঠের দিকে একবার তাকাও। ...যে-দুন্দুভিনাদে তোমার নিদ্রাঘোর ভাঙিয়াছিল, সেই দুন্দুভি ওখানে লুকানো আছে; যে-অনাবিল রূপের বিকাশে তোমার মোহান্ধতা দূর হইয়াছিল, সে মাধুরীর প্রতিচ্ছায়া ওখানে ঝুলানো আছে; যাঁহারা তাঁহার সঙ্গগুণে ধন্য তাঁহারা ওখানে সজীবদেহে বিচরণ করিতেছেন; ঐখানে তাঁহার দেহের ভস্মরাশি, স্মৃতির প্রচ্ছন্ন পুষ্পরাশি, বাগ্‌-বিভূতির প্রতিধ্বনির

সৌরভরাশি।... দেখ-দেখ! পতিতপাবনী সুরতরঙ্গিণী কুলকুল রবে উহার পদধৌত করিয়া অনন্ত সাগরকে সে সমাচার দিতে তরল-তরঙ্গে কেমন ছুটিয়াছেন।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাঁচকড়ি লিখলেন:

"বড় ভাগ্য আমাদের যে, এই বিলাসব্যসনবিকৃত দেহে সে কুমারকান্তের মুখে কান্তপদাবলী শুনিয়াছিলাম। তখন তাহাকে বুঝি নাই বটে, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াছিলাম, স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গ করিয়াছিলাম, তাহার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়াছিলাম, সমুদ্রোপম সে অগাধ হৃদয়ে ডুবিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ডুব দিয়া তল স্পর্শ করিতে পারি নাই, তলার মণিমাণিক্য আহরণ করিতে পারি নাই, পরন্তু সে স্নেহের শীতল সলিলস্পর্শে প্রাণমন শীতল হইয়াছিল, অনেক জ্বালা জুড়াইয়াছিলাম। সে মানুষ এখন...অতীতের চক্রবালক্রোড়ে সন্ধ্যার সপ্তরাগে রঞ্জিত হইয়া দিব্যপুরুষের ন্যায় শোভা পাইতেছে।"

সেই দিব্যপুরুষের উদ্দেশে পাঁচকড়ির শেষ বন্দনাস্তোত্র:

"একবার তাহাকে দেখিয়া লও! হিমালয়ের সানুদেশে বসিলে হিমালয়ের উদার মহিমা বুঝা যায়না। ...কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ রূপ দেখিতে হইলে দার্জিলিঙের চূড়ায় উঠিয়া দেখিতে হয়। এই হিমবান অতিমানুষের পরিমাণ ও মহিমা বুঝিতে হইলে বেলুড়ে যাইয়া, ভাবের উচ্চ চূড়ায় দাঁড়াইয়া, একবার তাহাকে দেখিয়া লও।...যে ধর্ম শিখাইয়াছে, শ্রদ্ধা শিখাইয়াছে, কর্ম শিখাইয়াছে, ত্যাগ শিখাইয়াছে, বাঙালীকে আবার মানুষ গড়িবার পথ দেখাইয়াছে—সেই নিজের মানুষকে মমতার বাষ্পাকুল নয়নে, ভক্তির নির্নিমেষদৃষ্টিতে একবার দেখিয়া লও! এই সন্ধিক্ষণে, এই জগদ্ব্যাপী বিরাট পরিবর্তনের মহা মুহূর্তে, একবার 'যে-দেশে রজনী নাই' সেই সেই দেশের মানুষকে দেখিয়া লও।"

[উদ্বোধন পত্রিকার আশ্বিন ১৩৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত]

স্বামী বিবেকানন্দ: সাহিত্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা

॥ এক ॥

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংজ্ঞা বা লক্ষণ সম্বন্ধে মতৈক্যের আশা কেউই করেন না। 'এমন মুনি নেই যিনি অন্যের সঙ্গে ভিন্নমত নন'—এই যদি প্রাচীন মুনিদের সম্বন্ধে সৎবাক্য হয় তাহলে আধুনিক মুনিরা সহমত হবেন, এটা নিতান্তই দুরাশা। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মতো গুরুতর ব্যাপার যেখানে উপস্থিত সেখানে আলোচনাক্ষেত্রে নানা বিদ্যাধারীরা গরহাজির থাকতে পারেন না। বিচারে উপস্থিত আছেন সাহিত্যিকদের সঙ্গে ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী, শিল্পতাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং কারা নন। সুতরাং সাধারণ-স্বীকৃত লক্ষণের কথাটা থাক।

নিজের প্রয়োজনে, অতি সরলীকরণের নিন্দা শিরোধার্য ক'রে, কাজ-চলা গোছের একটা-কিছু লক্ষণ নির্ণয় ক'রে নেওয়া যাক। যথা, ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে আচার-আচরণ, সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক রূপ লক্ষণীয়। যেহেতু তা অতীত থেকে বস্তু বহন ক'রে আনে তাই অনেক সময় মনে করা হয়—আচারবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা তার অচ্ছেদ্য অংশ। সেইসঙ্গে তাতে থাকে এক ধরনের স্বপ্নালু মোহমায়া। কিন্তু সমাজ ও সংস্কৃতি তো সদ্য-ভূমিষ্ঠ কোনো পিণ্ড নয়, এবং ধাবিত প্রগতির পক্ষে অতীতের চিন্তাসম্পদ ও অভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শিক্ষালাভের প্রয়োজন আছেই, সেজন্য ঐতিহ্যকে পুরোপুরি বর্জন করার অর্থ জাতীয় জীবনবৃক্ষের মূলোচ্ছেদ, যার পরিণতি নিশ্চিত আত্মিক মৃত্যু।

কিন্তু ঐতিহ্য কি সত্যই স্থাণু? নহে। কালপ্রয়োজনে তা বদলায়। সেক্ষেত্রে ফুটন্ত আধুনিকতা যে সর্বদা রূপান্তরিত, বর্ণান্তরিত হবে, তা বলাই বাহুল্য। বহমান কালতরঙ্গে আসীন আধুনিকতার পক্ষে 'ধাও ধাও' আবশ্যিক জীবনধর্ম। দেখা যায়, 'আধুনিক'কে ঠেলে দ্রুত এগিয়ে আসে 'সাম্প্রতিক', 'অতি সাম্প্রতিক'। আর পিছিয়ে-পড়া আধুনিকের যদি আয়ুর জোর থাকে তাহলে আখ্যা পেয়ে যায়, 'ক্লাসিক'। অতিশয় ক্ষণবাদী এই ধরনের আধুনিকতা নিয়ে বিব্রত রবীন্দ্রনাথ একদা 'শাশ্বত আধুনিক' শব্দ দুটি প্রয়োগ করেছিলেন—আধুনিকতার পায়ের তলায় জমি রাখার প্রয়োজনে। সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথ আধুনিকের সঙ্গে শাশ্বত শব্দ যুক্ত ক'রে এই কথাটা বলতে চেয়েছিলেন, ঐতিহ্যের সারাংশ আত্মসাৎ করার প্রয়োজন ও অধিকার আছে আধুনিকতার, কেননা একালে যেসব মূল্যবোধগুলি ঐতিহ্যসম্মত মনে করা হয়, জন্মকালে তারা অনেকেই ছিল আধুনিক এবং তাদের কোনো-কোনো অংশের এমনই জীবনীশক্তি যে, পরিবর্তিত কালের মার খেয়েও তারা সজীব থেকেছে, ফলে হয়ে পড়েছে শাশ্বত আধুনিক।

বিবেকানন্দ তাঁর চিন্তা ও সৃষ্টিতে আধুনিক এবং শাশ্বত আধুনিক। তাঁর মধ্যে ঘটেছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক সম্মিলন।

কোন্-কোন্ নূতন ভাব এবং আন্দোলনের প্রকোপে পৃথিবীতে আধুনিক ভাবধারার উদ্ভব ঘটল, তার দিকে নজর দিলে দেখি যে সেখানে—রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্পবিপ্লব, অর্থনৈতিক কেন্দ্রচ্যুতি, সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রে অগ্রগতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবতা, ঈশ্বর ও মানবের সম্পর্ক সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা, অজ্ঞেয়বাদ, নাস্তিকতা, বস্তুবাদ—এই সকল এবং আরও অনেক কিছু জড়িয়ে আছে। নানা টানাপোড়েনে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ। ভারতীয় প্রেক্ষিতে একথা স্বীকৃত যে, পাশ্চাত্য জাতির ভারতে আগমন, তাদের মধ্যে অতি ধুরন্ধর ইংরাজ কর্তৃক সাম্রাজ্যস্থাপন, বুকে পা রেখে এদেশে তাদের পণ্য ও অস্ত্রের আমদানী, তৎসহ কিছু গ্রন্থ ও ভাবরত্ন—তাতেই আধুনিকতার সূত্রপাত। "হিন্দুসভ্যতার সুপ্রাচীন উপকূলে আধুনিক চিন্তাতরঙ্গের বহুদূরব্যাপী প্লাবনের প্রথম ফলস্বরূপ বঙ্গদেশে যে-সকল মানবধর্মী পুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল"—তাঁদের মধ্যে প্রথমে আসেন রামমোহন রায়, তারপর বিদ্যাসাগর—স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন।[১] অন্যত্র তিনি রামমোহনকে ভারতে "নবজন্মের প্রথম পুরুষ" বলেও আখ্যায়িত করেছেন।[২] এবং অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীর অন্তরে চিরজাগ্রত ও বাঙ্ময়—যিনি শাশ্বত ভারতের প্রতিভূ। বিবেকানন্দে দেখি সেতুযোজনা।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের মনোভাব স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এক বিখ্যাত প্রবন্ধে—"প্রস্তাবনা: বর্তমান সমস্যা"। এটি রামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র, ১৮৯৯ সালে প্রবর্তিত উদ্বোধন-এর প্রথম রচনা। উদ্বোধন পত্রিকা এবং ভারতবর্ষ—উভয়ের পক্ষেই অবলম্বনীয় চিন্তানীতি এই রচনায় স্বামীজী নির্দেশ করেছিলেন। এর শুরুতে, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত গাঢ় বর্ণনা, পাশ্চাত্য-সংস্রবে ভারতীয় মন ও জীবনে আলোড়ন এবং উদ্দামতার রূপরেখা। স্বামীজী ভারতীয় জীবনক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন এই বলে:

"যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে—চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা।"

তিনি আরও চাইলেন:

"চাই—সর্বদা-পশ্চাৎদৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি। আর চাই—আপাদমস্তক শিরায়-শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

তিনি স্পষ্ট ক'রে বললেন:

"রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কী করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?"

স্বামীজী অনিয়ন্ত্রিত পাশ্চাত্য ভাবগ্রহণের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন:

"যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্য বীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়। ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে

আত্মহারা হইয়া যায়। ভয় হয়, পাছে অসাধ্য, অসম্ভব এবং মুলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হইয়া যাই।"

আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে স্বামীজী সর্বদা 'ঘরের সম্পত্তি', 'পিতৃধন', সম্মুখে রাখতে বলেছেন। তারপর বাকি অংশে স্বাধীনতা। উদার সাহসিকতার সঙ্গে বিবেকানন্দের মতো মুক্তমন সন্ন্যাসীই কেবল নিম্নোক্ত কথাগুলি বলতে পারেন:

> **"নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্যকিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর—তাহার নাশ কে করে?"[৩]**

॥ দুই ॥

ভারতীয় ইতিহাসে তথাকথিত মধ্যযুগের (মুসলিম যুগ নামেও পরিচিত) সাহিত্যে সৃষ্টিশীলতা ছিলনা তা নয়। অন্তত উচ্চমানের প্রেমসঙ্গীত ও ভক্তিসঙ্গীত রচিত হয়েছিল। উত্তরভারতে কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন কবীর, দাদু, সুরদাস, তুলসীদাস, মীরাবাঈ। মিথিলায় এসেছিলেন অমর বৈষ্ণবসঙ্গীতের বিদ্যাপতি। বাঙলায় অনুরূপভাবে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস। এই যুগের একেবারে শেষ পর্বে—শাক্তগীতিকার রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত। মধ্যযুগের বাঙলা-সাহিত্য নানা ধরনের মঙ্গলকাব্যেও পূর্ণ—উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে আছেন: মুকুন্দরাম, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, কেতকাদাস, ভারতচন্দ্র। বিশেষ-বিশেষ দেবতার মহিমাপ্রচারে নিযুক্ত এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে মানবিক চরিত্র প্রচুর—মানবজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জ্বালা-যন্ত্রণা—সবকিছু নিয়ে তাদের অবস্থান। কাব্যে চৈতন্যজীবন লেখা হয়েছে, যাতে কেবল জীবনের ঘটনাবলী নয়, বিস্ময়কর দর্শনচিন্তারও সমাহার ঘটেছে; প্রথম ক্ষেত্রে বৃন্দাবনদাস, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখযোগ্য। আর রামায়ণ্ মহাভারতকে স্বাধীন অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাঙালীর গৃহকাব্য ক'রে তুলেছিলেন কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস।

তবু স্বীকার্য, এই যুগের সাহিত্য ঈশ্বরকেন্দ্রিক, ধর্মানুরক্ত এবং চরিত্রে নিয়তিবাদী। পরাজিত মানুষের হাহাকার তাদের মধ্যে যথেষ্ট দেখা যায়, কিন্তু মানুষের বিদ্রোহ বা সংগ্রামের চিত্রণ নেই, কিংবা যেখানে বিদ্রোহের কিছু লক্ষণ দেখা গেছে সেখানে পরিণতি ঘটেছে বিধ্বস্ত পরাজয়ে। ছাপাখানা ছিলনা, গদ্য নয়— উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক নয়—ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, কিংবা বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অনুপস্থিতির কথা বলাই বাহুল্য। ক্ষুদ্র বা দীর্ঘ কাব্যের জন্য প্রচলিত ছন্দ হলো একটানা পড়ে যাওয়ার পয়ার; বৈচিত্র্যের জন্য অল্পাধিক মাত্রাবৃত্ত।

আধুনিক যুগ সেখানে আনল ছাপাখানা, পত্র-পত্রিকা, নানা ধরনের গদ্যসাহিত্য, গল্প-উপন্যাস-নাটকসহ বিবিধ মনন সাহিত্য। মহাকাব্য এল এবং গীতিকাব্য। মানববাদ, যুক্তিবাদ, এবং জাতীয়তা হয়ে উঠল মতাদর্শের ভিত্তিভূমি।

॥ তিন ॥

সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে বিবেকানন্দের মনন ও রচনায় আধুনিকতার সন্ধান করতে গিয়ে ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদের অংশগুলিকে প্রথমে পরীক্ষা করা উচিত। পাশ্চাত্যে যেহেতু তিনি প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সার-রূপের সমর্থন করেছিলেন বেদান্তসত্যের ভিত্তিতে—তাই তাঁকে নিছক প্রাচীনের ধ্বজাধারী বলে প্রতিপন্ন করার সুপরিকল্পিত চেষ্টা বিশেষ-বিশেষ স্বার্থমহলে দেখা যায়। স্বল্প পরিচয়ের শক্তিতে বলীয়ান সেহেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা যায়। এখানে স্বামীজীর কিছু উক্তি স্মরণ করতে পারি:

"আমি দেখতে চাই নূতনকে। পুরাতন ধ্বংসাবশেষের চারদিকে অলসভাবে ঘুরে বেড়িয়ে কেবল পুরনো ইতিহাস আর অতীত মানুষদের কাহিনী সম্বন্ধে দীর্ঘশ্বাস!! রামঃ! ভ্রূক্ষেপও করিনা ওসব জিনিসে। আমার রক্তের যা জোর তাতে ওসব আমার চলেনা।...আমি প্রচণ্ড দারুণ র‍্যাডিক্যাল হয়ে পড়েছি। ভারতবর্ষে যাচ্ছি। ওই রক্ষণশীল থস্‌থসে জেলি-মাছের মতো বিরাট বিকট পিণ্ডটাকে নিয়ে কী করতে পারি দেখব। শুরু করব নূতনকে নিয়ে—সরল, সবল, সতেজ, সদ্যোজাত শিশুর মতোই যা সম্পূর্ণ নূতন।"[৪]

প্রকৃতির নিয়মের বাধ্য দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে তিনি বলেছেন:

"প্রকৃতির নিয়মের প্রতি আনুগত্যের নাম স্বাধীনতা—আমি তা একেবারেই স্বীকার করিনা। এ সব কথার অর্থ কী? মানবপ্রগতির ইতিহাস তো বলছে, প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করার দ্বারাই ঘটেছে প্রগতি।...আমাদের এই জীবন—মুক্তির এক প্রচণ্ড ঘোষণা। অপরপক্ষে নিয়মানুবর্তিতার বাড়াবাড়ি আমাদের জড়পদার্থে পরিণত ক'রে ফেলবে—কি সমাজে, কি ধর্মে, কি রাজনীতিতে। অত্যধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন।"[৫]

অন্যত্র:

"নিয়ম নয়—নিয়মভঙ্গের সামর্থ্যই আমরা চাই। আমরা হতে চাই নিয়মের শিকলছেঁড়ার দল।...আমরা নিয়মের রাজত্বের বাইরে আছি কি নেই, সেটা বড় কথা নয়—আসল কথা হলো আমরা নিয়মহারা হতে চাই—সেই চিন্তার ভিত্তিতেই গঠিত মানবজাতির গোটা ইতিহাস।"[৬]

মানবের অনন্ত মুক্তির ঘোষণা ক'রে স্বামীজী বলেছেন, কর্মবন্ধনই মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে শিকলে জড়িয়ে রাখে। সুতরাং,

"শৃঙ্খল ভেঙে ফেলো। মুক্ত হও। পদদলিত করো নিয়মকে। মানবস্বরূপে কোনো নিয়ম নেই—নেই দৈব, অদৃষ্ট। অনন্তে কি কোনো আইন থাকে? মুক্তি তার স্বরূপ, তার মূলমন্ত্র—মুক্তিতে তার জন্মগত অধিকার।"[৭]

তাই বিবেকানন্দ যখন প্রেমসঙ্গীতের সৌন্দর্য ও গরিমা স্বীকার করেন, এমনকি উৎসাহভরে বলেন, যে-মানুষ প্রেমসঙ্গীতের সমাদর করতে পারে না তার কানাকড়ি মূল্যও তাঁর কাছে নেই (যেমন সেই পারসিক সঙ্গীত, 'প্রিয়তমের মুখের একটি তিলের জন্য বিলিয়ে দিতে পারি সমরখন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য")—তখনো তিনি প্রসঙ্গ শেষ করেছেন অদ্বৈতে—অনন্তে। "সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান—যে-কোনো তত্ত্বের বিচারেই স্বামীজী প্রবৃত্ত হোন [নিবেদিতা লিখেছেন] সেটি-যে সেই চরম অনুভূতিরই একটি দৃষ্টান্তমাত্র, এই ধারণাটি তিনি আমাদের মধ্যে সর্বদাই বদ্ধমূল ক'রে দেবার চেষ্টা করতেন।...বন্ধন সম্বন্ধে তাঁর ছিল চরম ঘৃণা।"[৯]

বিবেকানন্দের মন্ত্রশব্দ ছিল—স্বাধীনতা এবং শক্তি, সাহস এবং গতিশীলতা। এই সকল ভাব তিনি তাঁর ইংরেজী ও বাংলা রচনায় প্রকাশ করেছেন।

॥ চার ॥

এখানে সর্বোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—ভারতীয় সাহিত্যে বীরভাবের প্রয়োজন সম্বন্ধে স্বামীজীর অবিরাম তাগিদ। এই প্রসঙ্গে পুরনো বাঙলা সাহিত্যের কঠিন সমালোচনা তিনি করেছেন। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের লেখকেরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গান গেয়ে-গেয়ে জাতটাকে একেবারে মেয়েলি ক'রে ফেলেছে—এই ছিল তাঁর বক্তব্য।—"এই বাঙলা দেশটায় চারশো বছর ধরে রাধাপ্রেম-প্রেম ক'রে কি দাঁড়িয়েছে দ্যাখো। এখানে পুরুষত্বের ভাব প্রায় লোপ পেয়েছে। লোকগুলো কেবল কাঁদতেই মজবুত। ভাষাতেই ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—তা চারশো বছর ধরে বাঙলা ভাষায় যা-কিছু লেখা হয়েছে সে-সব একই কান্নার সুর। প্যানপ্যানানি ছাড়া আর কিছুই নেই। একটা বীরত্বসূচক কবিতারও জন্ম দিতে পারেনি।"[১০] সংস্কৃত কাব্যকেও এখানে অব্যাহতি দেননি। রামায়ণ মহাভারতাদির পরবর্তী সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন: "আমাদের সামরিক সঙ্গীত বা সামরিক কবিতা কোনোটাই নেই। কেবল ভবভূতিকে কিছু পরিমাণে সমরপ্রিয় কবি বলা যেতে পারে।"[১১] সমকালীন বাঙলা সাহিত্য—স্বামীজী তার যে-অংশের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন, বিশেষত সন্ন্যাস-জীবনের পূর্বে—তাঁর কাছে ভিন্নতর ভরসা-চিত্র উপস্থিত করেনি। তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে বলেছেন: "ঐ যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়েমানুষের মতো বেশভূষা, নরম-নরম বুলি কাটেন, এঁকে-বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠি হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাঁসেন-হোঁসেন' করেন"—ইত্যাদি।[১২]

গৌরবময় ব্যতিক্রম তিনি এখানে পেয়েছিলেন মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে, স্বামীজীর ধারণায় যার মতো "দ্বিতীয় কাব্য বাঙলা ভাষাতে তো নেইই, সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।"[১৩] নূতনের শত্রুদের বিরুদ্ধে স্বামীজীর বিতৃষ্ণা ধিক্কারের ভাষায় ফেটে পড়েছে: "তোদের দেশে কেউ একটা-কিছু নূতন করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস।...যাই কিছু আগেকার মতো না হলো অমনি দেশের লোক তার পিছু লাগল। এই 'মেঘনাদবধ কাব্য'—যা তোদের বাঙলা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ

করতে কিনা 'ছুঁচোবধকাব্য' লেখা হলো!!...মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে-কাব্য লিখে গেছেন, তা সাধারণে কি বুঝবে?"[১৪]

বিবেকানন্দ দুর্বলতাকে সবচেয়ে বড় পাপ বলে মনে করতেন। রাবণকে—মহাপাপী বলে চিহ্নিত রাবণকে—তিনি সর্বোচ্চ মহিমায় প্রকাশিত দেখেছেন যখন রাবণ নিজের প্রিয়তম পুত্র যুবরাজ ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে দারুণ শোকে বিদ্ধ হয়েও, নিজ যন্ত্রণাকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ রেখে, সৈন্যদের আহ্বান করেছিলেন মরণপণ যুদ্ধে। 'বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা বিভীষণের' বিষয়ে স্বামীজীর সহানুভূতি ছিলনা, কিন্তু বিভীষণের কিছু দোষলাঘব হয়েছিল যখন তিনি রাবণের মৃত্যুর পরে রামচন্দ্রের সম্মুখীন রাণী মন্দোদরীর পরিচয় দিতে গিয়ে রামকে বলেছিলেন, "মহারাজ দেখুন, কে এসেছেন! সেই সিংহিনী এসেছেন, যাঁর সিংহ এবং শাবককে আপনি হনন করেছেন। তিনি আপনাকে চোখে চোখ রেখে দেখতে চান।" গোটা দৃশ্যটি স্বামীজী অদ্ভুত নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি ক'রে বলেছিলেন—সেখানে উপস্থিতদের অন্যতম ভগিনী নিবেদিতা অবিলম্বে তা এক পত্রে বর্ণনা করেন। সেই চিঠিতেই তিনি লেখেন: "নারীত্ব বিষয়ে কি বিরাট আদর্শ স্বামীজীর! আর কেউ, এমনকি শেক্সপীয়ার—বা অ্যান্টিগোন সৃষ্টির সময়ে ইসকাইলাস—কিংবা অ্যালসেসটিস রচনার সময়ে সফোক্লিসও—এমন প্রচণ্ড কল্পনানুভূতি সৃষ্টি করতে পারেন নি।"[১৫]

অন্য এক সময়ে নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন, স্বামীজীর বিশ্বস্ত শিষ্য সদানন্দ যখন রামায়ণের কথা বলেন তখন হনুমানই নায়ক; আর স্বামীজী বললে কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে যান রাবণ।[১৬]

দুর্বলতা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ঘৃণা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, বেপরোয়া ভঙ্গিতে একথাও বলেছেন, (যাকে অবশ্য তাঁর চূড়ান্ত বক্তব্য না ধরাই উচিত)—"বাল্যকালে মিল্টনের প্যারাডাইজ লস্ট পড়েছি। সেখানে একমাত্র ভালো লোক বলে যাঁকে শ্রদ্ধা করেছি তিনি হলেন শয়তান। যথার্থ সৎপুরুষ তিনি যিনি কখনো দুর্বল হন না, সবকিছুর সম্মুখীন হন অকুতোভয়ে, উন্মুখ থাকেন মরণ-খেলার জন্য।"[১৭]

সাহিত্যের ভাব-দর্শনের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের বিরাট দান—'মৃত্যুপূজা'। বাঙলার জীবন ও সাহিত্যে এই বস্তু দারুণ এবং নূতন—লেখকদের তা মৃত্যুসঙ্গীত রচনা করতে, এবং কর্মীদের সেই অমর মরণকে বরণ করতে, প্রণোদিত করেছিল। (একথা সত্য, করালী কালীর রূপচ্ছবি আছে শাক্তগীতিকায়—কিন্তু ভক্তির পত্রপুষ্পে ঢাকা পড়ে গিয়ে সেই ভয়ঙ্কর 'মধুর ভয়ঙ্কর' হয়ে গিয়েছে)। স্বীকার্য, বিবেকানন্দের পূর্বে বাঙালী কবিরা স্বাধীনতার গান গেয়েছেন (যথা, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বলো কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়"—রঙ্গলাল); বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অমর উপন্যাস আনন্দমঠে স্বাধীনতা অপহরণকারী অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে বীরোচিত সংগ্রামের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ আরও অগ্রসর—তাঁর ডাক একেবারে, সরাসরি। এখনি নেমে পড়ো—এখনি ঝাঁপিয়ে পড়ো। বিদ্রূপে বিঁধিয়েছেন তিনি সেইসব আত্মপ্রবঞ্চকদের, যারা কালী নামক মহামৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে এবং কালীকে, উভয়কেই ভুলিয়ে আত্মরক্ষা করতে চায়: "মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।" বিবেকানন্দ জেনেছেন, "সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখ-বনমালী তোমার মায়ার ছায়া।"[১৮]

বলেছেন, "আমি ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর বলে ভালবাসি; নৈরাশ্যকে নৈরাশ্য বলে ভালবাসি; দুঃখকে দুঃখ বলে ভালবাসি। সংগ্রাম করো—অবিরাম সংগ্রাম করো—প্রতি পদে পরাজয়—তবু সংগ্রাম করো। এই হলো আদর্শ—এ-ই আদর্শ।...উপাসনা করো মৃত্যুর।...তাই বলে মনে করো না, এ হলো কাপুরুষের মৃত্যুলালসা কিংবা দুর্বলের মৃত্যুস্বীকৃতি, কিংবা এর নাম আত্মহনন। না—এ হলো শক্তিমানের মৃত্যু-আবাহন, যিনি সবকিছুকে গভীরতম স্তরে সন্ধান ক'রেও জেনেছেন—অন্য কোনো উপায় নেই।"[১৯]

বিবেকানন্দের একাধিক কবিতায় এই ভাবটি অত্যন্ত জোরালো ভাবে ও ভাষায় প্রকাশিত। তাদের মধ্যে সুবিখ্যাত দুটি কবিতা—ইংরাজিতে 'কালী দ্য মাদার,' বাঙলায় 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'।

এই প্রসঙ্গের সঙ্গে যোগ ক'রে দেওয়া যায়—এদেশের জীবন ও সাহিত্যে নিত্য-ব্যক্ত নেতিবাচক ভাবধারার বিরুদ্ধে স্বামীজীর অবিরাম আক্রমণের কথা। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে যে-কথা তিনি বলেছেন, তার অনুরূপ কথা তাঁর বাণী ও রচনার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে: "Positive ideas দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প—সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করেছে, তার ভুল না দেখিয়ে ঐসব কেমন ক'রে ক্রমে-ক্রমে আরও ভালোরকমে করতে পারবে, তাই বলে দিতে হবে।...Physical, mental, spiritual—সকল ব্যাপারেই মানুষকে positive ideas দিতে হবে।" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন, "তোদের history, literature, mythology প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষকে কেবল ভয়ই দেখাচ্ছে—তুই নরকে যাবি, তোর আর উপায় নেই।...তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে।"[২০] স্বামীজী তাঁর 'উদ্বোধন' পত্রিকাকে নেতিবাদের বিরুদ্ধে ইতিবাদী সংগ্রামের বাণী-যন্ত্র করতে চেয়েছিলেন।

॥ পাঁচ ॥

ভারতীয় চিন্তার গণ্ডীবদ্ধতার বিরুদ্ধে ভাব-সংগ্রামের আর একটি দিক—স্বামীজীর সাহিত্যের বিস্তারচেতনা। "বিস্তারই জীবন, সংকোচনই মৃত্যু"—এই ছিল তাঁর আদর্শ। বহির্ভারত থেকে শিষ্য ও বন্ধুদের কাছে পাঠানো তাঁর পত্রাবলী—মূলে এবং অনুবাদে প্রকাশিত হয়ে যাবার পরে বহুসংখ্যক মানুষের কাছে গীতা-মর্যাদা পেয়ে গিয়েছিল—সেইসব পত্র পূর্ণ ছিল এই বিস্তার-চেতনায়। তা সাধারণের মনে এবং সাহিত্যে এনে দিয়েছিল দ্বার ভেঙে বেরিয়ে পড়ার বিপুল জীবনাবেগ। সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক বিনয় সরকার বিবেকানন্দ-দর্শনকে "সামাজিক গতিময়তার গীতাস্বরূপ" বলে চিহ্নিত করেছেন।[২১] পত্রগুলির বিস্ফোরক চরিত্র প্রকাশমাত্রে লক্ষ্য ক'রে মাদ্রাজের সাহেবী সংবাদপত্র মাদ্রাজ টাইমস ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৫ তারিখে *Among the Prophets* নামক সম্পাদকীয়তে লেখে: "There is no doubt that the Swami is a wonderfully powerful leader of thought...We have seen some of the Swami's most recent letters, and there is a fiery zeal in them from beginning to end." এর আগে একই পত্রিকায় ৯ নভেম্বর ১৮৯৪

তারিখে স্বামীজী কর্তৃক প্রেরিত মাদ্রাজ-অভিনন্দনের উত্তর প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, "As a literary production, it is undoubtedly striking." পত্রিকাটি প্রশংসা করেছিল, স্বামীজীর রচনার "exceeding beauty of Language" সম্বন্ধে। মাদ্রাজ টাইমসের ইংরেজ সম্পাদক স্বামীজীর পত্রকে সেন্ট পলের উদ্দীপক পত্রের সঙ্গে তুলনাও করেন: "সুমহান খ্রীস্টান প্রচারক [সেন্ট পল] দূর দেশ থেকে যে-সব পত্র পাঠিয়েছিলেন এবং পার্চমেন্টের উপর লেখা সেই পত্রগুলির উপরে করিন্থিয়ান, ইফিসিয়ান এবং গলাসিয়ানরা যেভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ত, ঠিক তেমনই শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গে সুমহান হিন্দু প্রচারকের প্রেরিত শব্দগুলিকে গ্রহণ করা হবে বলেই মনে হয়।...এমনকি আমরা এই আশাও প্রায় করতে পারি, করিন্থ বা ইফিসাসের নাগরিকরা সেন্ট পলের পত্রকে যে-ভাবে স্বাগত জানাত, মাদ্রাজের নাগরিকরা স্বামীজীর পত্রকে তারও বেশি অনুরাগের সঙ্গে আবাহন করবে।"

স্বামীজীর বিদ্যুন্ময় পত্রগুলি থেকে মাত্র দুটি অংশ উদ্ধৃত করব:

> "ওঠো ওঠো, মহাতরঙ্গ আসছে, Onward, Onward. মেয়েমদ্দ আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে—Onward, Onward. নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই—দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার—তাঁর মহান চরিত্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার।...হুঁশিয়ার—তিনি আসছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়, তাঁর ছেলেদের—গরীব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত—তাদের সেবার জন্য যে যে তৈয়ার হবে, তাদের ভিতর তিনি আসবেন—তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন।"
>
> "আমার ভিতরে যে আগুন জ্বলছে তা জ্বলে উঠুক তোমাদের মধ্যে—তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে মরতে পারো বীরের মতো। আমি তাই চাই। মানুষ একবারই মরে। আমার শিষ্যরা যেন কাপুরুষ না হয়।...ভাঙনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ো—তাকে ভরাট করো নিজের জীবন দিয়ে। তোমরা বেঁচে থাকতে দুনিয়াকে তলিয়ে যেতে দেবে?...আমরা সিদ্ধিলাভ করবই করব। শত-শত লোক সে-চেষ্টায় মরবে, শত-শত লোক আবার উঠবে। বিশ্বাস বিশ্বাস—সহানুভূতি। অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। এগিয়ে যাও, প্রভু আমাদের নেতা। কে পড়ল, ফিরে দেখো না। একজন পড়বে—তার জায়গা নেবে আর একজন।" [অনূদিত]

॥ ছয় ॥

মানুষ কেবল ধর্ম খেয়ে বেঁচে থাকেনা—বিবেকানন্দের এই নূতন বার্তা। শ্রীরামকৃষ্ণের অবিস্মরণীয় উক্তি: 'খালি পেটে ধর্ম হয়না।' এই বিষয়টি স্বামীজী তাঁর কথাবার্তা, বক্তৃতা ও বর্ণনাতে বারে বারে জোর দিয়ে বলেছেন। ভারতীয় প্রেক্ষিতে অভিনব এই জিনিস, বিশেষত তা যখন এসেছিল এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে। এর ফলে এই দেশের মনোজগতে নূতন মাত্রার সৃষ্টি হয়। স্বামীজী দেখাতে চেয়েছেন, ভারত অতীতে কেবল অধ্যাত্ম সংস্কৃতিতে নয়, ঐহিক সভ্যতাতেও ঐশ্বর্যশালী ছিল। সত্ত্বগুণের পূর্বে রজোগুণ বিকাশের

অবশ্য-প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি এমন জোরালোভাবে উপস্থিত করেছেন যে, বিনয় সরকারের মতো ইহবাদী সমাজবিজ্ঞানী তাঁকে একালের ভারতবর্ষে বস্তুবাদের প্রবর্তক বলে ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হননি। বিনয় সরকারের মতে, এমানুয়েল কান্ট যেমন পাশ্চাত্যে আধুনিক বস্তুবাদের জনক, বিবেকানন্দ তেমনি ভারতে আধুনিক বস্তুবাদের জনক।"[২২]

॥ সাত ॥

সমকালে প্রচলিত সমাজসংস্কারের দাবি-দাওয়ার পরিবর্তে গণ-উত্থানের জন্য বিবেকানন্দের প্রচারকে নব পথসন্ধান বলে গ্রহণ করা যায়। আংশিক নয়, তিনি চেয়েছেন আমূল পরিবর্তন, যাকে অন্য ভাষায় বিপ্লব বলা চলে। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ছিল, জনগণকে তাদের অপহৃত অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা অন্য সকল মানুষের সঙ্গে সমভূমিতে দাঁড়াতে পারে। এই ভূমিকায় স্বামীজী 'হিরেডিট্যারি ট্রানস্‌মিশন থিয়োরী'কে "চূড়ান্ত দানবিক ও বর্বর" বলে চিহ্নিত করেছিলেন।[২৩] শূদ্ররাজকে (অর্থাৎ প্রোলিটেরিয়েট-রাজকে) তিনি অবশ্যম্ভাবী বলে স্বাগত জানিয়েছেন, এবং নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলে ঘোষণা করেছেন (এই পদ্ধতির সম্ভাব্য ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন থেকেও)। এ সকলই তাঁর ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানমূলক রচনাদির মধ্যে পাওয়া যাবে, বিশেষত অনন্যসাধারণ গ্রন্থ 'বর্তমান ভারত'-এর মধ্যে। তাঁর পূর্বেই কিছু কিছু সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছিল, উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' গ্রন্থ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুস্পষ্ট আহ্বান জানান নি, এবং অপরিণত চিন্তার সৃষ্টি বলে নিজের 'সাম্য' গ্রন্থটি প্রত্যাহার করেছিলেন, যদিও কৃষকদের শোচনীয় দুর্গতি ও শোষণসংক্রান্ত রচনাগুলি রক্ষা করেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণে বিবেকানন্দ আরও স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, উদ্‌ঘাটন করেছিলেন এই ব্যবস্থার "রক্তশোষক যন্ত্রের" প্রকৃতি। বিরল অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে সভ্যতার গঠনে শ্রমশক্তির ভূমিকার রূপ নির্ণয় করেছেন। শ্রমিকদের "নীরব, অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগ্‌দাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পর্তুগাল, ফরাসি, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য।"[২৪] মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী বিনয়কুমার রায় বর্ণনা করেছেন, কিভাবে স্বাধীনতাপূর্বে স্বামীজীর আগ্নেয় বাণী ও রচনা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে নব ভাবনায় উদ্দীপিত করেছিল। তারপর তিনি এক বিশেষ ক্ষেত্রে স্বামীজীর ভূমিকার সঙ্গে ম্যাক্সিম গোর্কির ভূমিকার তুলনা করেছেন: "পৃথিবীর সাহিত্যে সেই প্রথম দেখা গেল, দীনাতিদীন মানুষ নায়ক হয়ে উঠল, কেননা সে পেয়েছিল গোর্কির মতো প্রতিভাধর স্রষ্টাকে, যিনি তাদের দুঃখ ও স্বপ্ন, সত্তার বিস্তার, মহত্ত্ব ও স্বাধীনতাস্পৃহা, সর্বোপরি শ্রমজীবনের সকলপ্রকার সৌন্দর্য ও বীর্য চিত্রণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিবেকানন্দও কি শ্রমজীবনের গৌরব ও সৌন্দর্যের সঙ্গীত করেন নি? তাঁরও কি স্বদেশের চরম দরিদ্র মানুষদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলনা— যেমন ছিল গোর্কির— অনুরূপ ধরনের স্বদেশীয় মানুষদের সঙ্গে?"[২৫]

বিবেকানন্দের সাহিত্যের এই বিশেষ ভূমিকা বুঝতে হলে তাঁর সুপরিচিত নানা রচনাংশ

উদ্ধৃত করা প্রয়োজন, কিন্তু সে প্রলোভন দমন করব। স্বতঃই এখানে 'নূতন ভারত বেরুক লাঙল ধরে' ইত্যাদি অংশের কথা মনে আসবে।

॥ আট ॥

ভারতের সবচেয়ে ঘৃণ্য সামাজিক প্রথা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ-সাহিত্যে পুনঃপুনঃ ঘোষিত সংগ্রামের কথা এখানে স্মরণ করতেই হবে। তাঁর কালে তাঁর মতো প্রচণ্ড ভাষায় আর কেউ এই জঘন্য প্রথার মুক্ত সমালোচনা করেছেন কিনা সন্দেহে—কেউ ক'রে থাকলেও তার প্রভাব বিস্তৃত হয়নি, যেমন হয়েছিল স্বামীজীর ক্ষেত্রে। মহাত্মা গান্ধীকে এক্ষেত্রে তিনি প্রভাবিত করেছেন (গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ অনুগামী বিনোবা ভাবে ও অন্যান্যরা তা স্বীকার করেছেন); তাঁর চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন বহুসংখ্যক বিশিষ্ট লেখক।

॥ নয় ॥

আধুনিকতা যেমন একদিকে "চরম আকারে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়," তেমনি অন্যদিকে "দূর অতীত থেকে প্রেরণা সংগ্রহেও আকাঙ্ক্ষী"। বলা বাহুল্য দ্বিতীয় বাসনায় তা অতীতের নব ব্যাখ্যায় নিয়োজিত, যা প্রগতির গতিবৃদ্ধি করবে বলেই আধুনিকদের বিশ্বাস। বিবেকানন্দের মতে, বেদান্তেই নিহিত আছে সর্বোচ্চ সত্য। যুগের আচার্য হিসাবে তাঁর দায়িত্ব ছিল দেখিয়ে দেওয়া—বেদান্ত কেবল আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান করবে তাই নয়, ঐহিক প্রয়োজন পূরণের নীতিনির্দেশও করবে। বিবেকানন্দের সাম্যবাদ সেই কারণে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল নয়। ধর্মব্রতী মানুষদের কাছে তাঁর প্রশ্ন: বেদান্ত যদি আত্মার অভেদত্বে বিশ্বাস করে তাহলে কোনো বেদান্তী কিভাবে বস্তুজগতে বিশেষ অধিকারে বিশ্বাসী হয়? অরণ্যনিহিত বেদান্তসত্যকে তিনি দৈনন্দিন সংসারের প্রয়োজনে নিয়োগ করতে চেয়েছেন। এখানেই তাঁর 'ব্যবহারিক বেদান্তের' সুবিখ্যাত বার্তার কথা এসে যায়। 'বেদান্ত ও অধিকার' নামক এক আলোকবর্ষী বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, "বিশেষ অধিকারের ধারণা মনুষ্যজীবনের কলঙ্ক। দুটি শক্তি যেন নিয়ত সক্রিয়। তার একটি বর্ণ ও জাতিভেদ সৃষ্টি করছে, অপরটি তা ভাঙছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, একটি শক্তি বিশেষ অধিকার সৃষ্টি করছে, অন্যটি তা ভাঙছে। আর যখনই এই বিশেষ অধিকারকে ভাঙা হয়েছে তখনই যে-জাতির মধ্যে তা ঘটেছে সেখানে এসেছে আলোক ও প্রগতি।" স্বামীজী বিশেষাধিকারের শ্রেণীভাগও করেছিলেন। প্রথমে আসে দুর্বলের উপর সবলের বিশেষ অধিকারের পাশব ধারণা। দ্বিতীয়ত আসে ধনীর বিশেষ অধিকারের কথা। তৃতীয়ত, সূক্ষ্ম অথচ প্রচণ্ড শক্তিশালী বুদ্ধির বিশেষ অধিকার। শেষত আসে, সর্বনিকৃষ্ট কেননা সর্বাপেক্ষা উৎপীড়ক—আধ্যাত্মিক বিশেষাধিকার দাবি। শেষোক্ত বিষয়ে তিনি most tyrannical শব্দ দুটি ব্যবহার করেছিলেন। স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "কেউই বৈদান্তিক হতে পারবে না, যদি সে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক বিশেষাধিকারকে সমর্থন করে। না, কারো জন্য কোনো

বিশেষ অধিকার নয়।"[২৬] এই সঙ্গে পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের মধ্যে পার্থক্যের প্রসঙ্গ এনেছেন। উভয়ের পার্থক্যের ছুতো ক'রে যাঁরা সামাজিক বিশেষ অধিকারকে সমর্থন করেন, তাঁদের কঠোরতম সমালোচনা স্বামীজী করেছেন।

॥ দশ ॥

ইংরেজ আসার পূর্বে ভারতবর্ষে কি জাতীয়তার কোনো ধারণা ছিল? প্রশ্নটা প্রায়ই তোলেন শিক্ষিত ভারতবাসীরা। ব্রিটিশ শাসকরা সে প্রশ্ন তুলে বলবেনই তো—না, কদাপি তা ছিলনা; ও-বস্তু আমাদের প্রশাসনযন্ত্র, বিচারব্যবস্থা, যোগাযোগব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থার দান; আমরাই তো বহুভাষী, বহুধর্মী, বহু সংস্কৃতির অধিকারী, নিয়ত বিবাদ-বিসম্বাদযুক্ত ভারত নামক উপ-মহাদেশকে 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি', ইত্যাদি। তাঁরা তৃপ্তমনে দেখেছেন, তাঁদের কথার প্রতিধ্বনি সানন্দে করেছেন অনুগত ভারতবাসীরা। "স্বামীজীর সুদৃঢ় বিচারশীল মনে [নিবেদিতা লিখেছেন] দুই পয়সার পোস্টেজ, সস্তার ভ্রমণ, এবং কাজ চলার জন্য একটা সাধারণ ভাষা, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে—এই কথাটা খুবই অকিঞ্চিৎকর ছেলেমানুষি বলে মনে হয়েছিল।"[২৭] বিবেকানন্দ মূলগত ঐক্যের সন্ধানী। ভারতের ধর্মীয় উদারতার মধ্যে তিনি এমন শক্তির প্রকাশ দেখেছিলেন যা অপর ধর্মমতসমূহের তাত্ত্বিক আক্রমণের সম্মুখীন হতে সমর্থ। এ ছাড়াও ভারতে ছিল "অখণ্ড ভূমির বিরাট ব্যাপারটি," প্রাচীন সভ্যতার পটভূমিকা, এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনের অনিবার্য প্রভাব, যা অবশ্যই এগিয়ে দেবে...সমষ্টি প্রেমে, সমষ্টি ঘৃণায়।"[২৮] বিবেকানন্দ যে, ভারতীয় জাতীয়তার সুমহান ঋষি ও প্রচারক, তা সকল শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতাই স্বীকার করেছেন, তাঁদের মধ্যে তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল, অ্যানী বেশান্ত, গান্ধী, জওহরলাল প্রভৃতিরা আছেন—সুভাষচন্দ্রের কথা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় পটভূমিকায় জাতীয়তা অবশ্যই আধুনিকতার একটা বড় দিক। বিবেকানন্দ একদিকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন, বাহ্যত নানা ভাগে বিভক্ত ভারতীয় জনগণের মধ্যে কোন্ অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্র বর্তমান, অন্যদিকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন শাসকদের ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ—এবং চিহ্নিত করেছেন, কোন্ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। নিবেদিতাকে তিনি বলেছিলেন, "জাতি হিসাবে সংগঠিত হয়ে উঠতে হলে সাধারণ ভালবাসার মতো সাধারণ ঘৃণার প্রয়োজন আছে।"[২৯] সেকালের প্রধান সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকা 'ইংলিশম্যান' দেখেছিল, স্বামীজীর এই উক্তির মধ্যে বিপ্লবী পত্রিকা যুগান্তরের মূল ভাবধর্ম নিহিত আছে; সেকথা সে লিখেছিলও তীক্ষ্ণ এক সম্পাদকীয়তে। দেশপ্রেম বিবেকানন্দের আগেও এদেশে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু স্বামীজীর অনুরূপ জ্বালাময় তীব্রতা এবং অবিলম্বে আত্মোৎসর্গের তীব্র আহ্বান নিয়ে তা আসেনি। তার ফলে দেশে এলো অভূতপূর্ব এক চেতনা। "ভারতের ভাবনা তাঁর কাছে শ্বাসবায়ুর মতো।...জন্মপ্রেমিক তিনি—তাঁর আরাধ্যা দেবী তাঁর মাতৃভূমি।"[৩০] চিরযৌবনের প্রতীক বিবেকানন্দ এই বিশ্বাস না ক'রে পারেন নি যে, "এদেশ নবীন, বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় সে এমন এক বিরাট বিকাশের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত যার তুল্য কিছু সে অতীতে জানেনি।...এক শান্ত সুগভীর মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন, 'আমি দেখছি, তারুণ্যে ভরা এই দেশ'।"[৩১]

॥ এগারো ॥

জাতীয়তার এই মহান স্রষ্টা আবার পুরোপুরি আন্তর্জাতিক। সমকালের তুচ্ছ সংস্কারের গণ্ডী কাটিয়ে তিনি সমুদ্রপারে গিয়েছিলেন, যেজন্য রক্ষণশীলদের চেঁচামেচির শেষ ছিলনা; চেষ্টা চলেছিল তাঁকে জাতিচ্যুত করার। সে চেষ্টাকে তিনি ফুঃ ক'রে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। (একই কালে স্বামীজীর সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকা ১-৫-১৮৯৪ তারিখে লিখেছিল: "কয়েক মাস আগে স্বামীজী যখন বোম্বাইয়ে স্টিমারের ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, তখন তিনি কালাপানির পারে যাওয়ার বিরুদ্ধে যে-কুসংস্কার আছে তার মাথা থেঁতলে দিয়েছিলেন।...এই ঘটনার বিপুল তাৎপর্য কেবল এখনকার অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন পর্যবেক্ষকদের কাছেই ধরা পড়বে। এবং তা উদ্‌ঘাটিত হতে থাকবে ভবিষ্যতে বহু যুগ ধরে")। অহঙ্কৃত ও আত্মতৃপ্ত পাশ্চাত্যে পরাধীন ভারতের গৌরবময় অস্তিত্বের বোধ তিনি এনে দিতে পেরেছিলেন; এবং সমভূমিতে দাঁড়িয়ে পারস্পরিক বিনিময়ের দ্বারা যে সত্যকার আন্তর্জাতিকতা সৃষ্ট হতে পারে, তার ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। বিদেশের কাছে তিনি কুণ্ঠিত ক্ষমাপ্রার্থী ছিলেন না; বিদেশের হাটে স্বদেশের দোষ বিক্রির ব্যবসায়ে যাননি, আত্মনিন্দার বিনিময়ে বিদেশীর মুরুব্বি-হাতের পিঠচাপড়ানি খাওয়ার গদ্‌গদ সুখও তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিলনা। তাঁর কাছে সব মানুষ সমান, বিদেশী বা স্বদেশী। সব মানুষই বৈচিত্র্যে, জটিলতায়, নীচতায়, মহত্ত্বে, অভাবে ও গৌরবে ভরা। মানুষকে বিচার করতে হবে তার ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিকাতে রেখেই। এই সমদৃষ্টি অনবদ্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর বিখ্যাত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে। উনিশ শতকের শেষের দিকে পরাধীন ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিকতা যখন দূর অস্ত্, তখনই তিনি বলেছিলেন, "রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা কুড়ি বছর আগেও জাতীয় সীমায় আবদ্ধ ছিল তাদের সমাধান এখন আর কেবল জাতীয় ভূমিতে দাঁড়িয়ে করা সম্ভব হবেনা।...আন্তর্জাতিক বিশ্বের বৃহত্তর আলোকে দর্শন করলেই তবে তাদের মীমাংসা করা যাবে। আন্তর্জাতিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক সমবায়, আন্তর্জাতিক আইন—এই হলো একালের দাবি।" পুনশ্চ: "সমগ্র জগৎকে সঙ্গে নিয়ে না গেলে কোনো সত্যকার প্রগতি সম্ভব নয়। প্রতিদিন এই কথা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে—কেবল দেশীয় বা জাতিগত ভিত্তিতে কোনো সমস্যার মোকাবিলা কদাপি করা যাবেনা। প্রতিটি ভাব যে-পর্যন্ত-না সমগ্র বিশ্বকে ছেয়ে ফেলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিস্তারিত ক'রে যেতে হবে—প্রতিটি অভীপ্সাকে বাড়িয়ে চলতে হবে যাতে সমগ্র মানবজাতিকে গ্রাস ক'রে ফেলে।"

কঠিন তাঁর সতর্কবাণী: "আমি এই দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত, কোনো ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বাস করতে পারেনা। আত্মগৌরবের ভ্রান্ত ধারণায়, কিংবা ভ্রান্ত নীতির অনুসরণে, কিংবা ভ্রান্ত পবিত্রতাবোধে, যখনই সে-ধরনের চেষ্টা করা হয়েছে তখন সেই জাতির ক্ষেত্রে ঘটেছে অনিবার্য সর্বনাশ।"

॥ বারো ॥

সাহিত্যের (এবং ইতিহাস ও সমাজদর্শনের) ঘনিষ্ঠ অনুশীলনকারী বিবেকানন্দ নিজ রচনার ভাব ও রীতিতে নবপ্রবাহ আনবার সচেতন চেষ্টা ক'রে গেছেন। বাঙলার তৎকালীন "পচা নবেল নাটক" সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব প্রসন্ন ছিলনা।—তোদের সাহিত্যের মধ্যে কোথায় আছে ইতিহাস, দর্শন বা বৈজ্ঞানিক রচনা?—তিনি এক শিষ্যকে প্রশ্ন করেন। নিজের ভাবে স্বল্প সময়ে তিনি এই অভাব বাঙলা লেখায় পূরণ করার চেষ্টা করেন। বাঙলা সাহিত্যের একটা ত্রুটির দিক তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন—অতিরিক্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহারের জন্য ভাষায় প্রবহমাণতা থাকেনা। "এখনকার বাঙলা-লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশি verbs use করে; তাতে ভাষার জোর হয়না।" কারণ হিসাবে বলেছেন, অতিরিক্ত ক্রিয়ার ব্যবহারে বারবার বিরতি ঘটে, সেটা "ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মতো দুর্বলতার চিহ্ন। ঐরূপ করলে মনে হয় যেন ভাষার দম নেই।"[৩২] তাঁর মতে, বিশেষণ দিয়ে ক্রিয়ার কাজ খানিকটা চালিয়ে নিলে ওই দোষ কিছুটা কাটানো সম্ভব। সে-কাজ তিনি স্বয়ং করবার চেষ্টা করেছেন 'জ্ঞানার্জন', 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' ইত্যাদি প্রবন্ধে এবং গবেষণা-নিবন্ধ 'বর্তমান ভারত'-এ। সংস্কৃতে পণ্ডিত তিনি, ধ্রুপদী সাহিত্যে গভীর নিমগ্ন, দার্শনিক পদ্ধতিতে অভ্যস্ত—সাধু বাঙলায় ঈপ্সিত নবরীতির রচনা শুরু করলেন। সে-বস্তু তাঁর স্বগোষ্ঠীর অনেকের কাছেও "কটমট বাংলা" ঠেকল। কিন্তু তিনি যা করেছেন—সবই সচেতনভাবে। এই শিক্ষণীয় কথাটা বলেছিলেন যে, "সকল জিনিসের মতো ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে।" তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, "ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল [কিছু] প্রচার করতে হবে।" প্রতিরোধ আসবে তিনি জানতেন। "সাহিত্যসেবিগণ হয়ত তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাঙলা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করব।" "আহার, চলচলন ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতেই হবে,...নতুবা অদূরে মৃত্যুর ছায়াতে অচিরে এ-দেশ ও জাতিটা মিশে যাবে।"[৩৩]

॥ তেরো ॥

স্বামীজীর চিন্তা ও কার্যে কিন্তু কিছু অসঙ্গতি থেকে গিয়েছিল। তাঁর নবধারার প্রবন্ধাদি সাধু বাঙলাতেই লেখা হয়েছিল, সাহিত্যের উত্তম নিদর্শন সেগুলি— ভাব ও ভাষার গাঢ় সংহতি, ছন্দধ্বনি এবং গতিময়তার কারণে শক্তিমান স্রষ্টার মুদ্রণচিহ্ন তার সর্বাঙ্গে—কিন্তু তারা বাঙলা সাহিত্যের প্রগতিশীল ধারাবাহী নয়, এবং তা তাঁর অন্যত্র-ব্যক্ত ভাবধারার বিরোধী। দুরূহ সংস্কৃতের আবরণবদ্ধ জ্ঞানরাশিকে যিনি সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণের অভিলাষী—সেই তিনিই এখন কঠিন সংস্কৃতানুসারী বাঙলায় লিখছেন!! অনেকদিন ধরেই স্বামীজী সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যাদিতে অলঙ্কারবাহুল্যের সমালোচক। মধ্যযুগে ভারতবর্ষ কৃত্রিম আলঙ্কারিক কলাকৌশলের অনুকরণে আত্মসম্মোহিত ছিল, তখন না-ছিল রীতিসুষমার ভাবনা, না কল্পনার মহিমা,[৩৪]—তাদের বিরুদ্ধে অব্যাহত আক্রমণ তাঁর। উক্তযুগের জটিল পাকে পাকে

দিশাহারা সংস্কৃতের বদলে তিনি ভাব ও রীতির ক্ষেত্রে পূর্বতন উপনিষদকে পছন্দ করেছেন, সগৌরবে বলেছেন, "...উপনিষদের সেই অপূর্ব কাব্যত্ব, বিরাটের চিত্রণ, সুমহান কল্পনা!... ভাষা এবং ভাব—সবকিছুই সরাসরি এসে তরবারি ফলকের মতো আঘাত করে।...অর্থ বুঝতে ভুল হবার সম্ভাবনা নেই;...বেশিরকম রূপক নেই, বিশেষণের পর বিশেষণ জমানোর খেলা নেই! ...এ যদি মানবপ্রণীত হয় তবে বুঝতে হবে, এ সাহিত্য এমন এক জাতির সৃষ্টি যে-জাতি তার তেজ-বীর্য এক বিন্দু হারায়নি।"[৩৫] তেজ ও বীর্যই তো বিবেকানন্দ চাইতেন।

বিবেকানন্দ মহান আচার্যগণের ভাষার সরল প্রত্যক্ষতার সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। "তাঁরা যখন কথা বলেন তখন প্রতিটি শব্দ সোজা আসে, বোমার মতো ফেটে পড়ে।"[৩৬] এক্ষেত্রে তিনি গীতা, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র, শঙ্করাচার্যের সংস্কৃত ভাষার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আচার্যদের ভাষার এই সহজতা পুরোহিতদের পছন্দ নয়, কেননা এর মধ্যে "দু'হাজার স্বর্গ এবং দু' হাজার নরকের" ব্যাখ্যানা নেই।"[৩৭]

না, বর্তমান কালের জন্য প্রাচীন আচার্যদের অজটিল সংস্কৃতের সুপারিশও তিনি করেন নি, তিনি বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের মুখের ভাষার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের ভাষা-নীতি বিষয়ে বলেছেন: "বুদ্ধের শিক্ষাদানের কালে সংস্কৃত আর ভারতের কথ্যভাষা ছিলনা। পণ্ডিতদের গ্রন্থেই তা ছিল আবদ্ধ। বুদ্ধের কোনো-কোনো ব্রাহ্মণ-শিষ্য বুদ্ধের শিক্ষাকে সংস্কৃতে ভাষান্তরিত করতে চান। তাঁদের বুদ্ধদেব স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'আমি এসেছি দরিদ্রদের জন্য—এসেছি জনগণের জন্য—জনগণের ভাষাতেই কথা বলব আমি।' তাঁর উপদেশের বড়ো অংশ ভারতের সে-কালের জনগণের কথ্যভাষাতেই মেলে।"[৩৮]

বিবেকানন্দের অপর আদর্শ তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের ভাষার আদলে নিজের ভাষা তৈরি করতে ইচ্ছুক তিনি—জটিলতার রহস্যকে নয়, সরলতার শক্তিকেই ভাষার ক্ষেত্রে বরণ করতে চেয়েছিলেন। "আমার আচার্যের [রামকৃষ্ণের] ভাষাই আমার আদর্শ। তা একেবারে চলিত, আবার চূড়ান্ত ভাবপ্রকাশে সমর্থ"—স্বামীজী বলেছিলেন। অন্যত্র: "বাঙলা ভাষাকে সংস্কৃতের আদলে নয়, পালির আদলে গড়তে হবে।" তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দের যথাসম্ভব সাহায্য নিতে হবে—তাও স্বীকার করেছেন।

পাশ্চাত্যে থাকাকালে বিবেকানন্দ ভাষা ও রীতি ব্যাপারে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে গেছেন। সফল হয়েছিলেন। সে সাফল্যের ফলে ভারতের মূল চিন্তাসম্পদ উন্মোচিত হয়ে গেল সাধারণ ইংরেজীজানা মানুষের কাছেও। সেই মহাকীর্তির চরিত্র, তাঁর নিজের ভাষাতে এই:

> **"হিন্দু ভাবগুলিকে ইংরাজি ভাষায় রূপ দেওয়া, শুষ্ক দর্শন, জটিল পুরাণ, বিচিত্র চমকপ্রদ মনোবিজ্ঞানের ভিতর থেকে এমন এক ধর্ম বের ক'রে আনা, যা একদিকে সহজ সরল এবং জনগণের হৃদয়গ্রাহী হবে, অন্যদিকে সর্বোচ্চ মনীষীদের প্রয়োজন পূরণ করবে—এ কাজ করার চেষ্টা যিনি করেছেন তিনিই বলতে পারবেন কী কঠিন কাণ্ড! বিমূর্ত অদ্বৈততত্ত্বকে করতে হবে প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী সজীব ও কাব্যময়; অসম্ভবরকম জটিল পৌরাণিক তত্ত্বের ভিতর থেকে বের ক'রে আনতে হবে সুনির্দিষ্ট নৈতিক আদর্শের রূপ; বিভ্রান্তিকর যোগশাস্ত্র থেকে উদ্ধার ক'রে আনতে হবে অতীব বৈজ্ঞানিক এবং কার্যকর মনস্তত্ত্ব—আর সবকিছুকে এমন চেহারা দিতে হবে যা শিশুরও আয়ত্তগম্য। এই কর্ম আমার জীবনব্রত।"[৩৯]**

এই সমস্ত ভাব ও আদর্শের কথা বলার পরেও বিবেকানন্দ বাঙলা লেখার সময়ে এমন এক রীতি গ্রহণ করলেন, যা নিঃসন্দেহে দৃঢ় ও শক্তিশালী, কিন্তু কোনোমতে বলা যাবেনা তা সহজ ও সাবলীল। সে ভাষা চলিত নয়, তাঁর কথিত আদর্শের আনুগত্য নেই তাতে। একথা সত্য, উক্ত রীতির জন্য তিনি কেবল দুরূহতার নিন্দা শোনেন নি, ভাষায় ধ্রুপদী মহিমাসৃষ্টির প্রশংসাও পেয়েছিলেন—এবং তা এসেছিল নির্মম সমালোচক, 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির কলম থেকে। সাহিত্য পত্রিকায় বাঙলা ১৩০৬ বৈশাখ সংখ্যায় তিনি লেখেন, "আমরা আর কখনও বিবেকানন্দ-স্বামীর বাঙলা রচনা দেখি নাই। শুনিলাম ইহা [উদ্বোধনের 'প্রস্তাবনা'] তাঁহার প্রথম রচনা। স্বামীজীর ওজস্বিনী ভাষার নূতন ভঙ্গি ও লীলাগতি দেখিয়া মনে হয়—সত্যই প্রতিভা সর্বতোমুখী।" একই পত্রিকায় সমাজপতি অন্য একবার (জ্যৈষ্ঠ ১৩১২) স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত' রচনার ভাষাকাঠিন্যের বিরুদ্ধে সমালোচকদের নিন্দার সূত্রে দুঃখ ক'রে লিখেছেন, "গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই 'বর্তমান ভারত'-এর আলোচ্য বিষয়। ইহার ভাষা কেমন করিয়া আদি বা করুণরস-সংঘটিত নভেল-নাটকাদির তুল্য হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে এখন যথার্থ রসজ্ঞ লোকের একান্ত অভাব। গভীর চিন্তাপ্রসূত বিজ্ঞানেতিহাসদর্শনাদির অথবা আদি ও করুণ ভিন্ন বীর-রসাদির লেখক ও পাঠক অতীব বিরল।" এক্ষেত্রে গৌরবময় ব্যতিক্রম বিবেকানন্দের ভাষা সম্বন্ধে সমাজপতির মন্তব্য: "বঙ্গভাষা যে অত অল্পায়তনে অত অধিক ভাবরাশি প্রকাশে সমর্থ, ইহা আমরা পূর্বে কোথাও দেখি নাই। পদলালিত্যও অনেক স্থানে বিশেষ বিকশিত। অনাবশ্যকীয় শব্দনিচয়ের এতই অভাব যে, বোধহয় যেন লেখক যেন প্রত্যেক শব্দের ভাব পরিমাণ করিয়া আবশ্যকমতো প্রয়োগ করিয়াছেন।"[৪০]

উত্তম, অতীব উত্তম। স্বাদু ও তৃপ্তিকর। কিন্তু স্বামীজী সন্তুষ্ট হলেন না। নিজের কথা ও কাজের মধ্যে ব্যবধান তাঁর বিবেকে খোঁচা দিচ্ছিল নিশ্চয়ই। কোথায় গেল বুদ্ধ রামকৃষ্ণের ভাষা?—জনগণের ভাষায় জনগণের কাছে জ্ঞানবস্তু উপস্থিত করার সাধু বাসনা? না, আর আত্মখণ্ডন নয়—স্বামীজী স্থির করলেন। অতঃপর তিনি কেবল চলিত বাঙলাতেই লিখবেন।

॥ চৌদ্দ ॥

বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে—অন্তত বাঙলা গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে। বিবেকানন্দের আগেই কিন্তু বাঙলা গদ্য যথেষ্ট পরিণতি পেয়েছে। বিদ্যাসাগরের সুষম শব্দধ্বনিত শিষ্ট গদ্য দিয়ে সাহিত্যিক গদ্যের যাত্রাসূচনা। তা অনুসৃত ও নবশক্তিতে বলীয়ান হয়েছে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের বিপুল সৃষ্টিপ্রতিভায়; তার নানা সম্ভাবনার পথ মুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনার বিরল কাব্যিক অনুভূতি ও অপূর্ব আলঙ্কারিকতার ঐশ্বর্যে। কিন্তু এঁরা সবকিছুই করেছিলেন সাধু বাঙলায়—চলিত বাঙলার সঙ্গে ব্যবধান থেকে গিয়েছিলই। বিদ্রোহ ঘটেনি তা নয়; কালীপ্রসন্ন সিংহের সামাজিক ব্যঙ্গ 'হুতোম প্যাঁচার নকশার' কথা স্মরণ করতে হয়—উত্তর কলকাতার তেজালো চড়া কথ্যবুলিতে সে-রচনা প্রাণবন্ত। ব্যঙ্গ-নকশার পক্ষে তা ভালো ভাষা নিঃসন্দেহে, তাতে ছুরির ধার, এবং অশালীনতা, এমনকি অশ্লীলতার মশলাগন্ধ—কিন্তু যাকে বলা যায় সব ধরনের সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী শিষ্ট চলিত ভাষা—এ-ভাষা তেমন নয়।

স্মর্তব্য, বিবেকানন্দের আগেই রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণকথা লিখেছেন চলিত ভাষায়—'ইউরোপ যাত্রীর পত্র'। প্রথমে তা ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, পরে গ্রন্থাকারে (১৮৮১)। অতি স্বচ্ছন্দ এই লেখা, চমৎকার সকৌতুক লেখ-চিত্র এতে আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই রীতি ব্যক্তিগত আলাপচারির ভঙ্গির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তাঁর পরিবারের লোকজনও এর যথেষ্ট তারিফ করেন নি; রবীন্দ্রনাথও ঐকালে মনে করেছিলেন, চিঠিপত্র বা ডায়েরি ধরনের লেখার ক্ষেত্রে এই ভাষা উপযোগী, কোনো গভীররসাত্মক বা চিন্তামূলক লেখার ক্ষেত্রে নয়। বহু বৎসর পরে তাঁর ধারণার বদল হয়—অন্তত তাঁর রচিত সাহিত্যের প্রমাণে তা বলতে পারি। বিবেকানন্দ কিন্তু চলিত ভাষায় লেখা শুরু করেই সর্বপ্রকার সাহিত্যে তার ব্যবহারের পক্ষে জোরালো সমর্থন জানালেন।

স্বামীজী ওই দায়ভার কী ঐকান্তিকতার সঙ্গে তুলে নিয়েছিলেন, এবং তার ফলভোগ করতে কতখানি প্রস্তুত ছিলেন, নিবেদিতার চিঠিতে সে-বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাই:

> "রাজা [স্বামীজী] তাঁর বাংলা পত্রিকার [উদ্বোধনের] জন্য ঘাড় গুঁজে দাসের মতো খাটছেন ক্যাবিনে বসে। ...বাংলা পত্রিকাটি তাঁর কাছে কী যে আশীর্বাদের মতো হয়েছে, তা তোমাকে জানানো দরকার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এর জন্য এক দীর্ঘ পত্র ['বিলাতযাত্রীর পত্র', যার পরিবর্তিত নাম 'পরিব্রাজক'] রচনা ক'রে চলেছেন। মজাদার রসিকতায় তা পূর্ণ। সেইসঙ্গে টিপ্পনী, মন্তব্য ও আর্ত ভবিষ্যৎবাণী। বিদেশীয়ানা, ব্রাহ্মপদ্ধতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে জ্বলন্ত রোষ, জনগণ সম্বন্ধে নিবিড় আশা ও ভালবাসা, গুরুর প্রতি দীপ্ত ভক্তি, চারপাশের জীবন সম্বন্ধে ব্যাপক সন্ধানী দৃষ্টি—সর্বোপরি বাঙলা ভাষার উপরে কিছু ইচ্ছাকৃত উৎপীড়ন, যার জন্য তাঁর লেখা বোঝা কিছু দুরূহ হয়ে উঠেছে [নিবেদিতা সাধু বাঙলা অল্প বুঝতে পারতেন, কিন্তু কক্‌নি পুরো আয়ত্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা]—যেমন ছিল কার্লাইলের প্রথম আবির্ভাবকালের রচনা, যা সৃষ্ট হয়েছিল দারুণ কোনো লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে।""[১]

"বাঙলা ভাষার উপরে ইচ্ছাকৃত উৎপীড়নযুক্ত" বিবেকানন্দের চলিত গদ্যের রচনাসমূহ—পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ভাববার কথা (ব্যঙ্গ-নকশার সমষ্টি)—উদ্বোধনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে মহা হৈ-চৈ বাধিয়েছিল। অনুরাগীরা তাতে বিচলিত এবং সমালোচকরা উল্লসিত, কেননা শেষোক্ত ব্যক্তিরা বিষাক্ত আক্রমণের দারুণ সুযোগ পেয়ে গেলেন। ওই নব সন্ন্যাসীটি ইতিমধ্যে কথাবার্তা ও কার্যকলাপের দ্বারা রক্ষণশীলদের কাছে অবাঞ্ছিত অসহ্য চরিত্র হয়ে উঠেছেন। কী দুঃসাহস লোকটার—ধর্ম ও সমাজকে দূষিত করার কাজের সঙ্গে এখন আবার সাহিত্যের সাধু চরিত্র নষ্ট করতে উঠে-পড়ে লেগেছে!! 'পূর্ণিমা' ইত্যাদি সাময়িক পত্রে তাঁকে কদর্য ভাষায় নিন্দা করা হলো, 'ছ্যাবলামি' ত্যাগ করার উপদেশও পেলেন। তাঁর অনুরাগী সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বিব্রত হয়ে লিখলেন, স্বামীজী "অসংযত চলিত ভাষা" ব্যবহার করছেন। "লেখক স্বামী বিবেকানন্দ [সমাজপতি আরও বলেছেন] জ্ঞানের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া এই সন্দর্ভে বিবিধ রত্ন ঢালিয়া দিতেছেন। ...স্বামীজী ইচ্ছা করিয়া রচনাটিকে গ্রাম্য ভাষার পরিচ্ছদ দিয়াছেন। চলিত গ্রাম্য ভাষা নহিলে যে সাধারণ বাঙালী বুঝিত না, এমন মনে হয়না। যে-সকল পাঠক বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিতে

পারিবেন, প্রাঞ্জল সাধুভাষা তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারিত না। রাখাল বেশে এই জ্ঞানগর্ভ রচনাটির সৌন্দর্যহানি হইতেছে।"[৬২]

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য দিয়েছেন। বলেছেন, স্বামীজীর লেখা আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। একদিকে একদল মোহিত হয়েছিলেন তাঁর বিপুল জ্ঞানসম্ভারের পরিচয় পেয়ে, অন্যদিকে রক্ষণশীলেরা ক্ষিপ্ত আক্রমণ চালালেন। কী জঘন্য স্বামীজীর গুরুচণ্ডালী দোষ। পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্করের মতো ব্যক্তিও (তখন হিতবাদী পত্রিকার সহ-সম্পাদক) নিন্দাপ্রচারে নেমে পড়লেন। এঁদের কাছে 'উদ্বোধন'—ভাষার 'উদ্বন্ধন'। এক পুঁচকে পত্রিকা 'বঙ্গহিতৈষী' উপদেশ দিল—বিবেকানন্দ যেন তাঁর গুরুভাই সারদানন্দের কাছে বাংলা লেখা শিখে নেন। উচ্চশিক্ষিতদের কাছ থেকেও প্রকাশ্য সমাদর জোটেনি। ভূপেন্দ্রনাথ এই সূত্রে আরও বলেছেন, **"তখনকার দিনে নতুন কিছুকে স্বাগত জানাবার কেউ ছিলনা, এবং তৎকালীন কোনো জনসেবককেই স্বামীজীর মতো তীব্র আক্রোশ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়নি। তাঁর নতুন প্রচেষ্টার মূল্যায়ন দূরে থাক, বরং তা বিদেশী ও অসামাজিক বলে হৈ-চৈ উঠেছিল।"**[৬৩]

বিবেকানন্দ অটল থাকলেন। নতুন সর্বদাই অভ্যর্থিত হয় উৎপীড়নের দ্বারা—তিনি জানতেন। ফিরিয়ে দিতেও জানতেন। ক্ষুদ্র কিন্তু অসাধারণ তীক্ষ্ণ ও চিন্তা-উদ্দীপক এক খোলা চিঠিতে (লস এঞ্জেলেস থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ তারিখে লিখিত) তিনি নিজ পদ্ধতির সমর্থন করলেন। উদ্বোধনে ১৫ চৈত্র, ১৩০৬ তারিখে, প্রকাশিত 'বাঙলা ভাষা' নামে সুপরিচিত সেই পত্র-প্রবন্ধে তিনি বললেন—চলিত ভাষা সাহিত্যের সকল প্রয়োজন পূরণে সমর্থ—এবং জাতির প্রগতির প্রশ্নের সঙ্গে সাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। "বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে অপার সমুদ্র"-ব্যবধানে মর্মপীড়িত বিবেকানন্দ প্রশ্ন করলেন, "কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয়না? ...যে-ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে করো—তবে লেখবার বেলা ও একটা কী কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত করো?" দ্বিধাহীন ভাষায় জানিয়েছেন, চলিত ভাষায় যে-তেজ, অল্পে ভাবপ্রকাশের যে-ক্ষমতা, তা কৃত্রিম সাধুভাষায় নেই। জীবন ও সাহিত্যের সম্পর্কের বিষয়ে তাঁর ঐতিহাসিক উক্তি: "ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়—লক্ষণ।" এক্ষেত্রে গতি-নিরোধক হলো "প্যাঁচওয়া বিশেষণ," "বাহাদুর সমাস," "আঁকাবাঁকা ডামাডোল," "গদাইলস্করি চাল।" এ সবই মৃত্যুলক্ষণ। শক্তিশালী ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হোক শক্তিশালী ভাব। **"ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত—মুচড়ে-মুচড়ে যা ইচ্ছে করো—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।"** "যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জ্যান্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়।" মৃত্যু থেকে জীবনের পথে ডাক দিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, "জাতীয় জীবনে যেমন-যেমন বল আসবে, তেমন-তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে-ভাবরাশি আসবে, তা দু'হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই।"

বিবেকানন্দের এই রচনার এক দশক পরে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে বড়ো আকারে আন্দোলন শুরু করেন (কয়েক বৎসর আগেই অবশ্য তিনি চলিত ভাষায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন)। সেই আন্দোলনের ফলে, এবং কালপ্রয়োজনেও, সাধু

ভাষা ক্রমে সাহিত্য থেকে সরে যায়। প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার ক'রেও বলতে হবে, চলিত ভাষার পক্ষে বহু পৃষ্ঠা ব্যয় ক'রে তিনি যেসব যুক্তি সাজিয়েছিলেন, তার সার অংশ বিবেকানন্দ পূর্বেই কয়েক পৃষ্ঠার উক্ত রচনায় ধারালো ভাষায় প্রকাশ ক'রে গেছেন। অধিকন্তু বলা যায়, প্রমথ চৌধুরীর নিজের চলিত ভাষার মধ্যে সজ্জিত কৃত্রিমতার লক্ষণ আছে, অনেকটা অভিজাত ড্রইংরুমের শিষ্ট বাক্যালাপের ধাঁচ, অপরপক্ষে বিবেকানন্দ কৃত্রিমতামুক্ত এমন ভাষা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন যা স্বচ্ছন্দে গতায়াত করতে পারে কক্‌নি থেকে ক্লাসিক্যালে। আর একটি বিষয়ে বিবেকানন্দকে প্রমথ চৌধুরী অপেক্ষা অধিক আধুনিক দেখি। প্রমথ চৌধুরী যেখানে নদীয়া শান্তিপুর অঞ্চলের চলিত ভাষাকে কলকাতার শিক্ষিতজনের মুখযন্ত্রে শোধনের দ্বারা আদর্শ ভাষা করতে চেয়েছিলেন, বিবেকানন্দ সেখানে সরাসরি কলকাতার চলিত ভাষার পক্ষে রায় দিয়েছেন। শেষ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ ও প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে ঐক্য আছে বলে মনে হয়—কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষ মাত্রাভেদ। বিবেকানন্দ চেয়েছেন, সাহিত্যের ভাষায় প্রাণশক্তি এবং সর্ববিধ বিষয় ও ভাব প্রকাশের ক্ষমতা। তাই তাঁর মতে, প্রয়োজনে যেমন প্রচুর তৎসম শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়া যায় চলিত ভাষায়, তেমনি তারই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় মুখ-চলতি ইডিয়ম, যা এক ঝটকায় কাজটা সেরে ফেলতে পারে। **'গুরুচণ্ডালী' ভাষা লেখার দোষে তিনি দুষ্ট, এমন কথা বলা হয়েছে। অথচ বিবেকানন্দের লক্ষ্যই হলো, গুরু এবং চণ্ডালকে একসঙ্গে জুড়ে পথে নামিয়ে দেওয়া।** তাই তিনি দেশের রাজধানী কলকাতার ভাষা নেওয়ার কথা বলেছেন, যেখানে নানা প্রয়োজনে হাজির হয়ে লোকজন দেওয়া-নেওয়া করে, নানা ইডিয়ম ও শব্দ জমা হয় তার ফলে—সে সকলকে হজম করার ক্ষমতা কলকাতার ভাষায় রয়েছে, তাকেই নিতে হবে—আঞ্চলিকতার "গ্রাম্য ঈর্ষাটিকে জলে ভাসান" দিয়ে। নদীয়া ও শান্তিপুরের ভাষার বিশেষ অনুরাগী প্রমথ চৌধুরীও শেষ পর্যন্ত কলকাতার ভাষার পক্ষেই বলেছেন, না-বলে উপায় ছিলনা, কিন্তু সেই সঙ্গে যোগ করেছেন—সে ভাষা হবে কলকাতার শিক্ষিত লোকের ভাষা, যে 'শিক্ষিত' শব্দটি অত্যন্ত অনিশ্চিত লক্ষণের। তার ফলে, প্রমথ চৌধুরীর ধারাপথে বেশ কয়েক দশক বাংলা সাহিত্যে 'সাধু কৃত্রিমতার' পরিবর্তে 'চলিত কৃত্রিমতা' জায়গা জুড়ে বসেছিল—যাতে বিবেকানন্দের ভাষাদর্শের অনুগামিতা হয়েছে দ্বিধাগ্রস্ত।

প্রমথ চৌধুরীর বৃহৎ কীর্তি—রবীন্দ্রনাথকে চলিত ভাষা গ্রহণে প্রণোদিত করা, আর রবীন্দ্র-প্রভাবেই তো চলিত ভাষার সর্বত্র-স্বীকৃতি সম্ভব হয়েছিল। স্বীকার্য সে কথা। এখানে স্মর্তব্য, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের চলিত ভাষারীতির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। কুমুদবন্ধু সেন, বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেনের মুখে শোনেন, রবীন্দ্রনাথ স্বামীজীর ভাষার অজস্র প্রশংসা করেছেন। দীনেশচন্দ্র স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পড়েন নি শুনে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়েছিলেন। "চলিত বাংলা ভাষা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা [বিবেকানন্দের লেখা] পড়লে বুঝবেন, [রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে বলেন]—যেমন ভাব, তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি, আর পূর্ব পশ্চিমের আদর্শ। দেখে অবাক হতে হয়।"[৩৪]

রবীন্দ্রনাথ স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইটিকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে পাঠ্যবই করেছিলেন।

॥ পনেরো ॥

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে আধুনিকতার প্রসঙ্গ এখানে শেষ ক'রে ঐতিহ্য প্রসঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। ঐতিহ্যবিযুক্ত বিবেকানন্দ—কল্পনাও করা যায়না। তাঁকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র, পতঞ্জলি, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, চৈতন্য থেকে—ধর্ম এবং রামকৃষ্ণ থেকে। এই কারণে কেউ-কেউ তাঁকে 'রিভাইভ্যালিস্ট' পর্যন্ত বলে ফেলেছেন। মজার কথা নিঃসন্দেহে। **যিনি দলিত মানুষের অধিকারের পক্ষে নির্ঘোষ-কণ্ঠ, সাম্যবাদের প্রবক্তা, ছুঁৎমার্গের শত্রু, ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের শয়তানী চেহারার উন্মোচক, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের পক্ষে প্রচারক এবং ধর্মসমন্বয়ের আচার্য—তিনি রিভাইভ্যালিস্ট!!! তাহলে রিভাইভ্যালিজমের 'নরক' তো আধুনিকতায় 'গুলজার'।** আগেই বলেছি, বিবেকানন্দের আধুনিকতা অতীতের সদ্‌বস্তু গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল। তিনি সেই আদর্শবাদী যাঁর কাছে বস্তুভিত্তিতেই আদর্শ স্থাপিত। বারবার তিনি শিল্পের সঙ্গে পদ্মের তুলনা করেছেন, ভূমি থেকে যা উদ্‌গত, ভূমি থেকেই যা পুষ্টির বস্তু গ্রহণ করে, ভূমির সঙ্গে যার সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন থেকে যায়—কিন্তু সে মাথা তোলে ঊর্ধ্বে। শিল্পকেও সেইভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। যেখানে সেই সম্পর্ক ছিন্ন সেখানে শিল্পের পতন—তবু শিল্পকে উঠতে হবে প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে।[৪৫] অন্যত্র বলেছেন, শিল্পের পক্ষে সত্যের প্রকাশ অবশ্যকৃত্য।[৪৬]

স্বামীজীর নান্দনিক চিন্তার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পের তুলনাকালে। একাধিকবার সে কাজ করেছেন। তাঁর মতে, গ্রীক শিল্প সত্যের বস্তুরূপকে প্রকাশ করেছে, আর ভারতীয় শিল্প সত্যের আধ্যাত্মিক রূপকে। প্রকৃতির অনুকরণের ক্ষেত্রে গ্রীক শিল্পের চূড়ান্ত সাফল্য—যার মহিমা তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভারতীয় শিল্প তাঁর মতে শ্রেষ্ঠতর, যেহেতু তা আদর্শের প্রকাশক। আইডিয়ালিজম্-ই মানদণ্ড। নিছক প্রকৃতির অনুকরণের মধ্যে তিনি বিরাট কোনো গৌরব দেখতে পাননি।[৪৭] যেসব লেখক "ইন্দ্রিয়সম্ভোগকেই চরম লক্ষ্যবস্তু" বলে মনে করেন তাঁরা স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারেন না। অমরতার অধিকার তাঁদেরই যাঁরা আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে ব্রতী।[৪৮] তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন, মহৎ শিল্প বা সাহিত্যের সৃষ্টির জন্য, কিংবা এমনকি মস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য, মনের অখণ্ড একমুখিতা ও নিষ্ঠা প্রয়োজন। "যদি কেউ অতিচেতন স্তরে লব্ধ আলোক লাভ করতে চান—যা অন্যের কাছে ঐশী প্রেরণা, কিংবা দিব্য জ্ঞানালোক কিংবা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা রূপে প্রতীয়মান হয়—তাহলে তাঁকে নিজের সকল শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে। ওইরূপে দিব্যালোক যেমন ধর্মের জন্য তেমনি সর্বোচ্চ শিল্প বা বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন। যে-মানুষ স্বার্থপর বা নীচ উপায়ে নিজেকে ক্ষয় করে, তার পক্ষে অপূর্ব ম্যাডোনা-চিত্র বা মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।[৪৯] তথাকথিত "ধর্মীয়" আদর্শ নয় (যার মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা বা পৌরাণিকতার স্থূল অবলম্বন থাকে), সত্ত্বময় আধ্যাত্মিক আদর্শকে বরণীয় মনে করেছিলেন বলে স্বামীজী মিলটনের মস্ত অনুরাগী হয়েও ব্রাউনিং-এর কাব্যকে অধিক মর্যাদা দিতেন। "মিলটন, দান্তে বা অন্য অনেক প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপীয় কবি যেখানে অনন্তকে প্রকাশ করতে গেছেন সেখানে তাঁরা বহিঃপ্রকৃতিকেই অবলম্বন করেছেন, যাতে মনে হয়, পেশীর মধ্য দিয়েই অনুভূত হবে অনন্ত।"[৫০] এক্ষেত্রে ধন্য কবি পাশ্চাত্যের ব্রাউনিং। "ভারতের সৌভাগ্য, সে কোনো

মিলটনের সৃষ্টি করেনি যাঁর রচনায় দেখা যায়, 'গভীর খাড়া গহ্বরে কাউকে হেঁটমুণ্ডে নিক্ষেপের' বিকট কাণ্ড। এই গোটা [নরক] বস্তুটির পরিবর্তে ব্রাউনিং-এর কবিতার দু'চার ছত্রও উত্তম প্রাপ্তি।"[৫১]

বিবেকানন্দ দারুণ কণ্ঠে ভারতীয়দের জন্য শক্তি ও সংগ্রাম চেয়েছেন, ভারতীয় সাহিত্যে যুদ্ধ-কবিতা নেই বলে দুঃখপ্রকাশ করেছেন, আগেই তা দেখেছি—কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সংস্কৃতির নামে বর্বরতার মহিমাজ্ঞাপনেরও সমালোচক। পাশ্চাত্যে থাকাকালে আতঙ্কিত হয়ে শুনেছেন, "বুদ্ধের গরিমা আরও বাড়ত, অন্তত তাঁর আবেদন বাড়ত, যদি তিনি ক্রুশবিদ্ধ হতেন।" এ বস্তুকে "রোমক বর্বরতার ফল-পরিণতি" বলতে তাঁর দ্বিধা হয়নি। কঠিন ভাষায় বলেছেন, "সবচেয়ে নীচ ও পাশব প্রকৃতির লোকেরাই একটা-কিছু অসাধারণ ব্যাপারের পক্ষপাতী। সেইজন্য জগৎ চিরকাল এপিক কাব্য ভালবাসে।" "খ্রীস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা থেকেই রোমক-রাজ্যের সর্বত্র খ্রীস্টধর্ম প্রচারিত হয়।"[৫২] বিতৃষ্ণ বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছিলেন, হা ভাগ্য, একজন মানুষকে বড় হতে হলে তাঁর পক্ষে খুন হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন!! রক্তঝরা ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা অপেক্ষা তাঁর কাছে গভীরতর সৌন্দর্যময় ঘটনা—মৃতপুত্র কোলে এক মাতার বুদ্ধের নিকট আগমন, এবং বুদ্ধ কর্তৃক তাঁকে জীবনসত্যের বোধদান।[৫৩]

বিবেকানন্দ বীরত্ব চাইতেন কিন্তু নিরর্থক হিংসা নয়। শেক্সপীয়ারের মহা ভক্ত হয়েও ভারতীয় ট্রাজেডিকে পাশ্চাত্য ট্রাজেডির উপরে স্থাপন করেছেন। কালিদাসের ট্রাজেডির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতৈক্য দেখা যায়। (স্বামীজীর পরে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', এবং 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে যার রূপ দেখি। বঙ্কিমচন্দ্র অপরপক্ষে কালিদাসের নয়, শেক্সপীয়ারেরই ভক্ত)। মহামৌন ও মহাশান্তি হলো ভারতীয় ভাবধারার বৈশিষ্ট্য—বিবেকানন্দ বলেছেন। ভারতীয় সাহিত্যের এই লক্ষণ বিদেশী পাঠকের কাছে নৈরাশ্যকর ঠেকে:

> "ভারতীয় চিন্তার একটি লক্ষণ—তার শান্ত মৌন। তার পিছনে প্রচণ্ড শক্তি আছে, কিন্তু তা হিংস্রভাবে প্রকাশিত নয়। বলা চলে, তা হলো, ভারতীয় চিন্তার নিঃশব্দ মোহিনীশক্তি। বিদেশী কেউ আমাদের সাহিত্য অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলে প্রথমে তার কাছে এই সাহিত্য অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকবে। যে-চাঞ্চল্য, উদ্দীপনা, আছড়ে-পড়া গতি, তাকে মুহূর্তে মাতিয়ে তোলে—সে বস্তু এখানে মেলেনা। ইউরোপীয় ট্রাজেডির সঙ্গে আমাদের ট্রাজেডির তুলনা করো। ইউরোপীয় ট্রাজেডি দারুণ ক্রিয়াশীলতা ও গতিশক্তির দ্বারা অবিলম্বে মানুষকে উদ্দীপিত করে, কিন্তু শেষ হওয়ার পরেই আসে প্রতিক্রিয়া, তখন সবই যেন মন থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভারতীয় ট্রাজেডিগুলিতে আছে অপূর্ব মায়াশক্তি—আপাতভাবে নীরব শান্ত—কিন্তু তাদের অনুশীলনে মন যেন ভাবাচ্ছন্ন হয়ে যায়, সেই মায়াজাল থেকে মুক্তি থাকেনা। ...কোমল শিশিরবিন্দু অদৃশ্য অশ্রুতরূপে পতিত হয়, কিন্তু ফুটিয়ে তোলে সুন্দরতম গোলাপ—বিশ্বজগতে ভারতের দানও সেইপ্রকার।"[৫৪]

এর ফলে বুঝতে অসুবিধা হয়না, বিবেকানন্দের কাছে কেন ছাত্রজীবনেও কাব্যগগনের ধ্রুবতারা ছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ।[৫৫]

ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে পক্ষপাত ঘোষণার কালেও কিন্তু বিবেকানন্দ গ্রীক শিল্পের গৌরব স্বীকার ক'রে গেছেন। "গ্রীকরা বহির্গত অনন্তের অনুশীলনকারী, আর ভারতীয়রা সন্ধানী—অন্তর্গত অসীমের।...পৃথিবীর সভ্যতায় উভয় পদ্ধতিই নিজ-নিজ ভূমিকা পালন ক'রে গেছে।"[৫৬] অবশ্য বিবেকানন্দের বিশেষ অনুরাগ যে, ভারতীয় রীতির পক্ষেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।—"প্রাচ্যের মানুষ...কল্পনাপ্রবণ, জন্ম-স্বাপ্নিক। জলপ্রপাতের কলধ্বনি, পাখির গান, সূর্য চন্দ্র তারকার, সেইসঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর সৌন্দর্য তার কাছে পরম মনোরম। এও কিন্তু প্রাচ্যমনের কাছে যথেষ্ট নয়। স্বপ্নের অতীত স্বপ্ন সে দেখতে চায়; বর্তমানের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হতে চায়।"[৫৭] ভাব ও আদর্শ প্রকাশকে বিবেকানন্দ যেহেতু "শিল্প বিকাশের শ্রেয় প্রেরণা" বলে বিশ্বাস করতেন তাই পৃথিবীর শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয় ভাস্কর্যকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেছেন। "পুরাকালে স্থাপত্য-বিদ্যার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার এক-একটি মূর্তি দেখলে আপনাকে এই জড় প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেলবে।"[৫৮] এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তরূপে ভারতের বুদ্ধমূর্তির উল্লেখ করেছিলেন। মুঘল স্থাপত্য সম্বন্ধেও তাঁর একইপ্রকার সমাদরের মনোভাব ছিল।[৫৯]

আদর্শই সর্বোচ্চ শিল্পের ভিত্তি—এই দৃঢ় মত প্রকাশ করার পরে স্বামীজী বললেন, শিল্পকে প্রথমত জাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল হতে হবে। এই ধারণার শক্তিতে বলীয়ান তিনি দুঃসাহসিকতার সঙ্গে বলেছিলেন, গ্রীকরা (এবং অন্য পাশ্চাত্যবাসীরা) যীশুখ্রীস্টকে যথাযথভাবে আঁকতে পারেনি। যীশু প্রাচ্যের মানুষ, তিনি টেবিলে বসে ভোজনকর্ম করতেন না—কিন্তু যে অজস্র 'লাস্ট সাপার'-এর ছবি আঁকা হয়েছে সর্বত্রই তিনি টেবিলাসীন। "শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে এবং গ্রীক, রোমান ও অন্য উৎস থেকে যেসব বস্তু এসে জুটেছে, তার স্তূপ ঠেলে ইউরোপীয়দের পক্ষে ইহুদী রীতিনীতি বোঝা অতীব কঠিন।"[৬০]

অন্য এক দিক থেকে বিবেকানন্দ বিষয়টির পর্যালোচনা করেছেন। গ্রীকদের কার্যত কোনো আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি ছিলনা। তারা খ্রীস্টের অন্তর্জীবনের রহস্য নিয়ে কদাপি ব্যস্ত হয়নি। তাই তারা তাঁকে রীতিমতো পেশীসবল আকারে এঁকেছে। ভারতীয় বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে এখানে সুস্পষ্ট পার্থক্য ঘটে গেছে। "কোনো জাতির শিল্প পর্যালোচনা করলে তার অধ্যাত্মচরিত্রের পরিমাপ করা যায়। গ্রীকরা যে কোনোকালে সমুচ্চ অধ্যাত্ম উপলব্ধির জগতে উঠেছিল—তাদের শিল্পে তার প্রায় কোনো নিদর্শন নেই।"[৬১]

ভারতীয় ও ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির তুলনাকালে স্বামীজীর এক উক্তিতে রয়েছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি:

> **"একেবারে বর্তমান সময়েও [স্বামীজী বলেছিলেন] যদি আমরা কোনো ইউরোপীয়ের আঁকা ধর্মভাবগ্রস্ত কোনো মানুষের ছবি পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখব, শিল্পীর আঁকা ওই মানুষটি উপরের দিকে তাকিয়ে আছে—বাইরের পৃথিবীতে, আকাশের মধ্যে, সে ঈশ্বরকে সন্ধান করছে। অপরপক্ষে ভারতবর্ষে মানুষের ধর্মচেতনা আঁকার কালে চরিত্রটিকে মুদিতনেত্র করা হয়, যেন সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে অন্তর্লোকে।"[৬২]**

॥ ষোলো ॥

আদর্শ বস্তুটি কি কেবল ঐতিহ্যের সম্পত্তি? উত্তর নানা প্রকার হবে। আধুনিকতার পক্ষে কি সর্বদা বর্তমানে-গাঁথা-অবস্থায় কিংবা বস্তু-জড়ানো-অবস্থায় থাকা সম্ভব? বাস্তবতা মানে কি সর্বদা প্রতীয়মানতার উপাসনা? তাহলে আধুনিক সাহিত্যে মনোবিকলন, অবচেতন মন ইত্যাদির ধুমধাড়াক্কা কেন? আর সবকিছুর অন্তিম গতি কি কেবল অবচেতনের গুহায়— অতিচেতন বলে কি কিছু নেই বা থাকতে পারেনা? বিবেকানন্দ অতিচেতন মনের বিরাট রাজ্যের কথা জানতেন। সেখানে প্রবেশের অধিকারও তাঁর ছিল, এবং সে-বিষয় সম্বন্ধে নানাকথা তিনি বলেছেনও। তাঁর ধর্ম Apparent Man-কে স্বীকার করেছে, কিন্তু অগ্রসর হয়েছে Real Man-এর সন্ধানে। এখানে উল্লেখ্য তাঁর অসাধারণ একটি ভাষণ— *The Real and the Apparent Man*, যার বিষয়ে প্রাগ্‌ম্যাটিজ্‌মের প্রধান দার্শনিক উইলিয়ম জেমস সবিস্ময় হর্ষধ্বনি ক'রে বলেছিলেন, 'A wonder of oratorical experssion' এবং ভাষণটি পড়ে চমকিত হয়েছিলেন রোমা রোলাঁ। দীর্ঘদিনের বস্তুতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা আস্বাদনের পরে, বর্তমানের শিল্প ও সাহিত্য একাংশে অন্তত অন্তর্নিহিত বাস্তবতার গুরুত্ব স্বীকার ক'রে প্রতীকধর্মকে মূল্যদান করছে। কিউবিজম্, এক্সপ্রেসনিজম্ ইত্যাদি তো অজানিত রহস্যময়ের সন্ধান ছাড়া কিছু নয়। তাই বিবেকানন্দ যখন ভারতীয় শিল্প সাহিত্যের প্রতীকধর্ম সম্বন্ধে বিচার করছিলেন তখন তিনি যুগপৎ ঐতিহ্যবাদী ও আধুনিক। তাঁর মতে, উপনিষদসমূহে আছে সর্বোচ্চ কাব্য, কেননা সেখানে প্রকৃতিজগৎ থেকে ভিন্নস্তরে আহ্বান ছিল; ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয়ে গমন সেখানে। এর রূপ তিনি স্বয়ং ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকে কবিতায় ধরতে চেয়েছিলেন—"নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর" ইত্যাদি। অজ্ঞেয় লোকে উত্তরণের প্রয়োজনে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন যেমন ক্ষেত্রবিশেষে নেতি নেতি-র পরিষ্করণী ব্যবহার করেছে, তেমনি সাহিত্য ও শিল্প গ্রহণ করেছে প্রতীক। স্থূল বাস্তবতার বিরুদ্ধে প্রতীকধর্মিতা আধুনিক সাহিত্য ও শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

॥ সতেরো ॥

আগেই দেখেছি, বিবেকানন্দ সমন্বয়ের পক্ষপাতী। বিরাটের উপাসক তিনি—কি প্রাচ্যের কি পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে। একবার বলেছিলেন, "আমি একথা বলিনা যে, যারা বহিঃপ্রকৃতির মধ্য দিয়ে সত্য সন্ধান করে তারা ভ্রান্ত, কিংবা যারা অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য দিয়ে সত্যকে পেতে চায়, তারা উচ্চস্তরের। ওরা দুই ধরনের পদ্ধতি, উভয়কেই বাঁচতে হবে।" এই সূত্রে তিনি আরও বলেছেন, "পরিশেষে আমরা দেখব উভয়ে এক স্থানে মিলিত; দেখব যে, মনের বিরোধী নয় শরীর, আবার মন নয় শরীরের বিরোধী। ...এই শরীর বিগলিত হয়ে যাবে মনোমধ্যে, এবং মন—শরীরে।"[৬৩]

অতি-প্রতীকতার বিপদ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ সচেতন ছিলেন। নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "শারীরিক গঠন পরিকল্পনার মধ্যে মনঃপ্রকৃতিকে অতিরিক্ত পরিমাণে প্রবেশ করিয়ে দেবার জাতীয় প্রবণতার জন্য হিন্দু চিত্রকলা ও ভাস্কর্য উদ্ভট রূপ নিয়েছে।" কিন্তু এর সঙ্গে তিনি

আবার একথাও জুড়ে দেন, "নিজ অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে, অধিকাংশ শারীরিক ব্যাপার এবং বস্তু-ব্যাপারের মনোভাবাত্মক প্রতীক-রূপ আছে—স্থূল চোখে সেগুলি তাদের বহির্গত বস্তু-রূপের থেকে প্রায়ই উদ্ভটভাবে পৃথক।"[৬৪]

স্বামীজী অন্যত্র একই ধরনের কথা বলেছেন। যেমন:

"আদর্শকে—অতীন্দ্রিয় বিষয়কে—প্রকাশ করার ভারতীয় প্রবণতা উদ্ভট চিত্রাঙ্কনে, উদ্ভট মূর্তিনির্মাণে পর্যবসিত হয়েছে।"[৬৫]

"আধ্যাত্মিক বিষয়কে প্রকাশ করার অত্যুগ্র আগ্রহে ভারতীয় শিল্প বস্তুজগৎকে অধঃপতিত করেছে, ফলে অধঃপতিত হয়েছে নিজেও।"[৬৬]

ফলত দেখা যায়, বিবেকানন্দ শারীরিক এবং মানসিক, বস্তুগত এবং অতীন্দ্রিয়, ঐতিহ্যানুসারী এবং আধুনিক—সব কিছুর স্বচ্ছন্দ সানন্দ মিলনের পক্ষপাতী। তিনি এমনকি আর্ট ও ইউটিলিটির সহযোগ পর্যন্ত চেয়েছেন।[৬৭] এক্ষেত্রে জাপানের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। তাঁর আদর্শের রেখারূপ:

> "কবিত্বের মধ্য দিয়া উচ্চতম সত্যসকল জগৎকে দিবার জন্য যেন বিধাতা উপনিষদের ঋষিগণকে সাধারণ মানব হইতে বহু ঊর্ধ্বে কবিরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ...বুদ্ধদেবের মধ্যে দেখি, মহৎ সর্বজনীন হৃদয়, অনন্ত সহিষ্ণুতা। তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিলেন; অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য ধর্মকে প্রখর যুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এখন চাই—এই প্রখর জ্ঞানের সহিত বুদ্ধদেবের হৃদয়, সেই অদ্ভুত প্রেম ও করুণা—মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাব উহাতে থাকুক, উহা যুক্তিমূলক হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়, গভীর প্রেম ও করুণার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চনযোগ হইবে—তবেই বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পর কোলাকুলি করিবে।"[৬৮]

এই হলো ভবিষ্যতের ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর আদর্শ—এবং সাহিত্য ও শিল্প সে আদর্শের বহির্বর্তী নয়। শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি চেয়েছেন প্রচণ্ড ক্রিয়াশীলতা ও সুগভীর শান্তির সমন্বয়। যেমন একবার, কুরুক্ষেত্রে গীতা-উপদেশ দানরত শ্রীকৃষ্ণের ছবি কী-ধরনে আঁকা উচিত সে-সম্পর্কে বলেছিলেন, "সমস্ত শরীরে intense action, আর মুখ যেন নীল আকাশের মতো ধীর গম্ভীর প্রশান্ত।"[৬৯]

॥ আঠারো ॥

প্রসঙ্গশেষে বলতে পারি, বিবেকানন্দের আধুনিকতা মানবকেন্দ্রিক—সে মানব জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত। আঠারো ও উনিশ শতকের ইউরোপীয় আধুনিকতা, এবং তার অনুকরণে উনিশ শতকের ভারতীয় আধুনিকতা, বড়ো অংশে বহির্গত মানব নিয়ে ব্যাপৃত ছিল। বিবেকানন্দ তাঁর পারমার্থিক ও ব্যবহারিক বেদান্ত দ্বারা সেই সীমারেখাকে লঙ্ঘন করতে চেয়েছেন। তাঁর বেদান্ততত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত—সকল যোগশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, সর্বজনীন ধর্মপরিকল্পনা—

এমন সবকিছুই যা সৃষ্টির বহুধা বিকাশের অন্তর্গত ঐক্যের সন্ধানী। তাঁর ব্যবহারিক বেদান্ত দলিত মানুষের পক্ষ নিয়েছে, মানুষকে প্রণোদিত করেছে বিশেষাধিকার ভঙ্গে, ও মানবসেবার ধর্মে; স্বীকার করেছে প্রতি দেশ ও ধর্মের মানুষকে ভ্রাতা ও ভগিনী রূপে; এবং উদ্বুদ্ধ করেছে সমভূমিতে দাঁড়িয়ে পারস্পরিক বিনিময়ের আন্তর্জাতিকতায়। এই তাঁর নবমানবতাবাদ—একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাদী এবং আধুনিক। সর্বজনীন ধর্ম সম্বন্ধে সুমহৎ ঘোষণার মধ্যে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গির সেরা পরিচয় পাওয়া যায়:

> "যদি সত্যই কখনো সর্বজনীন ধর্মের উদয় হয়, তবে কোনো দেশে বা কালে তা সীমাবদ্ধ থাকবে না—যে-অনন্ত ঈশ্বরের বিষয় ঘোষিত হবে ওই ধর্মে, তারই মতো অনন্ত হবে তার রূপ। ওই ধর্মের সূর্য কৃষ্ণভক্ত এবং খ্রীস্টভক্ত, সাধু এবং অসাধু—সকলের উপর সমভাবে কিরণজাল বিস্তার করবে। তা ব্রহ্মণ্য বা বৌদ্ধ বা খ্রীস্টান বা মুসলমান হবেনা—তা হবে সকল ধর্মের সমষ্টি—আর তাতে থাকবে উন্নতির সীমাহীন অবকাশ। একদিকে পশুতুল্য হীন বর্বর মানুষ—অন্যদিকে হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুণরাশিতে সমুন্নতচরিত্র এমন মানুষ, সমাজ যাঁদের 'মনুষ্য' নামে চিহ্নিত করতে সন্ত্রস্ত—ওই ধর্ম সকলকেই স্থান দেবে নিজ অঙ্কে, স্বীকার করবে সকল মানুষের দেবস্বভাব, এবং নিয়োজিত থাকবে তারই উপলব্ধির সহায়তায়।"[৭০]

'সর্বজনীন ধর্ম' শব্দ বদলে 'সর্বজনীন মানবধর্ম' ক'রে দিলে আমরা সুমহান শাশ্বত আধুনিক বিবেকানন্দকে পেয়ে যাব। রোমা রোলাঁ এই বিবেকানন্দের জগৎ সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন—'মানবের মহানগরী'।

॥ উনিশ ॥

এই শাশ্বত আধুনিক বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাঁর কালের, পরবর্তীকালেরও, বহু ভারতীয় সাহিত্যিককে প্রভাবিত করেছেন। অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। একটি-দুটির মাত্র উল্লেখ করব।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগে বিবেকানন্দের তীব্র দেশচেতনা এবং কালপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন—এ-বিষয়ে স্বীকৃতি অল্পবিস্তর দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ সশস্ত্র বৈপ্লবিক পন্থার সমর্থক ছিলেন না, কিন্তু মৃত্যুভয়হীন যুবকদের উপরে বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন, এবং তাঁর রচনায় তার ছায়াপাতও আছে। তিনি একবার বলেছিলেন, "বিবেকানন্দের বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে, মুক্তির পবিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।"[৭১] অন্যত্র বলেছেন, "বাংলা দেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, [চরকা ঘোরানো] আঙুলকে নয়।"[৭২]

রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই নিজস্ব-ভাবে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছুঁৎমার্গের সম্বন্ধে তীব্র বেদনা

ও ঘৃণা বোধ করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি ১৯১০ সালে এই প্রসঙ্গে 'দীনের সঙ্গী' বা 'অপমানিত' কবিতা লেখেন তখন ভারতের চিন্তাজগতে বিবেকানন্দই প্রবল সক্রিয় শক্তি যিনি অনুরূপ বক্তব্য প্রচণ্ড শক্তিশালী ভাষায় পূর্বেই প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, "বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি। বলেছিলেন, দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। একে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালে। এ তো কোনো বিশেষ আচারের উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন নয়—ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধতা এর মধ্যে আপনিই এসে পড়েছে।"[৩] উদ্বোধিত ভারত সম্বন্ধে এবং ভারত-ইতিহাসের সুদীর্ঘ কালের মিলনশক্তি সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মহান চিন্তা—এক দশক পরে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতায় অপূর্ব আকারে রূপায়িত। ভারতীয় জীবনের অসার আনুষ্ঠানিকতা এবং গতিহীন পঙ্কাকীর্ণ জীবনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে 'অচলায়তন' এবং 'তাসের দেশ' নাটক দুটিতে। রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচক এডওয়ার্ড টমসন লক্ষ্য করেছেন, অচলায়তনে প্রবেশ করেছে বিবেকানন্দের ভাবধারা। বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রতীক নাটকগুলিতে প্রভাবিত করেছেন, এমন বলার অভিপ্রায় আমাদের নেই, তবে লক্ষ্য করার বিষয়, রহস্যময় অজানা ভয়ঙ্করের উদ্দেশে ধাবিত সত্তা, 'রাজা' নাটকে যার প্রকাশ আছে, তার সঙ্গে বিবেকানন্দের 'অন্তর্গত অসীমের' উদ্দেশে গতির কিছুটা ভাবসাদৃশ্য আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলনভূমি আবিষ্কারে বিবেকানন্দের প্রয়াস এবং সাফল্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমাদরের কথা আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথের প্রান্তজীবনের একাঙ্ক নাটক 'কালের যাত্রা'—যাতে সমাজের চার শ্রেণীর মানুষের সংঘাতের কথা পাই—পুরোহিত, সৈনিক, ধনিক ও শূদ্র—যার পরিণতি শূদ্রের অধিকার স্বীকৃতিতে—এর মধ্যে পরিষ্কার বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তের মুদ্রণ। বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারত' ও অন্য রচনায় একই চিন্তা ও ভবিষ্যদর্শন উপস্থিত ক'রে গেছেন পূর্বেই। অনুমান করতে পারি, চলিত ভাষার ক্ষেত্রে কেবল প্রমথ চৌধুরী নয়, বিবেকানন্দের সর্বত্রগামী চলিত ভাষার শক্তির কথা রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল যখন তিনি নিজ সাহিত্যে চলিত পন্থাকে বরণ করেছিলেন।

মালয়ালম সাহিত্যের তিন 'মহাকবির' অন্যতম কুমারন আসান (১৮৭৩-১৯২৪) গভীরভাবে বিবেকানন্দ-প্রভাবিত। অপর দুই মহাকবি উল্লুর ও ভাল্লাথোল-এর উপরও স্বামীজীর প্রভাব আছে, কিন্তু আসানের উপর তা সর্বাধিক। আসান, কেরালার বিখ্যাত আন্দোলন এবং আন্দোলনসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান "শ্রীনারায়ণ ধর্ম পরিপালন যোগম্"-এর ('এস-এন-ডি-পি' নামেই অধিক পরিচিত) প্রথম ও সবচেয়ে সফল সম্পাদক। কেরালার দলিত ইড়েবা সম্প্রদায়ের এই আন্দোলন সামাজিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে—তা বহুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র স্থাপন ক'রে, বৈষয়িক উন্নতির নানা পথ উন্মোচন ক'রে, এই সম্প্রদায়ের বহু লক্ষ মানুষের জীবনে এনেছে মানবিক মর্যাদার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। এই আন্দোলনের সূত্রপাতে স্বামী বিবেকানন্দের পরোক্ষ প্রভাবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন—ইড়েবা সম্প্রদায়ভুক্ত মার্কসবাদী শ্রমিকনেতা আর সুগতন।

কুমারন আসান সংস্কৃতজ্ঞ, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির গৌরবে পূর্ণচিত্ত—তিনি সানন্দে

বিবেকানন্দের যোগগ্রন্থগুলি অনুবাদ করেছেন (রাজযোগ, কর্মযোগ)। স্বামীজীর একাধিক কবিতারও তিনি অনুবাদক। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। অস্পৃশ্যদের অধিকারের পক্ষে সংগ্রামী কুমারন আসানের কাব্যগুলি সামাজিক তাৎপর্যে পূর্ণ—কিন্তু তাদের অধিকাংশই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত—সেখানে কেবল ব্যঞ্জনায় মেলে সমকালীন সামাজিক বক্তব্য। ব্যতিক্রম ঘটেছে একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থে, নাম 'দুরবস্থা', যার বিষয়রূপে সমকালের সামাজিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রসঙ্গ গৃহীত। সাম্প্রদায়িক মোপলা বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত এই কাব্যে দেখা যায়, এক সর্বোচ্চ নামবুদ্রি ব্রাহ্মণ-পরিবারের সুন্দরী কন্যা সাবিত্রী—তাদের বাড়ি যখন হিংস্র মোপ্লা মুসলমানেরা আক্রমণ ক'রে, পরিবারের মানুষদের খুন ক'রে, পুড়িয়ে ধ্বংস ক'রে দিয়েছিল—তখন সে কোনোক্রমে পালিয়ে গিয়ে প্রাণভয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সর্বনিম্নস্তরের অস্পৃশ্য পুলয়্যা সম্প্রদায়ের এক তরুণ, ছত্তনের কুটিরে। সেই কুটিরে থাকাকালে অচ্ছুত ঐ তরুণের মধ্যে শ্রমের মর্যাদাবোধ, আচরণের শালীনতা এবং উদার মহত্ত্বের আকার দেখে সাবিত্রী মোহিত হয়েছিল—যার তুল্য কিছু সে অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে দেখতে পায়নি। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে ছত্তনকে জীবনসঙ্গী হিসাবে নির্বাচন করেছিল, যদিও ছত্তন এই অসম বিবাহে সংকুচিত ছিলই। নামবুদ্রি তরুণী বিয়ে করছে এক পুলয়্যা যুবককে!!! ব্যাপারটা তখন, এমনকি এখনও অনেকের কাছে বিকট বীভৎস, উল্টোদিকে কারও কারও কাছে বৈপ্লবিক। কুমারন আসানের এই রচনা মালয়ালম সাহিত্যে সমাজবিদ্রোহের ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত। আর এই রচনায় বিবেকানন্দ ওতঃপ্রোত হয়ে আছেন। আসান অনেক সময়ে স্বামীজীর উক্তির কার্যত ভাষান্তর ক'রে গেছেন।

"তামিল ভাষা যতদিন বেঁচে থাকবে, তার সঙ্গে বেঁচে থাকবেন ভারতী"—একথা সোৎসাহে বলা হয়েছে সুব্রহ্মণ্য ভারতী (১৮৮২-১৯২১) সম্বন্ধে। সাহিত্য সর্বদাই নব নব মহাপ্রতিভার সন্ধানে ধাবিত, এবং তার স্বীকৃতিতে উৎসাহী, কেননা তার দ্বারা ঘটে সমকালের আত্মতোষণ। তবু তামিল সাহিত্যে এবং ভারতীয় সাহিত্যেও, স্বাধীনতা-পূর্বকালে ভারতীই জাতীয়তার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, এমন কথা বলা যায়। (ভারতীর জীবনীকার প্রেমা নন্দকুমার অবশ্য ভারতীর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের গরিমা খ্যাপনে বলেছেন, ভারতীর বহুবিস্তারিত রচনার একাংশ মাত্র তাঁর দেশাত্মবোধক রচনাবলী। এখানে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, স্বাধীনতা পাবার পরে 'জাতীয়তার কবি' কথাটার 'মুদ্রামূল্য' হ্রাস পেয়েছে)।

ভারতী প্রধানত কবি। তবে গদ্য রচনায় তাঁর খ্যাতি যথেষ্ট। প্রবন্ধকার, অনুবাদক, সাংবাদিক—এমনকি তিনি ছোট গল্প ও উপন্যাসের লেখকও। আর আমরা দেখি, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই স্বামী বিবেকানন্দ কোনো না কোনো আকারে তাঁর রচনায় উপস্থিত। স্বামীজী প্রত্যক্ষভাবে যেমন তাঁর রচনায় প্রবিষ্ট, তেমনি প্রবিষ্ট ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমেও। ভারতী নিবেদিতাকে গুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন, নিবেদিতার নামে তিনি সমুচ্চ প্রশস্তিসহ একাধিক কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন। জীবনের এক পর্বে ভারতী তামিল বা ইংরেজীতে বেশ কয়েকটি চরমপন্থী বা বৈপ্লবিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন (যথা 'ইন্ডিয়া', 'বাল ভারত')—এইসব পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দকে ***The Real Father of the New Movement*** বলে উপস্থিত

করার কালে স্বামীজীর সেইসব দেশাত্মবোধক, ওজস্বী বাণী প্রভূত পরিমাণে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে আছে পূর্ণ আত্মোৎসর্গের অমেয় আহ্বান। ভারতী স্বামীজীর চিঠিপত্র, বক্তৃতা, গদ্যরচনা এবং কবিতার অনেক অনুবাদ করেছেন। নিজ সম্পাদিত 'কর্মযোগী' পত্রিকায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, ওঁদের জীবনীও লিখেছেন। ভারতীর মতে, "আধুনিক ভারতের নির্মাতাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের স্থান সর্বোচ্চে।" দার্শনিক প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে ভারতী গ্রহণ করেছিলেন বিবেকানন্দকৃত বেদান্তের আধুনিক ব্যাখ্যা এবং শক্তিবাদ। জাতিপ্রথা ও অস্পৃশ্যতা বিষয়ে তিনি বিবেকানন্দ-চিন্তাকে জীবনে রূপায়িত করতে সচেষ্ট ছিলেন। নিম্নবর্ণের মানুষের সঙ্গে তিনি স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করতেন, সেজন্য কার্যত তাঁকে জাতিচ্যুত হতে হয়েছিল।

দেশাত্মবোধ, বীরভাব, আত্মোৎসর্গ, জাতিভেদের বিরুদ্ধে ধিক্কার, শক্তিতত্ত্ব এবং অদ্বৈতচেতনায় পূর্ণ সুব্রহ্মণ্য ভারতীর রচনায় বিবেকানন্দ কিভাবে সন্নিবিষ্ট তার বহুতর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, এখানে তা সম্ভব নয়।

হিন্দী সাহিত্যে বাস্তবতার জোয়ারের কালে প্রেমচন্দ (১৮৮০-১৯৬০) 'আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে'। ১৮টি উপন্যাস এবং ২২৪টি গল্পের এই লেখক হিন্দী গদ্যসাহিত্যে 'প্রেমচন্দ যুগের' স্রষ্টা।

প্রেমচন্দের রচনার মধ্যে দেখা যায়, তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির সমালোচক, সমাজসংস্কারে আগ্রহী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক। গান্ধীবাদ, বিপ্লববাদ, সমাজতন্ত্র—এসব সম্বন্ধে তাঁর আকর্ষণ ছিল। বাংলা দেশ ও তার সংস্কৃতি সম্বন্ধে ছিল বিপুল শ্রদ্ধা।

সূচনায় আছেন বিবেকানন্দ। প্রেমচন্দের আধুনিকতায় ঐতিহ্যের প্রত্যাখ্যান ছিলনা—এবং তিনি আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তারূপে স্বামী বিবেকানন্দকে পেয়েছেন। দেশপ্রেমের উদ্‌গাতা এবং অস্পৃশ্যতা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার প্রতিবাদী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রেমচন্দের আকর্ষণ শেষপর্যন্ত বজায় ছিল। ২৩ মার্চ ১৯৩২, হিন্দী কথাশিল্পী উপেন্দ্রনাথ অশক-কে তিনি এক পত্রে লিখেছেন, "...এবং অবশ্যই রোমা রোলাঁর বিবেকানন্দ পড়বে।"

তরুণ যৌবনে প্রেমচন্দ বিবেকানন্দের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন। তার মধ্যে অধ্যাত্মবিশ্বে বিবেকানন্দের প্রদীপ্ত প্রকাশের বন্দনা ছিল: "যেসব বিরাট পুরুষ ভারতীয় নবজাগরণের শঙ্খধ্বনি করেছেন, তাঁদের শীর্ষে বিবেকানন্দের স্থান। তাঁর দিব্যবাণীতে কেবল ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের উদ্দীপ্ত ঘোষণা। ...তিনি অধ্যাত্ম আলোকের যে-শিখা প্রজ্বলিত ক'রে গেছেন, তা চিরদিন জগতে জ্যোতিদান করবে।"

কেবল অধ্যাত্মক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও বিবেকানন্দের বক্তব্যকে প্রেমচন্দ বরণ করেছেন। ক্ষুধিত ভারতে অন্নদানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; সমাজসংস্কার মানে গুটিকতক উচ্চবর্গীয় মানুষের কিছু কুপ্রথার ছেদন নয়; বস্তুত তার অর্থ, কোটি কোটি নিম্নবর্ণের মানুষের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা সমস্যার সমাধান, এবং তাদের উন্নীত ক'রে উচ্চবর্ণের মানুষের সঙ্গে সমস্তরে স্থাপন। স্বামীজীর এইসকল চিন্তাকে রচনায় এবং উপন্যাসে (বিশেষত সুবিখ্যাত 'গোদান' উপন্যাসে) প্রেমচন্দ প্রকাশ করেছেন।

প্রেমচন্দের সাহিত্যিক পুত্র অমৃত রায় তাঁর 'কলম কা সিপাহী' নামক আকাদেমি

পুরস্কারপ্রাপ্ত পিতৃজীবনীতে প্রেমচন্দের উপরে স্বামীজীর বিশেষ প্রভাবের কথা জানিয়েছেন। পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের যখন গৌরবময় আবির্ভাব হয় [অমৃত রায় লিখেছেন] "তখন ভারতবাসীর হৃদয় পূর্ণ হয়েছিল গৌরবে, তাদের শিরাধমনীর রক্তপ্রবাহে গতিবৃদ্ধি ঘটেছিল, নেত্র হয়েছিল উজ্জ্বলতর। সে এক যাদুপ্রভাব। অল্পদিনের মধ্যে বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা স্বাধীনতাকামী তরুণদের কাছে হয়ে ওঠে নবগীতা। জাতির ঊষর জীবন ভরে ওঠে ফুলে ফলে। হীনম্মন্যতা দূর হয়ে জাগ্রত হয়েছিল আত্মগৌরববোধ।" অমৃত রায় আরও বলেছেন, বিপ্লব আন্দোলনে যোগ না দিলেও প্রেমচন্দের মন ঝুঁকে পড়েছিল মাৎসিনী, গ্যারিবলডি ও বিবেকানন্দের দিকে। বিশেষভাবে বিবেকানন্দের বিষয়ে অমৃত রায় বলেছেন: "সকলেরই জানা আছে, ওই প্রজন্ম বিবেকানন্দের কাছ থেকে কত মনোবল পেয়েছিল। মুনশীজী [প্রেমচন্দ] উগ্র রাষ্ট্রবাদের প্রবাহমধ্যে ছিলেন। ...এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের দিকে তিনি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হবেন, তাতে আশ্চর্যের কি আছে?"

হিন্দী সাহিত্যের অগ্রগণ্য কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (১৮৯৬-১৯৬১), যিনি 'নিরালা' এই লেখক-নামে অধিক পরিচিত—তিনি যে, হিন্দী সাহিত্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রচারক, তাতে সন্দেহ নেই। নিরালার শৈশব এবং যৌবন কেটেছিল বাংলায়, সেই পর্বে তিনি নিজ মাতৃভাষার মতো বা তারো বেশি বাংলা জানতেন, বাংলার সাংস্কৃতিক গৌরবযুগের রসপান করেছেন আকণ্ঠ, হিন্দী সাহিত্যে 'ছায়াবাদের' প্রবর্তকরূপে একদল শক্তিশালী কবিকে অনুবর্তী পেয়েছেন, আজীবন সংগ্রাম করেছেন অনাচার ভণ্ডামী ও ধান্দাবাজির বিরুদ্ধে—এবং ঐসব কঠিন কর্কশ পাথরে ধাক্কা খেয়ে, রক্তাক্ত হয়ে, বিদ্রোহের চীৎকার নিয়ে ফেটে পড়েছেন কথায় ও কাব্যে।

নিরালা কিছুকাল রামকৃষ্ণ মিশনের হিন্দী পত্রিকা 'সমন্বয়'-এর সম্পাদনা করেছেন। এই সময়ে স্বামী সারদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। সারদানন্দ তাঁর গুরু, যাঁর সান্নিধ্যে লব্ধ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা নিরালা নিজেই লিখে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণমণ্ডলী সম্বন্ধে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিরালার ১৫টি প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্বামী বিবেকানন্দের ৮টি কবিতার অসাধারণ অনুবাদ তিনি করেছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য বিষয়ে অন্য লেখাও তাঁর আছে।

নিরালা তাঁর বিবেকানন্দ বিষয়ক লেখায় স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার কয়েকটি দিকের উপর জোর দিয়েছেন: এক, অদ্বৈতচেতনা, দুই, শক্তিবাদ, তিন, আকুল মানবপ্রেম, যা ক্ষুধিত ও বঞ্চিতের সঙ্গে একই যন্ত্রণায় আছাড়িপিছাড়ি করে। হিন্দী সাহিত্যের আলোচকরা স্বামীজীর *To The Awakened India* কবিতার ভাবাশ্রয়ে নিরালা-রচিত 'জাগো ফির একবার' কবিতাটির উদাত্ত ধ্বনিঝঙ্কার ও জ্বলন্ত প্রেরণার প্রশংসায় মুখর। নিরালার 'সেবা প্রারম্ভ' নামক কবিতায় রয়েছে বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবাধর্মের অত্যুজ্জ্বল বর্ণনা। তাঁর 'ভক্ত ও ভগবান' গল্পে নিজ গৃহ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিবেশের বিচিত্র মিশ্রণ। 'অধিবাস' কবিতায় কর্মবিরতি ও কর্মযোগের টানাপোড়েনের দ্বন্দ্বকথা—যার রূপ দেখা গেছে স্বয়ং বিবেকানন্দের জীবনে। 'দান' কবিতায় পাই—তথাকথিত ধর্মধ্বজীদের ছবি, যারা পশুর মুখে খাদ্য জুগিয়ে পুণ্যার্জন করতে সচেষ্ট, কিন্তু অনাহারে কঙ্কালসার মানুষের দিকে ফিরেও তাকায় না। বলা বাহুল্য, এর পিছনে আছে স্বামীজীর সুপরিচিত কিছু উক্তি। "নিরালার 'রাম

কি শক্তিপূজা' হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।" এই দীর্ঘ কবিতাটিতে লক্ষ্যলাভের জন্য আত্মোৎসর্গের যে-সমুচ্চ ভাবময় রূপ দেখা যায় তা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মাতৃভাবনা ও শক্তিবাদ-আশ্রিত। নিরালা বলেছেন, "শূদ্র নামে কথিত নিপীড়িত জাতিসমূহের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন বৈষ্ণবধর্মের মতো [একালে] রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের দ্বারা হয়েছিল।" 'চোটী কি পকড়' নামে একটি উপন্যাস তিনি বিবেকানন্দের স্মৃতিতে উৎসর্গ করেন—সে উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে আছে নিপীড়িত মানুষের প্রতি মমত্ব, নিম্নবর্ণের উত্থানের প্রেরণা, দেশকে স্বাধীন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

নিরালার রচনায় বিবেকানন্দ-প্রভাবের অনুসন্ধান করার প্রয়োজন বিশেষ থাকেনা যখন তাঁর এই স্বীকারোক্তি পড়ি:

> "আমি যখন এইভাবে খুব তেজের সঙ্গে কথা বলি তখন মনে করো না যে, আমি নিরালা কথা বলছি। ভেবে নিও, আমার মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ কথা বলছেন। তোমরা তো ভালো করেই জানো, বিবেকানন্দের সমস্ত লেখা আমি হজম করেছি। তাই যখন আমার ভিতর থেকে এই ধরনের কিছু বেরিয়ে আসে তখন নিশ্চয় জেনো, কথা বলছেন আর কেউ নন—স্বয়ং বিবেকানন্দ।"[৩৪]

ভারতের আঞ্চলিক ভাষা-সাহিত্যে বিবেকানন্দের উজ্জীবক প্রেরণার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বিভিন্ন ভাষার কয়েকজন অগ্রগণ্য সাহিত্যকারের উদ্বুদ্ধ সৃষ্টির প্রসঙ্গই করেছি। ঐসকল সাহিত্যিক অবশ্যই স্ব-স্থানের প্রেরণাময় বাতাবরণের অন্তর্গত ছিলেন—সে সম্বন্ধে অধিক বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, এবং উপযুক্ত গবেষণার অভাবে প্রয়োজনীয় উপাদানও এই ভিন্নভাষী লেখকের আয়ত্তে নেই। তবে অভীপ্সিত কাজটি কিছু পরিমাণে করা সম্ভব হয়েছে মরাঠি ভাষার ক্ষেত্রে, এবং আমরা কিছু বিস্ময়কর সংবাদের সম্মুখীন হয়েছি।

যতদূর জানি, সকল ভারতীয় ভাষার মধ্যে মরাঠি ভাষাতেই স্বামীজীর জীবনকালে তাঁর ভাবধারা জনসাধারণের মধ্যে সমধিক বিস্তারলাভ করেছিল অনূদিত গ্রন্থাদি মারফত। বাংলার স্থান এক্ষেত্রে দ্বিতীয়। যেখানে স্বামীজীর ইংরেজী রচনার বাংলা অনুবাদ কেবল উদ্বোধন পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে, এবং অনূদিত গ্রন্থাদির প্রকাশ উদ্বোধন কার্যালয় থেকেই (এক্ষেত্রে কপিরাইট-নিয়মের বিধিনিষেধ থাকতে পারে), সেখানে মহারাষ্ট্রে বেশ কয়েকজন লেখক সমূহ উৎসাহে স্বামী বিবেকানন্দের, কিছু অল্প পরিমাণে শ্রীরামকৃষ্ণের, জীবন ও চিন্তার বিষয়ে প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ ক'রে গেছেন। স্বামীজীর জীবনকালেই তাঁর জীবনকথা মরাঠি ভাষাতে বেরিয়েছে।

বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পূর্বেই মহারাষ্ট্র সমাজসংস্কারের নানা পর্ব অতিক্রম করেছিল। স্ব-স্বভাবে মরাঠিরা দৃঢ় চরিত্র, কঠোর পরিশ্রমী এবং শক্তিকঠিন জাতীয়তায় বিশ্বাসী। সেজন্য তাঁরা কল্পনা-কুণ্ডলিত ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ সাহিত্য অপেক্ষা চিন্তাঋদ্ধ মননসাহিত্যের অধিক সমাদরকারী। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের গভীর আস্থা। আলোচ্যকাল সম্বন্ধে অন্তত সেকথা প্রধানাংশে সত্য। সেজন্য মহারাষ্ট্র বিবেকানন্দকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত ছিল। বালগঙ্গাধর তিলক এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামী এন সি কেলকার

তাঁদের সম্পাদিত 'কেশরী' (মরাঠি) এবং 'মরাঠা' (ইংরেজী) পত্রিকায় সমাদর ও সমর্থন-সহ নিয়মিত বিবেকানন্দ-সংবাদ পরিবেশন ক'রে গেছেন। তাঁদের বিবেচনায় বিবেকানন্দ অতিকায় চিন্তাবীর, অধ্যাত্মজগতে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ, ভারতীয় প্রতিভার আত্মিক বিগ্রহ, এবং ভারতীয় জাতীয়তার আধ্যাত্মিক পিতা। এই পর্ব প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে সুপণ্ডিত ডাঃ পি জি সহস্রবুদ্ধে তাঁর 'লোকসত্তা' (১৯৫৪) গ্রন্থে বলেছেন:

"আমেরিকায় বিবেকানন্দের বিজয় নানা দিক দিয়ে আলেকজান্ডার বা নেপোলিয়নের বিজয় অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যাপার। পাশ্চাত্যে স্বামীজীর জয়সংবাদ শোনামাত্র এক বিজিত নৈরাশ্যগ্রস্ত মৃতকল্প জাতি নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। জেগে উঠেছিল জাতিগর্ব, আত্মবিশ্বাস; বহুযুগের অন্ধকার বিগলিত হয়ে তখন যেন উদিত হলো নতুন প্রভাত—যাতে উদ্‌ভাসিত ভারতমাতার গৌরবোজ্জ্বল মুখচ্ছবি। স্বামীজী যখন তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যদের নিয়ে কলম্বোর সমুদ্রতটে জাহাজ থেকে অবতরণ করলেন তখন মনে হয়েছিল—পূর্ণ প্রভায় উন্মোচিত জ্যোতির্ময় সূর্য। স্বামীজী তারপর তাঁর কাজ শুরু ক'রে দিলেন।"[৫]

স্বামীজীর কালে তাঁর রচনার অনুবাদ ও তাঁর জীবনকাহিনী রচনার ব্যাপারে কৃষ্ণাজী নারায়ণ অঠল্যে (১৮৫২-১৯২৬) অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সুপ্রচারিত মরাঠি মাসিক 'কেরল কোকিল'-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। স্বামীজীর দেহত্যাগে অঠল্যে অন্যান্য কথার সঙ্গে এ-কথাও লেখেন: "যখন তমোময় কলিযুগের অন্ধকার ঘনতম, তখন শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বৈদিক ধর্মকে উদ্ধারের জন্য নারায়ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।... এই অতুলনীয় অবতারের বন্দনা করেছে বৃহত্তর পৃথিবী।" অঠল্যে তাঁর পত্রিকায় স্বামীজীর জীবনকালে ও পরেও, স্বামীজী সম্বন্ধে অনেক রচনা প্রকাশ করেছেন। ১৮৯৭ সালে স্বামীজীর যোগগ্রন্থাবলী পাঠ ক'রে আনন্দে উদ্বেল হয়ে তিনি স্থির করেন যে, তাঁর পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ঐ গ্রন্থগুলির অনুবাদ প্রকাশ ক'রে যাবেন। সেখানে রাজযোগের অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকলে পাঠকগণ প্রশংসাসূচক যেসব পত্র পাঠান, সেগুলি তিনি পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। ম্যাক্সমূলারের 'রামকৃষ্ণ-জীবন ও উক্তি'-কে ভিত্তি ক'রে অঠল্যে 'সস্তা বেদান্ত সিরিজ'-এর প্রকাশ শুরু করেন। ১৮৯৯ সালে রাজযোগ মরাঠিতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়—১৯০০ সালে কর্মযোগ—সেই সঙ্গে 'সুলভ বেদান্ত' নামক গ্রন্থে ৩৬০টি রামকৃষ্ণ-উক্তির সংকলন। ১৯০১ সালে বেরোয় ভক্তিযোগ। ১৮৯৯-এর ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯০০ জুলাই মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ঐ পত্রিকায় বেরিয়েছে বিবেকানন্দ-জীবনকথা। ১৯১২ সালে অঠল্যে পুনা থেকে বৃহত্তর আকারে বিবেকানন্দ-জীবনী প্রকাশ করেছেন। এই বইয়ের ভূমিকায় তিনি লেখেন:

"বিবেকানন্দ! কি মধুর এই নাম! তাঁর পূর্ণরূপ অনুধাবন করতে হলে বহুজন্মের নিবিড় পবিত্র সাধনার প্রয়োজন হবে।...শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য, সমর্থ রামদাসের মতো অবতারদের দিন এখন নেই। তাঁদের কালে তাঁরা যা ছিলেন, নিজ কালে বিবেকানন্দ একই প্রকার। এমনকি কোনো কোনো দিক দিয়ে তিনি অধিকতর গুণাবলীর অধিকারী।"

স্বামীজীর জীবনকালে তাঁর যোগগ্রন্থের একমাত্র অনুবাদক অবশ্য অঠল্যে নন। ১৯০০ সালে স্বালারাম অ্যান্ড কোং স্বামীজীর সকল যোগগ্রন্থ একসঙ্গে প্রকাশ করেছে। কর্মযোগের অনুবাদক—শঙ্কর ভিট্টল কালাম; রাজযোগের—চিন্তামন গঙ্গাধর ভানু; ভক্তিযোগের—

গুণগ্রাহী। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই বেরিয়েছে নীলকণ্ঠ চাপেকর-কৃত স্বামীজীর জ্ঞানযোগের অনুবাদ। 'গ্রন্থমালা' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক বিজাপুরকর তাঁর পত্রিকায় বিবেকানন্দ-স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন—'শঙ্কর দিগ্বিজয়'-এর রীতিতে 'বিবেকানন্দ দিগ্বিজয়' রচিত হওয়া উচিত। তাঁর তত্ত্বাবধানে স্বামীজীর রচনাদির অনুবাদ শুরু হয়ে যায়। তাঁর 'গ্রন্থমালা'য় গণেশকৃষ্ণ আগাসী জ্ঞানযোগ বিষয়ে বিবেকানন্দের অন্য ১২টি বক্তৃতার অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকেন—১৮৯৯-১৯০০ সালের মধ্যে। এই পত্রিকায় স্বামীজীর যে ১২টি বক্তৃতার অনুবাদ বেরিয়েছে, যেগুলি পরে 'সুলভ গ্রন্থ' সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিলকের কেশরী পত্রিকায় ২০ অগস্ট ১৯০০ তারিখে স্বামীজীর কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং রাজযোগের অনুবাদের উপর সম্পাদকীয় স্তম্ভে আলোচনা করা হয়, উচ্চ সমাদর জানিয়ে। এই অনূদিত গ্রন্থগুলি নিয়ে 'পরমার্থমাল' সিরিজ শুরু হয়েছিল। কেশরীর মন্তব্যে ছিল: "বিবেকানন্দ অতীব চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে, আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে, এই যোগগ্রন্থগুলি রচনা করেছেন—যে যোগসমন্বয় শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় প্রথম সম্পাদন করেন।"

স্বামীজীর সময়ে বা তাঁর পরে অন্য অনেক মরাঠি পত্রিকা শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণের জীবন ও শিক্ষার উপরে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। ১৯০১ সালে মরাঠি পত্রিকা কেতকী-র সম্পাদক কৃষ্ণরাও অস্মাদকর, স্বামীজীর 'ভক্তি' নামক বক্তৃতার ভিত্তিতে 'ভক্তি' পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৫ সালে স্বামীজীর গ্রন্থ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' সরাসরি বাংলা থেকে অনূদিত হয়ে সোলাপুর থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯১০ সালের আগে স্বামীজীর একগুচ্ছ পত্র অনূদিত হয়ে বেরিয়েছে বোম্বাই কর্নাটিক প্রেস থেকে—পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০২। স্বামীজীর আর একটি পত্রসংকলন বেরিয়েছে বোম্বাই-এর 'মনোরঞ্জক গ্রন্থ প্রসারক মণ্ডলী' থেকে। কৃষ্ণাজী গোবিন্দ কিনরে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তার বিবরণ অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেছেন 'মুলঘাটি ও সম্ভাষণ' নামে। বিশ্বনাথ বিনায়ক কঙ্কর স্বামীজীর 'মহাপুরুষ প্রসঙ্গ' অনুবাদ করেন 'মহাত্মা পরিচয়' নামে, পৃ. ১৭৮। ১৮৯৯ সালে প্রখ্যাত মরাঠি ঔপন্যাসিক হরিনারায়ণ আপ্তে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে ৬০ পৃষ্ঠার বই প্রকাশ করেন। এই ধরনের বই আরও বেরিয়েছে। কৃষ্ণাজি গোবিন্দ কিনরে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' (শ্রীম-কথিত) অনুবাদ করেন;—প্রথম ভাগ ১৯১২ সালে (পৃ. ৩০৪), দ্বিতীয় ভাগ ১৯১৫ সালে (পৃ. ২৫৭)। ১৯১৩ সালে নগেশ বাসুদেব গুণোজি কথামৃতের নির্বাচিত অংশ অনুবাদ ক'রে দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন—প্রথম খণ্ড 'শ্রীরামকৃষ্ণ' (পৃ. ৩১৫), দ্বিতীয় খণ্ড 'শ্রীরামকৃষ্ণচি বোধ বচনে' (পৃ. ১৬৩)। এই ধরনের বইয়ের মধ্যে পড়ে নরহরি রামচন্দ্র পরাঞ্জপে প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণের বিস্তৃত জীবনী—প্রথম ভাগ ১৯২৩ সালে (পৃ. ৩৭৬), দ্বিতীয় ভাগ ১৯২৫ সালে (পৃ. ৪০৮)। ইনি স্বামী সারদানন্দ-কৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ এবং অন্য কয়েকটি উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। উল্লেখ করা যায়, এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শভিত্তিতে সাময়িকপত্রও প্রকাশিত হয়েছে।

আরও সংবাদ: জগন্নাথ বাওজি টুলু স্বামীজীর উপরে লেখা কবিতা নিয়ে ৫০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অগস্ট ১৯০২ সালে মাসিক 'বালবোধ' পত্রিকার সম্পাদক বিনায়ক কোণ্ডদেব স্বামীজীর যোগগ্রন্থগুলির উল্লেখের পরে এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন: "ঐ যোগগ্রন্থগুলির ভাববীজ ইতিমধ্যেই বিস্তৃত ভূমিতে পতিত হয়েছে এবং তারা

বৃষ্টিপাতের অপেক্ষায় আছে। যথাকালে বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়ে তারা তাদের পুষ্পসৌরভের দ্বারা মানবজাতির হৃদয়ে হর্ষসঞ্চার করবে এবং তাদের অমৃতফলগুলি দান করবে প্রাণোত্তপ্ত নবজীবনসুধা।”

পাণ্ডুরঙ্গ সদাশিব সানে (১৮৯৯-১৯৫০)—'সানে গুরুজী' নামে যিনি অধিক পরিচিত—তাঁর বহুধাব্যক্ত কার্যাবলীর জন্য মহারাষ্ট্রের প্রবাদপুরুষ। বিভিন্ন ধরনের শতাধিক পুস্তক তিনি লিখেছেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রভাবশালী সমাজকর্মী, একাধিক সাময়িকপত্রের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ১৯৩২-৩৩ সালে নাসিক জেলে যখন অন্তরীণ ছিলেন (স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেবার জন্য), তখন জেলে বসেই তিনি ভগিনী নিবেদিতার 'রিলিজন অ্যান্ড ধর্ম' বইটির অনুবাদ করেন। তার ভূমিকায় নিবেদিতার জীবনচিত্র দিয়েছেন। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ও সমর্থ রামদাসের তুলনাকালে তিনি উভয়ের সাহস, ত্যাগ, ঈশ্বর-উপলব্ধি এবং সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে জ্বলন্ত ভালবাসা ও তাদের উন্নয়নের জন্য নিরন্তর ব্যাকুল আহ্বানের কথা বিশেষ জোর দিয়ে তুলে ধরেন।

আলোচ্য প্রসঙ্গে তিনজন মানুষের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন যাঁরা কয়েক দশক ধরে তন্ময় সাধনায় মরাঠিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য সৃষ্টিতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের একজন—গণেশ বামন গোগটে—বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনাবলী অনুবাদের কঠিন কাজ গ্রহণ করেন। তার প্রথম খণ্ড বেরোয় ১৯১২ সালে এবং শেষ খণ্ড ১৯৩১ সালে—প্রকাশক, কর্নাটক প্রেস। বইটির নাম—'স্বামী বিবেকানন্দ যাঁচে সমগ্র গ্রন্থ'—২৩টি খণ্ডে বিভক্ত। বইটি জনপ্রিয় হয় এবং একাধিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়।

বাকি দুই উল্লেখ্য লেখক হলেন বিষ্ণু ভাস্কর ফাড়কে এবং রামকৃষ্ণ বাসুদেব বর্বে। এঁরা একত্রে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ লিখিত' স্বামীজীর চারখণ্ডের বৃহৎ জীবনীর অনুবাদ শুরু করেন। ১৯১৭ সালে বইটির প্রথম খণ্ড বেরোয়। কিছুদিনের মধ্যে আরও তিনটি খণ্ড। চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের পরে ১৯১৮ সালে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ফাড়কের দুঃখজনক মৃত্যু ঘটে। অসমাপ্ত কার্যভার গ্রহণ করেন রামচন্দ্র নারায়ণ মাণ্ডলিক। তিনি আরও ৭টি খণ্ড প্রকাশ করেন। এই কালপর্বের গবেষক রেভাঃ ডঃ ম্যাথু লেডার্‌লে-র মতে এই বই মরাঠি ভাষায় লিখিত সর্ববৃহৎ জীবনী।

নাগপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রকাশিত পুস্তকাবলীর উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকছি। তাদের সংখ্যা বিস্ময়কর, সমাদরও অনুরূপ।

মরাঠি সাহিত্যের সৃষ্টিশীল অংশে বিবেকানন্দের বিশেষ প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয়, এ-সম্বন্ধে কোনো সুবিহিত গবেষণা হয়নি: কিছু বিচ্ছিন্ন সংবাদের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। যাই হোক, একথা জেনেছি যে, মরাঠায় একদা সামাজিক নাটকে স্বামী বিবেকানন্দের আদলে গঠিত একজন সন্ন্যাসীকে দেখা যেত, যাঁর সাজপোশাক স্বামীজীর মতো এবং কথাবার্তায় স্বামীজীর চিন্তার অনুসৃতি।

খ্যাতিমান মরাঠি নাট্যকার অচ্যুত বলবন্ত কোলাটকর ১৯১২ সালে 'বিবেকানন্দ' নামে পাঁচ অঙ্কের একটি নাটক লিখেছিলেন। ভূমিকায় লেখক দেশবাসীকে সম্বোধন ক'রে বলেন; “যদি সত্যই তুমি জাগ্রত ও উত্থিত হতে চাও তাহলে বিবেকানন্দের রচনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করো। জয় দাও তাঁর। একান্তই তা প্রয়োজন।”

মরাঠি সাহিত্যে দিকপাল লেখক মামা ওয়ারেকর। এই অত্যন্ত জনপ্রিয় সাহিত্যিক ৩৬টি নাটক, ২৬টি উপন্যাস, ২৫টি ডিটেকটিভ গল্প, ৪টি ছোটগল্প সংকলন, ৬টি একাঙ্কিকা সংকলন, ১০০টি প্রবন্ধ এবং ৪ খণ্ডে আত্মজীবনী লিখেছেন। তা ছাড়াও অনুবাদ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র-সহ অন্য কয়েকজন বাঙালী লেখকের লেখাও। তবে তাঁর বিপুল সাহিত্যসম্ভারের মধ্যে নাটকগুলিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত। বিখ্যাত সমালোচক আচার্য আত্রে মরাঠি নাটকের ইতিহাসে ১৯২০-৩০ পর্বকে 'ওয়ারেকর যুগ' ('গরকরি ওয়ারেকর এজ্') বলে চিহ্নিত করেছেন। মরাঠি সাহিত্যে অগ্রগণ্য ভূমিকার জন্য ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মান দিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য মনোনীত করেছেন।

এই সুবিখ্যাত লেখকের পরম সৌভাগ্য—ইনি তরুণ যৌবনে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ সংস্রবে এসেছিলেন। পিতার নির্বন্ধে পড়ে বিবাহ করতে হলেও সন্ন্যাসজীবনের প্রতি আকর্ষণের জন্য স্বামীজীর কাছে আলমোড়ায় গিয়ে উপস্থিত হন। স্বামীজী তখন ওই স্থানে তাঁর কয়েকজন সন্ন্যাসী গুরুভাই ও সন্ন্যাসী শিষ্যের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। সেখানে ভগিনী নিবেদিতা, মিস ম্যাকলাউড, মিসেস ওলি বুল প্রমুখ পাশ্চাত্য শিষ্যরাও ছিলেন। ওয়ারেকর স্বামীজীর সান্নিধ্যে থাকাকালে স্বামীজীকে নানা সময়ে ভারতীয় মহাকাব্য, পুরাণ ও শাস্ত্রাদির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে শুনেছেন। স্বামীজীর প্রাণোন্মাদী ভাষণ শ্রোতাদের মনপ্রাণকে আকর্ষণ ক'রে পৌঁছে দিত এক সুদূর অজ্ঞাত রাজ্যে—তারা উন্নীত হতো অপরিমেয় আনন্দময় সমুচ্চ লোকে। স্বামীজীর কণ্ঠস্বরের অনন্যসাধারণ বিস্তার ওয়ারেকরকে অভিভূত ক'রে ফেলত। তিনি লক্ষ্য করেন, সঙ্গীতের সময়ে অতি উচ্চগ্রামে কণ্ঠস্বর তুলেও তাকে স্বামীজী স্বচ্ছন্দে লীলায়িত ভঙ্গিতে একেবারে নিম্নগ্রামে নামিয়ে আনতে পারেন। ভারতের বহুসংখ্যক খ্যাতনামা গায়কের গান ওয়ারেকর শুনেছেন—তাঁদের মধ্যে মরাঠি মঞ্চের প্রখ্যাত গায়ক মুরু কোলহোকর-ও আছেন—কিন্তু কারো মধ্যেই স্বামীজীর কণ্ঠস্বরের সম্মোহনশক্তি ছিলনা। স্বামীজী আবার ওস্তাদ তবলাবাদকও। তাঁর তুলনায় অপর তবলচিরা, ওয়ারেকরের অভিজ্ঞতায়, শিক্ষানবিশের বেশি কিছু নয়।

স্বামীজী এই বিবাহিত যুবকটির সন্ন্যাসবাসনা অনুমোদন করেন নি। তাঁকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে রামকৃষ্ণ আশ্রমকে নিজের বলে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। আরও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার, ওয়ারেকরকে স্বামীজী 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চের পিতা' গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাছে পাঠান। স্বামীজী গিরিশচন্দ্রকে বলেছিলেন, "জি সি, এই ছেলেটিকে তুমি নিজের ছেলের মতো ক'রে নিও, একে তুমি নিজের নাট্যসাধনার উত্তরাধিকারী ক'রে তুলবে। সেই আশায় একে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি, যাতে তুমি যে-সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যধারার প্রবর্তন করেছ তাকে এ যেন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।" ওয়ারেকর মাঝে মাঝে গিরিশের কাছে গিয়ে থাকতেন এবং নাট্যশিল্প শিক্ষা করতেন। স্বামীজী আদিবাসী কেষ্টাকে কিভাবে ভূরিভোজে পরিতৃপ্ত করেছিলেন, ওয়ারেকর তার প্রত্যক্ষদর্শী। স্বামীজী কেষ্টার ভোজনান্তে বলেন, "আজ আমি সত্যই নারায়ণসেবা করলুম।" সন্ন্যাসীদের স্বামীজী জোর দিয়ে বলতেন, "যাও, নীচজাতি, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্যদের নারায়ণজ্ঞানে সেবা করো।"

স্বাভাবিকভাবেই ওয়ারেকরের রচনায় নানাভাবে স্বামীজীর জীবন ও ভাবধারা উন্মোচিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'সন্ন্যাসচ সম্সার' নাটকটির কথা তোলা যায়। ওয়ারেকর

খোলাখুলি জানিয়েছেন, স্বামীজীর সঙ্গলাভের অভিজ্ঞতাকেই তিনি নাটকটিতে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করেছেন। নান্দী-অংশের সঙ্গীতে তিনি নরেন্দ্রকে নিজ গুরুরূপে ঘোষণা ক'রে বলেছেন:

"নরেন্দ্র পুরুষোত্তম, ধর্মরাজ্যে উদ্‌ভাসিত পূর্ণচন্দ্র, নিজ ধর্মের গৌরবে পূর্ণপ্রাণ, একইসঙ্গে অপর সকল ধর্মের সমরূপত্বে বিশ্বাসী, সর্বমানবের সাম্যের প্রবক্তা, কলিযুগের তমসামধ্যে জ্যোতির্ময় সূর্য। স্বয়ং মহাদেব—পরমবাঞ্ছিত নির্বিকল্প ধ্যানলোক থেকে অবতরণ করেছেন নশ্বর পৃথিবীতে মহাবীর রূপে—পরিভ্রমণ করেছেন দুই গোলার্ধে—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষকে সাম্যসূত্রে আবদ্ধ করার জন্য।"

নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় বোম্বাইয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৯, নির্বাচিত দর্শকদের সামনে। লোকমান্য তিলক উপস্থিত ছিলেন। নাটক আরম্ভের আগে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। বিখ্যাত গায়ক রামকৃষ্ণ বুয়া সঙ্গীত পরিচালনা করেন। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল।

নাটকটির বিষয়বস্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সামাজিক জীবনে ও সন্ন্যাসজীবনে বরণীয় আদর্শের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ কী ধরনের নবভাব সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। নাটকের প্রধান চরিত্র এক শঙ্করাচার্য, যিনি জনৈক বাঙালী সন্ন্যাসীর ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে 'সেবাধর্ম'কে গ্রহণ করেছিলেন চূড়ান্তভাবে, যা ভারতীয় সন্ন্যাসীদের রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। ধর্মের নবপ্রত্যয়ে জাগ্রত হয়ে নাটকের শঙ্করাচার্য হিন্দুসমাজের দলিত অবনমিত অস্পৃশ্যদের মধ্যে প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। একবার এক বিধ্বংসী বন্যার সময়ে—যে-সময় খ্রীস্টান মিশনারিদের কাছে বড়ই শুভসময়, কেননা দান বিতরণ ক'রে দুঃস্থদের ধর্মান্তরিত করা সম্ভব—এই শঙ্করাচার্য তাঁর শিষ্যদের বলেন, "বিক্রয় ক'রে দাও আশ্রমের সবকিছু, এমনকি দেবতার স্বর্ণবিগ্রহ পর্যন্ত—তাতেও যদি না কুলোয় বেচে দাও মন্দিরের শ্বেতপাথরগুলি। যখন এত সংখ্যক দরিদ্র ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্যের জন্য কাঁদছে তখন শ্বেতপাথরের প্রয়োজন কি? শঙ্করাচার্য কি গলায় পাথর ঝুলিয়ে স্বর্গে যাবেন?" সন্ন্যাসী শেষে বলেন, "যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলাম তখন আমার প্রিয়জনদের সঙ্গসুখে আবদ্ধ হয়ে বাকি পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছিলাম। আর এখন বাস করছি বিরাট জগতে। আমার এই বিশাল ভুবনের সঙ্গে কি গৃহীদের সংকীর্ণ আত্মমগ্ন গৃহগত আশ্রয়ের তুলনা চলে?"

৷৷ কুড়ি ৷৷

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বাংিক খ্যাত কয়েকজন সাহিত্যিকের মধ্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা সমন্বিত বিবেকানন্দের ভাবধারার অনুপ্রবেশ দেখাবার কালে একথা বিস্মৃত হইনি—কোনো বিশেষ কালের জনজীবনে মধ্যখ্যাত বা অল্পখ্যাত সাহিত্যিকদের প্রভাব অল্প হয়না—অনেক ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তার কারণে শেষোক্তদের প্রভাব অধিকতর হয়ে দাঁড়ায়। এই শ্রেণীর অজস্র লেখক, তাঁরা বাংলা ছাড়াও হিন্দী, মরাঠি, গুজরাটি, কানাড়ি, ইত্যাদি সব ভাষাতেই আছেন—বিবেকানন্দের ভাবধারার মধ্যে তাঁরা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে এসেছেন। সব

জড়িয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসব—বিবেকানন্দ কেবল নিজের বাণী ও রচনার মধ্যে অতীত ও বর্তমানের শ্রেষ্ঠাংশকে সম্মিলিত ক'রে ভবিষ্যতের মুক্তপথে অগ্রসর হবার আহ্বান জানান নি—বিস্তৃত ভাবাবহ সৃষ্টি ক'রে তিনি সেই কাজে প্রণোদিত করেছিলেন সারা ভারতের বহু সংখ্যক লেখককেও।[২২]

উল্লেখপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. *Complete Works of Sister Nivedita*, Vol. I, p. 298, অতঃপর N.C.W.
২. Bhupendra Nath Dutta, *Swami Vivekananda: Patriot Prophet*, p. 5.
৩. স্বামী বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা', (১৩৬৯ সং) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৪। অতঃপর 'বাণী ও রচনা'।
৪. ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬-৪৭, C.W. VII, pp. 487-88.
৫. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪-৭৫, C.W. V, p. 287 (1959).
৬. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬-৭৭, C.W. V, p. 289.
৭. ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৪, C.W. II, p. 323 (1958).
৮. N.C.W. Vol. I, pp. 281-82.
৯. Ibid, Vol. 1, pp. 281-82.
১০. বাণী ও রচনা ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪২৮.
১১. ঐ, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২১৪.
১২. ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৮.
১৩. ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২১১.
১৪. ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২১১.
১৫. *Letter of Sister Nivedita* (Ed. Sankari Prasad Basu) Vol. 1, p. 222.
১৬. Ibid, p. 221.
১৭. বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১, C.W. I. (1957) p. 479.
১৮. ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৭১।
১৯. N.C.W., Vol. 1, pp. 127-28.
২০. বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬-৭৭।
২১. Benoy Kumar Sarkar, *Creative India*, Ch., 'Vivekananda as the World Conquerer'.
২২. অধ্যাপক সরকার লিখেছেন: "His [Vivekananda's] politics and economics are all to be found in his social philosophy. And in this domain we encounter Vivekananda as the messenger of modern materialism. It is possible to establish here an equation between Vivekananda and Immanual Kant... What Kant did for Euro-America towards the end of the eighteenth century was accomplished for India towards the end of the nineteenth century by Vivekananda. Kant is the father of modern meterialism for the West, Vivekananda is the father of modern meterialism for India. They are two of the greatest saviours of mankind; it is to them that the world is indebted for the charters of dignity for Nature, matter, material science and meterial welfare... India like Europe was in need of a man who could say with all honesty he could command, that Prakriti was no less sacred than Purush and that the pursuit of material sciences and material prosperity was as godly as that of the sciences and activities bearing on the soul. (Ibid).

বিবেকানন্দের ধর্ম সম্বন্ধে এই সূত্রে স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীর ভূমিকারূপে লিখিত নিবেদিতার বিখ্যাত রচনার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করা যায়:

"...Here he [Vivekananda] becomes the meeting-point, not only of East and West, but also of past and future. If the many and the One be indeed the same Reality [as preached by

Vivekananda], then it is not all modes of worship alone, but equally all modes of work, all modes of struggle, all modes of creation, which are paths of realisation. No distinction, henceforth, between sacred and secular. To labour is to pray. To conquer is to renounce, Life is itself religion. To have and to hold is as stern a trust as to quit and to avoid." [C. W. Vol. 1. p. XV].

স্বামীজীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে বর্তমান লেখকের *Economic and Political Ideas: Vivekananda, Gandhi, Subhas Bose* নামক গ্রন্থে।

২৩. C. W. Vol. III. p. 192.
২৪. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৬।
২৫. Benoy K. Roy, *Socio-Political Views of Vivekananda* (1970).
২৬. C. W., Vol. 1, p. 423.
২৭. N. C. W., Vol. 1. p. 378.
২৮. Ibid.
২৯. Ibid, Vol. 1. p. 282.
৩০. Ibid, Vol. 1. p. 45.
৩১. Ibid, Vol. 1. pp. 47-48.
৩২. বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৯৪।
৩৩. ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৯৩-৯৪।
৩৪. C.W., Vol. II pp. 270-71.
৩৫. বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৮-২৯।
৩৬. ঐ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৯২-৯৩।
৩৭. ঐ, পৃ. ৩২৪।
৩৮. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১।
৩৯. ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২৫।
৪০. লেখক-কৃত 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২-০৩।
৪১. ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১৭।
৪২. ঐ, পৃ. ২১১।
৪৩. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'স্বামী বিবেকানন্দ', পৃ. ২১৩।
৪৪. কুমুদবন্ধু সেন, 'উদ্বোধনের জয়যাত্রা', উদ্বোধন সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, মাঘ, ১৩৫৪।
৪৫. C. W., Vol. V. pp. 258-59.
৪৬. বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪।
৪৭. C. W., Vol. III. pp. 202-03; Vol. V. pp. 258-59
৪৮. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫১-৫২।
৪৯. N. C. W., Vol. 1. pp. 219, 220.
৫০. C. W., Vol. III. pp. 329-30.
৫১. N. C. W., Vol. 1. p. 178.
৫২. Ibid, Vol. I. p. 178.
৫৩. Ibid, Vol. I. p. 178.
৫৪. C. W., Vol. III. pp. 274-75.
৫৫. *Life of Swami Vivekananda*, By His Eastern and Western Disciples, 1st edition, Vol. I. p. 153.
৫৬. C. W., Vol III. p. 334.
৫৭. Ibid, Vol. VI. pp. 143-44.
৫৮. বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯।
৫৯. C. W., Vol. VII. p. 201.
৬০. Ibid, Vol. 1. pp. 321-22.
৬১. *Prabuddha Bharata*, Nov., 1906.

৬২. C. W., Vol. VI. pp. 3-4.
৬৩. Ibid, Vol. VI pp. 3-4.
৬৪. *Reminiscences of Swami Vivekananda*, p. 293.
৬৫. C. W., Vol. p. 258.
৬৬. *Prabuddha Bharata*, Nov., 1906.
৬৭. C. W., Vol. V. p. 374.
৬৮. বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪।
৬৯. ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪-১৫।
৭০. C. W., Vol. I. p. 19.
৭১. স্বামী অশোকানন্দকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, 'কিশোর বাংলা', পৌষ, ১৩৪৮।
৭২. ডাঃ সরসীলাল সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৯-৪-১৯২৮ তারিখের পত্র, 'রবীন্দ্রজীবনী' ৪র্থ খণ্ড।
৭৩. অশোকানন্দকে লেখা পূর্বোক্ত পত্র।
৭৪. 'নিরালা অভিনন্দন গ্রন্থ', পৃ. ১১৪।
৭৫. 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০। মরাঠি সাহিত্য সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন রামকৃষ্ণ সংঘের স্বামী বিদেহাত্মানন্দ।
৭৬. বিবেকানন্দের সাহিত্য ও শিল্পচিন্তা এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব সম্বন্ধে অনেকগুলি অধ্যায় লিখেছি 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে।

[ডঃ নিমাইসাধন বসু সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ 'শাশ্বত বিবেকানন্দ' (১৯৯২)-এর অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধের পরিবর্ধিত রূপ।]

স্বামীজীর সঙ্গে এক প্রার্থনা-সমাজীর সাক্ষাৎকার
নতুন তথ্য

॥ এক ॥

স্বামীজী, তাঁর গুরুভাইগণ, এবং তাঁর শিষ্যদের নিকট-চিত্রের সন্ধানে আমাদের প্রায়ই উপস্থিত হতে হয়েছে মহেন্দ্রনাথ দত্তের বইগুলির কাছে। ওঁদের বিষয়ে (এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়েও) তিনি বেশ-কিছু স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন। এগুলিতে দুটি লক্ষণীয় বস্তু: একদিকে মেলে সচল চিত্রমালা, অন্যদিকে বর্ণিত কাহিনীতে স্বামীজীর বিশেষ-বিশেষ অভিব্যক্তির তাৎপর্য নির্ণয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি, যা মহেন্দ্রনাথের ভাষায় 'অনুধ্যান', যেহেতু ব্যক্তি-অনুভূতি-নির্ভর, তাই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে, কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রটি যেখানে 'ঘটনাবলী' বর্ণিত, গ্রাহ্য হওয়া উচিত, যদি তথ্যবিচ্যুতি না থাকে। 'ঘটনাবলীর' তথ্য-সত্যতা সম্বন্ধে কখনো-কখনো প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, মাঝে-মধ্যে তথ্যভ্রান্তি ঘটলেও, যা বেশ-কিছু বছর পরে কথিত স্মৃতিকথায় ঘটতেই পারে—তার পরিমাণ অল্পই। অন্য অনেক প্রখর স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্মৃতিকথায় ভ্রান্তির তুলনায় মহেন্দ্রনাথের স্মৃতি-ভ্রান্তি মোটেই বেশি নয়। স্মর্তব্য, দত্ত-পরিবারের অন্য অনেকের মতোই মহেন্দ্রনাথ বিশেষ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন।

কিন্তু মহেন্দ্রনাথের নামে প্রচলিত "কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ" বইটির বিষয়ে কী বলা যাবে? বইটি বস্তুতপক্ষে মহেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ স্মৃতিকথা নয়। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় মহেন্দ্রনাথের 'প্রাগ্‌বাণী' (২২ ভাদ্র ১৩৩২) থেকে জানতে পারি, কাশীধামের উক্ত বিবেকানন্দ-স্মৃতি বস্তুতঃপক্ষে স্বামী সদাশিবানন্দের। "১৯২২-২৩ খ্রীস্টাব্দের শীতকালে প্রয়াগে অবস্থানকালে ভক্তরাজের (হরিনাথ ওদেদার বা স্বামী সদাশিবানন্দ) সহিত আমার [মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন] স্বামী বিবেকানন্দ-মহারাজজীর সম্বন্ধে নানাবিধ প্রসঙ্গ হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে ভক্তরাজ বলিলেন, 'স্বামীজী যখন শেষবার কাশীধামে আসিয়াছিলেন তখন আমি স্বামীজীর নিকটে থাকিয়া তাঁহার পরিচর্যা করিয়াছিলাম।' এই কথা শুনিয়া আমি ১৬নং হিউএট রোডস্থ ব্রহ্মবাদিন-ক্লাবে বসিয়া স্বামীজীর সম্বন্ধে ভক্তরাজকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। আমার প্রশ্ন শুনিয়া ভক্তরাজের পূর্বস্মৃতি অনেক পরিমাণে জাগরিত হইতে লাগিল। ভক্তরাজের মুখ হইতে স্বামীজীর উপ্যাখ্যানগুলি শুনিয়া সকলে বড় মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু পাছে সেইগুলি ভবিষ্যতে নষ্ট হইয়া যায় সেইজন্য উপাখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল।"

এই পরিকল্পনা অনুসারে ভক্তরাজের মুখে শুনে মহেন্দ্রনাথ সদ্য-সদ্য ঘটনাগুলিকে নিজের ভাষায় বলে যেতেন এবং সেগুলি লিখে নিতেন উমেশচন্দ্র সেন। ভক্তরাজ লেখক নন, নিজে কলম ধরে নাও লিখতে পারেন, কিন্তু তাঁর কথা হুবহু না টোকার কারণ কী? মহেন্দ্রনাথ মধ্যবর্তিতা ক'রে শ্রুত ঘটনা নিজের মতো ক'রে বলে দিতেন কেন? তার কারণও মহেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন: "ভক্তরাজ তাঁহার সহজ সরল ভাষায় কিছু বলিতেন, আর বাকিটুকু হস্তাদি সঞ্চালন, মুখভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ও ভাববিহ্বল নেত্রদ্বয় দিয়া প্রকাশ করিতেন।...উপাখ্যানগুলি বলিতে বলিতে তিনি সহসা এরূপ উচ্চভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেন যে, আর বলিতে পারিতেন না, ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িতেন। মাঝে মাঝে বলিতেন, 'আমি যেন স্বামীজীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেই সমস্ত ঘরদোর আমার চোখের সামনে ভাসছে দেখছি'।" মহেন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়—ঘটনাগুলির তথ্যরূপ ভক্তরাজ যেভাবে বলেছেন সেইভাবেই গৃহীত, কিন্তু যেখানে তিনি নিজ বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে না পেরে ভাবভঙ্গি দ্বারা তা ব্যক্ত করতে চাইছিলেন, সেখানে অন্তর্গত ভাবকে প্রকাশের ভাষা দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ: "এই সমস্ত উপাখ্যানগুলি, ভক্তরাজের ভাবব্যঞ্জক মুখভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া, ঘটনাগুলির পারম্পর্য ঠিক রাখিয়া, সেইগুলি আমি [মহেন্দ্রনাথ] ভাষায় বলিয়া যাইতাম আর শ্রীউমেশচন্দ্র সেন লিখিয়া যাইতেন।" এইপ্রকারে পুনর্গঠিত অংশগুলিকে অবিলম্বে ভক্তরাজকে শুনিয়ে মহেন্দ্রনাথ অনুমোদন করিয়েও নিয়েছেন। "ভক্তরাজ ও অপর সকলে নিকটে বসিয়া [লিখিত বিবরণ] শুনিতেন এবং তাঁহাদের ভাব যে স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে, ইহা তাঁহারা অনুমোদন করিতেন।" অনুমোদনকারীদের মধ্যে মহাপুরুষ-মহারাজ স্বামী শিবানন্দও ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ কাশীধামে থাকাকালে মহাপুরুষজী যে কেবল তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন তাই নয়, পরে ১৯২২-২৩ খ্রীস্টাব্দে এলাহাবাদে যখন ভক্তরাজের স্মৃতিকথা লিখিত হচ্ছিল তখনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং—"তিনিও বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে উপাখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।"

এইসব কারণে "কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ" সরাসরি ভক্তরাজ স্বামী সদাশিবানন্দের স্মৃতিকথার অনুলিখন না হলেও, এবং তার মধ্যে ব্যাখ্যাত্মক অংশগুলি মহেন্দ্রনাথ দত্তের যোজনা হলেও, তাদের ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার্য, এমনকি অনুভূতিমূলক বর্ণনাগুলিও মূল্যবান। স্বামীজীর জীবনী বা তাঁর বিষয়ে স্মৃতিকথাগুলি পড়বার সময়ে আমরা বারংবার দেখেছি—তিনি কথাবার্তা বা বক্তৃতার সময়ে শ্রোতাদের মনকে ঊর্ধ্বতর লোকে উন্নীত ক'রে দিতেন। তা যে তিনি করতেন—অধিকাংশক্ষেত্রে শুধু এই সংবাদটুকুই মিলেছে। দু-একটি ক্ষেত্রে কেবল, যেমন নিবেদিতা, ক্রিস্টিন বা দেবমাতার রচনায়, ঐ ঊর্ধ্বতর জগতের ভাবসত্য বর্ণনার চেষ্টা রয়েছে—অনুভূতির সাহিত্য হিসাবে যাদের মূল্য অসাধারণ। এঁদের নামের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথের নামও যোগ ক'রে দিতে পারি। তিনি কয়েক খণ্ডের "শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী" গ্রন্থে, ততোধিক, কয়েক খণ্ডের "লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থে—স্বামীজী-সৃষ্ট অপূর্ব পরিবেশের, অনির্বচনীয় ভাবলোকের, কিছুটা বাণীরূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। এই ধরনের পরিবেশের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ ও নিবিড় পরিচয় ছিল বলেই তিনি ভক্তরাজের অনুভূতির রূপ অনুধাবন করতে

পেরেছিলেন—আর তা যে পেরেছিলেন তা ভক্তরাজের স্বীকৃতি থেকেই দেখা যায়। সকলেই আধ্যাত্মিক মানুষ হন না, আবার সকল আধ্যাত্মিক মানুষ লেখক হন না। কিন্তু যাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা এবং ঐ আধ্যাত্মিকতার প্রকৃতি অনুভব ক'রে তাকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা থাকে, তাঁকেই আমরা অধ্যাত্ম-সাহিত্যিক বলে গণ্য করতে পারি। মহেন্দ্রনাথ এই ক্ষমতার কিছুটা অধিকারী ছিলেন।

॥ দুই ॥

স্বামীজী তাঁর জীবনের শেষ পর্বে—১৯০২ ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত (স্বামীজী ৮ মার্চ মঠে ফেরেন)—মাসখানেক বারাণসীতে ছিলেন। তাঁর বারাণসী অবস্থানের বিষয়ে যে-সকল স্মৃতিকথা মিলেছে তাদের মধ্যে ভক্তরাজ-মহারাজের বিবরণ সবচেয়ে দীর্ঘ এবং গুরুমূল্য। এর একটি অংশই বর্তমানে আলোচ্য।

ভক্তরাজের বিবরণে জনৈক কেলকারের স্বামীজী-দর্শনের ও পরস্পর কথাবার্তার সংবাদ আছে। সে কাহিনী এই:

> "খ্যাতনামা কেলকার এইসময়ে কাশীধামে ছিলেন। একদিন সায়ংকালে তিনি স্বামীজীকে দেখিতে আসিলেন। শরীর অসুস্থ, এইজন্য স্বামীজী পর্যঙ্কের উপর শায়িত ছিলেন। কেলকার বিনীতভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া নিম্নস্থিত আস্তরণে উপবেশন করিলেন, এবং গুরু বা মহাপুরুষের নিকট সসম্ভ্রমে যেমন যাওয়ার প্রথা তদ্রূপ নম্র ও বিনয়পূর্ণভাবে করজোড় করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।
>
> "কথাবার্তা ইংরাজীতে হইতে লাগিল। আমরা দূরে বসিয়াছি। প্রত্যেক শব্দ শুনিতে পাইলাম না এবং বয়স অল্পবশত বিদেশীয় ভাষার সকল কথা বোধগম্য হইল না।... স্বামীজী প্রথমে শুইয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন। ক্রমেই ভাবরাশি ঘনীভূত হইতে লাগিল। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। শরীর দুর্বল থাকিলেও তিনি হঠাৎ সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং কথাবার্তা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ দৃঢ়ভাবে কহিতে লাগিলেন। ক্রমে অধিকতর ভাবরাশি আসিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিল। তিনি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইলেন। চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইল।... শব্দ ক্রমে মধুর ও শ্লথ অবস্থা হইতে খরতর ও উচ্চভাব ধারণ করিল।... রুগ্ন ও অসুস্থ ব্যক্তি যিনি শুইয়াছিলেন এবং মৃদুভাবে যিনি ইতিপূর্বে বাক্যালাপ করিতেছিলেন, সেইসকল ভাব একেবারে বিদূরিত হইয়া গেল এবং তৎস্থানে মহা তেজস্বীভাব, সুস্থ শরীর ও তেজস্বীবাণী আসিয়া প্রকাশ পাইল। স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র উচ্চারণ, স্বতন্ত্র নেত্রের দৃষ্টি। ভাবাবেশে দেহ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে আমরা স্বামীজীকে বহুবার দেখিয়াছি, এইজন্য আমাদের নিকট ইহা তত নূতন ও কৌতূহলের বিষয় বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রথম বা দ্বিতীয়বারের ভাবাবস্থা দেখিয়াছেন তাঁহারা চমকিত ও ত্রস্ত হইয়াছেন। কেলকার মহাশয় স্বামীজীকে এইরূপ সহসা দেহ পরিবর্তন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ধারণ করিতে দেখিয়া বিমোহিত ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে উন্মনা হইয়াছিলেন—তাহা তাঁহার মুখভঙ্গিতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।...

"স্বামীজী ক্রমে ধীরে-ধীরে ভারতবর্ষের বিষয়ে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। রাজনৈতিক, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে নানা কথা হইল। স্বামীজী ক্রমে ব্যথিত, বিমনায়মান, দুঃখিত ও শোকার্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষুতে বিষাদ, শোক, দয়া এবং সর্বজীবের প্রতি প্রেম লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি কখনো খেদোক্তি করিয়া, কখনো-বা ম্রিয়মাণভাবে, কখনো-বা ক্রোধপ্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'ভারতবাসীর এরূপ হীন অবস্থায়, এরূপ দৈন্য অবস্থায়, আর বেশিদিন বাঁচিয়া থাকিবার কী আবশ্যক? পলকে-পলকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, অনাহার, লাঞ্ছনা, ক্লেশ, দিবারাত্র অনুভব করিতেছে, কেবল জীবম্মাত্র সংরক্ষণ করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে, প্রজ্বলিত নরকানলে দিবারাত্র দগ্ধ হইতেছে—মৃত্যু ইহার চেয়ে যে ঢের ভাল ছিল।' তিনি এইভাবে শোকার্ত ও সন্তপ্তহৃদয়ে ভারতবাসীদিগের দুঃখের বিষয়ে কহিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার সকরুণ দেশপ্রেমিকতা দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্ময়ান্বিত হইলাম। এরূপ অকপট দেশানুরাগ যে হইতে পারে, ইহা আমরা এই প্রথম দেখিলাম। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য খেদোক্তি, তাহাদের কষ্ট যেন নিজের কষ্ট, কিসে সকলের উন্নতি হয়, কিসে তাহারা সুখে থাকিতে পারে ও উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন পায়, কিসে তাহাদের দুঃখ তিরোহিত হয়, সেই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় হইতে শোক ও প্রেমের উৎস দ্রুতবেগে উঠিতে লাগিল।...

"তাহার পর তিনি কেলকারের সহিত রাজনৈতিক বিষয় আলাপ করিতে লাগিলেন। শুষ্ক বৈদেশিক রাজনীতিতে এ-দেশের কোনো উপকার হইবে না। এবং অনুকরণেও কোনো ফল হইবে না, কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত পূর্বতন প্রথা রাখিয়া চলিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে—এইটি তিনি কেলকারকে বিশেষভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। স্বামীজী কেলকার মহাশয়কে আরও স্পষ্টভাবে বুঝাইলেন যে, ধর্মের ভিতর দিয়া সমাজসংস্কার ও ধর্মের ভিতর দিয়াই নানারকম উন্নতিই হইতেছে একমাত্র ভারতবর্ষের পন্থা। কিন্তু ধর্মবিচ্যুত রাজনীতি বা অন্য কোনপ্রকার সামাজিক আন্দোলন ভারতবর্ষে কোনো কার্যদায়ক হইবে না। এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া কেলকার মহাশয় সন্তুষ্ট ও হর্ষিত হইয়া বিনীতভাবে প্রণামপূর্বক আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।"

[এখানে 'ধর্ম' বলতে স্বামীজী যে 'আধ্যাত্মিকতা' বুঝেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সর্বজনীন ধর্মের এই প্রবক্তা কোনো বিশেষ ধর্মের মধ্য দিয়ে রাজনীতির প্রকাশ ঘটুক, একথা বলতেই পারেন না। ধর্ম মানে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সেই অদ্বৈতচেতনা, যা সর্বাঙ্গীণ প্রেমের উৎস, শক্তির উৎস। লোভ ও হিংসাসর্বস্ব রাজনীতির বিষয়ে স্বামীজীর সতর্কবাণী এখানে লক্ষ্য করতে হবে।]

॥ তিন ॥

ভক্তরাজ-কথিত এই 'খ্যাতনামা কেলকার' কে? স্বতঃই মনে হবে, ইনি পুনার তিলক-মতবাদী ইংরেজী সাপ্তাহিক 'মরাঠা' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক এন সি কেলকার। (নরসিংহ চিন্তামন কেলকার)। মহেন্দ্রনাথের অনুলিখনে কিন্তু ইনি যে এন সি কেলকার, একথা বিশেষভাবে বলা নেই। কথাটা পাদটীকায় যোগ করেছেন "কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থের সম্পাদক। সেখানে তিনি অধিকন্তু ভুল ক'রে বলেছেন—এন সি কেলকার 'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদক। কেশরী মরাঠি দৈনিক, তার সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং তিলক। সে যাই হোক, সম্পাদক-প্রদত্ত কেলকারের পরিচয় গ্রহণ করেছেন স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর "যুগনায়ক" গ্রন্থে (৩য় ভাগ, ২য় সং, পৃ. ৪৩০)। তা গৃহীত হয়েছে স্বামীজীর "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ-লিখিত দ্য লাইফ অব্ স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (সর্বশেষ সংস্করণ, ১৯৮১, পৃ. ৬২৬)। আমি নিজেও একই ধারণার পোষকতা করেছি—"বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে (পৃ. ৯)। একই গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (পৃ. ৮৫-৮৬) উদ্ধৃত এন সি কেলকারের পুনা ফার্গুসন কলেজে ১৯ জুলাই ১৯৩৫ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে দেখা যায়, কেলকার বলেছেন, মহারাষ্ট্রে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের অবস্থানকালে তিনি সাক্ষাতের সুযোগ হারিয়েছিলেন। তবু কেলকার যে একবার অন্তত স্বামীজীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, এই ধারণা রক্ষা করেছি এই "কাশীধামে" গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যসূত্রেই। এমন মনে করার আরও কারণ, স্বামীজীর দেহান্তের পরে পুনার প্রার্থনাসমাজী 'সুবোধ' পত্রিকার ১০ অগস্ট ১৯০২ তারিখের সংবাদ, যার মধ্যে 'সরস্বতী মন্দির' পত্রিকায় রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেনের উপরে স্বামী বিবেকানন্দকে স্থাপনের বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল, এবং আঁতে ঘা দিয়ে বলা হয়েছিল—যে-বিবেকানন্দকে নিয়ে সাধারণ হিন্দুরা এত হৈচৈ করছে তিনি কিন্তু মোটেই প্রচলিত অর্থে হিন্দু ছিলেন না। "যারা স্বামীজীর সুখ্যাতি করছে ('সুবোধ' পত্রিকা লিখেছিল) তারা কি তাঁর আসল স্বরূপ জানে? (জিজ্ঞাসা করি), স্বামীজীর হিন্দুধর্মকে (এদেশে) কতজন মানে? বিদেশগমনকে স্বামীজী ত্যাজ্য ও অধর্ম মনে করতেন না, তাই তাঁর অনুগামীরাও তা মনে করেন না। বিদেশ থেকে ফিরে উনি গোময় গোমূত্রদ্বারা নিজেকে তো শুদ্ধ করেন নি! আজকে তাঁর কতজন সাধারণ ভক্ত তা করতে রাজি? যখন সংবাদ রটেছিল, স্বামীজী আমেরিকায় গোমাংস আহার করেছেন, তখন তিনি কখনই তার প্রতিবাদ করেন নি। উল্টোপক্ষে বলতেন, বিদেশে গোমাংস খাওয়ায় আপত্তি নেই। উনি কয়েক মাস আগে অমন বলেছেন। ওঁর এই বক্তব্য মানতে কতজন রাজী আছেন? ধর্মের সঙ্গে খাদ্যের সম্পর্ক নেই—এ তো ওঁরই কথা।... কয়েকমাস আগে স্বামীজী যে কেলকারের কাছে বলেছেন—হিন্দুস্থানের নাশ না হলে তার উন্নতি হবেনা—তার অর্থ কী, তা-কি বিবেকানন্দ-ভক্তরা ভেবে দেখবেন?" ["সমকালীন", ৩য়, পৃ. ২১১]।

উদ্ধৃত অংশে কয়েকমাস আগে কেলকারের সঙ্গে স্বামীজীর কথার উল্লেখ আছে—তার থেকে ধরে নিয়েছিলাম—এই কেলকার, এন সি কেলকার ছাড়া কেউ নন, যার সঙ্গে "কাশীধামে" গ্রন্থের পাদটীকা অনুযায়ী স্বামীজীর কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু 'সুবোধ'

পত্রিকার মন্তব্যের আর এক অংশ—বিদেশে স্বামীজী গোমাংস-ভোজন সমর্থন করেছেন—তার উৎসের সন্ধান পাইনি।

॥ চার ॥

নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী বিদেহাত্মানন্দ ব্যাপারটার মীমাংসা ক'রে দিয়েছেন নতুন আবিষ্কারের দ্বারা। এবং তার দ্বারা তিনি স্বামীজীর জীবনীগ্রন্থগুলির পক্ষে এই বিষয়ের তথ্যসংশোধনও অবশ্যকৃত্য ক'রে তুলেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত সংবাদ থেকে জেনেছি—কাশীতে যাঁর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল তিনি এন সি কেলকার নন—তিনি বিশিষ্ট প্রার্থনাসমাজী সদাশিবরাও কেলকার। বিদেহাত্মানন্দজী অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে, প্রার্থনাসমাজের মুখপত্র 'সুবোধ' পত্রিকার ৩০ মার্চ ১৯০২ সংখ্যায় সদাশিবরাও-লিখিত যে-সাক্ষাৎকার বিবরণ বেরিয়েছিল, তার বাংলা অনুবাদ আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সদাশিবরাও ইন্দোর থেকে ২০ মার্চ ১৯০২ তারিখে 'সুবোধ' পত্রিকার সম্পাদককে উক্ত সাক্ষাৎকার-বিবরণ লিখে পাঠান। বিবরণটি নানা দিক দিয়ে চিত্তাকর্ষক। এর মধ্যে একদিকে যেমন স্বামীজী সম্পর্কে সংস্কারপন্থীদের বদ্ধমূল ধারণার বিষয়ে জানতে পারি, অন্যদিকে তেমনি "কাশীধামে" গ্রন্থে প্রকাশিত বিবরণের তথ্যগত সত্যতা, এবং ব্যাখ্যাগত ভ্রান্তিও বুঝতে পারি। শেষোক্ত ভ্রান্তির কারণ আছে।

সে-আলোচনায় যাওয়ার আগে উল্লিখিত সাক্ষাৎকার বিবরণটি উপস্থিত করা যাক:

"তাজা খবরগুলির মধ্যে একটি—স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে স্বল্পকালীন সাক্ষাৎ। কলকাতা থেকে ফেরার পথে কাশীক্ষেত্রে তিন রাত্রি ছিলাম। সেখানে থাকাকালে শ্রীমতী বেশান্ত ও স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম।...

"স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ-বাসনা পূর্ণ হলো, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যা শুনব আশা ক'রে গিয়েছিলাম সেই ব্যাপারে নিরাশ হতে হলো। তাঁর খ্যাতিমতো তিনি ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বুনিয়াদী বিচার করবেন, আমার এইরকম প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু নিম্নলিখিত যে-কথাগুলি স্বামীজী বললেন সেগুলি কতখানি বুনিয়াদী তা নির্ণয়ের ভার পাঠকদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

"আমি স্বামীজীকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্রাহ্মসমাজ ও আপনাদের মধ্যে পার্থক্য কি? স্বামীজী বললেন, অনেক পার্থক্য আছে। ব্রাহ্মসমাজ দ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসী আর আমরা অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসী। ব্রাহ্মসমাজ কেবল যুক্তিবাদের আশ্রয় নিয়ে চলে, আর আমরা শাস্ত্রপ্রমাণ নিয়ে চলি। কারণ শুধুমাত্র যুক্তিকে আশ্রয় করলে ধর্মে অবশিষ্ট কিছু থাকেনা। এইজন্য কোনো না কোনো গ্রন্থকে অবলম্বন করা দরকার।

"মাংসাহার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে বললে স্বামীজী বললেন, যদি মাংস ছাড়া প্রাণধারণ অসম্ভব হয় তাহলে ব্রাহ্মণও তা খেতে পারে, নচেৎ তা খাওয়া উচিত নয়। অন্য বর্ণের লোক যথেচ্ছ মাংসাহার করতে পারে। গোমাংস সম্বন্ধে স্বামীজীর মত

জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, গরু এবং বলদ আমাদের দেশে কৃষির কাজে লাগে, সেজন্য এদের মারা উচিত নয়। ইউরোপে কৃষিকাজে এদের কোনো উপযোগিতা নেই, অতএব সেখানে এদের বধে কোনো দোষ নেই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, হিন্দু যদি সেদেশে যায় তাহলে তাদের গোমাংস ভক্ষণে আপত্তি আছে কিনা? তার জবাবে স্বামীজী বললেন, গোমাংস ছাড়া জীবনধারণ অসম্ভব হলে তবেই খেতে পারে, নচেৎ নয়। বিশ্বামিত্র চণ্ডালের বাড়িতে কুকুরের মাংস খেয়েছিলেন, কারণ খাদ্য ছাড়া তাঁর প্রাণ যায়-যায়, আর সেখানে অন্য কোনো খাদ্য ছিলনা। কিন্তু সেই চণ্ডালের বাড়িতে তিনি জল খাননি, কারণ জল অন্যত্র লভ্য ছিল। আমি তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, মার্কিন মুলুকের ডাঃ ব্যারোজ যখন এদেশে এসেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন যে, স্বয়ং স্বামীজী আমেরিকায় থাকাকালে গোমাংস খেতেন, এটা কী ক'রে হলো? আমেরিকায় গোমাংস ছাড়া অন্য খাদ্য পাওয়া যায়না, এমন তো নয়? স্বামীজী তখন বললেন, খ্রীস্টান লোকদের কথার উপর বিশ্বাস করা উচিত নয়; ওরা অন্য ধর্মের সর্বদাই নিন্দা করে, এবং দরকারমতো মিথ্যা কথা বলে।

"ডাঃ ব্যারোজ ইন্দোর শহরে যখন এসেছিলেন তখন আমি নিজে তাঁর মুখ থেকে এই কথা শুনেছি। তিনি এই কথা সার্বজনিক সভায় এবং অন্যত্রও বলেছিলেন। এই কথা যদি সরাসরি মিথ্যা হয় তবে তৎক্ষণাৎ স্বামীজীর তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। কিন্তু সে-রকম কিছু হয়েছে বলে আমি কখনও শুনতে পাইনি। তাছাড়া ডাঃ ব্যারোজ স্বামীজীর কুৎসা রটিয়েছিলেন, এরকমও আমার মনে হয়না।

"উপরি-উক্ত কথাবার্তা হওয়ার পরে, আমার সঙ্গী এক কাশীবাসী তরুণ বিদ্বান তাঁকে বললেন যে, বুদ্ধের সময় কাশী নগরী বর্তমান শহর থেকে দূরে ছিল। সে-সম্বন্ধে স্বামীজী বললেন, না, তা ঠিক নয়। বর্তমান জায়গাতেই আদিকাল থেকে কাশী শহর বর্তমান আছে। সে-কথার সমর্থনে তিনি কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রমাণ দিলেন। কাশী বিশ্বনাথের মন্দির এখন যেখানে রয়েছে সেখানে ছিলনা। এখন পাশে যেখানে মসজিদ রয়েছে সেখানে ছিল। মুসলমানেরা সেটা ভেঙে ফেলার পর এখনকার জায়গায় বানানো হয়। এই তথ্যে বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু এই কথাবার্তার ঝোঁকে স্বামীজী পরে যা বললেন তা কিছু বিশেষ অর্থবহ। উপরের কথাপ্রসঙ্গে আমি বললাম যে, এখনকার মন্দির থেকে এগিয়ে মসজিদের দিকে যেতে যে-কুয়ো পড়ে, তার ধারে বসে-থাকা পাণ্ডারা বলে যে, মুসলমানেরা যখন মন্দির ভাঙা শুরু করে তখন বিশ্বেশ্বর পালান এবং ঐ কুয়োতে ঝাঁপ দেন। পরে তাঁকে কুয়ো থেকে বের ক'রে নতুন মন্দিরে স্থাপন করা হয়। কিন্তু একথা বলার সময়ে ওরা দেবতার বিষয়ে অজ্ঞানতা প্রকাশ করে। বিশ্বেশ্বরের অর্থ কী? এবং তিনি মুসলমানদের ভয়ে পালান, তার মানে কী—একথা ওদের [পাণ্ডাদের] একেবারেই বোধগম্য নয়। দেবতা বিষয়ে এ-রকম বলার সময়ে তাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। আমার ধারণা ছিল আমার এইসব যুক্তির সঙ্গে স্বামীজী সহমত হবেন। কিন্তু—না। ওঁর সঙ্গে কেউ কথা বললে উনি নিজের প্রভাব বিস্তার করবার জন্য অপর পক্ষের বক্তব্য ধূলিসাৎ করার চেষ্টা করেন, আমার এমন ধারণা হলো। আমি ওইসব কথা বলার পর স্বামীজী এমন পণ্ডিতী চাল চাললেন যাতে মনে হলো, মুসলমানদের ভয়ে দেবতার পালানো কোনো আশ্চর্য ব্যাপার নয়। পাণ্ডারা যা বলে তা সত্য।...

"নেটিভ সংস্থাগুলির কর্মকর্তাদের উপরও স্বামীজীর রাগ দেখা গেল। এরা প্রজাদের কষ্ট দিয়ে নিজেরা বেশ আরামে থাকে।...

"দেশোন্নতির জন্য যে-প্রচেষ্টা চলছিল তার সম্বন্ধেও স্বামীজী নিজের মত এমনভাবে প্রকাশ করলেন যাতে মনে হল—যে-দেশের লোক এত দুঃখে ডুবে আছে সে-দেশ যদি পৃথিবী থেকে একেবারে লোপ পায় তবে দেশের মঙ্গল। দেশের উন্নতির চেষ্টা আমাদের দেশে সফল হবেনা। তাকে একেবারে লোপ করাতেই দেবতার দয়া প্রকাশ হবে। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিলনা বলে তাঁকে অধিক কষ্ট দেওয়া আমাদের ভাল লাগছিল না। এবং স্বামীজীর সঙ্গে আর বেশি কথা বলার ইচ্ছাও তখন ছিলনা বলে আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।..."

॥ পাঁচ ॥

সদাশিবরাওয়ের এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, স্বামীজীর কথাবার্তা তাঁর দীর্ঘপোষিত ধারণাগুলিকে কিভাবে আঘাত করেছিল। ধীরে-ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে বিচক্ষণ উক্তি করার মেজাজ তখন স্বামীজীর ছিলনা। (কোনো কালেই তা ছিল কি?)। কোনো প্রকার আপসের পথে তিনি তখন চলতে গররাজি। যাকে বলা যায়, ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো সত্য—তাকেই উচ্চারণ করতে বদ্ধপরিকর। অল্প প্রতিরোধের পথে চলা আর নয়—তিনি নিবেদিতাকে বলেছিলেন। আর তেমনি এক মেজাজে স্বামীজীকে সদাশিবরাও পেয়েছিলেন—তার প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল তাঁর স্বভাবানুরূপ।

সদাশিবরাওয়ের বিবরণের একাংশে আছে—ব্যারোজ-কথিত আমেরিকায় স্বামীজীর গোমাংস ভোজন। এই বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণভারতে বহু জল ঘোলা হয়েছে। রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থী—সকলেই স্বামীজীর জনপ্রিয়তা হ্রাসের জন্য এই ব্যারোজ-কথিত কাহিনীর ব্যবহার করেছেন—খ্রীস্টান মিশনারিদের কথা বলাই বাহুল্য। ধর্মমহাসভার শেষদিকে এবং তার পরে ডাঃ ব্যারোজের আক্রোশপূর্ণ পরিবর্তিত চেহারার কথা স্বামীজীর জীবনীপাঠকদের কিছুকিছু জানা আছে। মিশনারিদের প্ররোচনায় ডঃ ব্যারোজ ভারতে এসে কি ধরনের পরধর্মনিন্দা ও বিবেকানন্দ-নিন্দায় মেতেছিলেন, সে-বিষয়ে "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে একটি গোটা অধ্যায় (পৃ. ৩০৯-৪২) লিখেছি। ব্যারোজের এই পরধর্ম-কুৎসার ব্যাপারটি সদাশিব রাও-এর না জানা আশ্চর্যের ব্যাপার। এখানে কেবল গোমাংসাহার প্রসঙ্গে একই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (পৃ. ২১২) যা লিখেছি তার অংশ উদ্ধৃত করছি:

"স্বামীজীর গোমাংসাহারের কথাটা ডাঃ ব্যারোজ, এবং তাঁর কথা অনুযায়ী কিছু মিশনারি ও ব্রাহ্মপত্রিকা প্রচার করছিল। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৩৩৯) আমরা ডাঃ ব্যারোজের উক্তি উদ্ধৃত করেছি, যাতে পাই, স্বামীজী নাকি রেস্টুরেন্টে তাঁর সঙ্গে খেতে গিয়ে বীফ্ চেয়েছিলেন। স্বামীজী প্রকাশ্যে এই কথার প্রতিবাদ করেন নি—ব্যারোজের নোংরামিকে প্রতিবাদে মূল্যবান করার ইচ্ছা তাঁর ছিলনা। কিন্তু কথাটা ডাহা মিথ্যা, তা গুডউইন একটি

চিঠিতে লিখেছিলেন—অদ্বৈত আশ্রমে রক্ষিত সংগ্রহে তা পাই।... তাহা মিথ্যা ছিল স্বামীজী গোমাংসাহার সমর্থন করতেন—ব্যারোজের এই কথাটাও। অথচ সমাজসংস্কারপন্থীদের এমনই সত্যপ্রীতি যে, ডাঃ ব্যারোজের কথার উপরে নির্ভর ক'রে স্বামীজীর মুখে এমন কথা তাঁরা বসিয়ে দিলেন, যা তাঁর কথাই নয়। এই প্রসঙ্গটির একটু বিস্তারিত আলোচনা করলাম এইজন্য যে, সংস্কারকদের পত্রিকায় একে মূলধন ক'রে বিবেকানন্দ-নিন্দার ব্যবসা করা হয়েছে।"

সদাশিবরাওয়ের বিবরণে লক্ষ্য করার বিষয়—তিনি স্বামীজীর কাছ থেকে ধর্মবিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা শুনতে বড় বেশি ব্যস্ত ছিলেন। আর স্বামীজী, আমরা সহজেই ধরে নিতে পারি, সদাশিবরাওয়ের মতবাদ বুঝে নিয়ে, তাঁর সঙ্গে ও-সম্পর্কে কোনো গুরুতর আলোচনার প্রয়োজন আছে, তা একেবারেই বোধ করেন নি। কেবল দুচার কথার ঝাপটায় সে-প্রসঙ্গ সরিয়ে দিয়েছেন। তবে সেগুলি খুবই কড়া ও চড়া ঝাপটা। মূর্তিপূজাবিরোধী একজন প্রার্থনাসমাজীর মধ্যে 'পৌত্তলিক' হিন্দুদের দেবতাদের মর্যাদা নিয়ে যে-কাতরতার রূপ সদাশিবরাওয়ের বিবরণে দেখি, তাকে খুবই কৌতুকজনক বলে মনে হবে, যদি ভুলে যেতে পারি যে, ওর মধ্যে 'পৌত্তলিক' হিন্দুদের মনকে বিবেকানন্দ সম্পর্কে বিরূপ ক'রে তোলার কুশলী আয়োজন ছিল। স্বামীজী কোন্ যন্ত্রণা থেকে এদেশের মানুষের অন্ধ দেবতাভক্তিকে আঘাত করেছেন, তা অনুভব করার ক্ষমতা মাপা-ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন সদাশিবরাওয়ের ছিলনা। পতনযুগের পৌরাণিকতার সঙ্গে অতিরিক্ত দৈবনির্ভরতা জড়িত। অবিরাম মার-খাওয়া মানুষ ফিরে মার দিতে ভুলে গিয়ে, সকল প্রকার অন্যায়কে কর্মফল বলে মেনে নিয়ে, দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী করেছে—আর সেই পরাজয়ের মনোভাব নিয়ে এমন দেবকাহিনী রচনা করেছে যাতে দেখা যায়, দেবতা কেবল অন্যায়ের পরিপোষক। এইসব পৌরাণিক বা অর্ধ-পৌরাণিক কাহিনীর লক্ষ্য—যত অন্যায় অত্যাচার ঘটুক না কেন দেবতাদের চাই বরাদ্দ ভক্তি। তা সরবরাহ করতে পারলেই নির্ঘাত উদ্ধার। এইসব ভক্তি-কাহিনী সম্বন্ধে স্বামীজীর বিতৃষ্ণা ছিল সুগভীর। মানুষ নিজেদের কাপুরুষতাকে দেবতাদের অন্যায়কর্মের উপর চাপাবে এবং তার দ্বারা নিজেদের জাড্যকে 'ধর্ম' নাম দেবে—একে সহ্য করা স্বামীজীর পক্ষে সম্ভব ছিলনা—কারণ তিনি মনে করতেন, আত্মশক্তির জাগরণের উপরই ভারতের মুক্তি নির্ভর করছে। আর স্বামীজী নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিলেন এই দেখে যে, প্রার্থনাসমাজী এক ব্যক্তি, প্রচলিত দেবকাহিনীর বিরোধী হওয়াই যাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, তিনি কিনা ঐসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন!

সদাশিবরাওয়ের মানসিক অসাড়তার চূড়ান্ত রূপ—স্বামীজীর দেশপ্রেমের প্রকৃতি বুঝবার অসামর্থ্যের মধ্যে প্রকট। দেশপ্রেম বলতে সদাশিবরাও-গণ এতদিন বুঝে এসেছেন—ভারতীয়দের কুসংস্কার-ক্ষত-অঙ্গে কিছু সংস্কার-মলম লেপন এবং সাহেবদের কাছে কিছু সুযোগ-সুবিধার জন্য আবেদনপত্র রচনার মুন্সীয়ানা। সেখানে কোন্ নিদারুণ মর্মযাতনা থেকে একজন মানুষ বলতে পারেন—এদেশ ধ্বংস হয়ে গেলেই ভালো—তা বুঝবার ক্ষমতা তাঁর ছিলনা। তিনি কি ক'রে বুঝবেন বিবেকানন্দ কী ছিলেন? কি ক'রে বুঝবেন—মাদ্রাজে সমুদ্রতীরে এক-কোমর পচা কাদার মধ্যে ছোটছোট ছেলেমেয়েদের

কাজ করতে দেখে তাঁর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তাক্ত যন্ত্রণার রূপ—যখন স্বামীজী আর্তনাদ ক'রে বলেছিলেন—হে ভগবান, তুমি এদের সৃষ্টি করলে কেন? সদাশিবরাও কী ক'রে বুঝবেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের এই কথাগুলির গভীরার্থ—"দেশের জন্য ব্যথা কি কখনো শরীরিণী হয়। যদি হয় তো বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।"

এইবার ভক্তরাজের বিবরণ প্রসঙ্গে আসতে পারি। স্পষ্ট দেখা যায়, তিনি সদাশিবরাওয়ের মনের ভিতরকার কথা বুঝতে পারেন নি। তাই লিখেছেন, "(স্বামীজীর) এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া কেলকার মহাশয় সন্তুষ্ট ও হর্ষিত হইয়া বিশেষভাবে প্রণামপূর্বক আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।" সদাশিবরাও যে মোটেই 'সন্তুষ্ট বা হর্ষিত' হননি তা তাঁর লেখা থেকেই বোঝা যায়। তাঁর বিদায়কালীন প্রণাম (অর্থাৎ নমস্কার) অবশ্যই ভদ্রতাবশে। কিন্তু দুটি কারণে ভক্তরাজের ভুল হয়ে থাকতে পারে। এক, এই ঘটনা যখন ঘটছিল তখন তিনি অল্পবয়সী তরুণ, সবকিছু বুঝে ওঠা সম্ভব ছিলনা। সেকথা তিনি তাঁর বইয়ে অন্যত্র বলেছেনও। তাছাড়া গোড়ার দিকে স্বামীজী আস্তে-আস্তে কথা বলছিলেন, একটু দূরে বসে থাকার জন্য সব কথা ভালোভাবে শুনতেও পাননি। স্বামীজী উত্তেজিত হয়ে উঁচু গলায় কথা বলার পরেই ভালো ক'রে শুনতে পান। দ্বিতীয়ত, অন্য সকল ক্ষেত্রে যা ঘটত এখানেও তাই ঘটেছে—স্বামীজীর বিরাট ব্যক্তিত্বের দ্বারা সদাশিবরাও অভিভূত ছিলেন (তিনি লেখার মধ্যে অভিযোগও করেছেন, স্বামীজী প্রাধান্য বিস্তার করতে সচেষ্ট ছিলেন), তাই ভক্তরাজের মনে হয়েছিল, উনি তুষ্ট ও আনন্দিত। বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন ক্ষুদ্রতর মানুষরা বাহ্যত অভিভূত থাকলেও, পরে তাঁরা যখন সেই প্রভাব পরিমণ্ডলের বাইরে গিয়ে পূর্ব সংস্কার ও ধারণার মধ্যে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। সদাশিবরাওয়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। কিন্তু তিনি যে, কিছুটা বিরোধী মন নিয়ে স্বামীজীর সম্মুখীন হয়েছিলেন তার আভাসও ভক্তরাজের কথায় মেলে। তিনি বলেছেন, স্বামীজীর মধ্যে যতই তেজ ও উন্মাদনার বৃদ্ধি ঘটতে লাগল ততই যেন "কেলকার মহাশয়ের শক্তি ন্যূন হইতে লাগিল।" কিছুটা মতসংঘর্ষের পটভূমিকা না থাকলে একজনের ক্রমিক শক্তিহ্রাস এবং অপরের শক্তিবৃদ্ধির কথা ওঠেনা।

এইসঙ্গে ভক্তরাজের স্মৃতিশক্তিও লক্ষণীয়। ঘটনার কুড়ি বৎসর পরেও তিনি স্পষ্টভাবে স্বামীজীর খেদোক্তি স্মরণ করতে পেরেছিলেন, "মৃত্যু ইহার চেয়ে ঢের ভালো ছিল" ইত্যাদি। আরও লক্ষ্য করার বিষয়, ভক্তরাজ তাঁর তরুণ বয়সেই স্বামীজীর দেশপ্রেমিকতার স্বরূপ ঠিক-ঠিক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—যা একেবারেই পারেন নি বয়স্ক ও বিজ্ঞ সদাশিবরাও। ভক্তরাজের অপূর্ব অভিজ্ঞতা: "তাঁহার সকরুণ দেশপ্রেমিকতা দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্ময়ান্বিত হইলাম। এমন অকপট দেশানুরাগ যে হইতে পারে, ইহা প্রথম দেখিলাম। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য—তাহাদের কষ্ট যেন নিজের কষ্ট"—ইত্যাদি। ভক্তরাজের এই বিবরণ না থাকলে আমরা বুঝতেই পারতাম না, সদাশিবরাও কর্তৃক উপস্থাপিত স্বামীজীর উক্তির আসল তাৎপর্য কি। ফলে স্বামীজীর মনোভাব সম্বন্ধে, সদাশিবরাওয়ের রচনার ফলে, পাঠকদের মনে ভ্রান্তি থেকে যাবার সম্ভাবনা ছিল। ভক্তরাজের বিবরণ তাকে দূর করেছে।

ভক্তরাজের পক্ষে তরুণ বয়সে ঐপ্রকার অনুভব সম্ভব হয়েছিল তার কারণ ইতিমধ্যেই তাঁর রক্তে বিবেকানন্দ-সত্য প্রবেশ ক'রে গিয়েছিল। যে-যুবগোষ্ঠী কাশীতে পথিমধ্যে

বিষ্ঠামূত্রলিপ্ত মুমূর্ষু রোগীদের কোলে তুলে নিয়ে এসে শুশ্রূষা করতে শুরু করেছিল স্বামীজীর প্রেরণায়—ভক্তরাজ তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই সত্য তাঁর মর্মগত হয়ে গিয়েছিল—"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু" সর্বত্র বিরাজমান "সেই একই প্রেমময়।" সে সবার পায়ে "মনপ্রাণশরীর অর্পণই" দেশপ্রেম—বিশ্বপ্রেম—মানবপ্রেম।

[উদ্বোধন পত্রিকার সন ১৩৯৫ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত]

দক্ষিণেশ্বরে ১৮৯৭ সালের রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে স্বামী বিবেকানন্দ

(অপ্রচলিত স্মৃতিকথা)

॥ এক ॥

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে গিয়েছিলেন—এই ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একাধিক কারণে। প্রথমত, দক্ষিণেশ্বরে স্বামীজীর সেই শেষ রামকৃষ্ণ-উৎসবে যোগদান। কিছুদিনের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-দ্বার তাঁর কাছে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই বেদনাদায়ক কাহিনী আমি সবিশেষ বলেছি অন্যত্র। (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪০—১৪৭)। দ্বিতীয়ত, রামকৃষ্ণ সংঘের পক্ষে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সেই হলো শেষ আয়োজিত রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব। (এখন অবশ্য মন্দিরে উদারতর আবহাওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক 'কল্পতরু উৎসব'-সহ নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।)

কোনো ইতিহাসই একথা স্বীকার না ক'রে পারবে না—১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের রামকৃষ্ণ-উৎসবের তুল্য গৌরবান্বিত উৎসব আর কখনো দক্ষিণেশ্বরে হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দ বৃহৎ বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে, তার দ্বারা জাতীয় চিত্তে প্রবল আবেগ-অনুভূতির বন্যা বইয়ে, সদ্য স্বদেশে ফিরেছেন; সেই তিনি কলকাতার পথে রাজকীয় অভ্যর্থনার মধ্যে দাঁড়িয়েছেন 'কলকাতার বালক' হিসাবে, বস্তুতপক্ষে 'শ্রীরামকৃষ্ণের বালক' হিসাবে, সেই বালক সবকিছু উৎসর্গ করেছেন তাঁর পিতার চরণতলে, সেই পিতা কেবল আমার পিতা নন, তিনি তোমার পিতা, সবার পিতা, গর্বে গৌরবে মাতোয়ারা হয়ে তা শুনিয়েছেন কলকাতার গণ্যমান্য সেরা মানুষদের সভায়—শোভাবাজারে—রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে নাগরিক সংবর্ধনা সভায় (২৮ ফেব্রুয়ারি):

> "ভ্রাতৃগণ! তোমরা আমার হৃদয়ের গভীরতম তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছ—আমার গুরুদেব, আমার আচার্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম গ্রহণ করিয়া। ...আমরা জগতের ইতিহাসে শত শত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিয়াছি।...সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ প্রাচীন মহাপুরুষগণের জীবনচরিতগুলি ঘষিয়া-মাজিয়া কাটিয়া-ছাঁটিয়া মসৃণ করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি যে

জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাঁহার ছায়ায় আমি বাস করিয়াছি, যাঁহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন যেমন উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত, আমার মতে আর কোনও মহাপুরুষের তেমন নহে।... এইরূপ কোনও মহান আদর্শ-পুরুষের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া, তাঁহার পতাকাতলে দণ্ডায়মান না হইয়া, কোনও জাতিই উঠিতে পারেনা।—যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে।"[১]

এই সভার ঠিক এক সপ্তাহ পরে, ৭ মার্চ, দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির প্রাঙ্গণে পূর্বোক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব আয়োজিত হয়। কলকাতায় তখন বিবেকানন্দ-মহাপ্লাবন। সেই বিবেকানন্দ তাঁর সবকিছু অর্পণ করেছেন যে-রামকৃষ্ণে, তাঁরই জন্মোৎসব। সেখানে উপস্থিত থাকবেন মণ্ডলীসহ বিবেকানন্দ। যখন বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন না, তখনই ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের বিপুল আকার চমকিত করেছিল সকলকে। ১৮৯৫-এর উৎসব সম্বন্ধে 'ইন্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (এন এন ঘোষ) লিখেছিলেন (২৫ মার্চ ১৮৯৫):

"দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ভিতরকার প্রশস্ত প্রাঙ্গণ এবং বাইরের নদীপার্শ্বের বিস্তৃত ভূমি সারাদিন জনসমাগমে পূর্ণ ছিল। স্টীমারে, নৌকায়, গাড়িতে ও পায়ে হেঁটে স্রোতের মতো মানুষ এসেছে। সেই তরঙ্গায়িত মনুষ্য-সমুদ্রের সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নয়। ...মহান পরমহংসের শিষ্যদের ঐকান্তিকতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম...মহোৎসবে যোগদানকারী সকলের মনে ছাপ রেখে গিয়েছিল—সকলেই অনুভব করেছিলেন, পরম অধ্যাত্মশক্তিধর সেই পুরুষ অবশ্যই বিরল গুণসম্পন্ন, যাঁর প্রভাব এইভাবে দিন দিন গভীরতর ও বিস্তৃততর হচ্ছে।"[২]

স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে যদি উৎসবের ঐ রূপ হয়, তাহলে পাশ্চাত্য-প্রত্যাবৃত্ত বিজয়ী বিবেকানন্দের উপস্থিতিতে তা কোন্ আকার ধারণ করবে—সত্যই শিহরিত কল্পনার বিষয়। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' ভিন্ন এই মহোৎসবের উল্লেখযোগ্য বর্ণনা কিন্তু অন্যত্র পাইনি। স্বামীজীর পরবর্তী জীবনীকারেরা এক্ষেত্রে প্রধানত শরচ্চন্দ্রের বর্ণনার ওপরই নির্ভর করেছেন। সমকালীন সংবাদপত্রগুলিতেও (যেগুলি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে) এই উৎসবের বিবরণ নেই। ৭ মার্চের ইন্ডিয়ান মিরারে উৎসব হবে—কেবল এই বিজ্ঞপ্তিটুকু পাচ্ছি:

"To-day, the disciples of Sri Paramhamsa Ramkrishna will hold their annual celebration at Dakhineswar. This year, the celebration is likely to be on a grander scale than ever, in honor of Vivekananda."

এই সূত্রে ইন্ডিয়ান নেশনের ১ মার্চ, ১৯৮৭ তারিখের সংবাদও উল্লেখ্য:

We understand that many boys, who are candidates for the Calcutta

University examinations, are anxious that the Birthday Festival in honor of Sri Sri Ramkrishna Paramhansa Deva should be put off till another Sunday after their examinations are over. The managers regret to say that this cannot be done, as all their arrangements are by this time complete. (News of the Week: Local)

মহাবোধি সোসাইটি জার্নালে (এপ্রিল ১৮৯৭) এইটুকু বেরিয়েছিল:

"Ramkrishna Anniversary. The Birthday Anniversary of Paramhansa took place with great splendour on Sunday, the 7th ultimo, at Rani Rashmoni's Kalibari at Dakhineswar, Bengal."

এর মধ্যে স্বামীজীর উপস্থিতির উল্লেখ নেই।

॥ দুই ॥

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে'র সুপরিচিত বর্ণনায় পাই, স্বামীজী তাঁর কয়েকজন গুরুভ্রাতা এবং "দুইটি ইংরাজ মহিলা"-সহ (সম্ভবত মিসেস সেভিয়ার ও মিস মুলার) উৎসবস্থলে সকাল ৯-১০টা নাগাদ উপস্থিত হয়েছিলেন। "তাঁহার নগ্ন পদ, শীর্ষে গৈরিকবর্ণের উষ্ণীষ। জনসংঘ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইতস্তত ধাবিত হইতেছে—তাঁহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দর্শন করিবে, পাদপদ্ম স্পর্শ করিবে এবং শ্রীমুখের সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখাসম বাণী শুনিয়া ধন্য হইবে বলিয়া।" স্বামীজী যখন দেবী ভবতারিণীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছিলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে সহস্র-সহস্র শির অবনত হয়েছিল। রাধাকান্ত-মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-কক্ষে গিয়েছিলেন। তারপর দুই ইংরাজ মহিলাকে পঞ্চবটী ও বিল্বমূল দেখাতে নিয়ে যান। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী উৎসব সম্বন্ধে সংস্কৃত স্তব লিখেছিলেন—পঞ্চবটী যাবার পথে সেটি পড়ে স্বামীজী তারিফ করেন। পঞ্চবটীর একপাশে গঙ্গার দিকে মুখ ক'রে গিরিশচন্দ্র বসেছিলেন, তাঁকে ঘিরে ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণনাম-গানে মাতোয়ারা—স্বামীজী সেখানে উপস্থিত হয়ে গিরিশচন্দ্রকে প্রণাম করেন, গিরিশচন্দ্রও করজোড়ে প্রতিনমস্কার করেন। পুরাতন স্মৃতিতে আলোড়িত ঐ দুজনের মধ্যে সুগভীর বাক্যবিনিময় হয়। স্বামীজী—- "ঘোষজা, সেই একদিন আর এই একদিন!" গিরিশ—"তা বটে; তবু এখনও সাধ যায় আরও দেখি।" বিরাট জনসংঘ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে চাইলেও প্রচণ্ড কলরবের জন্য তা করা সম্ভব হয়নি। সেদিন চতুর্দিক 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে মুখরিত ছিল। নহবত বাজছিল। "উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা ধর্মপিপাসা ও অনুরাগ মূর্তিমান" হয়ে "শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ-গণরূপে ইতস্তত বিরাজ" করছিল। "সেদিন দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ির সর্বত্রই একটা দিব্যভাবের বন্যা বহিয়া যাইতেছিল।"

স্বামীজী বেলা তিনটার সময়ে উৎসবস্থল থেকে চলে আসেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিষ্যগণ-লিখিত স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী বা স্বামী গম্ভীরানন্দ-লিখিত বাঙলা জীবনীতেও অতিরিক্ত কিছু নেই।

॥ তিন ॥

সৌভাগ্যবশত এই উৎসবে উপস্থিত এক ব্যক্তির বিবেকানন্দ-চিত্র আমরা পেয়েছি। লেখক যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। লেখাটি বেরিয়েছিল প্রবাসী পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ সংখ্যায়। যোগেন্দ্রকুমার প্রবাসীতে একাধিক সংখ্যায় "আমার দেখা লোক" শিরোনামে স্মৃতিকথা লিখেছিলেন। তিনি বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণকেও দর্শন করেন, কিন্তু সেই বয়সে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বিশেষ চমকপ্রদ কিছু খুঁজে পাননি। যোগেন্দ্রকুমার লিখেছেন:

"ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সাক্ষাৎলাভের দুই বৎসর কি দেড় বৎসর পরে আর একজন মহাপুরুষের দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তিনি জগদ্বিখ্যাত পরমহংস রামকৃষ্ণদেব। পরমহংসদেবকে একদিন চার-পাঁচ মিনিটের জন্য চোখের দেখা দেখিয়াছিলাম মাত্র। আমার পিতার এক মাতুল ৺অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামপুরে ওকালতি করিতেন। আমি কি-একটা প্রয়োজনে তাঁহার বাসাতে গিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিবার সময় একটা বাগানের নিকটে দেখিলাম যে, ভিতরে নিশ্চয়ই একটা কিছু দর্শনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে, যে-জন্য তথায় আজ লোক সমাগম হইয়াছে। কৌতূহলবশত একজনকে সেই জনতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব ঐ বাগানে আসিয়াছেন, লোকে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছে। আমার ইচ্ছা হইল, পরমহংস কিরূপ দেখিয়া আসি। তখন পরমহংস কাহাকে বলে, সে-জ্ঞান আমার ছিল না। আমাদের বাটীতে একখানা পাতলা চটি বই ছিল, তাহার নাম, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের রচনাবলী'। [?]। সেই পরমহংসই যে এই পরমহংস তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক, জনতার সঙ্গে মিশিয়া বাগানে প্রবেশ করিলাম। তখন বোধ হয় বেলা পাঁচটা। দেখিলাম একটা গাছতলায় এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন, একটু স্থূলকায়, দাঁড়ি-ছাঁটা, অর্ধনিমীলিত চক্ষু। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অনেক লোক বসিয়া আছে। সকলেই নীরব, তিনি মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্তী লোকের সহিত দুই-একটি কথা বলিতেছেন। অতি মৃদুস্বরে কথা হইতেছিল, আমি কিছুই শুনিতে পাইলাম না। যাঁহারা বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় ভদ্রলোক। যুবক বালক একজনকেও দেখিলাম না। তাই সাহস করিয়া আর অগ্রসর না হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি আমার নিকটবর্তী একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পরমহংস কোথায়?' তিনি সেই জনতার মধ্যে উপবিষ্ট দাড়ি-ছাঁটা লোকটিকে দেখাইয়া বলিলেন, 'উনিই পরমহংসদেব'। আমার সেই বয়সে আমি পরমহংসদেবের সহিত সাধারণ লোকের কিছুমাত্র প্রভেদ বুঝিতে পারিলাম না। চার-পাঁচ মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া চলিয়া আসিলাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের অন্তত ১০-১১ বছর পরে যোগেন্দ্রকুমার স্বামীজীকে দেখেন, ইতিমধ্যে তিনি পরিণত যুবক, বিবাহিত। সঠিকভাবে দেখার মতো মানসিক শক্তি কিছুটা হয়েছে। তাঁর স্মৃতিকথায় স্বামীজীর এক চমৎকার কথাচিত্র পেয়েছি। এবার সেটি উদ্ধৃত করব।

"বাল্যকালে পরমহংসদেবকে দেখিয়া তাঁহার অসাধারণত্ব কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও পরে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য, জগদ্বিখ্যাত বিবেকানন্দ স্বামীকে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে, একজন অসাধারণ মানুষকে দেখিলাম। স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার বৎসরেই হউক বা তাহার পর বৎসরেই হউক, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। [প্রত্যাবর্তন-বছরেই দেখেছিলেন]। তাঁহার দর্শনলাভের পূর্বেই শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে তিনি অপূর্ব বক্তৃতা করিয়া সমগ্র আমেরিকাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতা একাধিকবার পড়িয়াছিলাম। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আমার অতি উচ্চ ধারণা হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরের অপর পারে বালীতে আমার শ্বশুরালয়। একদিন শ্বশুরবাটীতে গিয়া শুনিলাম যে, সেইদিন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে পরমহংসদেবের আবির্ভাব অথবা তিরোভাব উপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে। বিবেকানন্দ-স্বামীর তথায় আসিবার কথা আছে। স্বামীজী কালীবাড়িতে আসিবেন শুনিয়াই আমি তথায় যাইবার জন্য উৎসুক হইলাম। আমার সমবয়স্ক পাঁচ-সাতজন সঙ্গী জুটিয়া গেল। সকলে মিলিয়া একখানা নৌকা করিয়া কালীবাড়িতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম যে, সুপ্রশস্ত অঙ্গন লোকে লোকারণ্য। বাঙালী অপেক্ষা মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানীর সংখ্যাই অধিক বলিয়া মনে হইল। [?]। শুনিলাম যে, স্বামীজী তখনও আসেন নাই, তবে আসিবেন, ইহা নিশ্চিত। আমি বন্ধুবর্গ-সহ নাটমন্দিরে উঠিয়া একস্থানে বসিয়া পড়িলাম। নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে একটা ছোট গালিচা পাতা ছিল। বুঝিলাম যে, সেই আসন স্বামীজীর জন্য রিজার্ভড রাখা হইয়াছে। আমি গালিচা হইতে কিছু দূরে বসিয়া রহিলাম। প্রায় দশ মিনিট পরে, বাহিরে হঠাৎ একটা হৈ-হৈ শব্দ উঠিল— 'পরমহংস রামকৃষ্ণজীকী জয়', 'স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজকী জয়' ধ্বনিতে সেই প্রাঙ্গণ বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বুঝিলাম, স্বামীজী আসিতেছেন।

"মনে করিয়াছিলাম, "স্বামীজী সন্ন্যাসী, হয়তো ধীরগম্ভীর ভাবে, মৃদু পদক্ষেপে, নাটমন্দিরে আগমন করিবেন। কিন্তু আমার ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া যিনি নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাতে ধীরতা বা গাম্ভীর্যের কোনও লক্ষণই দেখিতে পাইলাম না। উদ্দাম চঞ্চল বালকের মতো যেন অস্থিরভাবে তিনি নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আমরা বাহিরে জয়ধ্বনি শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। স্বামীজী নাটমন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র, আমরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র মুগ্ধ হইলাম। তেমন উজ্জ্বল আয়ত-লোচন আর কাহারও দেখি নাই। মুখে হাসি। স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে সাধারণত যেরূপ উষ্ণীষ ও আপাদমস্তক আলখাল্লা-পরিহিত মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামীজী ঠিক সেইরূপ পোশাকই পরিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও পাঁচ-সাতজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচ্ছদও স্বামীজীর পরিচ্ছদের অনুরূপ। [?]। তাঁহারা বেশ সুশ্রী, উন্নত ললাট, গৌরবর্ণ, দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় তাঁহারা ধার্মিক, বুদ্ধিমান, বিদ্বান। কিন্তু স্বামীজীর চক্ষুর মতো অত উজ্জ্বল চক্ষু কাহারও দেখিলাম না। স্বামীজীর পার্শ্বে তাঁহাদিগকে যেন একটু নিষ্প্রভ বলিয়া বোধ হইল।

"নাটমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই স্বামীজী যাহা করিলেন তাহা দেখিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইলাম, মনে-মনে একটু যে গর্বও অনুভব করি নাই তাহা নহে। স্বামীজীকে দেখিয়া সকলেই করজোড়ে ললাট স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। তিনি এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী সন্ন্যাসীরাও প্রতি-নমস্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে

লাগিলেন। এমন সময় প্রায় আট-দশ হাত দূর হইতে তাঁহার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র তিনি আমাকে নমস্কার করিয়াই একেবারে আমার নিকটে আসিলেন। আমার বন্ধুরা মনে করিলেন যে, স্বামীজীর সহিত আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। কিন্তু সেই একদিন ব্যতীত আর কখনও তাঁহাকে দর্শন করি নাই। তবে তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য আমার মনে এক-এক সময় প্রবল ইচ্ছা হইত। জানিনা, আমাকে দেখিবামাত্র তিনি আমার সেই প্রবল আগ্রহের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা।

"তিনি উপবেশন করিলে আমরাও উপবেশন করিলাম। তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু কি কথা বলিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি আজ এখানে বক্তৃতা করিবেন কি?' তিনি বলিলেন, 'এ ভীষণ ভিড়ে বক্তৃতা করা অসম্ভব। করিলেও সকলে তাহা হয়তো শুনিতে পাইবে না।' স্বামীজীর সহিত আমার এই প্রথম বাক্যালাপ এবং বোধ হয় ইহাই শেষ। কারণ সেদিন তাঁহার সহিত আর কোনও কথা হইয়াছিল কিনা আমার মনে নাই। স্বামীজী সেই নাটমন্দিরে বোধ হয় কুড়ি মিনিট বসিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বোধ হয় দুইবার কি তিনবার তিনি মাথার উষ্ণীষ খুলিয়া আবার বন্ধন করিয়াছিলেন। সমস্তক্ষণ তাম্বূল চর্বণ করিতেছিলেন এবং চঞ্চল শিশুর মতো ছটফট করিতেছিলেন। তাঁহার সেই চঞ্চল ভাব দেখিলেই মনে হইত যেন একটা অদম্য শক্তিকে তিনি আপনার মধ্যে দমন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, আর সেই শক্তি যেন বাহিরে ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাঁহার সঙ্গী সন্ন্যাসীরা কিন্তু ধীর, স্থির, গম্ভীর।

"স্বামীজী নাটমন্দির হইতে বাহির হইয়া গুরুস্থান অভিমুখে অর্থাৎ পরমহংসদেবের অধ্যুষিত কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সমস্ত জনতা সেই দিকে ধাবিত হইল। আমার সঙ্গীরা আর সেই জনতার মধ্যে যাইতে সম্মত না হওয়াতে আমরা বালী প্রত্যাবর্তন করিলাম।"

॥ চার ॥

যোগেন্দ্রকুমারের চমৎকার স্মৃতিকথাটির বিষয়ে দু-একটি মন্তব্য করা চলে। বিবেকানন্দ-দর্শনের ৩৮ বছর পরে তাঁর স্মৃতিকথা প্রবাসীতে বেরোয় (লেখা হয় কোন্ সময়ে?)—এই ব্যবধানে কোনও কোনও বিষয়ে স্মৃতির কিছু ম্লানতা ঘটতে পারে। সেইসব জায়গায় আমি তৃতীয় বন্ধনীমধ্যে জিজ্ঞাসাচিহ্ন দিয়ে রেখেছি। যেমন, তিনি বলেছেন, ঐদিন দক্ষিণেশ্বরে সম্ভবত বাঙালী অপেক্ষা অবাঙালী দর্শকের ভিড় বেশি হয়েছিল। অবাঙালীরা প্রচুর সংখ্যায় এসেছিলেন, একথা মেনে নেওয়া যায়। তার দ্বারা বিবেকানন্দ যে, ভারতের সকল ভাষা ও শ্রেণীর মানুষের মনে নাড়া দিয়েছিলেন, তাও প্রমাণিত—কিন্তু অবাঙালীদের সংখ্যা বাঙালী অপেক্ষা বেশি হয়েছিল, এই তথ্যের সমর্থন অন্য কোনও সূত্রে পাইনা। মনে হয়, সাধারণত এই ধরনের উৎসবে অবাঙালী-উপস্থিতি বেশি সংখ্যায় হয়না, অথচ এখানে হয়েছিল, তাই লেখকের পরবর্তী স্মৃতিতে তা বাঙালীদের উপস্থিতি-সংখ্যাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল—আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে।

নাটমন্দিরে স্বামীজী যুবক যোগেন্দ্রকুমারকে পরিচিতের মতো নমস্কার করেছিলেন—এই মহাভাগ্য শ্বশুরবাড়িতে বয়ে নিয়ে যাবার পরে, ঈষৎ কৌতুকজনক যে-ঘটনা ঘটেছিল, তার বর্ণনা যোগেন্দ্রকুমার দিয়েছেন—সেই সূত্রে সে-সময়ের সমাজমনের একাংশের সংকীর্ণরূপের কথাও তিনি বলেছেন:

"শ্বশুরবাড়িতে (বালীতে) ফিরিয়া আসিবার পর এক মজার ব্যাপার হইয়াছিল, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমার শ্বশুরমহাশয়ের মাতামহীর ভগিনী তখন জীবিত ছিলেন, তাঁহার বয়স তখন বোধ হয় আশী বৎসরের কাছাকাছি হইলেও তিনি বেশ শক্ত ছিলেন। তিনি বাটীর গৃহিণী ছিলেন। রাত্রিতে আমরা আহার করিতে বসিয়াছি, এমন সময় আমার বড় শ্যালক (তিনিও আমাদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন) বলিলেন, "বিবেকানন্দ-স্বামী যোগীনকে দেখিয়াই উহাকে নমস্কার করিয়াছিলেন; আমরা মনে করিয়াছিলাম, বোধ হয় যোগীনের সঙ্গে তাঁহার পূর্বে পরিচয় ছিল।' এই কথা শুনিয়াই বৃদ্ধা সগর্বে বলিয়া উঠিলেন, 'নমস্কার করবে না? হলোই বা বিবেকানন্দ! কুলীনের ছেলের মান রাখবে না? যোগীনকে নমস্কার করেছে, এ কি বেশি কথা নাকি?' বলাবাহুল্য, তিনিও কুলীনের কন্যা, কুলীনের বধূ। সেকালের লোকের মনে কৌলীন্য-গর্ব কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা তাঁহারই এ-কথাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।"

যোগেন্দ্রকুমারের বর্ণনায় কয়েক ছত্রে স্বামীজীর ছবি যেমন সজীব তেমনি উজ্জ্বল। স্বামীজীর অসাধারণ আকার, বিশেষত দুই আয়ত-উজ্জ্বল চোখ, চঞ্চল ছটফটে ভাব, বারবার মাথার পাগড়ি খোলা-পরা—এ ছবি খাঁটি। দর্শনের অনেক পরে বর্ণিত হলেও যোগেন্দ্রকুমারের বর্ণনার সত্যতায় সন্দেহ করা যায়না। স্বামীজীর প্রত্যক্ষদর্শীরা পরবর্তীকালে স্মৃতিকথায় কখনো-কখনো একথা বলেছেন বলে মনে পড়ছে—স্বামীজীকে একবার দেখলে বহু বছর পরেও তিনি স্মৃতিতে জীবন্ত থাকেন—যদিও পারিপার্শ্বিক স্থান ও ঘটনাদি ম্লান হয়ে যায়। এমন ঘটার মূলে কেবল স্বামীজীর অপরিমেয় দৈহিক সৌন্দর্য নয়—তা তাঁর সমগ্র অস্তিত্বের ওজঃশক্তি। বিশেষজ্ঞদের এই ব্যাখ্যা। সুতরাং যোগেন্দ্রকুমার ঐ সময়ের চঞ্চল বালকবৎ বিবেকানন্দকে ঠিকই দেখেছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর অমন হাবভাবের যে-কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন, তা আংশিক সত্য—পুরো নয়। তিনি বলেছেন, স্বামীজী শক্তির আবেগে ছটফট করছিলেন—ভিতরকার বিপুল শক্তিকে যেন ধরে রাখতে পারছিলেন না। অবশ্যই। কিন্তু শক্তির প্রমাণ তো কেবল চঞ্চল প্রকাশে নয়—তাকে সংহত ক'রে রাখার মধ্যেও। বজ্র আপাতদৃষ্টিতে জড়—নিক্ষেপ করলেই তার আগ্নেয় বিদারণ। হিমালয়ের ধ্যানস্থ শিব—ও পর্বতবিদারণকারী প্রবাহিত গঙ্গা—দুই-ই বিবেকানন্দ।

তাই আমাদের মনে হয়—দক্ষিণেশ্বরে স্বামীজীর ছটফটে বালক হয়ে যাওয়ার একটা তৎকালোচিত কারণ ছিল।

এক সপ্তাহ আগে কলকাতার সংবর্ধনা-সভায় স্বামীজী কলকাতাবাসীদের সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন:

"... তোমাদের নিকট আমি সন্ন্যাসিভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্মপ্রচারকরূপেও নহে, কিন্তু পূর্বের মতো সেই কলিকাতার বালকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ। আমার ইচ্ছা হয়, এই নগরীর রাজপথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের মতো সরলপ্রাণে তোমাদিগকে আমার মনের কথা খুলিয়া বলি।"[৩]

যুবকদের উদ্দেশ্য ক'রে স্বামীজী বিশেষভাবে বলেছিলেন:

"... ইহাও স্মরণ রাখিও যে, আমিও একসময় অতি নগণ্য বালকমাত্র ছিলাম—আমিও একসময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মতো খেলিয়া বেড়াইতাম।"[৪]

কলকাতার ঐ বহুজনসমাকীর্ণ সভায় স্বামীজী সর্বসাধারণের সঙ্গে সমভূমিতে দাঁড়িয়ে কথা বলার ইচ্ছায় নিজের বাল্যস্মৃতির মধ্যে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। আর দক্ষিণেশ্বরে তিনি চেয়েছিলেন সত্যই বালক হয়ে যেতে।

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে। নিজের ঘর আর বিশ্বখেলাঘর যেখানে এক—সেইখানে—দক্ষিণেশ্বরে। খেলার রাজা তো এখানেই ছিলেন। মাতা যশোদাও—নহবতে। শ্রীদাম-সুদামের দলও ঘুরছে ফিরছে। কী পরিবর্তন পূর্ব-ক্রীড়াস্থলীর! ঠাকুরের কী লীলা। স্ফূর্তিতে হাততালি: "সেদিন—আর—এদিন!!" এদিনের মধ্যেও সেদিনটিকে চাই। সেদিন তাঁর গেরুয়ার খুঁটে তিনটি শব্দ বেঁধে দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল—"নরেন শিক্ষে দিবে।" সেইসঙ্গে আরও দুটি শব্দ—"হাঁক দিবে।" পৃথিবী ঘুরে, বুকের রক্ত তুলে, অনেক শিক্ষা দেওয়া গেছে—অনেক হাঁক। ধুত্তোর, শিক্ষা দেওয়া আর হাঁক দেওয়া! এতদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে ফিরেও সেই শিক্ষে-মার্কা বক্তৃতা দেবার তাগিদ? কার শিক্ষে দিয়েছি আমি—আমার না তাঁর?

"...যদি কায়মনোবাক্য দ্বারা আমি কোনও সৎকার্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোনও কথা বহির্গত হইয়া থাকে, যাহা দ্বারা জগতে কোনও ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোনও গৌরব নাই, তাহা তাঁহারই। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখনও অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখনও কাহারও প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার, তাঁহার নহে। যাহা-কিছু দুর্বল, যাহা-কিছু দোষযুক্ত, সবই আমার। যাহা-কিছু জীবনপ্রদ, যাহা-কিছু বলপ্রদ, যাহা-কিছু পবিত্র—সকলই তাঁহার প্রেরণা, তাঁহারই বাণী, এবং তিনি স্বয়ং।"[৫]

বড় অর্থকষ্টের সময়ে ঠাকুরই তো আমাকে মা-কালীর কাছে পাঠিয়েছিলেন—কিন্তু কোথায় আর টাকা চাইতে পারলাম—চেয়ে বসলাম জ্ঞান ভক্তি আর বৈরাগ্য! তারপরে আবার ওঁরই 'চক্রান্তে' মা-কালীর সঙ্গে নতুন সম্পর্কের সূত্রপাত হলো—অবাধ্য ছেলের সঙ্গে দুষ্টু মায়ের ঝগড়াঝাটির সেই সম্পর্ককথা":

"স্বামীজী: ওঃ! কালীকে ও কালী-ব্যাপারকে কী ঘৃণাই না করতাম! ছ-বছর ধরে সেই লড়াই—কেননা কালীকে কিছুতে মানব না।...

"[কিন্তু] মানতে বাধ্য হয়েছি। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর কাছে আমাকে উৎসর্গ

করেছিলেন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাজেও তিনি [মা-কালী] আমাকে চালিত করেন—আমার এই বিশ্বাসের কথা তুমি [নিবেদিতা] জানো।

"তবু কত দিনের লড়াই। লোকটিকে [শ্রীরামকৃষ্ণকে] আমি ভালবাসতুম। বুঝতে পারছ, তাতেই আটকে পড়েছিলুম। আমার দেখা পবিত্রতম ব্যক্তি তিনি—অনুভব করেছিলুম। আর জানতুম, তিনি আমায় এত ভালবাসেন—সে ভালবাসার শক্তি আমার বাপ-মায়েরও নেই।...

"তাঁর বিরাটত্ব সম্বন্ধে বোধ কিন্তু আমার মধ্যে তখন জাগেনি। সেটা এল পরে, আত্মসমর্পণের পরে। তার আগে তাঁকে খ্যাপা শিশুর মতো ভাবতাম—সব সময়ে এ-ই দেখছেন, আর সে-ই দেখছেন, দেবদেবী, কত কি! সেসব জিনিসকে ঘৃণা করতাম। কিন্তু তার পরে—এমনকি কালীকেও—মেনে নিতে হলো আমাকে।"[৬]

কালীকে তো মেনে নিলেন—কালী তাঁকে গোলাম ক'রে ফেললেন—কিন্তু সেখানেও গোলামরাজার কাণ্ড!

"কিন্তু কিভাবে না তিনি [জগন্মাতা] আমাকে যন্ত্রণা দেন কখনও কখনও। তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বলি, 'যদি তুই এই-এই জিনিস আগামীকাল আমাকে না দিবি, তাহলে তোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শ্রীচৈতন্যের পূজা করব।'—এবং সেই জিনিসগুলি আমি অতি অবশ্যই পেয়ে যাই।"[৭]

মজার ব্যাপার। রামকৃষ্ণের কাছে নরেন্দ্র শিশু, নরেন্দ্রের কাছে রামকৃষ্ণ শিশু। কালীর কাছে নরেন্দ্র শিশু, এমন অবাধ্য জেদী সেই শিশু যে তার মাকে ইচ্ছাপূরণে বাধ্য করে।

স্বামীজী দক্ষিণেশ্বরের স্মৃতিকথায় বলছেন:

"কী অপরূপ দৃশ্য ভেসে আসে চোখের সামনে—আমার সারা জীবনের অপরূপতম দৃশ্যগুলি! পূর্ণ নৈঃশব্দ্য, শৃগালের চীৎকারে শুধু সে নীরবতা ক্বচিৎ বিঘ্নিত; অন্ধকারে দক্ষিণেশ্বরের বিরাট পঞ্চবটীর আসন। রাতের পর রাত, সারা রাত, আমরা সেখানে বসেছি—আমি তখন বালক—তিনি আমার সঙ্গে কথা বলে গেছেন।"[৮]

জীবনের দেনা ঘুচিয়ে—সে-দেনা বিশ্ব-উদ্ধারের দায় হলেও—বিবেকানন্দ ফিরতে চেয়েছিলেন তাঁর 'নরেন্দর' জীবনে। সেই তাঁর অন্তিম আকৃতি।

"কত কি হলো গেল, তবু আমি সেই একই বালক,
দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলে বসে যে শুনত
রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী
অবাক হয়ে, বিভোর হয়ে—সেই আমার প্রকৃতি।
অন্য যা-কিছু কাজকর্ম, পরোপকার, লোকসেবা—
সবই আরোপিত,

একদা ছিল—এখন নেই।

আ-হা, আবার সেই মধুর বাণী,
সেই চিরচেনা কণ্ঠস্বর,
কন্টকিত অন্তর, রোমাঞ্চিত প্রাণ,
নেই বন্ধন মায়াজাল, নেই জীবনের আকর্ষণ,
শুধু আছে প্রভুর মধুর গম্ভীর আহ্বান।
যাই প্রভু যাই।

ঐ তিনি বলছেন, মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক গে,
সংসারের ভালমন্দ দেখুক সংসারীরা,
ওসব ফেলে তুই চলে আয়।
যাই প্রভু যাই।

আমার জন্য ফিরতে হবে সংসারে—নেই এমন কেউ,
যাচ্ছি না কোনো বন্ধন নিয়েও আমি।
পুরনো বিবেকানন্দ আর নেই।
নেই শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য—নেই।
রয়েছে একটি বালক—প্রভুর চিরপদাশ্রিত দাস।
বিবেকানন্দ আর নেই।"[৯]

"আমার বালক-ভাবটাই আমার আসল প্রকৃতি"
—বিবেকানন্দ বলেছিলেন।

উল্লেখপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. স্বামী বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, ১ম সং, পৃ. ২০৮-২১২।
২. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'—২য় খণ্ড, ১৩৮৩, পৃ. ১৭৪, পাদটীকা।
৩. বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫।
৪. ঐ, পৃ. ২১৫।
৫. ঐ, পৃ. ২০৯।
৬. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'নিবেদিতা লোকমাতা'—১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫।
৭. ঐ, পৃ. ৩৩৬।
৮. ঐ, পৃ. ৭৮।
৯. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ কবি চিরন্তন'—১৯৮৫, পৃ. ১০৯-১১০।

[উদ্বোধন পত্রিকার ১৩৯৮, আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত]

শ্রীমা সারদাদেবীর একটি ঐতিহাসিক পত্র
রামকৃষ্ণ-সংঘের দার্শনিক ভিত্তি প্রসঙ্গ

স্বামী বিমলানন্দকে লিখিত শ্রীমা সারদাদেবীর একটি পত্র নিম্নে মুদ্রিত হয়েছে। পত্রটি পূর্ণ আকারে এই প্রথম প্রকাশিত হলো। বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে গবেষণাকালে পত্রটির সন্ধান পেয়ে সংগ্রহ করি। পত্রটি এই:

শ্রীগুরবে নম

জয়রামবাটী
১৩০৯। ১৫ই ভাদ্র

নিরাপদেষু—
পরম শুভাশীর্ব্বাদবিশেষ—
বাবাজী—১খান পত্র পাইয়া জ্ঞাত আছি। শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের জন্য যে কষ্ট হইতেছে লিখিয়া কি জানাই। আমাদের গুরু জিনি তিনিত অদ্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিষ্য তখন তোমরাও অদ্বৈত বাদী। আমি যোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী। মিসেস সেভিয়ারকে আমার ভালবাসার সহিত আশীর্ব্বাদ জানাইবে। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। কালীকৃষ্ণ তথায় যাইবেক জানিয়া মতিলালের ১খান পত্র পাইয়াছি। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। মেয়ে মানুষের মঠ*—মঠে সাবধানে থাকিবে। আর স্বামীজির যোর নাই। আমরা সকলে ভাল আছি। তোমাদের সংবাদ লিখিবে। ইতি

তোমাদের মা
আশীর্ব্বাদীকা

[* 'মেয়ে মানুষের মঠ'—কথাটি চিঠির পাশে লেখা ছিল। মিসেস সেভিয়ার মায়াবতী আশ্রমের তত্ত্বাধায়ক ছিলেন, সেইজন্যই শ্রীশ্রীমা এরূপ লিখেছেন।]

উপরের পত্রটি আমাদের বিবেচনায় একটি ঐতিহাসিক পত্র। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসে এটির স্থান আছে। এই আন্দোলন ভারত ও পৃথিবীর ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে যেহেতু উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়েছে, তাই সংঘের ইতিহাসে যদি কোনো রচনার বিশেষ মূল্য থাকে, তাহলে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে।

পত্রলেখিকা কিন্তু লেখিকা হিসাবে কোনোমতে বিখ্যাত নন। তিনি স্বহস্তে চিঠি লিখতেন

না। ঠিকভাবে বলতে গেলে, তিনি লিখতেই পারতেন না। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর সুবিখ্যাত 'নিরক্ষর' স্বামীকেও অতিক্রম করেছেন।' 'নিরক্ষর' শ্রীরামকৃষ্ণ লিখতে জানতেন, এবং অতি সুছাঁদ ছিল তাঁর হস্তাক্ষর।

পত্রটি থেকে পাঠক দেখবেন তাতে বর্ণাশুদ্ধি যথেষ্ট আছে, এবং ভাষাও সুগঠিত নয়। পত্রটির বক্তব্য শ্রীশ্রীমা বলে গিয়েছিলেন, এবং সেবক বা সঙ্গিনীদের কেউ তা লিখে দেন। তা সত্ত্বেও বলতে হবে, এর মধ্যে এমন-কিছু বস্তু আছে যা বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য।

আগেই বলেছি এই পত্র ইতিপূর্বে সম্পূর্ণত কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই, যদিও এর প্রয়োজনীয় কিছু অংশ বহুদিন আগেই বেরিয়ে গেছে। ১৯১৫ সালে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ-লিখিত' স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়—তার মধ্যেই সম্ভবত পত্রটির প্রথম প্রকাশ্য উল্লেখ আছে। তারপর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁর 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থে স্বামী স্বরূপানন্দের ডায়েরী থেকে উক্ত পত্রের কয়েক লাইন উদ্ধৃত করেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'শ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থে স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী থেকে উক্ত অংশ নিয়েছেন, এবং 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে তা নিয়েছেন 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থ থেকে। স্বরূপানন্দের ডায়েরী আমি স্বামী অব্জজানন্দের কাছে দেখবার সুযোগ পেয়েছি—সেখান থেকে উক্ত অংশ 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছি। স্বামীজীর শিষ্য খগেন অর্থাৎ স্বামী বিমলানন্দ শ্রীশ্রীমাকে এক পত্র লেখেন—তার উত্তরে শ্রীশ্রীমার ঐ পত্র। ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০২ তারিখে স্বরূপানন্দের ডায়েরীতে এ বিষয়ে লেখা আছে—"খগেন মাতাঠাকুরাণীর পত্র পাইল, জয়রামবাটী হইতে, ১৩০৯, ১৫ ভাদ্র, ৩১ অগস্ট ১৯০২;—লিখিয়াছেন—।"

পত্রটির পটভূমিকা স্বামীজীর জীবনী-পাঠকের জানা আছে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে দারুণ বৃষ্টি ও তুষারপাতের মধ্য দিয়ে নিতান্ত অসুস্থ শরীরে স্বামীজী দুর্গম মায়াবতীতে গিয়েছিলেন শোকার্ত মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিতে এবং নিজের একটি প্রিয় স্বপ্নের কিছু সার্থকতার রূপকে স্বচক্ষে দর্শন করতে। স্বামীজীর স্বপ্ন-কল্পনা অনুযায়ী মায়াবতীতে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করেছিলেন—সেই ক্যাপ্টেন সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন, বিনা চিকিৎসায়—সে-মৃত্যু স্বামীজীর 'ভিশন্'-এর জন্য আত্মোৎসর্গ ছাড়া আর কিছু নয়।

স্বামীজীর নানাপ্রকার ভিশন্-এর প্রধান একটিকে—বিশুদ্ধ অদ্বৈতকে সাধনারূপে গ্রহণ এবং ধর্মরূপে প্রচারের ব্রতকে—গ্রহণ করেছিলেন ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার। অদ্বৈত আশ্রমের স্থাপনা সেই জন্যই। কোন্ বিরাট ও বিশুদ্ধ কল্পনায় স্বামীজী এক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত ছিলেন, তা স্বামীজীর জীবনী-পাঠক জানেন। তাঁরা জানেন, ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার, এই দুই বিদেশীকে, এবং স্বরূপানন্দ নামক স্বদেশীয়কে, একাজে সহায়ক পেয়ে স্বামীজী কতখানি উল্লসিত ছিলেন। ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের পঞ্জরাস্থি দিয়ে মায়াবতীতে কোন্ অদ্বৈত-বজ্র নির্মিত হয়েছে, তাই দেখবার জন্য স্বামীজীর শেষ হিমালয়যাত্রা।

মায়াবতী স্বামীজীকে কতখানি আনন্দ দিয়েছিল, তা তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায়—সেখানকার একটি ব্যাপার তাঁকে কতখানি আঘাত করেছিল, তাও পাই। অদ্বৈত আশ্রমের একটি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের পট প্রতিষ্ঠা ক'রে স্বামীজীর কয়েকজন শিষ্য পূজা আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলেন। স্বামীজী একান্তভাবে চেয়েছিলেন—রামকৃষ্ণ সংঘের একটি কেন্দ্র অন্তত থাক যেখানে বিশুদ্ধ নিরাকার অদ্বৈতের উপাসনা হবে; দূর হিমালয়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম

স্বামীজীর সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত কেন্দ্র। সেখানেও সাকার উপাসনা!! তদুপরি, আমার ধারণা, ঘটনাটিকে "কথা মতো কাজ না-করা" বলেও তাঁর মনে হয়েছিল। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী, তাঁরা অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা; প্রধান কর্মী স্বরূপানন্দও তাই—সেই আশ্রমে, যেহেতু সেটি রামকৃষ্ণ সংঘের অন্তর্ভুক্ত, তার জোরে, সংঘের সাধু-ব্রহ্মচারীরা যদি সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা আরম্ভ ক'রে দেন, তাহলে আদর্শরক্ষা তো হয়ই না, নেতার প্রতিশ্রুতিরক্ষাও হয়না।

১৯১৫ সালে প্রকাশিত স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর তৃতীয় খণ্ড থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ অনুবাদ ক'রে দিচ্ছি:

"কয়েকজন (অদ্বৈত) আশ্রমবাসীর একান্ত ইচ্ছায় একটি ঠাকুরঘর কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পটপূজা হত। (মায়াবতীতে) উপস্থিত হবার পরে স্বামীজী একদিন সকালে সেই ঘরটি দেখতে পান—দেখেন যে, অদ্বৈত আশ্রমে রীতিমত ঠাকুরঘর চালু হয়ে গেছে, ধূপ-ধুনো, ফুল-ফল দিয়ে দিব্য ভোগ-পূজা চলছে। তখনি তিনি কোনো কথা বলেন নি; কিন্তু সন্ধ্যায় সকলে যখন অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসেছেন তখন তিনি অদ্বৈত আশ্রমের মতো জায়গায় ঠাকুরপূজা করার কঠোর সমালোচনা করলেন। বললেন, অত্যন্ত অনুচিত কাজ করা হয়েছে। অদ্বৈত আশ্রমে ধর্ম আচরিত হবে ব্যক্তিগতভাবে; আশ্রমবাসীরা নিজস্ব-ভাবে ধ্যানাদি করবেন, একক বা সমবেতভাবে শাস্ত্রচর্চা করবেন, তাঁরা সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অদ্বৈতবাদের অনুশীলন করবেন ও তার শিক্ষা দেবেন—দ্বৈতবাদের দুর্বলতা বা নির্ভরতা থেকে একেবারে দূরে থাকবেন। অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রচারিত প্রস্‌প্রেকটাসে স্বামীজী স্বয়ং নির্ধারণ ক'রে দিয়েছিলেন—এখানে বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ অদ্বৈততত্ত্ব, সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও দুর্বলকর সংস্রব থেকে যা মুক্ত—কেবল তাই অনুশীলিত ও প্রচারিত হবে। অদ্বৈত আশ্রম একমাত্র অদ্বৈতের জন্যই উৎসর্গীকৃত। সুতরাং, স্বামীজী বললেন, এক্ষেত্রে বিচ্যুতির সমালোচনা করার অধিকার তাঁর আছে। তাছাড়া নিজ গুরুর শিক্ষা ও আশীর্বাদেই তিনি অদ্বৈতবাদী হয়েছেন; এবং তিনি এ বিষয়ে সচেতন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সর্বপ্রকার ধর্ম-ধারণা শিক্ষা দেবার ও প্রচার করার দায় দিলেও তাঁর (স্বামীজীর) ক্ষেত্রে কিন্তু অদ্বৈতবাদের উপরই জোর দিয়ে গেছেন।

"অদ্বৈত আশ্রমে আনুষ্ঠানিক পূজা সম্বন্ধে স্বামীজী যদিও তাঁর কঠোর মনোভাব উপস্থিত সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পূজাঘরটি অবিলম্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেননি—যাঁরা ওর জন্য দায়ী, তাঁদের অনুভূতিতে আঘাত করার মতো কোনো কাজ তখন করেন নি। সেটা করলে কর্তৃত্বের জোর খাটানো হতো। যাঁরা ওকাজ করেছেন, তাঁরাই যেন নিজেদের ভুল বুঝে তার থেকে সরে যান—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু স্বামীজীর আপসহীন মনোভাব—যার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন তাঁর দুই অদ্বৈতবাদী শিষ্য, স্বামী স্বরূপানন্দ ও মিসেস সেভিয়ার—অপর আশ্রমবাসীদের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্য এবং তাকে বজায় রাখবার জন্যই যে স্বামীজী তাঁদের নিয়োগ করেছেন, সেটা গভীরভাবে অনুভব ক'রে তাঁরা পূজা বন্ধ

করে দিয়েছিলেন—এবং ক্রমে ঠাকুরঘরও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[২]

"আশ্রমবাসীদের একজনের মনে দ্বৈতবাদের দিকে ঝোঁক ছিল। এক্ষেত্রে অদ্বৈত আশ্রমের সদস্য হওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান হয়ে তিনি সর্বোচ্চ বিচারকরূপে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে মীমাংসা চেয়েছিলেন। মাতাঠাকুরাণী তাতে উত্তর দেন—'শ্রীগুরুদেব ছিলেন সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদী; তিনি অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়েছেন। তোমরা তাহলে অদ্বৈতবাদ অনুসরণ করো না কেন? তাঁর সকল শিষ্যই অদ্বৈতবাদী।' বেলুড় মঠে ফেরার পরে মায়াবতীর ঠাকুরঘর সম্বন্ধে আক্ষেপ ক'রে স্বামীজী বলেছিলেন, 'ভেবেছিলুম, অন্তত একটি কেন্দ্রেও তাঁর বাহ্যপূজাদি বন্ধ থাকবে। হায়, গিয়ে দেখি বুড়ো ওখানেও জেঁকে বসে আছে। ভালই।"

স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে প্রকাশিত এই বিবরণের বিশেষ মূল্য এইখানে—জীবনীটি লেখা হয়েছিল স্বামী বিরজানন্দ এবং মিসেস সেভিয়ারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। অদ্বৈত আশ্রমের পূর্বোল্লিখিত ঘটনা যখন ঘটে, উভয়েই তখন সেখানে উপস্থিত। সুতরাং তাঁরা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণই লিখিয়েছিলেন। এবং আরও উল্লেখযোগ্য—উভয়ে ছিলেন ভাবধারার ক্ষেত্রে 'বিরোধী শিবিরের'—স্বামী বিরজানন্দ ঠাকুরঘর-প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম[৩] এবং মিসেস সেভিয়ার কট্টর অদ্বৈতবাদী।

ইংরেজী জীবনীর মধ্যে মাতাঠাকুরাণীর চিঠির যে অংশ পাই, তা কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ নয়। এবং জনৈক আশ্রমবাসী (স্বামী বিমলানন্দ) ঠিক কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে শ্রীশ্রীমাকে চিঠি লিখেছিলেন, তাও বোধহয় সবটা দেওয়া হয়নি। স্বামী বিমলানন্দ কি তাঁর দ্বৈতবাদে ঝোঁক আছে সুতরাং অদ্বৈত আশ্রমে থাকা উচিত কিনা—মাত্র এই বিষয়েই প্রশ্ন ক'রে শ্রীশ্রীমাকে চিঠি লিখেছিলেন, না অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুরঘর থাকার বিরুদ্ধে নিজ গুরুর মনোভাবের বিষয়ে প্রশ্নও ক'রে পাঠিয়েছিলেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল বলেই মনে হয়। এবং আমরা বুঝতে পারি—যাঁরা সর্বস্ব দিয়ে ধর্মকে বরণ করেন, তাঁরা কী গভীর জিজ্ঞাসায় মথিত হতে পারেন যা স্বামীজীর মতো গুরুর কাজের যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও সংশয় জাগাতে পারে—এবং পুনশ্চ, বুঝতে পারি—সংঘের কাছে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী কেবল গুরুপত্নী ছিলেন না, তিনি গুরুর প্রতিনিধি, সংঘজননী এবং সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ।[৪]

সারদাদেবীর আলোচ্য পত্রটির গুরুত্ব, আমরা যতদূর দেখেছি, এ পর্যন্ত স্বামীজীর দিক দিয়েই বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু ওটি কি সারদাদেবীর জীবনের পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ? যদি আমরা একবার ভেবে দেখি—কী সহজে স্বচ্ছন্দে তিনি নিজেকে পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিত্য সত্যের ভূমিতে স্থাপন করতে পারতেন—তাহলে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। সারদাদেবী নারী এবং মাতা, দৈনন্দিন জীবনে স্বতঃই দ্বৈতবাদী—তাঁর পূজার দেবতা আবার নিজ স্বামী—যিনি গুরু এবং ঈশ্বর তাঁর কাছে, সারাদিন তাঁর পূজাতেই কাটে—সেই স্বামী-গুরু-ঈশ্বরের পূজার পট সরিয়ে নেওয়া হয়েছে গুরুর শিষ্যের ইচ্ছায়—তখন তাঁর কী মনোভাব এবং সিদ্ধান্ত?—হ্যাঁ, অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা বন্ধ করিয়ে স্বামীজী ঠিক কাজই করেছেন।। আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে এ-বস্তু অলৌকিক। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীর পক্ষেই এ-জিনিস করা সম্ভবপর—যে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতসাধনার সময়ে জ্ঞানের অসিতে মাতৃমূর্তিকে পর্যন্ত

দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন! সারদাদেবী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ও সারদা, সরস্বতী'—সে কথার আর কোন্ প্রমাণ প্রয়োজন?

পত্রটির আর একটি বিশেষ মূল্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এবং রামকৃষ্ণ সংঘের সর্বোচ্চ ধর্মধারণা কি—সে বিষয়ে যদি প্রশ্ন ওঠে তাহলে এই পত্র তার মীমাংসা ক'রে দেবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়াচার্য সত্য, কিন্তু নিজে তিনি অদ্বৈতবাদীও। তাঁর ধর্মমত নিয়ে অবশ্য তর্ক আছে। তিনি কি দ্বৈতবাদী, না বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, না কি অদ্বৈতবাদী? কথামৃত পড়ে অনেকেই তাঁকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মনে করেন। এক বিশিষ্ট পণ্ডিত অধ্যাপক ডঃ অধরচন্দ্র দাস গ্রন্থ লিখে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ জোর ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণকে অদ্বৈতবাদী খাড়া করেছেন, যা তিনি মোটেই ছিলেন না। এ ধরনের রচনা নিশ্চয় শেষ রচনা নয়। এক্ষেত্রে নিঃসংশয় সিদ্ধান্তের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রমাণ চাই—সারদাদেবীর পত্রটি তেমন একটি অব্যর্থ প্রমাণ।

সবিনয়ে সবশেষে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়াচার্য হওয়ার সঙ্গে অদ্বৈতবাদী হওয়ার বিরোধ তো নেই-ই, উল্টোপক্ষে, অদ্বৈতবাদী না হলে তিনি সমন্বয়াচার্য হতে পারতেন কি? রামকৃষ্ণ-পন্থী সমন্বয়বাদীদের কথা—যে-কোনো পথ ধরে অগ্রসর হওয়া যাক-না কেন, যদি যথার্থ ব্যাকুলতা থাকে তাহলে চরম লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। মাত্র অদ্বৈতবাদীরাই একথা বলতে পারেন, কারণ তাঁরা কোনও ঈশ্বরীয় রূপকেই পথের প্রান্তে অবস্থিত বলেন না। পরিণতিতে যাঁদের কাছে কোনও একটিমাত্র মূর্তি নেই, এক অদ্বয় সত্তাকেই সর্ববিধ ঈশ্বরীয় রূপের মূল বলে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা কোনও পথকে একমাত্র পথ মনে না-করতে পারেন। অপরদিকে দ্বৈতবাদীরা যেহেতু তাঁদের সম্প্রদায়গত সাকার ভগবানকেই শুধু মানেন, তাই সেই ভগবানের কাছে উপস্থিত হবার জন্য সম্প্রদায়গত পথটিকে একমাত্র অবলম্বনীয় পথ বলে গ্রহণ করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। দ্বৈতবাদীরা খুব উদার হলে বড়জোর ভিন্ন মতাবলম্বীদের 'সহ্য' [tolerate] করেন—কিন্তু তাদের মতকে নিজ মতের মতো সত্য বলে 'স্বীকার' (accept) করেন কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্ম ও শক্তির সম্পর্ক বোঝাতে অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির কথা বলেছেন। অগ্নি না থাকলে দাহিকাশক্তির পৃথক অস্তিত্ব নেই। আবার ব্যবহারিক জগতে অগ্নির অস্তিত্ব স্বীকার্য নয় যদি তার দাহিকাশক্তি না থাকে। এক কথায়, উভয়ের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মের দাহিকাশক্তি শ্রীসারদা। তাই সারদার পক্ষেই দৃঢ়তার সঙ্গে মূল সত্যকে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল যখন তিনি বলেছিলেন—"তিনি তো **অদ্বৈত**, তোমরা সেই গুরুর শিষ্য তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী।" এখানে শুধু যে রামকৃষ্ণপন্থীদের, অন্তত সংঘভুক্ত সন্ন্যাসীদের, দার্শনিক মত সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে, তাই নয়, সেইসঙ্গে আশ্চর্য একটি উচ্চারণ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে। তাঁকে **অদ্বৈত** বলা হয়েছিল—অদ্বৈতবাদী নয়। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং পরম সত্য, পরম অদ্বৈত সত্য—তাই তাঁর পক্ষে অদ্বৈতবাদী হওয়ার কথা ওঠে না। তাঁর অনুগামীরাই হবেন অদ্বৈতবাদী।

প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলেই সারদাদেবীর পক্ষে ঐ কথা বলা সম্ভব হয়েছিল। তিনি সরস্বতী—সত্যের প্রথম উচ্চারণ তাঁর বীণা-কণ্ঠে।

উল্লেখপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত 'শ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থে শ্রীশ্রীমার লেখা-পড়ার কিছু বিবরণ আছে। বিয়ের আগে নিজের পড়াশোনা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বলেছেন—"ছেলেবেলায় প্রসন্ন, রামনাথ (জ্ঞাতিভাই) ওরা সব পাঠশালায় যেত। ওদের সঙ্গে কখনও কখনও যেতুম। তাতেই একটু শিখেছিলুম।" বিয়ের পরে লেখা-পড়া সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি 'বর্ণপরিচয়' একটু একটু পড়তুম। ভাগনে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে; বললে, 'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই; শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে?' লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। ঝিয়ারী মানুষ কিনা, জোর ক'রে রাখলে। আমি আবার গোপনে আর একখানি এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত; সে এসে আবার আমায় পড়াত।"

শ্রীশ্রীমার কথায় আরও জানা গেছে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে আরো একটু ভাল ক'রে শিখতে পেরেছিলেন। ভব মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে স্নান করতে এসে তাঁকে পড়িয়ে যেত; শ্রীশ্রীমা তাকে মাইনে রূপে বা (গুরুদক্ষিণারূপে!) বাগানের শাক-পাতা দিতেন। "এই বিদ্যাভ্যাসের ফলে তিনি রামায়ণাদি পড়িতে পারিতেন, কিন্তু লিখিতে বিশেষ পারিতেন না; এমনকি শেষ বয়সে নাম সহি পর্যন্ত করিতে পারিতেন না।"

২. একটা প্রশ্ন ওঠে—স্বামীজীকে কি কেউ ঠাকুরঘরটির বিষয়ে সংবাদ দিয়েছিলেন? 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থের মতে, না, তা সত্য নয়; স্বামীজীই একদিন তা 'আবিষ্কার' করে ফেলেছিলেন। 'স্বামীজী অতঃপর মাদার সেভিয়ার ও স্বরূপানন্দকে অদ্বৈত আশ্রমের নীতি-বিরুদ্ধ পূজাদি চলতে দেওয়ার জন্য খুব তিরস্কার' করেছিলেন।

৩. "স্বামী বিরজানন্দ ছিলেন ঐ ঠাকুরঘরটির একজন প্রধান পাণ্ডা।"—'অতীতের স্মৃতি'।

৪. সোজা ভাষায় সংঘের 'হাইকোর্ট'। স্বামী শিবানন্দ ঐ শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থে পাই, একবার জনৈক ব্রহ্মচারী কি একটা অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছিল, পাছে স্বামী শিবানন্দ তাঁকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেন সেই ভয়ে একেবারে সোজা পায়ে হেঁটে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে হাজির হন। শ্রীশ্রীমা উক্ত ব্রহ্মচারীকে ক্ষমা করার অনুরোধ জানিয়ে শিবানন্দ স্বামীকে চিঠি দেন। তারপর শ্রীশ্রীমা ছেলেটিকে মঠে পাঠিয়ে দেন। "ব্রহ্মচারী মঠে পৌঁছিলে শিবানন্দজী তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, ব্যাটা, তুই আমার নামে হাইকোর্টে নালিশ করতে গিয়েছিলি?"

[উদ্বোধন পত্রিকায় ১৩৭৯ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত]

একাসনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

॥ এক ॥

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক

ঘটনাটি স্মরণীয়। অনেক রামকৃষ্ণ-মন্দিরেই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদার পটের পাশে স্বামী বিবেকানন্দের পট রেখে পূজা করা হয়। কিছু ভক্তের কাছে ব্যাপারটা মনে হল অশাস্ত্রীয়—গুরুর পাশে শিষ্যের ছবি রেখে সমমর্যাদায় পূজাদি করা তো ঐতিহ্যবিরোধী কাণ্ড। ক্ষুণ্ণ ভক্তেরা এ-বিষয়ে ক্ষুব্ধ প্রশ্ন ক'রে পাঠালেন স্বয়ং শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে। সারদামাতা উত্তরে বলেছিলেন, কি বলছ তোমরা! ঠাকুর, নরেনকে পাশে কেন, মাথার মণি ক'রে রেখেছিলেন।

ঐতিহ্যবাহী ধর্মক্ষেত্রে প্রচণ্ড নাড়া দেবার মতো এই ঘটনা। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই এসে যায় গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের কথা। এই সম্পর্কের রহস্য আকৃষ্ট এবং অভিভূত করেছে প্রাজ্ঞ মনীষীদের। আচার্য বিনোবা ভাবে ভারতবর্ষে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের ইতিহাস পর্যালোচনা কালে গোবিন্দপূজ্যপাদ ও শঙ্করাচার্য, নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানদেব, মাধবদেব ও শঙ্করদেবের কথা এনেছিলেন। আচার্য বিনোবা সিদ্ধান্ত করেছেন—"গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের সর্বোচ্চ আদর্শ আমরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মধ্যে পেয়েছি।" আর, "বিবেকানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণের সেন্ট পল"—এ তো বহুকথিত। ডঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণের কাছে—"রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ হলেন নারায়ণ ও নরসখা।"

আলোচ্য প্রসঙ্গের দুটি দিক আছে। রামকৃষ্ণ কিভাবে নির্মাণ করেছেন বিবেকানন্দকে? এবং, রামকৃষ্ণ কোন্ চোখে দেখতেন বিবেকানন্দকে?

বিবেকানন্দ-নির্মাণের ইতিহাস বিস্ময়কর, প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। নরেন্দ্রনাথের মতো প্রবল ব্যক্তিত্বশালী এক যুবক, সহাধ্যায়ী বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সাক্ষ্যমতো যিনি "জন্মবিদ্রোহী কালাপাহাড়," "যিনি চিন্তায় স্বাধীন, বুদ্ধিতে সৃষ্টিশীল, প্রচণ্ড প্রতাপশালী, মানুষকে অক্লেশে বশীভূত করতে সমর্থ"—সেই তাঁকে সুকোমল ভাবময়, রসরহস্যসায়রের উপরে নিত্য ভাসমান এক পরমহংস কিভাবে বশীভূত করেছিলেন, সে রহস্য—বিবেকানন্দ স্বয়ং বলেছেন—"কোনোদিন জানা যাবে না—তা বিলীন হয়ে যাবে আমার দেহান্তের সঙ্গে-সঙ্গেই।"

তবু নরেন্দ্রনাথকে রামকৃষ্ণের শিক্ষাদানের নানা বিবরণ লীলাপ্রসঙ্গ বা কথামৃতের

অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে। সেখানে দেখি, আত্মমুক্তির আকাঙ্ক্ষী নরেন্দ্রনাথকে রামকৃষ্ণ সচেতন করেছেন সমষ্টিকল্যাণের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে। আমাদের স্বতঃই মনে পড়বে নরেন্দ্রনাথকে রামকৃষ্ণের সুবিখ্যাত ধিক্কারের কথা—"তুই কি ছোট রে। কেবল নিজের মুক্তির কথা ভাবছিস? আমি ভেবেছিলাম তুই বৃহৎ বটগাছ, সকলকে ছায়া দিবি, আশ্রয় দিবি।" ইত্যাদি।

আমরা দেখি—নরেন্দ্রকে রামকৃষ্ণ মানবমহিমার বিষয়ে অবহিত করছেন এই বলে: "মানুষ কি কম গা! এই মনুষ্য-শরীরেই চরম উপলব্ধি হয়।" নরেন্দ্রকে তিনি দান করেছেন অখণ্ড চৈতন্যের উপলব্ধি। নরেন্দ্র অনুভব করেছেন—মানুষে মানুষে ভেদবোধ হলো চূড়ান্ত কুসংস্কার। তারই ফলে তিনি হয়ে উঠেছেন সাম্যের মহান আচার্য।

এই উপলব্ধির উৎস প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন: "যেদিন থেকে রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেদিন থেকে সব ভেদ উঠে গেল—মেয়ে পুরুষে ভেদ, ধনী নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত ও অপণ্ডিতের ভেদ, ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদ, এবং হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান ভেদ—সব চলে গেল। এই সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার।"

আমরা দেখি, নরেন্দ্রনাথকে রামকৃষ্ণ সচেতন করেছেন নির্মম ক্ষুধাসত্য সম্বন্ধে। পিতার মৃত্যুর পরে যখন নিরন্ন নরেন্দ্রনাথ পথে পথে ঘুরছেন অন্নসংস্থানের সন্ধানে তখন রামকৃষ্ণ নিষ্ঠুর হয়ে বলেছিলেন—"নরেন্দ্র খেতে পাচ্ছে না—তা ভালোই হল। এবার ও অপরের পেটের জ্বালা কাকে বলে তা বুঝবে।" এরই ফলে পরবর্তীকালে সেবা-আন্দোলনের প্রবর্তক বিবেকানন্দকে ভারতবর্ষ পেয়েছে।

আমরা আরও দেখি—রামকৃষ্ণ একদিকে নরেন্দ্রনাথকে জ্বলন্ত ঈশ্বরসত্যের নিশ্চিত প্রত্যয় দান করেছেন, অন্যদিকে প্রশমিত করেছেন নরেন্দ্রনাথের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে। 'যত মত তত পথ'—এই তত্ত্ব ও আদর্শের বাহক হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ সারা বিশ্বে। বহু মত ও পথের দেশ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে পর্যন্ত একমাত্র রামকৃষ্ণের এই আদর্শই যে সংহতি আনতে সমর্থ—একথা সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন উদ্দীপ্ত আবেগে।

বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধের শিক্ষাও যে রামকৃষ্ণের কাছ থেকে পাওয়া—তাও জোরের সঙ্গে বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ "অতীত অবতারগণের সমষ্টিরূপ।" সেই রামকৃষ্ণ "ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন।" শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেছেন—"বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান।"

॥ দুই ॥

রামকৃষ্ণের বিবেকানন্দ-দর্শন

সংক্ষেপে বলা যায়, রামকৃষ্ণই বিবেকানন্দ-জীবনের প্রথম সূত্রকার—সেই সূত্র ধরেই পরবর্তী লেখকেরা অগ্রসর হয়েছেন বিবেকানন্দ-জীবনের ভাষ্য রচনায়।

একটি সূত্র: বিবেকানন্দ পৌরুষবীর্যময় যৌবনশক্তির বিগ্রহ।

"ও যেন খাপখোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে"—রামকৃষ্ণ বলেছেন। আর বিবেকানন্দ সগৌরবে তা স্বীকার করেছেন—"গুরুদেব আমাকে বলতেন—তুই বীর রে।" রামকৃষ্ণ আরও বলেছেন—"নরেন্দ্রের পুরুষসত্তা; কিছুর বশ নয়। ও কাউকে কেয়ার করে না।"

দ্বিতীয় সূত্র: বিবেকানন্দ বহু গুণান্বিত সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব।

"ওর খুব বড় আধার, অনেক জিনিস ধরে।" "অন্যরা কেউ দশদল, কেউ ষোড়শ দল, কেউ শতদল পদ্ম—নরেন্দ্র পদ্মমধ্যে সহস্রদল।"

তৃতীয় সূত্র: বিবেকানন্দ বার্তা-ঘোষক প্রচারক হবে।

"নরেন শিক্ষে দিবে—হাঁক দিবে।"

বিবেকানন্দের এই তিন রূপই ভারত ও বিশ্বের ইতিহাসে স্থাপিত। মহাঝঞ্ঝাময় সন্ন্যাসী তিনি, যৌবনের অধিরাজ। প্রতিভায় বহুকরোজ্জ্বল সূর্য। এবং লোকশিক্ষক প্রচারক আচার্য সন্ন্যাসী।

আরও একটি কথা রামকৃষ্ণ বলতেন—নরেন্দ্র নিরাকারের ঘর, অখণ্ডের ঘর। বলতেন, ওকে দেখলেই মন অখণ্ডে লীন হয়ে যায়। ওকে আপনার স্বরূপ জ্ঞান করি।

এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই পরম রহস্যগহন দর্শনের কথা। ব্যাপারটা আপাতত অলৌকিক, কিন্তু তারই মধ্যে রয়েছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব-সত্য।

সমাধির কালে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দেখেছিলেন—খণ্ড রাজ্যের পারে অখণ্ডলোকে সমাধিস্থ হয়ে আছেন সপ্ত ঋষির মধ্যে এক বিশেষ ঋষি, যিনি বিবেকানন্দ ছাড়া কেউ নন। সেই ঋষি জেগেছিলেন এক শিশুর স্পর্শে—যে-শিশু স্বয়ং রামকৃষ্ণ। সেই শিশুর টানে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ঋষি।

এর অর্থ, কবি-মনীষী মোহিতলাল মজুমদার গভীর ক'রে বলেছিলেন— প্রেম জাগিয়েছিল জ্ঞানকে, তাকে সচল সক্রিয় করেছিল। জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয়ই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনের শিক্ষা। জ্ঞানহীন প্রেম হারিয়ে যেতে পারে ভাবালুতায়, আবদ্ধ হয়ে যেতে পারে আত্মসৃষ্ট সংকীর্ণতায়। আর প্রেমহীন জ্ঞান পর্যবসিত হতে পারে শুষ্ক কাঠিন্যে, যা প্রায়শই নিষ্ঠুর ও বিধ্বংসী। অদ্বৈত ভাবভূমিতে অধিষ্ঠিত জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয়ই পরমাদর্শ। তখন "ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।"

এই সমন্বয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অভেদ।

॥ তিন ॥
বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ-দর্শন

বিবেকানন্দ কিন্তু লোকজগতে গুরু-শিষ্যের পার্থক্য জ্ঞাপন ক'রে গেছেন। তাঁর সেই অহং-হারা অপূর্ব কথাগুলি কি ভোলা সম্ভব?

"যদি কায়মনোবাক্য দ্বারা আমি কোনও সৎকার্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোনও কথা বহির্গত হইয়া থাকে যাহাতে জগতের কোনও ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোনও গৌরব নাই তাহা তাঁহার। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখনও অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কোনও ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার—তাঁহার নহে। যাহা কিছু দুর্বল, দোষযুক্ত, সকলই আমার। যাহা কিছু জীবনপ্রদ, বলপ্রদ, পবিত্র—সকলই তাঁহার শক্তির খেলা, তাঁহারই বাণী, এবং তিনি স্বয়ং।"

স্মরণ করব—রামকৃষ্ণের আরাত্রিক স্তোত্র এবং প্রণামমন্ত্র বিবেকানন্দেরই রচনা। 'নমো নমো প্রভু।' মনে পড়বে শ্রীমা সারদাদেবীর অধ্যাত্মভাবময় দর্শনটির কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের বেশ কিছুদিন পরেও শ্রীমা সারদার তীব্র বিরহযন্ত্রণার উপশম ঘটেনি। মনের জ্বালা জুড়োবার জন্য নৈসর্গিক জ্বালাময় পঞ্চতপার ব্রতানুষ্ঠান করেছিলেন। তার পরবর্তী ঘটনার বিবরণ স্বামী গম্ভীরানন্দের রচনা থেকে সংকলন করা যাক:

"পঞ্চতপার ফলে প্রাণের জ্বালা মিটিলেও [নিজের] শরীর-ধারণের প্রয়োজন তাঁহার নিকট তখনও চূড়ান্তরূপে প্রতিভাত হয় নাই। আর এক অভিনব দর্শনের ফলে উহারও বিলম্ব হইল না। সেদিন পূর্ণিমা তিথি। বিস্তৃত জাহ্নবীবক্ষে জ্যোৎস্নারাশি মৃদুপবনে গলিত রজতের ন্যায় নাচিয়া বেড়াইতেছে। শ্রীমা উদ্যানবাটী হইতে গঙ্গায় অবতরণ করিবার সোপানে উপবিষ্ট হইয়া মুগ্ধনেত্রে সুরধুনীর অপূর্ব শোভা দর্শন করিতেছেন—মনে অন্য কোনও চিন্তা নাই। অকস্মাৎ দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পিছন হইতে আসিয়া দ্রুতপদে গঙ্গায় নামিয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে চিন্ময় দেহ যুগযুগান্তারাধিতা ভাগীরথীর পাপহারী পবিত্র নীরে মিশিয়া গেল। তদ্দর্শনে শ্রীমায়ের সমস্ত অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, এমন সময় কোথা হইতে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিতে বলিতে দুই হস্তে সেই ব্রহ্মবারি লইয়া চারিদিকে অগণিত নরনারীর মস্তকে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। শ্রীমা চাহিয়া দেখিলেন, অসীম জনসংঘ সেই জলস্পর্শে পাপমুক্তি লাভ করিতেছে।"

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আবির্ভাবের ব্যঞ্জনাময় ভাবচিত্র এখানে অনবদ্যভাবে উন্মোচিত। তবু গুরুই ঈশ্বর, আর শিষ্য তাঁর বার্তাবহ। বিবেকানন্দ সেকথা শতমুখে প্রচার করেছেন। নতনম্র কণ্ঠে বলেছেন:

"দাস তব জনমে দয়ানিধে।"
"বাজে তথা অনাহত ধ্বনি—তব বাণী,
শুনি সসম্ভ্রমে, দাস তব প্রস্তুত সতত
সাধিতে তোমার কাজ।"
"দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।"

॥ চার ॥

দ্বৈতের অদ্বৈতলীলা

কিন্তু একই ধরনের কথার সঙ্গে অন্য কথাও যে মিশিয়ে দিয়েছেন!—

"প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।"

আরও অগ্রসর হয়েছেন একই কবিতায়:

"আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ-রচনা
জড়-জীব আদি যত,
আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া সনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।"

দ্বৈত অদ্বৈতের যুগ্ম
গুরু ও শিষ্য—'যেই সূর্য, সেই কিরণ।'

সহজ কাহিনীতে চলে আসা যায় শেষকালে। নরেন্দ্র-কর্তৃক কালীদর্শনের পরদিন সকালের ঘটনা। নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরবেন—

"ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গা ঘেঁষিয়া এক প্রকার তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, (আপনার শরীর ও নরেন্দ্রের শরীর পরপর দেখাইয়া)—'দেখছি কি—এটা আমি, আবার এটাও আমি, সত্য বলছি—কিছুই তফাত বুঝতে পারছি না! যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে—সত্য সত্য কিন্তু ভাগ নেই, একটাই রয়েছে! বুঝতে পারছ? তা মা ছাড়া আর কি আছে বল—কেমন?' ঐরূপে নানা কথা কহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তামাক খাব।' 'আমি [নরেন্দ্র] ত্রস্ত হইয়া তামাক সাজিয়া তাঁহার হুঁকাটি তাঁহাকে দিলাম। দুই-এক টান

দিয়াই তিনি হুঁকাটি ফিরাইয়া দিয়া 'কল্কেতে খাব' বলিয়া কল্কেটি হাতে লইয়া টানিতে লাগিলেন।' দুই-চারি টান টানিয়া উহা নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন, 'খা, আমার হাতেই খা।' নরেন্দ্র ঐ কথায় বিষম সংকুচিত হওয়ায় বলিলেন, 'তোর তো ভারি হীনবুদ্ধি, তুই আমি কি আলাহিদা? এটাও আমি, ওটাও আমি।' ঐ কথা বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে তামাক খাওয়াইয়া দিবার জন্য পুনরায় নিজ হাত দুখানি তাঁহার মুখের সম্মুখে ধরিলেন। অগত্যা নরেন্দ্র ঠাকুরের হাতে মুখ লাগাইয়া দুই-তিন বার তামাক টানিয়া নিরস্ত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে নিরস্ত দেখিয়া স্বয়ং পুনরায় তামাক সেবন করিতে উদ্যত হইলেন। নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মহাশয়, হাতটা ধুইয়া তামাক খান।' কিন্তু সেকথা শুনে কে? 'দূর শালা, তোর তো ভারি ভেদবুদ্ধি!' এই কথা বলিয়া ঠাকুর উচ্ছিষ্ট হস্তেই তামাক টানিতে ও ভাবাবেশে নানা কথা বলিতে লাগিলেন।"

স্বামী সারদানন্দ এখানে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন। অধ্যাত্মজগতের সমুচ্চ স্তরে সংঘটিত এই ঘটনা সম্বন্ধে বাগ্‌বাহুল্যের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উদ্যত—'স্তব্ধ করো মুখর ভাষণ!'

('মাতৃশক্তি' পত্রিকায় সন ১৪০৯ 'শারদ সম্ভার'-এ প্রকাশিত)

বিবেকানন্দের তিনটি ফটো

॥ এক ॥

বিবেকানন্দ কেবল পুরুষশ্রেষ্ঠ নন, সুপুরুষেরও শ্রেষ্ঠ। এ-যুগে ভারতের অগ্রগণ্যদের মধ্যে সুপুরুষের অভাব ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের কথা মনে আসে। তবু বিবেকানন্দের মূর্তিতে একটা বিশেষত্ব আছে।

মানব-ঐশ্বর্যের একটা বড় ঐশ্বর্য দেহরূপ। কেবল বৈষ্ণব নয়, সব মানুষই প্রথমে রূপ দেখে ভোলে। যাঁরা নরোত্তম, তাঁরা যখন দেবোত্তম হয়ে দাঁড়ান, তখন তাঁদের অর্চনার একটা ধারা বয়ে যায় ঐ রূপসাগরের দিকে। কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে ঘিরে ভারতের শিল্পচেতনার পরিস্ফূর্তি। 'নীরদ নয়ন' শ্রীচৈতন্যের রূপের বন্দনা করেছেন বৈষ্ণবকবি অপরূপ ভাষায়।

বিবেকানন্দের রূপের বিস্তারিত বর্ণনায় আসা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমরা তাঁকে দেখিনি। তাঁকে দেখেছেন এমন লোকও বিরল হয়ে আসছে। একজনকে বলতে শুনেছি, "আর কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে দুটি আশ্চর্য কমল চোখ।" অন্য একজন বললেন, "বক্তৃতা করছিলেন, পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো পায়চারি ক'রে ফিরছিলেন প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত, মেঘধ্বনির মতো গম্ভীর অথচ সঙ্গীতময় কণ্ঠ গুরুগুরু ক'রে উঠছিল।" তাছাড়া দেশ-বিদেশের প্রত্যক্ষদর্শীদের এ-বিষয়ে এত বর্ণনা আছে যে সেসব উদ্ধৃত করলে বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা ভরে যাবে।

আমার বক্তব্য অন্যতর। বিবেকানন্দের খুব বেশি না হলেও কতকগুলি ফটো আছে। তার মধ্যে তিনটি সর্বাধিক পরিচিত। পরিব্রাজক, হিন্দু সন্ন্যাসী এবং ধ্যানস্থ—এই ত্রিমূর্তিতে বিবেকানন্দকে আমরা পথে-ঘাটে-ঘরে সর্বত্র দেখে থাকি। আরো নানা উৎকৃষ্ট ছবি তাঁর আছে, আরো সুদৃশ্য, তবু ঐ তিনটি ছবিই জনচিত্তে প্রাধান্য পেয়েছে।

জনতার বিচারবুদ্ধির উপর আমরা আস্থা রাখিনা—বিবেকানন্দের বিপুল প্রত্যাশা ছিল কিন্তু তাদেরই উপর। তারাও ভালবেসে শ্রদ্ধা ক'রে তাঁর যে-তিনটি ছবিকে নির্বাচন করেছে, তার মধ্যে বিবেকানন্দের চরিত্র সম্বন্ধে তাদের বিচার ও সিদ্ধান্তের ঘোষণা আছে। সে সিদ্ধান্ত অত্যাশ্চর্য রূপে সত্য। বিবেকানন্দ-জীবনের সংক্ষিপ্ততম টীকা তাঁর ঐ চিত্র তিনটি।

হুবহু প্রতিকৃতি, বিশেষ ক'রে ফটোগ্রাফ, এতই স্পষ্ট যে, তার মধ্যে আমরা সাধারণত কোনো ব্যঞ্জনা অনুভব করিনা। সেই কারণে বড় আর্টিস্ট যখন প্রতিকৃতি আঁকেন, তখন তার মধ্যে তিনি অতিরিক্ত কিছু যোগ ক'রে দেন। তাঁদের আঁকা প্রতিকৃতি সত্যকার শিল্পচিত্র হয়ে ওঠে। ফটো সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। ক্যামেরার চোখ মিথ্যে দেখেনা, কিন্তু সত্য দেখে

কি? অন্তত সর্বাঙ্গীণ সত্য? পরমাশ্চর্য, বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে জড় ক্যামেরা সত্য দর্শন করেছে। বিবেকানন্দের ফটো প্রতীকচিত্র হয়ে উঠেছে।

প্রতীকচিত্র আমরা তাকেই বলব, যখন ছবি নিছক মানুষটিকে নয়, ব্যক্তির দৃষ্ট রূপের অতিরিক্ত একটা ভাবকে ফুটিয়ে তোলে। ব্যক্তিগত মানুষটি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা সংস্কার যা-কিছু আছে, সবকিছু ছাপিয়ে প্রতীকচিত্র নিখিল মানুষের চিরন্তন হৃদয়াবেগের কাছে আবেদন জানায়। খুব পরিচিত মানুষের ছবি থেকে সাধারণভাবে এই নৈর্ব্যক্তিক ভাব জাগানো কঠিন হয়। শিল্পীর মডেল তাই অজ্ঞাত কুলশীল। সে একটা মানুষ মাত্র। বিবেকানন্দের মতো পরিচিত মানুষ ভারতে কম আছেন। তত্রাচ তাঁর ছবি জনচিত্তে একটা বিশেষ ভাব উদ্দীপিত করে। এইখানেও তাঁর সম্বন্ধে জনতার রায়: বিবেকানন্দ যতখানি বাস্তব জীবন, ততখানি আইডিয়া।

এইবার উপরের বক্তব্য দুটিকে যুক্তিযুক্ত ক'রে তুলতে হবে। —ছবি তিনটি কেন দেহরূপ এবং সমভাবে ব্যক্তি-পরিচ্ছিন্ন ভাবপ্রতীক?

॥ দুই ॥

পরিব্রাজক চিত্র। বিবেকানন্দের প্রথম যথার্থ প্রকাশ পরিব্রাজকরূপে। বিলে নয়, নরেন নয়, নরেন্দ্র নয়—বিবেকানন্দ। ঐ নামটিও পরিব্রাজক অবস্থায় নেওয়া। তার পূর্বে—

> "এখনো বিহার কল্পজগতে
> অরণ্য রাজধানী,
> এখনো কেবল নীরব ভাবনা
> কর্মবিহীন বিজন সাধনা
> বসে বসে শুধু আনমনে শোনা
> আপন মর্মবাণী।"

বিবেকানন্দ যখন পথে বেরিয়ে পড়লেন আপন মানসগুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে, তখন তিনি স্রষ্টার হাতের শেষ ছোঁয়াটুকু পেয়েছেন। বিবেকানন্দ পরিব্রাজক হবেন না? যে অসীম অনন্ত মহাসাগরের তল থেকে বিবেকানন্দ-মহাদেশের জন্ম এবং তার যে কারণ সেই মহাকারণই তাঁকে ঐ সমুদ্র-গভীরের অপার শান্তি ও স্তব্ধতা থেকে বঞ্চিত করেছে। ধারণ করতে হবে, বহন করতে হবে, তাই তো বেদনাক্ষুব্ধ বারিধি থেকে হিমালয়শীর্ষ ভারতের উর্ধ্বাঙ্গের সমুন্নতি; রামকৃষ্ণ-সাগর থেকে বিবেকানন্দের উন্নয়ন। পৃথিবীতে দুঃখ আছে, কান্না আছে, আছে নিষ্ঠুর শাসন ও নিঃসীম অত্যাচার। বিবেকানন্দ তা তথ্য হিসাবে জানেন, কিন্তু পথে নেমে, জনতার জন হয়ে, তা বুকে বিঁধে উপলব্ধি করতে হবে। বিবেকানন্দ তাই ভারতের পথে। আর এই উপলব্ধি যেন খণ্ডিত না হয় আসক্তি ও অভিমানে, বিকারে বা বাসনায়—ভারতসত্তার পূর্ণরূপ তাঁকে সন্ন্যাসের সত্যদর্শনের আলোকে গ্রহণ করতে হবে—বিবেকানন্দ তাই পর্যটক নন, তিনি পরিব্রাজক।

আরো এক কারণে প্রথম পরিস্ফুট বিবেকানন্দকে পরিব্রাজক-রূপেই পাই। নরেন্দ্রের বড় ইচ্ছা ছিল সমাধি-সমুদ্রে ডুবে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সবলে তাঁকে ব্যক্তিমুক্তির গহন থেকে ছিন্ন ক'রে আনলেন। বিশ্বের মধ্যে বিশ্বরূপ দেখতে হবে বিবেকানন্দকে, শুধু আপনার মধ্যে নয়। পরিব্রাজক-রূপে সেই নবসাধনার সূত্রপাত। কর্মসমুদ্রের তরঙ্গচূড়ায় দাঁড়িয়ে পরবর্তীকালে একদিন স্বামীজী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন— "সেই কৌপীন, মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন, ভিক্ষান্ন ভোজন, হায় ইহারাই এখন আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়"—কর্মযোগীর কঠোর বৈরাগ্যের জীবন এই কালেরই। আবার তীর্থে তীর্থে ঐ বৈদান্তিক তাঁর ক্ষুধার্ত নারায়ণকে যখন দেখছেন—সেই পরম প্রেমিকও প্রকাশিত হয়েছেন এখনই। বিবেকানন্দের এই দুই রূপই সত্য; এবং পরিব্রাজক অবস্থায় সবচেয়ে সার্থকভাবে উভয়ে মিলিত হয়েছে; তার পরে বা পূর্বে নয়। হয়ত কখনো কর্মী বড়, কখনো-বা ধ্যানী।

কেবল ঐ দুই রূপই নয়, আরো একটি প্রকাশ—সেই চিরসংগ্রামীর রূপ—সেও এসেছে এই লগ্নে। ভারতের গ্রামে-তীর্থে-নগরে জ্বলদ্-মনীষা বিবেকানন্দের জয়ধ্বজা উড়েছে। নরেন্দ্র জয় করে, বিবেকানন্দ করেন উপলব্ধি। তাই বলি, পরিব্রাজক হলো বিবেকানন্দের প্রথম সম্পূর্ণায়ব মূর্তি, হয়ত শেষও।

এইবার দেখতে বলি সেই রূপ—দাঁড়িয়ে আছেন এক সন্ন্যাসী, পদপল্লব থেকে মুণ্ডিত মস্তক অবধি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেহ, করোদ্ধৃত চিরসঙ্গী যষ্টি, ঈষৎ পার্শ্বীকৃত উন্নত মুখ, উদার আঁখি সুদূর দিগন্তে বিলগ্ন—এ রূপ কি শুধুই বিবেকানন্দের?

> "তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
> চলেছে মানব-যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
> ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
> অন্তর-প্রদীপখানি।"

বিবেকানন্দ কি সেই লক্ষ্যে, সেই পথে এসে দাঁড়ান নি? বিবেকানন্দ কি বিলীন হয়ে যাচ্ছেন না 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা'র 'যুগযুগ ধাবিত যাত্রী'-দলের মধ্যে? ঐ পদধ্বনি, ঐ ভ্রমণ-যষ্টির মৃদুস্থির আঘাত কি অনাদিকালের বিচিত্র পথচলার ঐকতানে মিলিত হচ্ছে না?

ঐ পরিব্রাজক মূর্তি চিরন্তন যাত্রীর!

স্মরণে আনবার চেষ্টা করছি পথ-চলার শ্রেষ্ঠ ছবি আর কি আছে আমাদের। বাস্তব ও কাল্পনিক।

বুদ্ধের কথা মনে আসে, মনে আসে শঙ্কর এবং চৈতন্যের কথা। তাঁদের ভারত-পরিক্রমণের সঙ্গে বিবেকানন্দের ভারত-পর্যটনের প্রভেদ আছে। বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্য আগে সিদ্ধ হয়েছেন, এবং সেই সিদ্ধির দুর্লভ সত্য জনে-জনে বিতরণ করতে ভারতের পথে-পথে ফিরেছেন। বুদ্ধ তাই পথ চলেন যখন, পরম বরাভয় ও করুণার মুদ্রায় দক্ষিণ-করতালু পৃথিবীর পানে উত্তোলিত উন্মুক্ত থাকে। শঙ্করের চিত্রের কথা মনে করতে পারছি না, কল্পনা করতে পারি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার দুঃসহ দীপ্তিকে, সে যেন জ্বলন্ত জ্যোতিষ্কের মর্ত্যবেষ্টন। আর দুই বাহুর আন্দোলিত আকুলতা ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত ক'রে সংবিৎ-হারা হয়ে ছুটে চলেন যিনি, তিনিই প্রেম-দেহ শ্রীচৈতন্য!

এঁরা নন, বিবেকানন্দই যথার্থ পরিব্রাজক, কারণ এ তাঁর সাধনার ক্ষণ। গুরুর নিকটে আত্মসিদ্ধি যদি-বা হয়ে থাকে, ভারত-সিদ্ধি অথবা বিশ্ব-সিদ্ধি তখনো তাঁর হয়নি। বিবেকানন্দ যে পরবর্তী জীবনে বলেছিলেন, আমি অশরীরী বাণী (I am a voice without a form)—সে কথা তিনি বলতে পারতেন না, যদি ঐ বাণীর শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ না করতেন সমগ্র ভারতদেহে। এর জন্য তাঁকে সন্ধান করতে হয়েছে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, বঙ্গ থেকে গুজরাট। এই পরিক্রমার পথেই দেখা যায়—রাজা যাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে আছে, তাঁকেই আবার পাঠগ্রহণ করতে হয়েছে নর্তকীর নিকটে।

পরিব্রাজকের একেবারে নিকট কালের ছবি মেলে কি? প্রথমেই যেটির কথা মনে আসে সেও আর্টিস্টের কল্পনার ধন—নন্দলালের আঁকা গান্ধীজীর ডাণ্ডী-অভিযান চিত্র—'হাম যব যাত্রা শুরু করেঙ্গে, তব তামাম হিন্দুস্থান উথল যায়েঙ্গে'—আত্মবিশ্বাসের অয়স্কঠিন মূর্তি—প্রতিটি পদক্ষেপ পড়ে আর ভারত উথলে উথলে ওঠে—সে-ছবি নন্দলালের; সেই কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত, যষ্টিসম্বল, ঈষৎ নত, দুর্গমপথযাত্রীর অভ্রান্ত চিত্র। এ-ছবি যত অপূর্ব হোক, যথাযথ পরিব্রাজকের নয়। দুঃসাধ্য এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে লাভ করবার যে সুকঠোর দৃঢ়তা ফুটেছে প্রত্যেকটি দেহসন্ধি এবং মাংসপেশীতে—সে দৃঢ়তা এবং তপস্যার কাঠিন্য পরিব্রাজকেরও আছে—সেই সঙ্গে আরও আছে—মুক্ত আকাশতলে আত্মবিকিরণের উদার প্রসন্নতা। পরিব্রাজক পথ চলবেন, ভূমিতলে আসন পাতবেন, ডুবে যাবেন নিশীথিনীর গভীর গম্ভীরে, উত্থিত হবেন অরুণোদয়ের সঙ্গে. চলতে চলতে ঘনপ্রসন্ন কণ্ঠে আবার ডাক দেবেন গৃহস্থ-প্রাঙ্গণে—ভবতি ভিক্ষাং দেহি। বিবেকানন্দের মূর্তিতে সেই প্রকাশ।

আরও একটি ছবি, সে এখনও শিল্পীর তুলিতে ধরা পড়েনি—সমর্থ প্রতিভার প্রতীক্ষায় রয়েছে এক শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রীর ভাবরূপ। "দূরে বহুদূরে ঐ নদী ছাড়াইয়া. ঐ পাহাড় পর্বত অরণ্য ছাড়াইয়া, ঐ আমাদের দেশ"—সে যেন এক অশরীরী কণ্ঠ বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনির অনুরণনের মতো মনপ্রাণ উচ্চকিত করেছিল একদা—আমার দেশ আছে দূরে, অনেক দূরে—অতএব পথিক চলো। এ আমার মাটির দেশ, এ আমার স্বপ্নের দেশ, কত দিবসরাত্রির দ্বার অতিক্রম ক'রে ঐ আনন্দলোকের সিংহদুয়ারে উত্তীর্ণ হতে হবে—"ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা"—যিনি ডাকছেন তাঁর দূরাগত কণ্ঠই শুনেছি, দর্শন করিনি তাঁকে, নেতাজীর সেই যাত্রার সঙ্গে চিরযাত্রীর মূর্তি কি সংযুক্ত করতে পারি না?

॥ তিন ॥

স্বামীজীর দ্বিতীয় চিত্র—আমেরিকায় হিন্দু সন্ন্যাসীর; মোহিতলাল যে বিবেকানন্দের কথায় বলেছেন—"পুরুষসিংহ, জগতের মহত্তম মহাকাব্যের নায়ক হইবার উপযুক্ত, তাঁহার চক্ষে জ্বলদর্চি, কণ্ঠে পাঞ্চজন্য"—স্বামীজী-চরিত্রের সেই দ্বিতীয় প্রকাশও এইরূপে। বিপ্লবী সন্ন্যাসী পূর্ণপ্রভায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমেরিকার মানুষ সে অসহ্য রূপ দেখে সবিস্ময়ে বলেছে—সাইক্লোনিক হিন্দু-মঙ্ক। ভারতের মানুষ বলে, "মূর্তমহেশ্বরমুজ্জ্বলভাস্কর"। এইরূপেই বিবেকানন্দ সর্বাধিক মনোহরণ করেছেন। পাশ্চাত্য-বিজয় এবং প্রাচ্য-প্রতিষ্ঠা এর

দ্বারাই ঘটেছে। পরিব্রাজক মূর্তির পরে কোন্ দৈববলে এই বিজয়ী রাজবেশ, তা আমাদের ধারণার অতীত, অথচ বিবেকানন্দের কথা চিন্তা করতে গেলে মাঝের আর কোনও চেহারার কথা মনে আসে না।

বিবেকানন্দ জীবননাট্যের ক্লাইম্যাক্সও এইখানে। পরিব্রাজক বিবেকানন্দকে প্রথম এবং শেষ সম্পূর্ণায়ব প্রকাশ বলেছি। পরিব্রাজক জীবনের অন্তে সন্ন্যাসী দেখা দিলেন সংগ্রামীরূপে। সংগ্রামীরূপের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঐ বৈশাখী ঝঞ্ঝার মূর্তিতে। কর্মী নেতা যোদ্ধা বিবেকানন্দ সহস্র শিখায় জ্বলে উঠেছেন এখানে। আগ্নেয় পর্বত যেন সচল হয়ে পৃথিবী পর্যটন করেছে। অতঃপর স্বাভাবিক ভাবেই আসবে শান্তভাব, জীবনের সত্য লক্ষ্য সম্বন্ধে নবভাবনা—তাই সংগ্রামী হতে সন্ন্যাসীতে প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ ঝটিকা-উত্তর শান্ত স্তব্ধ সমুদ্র। ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পরেও যে বিবেকানন্দ 'কলম্বো থেকে আলমোড়া' গর্জন ক'রে ফিরেছেন, সে অভ্যাসবশে—আরো সঠিকভাবে—নিছক প্রয়োজনবশে। বাহ্যত উন্মাদনার স্পন্দন বজায় থাকলেও অন্তরে "বিপুল বিরতির" সন্ধ্যাসঙ্গীত শুরু হয়ে গিয়েছে।

এইবার চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করতে বলি। অপরূপ! অপরূপ!—সেই বীরমূর্তি! পরিব্রাজকের সমতুল মিলবে, ধ্যানী বিবেকানন্দের সমতুল মিলবে, মিলবে না ঝঞ্ঝারূপী বিবেকানন্দের। স্পর্ধা ঘোষণা ক'রে বলা চলে—এ চিত্র দ্বিতীয়রহিত। ঐ বীরমূর্তি কোথায় এ দেশে? ঐ সমুন্নত উষ্ণীষ, দীপ্তায়ত নয়ন, সুদৃঢ় চিবুক, বিশাল আনন, ঐ বিস্তৃত বক্ষ—বক্ষোপরি স্থাপিত যুগল বাহু—অমেয় দর্প ও মহিমায় এ কি তুঙ্গ মূর্তি! ভারতে বীরের অভাব ঘটেছে ইদানীংকালে, বীরমূর্তির ততোধিক। বিবেকানন্দের একটি চিত্র শূন্যস্থানের অনেকখানি পূরণ করেছে। বিশাল হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে পিষ্ট ক'রে দুই বাহুর বেষ্টনী, মুখ ঈষৎ সাচীকৃত, পদ্মনয়ন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, অধরোষ্ঠ সন্নদ্ধ অথচ মেঘমন্দ্রিত হতে উন্মুখ—

"Sinners? It is a sin to call a man so; it is a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep."

"মহা spiritual tidal wave আসছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

॥ চার ॥

ঐ মহাক্ষত্র-বিবেকানন্দ-চিত্র যে-বীর্যের প্রতীক-চিত্র, তা আর না-বললেও চলবে। আমাদের আলোচ্য বিবেকানন্দের তৃতীয় এবং সর্বশেষ চিত্র হলো ধ্যানমূর্তি।

ভারতে বুদ্ধের ধ্যানমূর্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ; এবং তাঁর পরেই সম্ভবত বিবেকানন্দের। দেবতা শিবকে বাদ দিলে ভারতের শিল্প-চৈতন্যকে সর্বাধিক উদ্বুদ্ধ করেছেন দুটি মানুষ—কৃষ্ণ ও বুদ্ধ। একটি আকর্ষণ করেছে রসচেতনার পথে, অন্যটি ধ্যানগভীরতায়। ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিতে ঐ দুই রূপই সত্য। কদম্বতলে এবং বোধিদ্রুমতলে দুই পুরুষশেখর আমাদের আনন্দিত ক'রে বিরাজ করছেন যুগ হতে যুগান্তরে।

ভারতীয় শিল্পদৃষ্টি যে, ধ্যানদেহকে গৌতমদেহে আবিষ্কার করবে—সে-কিছু আশ্চর্য নয়। ভারতে বোধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষের অভাব কোনদিন ঘটেনি, কিন্তু বুদ্ধ একজনই। অর্থাৎ বুদ্ধ আর কিছু নন, কোনো মানবীয় সত্তা নন, তিনি বোধিদেহ। বুদ্ধের বোধি—ধ্যানে, সেই ধ্যান তনুধারণ ক'রে বুদ্ধ হয়েছে। সন্দেহ হয় বুদ্ধ রক্তমাংসের কোনও মানুষ কিনা! কিন্তু পতিত মানুষের জন্য তাঁর অমেয় করুণা—মৈত্রীর বাণী-শতদল নিয়ে ভারত-পরিক্রমণ? জানি—সবই মানি। কিন্তু সে করুণা কি অপার্থিব নয়? ঐ যে মানুষটি ভারতের পথে-পথে পরিভ্রমণ করছেন, তাঁর চরণ কি মৃত্তিকা স্পর্শ করেছে? বুদ্ধের যেন ধ্যানসঞ্চরণ—তাঁর যে উপদেশ, সে ঐ ধ্যানলোক থেকেই আসছে; নইলে কিভাবে সমাজবাস্তবকে অস্বীকার ক'রে তিনি সর্বমানুষের জন্য বাসনাত্যাগের পরমা নিবৃত্তির নির্দেশ দিলেন?

তাই বুদ্ধ ধ্যানদেহে সর্বোত্তম!

তারপরেই বিবেকানন্দ— কেন?

অপরূপ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন তাঁর এক সমাধি দর্শন। রূপলোকের পারে অরূপলোকে যে সপ্তঋষি সমাধিস্থ, এক জ্যোতির্দেহ শিশু তাঁদের একজনের ধ্যান ভাঙিয়ে তাঁকে মর্ত্যভূমিতে আকর্ষণ ক'রে এনেছেন।

রামকৃষ্ণ সেই শিশু, বিবেকানন্দ সেই ঋষি!

শিশু, ঋষির ধ্যান ভাঙিয়েছে—ধ্যানোত্থিত বিবেকানন্দ—কর্মী ভক্ত সংগ্রামী প্রেমী।

ঋষি আবার সমাধিতে হারিয়ে যাবেন, গিয়েছেন অচিরকালে। ঐ তাঁর সত্যরূপ: মৌনগম্ভীর পরমহংস শ্রীমৎ বিবেকানন্দ!

বুদ্ধের এবং বিবেকানন্দের ধ্যানমূর্তি পাশাপাশি রাখতে ইচ্ছা হয়। সদ্য বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধের সে কি কৃশকঠিন স্তব্ধতা—ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সার বাহুল্যহীন আধার। অপরদিকে বিবেকানন্দের বিশাল গম্ভীর মূর্তি, হিমগিরির মৌনমহিমা। এমন কেন হয়? বুদ্ধের যে নির্বাণ, দুঃখহীন সর্বশূন্যতায় নিঃশেষ বিলয়! বিবেকানন্দের নির্বিকল্প সমাধি—চিরানন্দ অমৃত-স্বরূপে আত্মবিসর্জন। প্রাপ্তির চরম লোকে হয়ত উপলব্ধির পার্থক্য নেই, কিন্তু মর্ত্যসাধনায় সাধন-পথের ভিন্নতা থাকে। তপস্যার সেই বিশেষ রূপই আমরা সাধকের ভাবরূপে আরোপ করি। যেমন, বুদ্ধ-বিবেকানন্দের ধ্যান, তেমনই চৈতন্য-রামকৃষ্ণের দিব্যোন্মাদ।

নিবাত নিষ্কম্প আত্মস্তব্ধ বিবেকানন্দ, ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। তুষারশিখরের মতো তাঁর উষ্ণীষ। শৃঙ্গচ্যুত স্রোতস্বিনীর মতো স্কন্ধ ও বক্ষোবিলগ্ন উষ্ণীষপ্রান্ত, বিশাল বিস্তৃত প্রান্তরতুল্য দেহাবয়ব। ঐ বিস্তারকে আকার দান করেছে দুই বাহুতট। বাহুপ্রান্তে শিথিল মুক্ত করতলের পদ্ম প্রসন্নতা। উপরে অন্তর্মুখী নয়নের শান্ত সংহরণ। এ মূর্তি ধ্যানী বিবেকানন্দের, না ধ্যানী ভারতের? অনাগত যুগের শিল্পী—বিবেকানন্দের ধ্যানদেহের প্রত্যেকটি রেখা অনিবার্য ভাবে একই বিন্দুতে কেমন ক'রে মিলিত হয়েছে, কেবল সেই আশ্চর্য সামঞ্জস্যই দেখবেন না—বিবেকানন্দের ধ্যানরূপে ভারতরূপকেও আবিষ্কার করবেন।

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।' কিন্তু বিবেকানন্দের জীবনকাব্য—সে তো কোনো রোমান্টিক কবির রচনা নয় যে 'অন্য

কোথা, অন্য কোনোখানে'-র কোনো একস্থানে সে তার স্থান খুঁজে পাবে। না, ঝঞ্ঝারূপী বিবেকানন্দ ফিরে আসবেন আপন চিরনৈঃশব্দ্যের আসন'পরে। তাঁর সেই 'নিজ নিকেতনে' প্রত্যাবর্তনের ছায়া-ইতিহাস তাঁর পত্র-মুখে শুনতে ইচ্ছা করে:

২৪শে জানুয়ারি, ১৮৯৫। "প্রাণ ঢেলে খেটেছি।...বক্তৃতা ও অধ্যাপনাতে বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে। একটি লেখবার খাতা আমার আছে। এটি আমার সঙ্গে পৃথিবীময় ঘুরছে। দেখছি সাত বৎসর পূর্বে লেখা রয়েছে—'এবার একটি একান্ত স্থান খুঁজে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে থাকতে হবে।' কিন্তু তাহলে কি হয়, এইসব কর্মভোগ বাকি ছিল।"

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫। "হৃদয়, শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও! ...জীবন কিছুই নয়, মৃত্যু ভ্রম মাত্র। এইসব যাহা কিছু দেখিতেছ সে সকলের অস্তিত্ব নাই, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন। হৃদয় ভয় পাইও না, নিঃসঙ্গ হও। ভগিনি, পথ দীর্ঘ এবং সময় অল্প, আবার সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিতেছে, আমায় শীঘ্র গৃহে ফিরিতে হইবে।"

নিশীথ রাত্রির স্তব্ধ আসনে নীলাকাশ! 'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্।' অমাব্যাপ্ত আকাশ, আকাশব্যাপ্ত তপস্যা। বিবেকানন্দ তপোমগ্ন! এই বিবেকানন্দই কি একদা বৈশাখের মেঘ হতে চেয়েছেন— হয়েছেন কি ঝঞ্ঝা বজ্র বিদ্যুৎ? কবি, তোমার বীণা থামাও। নন্দী, তোমার প্রহরা সরাও। ঘুমাও ঘুমাও তরু লতা পশু পাখী। অনির্বাণ সত্য শুধু জাগো। পরিনির্বাণের পূর্বে বিবেকানন্দের শেষ প্রার্থনা—

"ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলে মায়ামুক্ত হোক, ইহাই আমার চির প্রার্থনা।"

[উদ্বোধন পত্রিকাব ১৩৬৩ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত]

বেলুড়মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির

॥ এক ॥

ঠিক যেন গঙ্গাগর্ভে সমাধিতে তিনি লীন হয়ে আছেন। অনন্ত অপার্থিব শান্তি আর মৌন তাঁকে ঘিরে। এই তিনি চেয়েছিলেন—

"উপরে সূর্য তাঁর নির্মল কিরণ বিস্তার করছেন, পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্পদশালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, দিনের উত্তাপে সব প্রাণী ও পদার্থ কত নিস্তব্ধ, স্থির, শান্ত। আর আমিও...প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর সুশীতল বক্ষে ভেসে চলেছি! যাই, মা, যাই! তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ ক'রে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে...কেবল দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নেই।"

বেলুড়মঠের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে একেবারে গঙ্গাতটে, বিবেকানন্দ-মন্দিরের সংকীর্ণ প্রবেশপথ দিয়ে প্রবেশ ক'রে, যখনই স্বামীজীর ধ্যানমূর্তির সামনে নত হয়েছি তখনই ভিতর থেকে ভেসে-আসা সূক্ষ্ম সৌগন্ধ্যে, আর বিচিত্র অপূর্ব এক প্রভাবে, মন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কী নিবিড়! কী গভীর! মনে হয়েছে, উপরের ঐ বর্ণনাটি স্মরণ করেই যেন মন্দিরটি নির্মিত! নচেৎ গর্ভমন্দির এত নীচু কেন? কেন স্বামীজীর রিলিফ-মূর্তিটি প্রায় গঙ্গাপ্রবাহের সমস্তরে স্থাপিত? তা কি এইজন্য যে, গঙ্গার ঢালু পাড়ে, সেখানে স্বামীজীকে দাহ করা হয়, তারই ওপরে তৈরি-করা বেদীতে স্থাপন করতে হয়েছে রিলিফটিকে—এবং তারপর ক্রমে নদীর পাড় উঁচু করা হয়েছে বলে মনে হয়, মূর্তিটি যেন গঙ্গার অন্তঃপ্রবাহিত তরঙ্গের উপরে ভাসমান!! কি জানি!

বিবেকানন্দ-মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু হয় কবে? আরম্ভের দিনটি ঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারলেও, প্রবুদ্ধ ভারতের পুরোনো সংখ্যার পৃষ্ঠা উল্টে মোটামুটি বলতে পারি সে কাজ শুরু হয়েছিল ১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসের পর। প্রবুদ্ধ ভারতে ১৯০৩-১৯০৭ পর্যন্ত সময়ে স্বামীজীর জন্মোৎসবের যেসব বিবরণ বেরিয়েছে তাতে স্বামীজীর সমাধিমন্দিরের কোনও উল্লেখ নেই। তা প্রথম পাওয়া যায় ১৯০৯ সালের জন্মোৎসব বিবরণে। ঐ বৎসরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় পাই:

'...At the extreme south-east corner of the lawn, washed by the rippling waves of the holy Ganges is the site where the ashes of the great Swami rest. On it a

Memorial temple is now being erected to perpetuate his memory. In the interior of this unfinished building, a large portrait of Swamiji was placed and beautifully decorated.'

উল্লিখিত 'অসমাপ্ত ভবন' সমাপ্ত হওয়ার ইতিহাস দীর্ঘ অর্থাৎ বহু বৎসর ধরে ক্রমনির্মিত মন্দির এটি। এবং সে ইতিহাস বেদনাদায়ক, কারণ মন্দিরটি পূর্ণাঙ্গ আকার ধারণ করতে বহু বৎসর লাগার হেতু আর কিছু নয়—অর্থাভাব। মন্দিরটি এখন যে-আকারে বর্তমান তাতে এটিকে বিপুল ব্যয়ে নির্মিত মন্দির মনে হয়না। তথাপি সেই অর্থের জন্যই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে কাতরভাবে ভিক্ষা করতে হয়েছিল সারা ভারতবর্ষের কাছে—ভারতের বাইরের মানুষদের কাছেও।

লোকমান্য তিলক-প্রবর্তিত এবং তাঁর সহকর্মী এন সি কেলকার-সম্পাদিত পুনার বিখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'মরাঠা'র (Mahratta) পুরোনো সংখ্যাগুলি ওল্টাবার সময়ে দেখি, তাতে ১৯১২, ১৪ জানুয়ারি, স্বামী ব্রহ্মানন্দের একটি আবেদনপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই আবেদনপত্রের উপরে ভূমিকারূপে সম্পাদক কিছু মন্তব্য যুক্ত করেন—শিরোনামা ছিল Semi Centenary of Swami Vivekananda। মরাঠার বিখ্যাত সম্পাদক স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট কীর্তির মূল্যায়ন করতে গিয়ে যা বলেছিলেন, তার মধ্যে একালের ইতিহাস-সচেতন পাঠক জ্ঞাতব্য বস্তু পাবেন। তিনি বলেছিলেন:

"স্বামী বিবেকানন্দই ভারতীয় জাতীয়তার আসল পিতা।...প্রত্যেক ভারতবাসী আধুনিক ভারতের এই পিতার জন্য গর্বিত।"

প্রত্যেক ভারতবাসী যদিও আধুনিক ভারতের পিতার জন্য গর্বিত ছিল, তথাপি তাঁর স্মৃতিরক্ষায় তারা বাস্তবিকপক্ষে কী করেছিল? মরাঠা কাগজে মুদ্রিত স্বামী ব্রহ্মানন্দের আবেদনপত্রে কিন্তু ভারতবাসীর দায়িত্বপালনের গৌরবময় ইতিহাস লিখিত ছিল না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভারতবর্ষের সর্বত্র-প্রেরিত এই আবেদনপত্রের সূচনায় স্বামীজীর কর্মকীর্তির উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন, "মাত্র দশ বছর আগে স্বামীজীর দেহান্ত হয়েছে; সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁর লোকান্তর 'জাতীয় বিপর্যয়' বলে প্রতীয়মান; এবং সেজন্য শোক ও ভক্তির তুলনারহিত অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছে।" "কিন্তু"—ব্রহ্মানন্দ প্রশ্ন করেছিলেন—"আধুনিক ভারতের এই দেশপ্রেমিক ঋষির উপযুক্ত স্মারকের কোন্ ব্যবস্থা আমরা করতে পেরেছি?"

স্বামীজীর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়াস ও পরিকল্পনার বিবরণ স্বামী ব্রহ্মানন্দ দিয়েছিলেন। "রামকৃষ্ণ মিশন চায়, স্বামীজীর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে গঙ্গাতীরে একটি মন্দির নির্মাণ করতে যার ছাততলে লোকান্তরিত আচার্যের চিতাভস্ম রক্ষিত হবে, তদুপরি থাকবে একটি বৈদিক বিদ্যালয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম ও দর্শন গ্রন্থের একটি গ্রন্থাগার এবং ঐ বিষয়ে আলোচনার জন্য সভাকক্ষ।" ঐ পরিকল্পনা সফল করার জন্য স্বামীজীর ভারতীয় বন্ধু ও অনুরাগীগণের, সেইসঙ্গে পাশ্চাত্য বেদান্ত কেন্দ্রগুলির কাছে, ব্যক্তিগত পত্র প্রেরিত হয়েছিল। তাতে যেটুকু সাড়া পাওয়া গিয়াছে, তার দ্বারা নদীতটের বাঁধাই এবং মূল মন্দিরভবনের ভিত্তি নির্মাণের কাজ শেষ করা যায়নি, কেবল স্বামীজীর চিতাভূমির উপরিস্থ বেদীকে আচ্ছাদিত করার মতো একটি সাদামাটা নীচুছাত-ঘর তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। স্বামীজীর চিতাভস্ম বর্তমানে মঠের (শ্রীরামকৃষ্ণ) মন্দিরের মধ্যে অস্থায়ীভাবে রক্ষিত আছে ইত্যাদি।

দুঃখ বেদনায় আপ্লুত স্বরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ লিখেছিলেন:

"এই অসমাপ্ত স্মারক মন্দির ভারত-সন্তানদের লজ্জা ও অপদার্থতার স্মারক রূপে দাঁড়িয়ে আছে।"

অত্যন্ত আক্ষেপ ও আকুলতায় পূর্ণ স্বামী ব্রহ্মানন্দের আবেদনে কোন্ সাড়া মিলেছিল? বলা চলে, তা চমকপ্রদ। তবে অভিপ্রেত অর্থে নয়। ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যার প্রবুদ্ধ ভারতে 'বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল ফাণ্ড'—এই নামে স্মৃতিভাণ্ডারে লব্ধ অর্থের যে-হিসাব মেলে তার সারাংশ এই:

"দেখা যাচ্ছে, প্রবুদ্ধ ভারত আফিসে রক্ষিত অদ্বৈত আশ্রম এবং তার সদস্যগণ প্রদত্ত ১৮৯ টাকা ছাড়া আমরা [প্রবুদ্ধ ভারত কর্তৃপক্ষ] সাধারণের কাছ থেকে ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়ে [অর্থাৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক নির্ধারিত এক বৎসরে] ১৮৭ টাকা ৪ আনা সংগ্রহ করেছি। এবং ১৯১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে বেলুড় মঠে দাতারা ৬০৭ টাকা ১৫ আনা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সব জড়িয়ে দাঁড়িয়েছে ১০৮৪ টাকা ৩ আনা।"

"প্রিয় পোষিত পরিকল্পনা" অবশ্য পরিত্যক্ত হয়নি, কিন্তু তাকে অবিলম্বে কার্যকর করাও যায়নি। "আধুনিক ভারতবর্ষের পিতা"-রূপে স্বীকৃত মহাপুরুষের মাঝারি আকারে সমাধি মন্দিরের নির্মাণ কাজ—১৯০৭ সালে আরম্ভ হয়ে সমাপ্ত হয়েছিল ১৯২৩ সালের শেষের দিকে। ঐ সময়ের মধ্যে অগণিত সভায় হাজার হাজার মানুষ বিবেকানন্দের নামে জয়ধ্বনি দিয়েছে; হাজার-হাজার মানুষ স্বামীজীর অসমাপ্ত সমাধি-মন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে গেছে; এই সকল মানুষের ভক্তির আন্তরিকতায় সন্দেহ করা সম্ভব নয়, তবে মনে রাখতে হবে, আমাদের ভক্তির সঙ্গেই আছে জাড্য, যার জন্য গঠনমূলক কাজ আমরা ক'রে উঠতে পারিনা।

যাই হোক, স্বামীজীর সমাধি-মন্দির মধ্যমাকার হলেও এর স্থাপত্য অতি চমৎকার। চিতাভূমির উপরে আচ্ছাদনী হিসাবে নির্মিত নীচুছাত-ঘরটির সঙ্গে পরবর্তীকালে নানা অঙ্গ যোজনা ক'রে যে মন্দির তৈরি হয়েছে—তার ছন্দোময় সামগ্রিকতা প্রশংসাযোগ্য। এখন এই মন্দিরের স্থাপত্য পরিকল্পনা কার? সঙ্গতভাবেই অনুমান করতে পারি, স্বামী বিজ্ঞানানন্দই একাজ করেছেন—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথমপর্বের ভবন ও মন্দিরাদির স্থাপত্য পরিকল্পনা যিনি করতেন, এবং স্বামীজীর সহায়তায় রামকৃষ্ণ-মন্দিরের মূল স্থাপত্য পরিকল্পনা ক'রে যিনি অমর গৌরবের অধিকারী হয়েছেন।

নানা সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী আমরা বলতে পারি, ১৯০৮ সালের অসমাপ্ত সমাধি-মন্দির আরও ১২ বছর প্রায় একইভাবে পড়ে থেকেছিল। ১৯২০ বা ১৯২১ সাল থেকে তোড়জোড় ক'রে এর নির্মাণ সমাপ্ত করার চেষ্টা করা হয়। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, "স্বামী বিজ্ঞানানন্দ" গ্রন্থে লিখেছেন, "এই সময়েই (১৯১৯ খ্রীঃ) [১৯২০? ১৯২১?] বিজ্ঞান-মহারাজ রাখাল-মহারাজের আহ্বানে বেলুড়মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির নির্মাণ করাইতে যান। ইহার কয়েক মাস পূর্ব হইতেই তিনি স্বামীজীর ভাবে মগ্ন ছিলেন।" [পৃ. ৮৮]

"প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ" নামক গ্রন্থে ধৃত স্বামী সদাশিবানন্দের স্মৃতিকথায় অনুরূপ সংবাদ পাই—

"ইহার প্রায় বৎসর খানেক পরে [আন্দাজ ১৯২০] পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আহ্বানে বিজ্ঞানানন্দজী স্বামীজীর সমাধি-মন্দির নির্মাণ উপলক্ষে কিছুদিনের জন্য বেলুড়মঠে যাইয়া অবস্থান করেন। এলাহাবাদে থাকিতে আমরা দেখিয়াছি, সেইসময় পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ স্বামীজীর ধ্যানে গভীরভাবে মগ্ন থাকিতেন। তখন তিনি আমাদের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা অপেক্ষা স্বামীজীর কথাই বেশি বলিতেন। প্রায় প্রত্যহ স্বামীজীর উপদেশ ও তাঁর মহাজীবনের অপূর্ব ঘটনাবলী আলোচনা করিতেন। প্রায়ই তিনি ভরদ্বাজ আশ্রমে যাইয়া সপ্তর্ষির যে মূর্তিটি আছে তা তন্ময় হইয়া দর্শন করিতেন। আবার আমাদিগকে বলিতেন, কল্পে-কল্পে যে-সকল সপ্তর্ষিমণ্ডল হয় তাঁরাই বিশ্বমঙ্গলের একমাত্র নিয়ন্তা। এইসময় তিনি জয়পুরবাসী একজন প্রবীণ চিত্রশিল্পীর দ্বারা সপ্তর্ষিমণ্ডলের একখানি তৈলচিত্র অঙ্কন করান ও তাঁর শয়নকক্ষে তাহা রাখেন। মহারাজজী বলিতেন, 'বিশ্বের সর্বত্র স্বামীজী আছেন; কিন্তু সপ্তর্ষিমণ্ডলেই তাঁর স্থান। তিনি সেখান থেকেই জগতের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন'।"

'প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' গ্রন্থে ধৃত আরো কয়েকটি স্মৃতিকথায় (যেমন স্বামী জ্ঞানদানন্দের ও স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের স্মৃতিকথায়) বিজ্ঞানানন্দ কর্তৃক বিবেকানন্দ-মন্দির তত্ত্বাবধানের কথা আছে। ঐ কালে বিজ্ঞান-মহারাজের আচার-আচরণের চমৎকার বিবরণ পাই স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের লেখায়। তার অংশ এই:

"আমরা তাঁহাকে (বিজ্ঞানানন্দকে) প্রথম দর্শন করি ১৯২১ সালে। তখন তিনি স্বামীজীর মন্দির নির্মাণের জন্য বেলুড়মঠে আসিয়াছেন। উহার কিছু পূর্ব হইতে স্বামীজীর মন্দিরের পূজাদির ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তখন শুধু স্বামীজীর মন্দিরের নীচের অংশটুকু (যেখানে স্বামীজীর প্রতিমূর্তি রহিয়াছে) ও উহার চারিদিকের আবরণশূন্য বারান্দামাত্র ছিল। নিকটে তখন অন্য কোনো মন্দিরাদি ছিলনা। মঠবাড়ির অংশ ছাড়া তাহার দক্ষিণ দিকে, স্বামীজীর মন্দিরের দিকেও, কোনো পোস্তা বাঁধানো হয় নাই। জোয়ারে গঙ্গার জল প্রায় স্বামীজীর মন্দিরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িত। ঐ মন্দিরের চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু ইষ্টকাদি পড়িয়াছিল। একদিন একটি বিদেশাগত ভদ্রলোক (সাহেব) আসিয়া আমাদের দেখিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা বিবেকানন্দ-মন্দিরটি এরূপ অযত্নে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন?'...পরে মহাপুরুষ-মহারাজকে উহা নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, 'কেন, ওটি under construction (নির্মাণাধীন) বললে না কেন?'...মঠের অফিসের...জনৈক ব্রহ্মচারীও বলিলেন..., মহাপুরুষ-মহারাজ ঠিকই বলেছেন; এই মন্দিরের ওপরে শীঘ্রই একটি দোতলা মন্দির হবে। তার নকশাদিও ঠিক হয়েছে, এবং এর জন্য অর্থাদিও এসেছে। কিন্তু তা করবার ভার বিজ্ঞান-মহারাজের উপর। তিনি এলাহাবাদে থাকেন—একটু খামখেয়ালী লোক। তাই কবে এসে যে কাজ করবেন তা এখনো ঠিক হয়নি।'...

"(তারপর) তখন ফাল্গুন কি চৈত্র মাস। দেখিলাম একটি ছ্যাকরা-গাড়ি করিয়া তিনি হঠাৎ সামনের মাঠে আসিয়া নামিলেন।...নামিয়াই কিন্তু সোজা স্বামীজীর মন্দির অভিমুখে গেলেন, ও নিকটবর্তী যাঁহাদের দেখিতে পাইলেন, (তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় স্বামী শঙ্করানন্দজীও ছিলেন) তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্বামীজীর মন্দিরের জন্য কি কি মালমসলা জোগাড় করা হইয়াছে? উহা সবিশেষ শুনিয়া তিনি মঠবাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। আহার ও বিশ্রামাদির পর তিনি আবার স্বামী শঙ্করানন্দজী প্রভৃতির সহিত স্বামীজীর মন্দির সম্বন্ধে কথা বলিতে লাগিলেন।

"অতি শীঘ্রই মালমসলা জোগাড় হইল এবং তিনিও নির্মাণকার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশেরও ঊর্ধ্বে, দেহও খুব স্থূল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহাকে কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করিতে দেখিয়াছি। সকালে চা ও তৎসঙ্গে সামান্য কিছু খাইয়া, কুলি মজুরেরা কাজে আসিবামাত্রই—বেলা আটটায় তিনি কার্যস্থলে উপস্থিত হইতেন, এবং বেলা একটা পর্যন্ত, যতক্ষণ মিস্ত্রী ও কুলিরা কাজ করিত, ততক্ষণ নিকটবর্তী দেবদারু বৃক্ষতলে কখনো-বা দাঁড়াইয়া কখনো-বা বেঞ্চিতে বসিয়া সকল কার্যই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিতেন। একটায় সকলের কাজ শেষ হইলে তিনি আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া (স্নান তিনি অতি অল্পই করিতেন) দুপুরের আহারাদি শেষ করিয়া (আহার অতি সাধারণই ছিল) সামান্য একটু বিশ্রাম করিতেন। আবার দুইটা হইতে কাজ আরম্ভ হইলেই তিনি বিশ্রাম হইতে উঠিয়া সেখানে যাইতেন। তাঁহাকে এই বৃদ্ধ বয়সেও ঐরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইতাম।"

॥ দুই ॥

জ্ঞানাত্মানন্দের স্মৃতিকথা থেকে কতকগুলি দরকারী কথা পাই। বিবেকানন্দ-মন্দিরের নির্মাণকার্য তত্ত্বাবধান করেন অন্য কেউ নন স্বামী বিজ্ঞানানন্দই। দ্বিতীয়ত, স্বামীজীর 'অভিন্নহৃদয়' গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দের চোখের সামনেই ঐ নির্মাণকাজ প্রায় শেষ হয়েছিল। তৃতীয়ত, ঐ শেষ পর্যায়ের কাজের আগেই স্বামীজীর মর্মর রিলিফ একতলা নীচু গর্ভমন্দিরের মধ্যে স্থাপিত হয়ে গেছে এবং তার পূজাদিও শুরু হয়েছে। এখন প্রশ্ন, ঐ মূর্তি কবে স্থাপিত হয়েছিল?

প্রবুদ্ধ ভারতে স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসবের বিবরণের মধ্যে এই রিলিফ মূর্তির প্রথম উল্লেখ পাই ১৯১৩ ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যায়। তার আগের কয়েকটি সংখ্যায় কেবল স্বামীজীর চিতাস্থলের উপরে নির্মিত মর্মরবেদীর কথা আছে। ১৯১৩ সালের রিপোর্টে সম্প্রতি-স্থাপিত স্বামীজীর মর্মর ধ্যানমূর্তির কথা এই প্রকার:

'From early morning until late at night vast crowds came sojourning in meitation before the image in marble, recently placed in the Memorial Chapel erected in his honour.'

পরবর্তী দুই বৎসরে অর্থাৎ ১৯১৪ ও ১৯১৫ সালের জন্মোৎসব বিবরণীতেও 'স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব মর্মর প্রস্তর-নির্মিত ধ্যানমূর্তির' কথা আছে—কিন্তু ঐ মূর্তি তখনো বর্তমানে যে-রকম দেখা যায়, সেইভাবে ভিত্তিপ্রাকারে গ্রথিত হয়নি।

স্বামী গম্ভীরানন্দের *"History of the Ramakrishna Math and Mission"* গ্রন্থে পাই (1957 Ed, p 281), সমাধি-মন্দির ১৯২৩ সালের মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছিল। ১৯২৪ সালের ২৮শে জানুয়ারি তার প্রতিষ্ঠাকার্য হয়। এ-সম্পর্কে উদ্বোধন পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩০ সংখ্যায় স্বামীজীর মন্দিরের একটি চিত্র ছাপা হয়। তার তলায় এই অতি সংযত বিবরণটি বেরিয়েছিল:

বেলুড় মঠে শ্রীবিবেকানন্দের
ওঁকার মন্দির

প্রতিষ্ঠিত—সোমবার ১৪ই মাঘ (১৩৩০) ২৮শে জানুআরি (১৯২৪)
বিগত ২৪শে [১৪ই] মাঘ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব দিবসে বেলুড় মঠে তাঁহার ওঁকার মন্দির প্রতিষ্ঠাকার্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে প্রায় ৫০০০ সহস্র ভক্ত নরনারায়ণ প্রসাদ প্রাপ্ত হন।

মিস ম্যাকলাউড অ্যালবার্টা মার্জেসনকে এই উপলক্ষে, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪ তারিখে লিখেছিলেন:

"মাদার (মিসেস লেগেট) স্বামীজীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবস ২৮শে জানুয়ারিতে ৫০০০ টাকা দিয়েছেন মন্দিরের পিছনের পোস্তা তৈরীর জন্য। দেখা যাচ্ছে, বর্তমান দেওয়ালটিকে পিছনের আর একটি দেওয়ালের দ্বারা আরো জোরদার করা দরকার, যেটি শ্রীমা ও ব্রহ্মানন্দজীর মন্দিরের সমরেখায় নির্মিত হবে। অত্যন্ত উপযুক্ত এবং মূলগত কাজ এটি—কারণ স্বামীজী—তাঁর দেহত্যাগের আগের দিন বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, যা ১৫০০ বৎসর বর্তমান থাকবে এবং দুমাইল বিস্তৃত হবে।"

এখানেই মন্দিরের গঠন প্রসঙ্গ শেষ হচ্ছে না। প্রথমে যে সিঁড়ি নির্মিত হয়, তা এতই খাড়া ও সংকীর্ণ ছিল যে, অনেকেরই পছন্দ হয়নি, বিশেষত মিস ম্যাকলাউডের। এগারো বছর পরে ২৬ শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫ তারিখে তিনি অ্যালবার্টাকে লিখেছেন:

"মিসেস বি, ইতালির Villa d' Este-এর সিঁড়ির একটি বিশেষ পরিচ্ছন্ন নকশা ক'রে পাঠিয়েছেন, যার অনুরূপ আমরা স্বামীজীর মন্দিরের জন্য করতে পারব। বর্তমানে যে সিঁড়ি আছে তা খাড়াই, উঁচু ও সংকীর্ণ—একেবারেই তা স্বামীজী ও তাঁর শিক্ষার মতো নয়।"

আরো চার বছর পরে, ২৪শে জানুয়ারি ১৯৩৯ তারিখে মিস ম্যাকলাউড লিখেছেন:

"মিসেস লেগেট স্বামীজীর মন্দিরের গায়ে পোস্তা তৈরীর জন্য যে টাকা দিয়েছিলেন, তাও কাজটার জন্য যথেষ্ট নয়, কারণ মন্দির রক্ষার জন্য আরো বিস্তৃত পোস্তা তৈরী করা দরকার।"

ঐ বছরই ১৩ই ফেব্রুয়ারি এক চিঠিতে মিস ম্যাকলাউড জানান—মন্দিরশীর্ষের ৯ ফুট

দীর্ঘ ত্রিশূলের ফলাগুলি নতুন ক'রে সোনার জলে ধোয়া হবে—তার খরচ ৪০০ টাকা তিনিই দেবেন।

॥ তিন ॥

বিবেকানন্দ মন্দিরের ভিতরে যে রিলিফ মূর্তি রয়েছে, যার কথা প্রবুদ্ধ ভারতের ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালের বিবরণে এবং মিস ম্যাকলাউডের ১৯১৫ সালের বিবরণে পাই—সেটি কখন, কার উদ্যোগে নির্মিত হয়? এ-বিষয়ে কোনো সংবাদই আমাদের জানা থাকত না, যদি-না নিবেদিতার পত্রাবলীতে এ-সম্পর্কে বেশকিছু সংবাদ্ পেয়ে যেতাম। সেখানে পাই, মিসেস লেগেটের অর্থানুকূল্যে এবং ভগিনী নিবেদিতার উদ্যোগে স্বামীজী-মন্দিরের জন্য একটি রিলিফ মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল। সেই মূর্তিই উক্ত মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত হয়। আমরা শিহরিত হয়ে ভাবি—স্বামীজীর মূর্তি ও মন্দিরের মূলে কতজনের কতদিনের স্বপ্ন ও কল্পনার সম্মিলন! এই মন্দির তাহলে নির্মিত হয়েছে যতখানি না অর্থে, ততোধিক বিন্দু বিন্দু অশ্রু ও রক্তে! কী যন্ত্রণা স্বামী ব্রহ্মানন্দের—কী আবেগ ভগিনী নিবেদিতার—কী পরিশ্রম স্বামী বিজ্ঞানানন্দের—কতখানি শ্রদ্ধার উৎসর্গ মিসেস লেগেট ও মিস ম্যাকলাউডের—রামকৃষ্ণ সংঘের সাধু সন্ন্যাসীদের—এবং জ্ঞাত অজ্ঞাত কত মানুষের!

স্বামীজীর রিলিফ মূর্তির জন্য নিবেদিতা-গোষ্ঠীর মধ্যে আলাপ আলোচনা ঠিক কোন্ সময়ে আরম্ভ হয়েছিল বলতে পারব না। ২০ এপ্রিল, ১৯১১ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠিতে এ-বিষয়ে প্রথম উল্লেখ পাচ্ছি:

> "লেডি বেটী (মিসেস বেটী লেগেট) যা চান সেইভাবে সমাধি-মন্দিরের ফলক তৈরী করবার মতো সত্যই একজন প্রস্তর-ভাস্কর ভারতে আছেন। তবে কাজটা করিয়ে নেবার জন্য গণেনকে সেখানে পাঠাতে হবে। লেডি বেটী কি মাপ ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলি জানাবেন? তবে যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক, গণেন জুলাইয়ের আগে জয়পুরে যেতে পারবে না, কারণ এখন প্রচণ্ড গরম। যদি লেডি বেটী কোন্ আকারে শুভ্র মর্মর প্রস্তরের প্যানেলটি চান, তা বলে পাঠান—এক ফুট কিংবা দেড় ফুট কিংবা আরো বড়—তা চৌকো কিংবা আয়তাকার—ধরা যাক এক ফুট চওড়া দেড় ফুট লম্বা—তাহলে আমরা সেইমতো করবার চেষ্টা করব।"

নিবেদিতা যখন এই চিঠি লিখেছেন, তখন ভারতীয় চিত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেলেও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে নতুন কোনো প্রতিভার অভ্যুদয় হয়েছে, এমন তিনি মনে করেন নি। মহারাষ্ট্রে ম্মাত্রে কিংবা বাংলায় শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু ভাস্কর্যকাজ করেছিলেন সত্য, কিন্তু মুখাকৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্য শিল্পী ছিল কিনা সন্দেহ। এইকালের মূর্তিগুলি প্রায়শই বহির্ভারত থেকে তৈরি হয়ে আসত। এই পটভূমিকা স্মরণ রেখে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ১২ই জুলাই ১৯১১, চিঠি পড়তে হবে। তিনি লেখেন:

> "লেডি বেটীর দ্বারা অর্পিত কর্মভার সম্বন্ধে গণেন ক্রমেই রীতিমতো উদ্দীপনা বোধ করছে। সুতরাং আশা হচ্ছে, কাজটা শেষ পর্যন্ত ক'রে ওঠা যাবে। সে বলছে, তার ধারণা,

এটা যুগসূচনাকারী ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। [শিল্পের দিক দিয়েই বোধহয় এই মন্তব্য।]...তবে প্রচেষ্টা পুরো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে, এ-বিষয়ে লেডি বেটীকে মনে মনে প্রস্তুত থাকতে বলো।"

এই চিঠি লেখার আগেই মিসেস লেগেটের কাছ থেকে রিলিফ মূর্তির ঈপ্সিত মাপ এসে গিয়েছিল। নিবেদিতা আগে সন্তর্পণে (অবশ্যই খরচের ভয়ে) এক ফুট × দেড় ফুট মাপের রিলিফের কথা বলেছিলেন, কিন্তু মিসেস লেগেট যখন আড়াই ফুট × তিন ফুট রিলিফের প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন, তখন নিবেদিতার আনন্দের অবধি রইল না। উপরিউদ্ধৃত চিঠিতেই তিনি লেখেন:

"৩০ × ৩৬ ইঞ্চি প্যানেল তো বিরাট কাণ্ড হয়ে দাঁড়াবে!!—তা বিবেকানন্দ মন্দিরকে গৌরবময় ব্যাপার ক'রে তুলবে, যা বহুযুগের বিখ্যাত ঘটনা হয়ে থাকবে। সুতরাং আশা করি, মাপ ছোট করতে হবে না। গণেন ভাবছে—[শিল্পীকে দেবার জন্য] স্বামীজীর একটা বেশ বড়-করা ফটোগ্রাফ অবশ্যই চাই।"

একই তারিখে নিবেদিতা মিসেস লেগেটকে লিখেছিলেন, তিনি নিজের খরচে একটি ছোট প্যানেলের অর্ডার দিয়েছেন, সেটা "উপযুক্তভাবে নির্মিত হ'লে মিস ম্যাকলাউডকে পাঠাবেন।" আমাদের ধারণা, স্বামীজীর সেই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার মর্মর পাথরের রিলিফ মূর্তি "উপযুক্তভাবে" নির্মিত হয়েছিল এবং সেটি মিস ম্যাকলাউড পেয়েছিলেন। এমন ধারণার কারণ আছে। ইংল্যান্ডে স্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভনে শেক্সপীয়ারের কন্যার বাড়ী 'হলস ক্রফট' মিসেস লেগেট কেনেন, যার উত্তরাধিকার মিস ম্যাকলাউডে বর্তেছিল। ঐ বাড়ীতে পূর্ব থেকেই একটি "প্রফেটস চেম্বার" ছিল, যেটিকে এঁরা নিজেদের প্রফেট অর্থাৎ স্বামীজীর নামে উৎসর্গ করেন। সেই ঘরেই মিস ম্যাকলাউড স্বামীজীর পাতলা একটি রিলিফ মূর্তি রেখেছিলেন, যেটি খুব সম্ভব নিবেদিতার করানো মূর্তি। মিস ম্যাকলাউড ৩১ মে, ১৯৪৪, এক চিঠিতে লেখেন:

"I don't want the Prophet's Chamber into a chapel. It was consecrated when we bought it 30 years ago. So I put out our Prophet into the wall...a window behind it—the thin marble bas relief of Swamiji—so there is a translucent glow. Then all the tiny pictures, S. Sara's, Nivedita's, Mrs. Mildred Adam's, all hang on the beam."

স্বামীজীর মূর্তির জন্য মিসেস লেগেট টাকাপয়সা দিয়েছেন, যার ফলে নিবেদিতার বড় প্রিয় একটি আশা চরিতার্থতার পথে। প্রাণ ঢেলে ধন্যবাদ দিয়ে নিবেদিতা লিখলেন, "অপূর্ব আপনার অর্থের সদ্ব্যয়। এ জিনিস মানুষ না খেয়েও করবে।" তারপরে তিনি হৃৎস্পন্দিত ভাষায় এই কথাগুলি লিখেছিলেন:

"ভাস্কর তাঁর কার্যারম্ভ করেছিলেন প্রস্তরগত স্বামীজীর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্যসহ পূজামন্ত্র উচ্চারণ ক'রে—'হে স্বামীজী! আবির্ভূত হও আমার হস্তে।' সকাল আটটা থেকে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত তিনি কাজ করেন, কাজের ফাঁকেই খেয়ে নেন। আমাকে তিনি এই সংবাদ পাঠিয়েছেন—যদি শেষ পর্যন্ত কাজটি সন্তোষজনক না হয়, তাহলে এক পাই-পয়সাও নেবেন না, সব টাকা ফেরত দেবেন।

"ব্যাপারটি নিয়ে আমি অবশ্যই শিহরিত; কেন তা আপনি বুঝবেন। ডঃ [জগদীশচন্দ্র] শুরুতেই আমাকে দিয়ে এই কথাটি লিখিয়ে নিয়েছেন—'এই কাজ সমগ্র জাতীয় জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।' কোনো সন্দেহ নেই তাতে—যদি তা যথাযোগ্যভাবে সম্পাদিত হয়।"

নিবেদিতা কি স্বামীজীর রিলিফ মূর্তি দেখেছিলেন? না। কারণ, উপরের চিঠি লেখার আটদিন পরে ২২ সেপ্টেম্বর তিনি দার্জিলিং যাত্রা করেন এবং ১৩ অক্টোবর তাঁর দেহাবসান হয়। মুক্তিপ্রাণা-লিখিত নিবেদিতা জীবনীতে দেখেছি, গণেন্দ্রনাথ নিবেদিতার শেষ সময়ে দার্জিলিং পৌঁছেছিলেন। যদি তিনি ২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জয়পুর থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন, তাহলে এখানে নিবেদিতাকে তিনি মূর্তি বিষয়ক সংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু তা ঘটেনি বলেই আমাদের ধারণা। আর যদি তিনি দার্জিলিং-এ সজ্ঞানে নিবেদিতাকে দেখে থাকেন এবং তাঁকে স্বামীজীর মূর্তির সংবাদ দিয়ে থাকেন, তাহলে মৃত্যু-পূর্বে না-জানি কী অপূর্ব তৃপ্তির প্রশান্তিতে নিবেদিতার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

নিবেদিতার বড় ইচ্ছা ছিল, ১৯১১ শীতকালের মধ্যে যেন স্বামীজীর মূর্তি যথাস্থানে স্থাপিত হয়। তা হয়নি। তার জন্য আরো ১২ বছরের বেশি অপেক্ষা করতে হয়েছে। এই মধ্যবর্তীকালে বিবেকানন্দ-ভক্তির ক্ষেত্রে নিবেদিতা যাঁকে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বান্ধবীরূপে পেয়েছিলেন সেই মিস ম্যাকলাউড একই স্বপ্নরেখা অনুসরণ ক'রে গেছেন। এবং যখন স্বামীজীর মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল, তখন সেইক্ষণে, মিস ম্যাকলাউড নিশ্চয় একটি অদৃশ্য কিন্তু উজ্জ্বল উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন—স্বামীজীর পাদমূলে তাঁর প্রণতা কন্যা নিবেদিতা।

[উদ্বোধন পত্রিকার আশ্বিন ১৩৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত]

সঙ্গীত-কল্পতরু

অর্থাৎ

নানাবিধ বাদ্যাদি শিক্ষা, স্বরলিপি ও সঙ্গীত সম্বন্ধে
বিশুদ্ধ শিক্ষাপ্রদ বিষয় সহ জাতীয়, ধর্ম-
বিষয়ক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক,
সাময়িক, প্রণয়, বিবিধ
এবং নানাবিষয়ক
গীত সংগ্রহ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ.

ও

শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক

কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

---

১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা,
"আর্য্যপুস্তকালয়" হইতে
শ্রীচণ্ডীচরণ বসাক কর্ত্তৃক

স্বামীজীর সন্ন্যাসপূর্ব জীবনের গ্রন্থ। বৈষ্ণবচরণ বসাকের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় গ্রন্থটি করা হলেও, বৈষ্ণবচরণ জানিয়েছেন, প্রধান কাজ নরেন্দ্রনাথই করেছেন। ঐ গ্রন্থে তিনি সঙ্গীততত্ত্ব ও নকশা-সহ তবলাবাদন সম্পর্কে এক দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন।
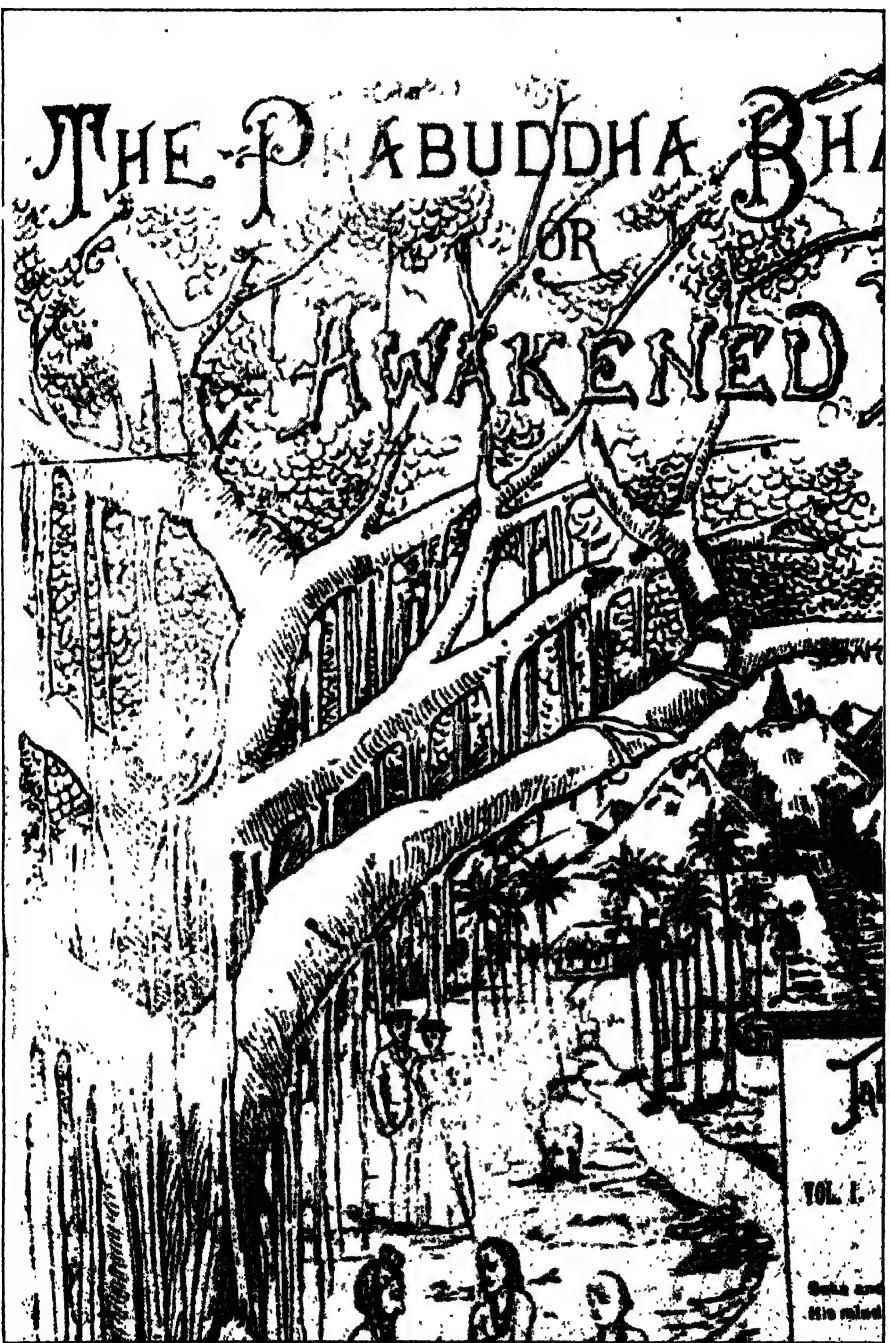
স্বামীজীর প্রেরণা ও অর্থসাহায্যে মাদ্রাজ থেকে স্বামীজীর অনুরাগীগণের দ্বারা প্রকাশিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রচ্ছদ, সেপ্টেম্বর ১৮৯৬। প্রচ্ছদ-চিত্রটি সমকালের পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত। স্বামীজী কিন্তু প্রচ্ছদচিত্রের কঠোর সমালোচনা ক'রে বলেন, অরণ্যে সাধুদের তপস্যা, সেখানে কৌতূহলী সাহেব-মেমদের বিবরণ, জাগরণের চিহ্ন নয়, পদ্মফুলই তার প্রতীক। সমকালে ভারতীয় শিল্পভাবনার দীনতা নিয়ে স্বামীজী দুঃখবোধ করেছিলেন।

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

বাঙ্গালা-পাক্ষিক-পত্র,

ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ক।

প্রথম বর্ষ

১৩০৫ মাঘ হইতে ১৩০৬ পৌষ।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।

স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲।

কলিকাতা, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কম্বুলেটোলা, ১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেনস্থ
উদ্বোধন-প্রেস হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম সংখ্যার নামপত্র। একটি প্রবন্ধে উদ্বোধন পত্রিকা, স্বামীজী ও উদ্বোধনের প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

BRAHMAVÂDIN

That which exists is One: sages call it variously.

VOL. I.

Madras

মাদ্রাজে স্বামীজীর প্রেরণায় আলাসিঙ্গা প্রমুখ স্বামীজীর ভক্তগণ ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫, 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ম্যাক্সমূলার পত্রিকাটির বেদান্ত-বিষয়ক রচনার বিশেষ সমাদর করেন।

আশ্বিন ১৩০৬ উদ্বোধনে 'বিলাতযাত্রীর পত্র' নামে চলিত ভাষায় স্বামীজীর ধারাবাহিক রচনার সূচনা। চলিত ভাষায় লেখার জন্য পত্র-পত্রিকায় স্বামীজী সবিশেষ সমালোচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রণীত

রাজযোগ।

ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা।

উদ্বোধন-প্রেস হইতে প্রকাশিত।

১৩০৫।

স্বামীজীর 'রাজযোগ', স্বামী শুদ্ধানন্দ অনূদিত, প্রথম সং ১৩০৫।

চিকাগো বক্তৃতা।

কলিকাতা।

ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ। প্রথম সং, ১৩০৮ সাল।

THE
Mahratta
A JOURNAL
OF
POLITICS, LITERATURE, ART AND SOCIETY
PUBLISHED EVERY SUNDAY
POONA:—SUNDAY, AUGUST 1, 1897.

SWAMY VIVEKANANDA AT THE FLORAL HALL.

Swami Vivekananda, the distinguished Hindu scholar, who arrived from Europe delivered an eloquent and impressive lecture at the Floral Hall. A large gathering assembled at the Hall and by far the majority consisted of Hindus. Punctual to time the lecturer was conducted to the stage by the Hon. P. Coomaraswamy and all the Hindus present made obeisance to the Swamy.

The Hon. P. Coomaraswamy offered a few remarks in introducing the lecturer. He said the highest privilege of a human soul was to be near God, next was the privilege of being in the presence of a servant of God. The sacred books taught that by devotion their duty was to reach the presence of a servant of God in order to attain to the other presence. The thing had to be accomplished by an enormous amount of difficulty Now servant of God was brought to their very threshold, although many were not entitled to such a mercy; and they felt that a high privilege. They received him first after his visit to the West. In him India had sent one of her highest devotees to America and England to preach the universal law of God. He referred to the enormous success the Swamy had achieved, and felt certain that the seed which he had sown during his travels would grow into an enormous tree. He entreated the assembly to listen attentively and in no carping spirit, to the words that were to be uttered, and he felt sure that a little quiet reflection on those words will lead to good results.

The Swamy, on rising, was greeted with applause. He said:—

Mr. President and Gentlemen—What little work has been done by me has not been from any inherent power that resides in me, but from the cheers, the good will, the blessings that have followed my path in the West from this our very beloved, most sacred, dear mother land. Some good has been done no doubt, but especially unto myself, for what before was a mere feeling, what before was the result perhaps of an emotional nature, gained the conviction of certainty attained the power and strength of demonstration. Before then, as every Hindu thinks I thought as the Hon. President has just pointed out to you, that this is the Puna Bhumi the land of Karma. To-day I stand here to say, with the conviction of truth, that it is so, that if there is any land on this earth that can lay claim to be the blessed Puna Bhumi, to be the land to which all souls on this earth must come to account for Karma, the land where every soul—which is wending its way Godward must come to attain its last home, the land where humanity has attained its highest towards gentleness, towards generosity, towards purity, towards calmness the land above all of introspection and of spirituality, it is India. Hence have started the founders of religions from the most ancient, time deluging the earth again and again with pure and perennial waters of spiritual truth. Hence have proceeded the tidal waves of philosophy that have covered the earth; East or West, North or South, and hence again must start the wave which is going to spiritualise the material civilisation of the world. Here is the life-giving water with which must be quenched the burning fire of materialism, burning the core of the hearts of millions in other lands.

কলম্বোর ফ্লোরাল হলে স্বামীজীর সংবর্ধনা ও ভাষণের রিপোর্ট। 'মরাঠা', ৩১ জানুয়ারি ও ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭।

VIVEKANAND INTERVIEWED.—The following sentences we pick out of a long report of an interview in a Madras paper:—

My idea as to the key-note of our national downfall is that we do not mix with other nations—that is the one and the sole cause. We never had opportunity to compare notes. We were *Kupa Mandukas*. I believe the Indian nation is by far the most moral and religious nation in the whole world and it would be a blasphemy to compare the Hindus with any other nation In England, social status is stricter than caste is in India. A great number of people sympathised with me in America—much more than in England Vituperation by the low-caste missionaries made my cause succeed better. I had no money, the people of India having given me my bare passage money, which was spent in a very short time. I had to live, just as here, on the charity of individuals. The Americans are very hospitable people. In America, one-third of the people are Christians; but the rest have no religion, that is, they do not belong to any of the sects, but amongst them are to be found the most "spiritual" persons. I think the work in England is sound. If I die to-morrow, and cannot send any more *sanyasis*, still the English work will go on. The Englishman is a very good man. American people are too young to understand renunciation. England has enjoyed wealth and luxury for ages. Many people there are ready for renunciation. The religion of India at present is 'Don't Touchism'—that is a religion which the English people will never accept The thoughts of our forefathers and the wonderful life-giving principle that they had discovered, every nation will take. The biggest guns of the English Church said that I was putting Vedantism into the Bible. The present Hinduism is a degradation There is no book on philosophy written to-day in which something of our Vedantism is not touched upon even the work of Herbert Spencer contains it. The philosophy of the age is Advaitism, everybody is [illegible]; but only in Europe, they try to be original. They talk of Hindus with contempt, at the same time swallowing the [illegible] [illegible] of the Hindus. Professor Max Muller is a perfect Vedantist, and has done splendid work in Vedantism. He believes in [illegible]."

ট্রিবিউন, ১৭ ফেব্রুয়ারি; মাদ্রাজে স্বামীজীর ইন্টারভিউয়ের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট।

SWAMI VIVEKANANDA is a model of manly beauty. Here is a pen portrait of him:—Stature commanding, chest lion-like, broad and deep, limbs gigantic but shapely, and carriage easy and elegant. Forehead expansive and bulging out; eyes large, soft and introspective (like lotus floating on still water), nose large but not out of proportion to other features, lips beautifully curved, the chin massive and the whole face soft but grand. The voice is sweet, but rich and sonorous. Altogether a majestic figure—a born leader of men.

ট্রিবিউন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭। বিবেকানন্দের দেহ সৌন্দর্যের বর্ণনা।

SWAMI Vivekananda arrived at Madras on the 6th instant and was accorded a reception unique for its enthusiasm and magnificence. The roads through which he passed on his way to the Kernan Castle where he was put up were profusely decorated, and triumphal arches with suitable mottoes were erected at intervals. Bands of music were stationed here and there all along the route, thunderous shouts of joy and welcome being raised by the massed populace at sight of him. At one point the horses drawing his carriage were unyoked and numbers of enthusiasts hauled the vehicle, in spite of the protests of the Swami, a long distance to the castle. Addresses of welcome and solicitations for a visit poured in from all parts of the Presidency, and it was with difficulty that the thousands that had assembled to do him honour were prevailed over to disperse for a few hours only to give him time to rest. Such popular demonstration with such an object in view had never been witnessed before not only in the South but in the whole country.

ট্রিবিউন, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭। স্বামীজীর মাদ্রাজে উপস্থিতি ও বিপুল অভ্যর্থনার সংবাদ।

HOME-COMING OF SWAMI VIVEKANANDA.—Swami Vivekananda arrived in Calcutta on Friday morning from Madras by steamer. He came by special train from Budge Budge to Sealdah. The *A. B. P.* thus describes the reception :—

Long before the appointed hour people began to pour into the station, and by 7-30 the Eastern platform of the station was thronged by a large number of people. Punctual to time, the special steamed in and the appearance of Vivekananda at the carriage door was greeted with vociferous cheering, and at the platform he was received by the committee formed for the purpose of receiving him, and taken to a carriage waiting outside. Vivekananda was accompanied by two European gentlemen and a European lady and four or five Madrasis, all of whom were his disciples. The procession was then formed and the party, amidst much rejoicing, slowly wended their way through Harrison Road to Ripon College in Mirzapore Street. The whole route was decorated with flag, and evergreens with triumphal arches at intervals bearing in relief words of welcome to the Swami and the terraces on the roadside were crowded by men, women and children. From Ripon College the Swami went to Baghbazar where he was received by a large number of his friends and admirers in the house of Babu Nanda Lall Bose. The Swami then went to Baranagore where he will stay during his sojourn in Calcutta.

ট্রিবিউন, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭; কলকাতায় স্বামীজীর প্রত্যাগমন বিষয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্ট উদ্ধৃত করেছিল।

TELEGRAMS.

SWAMI VIVEKANANDA.

MADRAS, JAN. 15

Swami Vivekananda arrived at Colombo on Friday and received a magnificent reception, Hon'ble Sir Comarasawmy heading the Committee. An address of welcome was presented thanking the Swamiji for having proclaimed to nations of Europe and America the Hindu ideal of universal religion, harmonising all creeds, providing spiritual food for each soul according to its needs and lovingly drawing it unto God. The address adds that the Swamiji has preached the truth and the way taught from remote ages by a succession of masters whose blessed feet have walked and sanctified Indian soil and whose gracious presence and inspiration have made her through all her vicissitudes the light of the world. The address also refers to inspiration of Sri Ramakrishna Deva and to the Swamiji's self-sacrificing zeal. It concludes that Swami Vivekananda by his noble work has laid humanity under deep obligation. The Swamiji gave an eloquent and touching reply to the address. The Swamiji has been invited to Rameswaram by H. H. Rajah of Ramnad. The Swamiji has accepted by telegram The Rajah started to receive the Swamiji. The Swamiji arrives at Madras passing Madura and other cities. The Madras Committee arranging grand reception On landing Colombo, the Swamiji received the following telegram " motherland rejoices to welcome you back." and in reply Swamiji wired " my love and gratitude to my countrymen. "

অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৯ জানুয়ারি ১৮৯৭। কলম্বোয় স্বামীজীর আগমনসংবাদ সূত্রে টেলিগ্রাম।

SWAMI VIVEKANAND AND THE RAJA OF KHETRI.—In his reply to the address presented him by the citizens of Bombay, for his help to the Swami in carrying the gospel of Vedanta to the West, the Raja of Khetri acknowledged the deep debt of obligation he owes to Vivekanand. Vivekanand's society he said was an inspiration to him. He made the Raja to take interest in astronomy and physics: and it seems that the Chief is cultivating that taste ever since.

This instance shows (says the Bombay Correspondent of the *Hindu*) that the Swami is a wonderful man indeed To create a taste for physics and astronomy in a Rajput Prince is no small credit, when it is known that Vivekanand himself is not a master of either science. Of course, he must be knowing the subjects well. But his speciality is religion and theology. It therefore shows a remarkable gift of observing the latent tendencies in others and getting them to develop those faculties. That explains, to a certain extent, the great influence he exercised over Americans and Englishmen. To enter into another person's feelings, to appreciate them and then to drive the current into channels suitable for their growth requires uncommon ability of a particular kind. And I was gratified to see that he has made an indelible impression on the Chief.

স্বামীজী রাজস্থানের পশ্চাদ্‌পদ এক দেশীয় রাজ্য খেতড়ির দৃষ্টিভঙ্গি ও চরিত্রে কোন্ পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, ট্রিবিউন পত্রিকায়, ৬ নভেম্বর ১৮৯৭, তার রিপোর্ট।

LAHORE, WEDNESDA

SWAMI VIVEKANANDA ON VEDANTA.

In the third lecture given by Swami Vivekananda during his short visit to Lahore—on "Vedanta," at Raja Dhyan Singh's Palace, last Friday evening, he may almost be said to have surpassed himself, and those who have read, and some who have heard, each of his lectures in India, are of opinion that it is the finest exposition of the Advaita system he has given since he landed at Colombo in January last.

When the Swami rose to address the gathering the spacious courtyard was quite filled, and the arrangements (made by a number of students) were such that every word of the two hours' lecture was heard with ease, and under thoroughly comfortable conditions.

The Swami said :—

Two worlds there are in which we live, one the external, the other the internal. Human progress has been, from times of yore, almost in parallel lines along both these worlds. The search began in the external, and man at first wanted to get answers for all the deep problems from outside nature. Man wanted to satisfy his thirst for the beautiful and the sublime from all that surrounded him, man wanted to express himself and all that was within him in the language of the concrete, and grand indeed were the answers, most marvellous ideas of God and worship, most rapturous expressions of the beautiful. Sublime ideas came from the external world indeed. But the other, opening out for humanity later, laid out before him a universe yet sublimer, yet more beautiful, and infinitely more expansive. In the *Karma Kanda* portion of the Vedas, we find the most wonderful ideas of religion inculcated, we find the most wonderful ideas about an over-ruling Creator, Preserver and Destroyer and this universe presented before us in language sometimes the most soul-stirring. Many of you, perhaps, remember that most wonderful Sloka in the *Rig Veda Samhita* where you get the description of chaos, perhaps the sublimest that has ever been attempted yet. In spite of all this we find it is only a painting of the sublime outside, in spite of all this we find that yet it is gross, that something of matter yet clings on to it. Yet we find that it is only the expression of the Infinite in the language of matter, in the language of the finite, it is the finite of the muscles and not of the mind. It is the infinite of space and not of thought. Therefore in the second portion, or *Gyana Kanda* we find there is altogether a different procedure. The first was to search out from external nature the truths of the universe. The first attempt was to get the solution of all the deep problems of life from the material world. *Yasyaite himavanto mahitwa.*

"Whose glory these Himalayas declare." This is a grand idea, but yet it was not grand enough for India. The Indian mind had to fall back—

stances, and for certain times, those th founded on the institutions of the time ; t other truths that are based on the nature himself that must endure so long as man endures. These are the truths that alo be universal, and in spite of all the c that we are sure must have come in as to our social surroundings, our of dress, our manner of eating, our of worship, even all these have ch but these universal truths of the *Sruti* marvellous Vedantic ideas, stand in the sublimity, immovable, unvanquishable, de and immortal. Yet the germs of all the ide are developed in the Upanishads have been already in the *Karma Kanda*. The idea cosmos, which all sects of Vedantists had t for granted, the psychology which has the common basis of all Indian schools of t had been worked out already and pi before the world. A few words, therefore it are necessary before we start into the s portion of the Vedanta alone, and I want t myself of one thing first, that is, my use word Vedanta. Unfortunately there is a committed many times in modern India, t word Vedanta has reference only to the A system, but you must always remember : modern India there are the three *Prastha* nas to study. First of all there are the reve by which I mean the Upanishads. Secondly our philosophies, the Sutras of Vyasa have greatest prominence, on account of their b summation of all the preceding systems of phy ; not that these systems are contradic one another, but the one is based on the oth a gradual unfolding of the theme which cul in the Sutras of *Vyasa*, and between the Upa and the Sutras, which are the systematising marvellous truths of the Vedanta, come divine commentary of the Vedanta. So The Upanishads, the *Gita*, and the Vyasa therefore, have been taken up by every India which wants to claim authority orthodox, whether dualist, or Vaishnav Advaitist it matters little, but the author each are these three. We find that a S Charia, or a Ramanuja, or a Madhwa Char Vallavha Charia, or a Chaitanya,—any o wanted to propound a new sect—had to these three systems and write only a ne mentary on them. Therefore it would be to confine the word Vedanta only to one which has arisen out of the Upanishads. A have been covered by the word Vedant Ramanayist has as much right to be called a ist as the Advaitist ; in fact I will go a li ther and say that what we really mean by t Hindu is the word Vedantist ; the word V will express it too. One idea more I wan note, that although these three systems h current in India almost from time imm for you must not believe that Sankara inventor of the Advaitist system ; it exis before Sankara was born ; he was one of representatives. So was the Ramanayist it existed ages before Ramanuja existe already know by the commentaries t written ; so were all the Dualistic systems existed side by side with the others, and

ট্রিবিউন, ১৭ নভেম্বর ১৮৯৭। লাহোরে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর মধ্যে 'সর্বোত্তম' বেদান্ত বক্তৃতার রিপোর্ট।

SWAMI VIVEKANAND AND DR. BARROWS.—Swami Vivekananda writes to the *Indian Mirror*, making an appeal to the Indian people to treat Dr. Barrows who is coming out to India to preach Christianity with courtesy and kindness. Dr. Barrows was the Chairman of the Chicago Parliament of religions, and it was owing to his exertions that "India, its people and their thoughts have been brought so prominently before the world" India is grateful to America and her people for the kind and courteous reception which was accorded to Swami Vivekanand and other religious preachers that followed him thither. And it is but a duty on the part of her sons to be hospitable in return. Even apart from the consideration that Dr. Barrows had shown courtesy so that he has a right to reap it, his claim to good treatment at the hands of the people of India arises, as, says the venerable Swami, he comes to us in the sacred name of religion in the name of one of the great teachers of mankind." From what Swami Vivekanand says of the motives of Dr. Barrows in coming over to India, it seems that he is a missionary of a far different and better type than any of those intolerant, biggoted and mischievous traducers of Hindu religion that abound in India. It is to be hoped therefore, that he will experience at our hands the same toleration which characterises the Hindu race. It is a pity, however, that Dr. Barrows' efforts to increase the fold of the Lord stand very slender chance of being successful. But that is entirely his look out.

ট্রিবিউনের ৬ নভেম্বর ১৮৯৭, বিবেকানন্দ ও ডঃ ব্যারোজ বিষয়ে রিপোর্ট।

EDITORIAL NOTES.

AWAKENED INDIA.—We have received a monthly called the *Prabudha Bharata* or *Awakened India*, published in the benighted presidency of Madras. The subscription is very modest only Rs. 1-8. The front page is almost picturesque. This magazine is to be conducted by three B. A.s and one M. A. B. L. The general get-up of the monthly is sufficiently attractive. A kind of stirring earnestness pervades every page of *Awakened India*. But the editor would do well to write in a less oriental style. Mr. Raju, barrister-at-law, leads with a refreshing paper on Pavitra Bharata. An anonymous writer has set before himself a more ambitious task. He is writing the elements of the Vedanta. Swami Vivekananda, who has made such a sensation in the West, writes on a singularly beautiful theme, viz. "Doing good to the world." He writes in quite a philosophical and engaging style and the incisive logic with which he treats every subject brought before him is really admirable. The following view of the world which he has taken must appeal to every man of sense.

মাদ্রাজে বিবেকানন্দ অনুরাগীদের দ্বারা প্রকাশিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' অথবা 'অ্যায়োকেনড ইন্ডিয়া' পত্রিকা প্রকাশে পুণার মরাঠা পত্রিকার মন্তব্য। ১২ জুলাই ১৮৯৬।

মাদ্রাজ, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭; দাঁড়িয়ে, বামদিক থেকে, আলাসিঙ্গা পেরুমল, জে জে গুডউইন, এম. এন. ব্যানার্জি, ও স্থানীয় ভক্তগণ। চেয়ারে বামদিক থেকে, তারাপদ (অন্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী), শিবানন্দ, বিবেকানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ। নীচে বসে (দ্বিতীয়) বিলিগিরি আয়েঙ্গার, (চতুর্থ) এম সি নানজুণ্ডা রাও।

প্রসঙ্গ: "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"

॥ এক ॥

আধুনিক ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ সেবাধর্মের প্রবর্তক—এই প্রসিদ্ধি আছে। 'সেবাধর্ম' কথাটাকে বিশেষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে, কেননা 'সেবা'—বিভিন্ন ধর্ম বা সম্প্রদায়েরও কৃত্য। খ্রীস্টান মিশনারিদের সেবাকর্মের কথা সকলেরই জানা আছে। ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ তাঁদের বিকাশপর্বে সেবাকার্য করেছেন। ঐতিহাসিকভাবে বৌদ্ধরাই সেবাকর্মের প্রবর্তন করেন। বৈষ্ণবসমাজেও সেবাপ্রয়াস দেখা গেছে। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের কাছে 'সেবা'—সন্ন্যাসের অন্যতম সাধনপন্থা-রূপে স্বীকৃত। ইদানীং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দুসমাজের কোনো কোনো ধারার বা গোষ্ঠীর মধ্যেও সেবাপ্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিচার্য, স্বামীজীর সেবাধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের সেবাকার্যের পার্থক্য আছে কিনা, থাকলে তার প্রকৃতি কি?

প্রথমেই বলে নেওয়া উচিত—সেবা যখন কার্যরূপে উপস্থিত হয় তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়কৃত সেবার বাইরের আকারগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়না। পার্থক্য যদি থাকে তা প্রধানত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেই। অর্থাৎ সেবা-রূপ কার্যের কারণের ক্ষেত্রেই পার্থক্য। সে-পার্থক্য কী?

এখানে অল্পাকারে বিষয়টি উত্থাপন করা যায়। বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবাধর্মের উৎস-বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবস্থ অবস্থার কিছু উচ্চারণ—একথা বহুকথিত। স্বামী সারদানন্দ-রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এর পঞ্চম খণ্ডের নবম অধ্যায়ে ('ঠাকুরের ভক্তসঙ্গ ও নরেন্দ্রনাথ') এ বিষয়ে কিছু বিস্তারিত তথ্য আছে।

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের কোনো সময়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দ-পরিবৃত অবস্থায় ধর্মপ্রসঙ্গ করছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রসঙ্গ উঠলে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণভাবে ঐ মতের সারমর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন:

"তিনটি বিষয় পালন করিতে নিরন্তর যত্নবান থাকিতে ঐ মতে উপদেশ করে—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর—নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্বদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে এবং কৃষ্ণেরই জগৎসংসার—একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্বজীবে দয়া (প্রকাশ করিবে)।"

সাধারণ অবস্থার এই কথাবার্তার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মুহূর্তে অসাধারণ অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন এবং উচ্চারিত হয়েছিল কিছু আশ্চর্য শব্দ যা নরেন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন:

"'সর্বজীবে দয়া' পর্যন্ত বলিয়াই তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না না—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবসেবা'।"

শ্রোতাদের মধ্যে মাত্র একজনই ছিলেন, যিনি আলোককে আলোক বলে চিনতে পেরেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "কী অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম!"

কী আলোক নরেন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন, তা স্বামী সারদানন্দ নরেন্দ্রনাথের জবানিতে উপস্থিত করেছেন। প্রথমত, তিনি পেয়েছিলেন সংসারে বেদান্তকে কর্মপরিণত করার ইঙ্গিত। বেদান্ত-সাধনা শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম বলে তদবধি কথিত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এক ঝলকে সেই ধারণার সীমাবন্ধন চূর্ণ ক'রে দেন।

"অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইলে (নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন) সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মতো দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি।... কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়।"

জীবকে শিবজ্ঞান করার বিষয়টি স্বামীজী আরো ব্যাখ্যা করেন:

"মানব যাহা করিতেছে, সে-সকলই করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল—ঈশ্বরই জীব ও জগৎ-রূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে যাহাদিগের সংস্পর্শে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান ও দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার অবসর কোথায়? ঐরূপে 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।"

স্বামীজী বলেছিলেন, পূর্বোক্ত মনোভাবে সেবা করলে ভক্তিপথেও অগ্রসর হওয়া যায়, কেননা যথার্থ ভক্তিলাভের পক্ষে সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন প্রয়োজন এবং সেবাকালে জীবকে নারায়ণজ্ঞান করতে পারলে পরম ভক্তিলাভ সহজসাধ্য হয়ে উঠতে পারে। কর্মযোগ সম্বন্ধেও একই কথা। জীব কর্ম ছাড়া থাকতে পারেনা, সেই কর্ম যদি শিবজ্ঞানে জীবসেবা হয়, তাহলে কর্মযোগী সত্বর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন। রাজযোগীও তন্নিষ্ঠ সেবার মধ্যে আত্মসমাহিত হওয়ার সহজ শক্তি অর্জন করবেন।

স্বামীজী সবশেষে ভাবোদ্দীপ্ত হয়ে বলেন:

"ভগবান যদি কখনো দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।"

শ্রীভগবান স্বামীজীকে 'দিন' দিয়েছিলেন, অথবা প্রচণ্ড আত্মশক্তিতে স্বামীজী ভগবানের কাছ থেকে সেই 'দিন' আদায় ক'রে নিয়েছিলেন! তাঁর এক মুখ সহস্র মুখ হয়ে এই বার্তা ঘোষণা করেছে শঙ্খকণ্ঠে। ভারতীয় ধর্ম-দর্শনশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ দানরূপে স্বীকৃত 'কর্মপরিণত বেদান্ত' ('Practical Vedanta') বিষয়ক ধারাবাহিক বক্তৃতাগুলির কথা এই সূত্রে স্মরণ করতে পারি। নিজ ভোগস্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট বৈদান্তিকরা পারমার্থিক ও ব্যাবহারিকের মধ্যে যে ভেদরেখা টেনে রেখেছিলেন, স্বামীজী নিজ প্রতিভায় তা মুছে দিয়ে বেদান্তকে সর্বোচ্চ নীতিধর্ম ও কর্মপদ্ধতিরূপে উপস্থাপন করেন। এদেশীয় সমাজ-সংস্কারকগণ এবং তাঁদের আদর্শমূর্তি বিদেশীয় ধর্মধারিগণ বেদান্তকে জগৎ-বিমুখ বলে যে ধারাবাহিক প্রচার চালিয়ে গেছেন—তার বিরুদ্ধে স্বামীজী উপযুক্ত উত্তর দিয়েছেন এই বক্তৃতাবলীতে এবং প্রাসঙ্গিক নানা উক্তিতে। এইখানেই তত্ত্বত প্রমাণিত হয়েছে—ধর্ম কেবল উপাসনাগৃহে নয়—কলকারখানা, কৃষিক্ষেত্র, গৃহাঙ্গন-সহ সর্বত্র উপলব্ধির পথ-রূপে বর্তমান। প্রমাণিত হয়েছে, ঐহিক ও আধ্যাত্মিকে মূলগত পার্থক্য নেই। প্রমাণিত হয়েছে, 'জীবনই ধর্ম'—'Life is itself religion'—যেকথা ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীর ভূমিকায় অনবদ্য ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করেছেন। নিবেদিতা যে নিজের মতো ক'রে স্বামীজীর ব্যাখ্যা করেন নি (যেমন সমালোচনা কোথাও কোথাও শোনা যায়), তা দেখা যাবে 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত' সম্বন্ধীয় স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতাটির (লন্ডনে প্রদত্ত, ১০ নভেম্বর ১৮৯৬) একেবারে প্রথম অনুচ্ছেদের কিছু অংশ পাঠ করলে:

"If it be absolutely impracticable, no theory is of any value whatever, except an intellectual gymnastics. The Vedanta, therefore, as a religion, must be intensely practical. We must be able to carry it out in every part of our lives. And not only this, the fictitous differentiation between religion and the life of the world must vanish, for the Vedanta teaches oneness—one life throughout. *The ideals of religion must cover the whole field of life, they must enter into all our thoughts, and more and more into practice.*"

॥ দুই ॥

ভাবস্থ অবস্থায় কথিত শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অসামান্য উক্তি প্রসঙ্গে ফেরা যাক। আপাতভাবে মনে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণবদের 'জীবে দয়া' তত্ত্বটিকে ধিক্কার দিয়েছেন। এর ফলে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের মনে আঘাত লাগতে পারে।

দ্বিতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণভাবে বৈষ্ণবদের পালনীয় আদর্শ বিষয়ে যে-কথা ন—নাম-নামী, ভক্ত-ভগবান, কৃষ্ণ-বৈষ্ণবকে অভেদ-জ্ঞান ক'রে বৈষ্ণবরা

ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা-পূজা-বন্দনাদি করবেন—তাঁর সেই কথাগুলিও কি নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের কাছে গ্রাহ্য হবে? তাঁরা তো ভক্ত-ভগবানকে কদাপি অভেদজ্ঞান করতে প্রস্তুত নন!

তৃতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উক্তিতে অবশ্য আপত্তি উঠবে না বলেই মনে হয়। অনেক সময়ে দয়া করা হয় সামাজিক বা আর্থিক উচ্চাসনে বসে। সেখান থেকে কৃপাবর্ষণতুল্য দয়া ব্যাপারটি সঙ্গতভাবেই ধিক্কারযোগ্য—'তুই কীটাণুকীট' ইত্যাদি।

চতুর্থত, 'কথামৃত'-এর অন্যত্র দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ 'দয়া'-কে খুবই উচ্চাসন দিয়েছেন। যথা—বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি। বিদ্যাসাগর যদিও ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল নন, কিন্তু দয়া করেন মানুষকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: "ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ করছে, সে খুব ভাল। দয়া খুব ভাল। দয়া আর মায়া অনেক তফাত। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আত্মীয়ের ওপর ভালবাসা—স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, ভাইপো, ভাগনে, বাপ, মা—এদেরই ওপর। **দয়া সর্বভূতে সমান ভালবাসা।**" (স্থূলাক্ষর লেখক-কৃত)

শ্রীম যখন প্রশ্ন করেছিলেন: "আচ্ছা, দয়াও কি একটা বন্ধন?" তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তীক্ষ্ণভাবে বলেন: "সে অনেক দূরের কথা। দয়া সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজস্তমঃ—তিন গুণের পার। প্রকৃতির পার।"[১] অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের ঠিক নিচের স্তরেই শ্রীরামকৃষ্ণ সত্ত্বগুণাত্মক দয়াকে স্থাপন করলেন।

এখানে 'দয়া' প্রসঙ্গে বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কটাক্ষ করেছেন কিনা সেই সূত্রে বলে নেওয়া যায়, 'কথামৃত' অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বরাবতার বলে বারবার ঘোষণা করেছেন, তিনি গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা থাকতেন, বৈষ্ণব-ভাবাশ্রিত ভক্তিযোগকে জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ অপেক্ষা গৃহীদের পক্ষে অবলম্বনীয় পন্থা বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং তাঁর বৈষ্ণব-ভাবমগ্ন অবস্থার বর্ণনা 'কথামৃত'-এর বড় অংশ জুড়ে আছে।

তবু "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি থেকে বৈষ্ণববিরোধী ভাবের কথাটা যায়না। স্বয়ং স্বামীজী, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মগত উচ্চারণ থেকে ঐ মহাবাণী আহরণ করেছিলেন, তিনি একইসঙ্গে বুঝেছিলেন—এক্ষেত্রে বিতর্ক উঠতে পারে। তাই ব্যাপারটির মীমাংসা করেছেন একটি চিঠিতে, যাতে স্পষ্টভাবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের এবং তাঁর মতবাদের উল্লেখ আছে। তাঁকে আরো সতর্ক হতে হয়েছিল এইজন্য যে, ভবিষ্যতে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" কথাগুলি ব্যবহৃত হতে হতে চলতি বুলি হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং অনেকের পক্ষেই সামান্য পরোপকার-কর্ম ক'রে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" করছি—এই আত্মপ্রসাদে বুঁদ হয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবীতে বহু মহাবাণীর এই দুর্দশা ঘটেছে।

স্বামীজী আলমোড়া থেকে ৩ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে 'শিষ্য' শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে সংস্কৃতে একটি চিঠি লেখেন, তার মধ্যে এই প্রসঙ্গটি আছে। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত দয়া-তত্ত্বের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত সেবা/প্রেম-তত্ত্বের পার্থক্য বুঝিয়েছিলেন। সেই পত্রের কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে:

"সর্বেশ্বর যিনি, তিনি ব্যক্তিবিশেষ হইতে পারেন না, তিনি সকলের সমষ্টিস্বরূপ।...তিনি সমষ্টিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ। অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপত অভিন্ন, তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম—দুই একই। বিশেষ এই, **জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয়**

তাহা দয়া—প্রেম নহে; আর আত্মবুদ্ধিতে যে জীবের সেবা করা হয় তাহা প্রেম। আত্মা যে সকলেরই প্রেমাস্পদ তাহা শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ—সর্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে। এইজন্যই ভগবান্ শ্রীচৈতন্য যে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়া করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত। দ্বৈতবাদী ছিলেন বলিয়া তাঁহার এই সিদ্ধান্ত—যাহা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সূচনা করে, তাহা সমীচীনই হইয়াছে। অদ্বৈতনিষ্ঠ আমাদের কিন্তু জীববুদ্ধি বন্ধনের কারণ। অতএব আমাদের অবলম্বন প্রেম—দয়া নহে। জীবে প্রযুক্ত 'দয়া' শব্দও আমাদের বোধহয় জোর করিয়া বলা মাত্র। আমরা দয়া করিনা, সেবা করি। কাহাকেও দয়া করিতেছি, এ অনুভব আমাদের নাই। তৎপরিবর্তে আমরা সকলের মধ্যে প্রেমানুভূতি ও আত্মানুভব করিয়া থাকি।" (পত্রাবলী, ৪র্থ সং, ১৯৭৭, পৃ. ৫৬৪-৫৬৫)

॥ তিন ॥

সেবা-'ধর্মে'র উৎস-চরিত্রদের জীবন থেকে কিছু দৃষ্টান্ত আহরণ করা যাক। প্রথমেই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ।

কাশীপুরের বাগানবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের তখন বাড়াবাড়ি অসুখ। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁকে দেখতে এসে বললেন, ঠাকুরের ন্যায় সিদ্ধসঙ্কল্প পুরুষ ইচ্ছা করলেই শারীরিক ব্যাধি দূর করতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বলেছিলেন: "তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি ক'রে বললে গো? যে-মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙা হাড়-মাসের খাঁচাটার ওপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?"

শ্রীরামকৃষ্ণ শশধরকে এড়িয়েছিলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথকে পারেন নি। নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "মাকে বলুন সারিয়ে দিতে, তিনি আপনার কথা শুনবেনই শুনবেন।" এখন, 'নরেন্দর'-এর তাগিদ, ধরা না-দিয়ে উপায় নেই। পরবর্তী ঘটনা 'লীলাপ্রসঙ্গ'তে এইপ্রকার:

"কয়েক ঘণ্টা পরে শ্রীযুক্ত স্বামীজী পুনরায় ঠাকুরের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মশায়, বলেছিলেন? মা কি বললেন?'

"ঠাকুর—মাকে বললুম (গলার ক্ষত দেখাইয়া), 'এইটের দরুন কিছু খেতে পারিনা। যাতে দুটি খেতে পারি ক'রে দে।' তা মা বললেন—তোদের সকলকে দেখিয়ে—'কেন? এই যে এত মুখে খাচ্চিস!' আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না।"[২]

স্বামী সারদানন্দ সঙ্গতভাবে ব্যাপারটিকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'দেহবুদ্ধির অভাব' এবং 'অপূর্ব অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান' বলে নির্ণয় করেছেন। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সিদ্ধান্ত করেছেন—ঐ অদ্বৈতজ্ঞানই স্বামীজীর সাম্যবাদের উৎস। অবশ্যই সেকথা সত্য। ততোধিক বলা যায়, সেবাধর্মের দিক দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি দেখিয়ে দিয়েছিল, অদ্বৈতভাবাবিষ্ট তিনি সর্বতোমুখ—সেজন্য সমষ্টির সেবাতেই আত্মসেবা হয়।

শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে এই সেবা নিরন্তর বহমান, তারই মধ্য থেকে একটি কাহিনী উপস্থিত করা যাক। জয়রামবাটীর কয়েক ক্রোশ ব্যবধানে ময়নাপুর গ্রামে

'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'র রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেনের বাস। সেখান থেকে তিনি এক বয়স্কা বাগদী নারীকে দিয়ে কিছু জিনিস পাঠিয়েছেন মায়ের কাছে। বৃদ্ধা দুপুরে হাজির হয়েছিল। স্নানাহার সারতে তার বেলা হয়ে যায়। মা তাকে রাত্রে থেকে যেতে বলেন। মায়ের শয়নঘরের দরজার সামনে বারান্দায় তার শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর—

"[মেয়েটি] ম্যালেরিয়ার রোগী, অনেক দূর হাঁটিয়া বোঝা বহিয়া আসিয়াছে, বিশেষ ক্লান্ত—রাত্রে আবার একটু জ্বরও হইয়াছে। বেহুঁশের মতো পড়িয়া রহিল। মা ভোররাত্রেই উঠেন—বরাবরের অভ্যাস। আজ দরজা খুলিয়াই বুঝিলেন, মেয়েটি অসাড়ে বিছানা নোংরা করিয়া ফেলিয়াছে। কি উপায়! প্রাতে উঠিয়া অন্যেরা টের পাইলেই তাঁহার দুঃখিনী মেয়ের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একশেষ হইবে। ভাবিয়া মায়ের চিত্ত ব্যাকুল হইল। মেয়েটি তখনও ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন, মা ধীরে ধীরে তাহাকে জাগাইলেন। মিষ্ট কথায় প্রবোধ দিয়া, চুপি চুপি জলপানির জন্য মুড়ি-গুড় হাতে দিয়া বলিলেন, 'মা, তুমি সকাল সকাল বেরিয়ে গেলে রোদে কষ্ট হবে না।' সে সন্তুষ্টচিত্তে প্রণামান্তর বিদায় নিলে মা স্বহস্তে সব পরিষ্কার করিলেন। গোবর-মাটি দিয়া বারান্দা লেপিলেন, চাটাইখানি ভাল করিয়া ধুইয়া পুকুরের পাড়ে মেলিয়া দিলেন। কেহই কিছু টের পাইল না।"[৩]

না, সকলের চোখ এড়ানো সম্ভব হয়নি। জনৈকা প্রৌঢ়া ভক্ত-মহিলা পরদিন বারান্দায় কে ন্যাতা দিয়েছে, সন্ধান ক'রে সব জানতে পেরেছিলেন।

ব্রাহ্মণঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা নারী সারদাদেবী, জাতিভেদে বিশ্বাসী কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক গ্রাম্য পরিবেশে বাস করছেন, তিনি এক বাগদী নারীর মলমূত্রমাখা বিছানা স্বহস্তে পরিষ্কার করছেন—পরমাশ্চর্য বটে! কিন্তু তার পিছনে কোন্ শক্তি ছিল? অবশ্যই তিনি মাতা এবং উক্ত বাগদিনী তাঁর কন্যা। তদুপরি অসীম প্রেমপারাবার তিনি—যে-প্রেম স্বামীজী-কথিত অদ্বৈতবুদ্ধি থেকেই আসতে পারে। তিনি কি অনুভব করেন নি, উক্ত নারী তিনিই—অন্যরূপে।

স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়-মঠে কার্যরত সাঁওতাল মিতা কেষ্টা ও তাঁর সঙ্গীদের একদিন ভূরিভোজ করিয়ে বলেছিলেন: "তোরা যে নারায়ণ; আজ আমার নারায়ণের ভোজ দেওয়া হলো।"[৪]

স্বামী অখণ্ডানন্দ তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ, তবু বহরমপুরের সারগাছি আশ্রম ছেড়ে বেলুড়মঠে আসতে চাইতেন না। তাঁর এক অপূর্ব উক্তি—"এবার প্রভুর আগমন পর্ণকুটীরে।" ঐ অঞ্চলের মহুলা গ্রামেই তাঁর উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সংগঠিত সেবাকাজের সচনা। তিনি মনে করতেন, স্বামীজী তাঁকে সাধারণ মানুষের সেবা করতেই গ্রামে পাঠিয়েছেন।

"অখণ্ডানন্দের মনের অবস্থা এমনই হইয়াছিল যে, তিনি পথে অন্নবস্ত্রহীন মলিন বালক দেখিলেই তাহাকে সস্নেহে আশ্রমে লইয়া আসিতেন। তাহার গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া, তেল মাখাইয়া, সাবান দিয়া গরম জলে স্নান করাইতে করাইতে গভীর ভাবের সহিত নারায়ণের স্নানমন্ত্র 'পুরুষসূক্ত' উচ্চারণ করিতেন:

'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বতঃ স্পৃষ্টা অত্যাতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ '"

॥ চার ॥

কিন্তু কী কঠিন জীবে সত্যকার ঈশ্বরজ্ঞান! বিদ্যাসাগরের মতো মহাপ্রাণ মানুষকেও জ্বলে-পুড়ে বলতে হয়েছিল—কি বললে, লোকটি আমার নিন্দা করছিল? কই, আমি তো তার উপকার করেছি বলে মনে পড়ছে না! বাস্তব জগতে স্বামীজী স্বয়ং কি মানুষের কদর্য চেহারাটা দেখেন নি? অবশ্যই দেখেছিলেন এবং তার বিকট রূপ তিনি তুলে ধরেছেন অন্য কোথাও নয়, একেবারে সেই কবিতাটির মধ্যে, যার শেষাংশে আছে সেবাধর্মের গায়ত্রী মন্ত্র—"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়" ইত্যাদি। ঐ 'সখার প্রতি' কবিতার প্রথমাংশে তিনি 'জীবে প্রেম'-বোধের পরিপন্থী বাস্তব সংসারের চেহারাটা খুলে ধরেছেন। বলেছেন—এই পৃথিবী স্বার্থময়, সে-স্বার্থের রূপ এমনই যে—

"দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান;
স্বার্থ স্বার্থ—সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার?"

এহেন সংসারে স্থান পেতে হলে—

"হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল,
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ—"

পৃথিবীতে উচ্চমনা মানুষের ভাগ্যে জোটে কেবল দুঃখ—

"যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়,
হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান।"

দারুণ আঘাতের সম্মুখীন হয়েও মানুষ যদি একটি বিশেষ সত্যকে জীবনময় ক'রে তুলতে পারে, তবেই সে সত্যকার সুখলাভ করতে পারে—

"মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম; প্রেম প্রেম—এইমাত্র ধন।"

প্রেম আছে বলেই মা ছেলের জন্য প্রাণ দেয়, দস্যু তার স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে হরণ বা হনন করে, এবং ভয়ঙ্করী 'মৃত্যুরূপা কালী'কে মানুষ 'মাতৃরূপা' বলে আবাহন ক'রে আনে।

সুতরাং স্বীকার করো সর্বাত্মক জীবনকে, পালিও না, বাস্তবের মুখোমুখি হও একটি পরম অস্ত্র সম্বল ক'রে—যার নাম প্রেম—

"পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার,
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম?

ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল,
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।"

স্বামীজীর কাছে প্রেমের জন্যই প্রেম। তার চরম রূপ—পতঙ্গের অগ্নিপ্রেম—মৃত্যুই যার পরিণতি।

এরপরেই এসে গেছে মহামন্ত্রবাণী—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার" ইত্যাদি।

॥ পাঁচ ॥

নিঃস্বার্থ প্রেমময় সেবার রূপ স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'র সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। নিঃস্বার্থ বলেই ঐ সেবা অসাম্প্রদায়িক। আকাশের স্বর্গরাজ্য বা মর্তের স্বর্গরাজ্য—কোনো প্রলোভনের হাতছানি যুক্ত নেই এই সেবার সঙ্গে। সেই কারণে সেবাধর্মী রামকৃষ্ণ মিশন সেবার সূত্রে ধর্মান্তরকরণের বিরোধী। স্বামী অখণ্ডানন্দ দুর্ভিক্ষের জন্য অনাথ মুসলমান বালককে অনাথ আশ্রমে নেওয়া হবে কিনা প্রশ্ন ক'রে পাঠালে স্বামীজী ১০ অক্টোবর ১৮৯৭ তারিখে লিখে পাঠিয়েছিলেন—
"মুসলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না। তাহাদের খাওয়া-দাওয়া আলগ্ করিয়া দিলেই হইল এবং যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এইপ্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম—জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখ।"

সেবার সঙ্গে ধর্মান্তরকরণকে যুক্ত ক'রে যে ব্যাপক প্রয়াস বিশেষ-বিশেষ ধর্মের পক্ষ থেকে এখন ভারতবর্ষে চলছে এবং তার ফলে যে-সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাত ক্রমেই প্রবলাকার ধারণ করছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে, রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ হিসাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ অনেক আগেই ১৯১০-এর মার্চ মাসে মাদ্রাজের 'ইন্ডিয়ান রিভিউ' পত্রিকায় যে-বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তার মধ্যে আছে—

"It [The Ramakrishna Mission] lays the greatest emphasis upon the practice of religion... It exhorts every man to stick to his religion in which he is born... **Hence proselytism is what it altogether denounces.**" (স্থূলাক্ষর লেখক-কৃত)

বলা বাহুল্য, এখানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী-নির্ধারিত নীতির পুনর্ঘোষণাই করেছেন। অধিকন্তু বলা যায়, স্বামীজী একইসঙ্গে প্ররোচনার বশবর্তী হয়ে যে-মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছে, সে জন্মগত ধর্মে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে তাকে পুনর্গ্রহণের বিরোধী ছিলেন না।

॥ ছয় ॥

বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবাধর্মের বিস্তৃত পরিধির কথাও এই সূত্রে এসে যায়। সেবা সাময়িক ও স্থায়ী—দুই-ই। আপৎকালে সাময়িক সেবা—প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদির সময়ে যা করা হয়—যথা তাৎক্ষণিক অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসার ব্যবস্থাদি। আর গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ কিংবা রোগাক্রান্তদের জন্য হাসপাতাল স্থাপনাদি স্থায়ী সেবাপ্রকল্পের মধ্যে পড়ে।

সর্বোপরি আছে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থাপনা। ক্ষুধিতকে কেবল মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে গেলে অন্নসমস্যার সমাধান হয়না। স্বামীজী বলেছিলেন, সারা পৃথিবীর ধনরাশি একটি গ্রামে ঢেলে দিলেও তার দারিদ্র্য দূর হবেনা। কাউকে অবিরাম ভিক্ষা দিয়ে গেলে সে স্থায়ী ভিক্ষুকে পরিণত হবে। মানুষকে অর্জন করবার উপযোগী অবস্থায় পৌঁছে দেওয়াই সত্যকার শিক্ষা। দারিদ্র্য কেবল শরীরের নয়, মনেরও। সেইজন্য স্বামীজীর সেবাদর্শে মনোনিরাময়ের বিধানও আছে। তাকে তিনি আত্মচেতনার বিকাশ বলেছেন, যা জীবনসংগ্রামের উপযোগী ক'রে তুলবে মানুষকে। সেইজন্য যখন তিনি প্রথম আমেরিকায় পাড়ি দেন তখন তাঁর উদ্দেশ্যের অন্যতম ছিল ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশা দূরীকরণের জন্য শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগী অর্থসংগ্রহ। শিক্ষাকে স্বামীজী কর্মসংস্থানের উপায়ের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।

স্বামীজীর সেবাদর্শ কিভাবে 'মানুষ তৈরি'র সাধনার রূপ ধরেছিল, সেই বিস্তৃত প্রসঙ্গের মধ্যে প্রবেশের স্থান এখানে নেই।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ অসাধারণ কয়েকটি শব্দের আলোক ফেলেছিলেন সেবাধর্মের মহিমার ওপরে। কাশীর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সম্বন্ধে তিনি যেকথা বলেছিলেন, তা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা সম্পর্কে সমগ্রত ব্যবহার্য। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন:

"সেবাশ্রম বিরাটের উপাসনামন্দির।"

শব্দটি 'বিরাট'। সেবার দ্বারা অর্চনা করা হয় সেই বিরাটের। সেই বিরাট কী? স্বামী বিবেকানন্দ তার রূপনির্ণয় করেছেন নানা স্থানে—

"বিরাট রূপ এই জগৎ—তার পূজা মানে তার সেবা। এর নাম কর্ম।" ('বাণী ও রচনা', ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৮)

"প্রেম সমগ্র বিশ্বকে আপনার গৃহসদৃশ ক'রে নেয়।" (ঐ, পৃ. ১০৯)

"আমাদের মহা জগন্নাথপুরী—যথায় পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী সকলের সমান অধিকার।" (ঐ, পৃ. ২৭৫)

"যাঁর জীবন বিশ্বব্যাপী, তিনিই জীবিত। জীবনকে যত সীমাবদ্ধ করা যায় ততই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয় মানুষ। জগতে কোনও একজনও জীবিত থাকলে তার মধ্যে জীবিত আছি আমি।" (ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২)

"আমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে পূজা করতে চাই। ঈশ্বরের সন্ধানে কোথায় ধাবিত তোমরা? যদি তাঁর সন্ধান না পাও নিজের হৃদয়ে এবং প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে, যদি তাঁকে দেখতে না পাও ঐ লোকটির মধ্যে মাথায় মোট নিয়ে গলদ্ঘর্ম হয়ে যে চলেছে পথে, তাহলে

কোথায় পাবে তাঁকে?... নিশ্চয় জেনো, সৃষ্টির সবকিছু মন্দির, আর শ্রেষ্ঠ মন্দির এই মানব-দেহ—মন্দির-মধ্যে তাজমহল।" (ঐ, পৃ. ২৪৯-২৫১)

"আমাদের সামনে রয়েছে আলোকিত বিশ্বজগৎ—তার প্রতিটি বস্তু আমাদের। বাহু প্রসারিত ক'রে আলিঙ্গন কর প্রতিটি বস্তুকে। ঐশ্বরিক অনুভূতি ঐ চেষ্টারই সাফল্য ছাড়া আর কিছু নয়।" (ঐ, পৃ. ২৫৩)

'বিরাট' শব্দটির সূত্রে স্বামীজীর একটি চমকপ্রদ ভবিষ্যৎবাণীর কথা এসে যায়, যেটি আক্ষরিকভাবে সফল হয়েছে এবং তার জন্য অনুরাগীরা উল্লসিত এবং বিরোধীরা 'ওরকম কত কথা মিলে যায়, তা নিয়ে বেশি উৎসাহ ভাল নয়'—ইত্যাদি জল-ঢেলে-দেওয়া কথাবার্তা বলে থাকেন। ভবিষ্যৎবাণীটি সুপরিচিত। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের একমাত্র দেবতা হউন—অন্যান্য অকেজো দেবতাকে এই কয়েক বৎসর ভুলিলে ক্ষতি নাই।" সত্যই পঞ্চাশ বৎসর পরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল। সুতরাং ঘটনাটিতে বিস্ময়বোধ করার স্বাভাবিক উপাদান আছেই। স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা মরণপণ আন্দোলনকালে আশা-সঞ্জীবনী হিসাবে স্বামীজীর ঐ কথাগুলিকে উচ্চারণ করতেন।

কিন্তু পূর্বাপর অংশ-বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত উচ্চারণের বিপদ আছে। সেই বিপদ ঘটেছে স্বাধীনতালাভকালে—ভারতবর্ষ খণ্ডিত হওয়ায়। স্বাধীন ভারতেও পুনরায় খণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কা ঘনাচ্ছে স্বামীজীর পরবর্তী কথাগুলি অনুধাবন না করায়, অথবা সেগুলিতে গুরুত্ব না দেওয়ায়।

লক্ষ্য করার বিষয়, স্বামীজী কেবল ভারতবর্ষকে ভূমিরূপা মাতা বলে অর্চনা করতে বলেননি—তিনি ভারতবর্ষকে মনুষ্যসন্তান-সমন্বিতা মাতৃরূপে অর্চনা করতে বলেছিলেন। ভারতবর্ষের উপাসনা মানে ভারতবাসীর সেবা। বিরাট শব্দটি অতঃপর এসে গিয়েছিল।

ওপরে উদ্ধৃত কথাগুলির পরে স্বামীজী বলেছিলেন:

> "অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন। **তোমার স্বজাতি এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত। সর্বত্র তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন।** কোন্ অকেজো দেবতার অন্বেষণে তুমি ধাবিত হইতেছ—**আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে-দেবতাকে দেখিতেছ—সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না?** যখন তুমি এই দেবতার উপাসনায় সমর্থ হইবে তখনই অন্যান্য দেবতাকে পূজা করিবার ক্ষমতা তোমার হইবে।...
>
> "**প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা।**" (স্থূলাক্ষর লেখক-নির্দেশে)

রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষভাবে জড়িত যাঁরা, তাঁদের উদ্দেশেও তিনি একই কথা বলেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের এক প্রধান নেতা, যিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে গ্রামবাসীকে দেশকর্মে উদ্বোধিত করতে পেরেছিলেন, সেই সুবিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে স্বামীজীর এই বিষয়ক কথাবার্তা মনে রাখার মতো। ১৮৯৭ সালে আলমোড়ায়

অবস্থানকালে অশ্বিনীকুমার জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্বন্ধে স্বামীজীর মত জানতে চেয়েছিলেন। সেকালের কংগ্রেস ব্রিটিশ প্রভুদের কাছে আবেদন-নিবেদনের ফিরিস্তি পেশ করার মধ্যেই কার্যাবলীকে আবদ্ধ রেখেছিল। স্বামীজী অশ্বিনীকুমারকে বলেন:
"আপনি কি মনে করেন, গোটা কয়েক প্রস্তাব পাস করালেই স্বাধীনতা এসে যাবে?... আগে তারা পেটভরে খেতে পাক, তারপর নিজেরাই নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে নেবে।... জনসাধারণ যেন মানুষ গড়ার শিক্ষা পায়।... আর অচ্ছুত, মুচি, মেথর ও তাদের মতো সকলের কাছে গিয়ে বলুন, 'তোমরাই তো জাতির প্রাণ, তোমাদের মধ্যে এমন অসীম শক্তি আছে যা দুনিয়াকে উলটে দিতে পারবে।'"

অর্থাৎ সেবার উদ্দেশ্য—সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব সৃষ্টি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'বিবেকানন্দের সাধনফল' রচনায় রামকৃষ্ণ মিশনের তরুণ সন্ন্যাসীদের সেবাসাধনার দ্বারা যে সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা বিলুপ্ত হতে পারে, তা বিশেষভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন: "যেসকল শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের নেতাস্বরূপ হইয়া ভারতবর্ষে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনার্থ নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, সেই মহৎ কার্য এইসকল বালকের [অর্থাৎ তরুণ সেবকদের] দ্বারাই সুসম্পন্ন হওয়া একমাত্র সম্ভব। মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান, পারসি, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ধর্মাবলম্বী বিবিধ জাতি ইহাদের অদ্ভুত সেবা-দৃষ্টে পরস্পর জাতীয় বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে নিশ্চয় বাধ্য হইবে। 'সেবাশ্রম'-ভুক্ত সেবাগ্রাহিগণ যে-জাতিই হউক, সেবাশ্রমে আসিয়া বুঝিবেন যে, এইসকল বালকের তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব নাই। কারণ, সেব্য ও সেবকদিগের ভিতরে বর্ণগত, জাতিগত এবং ধর্মগত প্রভেদ থাকিলেও ইহারা তাঁহাদিগকে সমভাবে সেবা করে।... প্রেমের অদ্ভুত প্রভাবে প্রেমদৃষ্টে প্রেমলাভ হয়। এই অদ্ভুত সেবায় সেবকের প্রেমদৃষ্টে যিনি সেবা পাইয়াছেন, তাঁহারও হৃদয়ে ঐরূপে প্রেমের উদ্দীপনা হইয়া নিশ্চয়ই তাঁহার জাতিগত, ধর্মগত বিদ্বেষ—উচ্চ দৃষ্টান্তে মলিন হইবে।"[৩৯]

॥ সাত ॥

সেবার মধ্যে যোগসমন্বয় ঘটেছে। সেবা প্রত্যক্ষে কর্মযোগ। কিন্তু ভক্তি না থাকলে কি কেউ ঈশ্বরে সর্ব কর্মফল অর্পণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়? জ্ঞান না থাকলে কি কেউ সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন ক'রে কর্মে প্রবৃত্ত হয়? কি কেউ উপযুক্তভাবে কর্মসাধন করতে পারবে যদিনা সে যোগের একাগ্রতা লাভ করে?

স্বামীজীর গুরুভাইদের মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ এই সেবাধর্মকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শপ্রাপ্ত—তাঁর সিদ্ধির সম্বন্ধে তাই সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বামীজীর শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে নিবেদিতা, ক্রিস্টিন, সেবাকে জীবনধর্ম করেছিলেন। সদানন্দ, শুভানন্দ, কল্যাণানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ প্রমুখরাও তাই। ত্যাগে, তপস্যায় জ্বলন্ত এঁদের জীবন যে বাঞ্ছিত ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েছিল, তা আমরা ধরে নিতে পারি। সমগ্র রামকৃষ্ণ সংঘের পক্ষে একজনের ক্ষেত্রে তা লিখিতভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। স্বামীজীর মরাঠি সৈনিক-শিষ্য নিশ্চয়ানন্দ তাঁর গুরুভাই কল্যাণানন্দের সঙ্গে কনখলে দীর্ঘকাল সেবাকাজ

করেন। স্তম্ভিত করার মতো তাঁদের সেবাকাহিনী। কনখল থেকে হৃষীকেশের দূরত্ব ১৮ মাইল। নিশ্চয়ানন্দ প্রতিদিন ভোরে কনখল থেকে পায়ে হেঁটে হৃষীকেশ যেতেন চিকিৎসাদি করবার জন্য। দুপুরে একবার ধর্মশালায় ভিক্ষা নিতেন, তারপর পায়ে হেঁটে ঘনরাত্রিতে কনখলের আশ্রমে ফিরতেন। প্রতিদিন ৩৬ মাইল হেঁটে তাঁর এই সেবাকাজ চলেছিল বছরের পর বছর। তাঁর দেহত্যাগের পরে রামকৃষ্ণ সংঘের মুখপত্র 'উদ্বোধন'-এ লেখা হয়:

"স্বামীজী-প্রচারিত নরনারায়ণের সেবা দ্বারা তিনি সেই পদ লাভ করিয়াছেন, যে-পদ জ্ঞানীরা বিচারের দ্বারা, ভক্তেরা ভজনা দ্বারা এবং যোগীরা ধ্যান দ্বারা লাভ করেন।" (স্থূলাক্ষর লেখক-নির্দেশে)

কেবল নিশ্চয়ানন্দ নন—নিশ্চয়ানন্দগণ—নির্মাণ করেছিলেন সংঘশরীর। প্রত্যক্ষদর্শী মনস্বিপুরুষ মহেন্দ্রনাথ দত্ত সেই কথাই লিখেছেন:

"কথিত আছে, পুরাকালে দধীচি মুনি নিজের অস্থি দিয়া দেবতাদিগের হিতসাধন করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের এইসকল কর্মীও ইষ্টকের পরিবর্তে নিজেদের অস্থি-কঙ্কাল দিয়া, চুন-সুরকির পরিবর্তে মজ্জা দিয়া এবং জলের পরিবর্তে হৃদয় ও গাত্রের তপ্ত শোণিত দিয়া, রামকৃষ্ণ মিশনের হর্ম্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। যদি নিরপেক্ষ হইয়া সমালোচনা করা যায়, তাহা হইলে স্বামীজী-প্রণোদিত এইসকল কর্মী পুরাকালের দধীচি মুনি হইতে কোন অংশেই ন্যূন হইবেন না।'"[৭]

অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা এবং দারুণ বিপদের মধ্য দিয়া সেবাকাজ রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা ক'রে গেছেন। তা করেছেন কিন্তু পরম আনন্দে। স্বামীজী যা চেয়েছিলেন—তাই হয়েছিল। ক্রুশকাঠ কাঁধে নিয়ে রক্তাক্ত দেহে তাঁরা আনন্দেই পথ চলেছিলেন। জার্মান দার্শনিক কাউন্ট কাইজারলিং কাশীতে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কর্মরত কর্মীদের দেখে লিখেছিলেন: "আমি কদাপি কোনও হাসপাতালে এমন উৎফুল্ল পরিবেশ দেখিনি।... [কর্মীরা] সত্যই ঈশ্বর-উদ্দীপিত রামকৃষ্ণের যথার্থ অনুগামী। ভালবাসায় পূর্ণ তাঁরা, অথচ সহজ বুদ্ধিসম্পন্ন—মোটেই ধর্মান্ধ অথবা জেদী নন। মানববন্ধুর যা হওয়া উচিত তাঁরা ঠিক তাই।"[৮]

আনন্দে ছিলেন তাঁরা—কারণ তাঁরা ছিলেন সেবা-মহোৎসবে। 'সেবা-মহোৎসব' কথাটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের। "জগন্নাথের রথ চলিল—উঠেছে জয়রব,/ উদ্বোধিত চিত্ত, আজি সেবা-মহোৎসব।"—কবি লিখেছিলেন।

প্রেরণার মুহূর্তে কবিরা সত্যের স্পর্শ পান।

উল্লেখপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন সং, ১৪০২।
২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ১ম ভাগ—গুরুভাব: পূর্বার্ধ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০০, পৃ. ৪০-৪১।
৩. স্বামী সারদেশানন্দ—শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৩য় সং, ১৩৯৫, পৃ. ৫০।
৪. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৩৮৩, পৃ. ২৩৫।

৫. স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ প্রণীত, উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় সং, ১৩৮৯, পৃ. ১৪১।
৬. শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও বিমলকুমার ঘোষ সম্পাদিত—'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ', মণ্ডল বুক হাউস, ২য় সং, ১৩৮৯, পৃ. ১০০।
৭. মহেন্দ্রনাথ দত্ত—স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান, ২য় সং, ১৩৬২, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, 'প্রাগ্বাণী'।
৮. শঙ্করীপ্রসাদ বসু—বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৪।

[উদ্বোধন পত্রিকার ১৪০৭ ফাল্গুন এবং চৈত্র এই দুই সংখ্যায় প্রকাশিত]

সৈনিক সন্ন্যাসী

তিনি সৈনিক হতে পারতেন, কিংবা সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীই হলেন। কিন্তু গৈরিকের দ্বারা আবৃত করতে পারলেন না সৈনিককে, চাইলেনও না। সন্ন্যাসের অপূর্বতম সংজ্ঞা পেলাম—"সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে ভালবাসা।" পেলাম গৈরিকের মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা—"আমাদের এ গৈরিক যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা।"

ভারতবর্ষের বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

১৮৮৭, বরাহনগর-মঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের সত্তার সন্তানেরা প্রস্তুত হচ্ছেন একটি ভাঙা বাড়ির মধ্যে, ছিন্নবাসে, অর্ধাহারে, শ্রীরামকৃষ্ণের রেজারেকশনের জন্য। বুদ্ধের করুণা, শঙ্করের জ্ঞান, চৈতন্যের প্রেম—এই মহা-ত্রিবেণীতে রচিত হোক ভারতের নবতীর্থ—তারই সাধনা। কিন্তু কোথায় কৃষ্ণ কিংবা অর্জুন—সেই প্রজ্ঞা ও শক্তির সম্মিলন, যা নির্জীব দেশের একান্ত প্রয়োজন? সুতরাং গীতার কর্মবাদ, তার সঙ্গে এল গিবনের 'রোমের উত্থান-পতনের কাহিনী' এবং কার্লাইলের ফরাসী বিপ্লব-কথা। উপনিষদ-গীতা গিবন-কার্লাইল একসঙ্গে গর্জন ক'রে উঠল নবীন সন্ন্যাসীদের শিরায় শিরায়; মোক্ষকামের শ্বেতপতাকা ক্ষুধিতের নিশ্বাসে দুলতে লাগল; "ঈশ্বরের জয় হোক"—এই ধ্বনির সঙ্গে "সাধারণতন্ত্রের জয় হোক" ধ্বনি মিশে গিয়ে কাঁপিয়ে তুলল বরাহনগর-মঠের জীর্ণ বাড়িকে।

'মেঘনাদবধ' কাব্যখানা নরেন্দ্রনাথ হাতে তুলে নিলেন। 'দেশে তো ঐ একজনই কবি হয়েছে!' জেনানা নয়, মর্দানা। বিশ্বাসঘাতককে ঘৃণা করবার কী প্রচণ্ড শক্তি—

> 'এতক্ষণে'—অরিন্দম কহিলা বিষাদে—
> 'জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
> রক্ষপুরে—'

ট্রে-টা-র। দাঁত চেপে উচ্চারণ করলেন। বি-ভী-ষ-ণ, 'ক্ষত্রকুলগ্লানি'। 'নেমকহারাম্, বংশটুকু ছারখার ক'রে দিলে।'

["When Sadananda talks about the Ramayana, I am convinced that Hanuman is really the hero, when Swami talks of it, Ravana is the central figure." (নিবেদিতা)]

বিবেকানন্দ ধিক্কার দিয়ে ওঠেন, তোদের লজ্জা হয়না; তোরা তোদের সেরা কবিকে বিদ্রূপ

ক'রে ছুঁচোবধ কাব্য লিখিস? বইটি হাতে নিয়ে বললেন, কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশ সপ্তম সর্গ—যেখানে রাবণের কাছে পুত্রশোকাতুরা মন্দোদরী এসেছেন। পায়চারি ক'রে স্বামীজী সেই অংশটি পড়তে থাকেন—স্থান এখন বরাহনগর-মঠ নয়, বেলুড়-মঠ, সময় ১৯০১ খ্রীস্টাব্দ। 'মেঘনাদ হত রণে।' মন্দোদরীর 'নীড় শিশুশূন্য।' বেদনায় মূর্ছিত অবরোধ। মন্দোদরী এসেছেন প্রকাশ্য সভাস্থলে, শেষ আশ্রয় স্বামীর কাছে। মেঘস্তম্ভিত নৈশ আকাশতুল্য রাবণ প্রিয়তমা পত্নীকে দীর্ণকণ্ঠে বললেন, বেঁচে আছি শুধু প্রতিহিংসা নিতে—

'কেন নিবাইবে এ শোকাগ্নি, অশ্রুনীরে,
'রাণী মন্দোদরী?'

মন্দোদরী সরে যান অবরোধে। সৈন্যদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছেন রাবণ—অগ্নিভীষণ কণ্ঠ—সংগ্রাম চাই। সৈন্যদলের প্রাণমনকে আলোড়িত করার মতো কণ্ঠে তাঁর গুরু-গুরু মেঘধ্বনি: 'শোনো তোমরা, শোনো পুত্রগণ! যার পরাক্রমে দেব-দৈত্য-নরগণের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হয়েছে রাক্ষসবাহিনী, যার পরাক্রমে থরহরি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—স্বর্ণালঙ্কার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারস্বরূপ যে মহাবীর—তাকে স্বর্ণলঙ্কার ভিতরে তস্করের মতো প্রবেশ ক'রে নিরস্ত্র অবস্থায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে অধর্মী ঘাতক সৌমিত্রী লক্ষ্মণ।' রাবণের কণ্ঠস্বর উচ্চনাদ থেকে নেমে এসে একান্তই করুণ হয়ে ওঠে: 'যখন সেই মহাবীরকে খুঁচিয়ে মারা হলো তার নিজের প্রাসাদের মধ্যে, সে মরল যেন প্রবাসে নিঃসহায়ের মতো, তার সামনে ছিলনা পিতা-মাতা-দয়িতা, হায়!' রাবণের সামনে তখন ক্রোধে যন্ত্রণায় আছড়াচ্ছে সাগরতুল্য বিরাট সৈন্যবাহিনী, তাদের বিবেকের কাছে রাবণ আবেদন জানালেন: 'মনে রেখো, বহুকাল ধরে তোমাদের পুত্রসম পালন করেছি, কৃতজ্ঞতার দায় পালন করো তোমরা।' তারপরেই মহান গর্বে সমুন্নত তিনি: 'বলো তোমরা, কোন্ বংশখ্যাতি রক্ষঃবংশের খ্যাতির তুল্য?' বলতে বলতে হাহাকার ক'রে ওঠেন: 'বংশগৌরব? কী মূল্য? বৃথাই কীর্তিবৃক্ষ রোপণ। হায়, জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে শুকিয়ে গেল।' রাবণের অশ্রুজল এবার জ্বলদগ্নির রূপ ধরে দাউ দাউ ক'রে উঠল: 'না না—অশ্রু নয়, অশ্রুজলে কৃতান্তের হৃদয় বিগলিত হয়না। যুদ্ধই পথ। সম্মুখসমরে কপট লক্ষ্মণকে সংহার করব, তবেই ফিরব, নইলে নয়, কদাপি নয়। চলো রণস্থলে, দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস হে সৈন্যদল, চলো যুদ্ধে। মনে রেখো, তোমাদের প্রিয় সেনাপতি মেঘনাদ অন্যায় সমরে নিহত হয়েছে, তার প্রতিশোধ না নিয়ে কেউ ফিরবে না।'

বিবেকানন্দের মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। আগ্নেয় আননে নীলা পাথরের দ্যুতিতে জ্বলতে লাগল দুই বিশাল নয়ন; মুষ্টিবদ্ধ বাহুতে মৃত্যুর আহ্বান—।

"ডাকে ভেরী, বাজে ঝরর্ ঝরর্ দামামা নক্কাড়,
বীর-দাপে কাঁপে ধরা,
ঘোষে তোপ বব-বব-বম্ বব-বব-বম্
বন্দুকের কড়কড়া।
ধূমে ধূম ভীম রণস্থল, গরজি অনল

বমে শত জ্বালামুখী,
ফাটে গোলা, লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায়
আসোয়ার ঘোড়া হাতী।
পৃথ্বীতল কাঁপে থর থর, লক্ষ অশ্ববর
পৃষ্ঠে বীর—ঝাঁকে রণে;
ভেদী ধূম গোলা বরিষণ, গুলি সনসন্,
শত্রু-তোপ আনে ছিনে।
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি
ধ্বজা লয়ে আগে চলে—”

উপরের কবিতা বিবেকানন্দের লেখা।

জাতির এই মহাসঙ্কটে [রচনাকালে চীন-ভারত সীমান্ত-যুদ্ধ চলছে] আজ আবার আমরা বিবেকানন্দের মধ্যে ফিরে যেতে চাইছি। ফিরে যেতে চাইছি রুদ্রের মধ্যে। বিবেকানন্দের মহিমা এইখানে, একদিকে তিনি গভীরতম শান্তি ও প্রেমের সত্যবহ, অন্যদিকে সে প্রেম যেহেতু শক্তিহীন নয়—পাপের বিরুদ্ধে তিনি শক্তির অবতার। হিমালয়ের শিখরে ধ্যানস্থ বিবেকানন্দ, ভারত-সমুদ্রের তরঙ্গতাড়িত বিক্ষুব্ধ বিবেকানন্দ, একেরই দুই প্রকাশ।

বিবেকানন্দের অট্টহাসি কি আমরা শুনতে পাচ্ছি? 'মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।' কত আত্মসন্তোষ ছিল আমাদের! বীভৎস হলুদকে সৃষ্টির হরিৎ বলে প্রচারের কী সে ব্যাকুল উদারতা! যখন উপর নিচের দাঁত বসেছে চেপে, তখনও চোয়ালের মধ্যে আশ্রয়কক্ষের সন্ধানবাসনা! ওটা নিরুদ্যমের গুপ্ত কাপুরুষতা—বিবেকানন্দ অবশ্যই বলতেন। 'লড়তে হবে তোমাদের, নয়তো মরতে হবে',—তিনি বললেন। 'যুদ্ধক্ষেত্রে তোমরা যেন বীরের মতো মরতে পার, সর্বদা এই চাই'—তিনি প্রার্থনা করলেন।

বিবেকানন্দের কাছে এ জীবন রণক্ষেত্র। মানুষ যখন অধ্যাত্মপথিক, তখন এ-জীবনে সে লড়ছে মহামায়ার সঙ্গে; আর যখন সে জাগতিক, তখন লড়ছে শত্রুর সঙ্গে। ইতিহাসের সংজ্ঞা তিনি দিলেন এইভাবে—'অসীম শক্তি কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে মানুষের মধ্যে। সে কুণ্ডলীর পাক খোলে, আর দেহের পর দেহকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে নতুন দেহকে গ্রহণ করে। শৃঙ্খলিত প্রমিথিউসের শিকল ছিঁড়ে যায় একে একে। এরই নাম মানুষের ইতিহাস, এরই নাম ধর্মের, সভ্যতার ও প্রগতির ইতিহাস।'

ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির, আর সৃষ্টির মধ্যে ধ্বংসের লীলাদর্শন ক'রে মহাকালের গান গেয়ে ওঠেন তিনি—তাঁর স্বরচিত সঙ্গীত—

'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা,
বম্ বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল মাল।
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ, জ্বলে শশাঙ্ক-ভাল।'

শিবদর্শনের পরেই আসে মৃত্যুদর্শন। স্বামীজীর সকল জীবনপ্রীতির মূলে আছে এই মৃত্যুপ্রীতি। জীবনকে ভালবাসার পথে সবচেয়ে বড় বাধা মৃত্যুর। আমি একদিন থাকব না—এই কথাটা যখন হঠাৎ ধক্ ক'রে গিয়ে বুকে বাজে—মানুষ চমকে শিউরে উঠে বুক চেপে ধরে দু'হাত দিয়ে; শুরু হয় জীবনের লোলুপ লেহন। পাশের মানুষকে মরতে দেখেও মানুষ ভাবে, সে চিরজীবী—এইটাই সবচেয়ে বড় আশ্চর্য—বিদ্রূপ ক'রে মহাভারত জানিয়েছে। এই মহাবিদ্রূপের মধ্যেই ফুটে আছে জীবনের গভীরতম ট্রাজেডি। তাহ'লে কোথায় পরিত্রাণ? এ মৃত্যুজাল ছেদিব কেমনে? বিবেকানন্দের উত্তর—তোমার ভয়কেই অর্চনা কর তুমি, তবেই তোমার কাছে ভয়ঙ্কর হবে অভয়ঙ্কর; ভালবাস মৃত্যুকে, পূজা কর তাকে। 'কে বলতে পারে ভগবান শুভের মতো অশুভেও আত্মপ্রকাশ করেন না? কিন্তু কেবল হিন্দুই তাঁকে অশুভরূপে পূজা করতে সাহসী হয়।'

এই ভয়ঙ্করের উপাসনা বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ। জিনিসটা তাঁর কাছে তত্ত্ব নয়—সত্য, উপলব্ধিজাত প্রত্যয়। ক্ষীরভবানী-প্রত্যাগত 'মৃত্যুরূপা কালী' কবিতা রচনার যে ইতিহাস পাই, তাতে দেখা যায়, তাঁর উপলব্ধির পরিণতিতে দাঁড়িয়ে আছেন এই মৃত্যুরূপা মাতা। স্বামীজী পায়চারি করতে করতে বললেন—"আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছি"—পায়চারি থামিয়ে বললেন—"বর্ণে বর্ণে সত্য। নিজের চোখে দেখেছি মৃত্যুরূপাকে।"

দুটো পাথর স্বামীজী তুলে নিলেন দু'হাতে। বললেন, 'সুস্থ অবস্থায় আমার সঙ্কল্পের জোর কমে গেছে মনে হতে পারে , কিন্তু যদি কোনো পীড়া বা যন্ত্রণা আসে, যদি মৃত্যুর সামনা-সামনি হই ক্ষণেকের জন্যও, তাহলে'—হাতের পাথর দুটো সজোরে ঠুকে বললেন—'আমি এই রকম [কঠিন] হয়ে যাই, কারণ আমি ঈশ্বরের পাদস্পর্শ করেছি।'

বিবেকানন্দের শক্তিবাদের কেন্দ্রে আছে এই মৃত্যুবাদ। এই মহাকালচেতনাকে তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন দেশে। তিনি জানতেন, সকল মানুষের পক্ষে এই মহারাত্রির আকাশতলে দাঁড়ান সম্ভব হবেনা, তাই তিনি কয়েকটি মানুষ সৃষ্টি করতে চাইলেন, যারা দুনিয়া ওলটপালট ক'রে দিতে পারবে। দুটি নাম এখনি মনে আসে—নিবেদিতা ও সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্রের শেষ জীবনের একটি ঘটনা। চারিদিকে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ, নেতাজী প্রবেশ করেছেন ট্রেঞ্চে, মৃত্যুবাণ ঝরে পড়ছে অজস্রধারে, বিদীর্ণ করছে পৃথিবী, হরণ করছে প্রাণ, ত্রাহি-ত্রাহি চীৎকারের মধ্যে নির্ভয় একটি কণ্ঠে উল্লাসের অগ্নিরাগ—'প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে, হে নটরাজ'!—সে কণ্ঠ একমাত্র সুভাষচন্দ্রের।

নিবেদিতা বিবেকানন্দের মানসকন্যা, সুভাষচন্দ্র মানসপুত্র।

ইতিহাসের পটে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন। পৃথিবীর জন্য তাঁর একটি বাণী ছিল—সে বাণী তাঁর এবং তাঁর গুরুর, বিশেষভাবে তাঁর গুরুর। সে বাণী অর্পণ করবার কালে বিবেকানন্দ বলতেন—'**I am a voice without a form.**' কিন্তু কী বিচিত্র! বিবেকানন্দের মতো পুরুষ শুধুই স্বর, আকার নন? হতে পারে কখনও? তা যদি সত্য হয়—রামকৃষ্ণের সকল বিবেকানন্দ-পূজা মিথ্যা হয়ে যায়। বিবেকানন্দ নিজের পুরুষকার ও পুরুষাকারকে উন্মোচন করলেন ভারতের জন্য। ভারতে শান্তিবাদ প্রচার ক'রে লাভ কি যখন সেখানে শ্মশানের শান্তি বিস্তৃত? শ্মশান-ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন,

ভারতকে শক্তি দিয়ে শান্তির যোগ্য করতে হবে। বিবেকানন্দের এই দায়িত্ব—এ দায়িত্ব তিনি সৈনিকের মতো পালন করেছেন জীবনমূল্যে। অবশ্য বিবেকানন্দ সাধারণ সৈনিক হতে পারেন না—তিনি সকল সময়েই সর্বাধিনায়ক—এই অধিনায়ককে চিন্তা করতে হয়েছে কিভাবে এই পদদলিত হতশ্রী জনসমষ্টিকে মহাব্রতের সৈন্যদলে পরিণত করবেন। ভারতীয় জনগণ হবে গণবাহিনী। এই বাহিনী গঠনের জন্য সেনাপতি বিবেকানন্দ কোন্ পরিকল্পনা ও সংগঠন-কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখা উচিত। এই আলোচনায় কিছু যুদ্ধের ভাষা ব্যবহার করব; তাতে দোষ হবেনা, কারণ স্বয়ং স্বামীজীই তা ক'রে গেছেন।

সৈনিকের প্রথম প্রয়োজন রসদ। রসদে ঘাটতি হলে নিশ্চিত হার। 'খালি পেটে ধর্মই হয়না'—যুদ্ধ বহুদূর। অন্ন—অন্ন—অন্ন! অন্ন চাই। আমেরিকার দ্বারে দাঁড়িয়ে স্বামীজী বললেন পরম দুঃখে—তোমরা আমাদের দুর্ভিক্ষের দেশে ধর্ম পাঠাচ্ছ—খাদ্য পাঠাও না কেন?

ভারত খেতে পায়না। কিন্তু তাই বলে এদেশে খাদ্যের বাছ-বিচার কম নয়। রাজসিক আমিষের বদলে সে সাত্ত্বিক নিরামিষভোজী। স্বামীজীর মতে ওটা সাত্ত্বিকতা নয়, তামসিকতা। সারা জাত ঘাসপাতা খেয়ে নির্জীব। তীব্রভাবে তিনি বললেন: সিংহের দিকে দেখ, আর দেখ গবাদি জীবকে; তফাত বোঝ। মাংসাহার চাই, জীবনসংগ্রামে যদি জয়ী হতে হয়। শাণিত বিদ্রূপ ঝকঝক ক'রে ওঠে—অশোক অস্ত্রের জোরে পাঁঠাদের প্রাণ বাঁচিয়ে দেশকে ডুবিয়ে গেলেন শক্তিহীনতায়—পরাধীনতায়। সাধারণ মানুষকে জোর ক'রে নিরামিষাশী করা ভারতের পতনের অন্যতম কারণ। আধ্যাত্মিকতা? স্বামীজীর কঠিন প্রশ্ন—মাংসাহারে যার আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হয় এমন আধ্যাত্মিক মানুষ দেশে ক'জন আছেন?

খাদ্যাখাদ্য বিচার না-হয় ত্যাগ করা গেল কিন্তু মূল প্রশ্নটা থেকে যায়—আমিষ বা নিরামিষ যে খাদ্যই হোক তা জোটানো যায় কিভাবে? স্বামীজী খাদ্যসংগ্রহ ব্যাপারটা দেশের ঐহিক সমৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেখেছেন। নিছক কৃষিনির্ভরতায় ভারত কোনোদিন অন্য দেশের সমকক্ষ হতে পারবে না। ঐহিক সমৃদ্ধির জন্য চাই শিল্প—একালে যন্ত্রশিল্প। বিবেকানন্দের আমেরিকা যাবার প্রাথমিক উদ্দেশ্য শিল্পশিক্ষা, একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

সৈন্যবাহিনীর দ্বিতীয় প্রয়োজন হাতিয়ার। তারপরে চাই ঐ হাতিয়ার ধরবার মতো শক্ত হাত; অর্থাৎ খাদ্যপ্রাণকে বুকে ও বাহুতে সঞ্চারিত করার ব্যবস্থা। লোহার মতো স্নায়ু, ইস্পাতের মতো পেশী দরকার—শরীরচর্চার আহ্বান জানালেন বিবেকানন্দ।

এরপর শৃঙ্খলা, আনুগত্য, আজ্ঞাবহতা, সংঘের পায়ে আত্মবিসর্জন। বড় হতে গেলে এগুলি জাতির চাইই—স্বামীজী জানালেন।

কিন্তু কেন সৈন্যরা আজ্ঞাবহ হবে, কেন থাকবে সংঘবদ্ধ? স্বামীজীর উত্তর, সাধারণ স্বার্থের বন্ধনের দ্বারা! নেতারূপে গুরুগোবিন্দের মহিমার ভিত্তি এইখানে—তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে "common interest" সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

এই "সাধারণ স্বার্থের" নানা দিক আছে। যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে মেলাতে হবে, সেখানে অপর সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকা দরকার। ভারতের ইতিহাসে ইসলামের দান নিয়ে হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ অভিভূত হতেন, তাঁর উত্তরাধিকারী সুভাষচন্দ্র—বাহাদুর শাহের কবরে বসে অশ্রুমোচন করেছেন।

এই "সাধারণ স্বার্থ" কিন্তু মূলে অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। ভারতে রাজায় রাজায় লড়াই হয়েছে, অথচ প্রজা থেকেছে নির্বিকার—এই সাধারণ সত্যটি ইতিহাসপ্রাজ্ঞ বিবেকানন্দের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনা। কেন তারা নির্বিকার থাকবে না, যখন আমরা রূপোর থালা থেকে খাওয়ার সময় এক টুকরো রুটিও তাদের দিকে ছুঁড়ে দিইনি—সন্ন্যাসীর মথিত জিজ্ঞাসা। শোষণের জন্য জনসাধারণের প্রতিরোধশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তার ফলে ইতিহাসের প্রতিহিংসা যখন বিদেশী অভিযানকারীর মূর্তি ধরে ধেয়ে এল, তখন ভারত ছারখার হয়ে গেল। বিদেশী শত্রুর হাত থেকে যদি ভারতকে বাঁচাতে চাও, তাহলে বন্ধ করো শোষণ—স্বামীজীর অমোঘ বাণী।

সৈন্যবাহিনীর উদর যখন পূর্ণ, পেশী যখন পুষ্ট, সাধারণ স্বার্থে যখন সে সম্মিলিত, এবং সে আনুগত্যপরায়ণ—তখনও অপরাজেয় হতে হলে তার আরও কিছুর প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন শারীরিক নয়, মানসিক বা আত্মিক। কিন্তু সেগুলির মূল্য মানবজীবনে আছে বলেই মানুষ পশু নয়। চাই আদর্শবাদ।

এই আদর্শবাদ বহুমুখী। সর্বপ্রথম ধরা যাক প্রধানতম আদর্শ—আত্মবিশ্বাস। 'তোমরা তেত্রিশকোটি দেবতাকে বিশ্বাস করেও নাস্তিক থাকবে যদি নিজেকে বিশ্বাস না করো।' সোঽহং সোঽহং শিবোঽহং—উচ্চারণ করো, বুকে বল আসবেই—স্বামীজী বললেন।

একদিকে আত্মবিশ্বাস, অন্যদিকে দেশের অতীত গৌরবে বিশ্বাস—এবং ভবিষ্যৎ উন্নতিতে আস্থা। বালক স্কুলে গিয়ে প্রথম শিখল—"তার বাপ একটা মূর্খ, দ্বিতীয়ত তার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়ত প্রাচীন আচার্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থত শাস্ত্র সব মিথ্যা? যোল বৎসর বয়স হবার আগেই সে একটা প্রাণহীন মেরুদণ্ডহীন 'না'-এর সমষ্টি হয়ে দাঁড়াল।" বিবেকানন্দ নাস্তি নাস্তি বলতেন না, বলতেন, অস্তি অস্তি। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, 'ভারতকে জানতে হলে বিবেকানন্দকে জানা দরকার, কারণ তাঁর মধ্যে সবই ইতিবোধক, নেতিবোধক কিছু ছিল না।' স্বামীজী অতীত ও ভবিষ্যৎকে উপস্থিত করতেন বর্তমানকে উত্তোলন করার জন্য। একদিকে তিনি ভারতের অতীত মহিমার ধ্রুবজ্যোতি বর্ষণ করতেন বর্তমানের উপর, অন্যদিকে ভবিষ্যতের নিশ্চিতজন্মের আনন্দকোলাহল শোনা যেত তাঁর কণ্ঠে।—পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস তোমাদের পিছনে—ভাবী পাঁচ হাজার বছর তোমাদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। হে বীর-হৃদয় যুবকবৃন্দ, তোমরা বিশ্বাস করো তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ।

ক্লান্ত ও প্রায়-বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনী নিয়ে নেপোলিয়ান উপস্থিত হলেন মিশরের পিরামিডের সামনে। সৈন্যবাহিনী আর এক পাও না-এগোতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তরবারি উন্মোচন ক'রে নেপোলিয়ান বাড়িয়ে দিলেন মানবসৃষ্টির কালবৃদ্ধ মহিমার দিকে।—ঐ দ্যাখো, তোমাদের সামনে স্তব্ধ হয়ে আছে হাজার হাজার বৎসর!—নেপোলিয়ানের কণ্ঠে রোমাঞ্চ।—তো-ম-রা দাঁড়িয়ে আছ হাজার হাজার বছরের সামনে—সুদূর সুরে ভরে যায় তাঁর উচ্চারণ। মূর্ছিত সৈন্যদল ইতিহাসের প্রাঙ্গণে হঠাৎ সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে—ক্ষুধা ও শ্রান্তিকে শোষণ ক'রে নেয় স্তব্ধ ইতিহাস। নেপোলিয়ানের বাহিনী আবার এগিয়ে চলে।

বীরের আদর্শ দেবার জন্য স্বামীজী ডাক দিতেন নেপোলিয়ানকে, সেকেন্দারকে, এমনকি

চেঙ্গিজ খাঁকে। ঐসব দিগ্বিজয়ীদের নৃশংসতাকে পর্যন্ত প্রশংসিত শ্রদ্ধায় আচ্ছন্ন ক'রে রাখতেন। মুরদের "দীন্ দীন্" গর্জনের কল্পনায় তাঁর রক্তে ঝড় উঠত। ভারতের বীরদের স্তুতি করতেন মুগ্ধভাবে। যথা শিবাজী—"আজ পর্যন্ত ভারতের কর্তৃপক্ষ সন্ন্যাসীকে ভয় করে, পাছে তার গৈরিকের ভিতরে আর একজন শিবাজী লুকিয়ে থাকে।" প্রতাপ সিংহ—"কেউ তাঁকে কখনও বশ্যতাস্বীকার করাতে পারেনি।...বিধর্মীর সংস্পর্শে রক্ত কলুষিত হয়নি এমন একমাত্র রাজপুত বীর।" গুরুগোবিন্দ—"ভারতের ইতিহাসে তাঁর দৃষ্টান্ত বিরল।" কিংবা আকবর,—"সুমহান, সর্বোত্তম মুঘল, ভারতের অবিসংবাদিত অর্ধশতাব্দীর প্রভু।" আকবরের কথা স্বামীজী অজস্রভাবে বলে যেতেন। বালক বয়সেও পতিত শত্রুকে আঘাত করতে আকবরের বীরোচিত ঘৃণা ছিল—এই কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী যে তীব্র অনুভূতি ও নাটকীয় বাস্তবতার সৃষ্টি করতেন তাতে মনে হতো, "স্বামীজী বুঝি আকবরের নবাবির্ভাব।" বাঙালীদের মধ্যে বীরপুরুষদের প্রাচীন দৃষ্টান্ত সুলভ নয়, একটি বুঝি পাওয়া যায়—"একটা ছিল দুষ্টু বাঙালী রাজার ছেলে—বিজয়সিংহ"—বলতে বলতে স্বামীজী প্রীতিতে আকুল।

কিন্তু বীর বিগ্রহরূপে স্বামীজীর সকল নমস্কারকে যিনি অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি পুরুষ নন, নারী—রানী লক্ষ্মীবাঈ।

> "তিনি মানবী নন, তিনি দেবী ছিলেন। যখন আর পারলেন না, তখন নিজের তরবারির উপর পড়ে গেলেন—পুরুষের মতো মরলেন।"

বিবেকানন্দ তাঁর বাহিনীর কাছে এই সব বীরচরিত্রগুলি উপস্থিত করার পরে ক্ষত্রিয়মহিমার কথা বিশেষভাবে ঘোষণা করলেন। ভারতের শ্রেষ্ঠপুরুষ ক্ষত্রিয়রা। রাম কী ছিলেন? কৃষ্ণ কী ছিলেন? কিংবা বুদ্ধ? বিবেকানন্দ 'বুদ্ধের দাসানুদাস', ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানব বলে তাঁকে বন্দনা করেন, কিন্তু বুদ্ধকে এক জায়গায় তিনি স্বীকার করতে অপারগ। বুদ্ধ সর্বজনীন অহিংসা প্রচার করেছেন। বিবেকানন্দের মত, পৃথিবী যতদিন না আদর্শ স্তরে পৌঁছচ্ছে ততদিন নির্বিচার অহিংসায় মানুষের ক্ষতি হবে।—"অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা; কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ করবে।" আততায়ীকে যে আঘাত করেনা, সে মানুষই নয়, তায় আধ্যাত্মিক! অধিকারী বিচার না-করে নির্বিচার অহিংসা ও সন্ন্যাস প্রচারের দ্বারা বৌদ্ধ ও জৈনরা ভারতের সর্বনাশ করেছে—সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অভিমত।

সেনাপতি বিবেকানন্দের রণনীতির রূপ এই। **'I want to rouse struggle in you, that is my mission'**। লড়াইয়ের যোগ্য ক'রে তুলতে হবে ভারতকে, তবেই ভারত উঠবে। বিবেকানন্দ ভারতের পক্ষে সেই সংগ্রাম শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। 'বীরহৃদয় যুবকবৃন্দের' জন্য যে-সমস্ত আদেশনামা তিনি ঘোষণা করেছিলেন, পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে তার তুল্য উদ্দীপক **'Order of the day'** কদাচিৎ কোনো সেনাপতি ঘোষণা করেছেন। আধুনিক ভারতবর্ষে গদ্যে শ্রেষ্ঠ বীররস সৃষ্টির গৌরব তাঁরই। উৎসাহ নামক ভাব থেকে বীররসের সৃষ্টি; বিবেকানন্দ মূর্তিমান উৎসাহ। "উৎসাহ বৎস উৎসাহ, প্রেম বৎস প্রেম, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা।" বিবেকানন্দের ভাষারূপের ঐ শক্তির পিছনে ছিল তাঁর অথরিটি—তাঁর ছিল প্রত্যাদিষ্টের প্রেরণার উচ্চারণ—কারণ তিনি ছিলেন শেষপর্যন্ত ঈশ্বরের সৈনিক।

আর ঐ ভাষা তো বিবেকানন্দের নিজস্ব নয়—ঐ ভাষা উপনিষদের—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মস্তিষ্কজাত নয়, উপলব্ধিপ্রসূত—রচিত নয়, শ্রুত।

বিস্ময়কর কথা এই, বিবেকানন্দ তাঁর বাণীর মধ্যে যুদ্ধের রূপ ও চিত্র কত অজস্রভাবে ব্যবহার করেছেন! বিবেকানন্দের বিখ্যাত উদ্দীপক উক্তিগুলির ভিতরে যে একটা বাস্তব সংগ্রামের ছবি ফুটে উঠেছিল [পূর্বে উদ্ধৃত তাঁর কবিতাটির মধ্যে কামান-বোমা-বন্দুকসহ যুদ্ধেরই বর্ণনা আছে]—যুদ্ধ-ব্যাপারের সঙ্গে অপরিচিত আমরা তা খেয়ালই ক'রে দেখি না। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যুদ্ধকালে বাহিনীকে উদ্দীপিত ও লক্ষ্যমুখী করার জন্য নেতাকে কতকগুলি 'রণধ্বনির' সৃষ্টি করতে হয়। সেগুলির পুনঃপুনঃ উচ্চারণে প্রতিজ্ঞা একমুখী হয়। ঐ ধ্বনিগুলিকে বলা চলে—সচল শব্দদুর্গ। চিঠির পর চিঠিতে, বক্তৃতার পর বক্তৃতায়, এবং কথোপকথনে স্বামীজী ঐ সব 'ধ্বনি' ব্যবহার করেছেন। এর অনেকগুলিই তাঁর সংগ্রহ করা। শিখদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন "ওয়া গুরুজীকি ফতে" [তাঁর সর্বাধিক প্রিয়], মরাঠাদের কাছ থেকে 'হর হর মহাদেব,' উপনিষদ থেকে 'অভীঃ অভীঃ,' 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এবং সমস্ত জড়িয়ে চরৈবেতি চরৈবেতি, Onward, Forward। লক্ষ্য করার বিষয়, স্বামীজী বাংলা ভাষার সাহায্য এ-ব্যাপারে বিশেষ পাননি। যে-দুটি সবচেয়ে বড় রণধ্বনি বাঙালী সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে "বন্দেমাতরম্"-এর ভাষা সংস্কৃত এবং 'জয় হিন্দ'-এর ভাষা হিন্দী।

আর একটি উত্তরভারতীয় ধ্বনি স্বামীজী ব্যবহার করতেন—'শির্‌দার তো সর্‌দার।' ভারতীয় নেতৃত্বে যখন শির-বাঁচানো সর্দারির প্রাধান্য, তখন স্বামীজী এগিয়ে গিয়ে বললেন, আমার বুকে গুলি লাগুক, আমার রক্ত ঝরুক, তাতে ভারত জাগবে।—

"Often on Swami's lips was the phrase, 'They would not dare to do this to a monk.'...At times he even expressed a great longing that the English Government would take him and shoot him. 'It would be the first nail in their coffin,' he would say with a little gleam of his white teeth', and my death would run through the land like wild fire." [মিসেস রাইটের নোট। ১৮৯৩]

একই কথা পাই মহেন্দ্রনাথের লন্ডনের স্মৃতিকথায়—

"সারদানন্দ-স্বামীর সহিত কংগ্রেস লইয়া কথাবার্তায় স্বামীজী বলিলেন—ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস কংগ্রেস ক'রে মিছামিছি হৈ-চৈ করছে কেন? কতকগুলো হাউড়ো লোক এক জায়গায় জুটে গলাবাজি করলেই কি কাজ হয়? চেপে বসুক। নিজেদের independent বলে declare করুক। হেঁকে বলুক, আজ থেকে আমরা স্বাধীন হলাম; আর সমস্ত স্বাধীন Government-কে নিজেদের declaration পাঠিয়ে দিক।...

"তারপর তিনি বলিতে লাগিলেন, 'জগতে ভারতবর্ষ বলে যে একটা দেশ আছে তা বেশীর ভাগ লোকই জানে না।...বেপরোয়া হয়ে কাজ করতে হবে। বিধিমতে কাজ ক'রে যাব। তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, প্রথমে আমার বুকে পড়ুক'—এইরূপ বলিতে বলিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন।

"পরে আবার বলিতে লাগিলেন, 'পড়ুক গুলি আমার বুকে। আমেরিকা, ইউরোপ একবার কি রকম কেঁপে উঠবে! তখন বুঝবে বিবেকানন্দ কি জিনিস!...আমার রক্ত পড়লে সারা জগতে একটা সাড়া পড়ে যাবে।" [১৮৯৬]

এই তো সেনাপতি যিনি এগিয়ে গিয়ে বুকে গুলি নিতে পারেন, পাশে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন, 'আমি এক টুকরো রুটি পেলেও তার সবটুকু তোমাদের'—অগ্নিবেষ্টিত যাঁর জ্বলন্ত-মূর্তি আহ্বান জানাতে পারে—'আমার ভিতরে যে আগুন জ্বলছে তা তোমাদের ভিতর জ্বলে উঠুক;' তারপরে এক সময়ে সরে যান পাশ থেকে—'মনে করো আমি জীবিত নেই, ভাবী পাঁচ হাজার বছর তোমাদের দিকে চেয়ে আছে', চন্দ্রহারা নৈশ আকাশের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত ক'রে গম্ভীর কণ্ঠে প্রবুদ্ধ করেন—'আকাশের তারকারা তোমাদের পিষে ফেলবে না, ভয় পেয়ো না, তোমরা তারকাদের প্রভু,' ভীষণকণ্ঠে শাসন করেন অন্যায়কে—'এই মুহূর্তে প্রয়োজন হলে তোমাদের ফাঁসি দিতে পারি'—তারপরেই সবার মধ্যে ফিরে সকলকে জড়িয়ে ধরে বলেন—'তোমরা আমার কথা না শুনলে ডুববে, কিন্তু কি জানো, আমিও তোমাদের সঙ্গেই ডুবব'। এই তো সেনাপতি।

বিবেকানন্দ-বাণীকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেখানে কতকগুলি বিশেষ শব্দের প্রাধান্য আছে। শব্দগুলি শক্তি ও সম্প্রসারণের দ্যোতক। যেমন 'সিংহ' (**You may meditate on whatever you like but I meditate on the heart of a lion, that gives me strength**); যেমন 'ঝঞ্ঝা', 'অ্যাভালেঞ্চ'। 'বজ্র', 'বোমা' বা 'কামান'। 'রক্ত' এবং 'অগ্নি'। 'গ্রেট' ও 'জায়েন্ট'। 'সাবাস', 'বাহাদুর', 'হুঁশিয়ার'। 'ত্যাগ' ও 'বলিদান'। 'ঝাঁপ দেওয়া', 'ধেয়ে যাওয়া', 'জিতে নেওয়া'। অল্প-কিছু স্বামীজীর মনে ধরত না, সবই বিপুল—'শত শত, 'সহস্র সহস্র', 'অসীম', 'অনন্ত'।

"স্বামীজী তাঁর শব্দের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতেন তাঁর প্রাণকে, তাঁর আত্মাকে"—বলেছেন পণ্ডিত জওহরলাল। "কী আশ্চর্য সে বাণী, আজ তিরিশ বছর পরেও বইয়ের পাতায় তাদের স্পর্শ ক'রে যেন ইলেকট্রিক শক্ লাগছে"—বলেছেন রোমাঁ রোলাঁ। "সঙ্গীতের মতো তাঁর কথাগুলি, বীঠোফেনের মতো তাঁর রচনা। হেন্ডেলের ঐকতানের মতো তাঁর উদীপ্ত ছন্দ"—রোলাঁরাই কথা। এই বাণীর দ্বারা যখন বিবেকানন্দ যুদ্ধের ছবি আঁকতেন তখন শ্রোতাদের মনে হতো, তারা পৃথিবীর চিরদিনের ধর্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে, দাঁড়িয়ে আছে। আমেরিকা থেকে ফিরে মাদ্রাজের সমুদ্রকূলে যখন তিনি একটি খোলা ঘোড়ার গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছিলেন, তখন তাঁর নিজেরই মনে হয়েছিল—কৃষ্ণের মতো তিনি অর্জুনের বিষাদকে আক্রমণ করছেন। মাদ্রাজে তাঁর বিখ্যাত ভাষণের নাম—**My Plan of Campaign**—'আমার সমরনীতি'। যুদ্ধের ভাষাকে তিনি কী পরিমাণে ব্যবহার করেছেন তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

"সেনানী যদি তাঁর অধীনস্থ সেনাকে কামানের মুখে যেতে বলেন, তা'হলে তার অভিযোগ করবার বা আদেশ পালনে এতটুকু ইতস্তত করবার অধিকার নেই।"

"যদি তোমরা আমার শিষ্য হতে চাও তাহলে দ্বিরুক্তি না করে তোমাদের কামানের মুখে দাঁড়াতে হবে।"

"আমি তোমাদের মরতে দেখলেও বরং খুশি হব, তবু তোমাদের লড়তে হবে। সেপাইর মতো আজ্ঞা পালনে জান পর্যন্ত কবুল ক'রে নির্বাণলাভ বরং করতে হবে—তবু ভীরুতাকে আমল দেওয়া চলবে না।"

"সাহসী হও, সাহসী হও। মানুষ একবার মাত্রই মরে। আমার শিষ্যরা যেন কোনোমতে কাপুরুষ না হয়।"

কামানের কথা পেলাম। বোমার কথা স্বামীজীর রচনায় সর্বত্র। 'আমি সমাজের উপর বোমার মতো ফেটে পড়ব', 'মিশনারিদের মধ্যে বোমা ফেলতে যাচ্ছি' ইত্যাদি।

একটি যুদ্ধচিত্রে বারুদের কথা—

"ধীরে ধীরে বারুদের স্তর পুঁততে হয়; তারপর একদিন এক কণা অগ্নি—আর সমস্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে।"

মৃত্যুব্রতী সৈন্যদের বর্ণনা পাচ্ছি একটি উৎকৃষ্ট যুদ্ধচিত্রে—

"কয়েকটি যুবক দুর্গপ্রাচীরের ভগ্নপ্রদেশে লাফিয়ে পড়েছে, তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে; তারা খুব অল্পসংখ্যক। এইরূপ আরও কয়েক সহস্র যুবকের প্রয়োজন।"

এইবার বিবেকানন্দের সৈন্যবাহিনীর অভিযানের গোটা চিত্র তুলে আনা যাক। কামানের মুখে দাঁড়াতে সমর্থ এক সৈন্যদল। তারা প্রস্তুত। তূরী, ভেরী, শিঙ্গা বাজছে। যাত্রা শুরু করার আগে সৈন্যদল স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগল মহানায়কের আহ্বান—

"তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন, তোমরা বীর হও।"

"বলি প্রদান করো। বলি চাই—জীবন বলি।"

"দুনিয়া তোমাদের পায়ের তলায় আসবে—মাভৈঃ মাভৈঃ।"

"আগুনে ঝাঁপ দাও। ছড়াও ছড়াও, আগুনের মতো ছড়াও সব জায়গায়।"

"সাবাস! ঐ রকম চাই! এক একটা নক্ষত্রের মতো ছুটে পড়্ দিকি...সাবাস! তোলপাড় কর্ দুনিয়া।...দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।...**Avalanch**-এর মতো দুনিয়ার উপর পড়্, দুনিয়া ফেটে যাক চড় চড়্ ক'রে।"

"মহাবলে সর্বজয়, বিশ্ববিজয়।...মহাবিজয়, মহালক্ষ্মী, মহাশ্রী তোমাদের। মাভৈঃ, মাভৈঃ।"

মহানায়কের কণ্ঠ এখন উন্মাদনার শিখরে। শক্তির আবেগে থরথর করছেন। এবার ফিরছেন নিজের দিকে। শুরু হল আত্মকথা—

"আমি চিরকাল বীরের মতো চলে এসেছি। আমার কাজ বিদ্যুতের মতো শীঘ্র আর বজ্রের মতো অটল চাই। আমি লড়ায়ে কখনও পেছপাও হইনি।"

"আমি শাক্ত মায়ের ছেলে। মা জগদম্বে! হে গুরুদেব! তুমি চিরকাল বলতে—এ বীর!"

"হারবার ভয়ে লড়াই থেকে হঠে আসব? হার তো অঙ্গের আভরণ, কিন্তু না লড়েই হারব?"

"আমি নিজে যোদ্ধা; যুদ্ধ করতে করতেই আমাকে প্রাণ দিতে হবে।"

"বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরব। এখানে মেয়েমানুষের মতো বসে থাকা কি আমার সাজে?"

প্রেরণার অগ্নিবাণীতে জ্বলছে সৈন্যদল—সৈন্যসাগর এখন ফুলে উঠেছে আবেগে। চরম লগ্ন আসতেই আদেশ গর্জে উঠল, Forward, Onward। এগিয়ে চলো, পিছে দেখো না। "চোখ তোমাদের পৃষ্ঠে নয়—সুতরাং সম্মুখে সম্মুখে।" "ঝাণ্ডা উড়িয়ে দাও। মশাল জ্বালো।" মশালের আলোকে দুঃখ-দুর্গম পথে চলতে শুরু করে সৈন্যদল। সামনে পড়ে পর্বত। "বজ্র-বাঁটুলের মতো হও, যাতে পাহাড় পর্বত ভেদ হয়ে যায়।"—সেনাপতি ডাক দেন। সামনে পড়ে নদী, শোনা যায় উদ্দীপনী বাণী—"একজন আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানায় আর হাজার হাজার তার উপর দিয়ে পার হয়।" নদী অতিক্রম করেও দেখা গেল পথ বন্ধ!—"বড়লোক তাঁরা যাঁরা আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন।" কিন্তু যদি সমুদ্র সামনে আসে?—"সমুদ্র পান ক'রে ফেল।" যদি না পারো সাগরে তরী ভাসাও। সেই তুফান-সাগরে বিশ্রাম মিলবে না। যদি ক্লান্ত হও—"দাঁড়ের উপর নির্ভর ক'রে বিশ্রাম ক'রে নাও।" যে ভাবেই হোক, তোমাকে এগিয়ে যেতেই হবে। নিয়তিনিহত হয়েও তুমি বীর—"এক হাতে অশ্রু মোচন ক'রে অন্য হাতে তরবারি তোমাকে তুলে নিতে হবে।" যদি মনে হয় সামনে অন্ধকার নিশ্ছিদ্র, জেনে রেখো, সে অন্ধকারের দুর্গে আঘাত পড়েছে বহ্নিবাণের। সারারাত্রির যাত্রী ক্লান্ত সৈন্যদলকে দূর-লক্ষ্যের দিকে ইঙ্গিত ক'রে নায়ক ডাক দেন—

"জাগো জাগো! দীর্ঘ রজনী প্রভাত প্রায়! দিবার আলো দেখা যাইতেছে। মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না।"

এই মহানায়কের সর্বশেষ যে-বাণী, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সেনানী সে ভাষায় আহ্বান করতে পারলে ধন্য হবে—

"আমরা সিদ্ধিলাভ করবই করব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করবে, আবার শত শত লোক উঠবে। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি। অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। কে পড়ল দেখো না। অগ্রসর হও, সম্মুখে সম্মুখে। এই ভাবেই আমরা অগ্রগামী হবো। একজন পড়বে আর একজন স্থান অধিকার করবে।"

"দেখলাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ধর্মের নেপোলিয়ান। দেখলাম, সন্ন্যাসীর গৈরিকের অন্তরালে দুলে উঠছে যোদ্ধার বুক। আলেকজান্ডার, সীজার যে ধাতুতে গড়া সেই একই ধাতু—কেবল ভূমিকা ভিন্ন"—জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

সত্যই সন্দেহ হয় সন্ন্যাসী, না সেনাপতি! সেই প্রবাহিত অগ্নিবৎ ভাষণ, সেই স্পন্দিত কণ্ঠ, গুরুধ্বনিত উচ্চারণ, স্বরের নাটকীয় উত্থান-পতন, শব্দ-মাত্রার সঙ্গীতময় ঘাতপ্রতিঘাত, সময়ান্তরে ঊর্ধ্ব থেকে বজ্র নিক্ষেপ—সেই মঞ্চের উপরে সিংহবৎ পাদচারণ! স্ফীত বক্ষকে বাহুবদ্ধ ক'রে, দুই নয়নে ধাবিত-তারকার দ্যুতি আকর্ষণ ক'রে, কোনো এক অলৌকিক বীর্যকে যখন তিনি নিজের মধ্যে আবির্ভূত করাতেন—তখনকার সে মূর্তির সমতুল-কিছু পৃথিবী অল্পই দেখেছে। সেই মূর্তিকেই বিবেকানন্দ ন্যস্ত ক'রে দিয়েছিলেন ইতিহাসের উপরে।

অ্যানী বেশান্ত বিবেকানন্দের রূপ আঁকছেন—

"শিকাগোর ঘন আবহাওয়ার মধ্যে জ্বলন্ত ভারতীয় সূর্য, সিংহতুল্য গ্রীবা ও মস্তক, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, স্পন্দিত ওষ্ঠ, চকিত দ্রুত গতি, কমলা ও হলুদ রঙের পোশাকে পরমাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব—স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়ার রূপ এই। সন্ন্যাসী? তাঁর পরিচয়? নিশ্চয়ই। কিন্তু সৈনিক সন্ন্যাসী—প্রথম দর্শনে বরং সন্ন্যাসীর চেয়ে সৈনিকই বেশি মনে হয়—মঞ্চ থেকে এখন নেমে এসেছেন—দেশ ও জাতির গর্ব ফুটে আছে দেহের রেখায় রেখায়—পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মের প্রতিনিধি...পুরুষের মধ্যে পুরুষ...।"

বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই সৈনিক ছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি ভারতের জন্য বলিপ্রদত্ত সৈনিক, কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই, বিবেকানন্দের সেই ভারত চিরন্তন ভারত, অর্থাৎ চিরন্তন সত্য। বিবেকানন্দ তারই সৈনিক, তারই সেনাপতি। তাঁর মুক্তিযুদ্ধ নিশ্চয়ই দেশের বাস্তব মুক্তির জন্য, সমগ্র শোষিত মানুষের ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। কিন্তু সর্ববন্ধনবিরোধী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যে, মানুষের বাস্তব প্রয়োজন নিবারণে অংশ নিয়েছিলেন, মানুষকে তিনি অখণ্ড সত্যের অংশ মনে করতেন বলেই।—

"All our struggle is for freedom. We seek neither misery, nor happiness but freedom..."

আমাদের সকল সংগ্রাম—সে শুধু মুক্তির জন্য।
আমরা দুঃখও চাই না, সুখও চাই না—
মুক্তি চাই।
জ্বলন্ত অতৃপ্ত অশান্ত তৃষ্ণা কাঁদছে—
আরও—আরও—আরও।
মানব অসীম—এই তৃষ্ণার বিশালতায়।

"And so the splendid sentences rolled on and on and we lifted in Eternities, thought of our common-selves as of babies stretching out hands for the Moon or the Sun—thinking them as babies toys."

(নিবেদিতার ডায়েরী)

'অনন্তকে কে সাহায্য করবে? অন্ধকারে যে হাত তোমার কাছে আসে, জেনে রেখো, সে হাত তোমারই।'

"And then with lingering, heart piercing pathos, that no pen can even suggest—'We—infinite dreamers—dreaming finite dreams!"

বিবেকানন্দ সীজার নন, আলেকজান্ডার নন, নেপোলিয়ান নন—তিনি তাঁদের অনধিগম্য কোনো মহারাজ্যের দিগ্বিজয়ী সম্রাট। বিবেকানন্দ বিবেকানন্দই।

[এই রচনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৬৩, আনন্দবাজার পত্রিকায় বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সূত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর পূর্ণতর আকারে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া প্রকাশিত 'বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে, (১৯৬৩) গৃহীত হয়।]

আইনের জগতে বিবেকানন্দ

॥ এক ॥

কায়স্থরা মধ্যযুগে জাতিবৃত্তিতে মসীজীবী। রাজদপ্তরে কাজ ছিল তাঁদের, ফলে আইন-আদালতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। স্বামীজীর পরিবার বহু পুরুষে আইনজীবী। বর্ধমান-কালনার ডেরেটোনা গ্রামে তাঁদের আদি বাস। পূর্বপুরুষেরা সেখানে রাজকাজে বা জমিদারীর কাজে যুক্ত ছিলেন।

কলকাতায় দত্ত-বংশের 'বন কেটে বসত।' কেল্লা তৈরির সময়ে গোবিন্দপুর ছেড়ে তাঁরা চলে যান সিমুলিয়ায়।

স্বামীজীর প্রপিতামহ রামমোহন দত্ত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের ফার্সি-জানা অ্যাটর্নি। ইংরেজ না হলে সেকালে পুরো অ্যাটর্নি হওয়া যেতনা। তিনি সুপ্রিম কোর্টের ইংরাজ অ্যাটর্নির অফিসের তত্ত্বাধায়ক ছিলেন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন।

এঁর দুই পুত্র—দুর্গাপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ। অনেকের মতে, দুর্গাপ্রসাদও অ্যাটর্নি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ অবশ্য সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে যান।

সংসার চালাবার ভার পড়ে কালীপ্রসাদের উপর। ইনি সারাজীবন নিজে কিছু উপার্জন করেন নি। ফলে একদিকে তিনি সঞ্চিত বিপুল পৈতৃক সম্পত্তি ক্ষয় করেছেন, অন্যদিকে খবরদারির যন্ত্র চালিয়ে গেছেন সংসারের লোকজনের উপর।

দুর্গাপ্রসাদের পুত্র বিশ্বনাথ (জন্ম সম্ভবত ১৮৩৫ খ্রীঃ) বাল্যে কৈশোরে অবহেলিত। তাঁর বিয়ে হয়েছিল সিমুলিয়ার নন্দলাল বসুর কন্যা ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে। ভুবনেশ্বরী পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাই পিতার সম্পত্তি তাঁর উপর বর্তেছিল। পরবর্তীকালে এর উপর নির্ভর ক'রে তাঁকে চলতে হয়।

কাকা কালীপ্রসাদ গোড়ায় বিশ্বনাথের পড়াশোনার বিশেষ ব্যবস্থা না করলেও পাড়াপ্রতিবেশীদের অনুরোধে শেষপর্যন্ত ভ্রাতুষ্পুত্রকে গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ভর্তি ক'রে দেন। মেধাবী বিশ্বনাথ স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্যবসার চেষ্টা করেন এবং ব্যর্থ হন। তখন ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে অ্যাটর্নি সি এফ পিটারের অধীনে আর্টিকেলড্ ক্লার্ক হন। তারপরে অ্যাটর্নি হেনরি জর্জ টেম্পলের অফিসেও একই কাজ করতে থাকেন। ১৮৬৬-র ১৪ মার্চ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ব্যারন পিকক তাঁর নাম 'অ্যাটর্নি' ও 'প্রক্টর' রূপে অনুমোদন করেন। ১৮৬৬ সালেই অ্যাটর্নিশিপ পরীক্ষায় পাস করার পরে তিনি আশুতোষ ধর নামক আর এক নতুন অ্যাটর্নির সঙ্গে একত্রে 'ধর অ্যান্ড দত্ত' নামে অ্যাটর্নি-অফিস স্থাপন করেন। পরে ওই সংস্থা ত্যাগ ক'রে নিজের অফিস করেন।

বিশ্বনাথ আইন ব্যবসায়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সেখানেই আবদ্ধ ছিলনা তাঁর জীবন। রীতিমত শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ হয়ে ওঠেন; একাধিক ভাষা জানতেন, যেমন, ইংরেজী, ফার্সি, আরবি, উর্দু, হিন্দী এবং কিছু সংস্কৃত; সাহিত্য ও সঙ্গীতে ছিল বিশেষ অনুরাগ; বাংলায় গ্রন্থরচনা করেছেন; স্বভাবে উদার ও অতিথিবৎসল; একেবারে হাতখোলা মানুষ। "দান-ধ্যান তাঁর ব্যামো।" ফলে উপার্জনের সঙ্গে ব্যয় পাল্লা দিয়ে ছুটছিল।

বিষয়সম্পত্তি নিয়ে বহু বঞ্চনার শিকার হয়েছেন—তাঁর স্ত্রী পুত্ররাও। প্রথম যৌবন থেকেই তার সূত্রপাত। বিশ্বনাথের কনিষ্ঠপুত্র ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"বিশ্বনাথের যখন ১৭ বৎসর বয়স (১৬ বৎসর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল), মাতামহ দেওয়ান রাজীবলোচন ঘোষের তখন মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর অনাথ দৌহিত্রের জন্য একটি বাগানবাড়ি লিখে দিয়ে যান। কিন্তু অকস্মাৎ আবির্ভূত হলেন বিশ্বনাথের সেজমামা। তিনি এসে ভাগ্নের কানে-কানে কী যেন পরামর্শ দিলেন। বিশ্বনাথ তখন সে সম্পত্তি তাঁর মামার নামে লিখে দিলেন। আমি [ভূপেন্দ্রনাথ] মায়ের কাছ থেকে এ কাহিনী শুনেছি। তিনি এ কাজের সমর্থন করেন। তিনি বলতেন যে, ওই সম্পত্তি লিখে না দিলে মাতামহের কাছ থেকে পাওয়া সম্পত্তি কাকাই আত্মসাৎ ক'রে নিতেন। সে সময়েই পরিবারের সমস্ত অংশীদাররা মধু রায় লেনের বাড়ি বিক্রয়ের চেষ্টা করছিলেন। বিশ্বনাথ তাঁর নিজের অংশ কাকার নামে লিখে দিয়েছিলেন।"

বিশ্বনাথের কাকা কালীপ্রসাদ বিশ্বনাথের জীবনের দুর্গ্রহ। বাল্যকালে দেখাশোনা করেছেন (সে দেখাশোনার চরিত্র যাই হোক-না কেন), এই কৃতজ্ঞতা কালীপ্রসাদ সম্বন্ধে বিশ্বনাথের ছিল। সে কারণে তিনি প্রথম দিকে নিজ উপার্জন থেকে কাকার পরিবার ও পোষ্যদের পালন করেছেন। অথচ সংসারে সর্বময় কর্তৃত্ব করতেন কাকা ও কাকিমা। অন্দরমহলে ভুবনেশ্বরীর দুঃখকষ্টের শেষ ছিলনা। তার চেহারা আমরা সরাসরি দেখব ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থ থেকে, যার থেকে আমি উপরে পরিবেশিত তথ্য সংকলন করেছি:

"খুড়শ্বশুর [কালীপ্রসাদ] ও তাঁর স্ত্রীর কর্তৃত্ব ভুবনেশ্বরীকে মুখ বুজে অসীম ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে হয়েছে। তিনি নিজে আমার কাছে বলেছিলেন যে, এমন সময়ও গেছে যখন তাঁকে একটিমাত্র শাড়ি পরে কাটাতে হয়েছে অথচ তাঁর জায়েদের পরনের যথেষ্ট কাপড় থাকত। এই প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনা উল্লেখ্য। বিশ্বনাথ তাঁর স্ত্রীর নামে সুন্দরবনের আমড়াডাঙ্গা নামে একটি তালুক (লাট নং ৭১) ক্রয় করেছিলেন। এটি এগার হাজার বিঘার উপর বিস্তৃত জমি ছিল। কিন্তু বিশ্বনাথের কাকা আমার মাকে গালি দিয়ে এই তালুকের পাট্টা বের ক'রে নেন। খুড়শ্বশুরের মুখে 'তোমার কি বাবার তালুক', এই গালি শুনে মা পাট্টাটি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেন। পিতা বাধ্য হয়ে তা 'খাইখালাস' শর্তে বন্ধক দেন। ব্যবস্থা ছিল, আয় দ্বারা খাজনা পরিশোধ হলে তালুক আবার ভুবনেশ্বরী দেবীর হাতে ফিরে আসবে। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তা আর ফিরে এলো না।"

॥ দুই ॥

নরেন্দ্রনাথ বি-এ পাস করেন ১৮৮৪-তে। তার আগেই ১৮৮৩ থেকে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের আইন বিভাগে বিএল পড়তে শুরু করেন। পিতার আদেশে তিনি অ্যাটর্নি নিমাইচন্দ্র বসুর অফিসে শিক্ষানবিশী করেছেন—সেই সূত্রে নিয়মিত গেছেন হাইকোর্টে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য 'ফ্রি ম্যাসনস্' দলে নাম লিখিয়েছেন—পিতারই ইচ্ছায়। বিলাতে গিয়ে আইনশিক্ষা করার ইচ্ছা তাঁর হয়েছিল, কিন্তু তা পূরণ হয়নি, যেহেতু বিশ্বনাথ বলেন, 'ও চলে গেলে আমি মরে যাব।'

বিশ্বনাথের বাইরের ঠাট-ঠমক বজায় থাকলেও ভিতরে ফোঁপরা, কারণ অফিসে চুরি এবং বাড়িতে বঞ্চনা। সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত তিনি। তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হলো, শনিবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৪। ফলে তাঁর নিজ পরিবারবর্গ নিঃসম্বল—আশ্রয় নিলেন মামার বাড়িতে। বন্ধু-বান্ধবেরা অধিকাংশই মুখ ফিরিয়েছে, সুখের পায়রাদের রীতি মেনে। রামকৃষ্ণ-ভক্তদের কেউ কেউ কিছু সাহায্য করেছেন।

শুরু হয়ে গেল পারিবারিক মামলা—ভুবনেশ্বরী দেবীর সঙ্গে তারকনাথ দত্তের স্ত্রীর। মামলার কারণ—তারকনাথ দত্ত-পক্ষীয়রা জোর ক'রে বিশ্বনাথের উত্তরাধিকারীদের ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন। এই মামলার নিবৃত্তি হয় ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে।

হাইকোর্টে মামলা চলাকালে নরেন্দ্রনাথদের সাহায্য করেছেন অ্যাটর্নি নিমাইচন্দ্র বসু ও ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডবলিউ সি ব্যানার্জি)। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত একটা কথা স্পষ্ট ক'রে জানিয়েছেন, "এই মোকদ্দমায় ব্যারিস্টার ও উকিল পাই-পয়সাটি পর্যন্ত আদায় করেছিল। ব্যারিস্টারদের নগদ বিদায় দিতে হয়। আর উকিলের পাওনা, তা শোধ দেবার সময় লেখক হাজির ছিলেন, তার রসিদও আছে।"

মামলা চলাকালে নরেন্দ্রনাথের আইনজ্ঞান ও তৎপর বুদ্ধির অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। জীবনীকার প্রমথনাথ বসু একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন:

"অপর পক্ষের ইংরেজ ব্যারিস্টার তাঁহাকে আদালতের সমক্ষে একজন খেয়ালি ছোকরা (fanatic) প্রতিপন্ন করিবার মানসে 'চেলা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন । কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ঘাবড়াইবার পাত্র নহেন। তিনি জানিতেন, সাহেব বিদেশী লোক, সুতরাং চেলা শব্দের অর্থ অবগত নহেন। এজন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'Do you know, sir, what a chela is?' (মহাশয়, চেলা কাহাকে বলে আপনি জানেন কি?) বিচারক নরেন্দ্রের সপ্রতিভ উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়া, ও তাঁহাকে আইন-ক্লাসের ছাত্র জানিতে পারিয়া, বলিয়াছিলেন, 'Yougman, you will make a very good lawyer. (যুবক, তুমি একজন ভালো উকিল হইবে)। অপরপক্ষের ব্যারিস্টার আদালতের বাহিরে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া উৎসাহের সহিত বলিয়াছিলেন, 'জজসাহেবের যা মত, আমারও তাই। বাস্তবিক আইনব্যবসাই তোমার উপযুক্ত। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি'।"

মামলা চলাকালে নরেন্দ্রনাথের সহনাতীত মানসিক যন্ত্রণা। একদিকে নিদারুণ দারিদ্র্য, মা, ভাই-বোনদের অন্নকষ্ট, মামলার খরচের বোঝা এবং অনিশ্চিত ফলাফলের দুশ্চিন্তা—অন্যদিকে চূড়ান্ত আত্মিক সংকট—শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারজীবন নষ্ট করার আগুন জ্বালিয়েছেন তাঁর মধ্যে, অথচ সংসারের কঠিন পাক কণ্ঠে। এই সময়কার মানসিক

অবস্থার ছবি পাই নরেন্দ্রনাথের নিজের কথায়, যা তিনি বলেছিলেন ৪ জানুয়ারি ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে:

"আজ সকালে বাড়ি গেলাম। সকলে বকতে লাগল, আর বললে, কি হো-হো ক'রে বেড়াচ্ছিস? আইন এগজামিন এত নিকটে, পড়াশোনা নাই, হো-হো ক'রে বেড়াচ্ছ?...দিদিমার বাড়িতে সেই পড়বার ঘরে পড়তে গেলাম। পড়তে গিয়ে পড়াতে ভয়ানক আতঙ্ক এলো—পড়াটা যেন কী ভয়ের জিনিস। বুক আটুপাটু করতে লাগল। অমন কান্না কখনও কাঁদি নাই। তারপর বই-টই ফেলে দৌড়। রাস্তা দিয়ে ছুট। জুতো-টুতো রাস্তায় কোথায় একদিকে পড়ে রইল। খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম—গা-ময় খড়। আমি দৌড়চ্ছি কাশীপুরের রাস্তায়। বিবেকচূড়ামণি পড়ে আরও মন খারাপ হয়েছে। শঙ্করাচার্য বলেন, এই তিনটি জিনিস অনেক তপস্যায়, অনেক ভাগ্যে মেলে—'মনুষ্যত্বং, মুমুক্ষুত্বং, মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ। ভাবলাম, আমার তিনটিই হয়েছে। অনেক তপস্যার ফলে মানুষ জন্ম হয়েছে, অনেক তপস্যার ফলে মুক্তির ইচ্ছা হয়েছে, আর অনেক তপস্যার ফলে এরূপ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয়েছে। সংসার আর ভালো লাগেনা। সংসারে যারা আছে তাদেরও ভালো লাগেনা—দু'একজন ছাড়া। (শ্রীম'র প্রতি) আপনাদের শান্তি হয়েছে, আমার প্রাণ অস্থির হচ্ছে। আপনারাই ধন্য।" (কথামৃত, আনন্দ সংস্করণ, পৃ. ৬০৪-০৫)।

বি.এল. পরীক্ষার ফি জমা দিয়েও নরেন্দ্রনাথের পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।

মামলা নিষ্পত্তির পরের অবস্থা—প্রমদাদাস মিত্রকে ৪ জুলাই ১৮৮৯ তারিখে লেখা নরেন্দ্রনাথের এক পত্র থেকে:

"আমার মাতা ও দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। ইঁহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভালো ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন-কি কখনও-কখনও উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটীর অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে-প্রকার মকদ্দমার দস্তুর। কখনও-কখনও কলিকাতার নিকটে থাকিলে তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকারস্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে; তাহাতেই লিখিয়াছিলাম, মনের অবস্থা বড় ভয়ঙ্কর। এবার তাহাদের মকদ্দমা শেষ হইয়াছে। কিছুদিন কলকাতায় থাকিয়া তাহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইতে পারি—আপনি আশীর্বাদ করুন...কারণ, 'আমরা জগতের দুঃখকষ্টের ক্রুশ ঘাড়ে লইয়াছি। হে পিতঃ, তুমি উহা আমাদের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছ। এক্ষণে আমাদিগকে বল দাও, যেন আমরা উহা আমরণ বহন করিতে পারি'।"

॥ তিন ॥

পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী যেমন আতিথ্য নিয়েছেন অচ্ছুতদের ঘরে তেমনি রাজামহারাজাদের ঘরেও। রাজা বা মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা প্রধানত ধর্ম ও সভ্যতা বিষয়েই হতো। তবে আইনগত ব্যাপার এসে যেত কখনো কখনো, এবং স্বামীজী তাঁর প্রতিভা কিছু ব্যয় ক'রে কোনো-কোনো জটিল প্রশ্নের সমস্যা সহজ ক'রে দিতেন। একটি দৃষ্টান্ত দেব। জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস তখন ভারতবর্ষে বিখ্যাত পুরুষ, রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জন্য "ভারতের গ্ল্যাডস্টোন' নামে খ্যাত। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় হয়েছিল। প্রথম পরিচয়কালীন একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার কথা মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী' (২য় খণ্ড) গ্রন্থ থেকে উৎকলন করছি:

"হরিদাস বিহারীদাসের ধারণা ছিল যে, স্বামীজী একজন রম্‌তা সাধু, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, কোনো জায়গায় আশ্রয় না পাইয়া তাঁহার বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছেন।...হরিদাস বিহারীদাস বোম্বাই সরকার হইতে জুনাগড়ের নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন।...এক সময় হরিদাস বিহারীদাস অতি বিষণ্ণভাবে কয়েকদিন আছেন, কাহারও সাথে বাক্যালাপ করেন না। স্বামীজী তাঁহার বিমর্ষ ভাবের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'আপনি সাধু, আপনার এ-সকল কথা শুনিয়া কি ফল হইবে? রাজ সরকারে যাহারা চাকরি করে তাহাদের সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়।' কিন্তু স্বামীজী আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন যে, বোম্বাই গভর্নমেন্ট জুনাগড় দরবারকে এক পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রের কী উত্তর হইতে পারে সেই বিষয় লইয়া তিনি ভাবিতেছেন, কারণ তিনি নবাবের কর্মচারী। আবার এদিকে বোম্বাই গভর্নমেন্ট হইতে তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন। উভয় কুল যাহাতে রক্ষা হয়, এরূপ কোনো উপায় স্থির করিতে পারিতেছেন না, সেইজন্য এত বিমর্ষ। স্বামীজী সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া, আর কোনো কথা না বলিয়া, সম্মুখ হইতে একখানি কাগজ তুলিয়া লইলেন এবং আপনমনে ইংরাজিতে কি লিখিতে লাগিলেন। লেখা শেষ হইলে তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, এটা কেমন হয় বলুন দিকি?' হরিদাস বিহারীদাস পত্রখানি পড়িয়া অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'ঠিক এই চিঠিই তো চাচ্ছিলাম, এই চিঠিতেই কাজ হবে।' এই বলিয়া চিঠির আর কোনো পরিবর্তন না করিয়া, অবিকল নকল করিয়া, এবং নাম স্বাক্ষর করিয়া, বোম্বাই সরকারকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতেই তাঁহার কার্য সফল হইয়াছিল। হরিদাস বিহারীদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামীজী, এ যে দেখিতেছি খুব পাকা হাতের লেখা এবং রাজনীতি বিশেষভাবে না জানিলে এরূপভাবে কেহ লিখিতে পারে না।' হরিদাস বিহারীদাস তদবধি স্বামীজীকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিতেন।"

॥ চার ॥

স্বামীজীকে যে একবার ভালবেসে ফেলেছে, সে তাঁর সঙ্গ কদাপি ছাড়েনি। এক্ষেত্রে সজীব ও জড়ে পার্থক্য নেই। সুতরাং মামলা তার সঙ্গে লেগে রইলই, যতই তিনি বিশ্ববিখ্যাত, ভারত-ভাস্কর বিবেকানন্দ হোন। এবার মামলা বেলুড়-মঠের সঙ্গে বালী মিউনিসিপ্যালিটির। বালী মিউনিসিপ্যালিটি বেলুড়-মঠের উপর বিরাট ট্যাক্স চাপালো, কারণ মিউনিসিপ্যালিটির সুবিজ্ঞ কর্তাদের বিবেচনায়, ওই মঠ কোনো ধর্মস্থান নয়, ওটা বিবেকানন্দের বাগানবাড়ি। ১৯০০-'০১ জুড়ে মামলা চলে। প্রথমে তা ওঠে জেলা কোর্টে। সেখানে মঠ জিতলে, তার বিরুদ্ধে আপীল করা হয় হাইকোর্টে। হাইকোর্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের উপর তদন্ত ক'রে সিদ্ধান্ত করার ভার দেন। ম্যাজিস্ট্রেট মঠের পক্ষে রায় দেন।

এই বিষয়ে অগস্ট ১৯০১ সংখ্যার প্রবুদ্ধ ভারতের সংবাদ এই:

"The Bally Municipality would not consider our Math at Belur as a place of public worship and so would have it pay taxes. The matter went to court and was decided in the first instance by the Sub-Judge of Hooghly in favour of the Math. The decision was appealed against by the Municipality in higher court. It was then referred to the District Magistrate of Howrah for arbitration, who has uphold the claims of the Math and exempted it from the payment of house-rate."

মঠের সপক্ষে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সিদ্ধান্তের পিছনে একটি কুকুরের ভূমিকা ছিল—স্বামীজীর প্রিয় কুকুর—নাম বাঘা। মহাপ্রস্থানপর্বে ধর্মরাজ কুকুরবেশ গ্রহণ করেছিলেন—এ-বিষয়ে যদি কারও সন্দেহ থাকে, তা দূর করার মতো উপাদান বেলুড়-মঠের বাঘা সরবরাহ করেছে। 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"এই সময় একদিন হাবড়ার [হাওড়ার] কালেক্টর [এবং ম্যাজিস্ট্রেট] কুক-সাহেব কোনো কার্যোপলক্ষে [কার্যটি কী, তা উপরে জানিয়েছি] দুপুরবেলা মঠে আসেন। সাহেব ফটকে প্রবেশ করিতেই [স্বামীজীর পোষা] সারসটি ডাকিয়া উঠিল, এবং তাহার ডাক শুনিয়া কুকুরটিও তথায় উপস্থিত হইল। এক পার্শ্বে সারস, অপর পার্শ্বে কুকুরসহ সাহেব মাঠ পার হইয়া মঠগৃহের নিকটে আসিয়া উপনীত হইলে—স্বামীজী ও মহারাজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] প্রভৃতি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। কুক-সাহেব বলিলেন, 'আপনাদের পূর্বেই সারস ও কুকুর আমাকে অভিবাদন করিয়া লইয়া আসিয়াছে। জীবনে এমন সাদর অভ্যর্থনা কখনও পাই নাই'।"

বলাবাহুল্য সাহেব পুরো বুঝে গিয়েছিলেন—এটি অবশ্যই মঠ, কারণ সাহেবের স্বদেশে খ্রীস্টীয় সাধুনিবাসে এমনই সারমেয় রক্ষী থাকে। সাহেব স্বদেশী ছিলেন।

মামলার পটভূমি কী ছিল? জাত-ভাঙা সাধু বিবেকানন্দকে কব্জা করার একটা সুযোগ অবশ্য বালী মিউনিসিপ্যালিটির কর্তারা পেয়েছিলেন। মঠ স্থাপিত হয়ে গেলেও, মঠের জমি তখনো স্বামীজীর নামে। ট্রাস্ট-ডীড্ ক'রে জমি হস্তান্তরিত করতে কিছু দেরি হয়েছিল। যেসব পাশ্চাত্য ভক্তদের টাকায় সম্পত্তি কেনা হয়, তাঁরা অবিলম্বে ট্রাস্ট-ডীড্ করতে বাধা দিচ্ছিলেন। তাঁরা স্বামী বিবেকানন্দকে চিনতেন, কিন্তু স্বামীজীর দু'একজন গুরুভাই ছাড়া

অন্যরা তাঁদের যথেষ্ট চেনাশোনার গণ্ডির মধ্যে ছিলেন না। যাই হোক, স্বামীজী এর পরে সমস্ত বাধা সরিয়ে দিয়ে ট্রাস্ট-ডীড্ করেন, এবং হাওড়ার সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে এসে তাতে স্বাক্ষর করেন, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০১।

॥ পাঁচ ॥

তবু স্বামীজীর অব্যাহতি ছিলনা। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংসারযন্ত্রণা ভোগ করবেন—বিধাতার সঙ্গে এমন শর্ত করেই তো তিনি পৃথিবীতে অবতরণের ছাড়পত্র পেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, সংসার ছাড়লেই তার যন্ত্রণা যাবে। হায়!

স্বামীজী পুনশ্চ পারিবারিক মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। এ মামলা প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে। স্বামীজী তাঁর মা ভুবনেশ্বরী দেবীকে বড্ডই ভালোবাসতেন। তাঁর সংসারত্যাগে মায়ের দুঃখকষ্টের জীবন নিয়ে তাঁর যন্ত্রণার সীমা ছিলনা। অন্তরালে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এই নিয়ে খুবই ঝগড়াঝাটি করতেন। শেষজীবনে তো বলতেনই, ঠাকুর, তোমার বোঝা অনেক বয়েছি, এবার নিজের মায়ের কাছে ফিরে যাব, যদি বৃদ্ধাকে একটু স্বস্তি দিতে পারি। মায়ের যাতে ছোট একটি নিজস্ব বাড়ি হয় সেজন্য নিজের রাজকীয়তা পর্যন্ত ত্যাগ ক'রে, কাতরভাবে খেতড়ির রাজার কাছে ভিক্ষা পর্যন্ত করেছেন। বাড়ি তৈরির টাকা মেলেনি। এধারে পূর্বে মামলায় জেতা বাড়ির অংশ অধিকার ক'রে আছেন তারকনাথ দত্তরা। যিনি সেই কাজটি করেছেন সেই তারকনাথ দত্তের বিধবা স্ত্রীর অবস্থা কিন্তু শোচনীয়। "একজন ধনী বিধবা দালালদের প্রবঞ্চনা ও শোষণের বস্তু হয়ে থাকেন। তাই কোর্টে তিনি পরপর দুইবার যান। ফলে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যান।" (ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রদত্ত তথ্য)। এই অবস্থায় তিনি স্বামীজীর কাছেই অর্থভিক্ষা করেন। স্বামীজী তাঁকে সাহায্য করেন, কিন্তু একেবারে নিঃশর্তে নয়। কী ঘটেছিল, তা মিসেস ওলি বুলকে লেখা স্বামীজীর ৬ অগস্ট ১৮৯৯ তারিখের চিঠি থেকে দেখতে পাই:

"দুশ্চিন্তা? সম্প্রতি তা যথেষ্ট। আমার খুড়িকে আপনি দেখেছেন—তিনি আমাকে ঠকাবার জন্য তলে-তলে চক্রান্ত করেন। তিনি ও তাঁর পক্ষের লোকজন আমাকে বলেন, ৬০০০ টাকায় বাড়ির অংশ বিক্রয় করবেন, আর তা আমি সরল বিশ্বাসে ৬০০০ টাকায় কিনি। তাঁদের আসল মতলব, তাঁরা বাড়ির অধিকার দেবেন না, এই বিশ্বাসে যে, আমি সন্ন্যাসী হয়ে জোর ক'রে বাড়ির দখল নেবার জন্য কোর্টে যাব না।"

স্বামীজী কিন্তু মামলা করেছিলেন। তিনি অনুভব করেন, তাঁর জীবনের শেষ ঘনিয়ে আসছে। মাকে গৃহহারা ক'রে যাবেন, এই অসহ্য চিন্তা তাঁকে মামলা করতে প্রণোদিত করেছিল। মামলার অপমান যন্ত্রণা তাঁকে কুরে কুরে খেয়েছে। মামলার জন্য মঠের তহবিল থেকে ৫০০০ টাকা ধার করেছিলেন। সেজন্য পাশ্চাত্য ভক্তদের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। শেষপর্যন্ত মৃত্যুর কয়েকদিন আগে আপসে মামলার নিষ্পত্তি হয়। স্বামীজী মঠের ঋণশোধও করতে পারেন।

॥ ছয় ॥

আইনের জগতকে স্বামীজী হাড়ে-মজ্জায় চিনেছিলেন। বংশানুক্রমে তাঁর সেই শিক্ষা। ন্যায়ালয়ে সমবেত হয় ন্যায়প্রার্থী এবং অন্যায়কারী। অন্যায়কারীদের সংখ্যাই বেশি, তাদেরই শারীরিক ও আর্থিক প্রতিপত্তি। ন্যায়প্রার্থীরা প্রায়শই দরিদ্র। ন্যায় কিনবার চেষ্টায় তারা হৃতসর্বস্ব, সুবিচার পায়না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।' তাছাড়া আইনের এই জগৎ গতিহারা। যেখানে মানুষকে ছুটতে হবে দুরন্ত বেগে—নতুন নতুন দর্শনের আবেগে আনন্দে এবং সৃষ্টির পাগল নেশায়—সেখানে আইনের জাল সর্বাঙ্গে জড়িয়ে থাকলে সে নিরুপায় বন্দী। বন্দী প্রোমিথিউস। তিনি অগ্নি আহরণ করেছেন—সে আগুন ছড়িয়ে দিতে হবে পৃথিবীতে। একালের সভ্যতায় বিদ্যুৎ তারই প্রতীক। সংসারত্যাগী বিবেকানন্দের বিশেষ সাধনা—নিয়মের উপরে অবস্থান। সেই হলো মুক্তি। অপরপক্ষে যারা সংসারসীমার মধ্যে থাকবে, তারা যেন বিদ্যুতের মশাল তুলে নেয়। স্বামীজী তাই নিজের ভাই মহেন্দ্রনাথকে কোনোমতে আইন পড়তে দেননি। মহেন্দ্রনাথ 'বৈদ্যুতিক' হোক, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়, কেবল ব্যক্তিপ্রয়োজনে নয়—জাতীয় প্রয়োজনেও।

একটি চিঠি উদ্ধৃত করেই শেষ করব। স্বামীজী মিসেস ওলি বুলকে লন্ডন থেকে ৫ জুন ১৮৯৬ তারিখে লিখেছিলেন:

"আমার পিতা উকিল ছিলেন, তবু আমি চাইনা আমার কোনো প্রিয়জন উকিল হোক। আমার গুরুদেব এর বিরোধী ছিলেন। আমার বিশ্বাস, যে-পরিবারে একাধিক উকিল আছে সে পরিবারের বরাতে দুঃখ অনিবার্য। আমাদের দেশ উকিলে ভর্তি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে শত শত উকিল বেরুচ্ছে। জাতির এখন প্রয়োজন তেজ-বীর্য এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। তাই আমি চাই, মহিম [মেজভাই মহেন্দ্রনাথ] ইলেকট্রিসিয়ান হোক। যদি সে ব্যর্থও হয় তবু আমি এই ভেবে তৃপ্তি পাব যে, সে জীবনে বড় হবার এবং দেশের যথার্থ উপকারে লাগবার চেষ্টা করেছিল।...কেবল আমেরিকার বাতাসে এমন-কিছু আছে যা মানুষের ভিতরের সকল ভালো বস্তুকে প্রকাশ ক'রে দেয়।...আমি চাই, মহিম বেপরোয়া ও সাহসী হোক, নিজের এবং দেশের জন্য নতুন পথ কেটে বার করার লড়াই করুক। আর, একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ভারতে ক'রে খেতে পারবে।"

[১৯৯১, ফেব্রুয়ারি মাসে হাওড়া রেজিস্ট্রি কোর্টে স্বামী বিবেকানন্দের আগমন স্মরণে হাওড়ার নাগরিকদের পক্ষে এক স্মারকলিপি খোদিত হয়েছে। সেই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় লেখাটি প্রকাশিত হয়।]

বিবেকানন্দ ও যুব আন্দোলন

॥ এক ॥

স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ ক'রে ভারতবর্ষে যুববর্ষের সূচনা হোক—ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত কেবল একটি ঐতিহাসিক সত্যের কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য স্বীকার্য আদর্শের ঘোষণাও বটে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক আকারে যুব আন্দোলন বিবেকানন্দই সৃষ্টি করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে খণ্ডাকারে আন্দোলন অবশ্য শুরু হয়েছিল তাঁর আগেই। ইয়ং বেঙ্গল-এর কথা মনে আসবে, কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্মিতায় যুবকদের উন্মাদনার কথাও। পুনার ডেকান এডুকেশন সোসাইটি, ফার্গুসন কলেজকে কেন্দ্র ক'রে যুবসংগঠন, মাদ্রাজের তরুণ সমাজসংস্কারক গোষ্ঠী, কলকাতার হিন্দুমেলা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রীর সংগঠন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দীপক রাজনৈতিক বক্তৃতায় যুবকদের ভিড়—আরও নানা সংস্থা ও তরঙ্গ। মহৎ উদ্দেশ্য ও প্রেরণায় প্রবর্তিত এবং পরিচালিত এইসব তরঙ্গ এক মহাসাগরীয় সামগ্রিকতায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল—যখন ১৮৯৩-৯৪-৯৫ সালে দূর সমুদ্রপার থেকে ভারতবর্ষের উপর ধেয়ে এসেছিল বিবেকানন্দ-ঝঞ্ঝা। বিবেকানন্দকে সত্যই 'সাইক্লোনিক' বলা হয়েছে। সেদিনকার ভারতবর্ষের পত্র-পত্রিকায় সে আলোড়ন-সংবাদ লেখা আছে অজস্র অক্ষরে। তারপর ১৮৯৭ সালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দের প্রত্যাবর্তন ও বক্তৃতা-অভিযান, রোমা রোলাঁ যার প্রসঙ্গে বলেছেন: "তিনি চলিলেন বিজয়ীর বেশে, সঙ্গে চলিল অগণিত মানুষের উন্মত্ত জনতা; রাজারা সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইল, কামান গর্জিয়া উঠিল: দলে-দলে চলিল হস্তী, উষ্ট্র; ধ্বনিত হইল জুডাস ম্যাকাবিয়াসের বিজয়সঙ্গীত; বক্তৃতার পর বক্তৃতায় তিনি বাতাসে বাণীর বীজ উড়াইয়া চলিলেন,....সে ঘোষণা শঙ্খধ্বনির মতো,...তাহা পুনরায় জাগ্রত হইতে আহ্বান করিল; ভারতের শৌর্যশীল মানস-সত্তাকে, অমর আত্মাকে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতে বলিল। তিনিই ছিলেন সেনাপতি।" এই ঘটনার দু'বৎসরের মধ্যে, ১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দকে মনে রেখে যদি নাও হয়, তবু অসন্দিগ্ধভাবে বিবেকানন্দের যৌবন-ঝঞ্ঝামূর্তির রূপাঙ্কন করেছিলেন: "রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম, গর্বিত নির্ভয়, বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে, বুঝিলাম নাই বুঝিলাম, জয় তব জয়।" পরবর্তীকালে যে-অগণিত বিপ্লবী যুবককে বিবেকানন্দের প্রাণ ও বাণী মৃত্যুর দিকে ছুটতে প্রেরণা দিয়েছিল, তাদের জীবনসত্যকে রবীন্দ্রনাথ পূর্বাহ্নে প্রকাশ করেছিলেন মহাকবির দিব্য প্রতিভায় একই 'বর্ষশেষ' কবিতায়—"চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন, হেরিব না দিক—গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার, উদ্দাম পথিক। মুহূর্তে করিব

পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা উপকণ্ঠ ভরি, খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা উৎসর্জন করি।" ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের পক্ষে বিস্ময়কর এই রচনা—বেপরোয়া বিপ্লবীর যৌবনধর্মের যা মর্মবাণী। বিবেকানন্দই যে যৌবনাগ্নি জ্বালিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সে-বিষয়ে স্বীকৃতি জানান বহু বছর পরে, ১৯২৮ সালে, গোটা বিপ্লব আন্দোলনের রূপ পর্যবেক্ষণ ক'রে, যখন তিনি বলেছিলেন:

"বাঙলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই, তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।"

যুবকদের 'দুঃসাহসিক অধ্যবসায়' কেবল বৈপ্লবিক আন্দোলনেই প্রকাশিত হয়নি, কিংবা কেবল বাঙলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছেন, বিবেকানন্দের বাণীতে ছিল "সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন," তখন জাতীয় আন্দোলনের সর্বস্তরে বিবেকানন্দের প্রেরণার স্বীকৃতি আছে। দেখা যায় যে, সে প্রেরণায় সাড়া দিয়েছিল প্রধানত যুবকরাই।

॥ দুই ॥

আহ্বান প্রথমে আসে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। তিনি বুক-চেরা স্বরে ডেকেছিলেন—'ওরে, কে কোথায় আছিস্, আয়।' সে-ডাক বিশেষভাবে কিশোর যুবকদের জন্যই। যুব আন্দোলন শুরু হলো—ঘর ছেড়ে পথে নামার জন্য। আপাতভাবে তা ঈশ্বরের জন্য সর্বস্বত্যাগের সাধনা—কিন্তু সেই ঈশ্বরকে মানুষের মধ্যে দর্শনের শিক্ষা রামকৃষ্ণই দিয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন তখন তাঁর বয়স—১৮। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে তিনি বরাহনগর-মঠ স্থাপন করেন ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে, বয়স তখন ২৩। পরিব্রাজক জীবন শুরু হয় ২৪ বৎসর বয়সে। ৩০ বৎসরে শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিশ্বখ্যাতি। ৩৪ বৎসরে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন। ৩৯ বৎসরে যৌবনের অপর সীমান্তে দেহত্যাগ। রামকৃষ্ণ আন্দোলন সংগঠনে বিবেকানন্দের প্রধান সহযোগী ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, প্রেমানন্দ, অভেদানন্দ, তুরীয়ানন্দ—বিবেকানন্দের প্রায় সমবয়সী। অখণ্ডানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ কয়েক বৎসরের ছোট। এক কথায় রামকৃষ্ণ আন্দোলন তার সূচনাপর্বে যুব আন্দোলন, অন্তত বলা যায়, যুবকদের আন্দোলন।

এই যুবকদের যৌথ সাধনা সম্বন্ধে বহুদর্শী মহেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এ-জিনিস দুর্লভ। ১৮৮৭ সালের মাঝামাঝি নরেন্দ্রনাথের আকার, প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথের রচনায় এইপ্রকার:

"তখন তাঁহার মানসিক ও শারীরিক কষ্ট দুর্বিষহ। গুরুভাইদের লইয়া, উচ্চ উদ্দেশ্য করিয়া, এক মঠ স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে মহা কষ্ট, অনাহার, অনিদ্রা, সকলেই বিবস্ত্র, বিকট, মলিন, রাত্রে শয়ন ধরণীতলে। বাড়িতে স্বজনেরা অন্নাভাবে কাতর ও নিরাশ্রয়।... আহার—এর-ওর বাড়িতে ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ। চারিদিকে লোকে বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেছে: 'নরেন পাগলা হয়ে গেছে; কি বলে, কি কয়, কথার মাথামুণ্ডু নেই; শঙ্কর, উপনিষদ, পঞ্চদশী—ওসব আবার কি জিনিস।' .....নরেন্দ্রনাথের পূর্বপরিচিত এক বন্ধু

বলিল, 'তাই ত হে, নরেন্দ্র পাগলা হয়ে বেরিয়ে গেল। এত বচ্ছর গলা সেধে গানটা শিখলে, সব মাঠে মারা গেল।' এইরূপে চারিদিকে বিকট কটুবাক্য নরেন্দ্রনাথের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। সমস্ত দিনরাত তাহার জপ-ধ্যান, শরীরের প্রতি লক্ষ্য নাই, গায়ে ধূলাকাদামাখা, বড়-বড় নখ, মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল কাদাভর্তি, হুঁশ নাই, দেহ কৃশ, চোখের কোল বসিয়া গিয়াছে। মনটা শরীর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে, অনেক কষ্টে দেহের ভিতর তাহাকে টানিয়া আনিতে হইতেছে।"

এহেন পরিবর্তন দেখে, পূর্বে নরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রসন্ন, এখন বিরক্ত, কোনো-কোনো সংস্কারবাদী ব্যক্তি তাঁকে নবপরিচয়ে চিহ্নিত করেছিলেন—'ভ্যাগাবণ্ড ছোঁড়া।' অভিজাতগণের মূল্যায়ন ঐ প্রকারই ছিল। নরেন্দ্রনাথের চেয়ে দুই বৎসরের বড় রবীন্দ্রনাথ সামাজিক দৃষ্টিমতো কী দেখেছিলেন জানিনা (যদি আদৌ তিনি ঐকালে নরেন্দ্রনাথকে ঐ রূপে দেখে থাকেন)। কিন্তু দুর্জ্ঞেয় প্রতিভার রহস্য। নরেন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন তাঁর রচনায়—ধরে নেব অবশ্যই তাঁর অজ্ঞাতে। ১৮৮৬-৯২ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথের কঠোর তপস্যা; দুঃসাহসিক বিপদসংকুল পরিব্রাজক জীবন; ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথম ভাগে তাঁর সাফল্য-গৌরবে আলোড়িত ভারতবর্ষ; তৎসহ শিহরিত এবং আতঙ্কিত ভারতবর্ষ—কী স্পর্ধা যুবকটির—কালাপানি পারে যাওয়ার নিষেধ কেবল ভেঙেছে তাই নয়, রক্ষণশীলদের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য ক'রে বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে আদান-প্রদানের ডাক দিচ্ছে ভারতবর্ষকে!! এই সময়েই মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকা লিখেছিল (১মে, ১৮৯৪): "কয়েকমাস আগে স্বামীজী যখন বোম্বাইয়ে এক স্টিমারের ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, তখন তিনি কালাপানির পারে যাওয়ার বিরুদ্ধে যে-কুসংস্কার আছে তার মাথা থেঁতলে দিয়েছিলেন।... একজন সন্ন্যাসী তাঁর স্বদেশের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো কুসংস্কারের উপরে এতখানি উঠতে পারলেন যে, কেবল মুখের কথায় নয়, কাজেও দেখালেন, আসল হিন্দুধর্ম কী! এই ঘটনার বিপুল তাৎপর্য কেবল এখনকার অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন পর্যবেক্ষকের কাছেই ধরা পড়বে, এবং ভবিষ্যতে বহু যুগ ধরে তা উদ্‌ঘাটিত হবে।" আমরা দেখি, একই কালে রবীন্দ্রনাথ রঙ্গময়ী কল্পনার দোলায়িত প্রলোভন থেকে অব্যাহতি চেয়ে এমন এক মহাযাত্রার কবি-দ্রষ্টা হতে চেয়েছিলেন—যে-যাত্রাপথে সেই কালে বিবেকানন্দকে দেখা গিয়েছিল। ১৮৯৪-এর মার্চ মাসে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার বিখ্যাত লাইনগুলি স্মরণে আসে: "স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ/ বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।/ মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে/ নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা/ মৃত্যুরে করি না শঙ্কা।" মহাকাব্যিক ছত্রগুলি আছড়ে পড়েছিল: "তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে।" মহাপথিকেরা মৃত্যুর গর্জনকে শোনেন সঙ্গীতের মতো। ছিন্নকন্থা পরে পথের ভিক্ষুক হয়ে পড়েন। সহ্য করেন সংশয়ের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন। তাঁদের পদতল বিদ্ধ করে প্রত্যহের কুশাঙ্কুর। তাঁদের অবিশ্বাস করে মূঢ় বিজ্ঞজন। পরিহাস করে প্রিয়জন—অতি পরিচিত অবজ্ঞায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই অংশের প্রতিটি বক্তব্যকে বিবেকানন্দের জীবনের বাস্তব ঘটনার পাশে রেখে প্রায় আক্ষরিকভাবে মিলিয়ে দেওয়া যায়।

বিবেকানন্দ একা নন, তাঁরই মতো রামকৃষ্ণের অন্য শিষ্যরাও পথে ঘুরছিলেন—

ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, শিবানন্দ, অখণ্ডানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, তুরীয়ানন্দেরা। তাঁদের সম্পর্কে বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকেই লিখেছিলেন 'মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর'-এ (ইন্ডিয়ান মিরারে বেরিয়েছিল ৩ নভেম্বর ১৮৯৪):

"শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য চরণস্পর্শে যে-মুষ্টিমেয় যুবকদলের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহাদের দিকে চাহিয়া দ্যাখো। আসাম হইতে সিন্ধু—হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত—তাহারা পদব্রজে বিশ হাজার ফুট ঊর্ধ্বে হিমালয়ের তুষাররাশি অতিক্রম করিয়া তিব্বতের রহস্য ভেদ করিয়াছে। [অখণ্ডানন্দ, ত্রিগুণাতীত তিব্বতে গিয়েছিলেন]। তাহারা চীরধারী হইয়া দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছে। কত অত্যাচার তাহাদের উপর দিয়া গিয়াছে। পুলিশ তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, কারাগারে তাহারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।...

"এখন তাহারা বিংশতিজন মাত্র। কালই তাহাদের সংখ্যা দুই সহস্রে পরিণত করো। বাঙলার যুবকগণ! তোমার দেশের জন্য ইহা প্রয়োজন, পৃথিবীর জন্য ইহা প্রয়োজন। অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তি তোমরা জাগাইয়া তোলো। সে শক্তি তোমাদিগকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উষ্ণতা—সবকিছু সহিবার সামর্থ্য দিবে। বিলাসপূর্ণ গৃহে বসিয়া, জীবনের সকল স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবৃত থাকিয়া, অল্প-স্বল্প শখের ধর্ম করা অন্য দেশের পক্ষে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু ভারতের অন্তরের প্রেরণা উচ্চতর। ভারত সহজেই মুখোশ চিনিতে পারে। মুখোশ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও। মহৎ হও। ত্যাগ করো। ত্যাগ ভিন্ন মহৎ কাজ সম্পন্ন হয়না।... সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নাম, যশ, পদ—এমনকি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া, মানবদেহের শৃঙ্খলদ্বারা, এমন একটি সেতু নির্মাণ করো, যাহার উপর দিয়া লক্ষ-লক্ষ মানুষ জীবনসমুদ্র পার হইবে।"

ভারতবর্ষের যৌবনশক্তির কাছে ১৮৯৪ সালের নভেম্বর মাসে বিবেকানন্দের এই প্রকাশ্য আহ্বান এসে গিয়েছিল, যা পরবর্তী কয়েক দশকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ভারতের গতিহারা ইতিহাসকে গতিশীল সংগ্রামের ইতিহাস ক'রে তুলবে। বিবেকানন্দ তাঁর ঐ বার্তাতেই যুব-নয়নে স্বপ্ন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কোন্ পতাকার নীচে তুমি যাত্রা করছ, সে পতাকার রঙ নীল, সবুজ বা লাল, তা গ্রাহ্য করো না। সমস্ত রঙ মিলিয়ে প্রকাশ করো প্রেমের শুভ্রবর্ণের তীব্রজ্যোতি। তিনি আরও বললেন: "একটি দৃশ্য প্রত্যক্ষ জীবনের মতো স্পষ্ট দেখিতেছি—আমাদের সেই প্রাচীনা মাতা আবার জাগিয়া উঠিয়াছেন; পুনর্বার নবযৌবনশালিনী ও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিতা হইয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন।"

এই আকারে আহ্বান ভারতের যুবশক্তির কাছে আগে আসেনি। বাঙলাদেশে তার তৎক্ষণাৎ কোন্ প্রভাব পড়েছিল, তা মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকে দেখা যেতে পারে:

"রচনাটি প্রকাশিত হইলে শহরে যেন হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কি ট্রামে, কি স্কুল-কলেজে, কি অফিসে—সর্বদিকে ঐ কথা।...জাতিগত ভাব, জাতিগত ইচ্ছা, জাতিগত প্রাধান্যের ভাব জাগিয়া উঠিল।... এরূপ ভাব আর কখনো বাঙালী জাতির মধ্যে দেখা যায় নাই। প্রত্যেক লোকের মধ্যে মহাবীরের ভাব উঠিতে লাগিল। সকলেই যেন বিশ্ববিজয়ী। এরূপ

সাহসপূর্ণ উন্মাদনার বাণী বাঙালী পূর্বে শোনে নাই। শহরময় একটা গম্‌গমে ভাব। এই সময় হইতে প্রকাশ্যে কেহ আর স্বামীজীর নিন্দা করিতে সাহস করিত না। কারণ তাহা হইলে যুবকদের নিকট প্রহার খাইবার সম্ভাবনা ছিল। যুবকেরা তখন উন্মাদনায় অস্থির। বক্তৃতাটি অবিলম্বে কালীবেদান্তীর তত্ত্বাবধানে প্যামফ্লেটরূপে প্রকাশিত হইল। প্যামপ্লেটখানি খুব বিক্রয় হইতে লাগিল।"

কেবল বাঙলাতেই ঢেউ উঠল না। উপরের রচনাটি ভবিষ্যতে কোন্ কাণ্ড ঘটাবে (যা সত্যই ঘটিয়েছিল) সে-বিষয়ে মাদ্রাজের সাহেবী কাগজ মাদ্রাজ টাইমস সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেছিল:

"সুমহান খ্রীস্টান প্রচারক সেন্ট পল দূর দেশ থেকে যেসব পত্র পাঠিয়েছিলেন—এবং সেই পার্চমেন্টে লেখা পত্রগুলির উপরে করিন্থিয়ান, ইফিসিয়ান এবং গলাসিয়ানরা যেভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ত—ঠিক সেইপ্রকার শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গে সুমহান হিন্দু প্রচারকের কথাগুলিকে গ্রহণ করা হবে বলেই মনে হয়।...এমনকি আমরা এ-আশাও প্রায় করতে পারি—করিন্থ বা ইফিফাসের নাগরিকেরা সেন্ট পলের পত্র যেভাবে স্বাগত জানাত, মাদ্রাজের নাগরিকেরা স্বামীজীর পত্রকে তারো চেয়ে বেশী অনুরাগের সঙ্গে আবাহন করবে।"

॥ তিন ॥

সুতরাং যুব-আন্দোলন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দকে সর্বভারতীয় পটভূমিকাতে দেখাই সঙ্গত। বিবেকানন্দের প্রথম বৃহৎ স্বীকৃতি তো মাদ্রাজেই ঘটেছিল, সেজন্য মাদ্রাজীরা বাঙালীদের কিছু-বিলম্বিত বিবেকানন্দ-উৎসাহকে কটাক্ষে বিদ্ধ করতে কদাপি ছাড়েন নি। "বিবেকানন্দ এখন বিখ্যাত, তাই বাঙালীরা তাঁর বিষয়ে উৎসাহী। বাঙলা বিবেকানন্দের জন্ম দিয়েছে, কিন্তু তাঁকে আবিষ্কার করেছে মাদ্রাজ। কোনো প্রফেটই স্বভূমিতে সম্মানিত হন না"—এই ধরনের কথা বারবার মাদ্রাজের সংবাদপত্রে লিখিত, এবং সভাসমিতিতে কথিত হয়েছে।

পরিব্রাজক অবস্থায় বিবেকানন্দের আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশ—দুই পর্বই দেখা গেছে। যখন উত্তর ও পশ্চিমভারতে তিনি ভ্রমণ করেছেন তখন বিশেষভাবে তাঁর নিভৃত সাধনা ও একান্ত শিক্ষার কাল, সেজন্য ঐ সময়কার প্রাপ্ত সংবাদ অপ্রচুর। তবে ইতস্তত লব্ধ স্মৃতিকথায় ঝলকের অভাব নেই। যেখানেই গেছেন, তাঁর অবস্থিতি গোচর হওয়া মাত্র, সর্বশ্রেণীর ও সর্বসম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর চতুর্দিকে জুটেছে, তার মধ্যে, ধরে নেওয়া যায়, যুবকদের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। তবে তখনকার দিনে প্রবীণ বিজ্ঞতার এমনই মর্যাদা, এবং যুব-চাঞ্চল্য এমনই ভ্রূকুটির বস্তু যে, বিবেকানন্দের কাছে যুবকদের উপস্থিতির ব্যাপারটি বিশেষভাবে লিখে রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। তবু যেহেতু বিবেকানন্দ মানে যৌবনের ডাক যৌবনের উদ্দেশ্যে, তাই রাজপুতনার আলোয়ারে তাঁর অবস্থান-বিবরণে পেয়ে যাই—তিনি যুবকদের বলেছেন, "সংস্কৃত পড়ো এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চা করো। সব জিনিসকে

যথাযথভাবে দেখতে ও বলতে শেখো। পড়ো, খাটো—যাতে দেশের ইতিহাসকে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে নতুন করে গড়ে তুলতে পারো।" ইংরেজের লেখা ইতিহাসে কেবল ভারতের পতনের কথা, দুর্বলতার কাহিনী। যাঁরা ঐসব ইতিহাস লিখেছেন তাঁরা "ভারতের ধর্ম-দর্শনের সঙ্গে অল্পই পরিচিত—তাঁরা কেমন ক'রে বিশ্বস্ত ও নিরপেক্ষভাবে ভারতের ইতিহাস লিখবেন?" স্বাধীনভাবে তথ্যানুসন্ধান ক'রে ভারতবর্ষের "ইতিহাস সংকলনকে নিজ জীবনের সাধনারূপে গ্রহণ করবার জন্য" তিনি যুবকদের কাছে আবেদন করেছিলেন। নিজের হারানো ছেলেকে ফিরে না-পাওয়া পর্যন্ত মানুষ যেমন অশান্ত থাকে, সেইপ্রকার আকুলতা নিয়েই ভারতের লুপ্ত ইতিহাস সন্ধান ক'রে যদি তাকে উদ্ধার করা যায়, "তবেই হবে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা—সে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠবে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ।"

সর্বাত্মক জাগরণের জন্য প্রয়োজনীয় কৃত্যগুলি তুলে ধরার প্রযত্নে বিবেকানন্দ আলোয়ারের এক যুবকের কাছে কৃষিজ অর্থনীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তথাকথিত উচ্চশিক্ষা, যা না-দেয় আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতা, না-দেয় চরিত্র ও তার দৃঢ়তা—তার প্রলোভন ছেড়ে তিনি শিক্ষিত যুবকদের গ্রামে গিয়ে কৃষিকাজ করতে প্রণোদিত করেছিলেন। কৃষির সঙ্গে যথার্থ উচ্চশিক্ষার বিরোধ তিনি স্বীকার করেন নি। জনক রাজার প্রতীক দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন—জনক এক হাতে লাঙল অন্য হাতে বেদ ধারণ করেছেন। কৃষি কী পরিমাণে আমেরিকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়িয়েছে, তার উল্লেখের পরে স্বামীজী বলেছিলেন, ভারতে আর মান্ধাতার আমলের পুরনো পদ্ধতিতে চাষ চলবে না। শহুরে শিক্ষিত লোকদের গ্রামে বসবাস করার প্রয়োজন প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তার মূল্য আজও কমেনি: "লেখাপড়া-জানা লোক পল্লীগ্রামে বাস করলে, আর চাষবাসটা বিজ্ঞান-সাহায্যে করলে, উৎপাদন বেশি হয়; চাষাদের চোখ খুলে যায়, লেখাপড়া করতে ইচ্ছা হয়, আর যেটা আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা বেশি আবশ্যক তাও হয়।"

বিবেকানন্দের কাছে সেই "সর্বাপেক্ষা বেশি আবশ্যক" জিনিসটা হলো:

"এই ছোটজাত আর বড় জাতের মধ্যে যেন একটা ভাই-ভাই ভাবে মেশামেশি হয়।...এখন অত্যাবশ্যক [কাজ] জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া, ধর্মের উচ্চ-উচ্চ ভাব দেওয়া, পরস্পর সহানুভূতি ভালবাসা, উপকার করতে শেখানো।"

স্বামীজী ঐ যুবকদের বলেছিলেন:

"তোমরা আলোয়ারবাসী যে-কয়জন যুবক আছো, তোমরা সকলেই চমৎকার মানুষ। আশা করি, অচিরে তোমাদের অনেকেই সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ এবং জন্মভূমির গৌরবের হেতুস্বরূপ হয়ে উঠবে।"

রাজপুতনার এক ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য খেতড়ি, তার যুবক-রাজা অজিত সিং, অপরিচিত পরিব্রাজক এক তরুণ সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব নিয়েছিলেন। তার মূল্যও তাঁকে দিতে হয়েছে। কেবল যে তিনি প্রজাকল্যাণের নানা ব্যবস্থা করেছিলেন তাই নয়, এমন মুক্তদৃষ্টি হয়ে ওঠেন যে, নিজের উপর টেনে এনেছিলেন "অবর্ণনীয় দুর্গতি"—সামাজিক সংস্কার লঙ্ঘন ক'রে। সমাজসংস্কারক বি এম মালাবারির 'ইন্ডিয়ান স্পেকটেটর' কাগজে ৩১ অক্টোবর ১৮৯৭, লেখা হয়: "মহারাজা স্বীকার করেছেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কাছে মহাঋণী। অধ্যাত্মপথ প্রদর্শনের ঋণই কেবল নয়, পাশ্চাত্যের

জ্ঞানলাভের প্রেরণা তিনিই দিয়েছেন। সেইসঙ্গে দিয়েছেন বিদেশ ভ্রমণের প্রেরণা, যার দ্বারা আত্মসংস্কার করা যাবে, এবং নিজ দেশ ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে নবজাগরণ আনা যাবে।”

স্বামীজী খেতড়ির তরুণ রাজাকে কিভাবে বিজ্ঞানশিক্ষা দিয়েছেন, টেলিস্কোপের সাহায্যে রাত জেগে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে শিখিয়েছেন, তার দৈনন্দিন বিবরণ বেণীশংকর শর্মা তাঁর ‘এ ফরগটন্ চ্যাপটার’ গ্রন্থে দরবারী নথি উদ্ধৃত ক’রে দেখিয়েছেন।

হরবিলাস সর্দা নামী সমাজসংস্কারক, অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিবাহ-নিরোধক আইনের (সর্দা-আইন) প্রবর্তক হিসাবে বিখ্যাত—যৌবনে তিনি আবু পাহাড় ও আজমীর, এই দুই জায়গায় পরিব্রাজক বিবেকানন্দকে বেশ কয়েকদিনের জন্য নিকট থেকে দেখেন। মাতৃভূমি ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে স্বামীজীর গভীর ভালোবাসা তাঁকে অভিভূত করে। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে স্বামীজীকে দীর্ঘ আলোচনা করতেও তিনি দেখেছেন। মহারাষ্ট্রের পুনায় তিলকের গৃহে স্বামীজীর অবস্থান, ৩৫ বৎসর বয়স্ক তিলকের সঙ্গে ৩০ বৎসরের বিবেকানন্দের দীর্ঘ আলোচনা, বিবেকানন্দের শাস্ত্রজ্ঞান ও বাগ্মিতায় তিলক ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মুগ্ধতার কথা জেনেছি; কোলাপুরে বিবেকানন্দের চমকপ্রদ আত্মপ্রকাশের কথাও। দুঃখের বিষয়, এই সকল বিবরণ নিতান্ত অসম্পূর্ণ।

অনেকখানি ক্ষতিপূরণ হয়েছে—দক্ষিণ ভারতে যুবকদলের মধ্যে স্বামীজীর আবির্ভাব কোন্ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তার বিবরণ থেকে। এই সময়কার একটি স্মৃতিকথা থেকে স্বামীজীর চেহারাটা দেখে নেওয়া যায়:

> “এক সন্ন্যাসী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাস করেছেন, মুণ্ডিত মস্তক, চেহারা চমৎকার, পরনে গেরুয়া। ইংরাজি ও সংস্কৃতে অনর্গল কথা বলেন, বিরুদ্ধ কথার পালটা জবাবে অসাধারণ দক্ষ, যখন খোলা গলায় ললিত কণ্ঠে গান ধরেন মনে হয় যেন বিশ্বাত্মার সঙ্গে একীভূত, বিপুল বিশ্বের মহাযাত্রী তিনি। মানুষটি স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘাবয়ব, রসিকতায় ভরপুর, সিদ্ধাই সম্বন্ধে ঘৃণায় পূর্ণ। সুপক্ক খাদ্যে তৃপ্তি আছে, তাম্রকূট সেবনে বিশেষ প্রীতি, অথচ এমন গভীর আন্তরিকতা ও সারল্যের সঙ্গে বৈরাগ্যের কথা বলেন যে, মন মুগ্ধ হয়ে যায়, শ্রদ্ধায় নত হয় মাথা। এহেন এক বাস্তব কাণ্ডের সামনে বি-এ ও এম-এ পাস ব্যক্তিরা হতভম্ব হয়ে যেত। তাঁর মধ্যে এমন একজন মানুষের সাক্ষাৎ তারা পেত যিনি অধ্যাত্মক্ষেত্রে কেউ মল্লযুদ্ধ বা অসিযুদ্ধ করতে এলে উপযুক্ত উত্তর দেবার মতো বীরযোদ্ধা; আবার গভীর আলোচনার পরে হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গবিদ্রূপে কোনো কিছুকে হেসে উড়িয়ে দিতে পটু। সে সব ছেড়ে দিলেও—তাঁর অবিমিশ্র অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম সকলের চিত্ত জয় করত। এই যুবক—সংসারের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, বন্ধনমুক্ত—এঁর একটিমাত্র ভালবাসার বস্তু—স্বদেশ। এঁর একটিমাত্র বিষাদের কারণ—স্বদেশের পতন। এই বিষয়ে চিন্তামগ্ন অবস্থায় তিনি এমন সব কথা বলতেন, তা শুনে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে থাকত। হুগলী নদী থেকে তাম্রপর্ণী নদী পর্যন্ত পর্যটক মানুষটির রূপ এই। তিনি মুক্তকণ্ঠে যুবক সম্প্রদায়ের নির্বীর্যতার জন্য দুঃখ করতেন। যখন সমালোচনা করতেন তখন বিদ্যুতের মতো বেরিয়ে আসত তাঁর বাক্য, ইস্পাতের

Letter to Vivekananda

ESPLANADE HOUSE
BOMBAY

Nov. 23. 1898

Dear Swami Vivekanand.

I trust that you remember me as a fellow traveller on your voyage from Japan to Chicago. I very much recall at this moment your views on the growth of the ascetic spirit in India & the duty, not of destroying, but of diverting it into useful channels.

I recall these ideas in connection with my scheme of a Research Institute for India, of which you have doubtless heard or read. It seems to me that no better use can be made of the ascetic spirit than the establishment of monasteries or residential halls for men dominated by this spirit, where they should live with ordinary decency & devote their lives to the cultivation of sciences — natural & humanistic. I am of opinion that if such a crusade in favour of an asceticism of this kind were undertaken by a competent leader, it would greatly help asceticism, science & the good name of our common country, & I know not who would make a more fitting general of such a campaign than Vivekanand. Do you think you would care to apply yourself to the mission of galvanising into life our ancient traditions in this respect? Perhaps, you had better begin with a fiery pamphlet rousing our people in this matter. I should cheerfully defray all the expenses of publication. With kind regards

I am, dear Swami
Yours faithfully
Jamsetji N. Tata

Jamsetji Tata
Nov. 23 '98

Swamee Vivekanand
~~Calcutta~~

স্বামী বিবেকানন্দকে লেখা জামসেদজী টাটার পত্র। প্রথম আমেরিকা-যাত্রার কালে স্বামীজীর সঙ্গে টাটার পরিচয় ঘটে। তখনই সেই অপরিচিত তরুণ সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী জামসেদ টাটাকে নিছক বাণিজ্যিক লেনদেনের বদলে উৎপাদনী শিল্পস্থাপনে উৎসাহিত করেন। টাটা মুগ্ধ হন। ১৮৯৮ সালে টাটা ভারতীয়দের তত্ত্বাবধানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপনে ৩০ লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব করেন। স্বতঃই ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষা সংকোচনে উদ্যোগী ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাধা সৃষ্টি করেন, তখন টাটা সাহায্য চেয়ে স্বামীজীকে পত্র লেখেন, তারই প্রতিলিপি।

NOTES OF SOME WANDERINGS
WITH THE SWAMI VIVEKANANDA
BY SISTER NIVEDITA OF
RAMKRISHNA-VIVEKANANDA.

Author of "The Web of Indian Life", "The Civic and National Ideals", "Cradle-Tales of Hinduism", "The Master as I saw Him" &c.

AUTHORISED EDITION,

1913.

EDITED BY THE SWAMI SARADANANDA

PUBLISHED BY THE BRAHMACHARI GONENDRA NATH
UDBODHAN OFFICE BAGHBAZAR, CALCUTTA

স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণের উপরে লিখিত নিবেদিতার গ্রন্থের নামপত্র। মাদ্রাজের ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় এপ্রিল ১৯০৬ থেকে ধারাবাহিকভাবে ১৯১০ পর্যন্ত প্রকাশিত এই ডায়েরি-নির্ভর লেখাটি লেখিকার দেহান্তের পরে ১৯১৩ সালে গ্রন্থাকারে বেরোয়। বইটির উপাদান স্বামীজীর জীবনীতে বহুভাবে ব্যবহৃত। এটি বিপ্লবের প্ররোচক বলে ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ইংলিশম্যান পত্রিকায় সমালোচিত।

A TRIBUTE OF AFFECTION.

TO

SWAMI VIVEKANANDA

BY

DR. JOHN [illegible] WYMAN
BROOKLYN, NEW YORK.

Brother Swami Vivekananda,
[illegible] of the Orient [illegible]
[illegible]

[illegible]
From the mystical East to our West,
And from those wise Vedas inspired
[illegible] the purest and best.

[illegible]
[illegible] ages of time;
[illegible] the Priest and the Prophet,
[illegible] faith all sublime.

[illegible]

[illegible] more bright!
[illegible] earth journey is finished
[illegible] garments of light!

১৫ জুলাই ১৮৯৯, 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় অধ্যাপক ডঃ জন ওয়াইম্যান-লিখিত কবিতা। ইনি পূর্ব আমেরিকার বুদ্ধিজীবী মহলে সুপরিচিত ছিলেন। স্বামীজীর বিষয়ে এঁর একাধিক কবিতা এই পত্রিকায় বেরিয়েছে।

SWAMI VIVEKANANDA
IN AMERICA
NEW DISCOVERIES

By
MARIE LOUISE BURKE

I have a message to the West as Buddha had a message to the East.
—SWAMI VIVEKANANDA

ADVAITA ASHRAMA
4 WELLINGTON LANE
CALCUTTA 13

লুইস বার্ক-এর বিখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষণা গ্রন্থ প্রথমে যে-আকারে প্রকাশিত হয় তার নামপত্র। লেখিকা আরো উপাদান সংগ্রহ ক'রে ৬ খণ্ডে বইটি প্রকাশ করেন। একটি প্রবন্ধে আলোচিত।

SWAMI VIVEKANANDA

A STUDY

BY

D. V. ATHALYE

FIRST EDITION

1929

PRICE RS. FOUR

সমকালে সুপরিচিত লেখক ডি ভি অঠল্যে লিখিত স্বামীজীর উপর গ্রন্থ।

THE EMPRESS

IN PUNKAH-LAND - NO. 23

কালামানুষের বোঝা বহনে ক্লান্ত সাহেবের স্নানবিলাস। সাহেব মহোদয় বাথটাবে অঙ্গ ডুবিয়ে, মুখে চুরুট দিয়ে, গ্রন্থপাঠ করছেন। তাঁর শীতল শরীর শীতলতর করার জন্য এক কালা ভারতীয় ভৃত্য পাখার বাতাস ক'রে যাচ্ছে। এমপ্রেস, মে ১৯০৪।

THE EMPRESS

IN PUNKAH-LAND - NO. 24.

সেকালের সাহেব-কর্তার মেম। তিনি আরামকেদারায় সুখে অর্ধশয়ান। তাঁর গর্ভের সাদা শিশুটি দেশীয় আয়ার কোলে। আয়ার কালো শিশুটি মাটিতে বসে, দুহাত বাড়িয়ে মায়ের কোল চাইছে।

THE EMPRESS

IN PUNKAH-LAND - NO 40

সাম্রাজ্যবাদী সাহেবের কার্টুন। সাহেব-বীরের ভৃত্য, সাহেবের হয়ে বাঘশিকার করে দিয়েছে। সাহেব সেই বাঘের পিঠে পা দিয়ে ক্যামেরায় ছবি তোলাচ্ছে, অবশ্যই হোমে পাঠাবার জন্য।

১৮৯৮ জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন নিয়ে হিন্দি পাঞ্চ-এর কার্টুন। আবেদন-নিবেদন-সর্বস্ব কংগ্রেসের বড়কর্তারা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে করজোড়ে আবেদনপত্র পেশ করছেন, কিছু আমলাতান্ত্রিক পদ প্রার্থনায়। স্বামীজীর দৃষ্টিতে ঘৃণ্য এই কাণ্ড।

SWAMI VIVEKANANDA

DISCIPLE OF THE LORD

RAMKRISHNA PARAMHANSA DEB

AT THE PARLIAMENT OF RELIGIONS

CHICAGO

PUBLISHED UNDER THE PATRONAGE

OF

BABU GURU PRASANNA GHOSE

Of Jorabagan, Calcutta.

Distributed on the occasion of the BIRTHDAY ANNIVERSARY OF THE LORD RAMKRISHNA PARAMHANSA DEB.

Calcutta

March 1894.

স্বামীজী আমেরিকা থাকাকালে তাঁর বিষয়ে কলকাতায় ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত একটি পুস্তিকা। ধর্মমহাসভায় স্বামীজী তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের নামোল্লেখ করেননি, এইরকম একটা অভিযোগ ভক্ত মহলের একাংশে নড়াচড়া করেছিল। তাই পুস্তিকাটির নামপত্রে স্বামীজী যে 'ডিসাইপল অব দ্য রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব', এই কথাগুলি উল্লিখিত হয়। স্বামীজী অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করেন এই গায়ে-পড়া উপদেশে।

ত্রৈমাসিক 'সরস্বতী মন্দিব' পত্রিকায় স্বামীজীব প্রয়াণ সংবাদ। আষাঢ় ১৮২৪ শক।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ যাচেঁ চরিত্র/ বিবেকঃ সহ সংযত্যা, বিনয়ো বিদায়া সহ।/ প্রভুত্বং প্রশ্রয়োপেতং চিহ্নমেতন্মহাত্মনাম ॥ / হ্যানেঁ বিবেক মাঝলা। তেণেঁ নিশ্চয় বলাবলা।/ অবগুণাঞ্চা সংহার কেলা। বৈরাগ্যাবলেঁ ॥/ গোস্যা তা. ৪ জুলৈ বোজী শ্রীমদ্বিবেকানন্দ স্বামী পবমহসং হে.../

YOGA PHILOSOPHY

LECTURES

DELIVERED IN NEW YORK, WINTER OF 1895-6

BY THE

SWAMI VIVEKÂNANDA

ON

RÂJA YOGA

OR CONQUERING THE INTERNAL NATURE

ALSO PATANJALI'S YOGA APHORISMS, WITH COMMENTARIES.

NEW EDITION.

LONGMANS, GREEN, AND CO.

LONDON, NEW YORK, AND BOMBAY

1897

All rights reserved

স্বামীজীর 'রাজযোগ' বক্তৃতাবলী, (১৮৯৫-৯৬)। পাশ্চাত্যে স্বামীজীর সবচেয়ে জনপ্রিয় এই গ্রন্থ পড়ে টলস্টয় সহ বহু বিশ্বমনীষী মুগ্ধ। ভারতবর্ষে তৎকালীন গোঁড়া সাহেবী সংবাদপত্র টাইমস অব ইন্ডিয়া এর উপরে তিনটি সম্পাদকীয় লেখে। অন্য সংবাদপত্রও বিশেষ মনোযোগ দেয়।

RAMAKRISHNA

HIS LIFE AND SAYINGS

THE RIGHT HON. F. MAX MÜLLER, K.M.

LONGMANS, GREEN, AND CO.

39 PATERNOSTER ROW, LONDON

AND BOMBAY

1898

ফ্রেডরিখ ম্যাক্সমূলারের রামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণী গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের নামপত্র। গ্রন্থটি সমকালে কেবল ভারতীয় নয়, শাসক ও ব্রিটিশ সম্প্রদায়ের মধ্যেও চাঞ্চল্যের কারণ হয়। ভারতীয় ছাড়াও সাহেবী কাগজগুলিতে এর উপরে সম্পাদকীয় লেখা হয়।

SRI

RAMAKRISHNA AND HIS MISSION

BY

SWAMI RAMAKRISHNANANDA
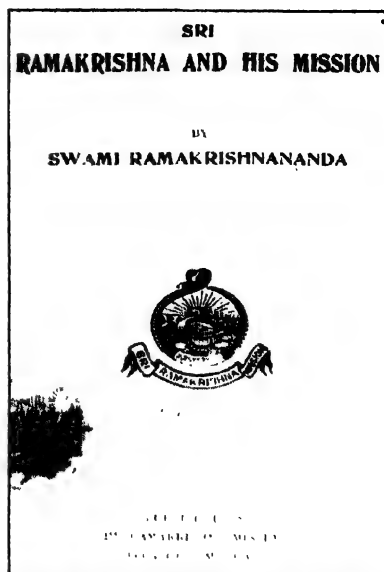
শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। তিনি গুরুভাই স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে মাদ্রাজকে কর্মকেন্দ্র করেছিলেন। সেই কাজেই জীবনপাত করেছেন। ময়লাপুর, মাদ্রাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত এই গ্রন্থ রামকৃষ্ণ সংঘ বিষয়ে প্রথম পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য রচনা।

THE REPLY

OF

SWAMI VIVEKANANDA

THE MADRAS ADDRESS.

MADRAS

RAMASAWMY CHETTY & CO.
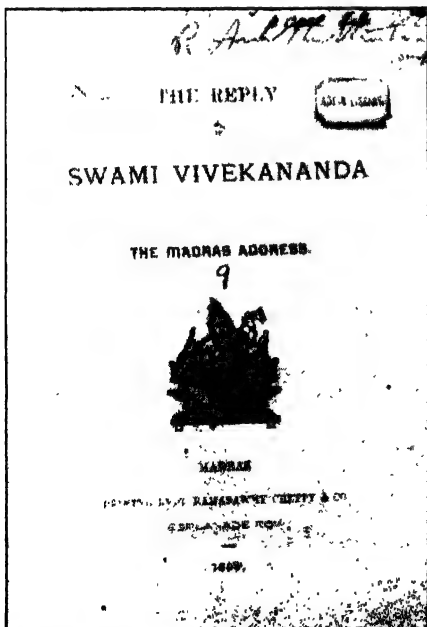
আমেরিকা থেকে স্বামীজী-প্রেরিত মাদ্রাজ-অভিনন্দনের উত্তর-পুস্তিকা, ১৮৯৪।

SWAMI VIVEKANAND SERIES.

PART I.

CONTAINING.—(1). His Lectures in the Parliament of Religions, Chicago, America, (2). His lectures at Hartford and at Brooklyn, America, (3) Another Version of his Lecture at Brooklyn, (4). Is the Soul Immortal ? (5). An article on Reincarnation, (6). His Lecture on the Ideal of Universal Religion, (7). The address of the Maharaja of Khetri and Swami's Reply to it, (9) Reply to the address of the Hindus of Madras, 10). The Song of the Sanyasin.)

PUBLISHED BY

S. C. MITRA.

2 NAYAN CHAND DUTT'S LANE,

Beadon Street. CALCUTTA.

AHMEDABAD

"THE SARASVATI PRINTING WORKS".

1897.

স্বামীজীর বক্তৃতা ও কবিতা-সংবলিত পুস্তক, প্রথম খণ্ড, ১৮৯৭।

Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya!

EIGHT LECTURES

BY THE

SWAMI VIVEKANANDA,

ON

KARMA YOGA,

(The Secret of Work.)

DELIVERED IN NEW YORK,

WINTER 1895 6

PUBLISHED AT $1.00 NET.

BRENTANO'S, 31 UNION SQUARE, W., NEW YORK

Copyrighted by
SWAMI VIVEKANANDA
New York
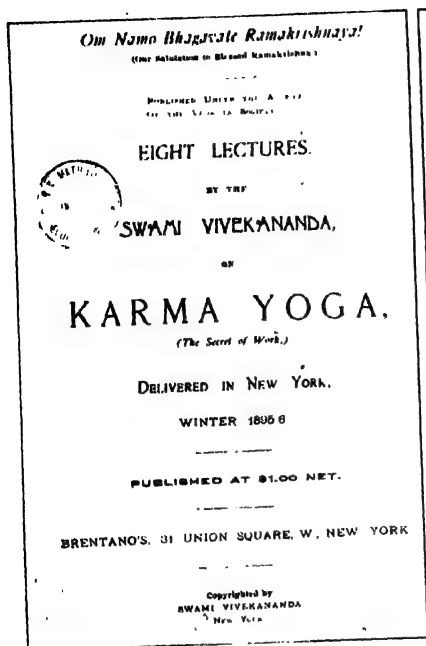
নিউইয়র্ক থেকে ১৮৯৫-৯৬ সালে প্রদত্ত 'কর্মযোগ'-এর উপর স্বামীজী-প্রদত্ত ৮টি বক্তৃতা-গ্রন্থের নামপত্র।

The Brahmavadin Series No. 3

BHAKTI-YOGA

BY

SWA'MI VIVEKA'NANDA.

(Reprinted from the Brahmava'din.)

Madras:

PRINTED BY THOMPSON AND CO., AT THE "MINERVA" PRESS, POPHAM'S BROADWAY

1896

Price Cloth Bound Rs. 1 8 Exclusive of Postage
Paper Cover 1 0
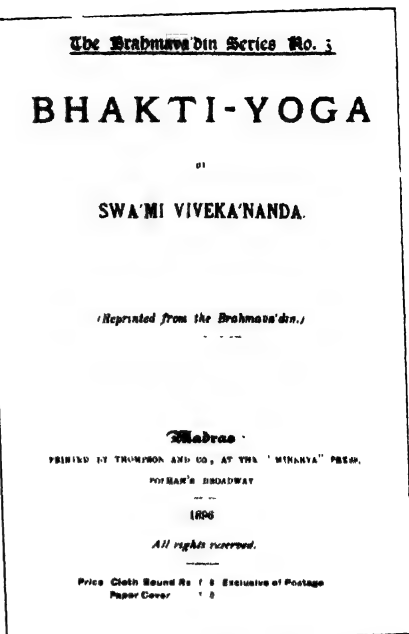
মাদ্রাজ থেকে ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত স্বামীজীর 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থের নামপত্র।

Lectures

ON

GNANA-YOGA

Swami Vivekananda.

"Know this Atman, give up all other vain words and hear no other."
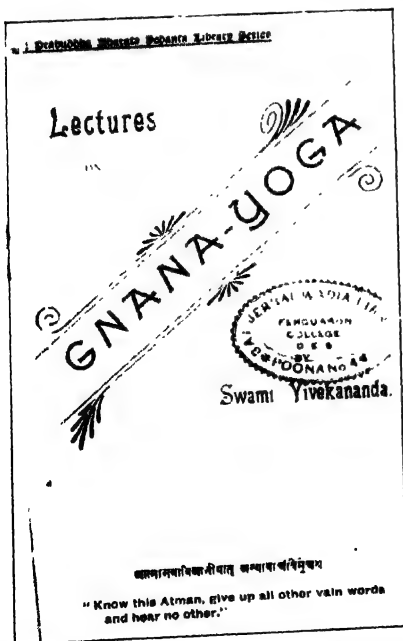
স্বামীজীর 'জ্ঞানযোগ', প্রবুদ্ধ ভারত-এর 'বেদান্ত লাইব্রেরি সিরিজ'-এ প্রকাশিত।

Swami Vivekananda's
Madras Lectures

SIX LECTURES

AND KUMBAKONUM

A Photo of the Swami taken while he was at Madras.

Madras:

THOMPSON AND CO

1897

Price Annas Eight.
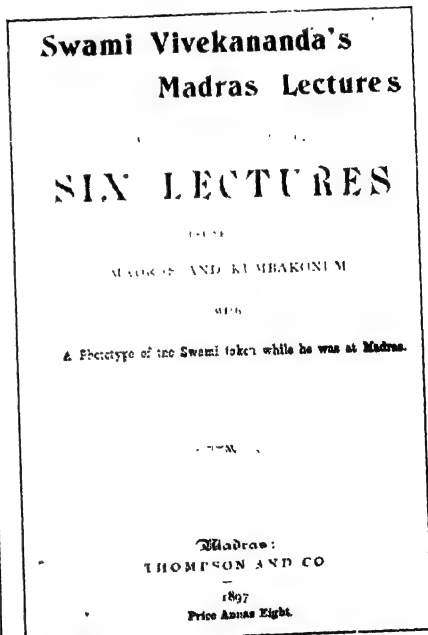
মাদ্রাজ থেকে ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত স্বামীজীর ৬টি বক্তৃতা-গ্রন্থের নামপত্র।

KARMAYOGIN

A WEEKLY REVIEW
OF
National Religion, Literature, Science, Philosophy, &c.,

Vol. I. | 5th CHAITRA, 1316. | No. 37.

PASSING THOUGHTS.

The *utsava* of Ramakrishna Paramahamsa is an event that annually stirs Calcutta to its depths. Year after year the number increases, of those who believe that the birth of the sage of Dakshineshwar has been the critical event of the present age in India. Some believe this, for one reason, others for another. The devotee sees in him the last of the Avatars. The historian sees the key stone of the idea that constitutes Hinduism. The partisan feels that he satisfies all parties and conflicts with none. The philosopher finds him the living embodiment of the highest Vedanta. And even amongst the workers, there are some who derive from the spectacle of his birth, the faith that inspires and sanctions all their struggles.

What is a Nationalist?

For a nationalist may be described as one who believes that the light has already shone upon us. He is not waiting for someone to arrive, for God to remember His India, for the leader of the age and the heroes to be born. In the eyes of the nationalist, all this has been done for us already and it remains with us to work out the trust laid upon us. We have every opportunity that a people ever had. We have nothing more to ask for, nothing more to wait for. Ours is only to love and work and suffer, and struggling to the last with all our might, secure in the conviction that the Great Power which bore us will bear others also and round out in fulness of fruition the lives brought forth.

Some such faith is an absolute necessity to those who pledge themselves to a cause for life and for death. Our own action is limited and guided by our own vision our own opinion our own knowledge. Others, with a different or a defective experience act variously, some in ways of which we do not approve, some in ways that are proved mistaken, and others by methods that are mutually destructive. A certain hope and joy is essential to all work. It would take a Titan like Bhishma himself to throw his whole heart into a losing cause, a cause that he knew belonged neither to God nor the future. Mere mortals are not so made. The nation maker therefore, works to his utmost, but he must be free to realise the while that very little depends on him, that his work achieves significance only from that immense current of destiny that is working through him and his efforts, and that, whatever outward form it might take, it would, so long as it was wise, be carried on the self-same way, on that self-same stream.

... the ground of action.

In other words, behind the best work lies a quiet super-consciousness—knowledge that the work itself is not the great thing, but the spirit that speaks in it. It is the purpose of help and redemption the pitying love, the steadfast hope, that determines the value of the act. The deed itself, the work performed, is merely apparent, and does not count, in comparison with the thought force sent out and the spiritual energy generated. God is working through many people to-day, in different ways and though mistakes may entail suffering, and hatred is a mistake, yet even these defects cannot retard the onward march of what has been begun.

Who then, are to be condemned?

Are we then to condemn no one? Are all to be held equally useful, equally valuable, since, whether they will or not, God works through all equally? Is the renegade to be pardoned and the traitor treated as a saint? Very much the contrary. We are not to ask that a man stand with us, but we are always to demand that he stand with God. Here there must be no slackness. The politician and extremist, the religious and the Swadeshi worker, the social reformer and the ultra-orthodox can all co-operate, as long as they can heartily respect each other's characters. Integrity is the ...

মানিকতলা বোমার মামলার পরে অরবিন্দ গোপনে কলকাতা ত্যাগ করেন। তাঁর সম্পাদিত 'কর্মযোগিন' পত্রিকা নিবেদিতা কয়েক সপ্তাহ চালিয়ে যান, অরবিন্দ অন্য কোথাও যাননি দেখিয়ে দেবার জন্য। সে সময়ে অরবিন্দ আর এক বড়ো মাপের অবতারের আসন্ন আবির্ভাবের ঘোষণা করেছিলেন। মুদ্রিত চিত্রের রচনায় নিবেদিতা দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন, রামকৃষ্ণের জন্মের পরে পাঁচশো বছরের আগে ওই মাপের ঈশ্বরাবতারের আবির্ভাব সম্ভব নয়।
দ্র. লেখক-কৃত 'নিবেদিতা লোকমাতা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮।

RAMAKRISHNA SCHEME OF SERVICE.

AN APPEAL.

TO THE EDITOR OF THE MAHRATTA.

Sir —While it is a fact that in our Tirthas, Sadhu do not usually suffer much for want of food, it is non the less true that in very few of our holy places, pai ticularly in those situated in out-of-the-way moun tainous regions, there are no arrangements to loo after them when they are ailing and sick. Sadhu as a rule, live apart from one another, each in hi own little hut. It can, therefore, be easily imagine how much suffering—which a little loving servic and care may alleviate—they undergo in thei seclusion, when laid up with sickness. They becom so helpless that it is not improbable that many o them suffer the most intense agony for want of drop of water and that some die weakened b disease, thirst and hunger.

Realising the extreme necessity, the Sannyasi Brotherhood of which the Swami Vivekananda is th head, have as a beginning started a home, at Kan khal, near Haridwar, early in July 1901, for the extremely sick and helpless Sadhus and pilgrims and from where too, medicines and food for the sick are distributed.

One of the highest products of human development is the increasing capacity of realizing the helplessness and distress of others and a loving solicitude to remove them so far as possible. The succour of those, in their moments of suffering, who keep the spiritual atmosphere of India from losing its ancient power and potency, who sacrifice their lives to the sustenance of the highest force that makes for good in the universe and thus contribute to the maintenance of the spiritual equilibrium of the whole world,—which, as we venture to think, is the only condition of ensuring a steady, harmonious, ever progressing evolution and thus perform the highest possible service that could be done by man—is therefore the supremest act of useful charity, as well as the best value that money can give. It is earnestly hoped none will hesitate to contribute his share to the up-rearing of an insitution of such palpable practical good and spiritual promise.

All donations and subscriptions will be thankfully received and acknowledged by the undersigned in *Prabuddha Bharata*, the monthly English organ of the Brotherhood, published at Mayavati, Almora.

Advaita Ashrama, Mayavati, Kumaon.

Yours truly
VIMALANANDA.

Joint Editor, *Prabuddha Bharata.*

বালগঙ্গাধর তিলক পরিচালিত ইংরেজি সাপ্তাহিক মরাঠা পত্রিকায় কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমকে সাহায্যের জন্য স্বামী বিমলানন্দ-প্রেরিত আবেদনপত্র। মরাঠা, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯০১।

SWAMI VIVEKANANDA

'স্বামী বিবেকানন্দ, ডিসাইপল অব শ্রীরামকৃষ্ণদেব' পুস্তিকার সঙ্গে যুক্ত স্বামীজীর ছবি।

To say that Swami Vivekananda has been warmly welcomed to Lahore would be giving only a faint idea of the enthusiasm in the city. At his first lecture more than four thousand people were present and many had to go away for want of standing room. Those who have seen him and known him are satisfied that his great power as an orator is among the least of his powers. The reverence in which he is held by his English and American disciples is well illustrated by the example of Mr. Goodwin whose devotion has excited the warmest admiration and even astonishment in the city. The story of Swami Vivekananda's life, the training and discipline that have made him the extraodinary man he is, has yet to be written. But it will be found to be an eminently Indian story—a history of years of patient meditation and earnest self-searching a life of self imposed privations, and hardships known to the Indian *faquir* alone. Years of stern self-discipline, and strenuous adherence to the teachings of his great master, Ramkrishna Parmhansa, are the secret of the marvellous magnetism of his personality and the spiritual and intellectual power that has extorted the wonder and admiration of Europe and America.

ট্রিবিউন, ১০ নভেম্বর ১৮৯৭। লাহোরে বিবেকানন্দ সংবর্ধনার বিপুলত্বের সংবাদ।

মতো পথ কেটে চলত। তিনি সাড়া জাগাতেন সকলের প্রাণে; তাতে উদ্দীপিত হতেন অনেকে। আর কয়েকজন ভাগ্যবানের হৃদয়ে জ্বলে উঠেছিল অনির্বাণ বিশ্বাসের দীপ।"

তেমন বেশ কয়েকজন ভাগ্যবান যুবক মাদ্রাজে তাঁর চারপাশে জুটলেন, যাঁদের তিনি টেনে আনতে পেরেছিলেন ডঃ ডানকানের অনুগামিতা এবং মিল স্পেনসারের অন্ধ আনুগত্য থেকে, কারণ "স্বামীজীর মনোরাজ্যের প্রসার" ঐ যুবকদের "মুগ্ধ ও স্তম্ভিত" করেছিল। "ঋগ্‌বেদ থেকে রঘুবংশ; বেদান্তের অত্যুচ্চ দর্শন থেকে কান্ট হেগেলের আধুনিক দর্শন; প্রাচীন ও আধুনিক সর্বপ্রকার সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকলা; প্রাচীন যোগশাস্ত্রের রহস্যবিদ্যা ও আধুনিক বিজ্ঞানাগারের জটিলতম বিষয়—সবকিছু তাঁর দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত।"

মাদ্রাজের এই যুবকদলের নেতা আলাসিঙ্গা পেরুমল—যিনি তাঁর বন্ধুদলের সঙ্গে অনুভব করেছিলেন—তরুণ বিবেকানন্দই ভারতবর্ষের নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যপুরুষ। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে বিবেকানন্দকে বিদেশে পাঠাবার জন্য অর্থসংগ্রহের কাজে তাঁরা সংগঠিত হয়েছিলেন, দ্বারে-দ্বারে ঘুরে অর্থসংগ্রহও করেছেন। "ধন্য তাঁরা, কয়েকদিনের জন্যও যাঁরা সুমহান স্বামীজীর পায়ের তলায় বসে আমাদের ধর্ম, ইতিহাস, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে হৃদয়মন্থনকারী শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছেন। ['ধন্যদের' অন্যতম ডাঃ নানজুণ্ডা রাও লিখেছেন]। বস্তুত সেই শান্ত অথচ অত্যন্ত উৎসাহপূর্ণ সম্মিলনগুলি ভোলা সম্ভব নয় যখন মাদ্রাজ-সমুদ্রতটে সান-থোমের নিকটে একটি বাংলোয় স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হতো অগণিত গুণমুগ্ধ বন্ধু ও কলেজের ছাত্ররা।" একটি বিশেষ রাত্রি তাঁদের স্মৃতিতে অক্ষয়:

> "শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সমুদ্রতীরের বাড়ি। স্বামীজী সর্বোত্তম ভাবাবেশে আছেন। মুখ প্রদীপ্ত, সুস্মিত; সৌম্য দেহ থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে তাঁর চারিপাশে যেন জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করেছে। একটু আগে গান গাইছিলেন, মহামায়ার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের সঙ্গীত, যা প্রাণের ভিতরকে পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছে। স্মরণীয় সন্ধ্যায় সকলে নিঃশ্বাস রোধ ক'রে গান শুনেছে। গান শেষ। সকলে সম্ভ্রমে অভিভূত। স্বামীজী কথা আরম্ভ করলেন। বললেন, কখনো-কখনো কিভাবে এক শক্তি তাঁর উপর ভর করে। তখন মনে হয়, সেই বিরাট শক্তি তাঁর দেহের অণুপরমাণুর মধ্যে শিহরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে..."

স্বামীজীর অপর এক মূর্তি ছিল, বাস্তবে কঠিন, দাহকর, বিস্ফোরক। মাদ্রাজের বুদ্ধিজীবী ও আধুনিক তরুণদের সম্মিলনস্থল ট্রিপলিকেন লিটারারি সোসাইটিতে সেই রূপ দেখা গিয়েছিল। ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক কামাক্ষী নটরাজন এই সমাবেশে স্বামীজীকে দেখেছেন। স্মৃতিকথনে তিনি বলেছেন, সেই সভাতে "দরিদ্র ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী" এমন প্রচণ্ডভাবে সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন যে, "সেখানেই স্থির হয়—তাঁকে শিকাগোয় পাঠানো উচিত—আধুনিক ভাষায় ভারতের মহান অধ্যাত্মনীতিকে পাশ্চাত্যে ব্যাখ্যা করবার জন্য।" ঐকালে স্বামীজী যে, নারী ও জনসাধারণ সম্বন্ধে অবহেলাকেই ভারতের পতনের কারণ বলে নির্ধারণ করেছিলেন, তাও কামাক্ষী

নটরাজন জানিয়েছেন। শিক্ষা ও বৃত্তির ক্ষেত্রে স্বামীজী নারী পুরুষের পার্থক্য করতে চাননি। **"চিত্তাকর্ষক কথা হল, [নটরাজন আরও বলেছেন] স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন, নারীরা আত্মরক্ষার কৌশল শিখুক। ঝাঁসীর রাণী ভারতীয় নারীর অনুসরণীয় আদর্শ। তাঁর মতে, হিন্দুশাস্ত্রে নারীর সন্ন্যাস নিষিদ্ধ নয়। ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা সমগ্র ভারতে জ্ঞানালোক বিস্তারের বিরাট পরিকল্পনা তাঁর ছিল।"**

রক্ষণশীল মাদ্রাজেই নয় শুধু, সেকালের ভারতীয় পটভূমিকায়, তিরিশ বছরের এক অপরিচিত তরুণ সন্ন্যাসীর ঐ বক্তৃতা সত্যই বিস্ফোরক। তার কিছু নমুনা:

—ব্রাহ্মণরা একদা গোমাংস খেতেন, শূদ্র নারী বিবাহ করতেন। শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের পাচক ছিলেন।

—জাতিভেদ প্রথা সামাজিক ব্যাপার—ধর্ম-ব্যাপার নয়। একদা তার প্রয়োজন ছিল, এখন নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ যে-কারো সঙ্গে আহার করতে পারেন, পারিয়াদের সঙ্গেও। পারিয়ার স্পর্শে যে-আধ্যাত্মিকতার ক্ষয় হয়, তা বড় মন্দমানের বস্তু। বলা উচিত তার অস্তিত্ব নেই, তা শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে।

—জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি যেসব প্রথা শিক্ষার প্রতিবন্ধক, সেগুলির মুণ্ড অবিলম্বে গুঁড়িয়ে ফেলতে হবে। এমনকি শ্রাদ্ধকেও বর্জন করা যায়, যদি তার অনুষ্ঠানে অযথা সময় নষ্ট হয়। শ্রাদ্ধের সঙ্গে কারো মুক্তির সম্পর্ক নেই। তবে শ্রাদ্ধের মন্ত্র চিত্তোন্নতিকর। পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তা করা যেতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণভোজনাদি বাহ্য আনুষ্ঠানিকতা তার আবশ্যিক অংশ নয়।

—নারীদের শিক্ষার স্বাধীনতা দিতে হবে। অজ্ঞতা ও দাসত্বের মধ্যে ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব নয়। নারীর বিষয়ে পুরুষের অত্যুৎসাহী অভিভাবকত্ব দেখিয়ে দেয়—আমরা নিজেদের নিয়ে গিয়েছি বর্বর অবস্থায়।

—দাসত্বের জন্য হিন্দুরা অধঃপতিত। তারা আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। উত্থিত হতে হলে খাঁটি বৈদিক ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ইউরোপের রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যজ্ঞান। কলিযুগে খাঁটি ব্রাহ্মণ বলতে কিছু নেই। মনে রাখতে হবে—পারিয়ারা আমাদের মতোই মানুষ—তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে উচ্চতর শ্রেণীর সঙ্গে।

॥ চার ॥

কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডে বিবেকানন্দের ভারত-সাধনা—বহুকথিত প্রসঙ্গ। জ্ঞাত ইতিহাসে এই প্রথম একজন সন্ন্যাসী স্বদেশের লৌকিক জীবনযন্ত্রণাকে, জনগণের অন্নবস্ত্র ও শোষণের সমস্যাকে, ধ্যানের বিষয় করেছেন। তারপর বিবেকানন্দের আমেরিকা গমন ও সেখানে সাফল্য, সেখান থেকে পাঠানো 'মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর'-এর উল্লেখও করেছি। এখানে আর একটি 'উত্তর'-এর কথা আনব, যা তিনি আমেরিকা থেকেই পাঠিয়েছিলেন 'কলকাতা অভিনন্দনের উত্তর' হিসাবে—১৮৯৪ সালের ১৮ নভেম্বর। সেই পত্রে দ্বার ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্য, ছড়িয়ে পড়ার জন্য, যুবশক্তিকে আহ্বান করা হয়েছিল:

"আমার দৃঢ় ধারণা—কোনো ব্যক্তি বা জাতি অপর সম্প্রদায়ের মানুষের থেকে

নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে বাঁচতে পারে না। ...আমার মতে, ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—জাতির চারিদিকে আচারের বেড়া দেওয়া। ...এর ভিত্তি—অপরের প্রতি ঘৃণা।...

"আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম। ...বিস্তারই জীবন, সংকীর্ণতাই মৃত্যু। প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু। যেদিন থেকে আমরা নিজেদের গুটিয়ে নিতে আরম্ভ করেছি, সেদিন থেকে আমাদের মৃত্যুর সূচনা। সে মৃত্যু কিছুতে থামানো যাবে না—যতদিন-না আমরা সম্প্রসারণের জীবনকে অবলম্বন করছি।"

স্বামীজীর পাশ্চাত্য-সাফল্য সংবাদ একদিকে ভারতের যুবচিত্তকে গর্বে-গৌরবে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলল (দীর্ঘদিন পরাধীন, প্রতি মুহূর্তে শ্বেত শাসকদের দ্বারা পদাহত, এক জাতির কাছে কোনো কৃষ্ণকায় স্বদেশবাসীর শ্বেত-সমাদর যে কতখানি উন্মাদক সুরা—তা স্বাধীন ভারতে যাদের জ্ঞানোদয় হয়েছে তাদের বলে বোঝানো যাবে না)—অন্যদিকে তাঁর বাস্তব নির্দেশপূর্ণ এবং উজ্জীবক পত্রগুলি এসে পৌঁছতে লাগল মাদ্রাজ ও কলকাতার অনুরাগী যুবগোষ্ঠীর কাছে—সংগঠিত হবার শিক্ষা ও প্রেরণা বহন ক'রে। ১৮৯৪-৯৬ পর্যন্ত সময়ে স্বামীজী মাদ্রাজে ও কলকাতায় প্রচুর চিঠি লিখেছেন, এমন ভাষায়, যার অনুরূপ ভাষায় ভারতবর্ষে আর কেউ কথা বলেন নি, তখন বা পরে। যেহেতু সেগুলি সংখ্যায় প্রচুর এবং তাদের থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে যাওয়ার প্রলোভন দমন করা কঠিন, তাই সে অভিপ্রায় ত্যাগ করাই বুদ্ধিসঙ্গত। ঐসব পত্রের বক্তব্যের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিল জনগণের অধিকারদাবি, উন্নয়ন পরিকল্পনা, গণশিক্ষানীতি, পৌরোহিত্যের অত্যাচার, অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, নারীর স্বাধীনতা, মোহজনক ধর্মীয় অলৌকিকতার ক্ষতিকারতা, দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা ও দলাদলির প্রতি বিতৃষ্ণা এবং আত্মত্যাগের প্রার্থনা। সকল কথাই কার্যত যুবকদের উদ্দেশ্য ক'রে। কলকাতায় তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখলেন:

"কতকগুলো চেলা চাই—fiery young men—বুঝতে পারলে?—intelligent and brave—যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত। Hundreds ঐরকম চাই—মেয়েমদ্দ both...."

মাদ্রাজে আলাসিঙ্গাকে:

"হে বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ! বিশ্বাস করো—বড়ো-বড়ো কাজ করার জন্য তোমরা জন্মেছ। কুকুরের ঘেউ-ঘেউ ডাকে ভয় পেয়ো না—আকাশ থেকে প্রবল বজ্র পড়লেও ভয় পেয়ো না। খাড়া হয়ে ওঠো। কাজ করো।"

॥ পাঁচ ॥

১৮৯৭ সালে ভারতে ফেরার পরে স্বামীজী যে তৎকাল-পর্যন্ত সর্ববৃহৎ সংবর্ধনা পেয়েছিলেন, তা সমকালীন সকল তথ্যসূত্র থেকেই জানা যায়। লাহোর ট্রিবিউন লিখেছিল (১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭): "কেবল দক্ষিণদেশে নয়, সমগ্র দেশের কোথাও ইতিপূর্বে এই ধরনের জনসংবর্ধনা আর কেউ পাননি।" মিশনারি পত্রিকাগুলির তাই দারুণ আক্রোশ—হুঁঃ, বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি-এ এখন স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছে—আর ভারতীয়রা তাকে পরিত্রাতা বলে বরণ করছে!!

এই-যে বিপুল সংবর্ধনা—এর বড় অংশ জুড়ে ছিল ছাত্র ও যুবকেরা। মায়াবরম থেকে মাদ্রাজের দিকে যখন তিনি ট্রেনে চলেছেন, তখন রেললাইনের উপর শুয়ে পড়ে যুবকেরা ট্রেন থামিয়েছে, তাঁকে দেখবে বলে। মাদ্রাজের যুবকদের মাতোয়ারা অবস্থা, সাহেবী কাগজ মাদ্রাজ টাইমসের বর্ণনা অনুযায়ী:

"প্রত্যেকের মুখে কেবল তাঁরই নাম, তা ছাড়া আর কিছু নেই। স্কুলে. কলেজে, হাইকোর্টে, পথে-ঘাটে-বাজারে, সমুদ্রের ধারে, সর্বত্র শত-শত উৎসুক লোক কেবলই পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে—স্বামীজী কখন আসছেন—কখন আসবেন? মফস্বল থেকে বিরাট সংখ্যক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবার জন্য এসেছিল। স্বামীজীর দর্শনের জন্য তারা থেকে গেছে, যদিও তার ফলে তাদের হস্টেলের বিল বাড়ছে এবং বাপ-মা অবিলম্বে ফেরার জন্য জরুরী তাগাদা পাঠাচ্ছেন।" (৩ ফেব্রুয়ারি)

তারপর ৭ ফেব্রুয়ারি, মাদ্রাজে নাগরিক সংবর্ধনার সময়ে সেই আনন্দদায়ক বিশৃঙ্খলার ঘটনাটি ঘটল। মান্য-গণ্য দক্ষিণীদের দ্বারা ভিক্টোরিয়া হল কানায়-কানায় ভর্তি। কিন্তু সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। বিপুলসংখ্যক যুবক ও অন্য সাধারণ মানুষ হলের বাইরে জড়ো হয়েছে। তাদের চিৎকার বন্ধ দরজায় আছড়ে পড়ে সভা অসম্ভব ক'রে তুলল। কী ব্যাপার—স্বামীজী জেনে নিলেন। তারপর বিজ্ঞদের নিষেধ না শুনে. দ্বার খুলে বেরিয়ে এসে, উঠে পড়লেন একটি মাথাখোলা ঘোড়ার গাড়ির উপরে—এবং বললেন—

"স্থির ছিল, হলের মধ্যে অভিনন্দনপত্র পাঠ এবং উত্তর দান হবে। কিন্তু মনে হচ্ছে, যারা হৃদয়ের অভিনন্দন নিয়ে এসেছে, তেমন অধিকাংশ মানুষ থেকে গেছে হলের বাইরে। হলের মধ্যে থাকা তাই আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। **আমি এসেছি জনগণের ভিতর থেকে, জনগণের জন্য আমি প্রচারক, জনগণের জন্য আমি কর্মী—আমার জনগণ আমাকে ডেকেছে এখানে।"**

মাদ্রাজের বক্তৃতাগুলিতে তিনি বারে-বারে যুবকদের ডাক দিলেন: "মানুষ—মানুষ চাই—তাহলেই বাকি সবকিছু তৈরি হয়ে যাবে। চাই বলিষ্ঠ ওজস্বী বিশ্বাসী যুবকের দল—মেরুদণ্ড পর্যন্ত সাচ্চা—তাই চাই। এইরকম একশো—তাহলেই পৃথিবীতে বিপ্লব।" যাতনায় উন্মাদনায় ভরা গলায় বললেন: "হে আমার সন্তানগণ! আমি তোমাদের কাছে আমার সকল পরিকল্পনার কথা বলতে এসেছি। যদি সেকথা শোনো একযোগে কাজ করব। যদি না-শোনো, এমনকি পদাঘাতে আমাকে ভারত থেকে দূর ক'রে দাও, তবু ফিরে এসে বলব, আমরা সবাই ডুবছি। আমি আবার এসেছি তোমাদের মধ্যে—যদি ডুবি সবাই যেন একসঙ্গে ডুবি—কিন্তু কোনো অভিশাপ যেন উচ্চারণ না করি।"

কলকাতায় পৌঁছলেন তিনি। শিয়ালদহ স্টেশনে বিপুল জনতা, ছাত্ররা তাঁর গাড়ির ঘোড়া খুলে নিয়ে জয়ধ্বনি দিতে-দিতে এগিয়ে চলল। জনতার আকারের বিশালতা দেখে উদ্বিগ্ন, এবং তা ঢাকা দিতে বক্রকণ্ঠ, কলকাতার সাহেবী কাগজ বলল, জনতার অধিকাংশই ছিল স্কুল-বালক। দেশীয় কাগজ তারস্বরে বলতে লাগল, না না, বিশিষ্ট ব্যক্তিতে ঠাসা ছিল ভিড়। কয়েকদিন পরে শোভাবাজার রাজবাটীতে স্বামীজীর বিরাট নাগরিক সংবর্ধনা। রাজা মহারাজা অভিজাত ও বিজ্ঞজনদের সেই সমাবেশে, স্বামীজী সাহেবী কাগজের দূষণ বাক্যটিকে সানন্দে ভূষণরূপে কণ্ঠে ধারণ ক'রে, বললেন:

> "কলিকাতাবাসী যুবকগণ! ওঠো জাগো! শুভমুহূর্ত এসেছে, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি মহাবলি প্রার্থনা করছে। তোমরা বলেছ, আমি কিছু কাজ করেছি। তাহলে স্মরণ রাখো, আমি এক সময় নগণ্য বালক ছিলাম, এই কলকাতার ধূলিপথে তোমাদের মতো খেলে বেড়াতাম। ...ওঠো, জাগো! জগৎ তোমাদের আহ্বান করছে। ...তোমরা দরিদ্র, তোমরা বন্ধুহীন, সেজন্য চিন্তিত হয়ো না। কে কোথায় দেখেছে—টাকায় মানুষ করেছে? মানুষই চিরকাল টাকা ক'রে থাকে। জগতের যা-কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হয়েছে, উৎসাহের শক্তিতে হয়েছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হয়েছে।"

স্বামীজী পঞ্জাবে গেলেন। সেখানে যুবতরঙ্গ উচ্ছলিত হতে লাগল তাঁকে ঘিরে। উৎসাহের আধিক্যে তাঁর সভা তারা পণ্ড করল; আবার তারাই শৃঙ্খলার সঙ্গে পরবর্তী সভার সংগঠনও করল। প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৮৯৭ সংখ্যায় জে জে গুডউইন স্বামীজীর পঞ্জাব সফর-বিবরণের মধ্যে ছাত্র-উৎসাহ প্রসঙ্গে লিখলেন: "স্বামীজীর লাহোরে তৃতীয় বক্তৃতা—সাফল্যের জয়তূর্য। এবার ব্যবস্থাপনার পুরো ভার ছিল লাহোরের চারটি কলেজের ছাত্রদের উপর—এবং অতীব সুষ্ঠু তাদের ব্যবস্থা।"

একই রচনা থেকে জানছি, স্বামীজী ছাত্রদের নিয়ে একটি সভা করেন। তাঁর কথামতো একটি অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হলো—সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক তার চরিত্র। এর কাজ হবে—দরিদ্রদের সাহায্য করা, সম্ভব-মতো শহর ও জেলায় বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান ক'রে পীড়িত দরিদ্রদের শুশ্রূষা করা, অজ্ঞ দরিদ্রদের সন্ধ্যায় শিক্ষাদান করা।

গণশিক্ষা ও নারীশিক্ষার ব্যাপারে স্বামীজীর বিশেষ তাগিদের বিষয়ে ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকার ১ ডিসেম্বর, ১৮৯৭ সংখ্যায় পাই: শিয়ালকোটে অবস্থানকালে তিনি বালিকাদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে বলেছেন—যেখানে শিক্ষাদানের ভার নারীদের উপরেই অর্পিত থাকবে। বিধবারা যদি এই ভার নেন, তাহলে তাঁদের স্বাধীন অন্নসংস্থানের একটা উপায় হয়, তাও তিনি বলেছিলেন।

আর স্বামীজী দীর্ণকণ্ঠে বলেছিলেন—"কোটি-কোটি মানুষ অনশনে আছে। দর্শনের কচকচি খেয়ে তারা বাঁচবে না। তাদের রুটি চাই।"

॥ ছয় ॥

স্বামীজীর বাণীকে বুকে বেঁধে নিয়ে অবিলম্বে অনেক যুবক পথে ও পথের প্রান্তে ছুটে গেল। তাদের কাহিনীর মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া যাক—যাতে নাটকীয়তার লক্ষণ আছে।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ১২ জুন। চারুচন্দ্র দাস, যুবক, রয়েছেন কাশীতে, তাঁর হাতে গিয়ে পৌঁছল উদ্বোধন পত্রিকা, তাতে ছাপা আছে স্বামীজীর 'সখার প্রতি' কবিতা, আর ঐ কবিতারই একাংশে আছে সেবাধর্মের গায়ত্রী মন্ত্র: "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" চারুচন্দ্রকে যেন বিদ্যুৎ-শক লাগল, উঠে পড়ে ছুটে গেলেন বন্ধু যামিনীরঞ্জন মজুমদারের বাসায়। সন্ধ্যাকাল, যামিনীরঞ্জন মালা জপছেন, চারুচন্দ্র তাঁর বন্ধুর পুরাতনী ধর্মকাজ লণ্ডভণ্ড ক'রে নবধর্ম শোনালেন উদ্বোধনের পৃষ্ঠা থেকে। আর তার ঠিক পরদিন যামিনীরঞ্জন যখন প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানের পথে, তাঁর কানে গেল কাতরোক্তি, মলমূত্রমাখা এক বৃদ্ধা, মুমূর্ষু। যামিনীরঞ্জন থমকে দাঁড়ালেন, গঙ্গাস্নানের পরিবর্তে বৃদ্ধার গা পরিষ্কার করতে শুরু করলেন...

সূচনা হলো সুবিখ্যাত কাশী সেবাশ্রমের, যা দেখে রক্ষণশীল বিহারীলাল সরকার পর্যন্ত বললেন, কাশীতে এসে বিশ্বনাথ দর্শনের পরে সেবাশ্রম দর্শন না করলে তীর্থফল পুরো পাওয়া যাবেনা। এর আগেই বিবেকানন্দের প্রেরণায় তাঁর তরুণ গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দ দুর্ভিক্ষে সেবাকাজ শুরু ক'রে দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে। কল্যাণানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ, স্বরূপানন্দ, বিরজানন্দ প্রভৃতি বিবেকানন্দের যুবক শিষ্যেরা একই কাজে নিয়োজিত ছিলেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে। কাশী সেবাশ্রম সম্বন্ধে সেবাশ্রমের প্রতিবেশী অ্যানী বেশান্ত যেকথা বলেছেন তা ভারতের অন্য সেবাশ্রমগুলি সম্পর্কেও সত্য:

> "যখন আমি সাহসী, শক্তিশালী ও সত্যব্রত তরুণদলকে সেবায় উদ্বুদ্ধ দেখি [বেশান্ত ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকার ১৯১৪ মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় লেখেন], যখন দেখি তারা এক হাতে দিচ্ছে দেহের অন্ন, অন্য হাতে আত্মার পরমান্ন, তখন মনে পড়ে বিবেকানন্দকে। ...মাত্র কটি ছেলে বেনারস-হোমের প্রতিষ্ঠা করেছিল। মনে আছে, কিভাবে তারা পথ থেকে পীড়িত ও মরণাপন্নদের কুড়িয়ে নিজেদের দীন কুটীরে এনে তুলত, তাদের ধোয়াত, মোছাত, খাওয়াত, সেবা করত—মধুর ও কঠোর শুশ্রূষায় তাদের বাঁচিয়ে রাখত সযত্নে।"

এইভাবে জন্ম নিয়েছিল বিবেকানন্দের প্রেরণাপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্য হতে 'ভাঙ্গী সাধুর' দল। এই শিরোধার্য বিশেষণই রক্ষণশীলেরা তাদের উপহার দিয়েছিল।

এই সেবাকার্য যে কর্তব্য-মাপা নিরীহ কোনো উপকারকর্ম নয়, পরন্তু অনেক সময়েই তা যে মৃত্যু-ঝাঁপ, তা ১৮৯৯ সালে (পরে ১৯০০ সালেও) দেখা গিয়েছিল—কলকাতায় প্লেগ মহামারীর সময়ে। মহারাষ্ট্রে তার আগের কয়েক বৎসরে লক্ষ লক্ষ লোক মরেছে প্লেগে: প্লেগ-দাঙ্গা হয়ে গেছে। প্লেগ মানেই মৃত্যু। কলকাতা ছেড়ে যখন প্লেগের ভয়ে হাজারে-হাজারে মানুষ উর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে—তারই মধ্যে বিবেকানন্দ নেমে এলেন পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাসের বিশ্রাম ছেড়ে—নিজ জন্মভূমির রক্ষায়। রামকৃষ্ণ মিশন নেমে পড়ল প্লেগ প্রতিষেধের কাজে—নিবেদিতা ও সদানন্দের নেতৃত্বে। তাঁরা বস্তীতে গিয়ে, যেখানে মৃত্যু-বিভীষিকার অবাধ রাজ্য, কাজ শুরু করলেন। কাজ মানে—ক্লেদ পরিষ্কার। বৎসরের

পর বৎসর ধরে জমে-থাকা মৃত্যুবীজে ভর্তি আবর্জনার সঙ্গে লড়াই। নিবেদিতা রাগে ফেটে পড়ে বললেন—"ধিক্ সেই বস্তী-মালিকদের যারা এইভাবে মানুষকে রেখেছে। ধিক্ সেই পৌরকর্তাদের, যারা চোখ বুজে আছে।" কলকাতার ইতিহাসে—কলকাতা কর্পোরেশন যে-কথাটা স্মরণ করতে ভুলে গেছে, কিন্তু কথাটা সত্য—সেই হলো প্রথম ব্যাপক বেসরকারী নগর পরিষ্কারের কাজ, কঠিনতম পরিস্থিতিতে। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে বিতরিত প্রচারপত্রে বলা হয়েছিল:

"কলিকাতাবাসী ভাইসকল! আমরা তোমাদের সুখে সুখী, ও তোমাদের দুঃখে দুঃখী। ...যে মহারোগের ভয়ে বড় ছোট, ধনী নির্ধন, সকলে ব্যস্ত হইয়া শহর ছাড়িয়া যাইতেছে, সে রোগ যদি যথার্থই আমাদের মধ্যে হাজির হয় তাহা হইলে তোমাদের সকলের সেবা করিতে করিতে জীবন যাইলেও আমরা আপনাদিগকে ধন্যজ্ঞান করিব। ...ধনী লোক পালায় পালাক। আমরা গরীব, গরীবের মর্মবেদনা বুঝি। ...হে ভাই, যদি তোমাদের কেহ সহায় না থাকে, অবিলম্বে বেলুড়-মঠে, শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ-দাসদিগের নিকট খবর পাঠাইবে। শরীরের দ্বারা যতদূর সাহায্য হয় ক্রটি হইবে না। মায়ের কৃপায় অর্থসাহায্যও সম্ভবপর।"

কাজ শুরু হবার পরে, রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে একটি যুবসভা হয়েছিল—ক্লাসিক থিয়েটারে, ২২ এপ্রিল, ১৮৯৯। অসুস্থ থাকলেও স্বামীজী সভাপতিত্ব করেন। প্রধান বক্তা নিবেদিতা। সভায় স্বামীজী তাঁর বড় প্রিয় 'কলিকাতাবাসী ভ্রাতৃগণকে' মধুবচনের পরিবর্তে চাবুক কষিয়াছিলেন। "এ-পর্যন্ত ঝুড়ি-ঝুড়ি তত্ত্বকথা লাভ করা গেছে [স্বামীজী বলেছিলেন] কিন্তু বাঙালীরা প্লেগ নিবারণের জন্য কোনো কাজের কাজ ক'রে উঠতে পারেনি। এক ইংরাজ সংবাদদাতা সম্প্রতি বাঙালীদের বিষয়ে নিন্দা ক'রে যে-কথা লিখেছে, তাতে বাঙালীরা ক্ষেপে গেছে। কিন্তু যতক্ষণ না বাঙালীরা কুঁড়েমি ঝেড়ে ফেলে বাস্তব কাজের দ্বারা নিজেদের মানুষ বলে প্রমাণ করছে, যতক্ষণ না প্রমাণ করছে তারা আলমারিতে রাখা কাঁচে-ঢাকা পুতুল নয়, ততক্ষণ তাদের গায়ে ছিটানো কলঙ্ক দূর হবে না।"

সভায় নিবেদিতা কলকাতার বস্তীগুলির ভয়াবহ অবস্থার দীর্ঘ বর্ণনা করেন। যুবকদের সম্বোধন ক'রে আগুনের ভাষায় তিনি বলেছিলেন:

"কলকাতার ছাত্র তোমরা—তোমরা কতজন প্রস্তুত আছো—আমাদের বস্তীবাসী ভ্রাতৃগণের উপরে যে-সর্বনাশ ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তার সম্মুখীন হয়ে তোমাদের আদর্শকে জ্বলন্ত বাস্তবে রূপায়িত করতে?... শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ আমাদের সামনে আছে, যাঁর স্মরণে তোমরা গৌরববোধ করো। তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে অস্পৃশ্যের বাড়িতে গিয়ে নিজের মাথার চুল দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করেছিলেন। ...তোমাদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে বস্তী পরিষ্কার করতে তৈরি আছো? আমরা এই মুহূর্তে যেন সিদ্ধান্ত করি—আমরা সকলে একত্র থাকব—জীবনে ও মৃত্যুতে। যে-মানুষ দুঃখের দিনে তার ভাইকে ত্যাগ করে, তার বরাতে আছে অশেষ দুর্গতি। দরিদ্রের প্রয়োজনই এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন—এসো, বাস্তব কাজের দ্বারা আমরা তা প্রমাণ করি।" (ইন্ডিয়ান নেশন, ১ মে ১৮৯৯)

কলকাতার কিছু যুবক সেই 'দারুণ' সেবার কাজে সত্যই এগিয়ে এসেছিলেন—তাঁদের অন্যতম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)।

॥ সাত ॥

স্বামীজীর দেহান্তের পরে তাঁর প্রভাব কমল না, বরং ব্যাপকতর আকারে ছড়িয়ে পড়ল যুবকদের মধ্যে, কারণ শক্তিনির্ভর যে জাতীয় চৈতন্যর জাগরণ তিনি ঘটিয়েছিলেন, স্বদেশী আন্দোলন পর্বে তার রাজনৈতিক বিস্তার ঘটল। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার আগে, ১৯০২-এর শেষ থেকে ১৯০৪-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে যুবকদের মধ্যে বিবেকানন্দের সংগ্রামী ভাবধারার প্রচার বিশেষভাবে ঘটেছে ভগিনী নিবেদিতা এবং মহারাষ্ট্রে তিলক-পন্থীদের দ্বারা। নিবেদিতার প্রসঙ্গে সঙ্গতভাবেই বলা হয়েছে—ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে যুবকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টিতে তাঁর জুড়ি ছিলনা। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পরে বিবেকানন্দের ভাব-বিস্তারে নিবেদিতার সঙ্গে যোগ দিলেন অরবিন্দ এবং তাঁর অনুবর্তীরা। স্বদেশী আন্দোলনের মনোভূমি নির্মাণে বিবেকানন্দের বিপুল প্রেরণার কথা সমসাময়িক তথ্যসূত্রে সমর্থিত। এই আন্দোলনের সব কটি ধারাতেই তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব দেখা যায়। নরমপন্থী, মধ্যপন্থী, চরমপন্থী ও বিপ্লবপন্থী, সকলেই তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। অ্যানী বেশান্ত বলেছেন, **"Vivekananda roused the strongest feeling of Nationality"**। স্বদেশী যুগের অগ্ন্যুদ্গারী বাগ্মী ও তাত্ত্বিক নেতা বিপিনচন্দ্র পাল একাধিকবার বলেছেন, "কতকগুলি দিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অবশ্যই দাবি করা যাবে—তিনি আমাদের জাতীয়তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক ও প্রফেট। তিনিই প্রথম আমাদের দেশ ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে জ্বলন্ত বাসনার সুর তুলেছিলেন—তীব্র অনুভূতিময় সেই দেশপ্রেম, যা গত দশকের জাতীয়তাবাদী প্রচারের মধ্যে প্রধান আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।" [বিপিন পালের এই লেখাটি বেরিয়েছিল মাদ্রাজের কমনউইল পত্রিকায় ১৩ অগস্ট, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৬]। এর কিছু বেশি চার বছর আগে তিলকের 'মরাঠা' কাগজ লিখেছে—

"Swami Vivekananda is the real father of Indian nationalism. He wanted to develop a modern India. Every Indian is proud of this father of modern India."

বাংলা ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলন যে প্রধানাংশে যুব-আন্দোলন, তা এর সঙ্গে যুক্ত মানুষদের বয়সের হিসাব নিলেই বোঝা যায়। আর বিপ্লবীদের স্মৃতিকথা, বিপ্লবের ইতিহাসগ্রন্থ এবং সরকারী গোপন বা প্রকাশ্য রিপোর্ট—সকল সূত্র থেকেই এই আন্দোলনে বিবেকানন্দের প্রভাবের ব্যাপক স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। তা স্বাভাবিক। কারণ, আগুন জ্বালিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের অন্যতম, রক্তমেঘের 'সন্ধ্যা'-সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বিবেকানন্দের বন্ধু এবং নিজস্ব-ভাবে ও রীতিতে বিবেকানন্দের ভাব প্রচার করেছেন, অন্তত আংশিকভাবে। বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতা স্বামীজীর বৈপ্লবিক চেতনাকে প্রচার করাকে জীবনব্রত করেছিলেন। বিবেকানন্দ-অনুরাগী অরবিন্দের এইকালীন রচনা উৎকলন ক'রে স্বচ্ছন্দে দেখিয়ে দেওয়া যায়—রাজনৈতিক প্রয়োজনে ঈষৎ রূপান্তরে তিনি বিবেকানন্দের চিন্তারই উপস্থাপক (কর্মযোগিন্-এর লেখাগুলিতে এর ভূরিভূরি নিদর্শন মিলবে; তাঁর 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকায় আদর্শ পুরুষরূপে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উপস্থাপনা গোয়েন্দা রিপোর্টে ক্রুর উল্লেখের কারণ হয়েছে); 'বন্দেমাতরম' অথবা 'যুগান্তর' পত্রিকায় (বারীন্দ্র-ভূপেন্দ্র-দেবব্রতর কাগজ) বিবেকানন্দের ভাবের বিশেষ চরিত্রের প্রতিফলন স্পষ্ট।

ইংলিশম্যান ১ এপ্রিল ১৯১৩, সম্পাদকীয়তে লিখেছিল: **"He (Vivekananda) was using phrases and expressions which were later repeated in the Jugantar with most mischievous results."** স্যার হেনরি লোভেট তাঁর 'হিস্টরি অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যালিস্ট মুভমেন্ট' গ্রন্থে বলেছেন, বাংলার ছাত্রদের ঘরের দেওয়ালে বিবেকানন্দের বাণী লেখা থাকে; তাদের কাছে বিবেকানন্দের বই অবশ্যপাঠ্য। জেমস ক্যাম্বেল কার তাঁর 'একান্ত গোপনীয়' মুদ্রিত সরকারী রিপোর্টে ('পোলিটিক্যাল ট্রাবল ইন ইন্ডিয়া—১৯০৭-১৭') বিপ্লবীদের মধ্যে বিবেকানন্দের ভাবানুগামিতার উপর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। স্টিফেনসন, টিনড্যাল প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীদের রিপোর্টে একই প্রসঙ্গের সমর্থনে তথ্য প্রদত্ত। এ-বিষয়ে রাউলাট রিপোর্টের মন্তব্য তো বহু পরিচিত। এইসব রিপোর্ট বারবার বলেছে, যুবসমাজে বিবেকানন্দের এমনই জনপ্রিয়তা যে, তাঁর নাম ও রচনার চার ফেলে বিপ্লবী-দলে ছেলে ঢোকানো হয়। একই কারণে পূর্ববঙ্গে "ব্যাঙের ছাতার মতো প্রাইভেট রামকৃষ্ণ আশ্রম গজিয়ে উঠেছিল।" স্টিফেনসন একটি চমৎকার শব্দ ব্যবহার করেছিলেন—'রামকৃষ্ণ মিশন আবহাওয়া'—বিপ্লবীরা যার আওতায় ছিল।

বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়—বিপ্লবী দলগুলিতে যদিও নানা গোষ্ঠীভাগ ছিল, কিন্তু বিবেকানন্দ-আনুগত্যের ক্ষেত্রে সব গোষ্ঠীই আগুয়ান। বাংলায় এই আন্দোলনের আদিপর্বের স্রষ্টা প্রমথনাথ মিত্র, বিবেকানন্দের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন, এবং তিনি বিবেকানন্দের ভাবপ্রবাহের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বলে কথিত সতীশচন্দ্র বসু সাক্ষাৎভাবে বিবেকানন্দের পরিচিত এবং তাঁর কাছ থেকে প্রেরণাপ্রাপ্ত। যুগান্তর গোষ্ঠীর বারীন্দ্রকুমার, দেবব্রত (পরে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ), ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব স্পষ্টলক্ষ্য এবং তাঁদের স্বীকৃতিও আছে। পূর্ববঙ্গে অনুশীলন সমিতির প্রধান নেতারা, যথা মাখনলাল সেন, নরেন্দ্রমোহন সেন, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, রমেশ আচার্য, একনিষ্ঠ বিবেকানন্দ-ভক্ত। চন্দননগর গোষ্ঠীর মতিলাল রায়, রাসবিহারী বসু, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, রাজেন লাহিড়ী সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। যুগান্তর গোষ্ঠীর দ্বিতীয় পর্বের (একে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীও বলা যায়) যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর বিবেকানন্দ-ভাবানুগত্য সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য আমাদের কাছে আছে। এই গোষ্ঠীর নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম এন রায়) প্রথম জীবনে ঐ ভাবধারারই অন্তর্গত ছিলেন। নির্দিষ্ট বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টিতে সর্বাধিক সফল বিপ্লবী-গোষ্ঠীর নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ স্বামীজীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তিনি বারংবার বলেছেন—তাঁর প্রেরণা কেবল বিবেকানন্দ এবং বিবেকানন্দই। হেমচন্দ্রের সহকর্মীদের সম্বন্ধেও একথা বহুলাংশে সত্য। চট্টগ্রামে চমকপ্রদ বৈপ্লবিক উত্থানের নেতা সূর্য সেন এবং তাঁর দলের রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, প্রীতিলতা ওয়াদেদরের জীবনে বিবেকানন্দের আলোকপাতেব কথা আমাদের অগোচর নেই। যেসব বিপ্লবী পরবর্তী জীবনে মার্কসবাদ গ্রহণ করেছেন, তাঁরাও, যথা শ্রীগণেশ ঘোষ, শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, তাঁদের মনোগঠন-পর্বে বিবেকানন্দের ভাব-ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন অকুণ্ঠে। বিপ্লব আন্দোলনের বিষয়ে লিখিত গ্রন্থসমূহের বক্তব্যও একই প্রকার।

বিবেকানন্দের ভাবানুরাগী বিপ্লবী যুবকেরা কেবল বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না।

দক্ষিণ ভারতে যে-অল্পাকারে বিপ্লব আন্দোলন হয়েছে তার প্রধানাংশে বিবেকানন্দের প্রভাব। মাদ্রাজের প্রধান বিপ্লবী-গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত 'বালভারত' ও 'ইন্ডিয়া' (যার সম্পাদক সুব্রহ্মণ্য ভারতী, পরিচালক তিরুমলাচার্য) বারবার লিখেছে—তাঁরা সংগ্রামপথে অগ্রসর হবার কালে বিবেকানন্দের আগ্নেয় ভাবনাকেই বহন করেছেন। টেগার্ট রিপোর্টে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার বসন্ত ভট্টাচার্যের বিবৃতি উৎকলিত হয়েছে। তার মধ্যে পাই:

"In speaking of the places outside Bengal to which members are sent, Basanta stated, 'Madras is the main head quarters where many, in the guise of followers of Vivekananda live, who all belong to the secret society'."

মাদ্রাজে বিপ্লবীগোষ্ঠীর অন্যতম সংগঠক তারকনাথ দাশ তো নিবেদিতা-দলের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর ভারতে বিপ্লবভাবের প্রসারে যাঁদের প্রধান ভূমিকা, সেই রাসবিহারী বসু বা শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল যুবকদের মনোভূমিতে বিবেকানন্দ-বীজ নিক্ষেপ করতেন। বেশান্তের কমনউইল পত্রিকার ১৩ আগস্ট ১৯১৫ তারিখের সংবাদে পাই: "রাওয়ালপিণ্ডির এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে—যেহেতু তার কাছে একটি চিঠি ছিল যাতে লেখা আছে, দেশের জন্য তিনি মরতে প্রস্তুত, এবং তাঁর বাড়ি তল্লাশ করে পাওয়া গিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী।"

সারা ভারতের বিপ্লবী যুবকদের উপর বিবেকানন্দের প্রভাবের বিষয়ে টেগার্ট-রিপোর্টে লেখা আছে:

"There have been several indications that the (Ramakrishna) Mission and its followers are connected with the revolutionary side of the recent political upheaval in India, which has convulsed the student community in Bengal and has more recently still extended its pernicious influence to even more dangerous ground in the Native States of India."

সরকারের গোপন রিপোর্টগুলির বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল: রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাশ্রিত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নামের তালিকা। তাঁরা মিশনের কোন্-কোন্ শাখায় যাতায়াত করেন তার সংবাদ, মিশনের কোন্ কোন্ সন্ন্যাসীর গায়ে পূর্বতন রাজনীতি-গন্ধ আছে, এবং তাঁদের কাছে কোন্-কোন্ বিপ্লবী যুবক যাতায়াত করেন তার বিবরণ ইত্যাদি। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বযুক্ত অংশ অধিকার করেছিল—বিবেকানন্দ সাহিত্যের কথা। টেগার্ট-রিপোর্ট, কার রিপোর্ট, লোভেটের বই, অন্যত্রও, সরকারী দৃষ্টিতে বিপজ্জনক বিবেচিত বিবেকানন্দের রচনার উদ্ধৃতি ছিল। ডঃ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, পদস্থ সরকারী কর্মচারী সি টিনড্যালের একটি রিপোর্ট অনুবাদে প্রকাশ করেছেন (শিলাদিত্য, মার্চ ১৯৮৩), যার বড় অংশ জুড়ে আছে বিবেকানন্দের বই পড়ে কিভাবে যুবকদের 'বুদ্ধি বিকৃতি' ঘটত, তারই সংবাদ। অত্যন্ত আক্রোশের সঙ্গে টিনড্যাল লিখেছিলেন, "বিপ্লব এবং নরহত্যায় উস্কানিদাতা 'দি লিবার্টি' নামক প্রচারপত্রগুলির শিরোদেশে বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধৃত করা হতো।"

সরকারী মহলে বিবেকানন্দের বইয়ের প্রেরণা সম্বন্ধে এই প্রকার গুরুত্বদান দেখিয়ে দেয়, যুবকদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের পিছনে আদর্শের প্রচণ্ড তাগিদের রূপটি। ইদানীং যাঁরা বৈজ্ঞানিক-অর্থনৈতিক প্রণালীর অনুসরণে সমাজবিজ্ঞানের নানা সূত্রের যান্ত্রিক-আঙ্কিক

প্রয়োগের দ্বারা বিপ্লব আন্দোলনের হেতু নির্ণয়ের পরিশ্রম করছেন, যাঁদের সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে—পেটের জ্বালাতেই ছেলেরা বিপ্লব আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, আদর্শ ব্যাপারটা সেখানে গৌণ—তাঁরা অবশ্যই ঠিক, কারণ স্বদেশীয়দের পেটের জ্বালার কারণ সন্ধান ক'রে বিপ্লবী যুবকেরা ইংরাজদের শোষণ সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিল, তাই ব্যস্ত হয়েছিল শোষকদের উৎখাত করতে। কিন্তু যদি মনে করা হয়, যুবকেরা একেবারে নিজেদের পেট চাপড়াতে-চাপড়াতে সাহেব খুন করেছিল, তাহলে ব্যাপারটা টেকসই হবেনা, যেহেতু আন্দোলনে যোগদানকারী যুবকদের অধিকাংশেরই ঘরে অন্ন ছিল। বস্তুত ঐ যুবকেরা সারা দেশের অন্নসমস্যা মেটাবার জন্য আত্মোৎসর্গে এগিয়ে এসেছিল—আর তারই নাম তো দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, আদর্শবাদ ইত্যাদি!! 'বিশ্বাস' বস্তুটা কেবল উদরে জন্মায় না—গোটা দেহমনকে জড়িয়ে তা আবির্ভূত হয়। বিবেকানন্দ ঐ বিশ্বাসের জন্মদাতা। তাই তাঁর বই যুবকেরা পড়ত, বা তাদের পড়ানো হতো। সেখানে কেবল অর্থনৈতিক শোষণের কথা ছিলনা (তা ছিলই)—প্রাধান্য পেয়েছিল জাগরণের আহ্বান। ইংরেজ প্রশাসকরা বিবেকানন্দের বিশেষ-বিশেষ রচনাংশ তাঁদের রিপোর্টে উৎকলন করার সময়ে যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। সেগুলি বিশ্লেষণ করলে বেরিয়ে আসে—বিবেকানন্দের রচনার কোন্-কোন্ বক্তব্য যুবচিত্তকে নাড়িয়েছিল। সেগুলি মোটামুটি এই:

(১) বিবেকানন্দ জাতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে গৌরববোধ করতে আহ্বান করেছেন। মহান ঐতিহ্যের স্মৃতি মহত্তর ভবিষ্যৎ সৃষ্টির প্রেরণাদায়ী—বিবেকানন্দ এই বোধ এনে দিয়েছিলেন;

(২) স্বদেশীয় ঐতিহ্যের মহিমা উপলব্ধির পথে প্রধান বাধা—বিদেশীয় ঐতিহ্যের বিরাট শক্তিমত্তা সম্বন্ধে আতঙ্ক এবং নিজ ঐতিহ্য সম্বন্ধে নির্বিচার ঘৃণা—ইংরাজ শাসন যে-দুই বস্তু ভারতীয় মনে প্রোথিত করতে পেরেছিল। বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যপ্রচার ঐ মনোভাবের মূলে আঘাত ক'রে, ভারতীয় সংস্কৃতির শক্তিরূপ দেখিয়ে, প্রমাণ করেছে—ইংরাজের সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে সর্বদা মাথা নামিয়ে মেনে নেবার কারণ নেই, এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যের অজুহাত দেখিয়ে রাজনৈতিক আধিপত্যের নৈতিক অধিকারও তাদের নেই;

(৩) সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের ভাবী বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন বিবেকানন্দ যুবকদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন, যা তাদের মধ্যে বিশ্ববিস্তারী শক্তির চেতনা এনে দিয়েছিল;

(৪) হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত ভারতীয়দের বিবেকানন্দ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—ভারতের বর্তমান পতন চিরপতন নয়; অতীতে সে উন্নত ছিল, ভবিষ্যতেও হতে পারবে, যদি সচেষ্ট হয়; এতে ভারতীয়দের মধ্যে আত্মগ্লানি বহুলাংশে দূরীভূত হয়ে আত্মবিশ্বাস জেগেছিল;

(৫) ভারতের পতনের অন্যতম কারণ—ভারতীয় জাতির আত্মসংকোচ, বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কত্যাগ, গতিশীল জাতিসমূহের অভিজ্ঞতার শিক্ষাগ্রহণ না-করা। বিবেকানন্দ ভারতীয়দের সকল নিষেধ-বিধি ভেঙে, পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, সেখানকার সামাজিক সংগঠন, শিক্ষানীতি, এবং বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করতে বলেছেন;

(৬) ভারতের পতনের আর এক কারণ, জাতীয় সংহতিনাশক শক্তিসমূহের অবাধ সক্রিয়তা। ভারতে ধর্মে-ধর্মে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বিভেদ; উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণে বিভেদ; আর্য অনার্যে বিভেদ; আর্য দ্রাবিড়ে বিভেদ। এই সকল বিভেদের চরিত্র খুলে ধরে, তাদের

দূরীকরণের উপায় বিবেকানন্দ যথাসম্ভব খুলে ধরেছেন। তাঁর ধর্মসমন্বয়বাদ, জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রচার, উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রদর্শন, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমস্যাসমূহ আলোচনা করার প্রবণতা—এক্ষেত্রে দিগ্‌দর্শন করেছে।

(৭) সমাজ-দার্শনিকের ভূমিকায় বিবেকানন্দ ভারতে ইংরাজ শাসনের স্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন, এই শাসন ধনতন্ত্রের শাসন ছাড়া কিছু নয়; অর্থনৈতিক শোষণ নিশ্ছিদ্র করতে নিয়োজিত আছে ইংরাজের নিষ্ঠুর রাজনৈতিক শাসন-কাঠামো। গোটা ভারতবর্ষ ইংরাজ-শাসনে শূদ্রত্বে অবনমিত। বিবেকানন্দ আশার বাণী শুনিয়েছেন—পৃথিবীজোড়া শূদ্রের উত্থানের দিন এসেছে, ভারতবর্ষ তার বহির্বর্তী নয়। সমাজতন্ত্র কালের বিধান;

(৮) দরিদ্র ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বিবেকানন্দ ম্যাপ, চার্ট, গ্লোব, ম্যাজিক লণ্ঠন ইত্যাদি নিয়ে গ্রামে-গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে বলেছেন। (তাঁর এই গণশিক্ষার পরিকল্পনাটির প্রতি গোয়েন্দাদের বিশেষ নজর পড়েছিল)। শিক্ষাকে নিয়ে যেতে হবে চাষীর লাঙলের কাছে, শ্রমিকের কারখানার মধ্যে;

(৯) ভারতের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বিবেকানন্দ যুবসমাজকে আত্মবলিদানে আহ্বান করেছেন; বলেছেন, আত্মা অজর অমর, কিন্তু দেহের বিনাশ অনিবার্য; তাই শ্রেয়কাজে দেহপাত করাই কর্তব্য। যুবকেরা তাঁর কাছ থেকে জেনেছে—সমষ্টির ইচ্ছাশক্তিকে সংহত করতে পারলে ফললাভ হবেই। মুষ্টিমেয় ইংরাজ যদি তাদের ইচ্ছাশক্তিকে সংহত আকারে ব্যবহার ক'রে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারে, তাহলে কোটি-কোটি ভারতবাসীর কিছু অংশের ইচ্ছাশক্তি সংহত হলেই অসাধ্যসাধন করা সম্ভব।

ইংরাজ প্রশাসকদের দ্বারা উৎকলিত বিবেকানন্দের রচনা থেকে ঐ সকল বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে। তাঁরা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, বিবেকানন্দের লেখা কেন বিপজ্জনক। সেই জন্যই তাঁরা স্বামীজীর পত্রাবলী নিষিদ্ধ করার মতলব করেন। ডঃ শিশির কর গোয়েন্দা-রিপোর্ট থেকে সরকারের ঐ অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ করেছেন। এই সঙ্গে, বিবেকানন্দের গ্রন্থপ্রকাশক ও ভাবপ্রচারক রামকৃষ্ণ মিশনকেও নিষিদ্ধ করার ইচ্ছা সরকারের হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশনকে সরকার কিভাবে বহু বৎসর ধরে উত্ত্যক্ত ও উৎপীড়িত করেছে, দীর্ঘ সে ইতিহাস এখানে বলার প্রয়োজন নেই।

॥ আট ॥

যুব আন্দোলনের কেবল বৈপ্লবিক অংশেই বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল, নিতান্ত ভ্রান্ত সে কথা। বিবেকানন্দের চিন্তার যে আংশিক রূপ ইতিপূর্বে হাজির করেছি, তার আবেদন কেবল রুদ্রপন্থীদের মধ্যে আবদ্ধ থাকার কথা নয়। বস্তুত সর্বাত্মক যুব-আন্দোলনের প্রেরণাপুরুষ যে তিনি ছিলেন, তার স্বীকৃতি আছে সমকালীন ঐতিহাসিক ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' (২য় খণ্ড, ১৮৭-৯০) গ্রন্থে:

"পাঁচ বৎসরে তিনি [বিবেকানন্দ] এমন মন্ত্রে ভারতীয় যুবকগণকে উদ্বোধিত করেন যে, পরে যুব-আন্দোলনই ভারতের প্রধান কার্যকরী আন্দোলন হয়। অতঃপর ভারতে এমন একটি শক্তির উদ্বোধন হইল যে, বাংলার যুবসম্প্রদায়ের নিকট লর্ড কার্জনের দমননীতিও অসার হইয়া পড়িল। বস্তুত এই সময় হইতে কেবল ধর্মজীবনে নয়—জাতিগঠনে, সমাজসেবায়, শিক্ষার প্রসারে, সকল দিকেই দেশে যেন নূতন বন্যা প্রবাহিত হইল।"

স্বয়ং বিপ্লবী, এবং বিপ্লব আন্দোলন বিষয়ে সুপরিচিত গ্রন্থের ('ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব') লেখক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ও বিবেকানন্দকে 'সর্বাত্মক বিপ্লবের ভাবগুরু' রূপে উপস্থিত করেছেন।

"শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয় [ভূপেন্দ্রকিশোর লিখেছেন], সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পকলা, সাহিত্যকে ঘিরে যে-সংস্কৃতি, [এবং] বিজ্ঞান, দর্শন, মানসিক উৎকর্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও—উল্লিখিত গুরু ও শিষ্যার [বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা] অগ্নিস্নাত মন্ত্র বাংলার কর্মী ও জিজ্ঞাসুর দলকে সেই রেনেসাঁর যুগে আত্মনিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছিল। তাই স্বামী বিবেকানন্দকে বলা চলে ভারতীয় সর্বাত্মক বিপ্লবের ভাবগুরু এবং নিবেদিতাকে বলা যেতে পারে বিপ্লবচঞ্চল ভারতের লোকমাতা।"

এক বাঙালী বিপ্লবীর এই কথাগুলিকে যদি আবেগপ্রসূত বলে মনে হয়, তাহলে স্থিতধী দার্শনিক ডঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণের কিছু কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

"কলিকাতা নগরী শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, ধর্মৈষণায় শ্রেষ্ঠ কত প্রতিভার জন্ম দিয়েছে [রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন]—তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ। এই মহাদেশের আত্মার প্রতিভূ তিনি। তিনি এই দেশের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার ও তার পূর্ণতার প্রতীক। সেই আত্মিক শক্তি ভক্তের সঙ্গীতে, ঋষির দর্শনে, সাধারণ মানুষের প্রার্থনায় অভিব্যক্ত। ভারতের এই চিরন্তন সত্তাকে বিবেকানন্দ মূর্তি দিয়েছেন, বাণী দিয়েছেন।"

রাধাকৃষ্ণণ জানিয়েছেন, তিনি যখন মাদ্রাজে কলেজের ছাত্র তখন তাঁদের কাছে বিবেকানন্দের পত্রের হস্তলিখিত কপি আসত, আর তাঁরা গোপন বৈপ্লবিক সাহিত্যের মতো সেগুলি পড়তেন।

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী যৌবনে বিবেকানন্দকে দেখেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের গোটা ইতিহাসকে স্বচক্ষে দেখার পরে তিনি লিখেছেন,

"আমরা অন্ধ ছিলাম, তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়েছেন। ভারতীয় স্বাধীনতার জনক তিনিই। তিনি আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার পিতা।"

উত্তরভারতীয় লালবাহাদুর শাস্ত্রী, এবং পশ্চিমভারতীয় কে এম মুনশীর মতো দেশনেতারা জানিয়েছেন, কৈশোরে যৌবনে বিবেকানন্দের রচনা পড়ে তাঁদের চোখ খুলে গিয়েছিল। এ-ধরনের অন্য উল্লেখও করা যায়।

স্বদেশী আন্দোলনকালেই বিবেকানন্দের প্রভাবে যুব সংগঠন লক্ষ্য করে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন:

"ভারতের সর্বত্র বিশেষত দক্ষিণভারতে, নগর ও গ্রামে, বিবেকানন্দ সোসাইটি দেখা যাবে। একদল ছাত্র স্বামীজীর গৌরবময় নামের আগুনে জ্বলে উঠে সংঘবদ্ধ হয়েছে।" [নিবেদিতার ইংরেজী রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৮০]

'বিবেকানন্দ সোসাইটি' নাম না নিয়েও একই আদর্শে বহু প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে গড়ে ওঠে। স্বাধীনতা সংগ্রামসহ অন্য সংগ্রাম ও উন্নয়নমূলক কার্যের সঙ্গে যুক্ত খ্যাত অখ্যাত ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায়, তাঁরা যৌবনে কী প্রচণ্ডভাবে বিবেকানন্দের রচনার দ্বারা প্রভাবিত। এই প্রভাবক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত সাহিত্য ও শিল্পও। কেরালার মহাকবি কুমারণ আসান, তামিলনাডুর কবিশ্রেষ্ঠ সুব্রহ্মণ্য ভারতী, হিন্দী বলয়ের সুবিখ্যাত কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (নিরালা), প্রখ্যাত হিন্দী কথাশিল্পী প্রেমচন্দ্, একযুগের শ্রেষ্ঠ মরাঠি নাট্যকার মামা ওয়ারেকর—সকলেই যৌবনে বিবেকানন্দের দ্বারা আলোকিত। 'নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার' তরুণ শিল্পীরা নিবেদিতার মাধ্যমে বিবেকানন্দের চেতনা লাভ করেছিলেন।

মাদ্রাজের তরুণ সংস্কারকদের সঙ্গে স্বামীজীর যোগাযোগের উল্লেখ আগে করেছি। তাঁর প্রভাবেই যে, জাতীয় ভিত্তিতে সমাজসংস্কারের ঔচিত্য উপলব্ধ হয়, তা সংস্কার-আন্দোলনের ইতিহাস-লেখকেরা স্বীকার করেছেন। মাদ্রাজের তরুণ সমাজসংস্কারকদের মুখপত্র 'সোস্যাল রিফর্মার' পত্রিকায় ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭, লেখা হয়েছিল: "সুবিখ্যাত স্বামীজী...পৃথিবীতে হিন্দুধর্মের প্রতিভাবান উদারমনা প্রচারক হিসাবে প্রধানত পরিচিত। কিন্তু এমন একদিন আসবে, আশা করি সেদিন দূরবর্তী নয়, যখন পৃথিবী তাঁর মধ্যে সেই সমাজসংস্কারককে দেখবে যাঁর তুল্য পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি, কল্পনার সাহসিকতা ও উদ্দেশ্যের বাস্তবমুখিতা অতি অল্পই দেখা যায়।" একই তারিখে একই পত্রিকায় অপর একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়:

পুরোপুরি আমাদের সঙ্গেই আছেন। তাঁর লক্ষ্যের কথা নিজেই বলেছেন—ঝাড়ে-মূলে সংস্কার। তিনি আমাদের অধিকাংশের চেয়ে বেশি র‍্যাডিক্যাল। আমাদের সুচিন্তিত মত এই যে, সমাজসংস্কার আন্দোলন বহু বৎসরের মধ্যে তাঁর অপেক্ষা বড় সহায়ক লাভ করেনি।"

স্বামীজীর সংস্কার-পরিকল্পনা প্রচলিত তালিকাগত সংস্কারচেষ্টায় আগ্রহ না দেখিয়ে মূলগত ব্যাপারে বেশি জোর দিতে চেয়েছিল। জনগণের মধ্যে লুপ্ত আত্মচেতনার পুনরাবির্ভাব ঘটিয়ে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারকামী সেই সংস্কার-পরিকল্পনা ভারতবর্ষের তৎকালীন পরিস্থিতিতে বৈপ্লবিক। এর প্রস্তুতি হিসাবে তিনি মনোগঠনের উপর জোর দিয়েছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে ইতিবাচক গণশিক্ষার বিস্তার ছাড়া আর কোনো পথ তিনি দেখেন নি। তাঁর প্রেরণায় অজস্র নৈশ বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। প্রতিষ্ঠিত

বিদ্যালয়গুলির মধ্যে তরুণ আদর্শবাদী শিক্ষকেরা প্রবেশ ক'রে গিয়েছিলেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগ নেই এমন দেশপ্রেমী যুবকেরাও একই কাজ ক'রে গেছেন। বহু আদর্শবাদী শিক্ষকের চরিত্রতেজে দেশ পূর্ণ ছিল। বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন-পর্বে ও পরবর্তীকালে সেই সকল শিক্ষকেরা কয়েক প্রজন্মের সংগ্রামী যুবকদের চরিত্রগঠন ক'রে দিয়েছিলেন। যেমন ধরা যাক, এইরকম দুইজন অধ্যাপকের পুণ্য জীবনকথা বলতে শিক্ষাবিৎ ও লেখক ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য অক্লান্ত। তাঁরা—গোপালচন্দ্র মজুমদার ও বিনয় সেনগুপ্ত—তাঁদের প্রতি নিশ্বাসে বিবেকানন্দ। আমি নিজে হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের ছাত্র—যে-বিদ্যালয় অসহযোগ আন্দোলনের কিছু আগে স্থাপন করেন জনদশেক বিবেকানন্দভক্ত তরুণ। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ এই যুবকদের বলেছিলেন স্বামীজীর আদর্শে শিক্ষাবিস্তার করতে। সেই নির্দেশ শিরোধার্য ক'রে তাঁরা হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম স্থাপন করেন, এবং সংসারজীবনে প্রবেশ না ক'রে বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের মধ্য দিয়ে আদর্শবাদী শিক্ষাদানকে জীবনব্রত করেছিলেন।

যুবকগণ শিক্ষাবিস্তারকালে স্বামীজীর কোন্ চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছিলেন, তার একটা রূপরেখা আমরা স্বামীজীর সঙ্গে অশ্বিনীকুমার দত্তের আলোচনা থেকে পেয়ে যাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলেছেন, সেকথা তথ্যাভিজ্ঞ অনেকেরই কথা, "স্বামী বিবেকানন্দ রাজনীতিতে সেবা ও মানবতা প্রচার করিয়াছেন, আর তাহা কার্যে পরিণত করিয়াছেন অশ্বিনীকুমার।" ১৮৯৭-এর মাঝামাঝি সময়ে আলমোড়ায় বিবেকানন্দের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারের দেখা। অশ্বিনীকুমার কংগ্রেসের অনুরক্ত। কংগ্রেস সম্বন্ধে তিনি স্বামীজীর মত জানতে চাইলেন। কংগ্রেসের তৎকালীন নীতিতে অসন্তুষ্ট বিবেকানন্দ বললেন, নিছক কয়েকটা প্রস্তাব পাস করলে স্বাধীনতা আসবে না! জনগণকে প্রথমে জাগাতে হবে। তাদের অন্ন চাই। সেই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস কিছু করলে তার সম্বন্ধে তাঁর সহানুভূতি আছে। ধর্ম প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন, যে-ধর্ম মানুষকে শক্তি দেয়না, তা ধর্মই নয়। তারপর অশ্বিনীকুমার যখন উচিত কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ চাইলেন তখন বিবেকানন্দের আসল চেহারা বেরিয়ে এল:

> "শুনেছি আপনি শিক্ষামূলক কাজ করেন। ওটাই আসল কাজ। আপনার মধ্যে মহাশক্তির খেলা চলছে। জানবেন জ্ঞানদান মহাদান। তবে, মানুষ তৈরীর শিক্ষাই যেন জনগণকে দেওয়া হয়। চরিত্রগঠন চাই। ছাত্রদের আপনি বজ্রের মতো গড়ে তুলুন। বাঙালী যুবকদের হাড় থেকে বজ্র তৈরী হয়ে ভারতবর্ষের দাসত্বকে চূর্ণ করবে।
>
> "আর আপনারা চলে যান অচ্ছুতদের কাছে, মুচি মেথর ঝাড়ুদারদের কাছে। তাদের বলুন, তোমরাই জাতির প্রাণ; তোমাদের মধ্যে আছে পৃথিবীতে বিপ্লব ঘটাবার শক্তি। তোমরা উঠে দাঁড়াও, শিকল ছিঁড়ে ফেলো। পৃথিবী অবাক হয়ে তোমাদের দিকে চেয়ে থাকবে।"

অশ্বিনীকুমার যে স্বদেশী যুগে বিবেকানন্দের এই ইচ্ছাকে ব্যাপকতম আকারে পূরণ করতে পেরেছিলেন, তা সকল বিবরণেই মেলে। এক বৃদ্ধ বিপ্লবী, সঞ্জীবপ্রসাদ সেন, বিপ্লব আন্দোলনের পদ্ধতি ও লক্ষ্যগত সংকীর্ণতার সমালোচনা প্রসঙ্গে আমাকে এক চিঠিতে (২.২.৭৯) লিখেছেন: "আপনাকে স্মরণ করতে বলব, স্বামীজীর সঙ্গে অশ্বিনী দত্তর

আলমোড়ার কথাগুলো এবং অশ্বিনীকুমার ও তাঁর সহকর্মীরা স্বামীজীর পরামর্শানুযায়ী কিভাবে পূর্ববঙ্গে আর একরকমের বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন, যার সঙ্গে খুনজখমের বিন্দুমাত্র সংস্রব ছিলনা। স্বামীজীর আদর্শে কর্মী প্রস্তুত ক'রে যে-গণজাগরণ বরিশালে দেখা দিয়েছিল, তাতে প্রশাসন প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিল। অশ্বিনীবাবু হয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমান সর্বসম্প্রদায়ের হৃদয়ের রাজা। অশ্বিনীবাবুর জনশিক্ষায় হাড়ি ডোম মুচি মেথর বাগদী নমশূদ্র, হিন্দু মুসলমান, একতাবদ্ধ একপ্রাণ হয়ে বিদেশী শাসনকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছিল। অশ্বিনীবাবু তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আবার হাজার-হাজার ছেলেকে শিক্ষিত ক'রে তুলেও স্বামীজীর বিপ্লবের কার্যক্রমকে রূপায়িত করার জন্য বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি চট্টগ্রামে প্রবর্তক সংঘের গঠনমূলক কাজকর্ম দেখেছি। প্রবর্তকের অবিনাশ মজুমদার নামে এক কর্মী কুতুবদিয়া নামে একটি বিরাট দ্বীপের হিন্দু মুসলমান সর্বসম্প্রদায়ের সমস্ত নিরক্ষর অধিবাসীদের হৃদয় জয় ক'রে স্বামীজীর আদর্শে অশ্বিনীবাবুর মতোই কাজ করেছিলেন।"

অর্থাৎ গণশিক্ষার বিস্তারের দ্বারা চেতনাসৃষ্টির পিছনে বিবেকানন্দের প্রেরণা প্রবলভাবে সক্রিয়, এবং যুবকেরা সেই কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। স্বামীজীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছেন এমন দুই মাদ্রাজী তরুণ—সি রামস্বামী আয়েঙ্গার এবং সি রামানুজাচারী—মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রয়ে যে স্টুডেন্টস্ হোম তৈরি করেছিলেন, তা বহু বৎসর ধরে বহুসংখ্যক নীতিনিষ্ঠ তরুণের সৃষ্টি করেছে। এরই দ্বারা অনুপ্রাণিত টি এস অবিনাশলিঙ্গম কয়ম্বাটরে গড়ে তুলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়তুল্য প্রতিষ্ঠান—রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ অবিনাশলিঙ্গম বলেছেন, মাদ্রাজ স্টুডেন্টস্ হোম দক্ষিণ ভারতে অনুরূপ বহু প্রতিষ্ঠানের ভাব-উৎস। ভারতের অন্যত্র অনেক জায়গাতেই একই ব্যাপার ঘটেছে।

আর ভারতীয় যুবকদের মধ্যে সেবা-আন্দোলন যে প্রধানত বিবেকানন্দেরই প্রেরণা-সৃষ্টি, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ঐতিহাসিকরা তা স্বীকারে কুণ্ঠিত নন।

॥ নয় ॥

বিংশ শতাব্দের বিশ ও ত্রিশের দশকে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে যুব আন্দোলন প্রধানত দুই ব্যক্তির সৃষ্টি—সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল। বিবেকানন্দের ডায়ন্যামিক জীবন ও বাণী ভারতবর্ষের জীবনে কোন্ শক্তি ও গতি দিয়েছে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনে তিনি কোন্ প্রবল স্পন্দন সৃষ্টি করেছেন—সে-সম্বন্ধে জওহরলালের জোরালো স্বীকৃতি আছে। সে প্রসঙ্গ বাদ থাক। বাঙলার ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের কথায় আসা যাক। সুভাষচন্দ্র যে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যুবসমাজের মধ্যে সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি যে তাদের 'প্রাণের রাজা' ছিলেন—সে-বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার মতো যথেষ্ট মানুষ এখনো জীবিত আছেন। সুভাষচন্দ্রের রচনাবলীর পৃষ্ঠা ওল্টালেই দেখা যাবে, যুব সম্মেলনগুলির সংগঠনে বা পরিচালনায় তিনি কতভাবে ব্যাপৃত থাকতেন। রাংলাদেশে প্রদত্ত তাঁর ভাষণগুলিতে ভাব, ভঙ্গি, ও চিন্তায় বিবেকানন্দের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়, আর সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়,

কারণ তিনি নিজেকে বিবেকানন্দের ভাব-সন্তান বলে ঘোষণা করেছেন। এখানে একটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সুভাষচন্দ্র স্বামীজীকে কেবল উদ্দীপক বাণীর ঘোষকরূপেই উপস্থিত করেন নি; নিছক উদ্দীপক বাণীর আয়ু অল্প, তা স্ফুলিঙ্গবৎ জ্বলে নিঃশেষিত হয়ে যায়—যদিনা তার পিছনে নিত্য-অগ্নি-উৎস থাকে। বিবেকানন্দের গভীরতর পর্যালোচনা করতে সুভাষচন্দ্র চেয়েছেন। তাঁর তেমন দুটি ভাষণ—রংপুরে প্রদত্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের ভাষণ (৩০.৩.১৯২৯), এবং হুগলীতে হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলনের ভাষণ (২১.৭.১৯২৯)। রংপুর ভাষণে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নানা পর্বের কথা বলার পরে, সুভাষচন্দ্র রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারার সর্বমুখী বিস্তারের কথা বলেন:

> "রামমোহনের বেদান্ত প্রচারের মধ্যে যে-সমন্বয়ের সূচনা আমরা দেখিতে পাই, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মধ্যে পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার জীবনের অপূর্ব অলৌকিক সাধনার বলে বিভিন্ন সাধনপদ্ধতির (যেমন কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান) মধ্যে সমন্বয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে (যেমন শাক্ত, বৈষ্ণব, যোগী, শৈব ইত্যাদি) সমন্বয়, এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে (যেমন খ্রীস্টীয় ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম ইত্যাদি) সমন্বয় স্থাপন করিযা গেলেন। পরমহংসের অনুভূতি ও সাধনার উত্তরাধিকারী হইলেন প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ, এবং তারপরে সমগ্র বঙ্গবাসী। এই সমন্বয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া—কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, ক্রীড়া ও ব্যায়ামকৌশলে সৃষ্টি ও নূতন প্রচেষ্টা চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত সমাজে পূর্ণ সাম্য স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে—এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালী জাতি সাহিত্যসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।"

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পূর্বে-উদ্ধৃত রাধাকৃষ্ণণের ১৯৬৩ সালের বক্তব্যের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ৩৪ বৎসর পূর্ববর্তী বক্তব্যের প্রায় কোনো তফাত নেই, কেবল সুভাষচন্দ্র যেখানে বঙ্গদেশীয় পটভূমিকার কথা বলেছেন সেখানে রাধাকৃষ্ণণের বক্তব্যে ভারতবর্ষীয় পটভূমিকা।

সুভাষচন্দ্র পূর্বোক্ত ভাষণে এরপর বিশেষ জোর দিয়ে বিবেকানন্দের অন্য একটি ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলেছেন। বৌদ্ধযুগের পরে বিবেকানন্দই একালে প্রথম ভারতবর্ষীয় যিনি জ্ঞানদীপ নিয়ে বিশ্ব পরিক্রমণ করেছেন। সেই ঘটনার পর, "ভারতবাসী ঘর ছাড়িয়া বাহিরের জন্য পাগল হইল; বিশ্বদরবারে দিবার মতো সামগ্রী নিজের ঘরে খুঁজিয়া পাইল। তারপর রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রামানুজম্, রামন প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও মনীষীগণ কতদিক দিয়া বিশ্বসভ্যতাকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। এইসব মহাপুরুষের আজীবন সাধনার ফলে আজ ভারতীয় জাতি বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহাদের একটা আদর্শ আছে, বাঁচিবার উদ্দেশ্য আছে, পৃথিবীতে জাতি হিসাবে একটা মিশন আছে।"

একই বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর মানুষ তৈরির ব্রতের কথা বললেন, সেই মানুষকে তিনি কিভাবে সমষ্টির মধ্যে সন্ধান করেছেন, সে কথাও। স্বামীজীর বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত

করলেন, "নতুন ভারত বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হতে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে" ইত্যাদি। তারপর বললেন, "এই তো বাঙলার সোস্যালিজম্। এই সোস্যালিজমের জন্ম কার্ল মার্কসের পুঁথিতে নয়—এর জন্ম ভারতের শিক্ষাদীক্ষা ও অনুভূতি হতে।"

হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলনের ভাষণে সুভাষচন্দ্র নিজের 'জীবনবেদ' খুলে ধরতে চেষ্টা করেন। তিনি জাতীয় আদর্শে বিশ্বাসী; আদর্শ না থাকলে জীবন অর্থহীন; আদর্শের বিকাশ-সাধনা জাতি বহু বৎসর ধরে ক'রে যায়, ইত্যাদি। তিনি আরও বলেন, ব্যক্তির আদর্শ ও জাতির আদর্শ, একে অপরের পরিপূরক। তারপর তিনি একালে ভারতীয় জাতির পক্ষে আদর্শের জন্য সাধনার ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রাথমিক প্রয়াস, যার পূর্ণতা স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে, সেই প্রসঙ্গে আসেন। এই রচনায় তিনি বিশেষভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রয়োজনের কথা উত্থাপন ক'রে, সেই ব্যক্তিত্ব যে কর্মবিহীন সন্ন্যাসে বা পুরুষকারহীন অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসের দ্বারা বিকশিত হবেনা, তাও দৃঢ়ভাবে জানান। পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতাই মূল প্রশ্ন। তাই বলেছিলেন, "স্বাধীনতার অখণ্ড রূপের আভাস রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। *Freedom, Freedom is the Song of the Soul*—এই বাণী যখন স্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয়, তখন সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে।" স্বাধীনতার এই অখণ্ড রূপ কিভাবে এক ও বহুর সমন্বয়ের দার্শনিক ভূমিতে, সেইসঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ঐহিক ভূমিতে প্রসারিত হয়েছিল, তার উল্লেখ সুভাষচন্দ্র করেছেন। রচনার শেষে তিনি বিবেকানন্দের অনুসরণে ছাত্রদের আহ্বান ক'রে বলেছিলেন, "সাম্যবাদ ও স্বাধীনতা-মন্ত্র প্রচার করিবার জন্য তোমরা গ্রামে-গ্রামে ছড়াইয়া পড়ো।...স্বাধীনতার পূর্ব-স্বাদ নিজের অন্তরে পাইলে সকলেই পাগল হইয়া উঠিবে।... নিজের অন্তরে এই আলোক জ্বালো—সেই দীপ হস্তে লইয়া দেশবাসীর দ্বারবর্তী হও...চাষার পর্ণকুটীরে, মজুরদের আবর্জনাপূর্ণ ভগ্নগৃহে।...আর যাও মাতৃজাতির সমীপে, যাঁহারা শক্তিরূপিণী অথচ সমাজের চাপে আজ হইয়াছেন অচলা।"

স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী নায়ক সুভাষচন্দ্র, জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা পর্যালোচনায় আগ্রহীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই কথাগুলি বলেছেন:

> **"রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্ব ধর্মের যে-সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি। এই সর্বধর্মসমন্বয় ও সকল মত-সহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয়তার সৌধ নির্মিত হইতে পারিত না।"**

একই ভাষণের একাংশে সুভাষচন্দ্র বলেছেন: "১৫ বৎসর পূর্বে যে-আদর্শ বাংলার ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করিত তাহা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। সে আদর্শের প্রভাবে তরুণ বাঙালী ষড়্‌রিপু জয় করিয়া, স্বার্থপরতা ও সকল প্রকার মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া,

আধ্যাত্মিক শক্তির বলে শুদ্ধ-বুদ্ধ জীবনলাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইত। সমাজ ও জাতিগঠনের মূল—ব্যক্তিত্ব বিকাশ। তাই স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা বলিতেন, Man making is my mission. খাঁটি মানুষ তৈয়ারী করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।"

বাঙলার ছাত্রসমাজের উপর স্বামীজীর প্রভাব সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের উক্তি যে আক্ষরিক সত্য ভিন্ন আর কিছু নয়, তার সমর্থনে অজিতকুমার চক্রবর্তীর সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়। সুভাষচন্দ্রের ভাষণের কাল, ১৯২৯। তার থেকে ১৫ বছর পেছিয়ে গেলে হয়, ১৯১৫। অজিতকুমার চক্রবর্তী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে 'লোকহিতের নূতন আদর্শ' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন, যার উদ্দেশ্য—বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত লোকহিতের আদর্শ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ-কথিত লোকহিতের আদর্শের শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন। তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতা আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়; কিন্তু ঐ প্রবন্ধে তিনি যুবসমাজে বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে যা বলেছেন তা গ্রাহ্য হবে এক ভিন্ন ভাবের মানুষের সাক্ষ্য হিসাবে। অজিতকুমার লিখেছেন:

> "দেশময় বিবেকানন্দের লেখার যত প্রচার এমন বোধহয় বঙ্কিমের উপন্যাসেরও নয়। [স্মর্তব্য: বঙ্কিমচন্দ্র তখন সর্বাধিক-পঠিত ঔপন্যাসিক]। ঘরে-ঘরে বিবেকানন্দের ছবি। তাছাড়া বিবেকানন্দের সেবক-সম্প্রদায় দেশের নানা জায়গায় পীড়িতদের শুশ্রূষা ও দরিদ্রের ভরণ করিতেছে—এ তো প্রত্যক্ষ। যে-কোনো কলেজ-পড়ুয়া যুবককে জিজ্ঞাসা করো, [শুনিবে যে/] বিবেকানন্দের প্রভাব তাহার উপর যেমন এমন আর কোনো মানুষের নয়। বাংলাদেশে এখন বিবেকানন্দের পর্ব চলিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

পরিবর্তন কিন্তু শুরু হয়েছিল নানা মুখে। কিছু দিনের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অভ্যুদয় পরিবর্তনের একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণ, পাশ্চাত্য সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার অনুপ্রবেশ। এইসঙ্গে দেশকর্মীদের মধ্যে উন্মুখ প্রশ্ন—সন্ন্যাসী-সুলভ নৈতিক শুদ্ধতার এত কি প্রয়োজন? তা কি অনাবশ্যক আত্মনিগ্রহ নয়? পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ভাবধারার ইন্দ্রিয়রসাক্ত ঔদার্যও সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একই ঢেউ তুলছিল। সুভাষচন্দ্র স্বতঃই উদ্বেগ বোধ করেছিলেন। যুব-আন্দোলন তিনি তৈরী করেছেন—'তরুণের স্বপ্ন' ও 'নূতনের আহ্বান' কেবল তাঁর দুটি বইয়ের নাম নয়, তাঁর আন্দোলনের মর্মবাণী তা—তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে দেখলেন, যে-আদর্শবাদ, চারিত্রিক শক্তি না থাকলে কোনো আন্দোলনই সফল হয়না, তাতে ঘাটতি পড়তে শুরু হয়েছে। বিবেকানন্দ তখনো আছেন বড় আকারেই, যথা গান্ধীবাদীদের মনে, (এইকালের জাতীয়তাবাদী আনন্দবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠা ওল্টালে দেখা যাবে গান্ধীজীকে বিবেকানন্দ-ভাবধারার বিস্তাররূপেই দেখানো হয়েছে), কিন্তু একথাও সত্য, বিবেকানন্দকে সুভাষচন্দ্র যে-চরিত্রে যুবকদের মধ্যে সঞ্জীবিত দেখতে চাইছিলেন, গান্ধীপন্থীরা সেই আকারে বিবেকানন্দকে গ্রহণ করেন নি। বিবেকানন্দের শক্তিবাদ আর গান্ধীর অহিংসাবাদ এক জিনিস নয়। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের বৃদ্ধ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহীও বটে। অপরপক্ষে তিনি প্রয়োজনমতো বৈদেশিক বস্তু গ্রহণে প্রস্তুত থেকেও, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাকে মেড ইন ইউরোপ আকারে গ্রহণ করতে গররাজি। ঐকালের কম্যুনিস্টদের নিপাট বৈদেশিক ভাবানুগত্যের চেহারা অনেকেরই মনে আছে। পত্রপত্রিকায় তাঁদের রচনাদিতে, ও আচরণে তা প্রকট। তাছাড়া তখনকার বাংলাসাহিত্য বাসনারসতরঙ্গে

ভাসমান বা ডুবুডুবু। ঐকালের কম্যুনিস্ট আন্দোলন যৌন স্বাধীনতার সমর্থক, এমন একটা ধারণাও, ঠিক ক'রে হোক, ভুল ক'রে হোক, ছড়িয়ে পড়েছিল। সুভাষচন্দ্র মানসিক অস্বস্তিতে ছিলেন; ক্ষোভ জানিয়ে বলেছেন, শুনছি এখন নাকি যুবকদের মধ্যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্যের তেমন টান নেই; অথচ চরিত্র গঠনের জন্য ঐ সাহিত্যের তুল্য সাহিত্য তো আমার জানা নেই। পূর্বে উদ্ধৃত সুভাষচন্দ্রের রচনাংশ থেকে দেখা যায়, যুবকদের সামনে তিনি স্বামীজীর মানুষ তৈরির আদর্শের কথা তুলে ধরেছেন। (এইকালের নানা বক্তৃতায়, রচনায় একই কাজ করেছেন)। বিবেকানন্দের সাম্যবাদের কথাও বলেছেন, যা ভারতীয় ভাবনির্ভর। বুঝতে অসুবিধা হয় না, বিদেশীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার একনিষ্ঠ অনুকরণ বা অনুসরণের প্রতিরোধের জন্যই তাঁর ঐ ধরনের কথাবার্তা। সুভাষচন্দ্র কোনোমতেই বস্তুবাদী নন, (সুতরাং কোনোমতেই মার্কসবাদী হতে পারেন না), ব্যক্তিজীবনে তিনি অধ্যাত্মবাদী, তাই মানবমুক্তির ক্ষেত্রে তিনি সর্বাঙ্গীণ মুক্তির কথা এনেছেন—তার মধ্যে কেবল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি নয়, ধর্মীয় মুক্তিও আছে। এ-বস্তু পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের 'অখণ্ড স্বাধীনতা' তত্ত্বে। যখন তিনি বিশেষভাবে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সমন্বয়তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন তখন অবশ্যই ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতির কথা তাঁর স্মরণে ছিল। বহু ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির দেশ ভারতবর্ষ। আঞ্চলিক স্বার্থ ক্রমেই উগ্র। সাম্প্রদায়িকতার বিকট প্রসার। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হচ্ছে। বিভেদের মূলে ইন্ধন দিচ্ছে নানা শক্তি। এই অবস্থায় ভারতীয় ঐক্যের জন্য কোনো একতন্ত্রী ভাবের পোষকতার পরিবর্তে তিনি বহুতন্ত্রী ভাবের প্রচারই উপায় ভেবেছিলেন— আর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মধ্যেই বহু ভাব ও সাধনার ঐকতান। সুভাষচন্দ্র যে-যুব র, তার স্বীকার্য আদর্শ—বিবেকানন্দেরই ভাবধারা।

॥ দশ ॥

বিবেকানন্দের আদর্শের উপর আঘাতের পর আঘাত পড়ছিল, কিন্তু তাকে স্থানচ্যুত করা যায়নি। এমনকি কম্যুনিস্ট আন্দোলন যে স্বাধীনতা-পূর্বে বাংলাদেশে ঠাঁই ক'রে নিতে পেরেছিল, তাও কিছুটা সম্ভব হয়েছিল বিবেকানন্দের দ্বারা প্রস্তুত সামাজিক সাম্য-ভাবনার ভিত্তি ছিল বলেই। প্রথম পর্যায়ে বাংলায় কম্যুনিস্টরা প্রধানত এসেছিলেন প্রাক্তন বিপ্লবীদের ভিতর থেকে, সেইসঙ্গে সমাজ-সংস্কারপন্থী পরিবার থেকে। শেষোক্ত গোষ্ঠীতে নয়, প্রথমোক্ত গোষ্ঠীতে ব্যক্তিগতভাবে বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট ছিল। আদর্শবাদী ত্যাগী কম্যুনিস্টদের যেসব শ্রদ্ধেয় চেহারা দেখা যেত তাঁরা প্রধানত প্রাক্তন বিপ্লবী বা প্রাক্তন জাতীয়তাবাদী। এবং তাঁদের মনোগঠন হয়েছিল বিবেকানন্দের ভাব-পরিমণ্ডলের মধ্যেই।

আর বিবেকানন্দ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বর্তমান ছিলেন গান্ধী-আন্দোলনের মধ্যে। গান্ধীজীই যে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ আন্দোলনের স্রষ্টা, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর আন্দোলনকে সাধারণভাবে যুব আন্দোলন বলা চলেনা। পঞ্চাশের মতো বয়সে পৌঁছে তবে তিনি ভারতীয় রাজনীতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তবু গান্ধীজীর আদর্শ রূপায়িত করতে ভারতের সর্বত্র যেহেতু অগণিত যুবক এগিয়ে এসেছিল, তাই তাঁর

আন্দোলনের যুব-অংশ উপেক্ষার নয়। বিবেকানন্দের সঙ্গে গান্ধীর ভাব-বিরোধের ক্ষেত্র যথেষ্ট। বিবেকানন্দের সংগ্রামী শক্তিবাদ, সামাজিক জীবনে বৈধ হিংসাকে ছাড়পত্র দান, জনগণের জন্য আমিষাহারের বিধান, কিংবা উৎপাদন ব্যবস্থায় বিজ্ঞানসম্মত আধুনিকীকরণের প্রতি সমর্থন ইত্যাদি—গান্ধীজীর মনঃপূত ছিলনা। ব্যক্তিজীবনে গান্ধী, বিবেকানন্দের তুলনায় রামকৃষ্ণকে নিকটতর মানুষ হিসাবে পেয়েছিলেন। সত্য, অহিংসা, বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য, ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি রামকৃষ্ণ-অনুগামী—একথা তাঁর বিখ্যাত জীবনীকার প্যারেলাল বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন। বিবেকানন্দকে গান্ধী প্রথমত নিয়েছিলেন দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের ক্ষেত্রে। ১৯২১ সালের ৩০ জানুয়ারি, বেলুড়-মঠে গিয়ে গান্ধীজী যা বলেছিলেন, তার গোয়েন্দা-রিপোর্ট এই—(অন্য রিপোর্টও আছে):

> "He [Gandhi] began by saying that he bore great respect for the late Swami Vivekananda. He had studied many of his books and said that his ideals agreed in many respects with that great man. If Vivekananda was alive it would have been a great help for their national awakening. However, his spirit was amongst them and that they should do their best to establish Swaraj. He said that they should learn to love their country before anything else."

কেবল দেশপ্রেম নয়, মানবপ্রেমের ক্ষেত্রেও আদর্শ পুরুষ হিসাবে গান্ধীজী বিবেকানন্দকে দেখেছেন। জনগণের মধ্যে 'কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত' হয়ে গান্ধীজী যখন বিচরণ করেছেন, তখন তিনি বিবেকানন্দের আহ্বানেরই অপূর্ব উত্তর। গান্ধীজী যখন মানবসেবাকে ঈশ্বরসেবা বলে ঘোষণা করেছেন, তখন বিবেকানন্দের উচ্চারণ মনে আসে। গান্ধীজী যে 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটিকে বিবেকানন্দের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন, সেকথা আচার্য বিনোবা ভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্যারেলালের রচনাতেও একই সংবাদ: "প্রাণকাড়া প্রবচন রচনায় সিদ্ধপুরুষ বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ণ শব্দটি প্রথম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রহণ করেন কলকাতা কর্পোরেশনে স্বরাজ্যদলের সেবাকর্মনীতির ঘোষণায়। পরে এই শব্দটি ভারতের অহিংস সংগ্রামকালে সংকেতবাণী হয়ে দাঁড়ায়—যখন গান্ধীজী ভারতের সাত হাজার গ্রামের পুনরুজ্জীবনের ধর্মযুদ্ধকালে পতাকার উপর শব্দটি লিখেছিলেন।"

গান্ধীজীর রাজনৈতিক ভাবনার সামাজিক অংশেই বিবেকানন্দ বিশেষভাবে গৃহীত। ধর্ম-প্রশ্নে গান্ধীজী বিবেকানন্দের দৃঢ় সমর্থক, এবং ধর্মান্তরকরণের দৃঢ়তর প্রতিবাদী। আপাতভাবে দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব গান্ধীর মধ্যে বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদের সংক্রমণ ঘটেছিল সমন্বয়ী মতবাদের ক্ষেত্রে। বিবেকানন্দের বেদান্তের "সর্বজনীনতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, সার্বভৌমিক উদারতা এবং আশাবাদকে গান্ধীজী পৃথিবীর উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত ভারতের বাণী বলে মনে করেছেন"—প্যারেলালের এই মত।

বিবেকানন্দের চিন্তা আরও দুটি ক্ষেত্রে গান্ধীজীকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল, সেগুলি হলো, দরিদ্র ভারতবাসীর ক্ষুধা নিবারণের অগ্রাধিকার এবং হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা। গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের পিছনে বিবেকানন্দের ছুৎমার্গ-বিরোধী প্রচারের প্রেরণা সক্রিয়—একথা গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠজনেরা স্বীকার করেছেন। বিবেকানন্দের কঠোর বাস্তবদর্শনকেও

এক্ষেত্রে গান্ধীজী স্বীকার করেছেন। ভারতে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষ 'অনুন্নত' না 'অবনমিত'? বিবেকানন্দ দ্বিতীয় শব্দটির পক্ষপাতী। গান্ধীজী একাধিকবার বিবেকানন্দের ঐ শব্দব্যবহার সমর্থন করেছেন। গান্ধীজীর একটি বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে, তিনি কেবল বিবেকানন্দের বক্তব্যকে নয়, ভাষাভঙ্গিকে পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন:

"We are guilty of having suppressed our brethren; we make them crawl on their bellies; we have made them rub their noses on the ground; with eyes red with rage we push them out of Railway compartment—what more than this has British rule done?...Swami Vivekananda used to say that the untouchables were not depressed, they were suppressed by the Hindus who in turn had suppressed themselves by suppressing them...I [pray] to-day that if I should die with any of my desires unfructified, with my service of the untouchables unfinished, with my Hinduism unfulfilled, I may be born again amongst the untouchables to bring my Hinduism to its fulfilment."

গান্ধীজী ১৩ নভেম্বর ১৯২৭, কলম্বো বিবেকানন্দ সোসাইটিতে বলেছিলেন:
"বিবেকানন্দের নাম যাদুমন্ত্র। ভারতবর্ষের জীবনে তাঁর অনপনেয় প্রভাব।... বিবেকানন্দের নামে যখন আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নাম তখন আপনারা কদাপি লক্ষ-লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষকে উপেক্ষা করতে পারেন না।"

অন্ন, সেবা, শিক্ষাদানের কর্তব্যে আত্মনিয়োজিত বিবেকানন্দের যুবক অনুগামীদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখে দীনবন্ধু এন্ডরুজ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি দেখেন—বিবেকানন্দের ঐসব অনুগামীরা বরেণ্য অদ্বৈতবাদকে সত্যই জীবনগত করতে পেরেছেন। আসাম স্টুডেন্টস্ কনফারেন্সে (১৯২৩) তিনি বলেছেন: "আমি মনে করি, স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আধুনিক ভারতীয় যুবকদের সবচেয়ে বড় ঋণ—অদ্বৈতবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের পুনঃপ্রবর্তনের ক্ষেত্রে। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীদের সঙ্গে আমি কলেরা-ক্যাম্পে ও দুর্ভিক্ষ-অঞ্চলে কাজ করেছি। গভীর আনন্দের সঙ্গে দেখেছি, কিভাবে তাঁরা সমাজের অন্ত্যজ মানুষের সঙ্গে নিজেদের সম-সত্তা অনুভব করেছেন।"

কেবল এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে নয়, বৃহত্তর জনজীবনে বিবেকানন্দের বিপুল প্রভাব লক্ষ্য ক'রে এন্ডরুজ তাঁর 'দি রাইজ্ অ্যান্ড গ্রোথ্ অব দি কংগ্রেস ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে (গিরিজা মুখার্জির সহযোগিতায় রচিত) বলেছেন: "এমনকি কংগ্রেসের বিকাশের পিছনে বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীরই প্রধান প্রভাব।" "কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও তিনি [বিবেকানন্দ] বৃহৎ অংশে তার নীতি নির্ধারণে ও বিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করেছেন।" এই কথা এন্ডরুজ যখন বলছিলেন তখন তাঁর মনে স্বতঃই উঠেছিল: আবেদন-নিবেদনের প্রথম পর্যায়ী কংগ্রেসের কথা (বিবেকানন্দ যে-ভিক্ষাবৃত্তির কঠোর সমালোচনা করেছেন); পরবর্তীকালের সংগ্রামী কংগ্রেসের কথা (কংগ্রেস স্বাধীনতা ঘোষণা করুক, এই ছিল বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা); জনগণের সেবা, শিক্ষা, ও সমানাধিকারের আদর্শ ঘোষণাকারী কংগ্রেসের কথা (প্রথম পর্বে কংগ্রেস ঐ নীতি ও

কার্যক্রম গ্রহণ করেনি বলে বিবেকানন্দের ক্ষোভ ছিল)। কংগ্রেস যে ক্রমে বিবেকানন্দ-আকাঙ্ক্ষিত পথে অগ্রসর হয়েছে, তার পিছনে যুবশক্তির প্রচণ্ড চাপ ছিলই। এই বিষয়ে সচেতন প্রত্যক্ষদর্শী এন্ডরুজ লিখেছেন:

"বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান তরুণ ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষায় নবপ্রাণের সঞ্চার করেছিল।... সেই কাল অপসৃত, যখন বিদেশী শাসনসৃষ্ট বহুবিধ অসন্তোষ অভিযোগ অন্যায়ের দূরীকরণের জন্য কংগ্রেস দরখাস্ত দাখিল করার বেশি কিছু করতে সমর্থ ছিল না। বিবেকানন্দ আনলেন নতুন ধ্বনি—তরুণদের চিত্তে তা অবিলম্বে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।... যৌবনকাল থেকেই বিবেকানন্দ নিজ দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীরভাবে আগ্রহী। ব্যাপক ভ্রমণ ও বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে ব্যাপকতর পরিচয়ের ফলে তিনি স্বদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা গঠন করতে পেরেছিলেন। কংগ্রেসের কার্যাবলীতে তিনি অংশ নেননি, কিন্তু কী ঘটেছে সে সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে অবহিত ছিলেন। কংগ্রেসের প্রধান নেতাদের অনেকেই তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। এমনকি তিনি ব্যক্তিগতভাবে কিছু যুবককে জানতেন যাঁরা পরে বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। বিবেকানন্দের অকুতোভয় দেশপ্রেম সারা ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নবচেতনা দিয়েছিল।"

॥ এগারো ॥

বিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে যুবসমাজে বিবেকানন্দের প্রভাব-স্রোতে অন্য ঘূর্ণি এসে তার প্রবাহকে ব্যাহত করতে সক্রিয় ছিল—একথা বলেছি। সে প্রবাহ কিন্তু গতিহারা হয়নি। বিপ্লবীদের অনেকে গান্ধী-আন্দোলনে যোগ দেন; অনেকে চিত্তরঞ্জনের আনুগত্য স্বীকার করেন; আবার অনেকে রাজনীতি পরিহার ক'রে সেবা ও শিক্ষামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এঁরা সবাই অল্পবিস্তর নিজেদের ভাব ও কর্মে বিবেকানন্দকে রক্ষা করেছেন। যাঁরা সেবা ও শিক্ষার পথে গিয়েছিলেন, তাঁরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নামে নানা প্রতিষ্ঠান গঠন ক'রে তরুণদের মধ্যে ওঁদের ভাবকে সঞ্চারিত করতে থাকেন। এইসব প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা-প্রতিষ্ঠান হয়ে যায়। এর সঙ্গে মিশনের সন্ন্যাসীদের দ্বারা স্থাপিত শাখাগুলি তো ছিলই। এই সকলের মধ্য দিয়ে ধীর সুনিশ্চিতভাবে যুবসমাজে ঐ ভাবধারা ছড়িয়েছে।

স্বাধীনতার পরে পরিস্থিতির বিচিত্র রূপান্তর ঘটল। নবলব্ধ স্বাধীনতা অর্থনৈতিক উন্নতির কিছু পথ খুলে দিল। ক্ষমতালাভের মাদকতা নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলই। পুরনো নেতারা কিছুদিন বিবেকানন্দকে বাক্যে গুরুপ্রণামী দিলেন। পরে তাঁরা ক্লান্ত বা অদৃশ্য হলেন। রাজনৈতিক জীবনে বিবেকানন্দের গুরুত্ব থাকল না, কারণ স্বাধীনতা এসে গেছে, সংগ্রাম, ত্যাগ ও সেবার দরকার নেই—আর বিবেকানন্দের ডাক তো ঐ বস্তুগুলির জন্যই। কংগ্রেসীদের হাত থেকে বিবেকানন্দ মাঝে-মধ্যে কিছু শুকনো মালা পেতে লাগলেন; অপরদিকে প্রতিবাদী প্রগতিশীল সাম্যবাদীরা তাঁর ভাবমূর্তি ভাঙার হাতুড়ি তুললেন।

বিবেকানন্দ তবু থাকলেন। ঢেউ নেমে যাবার পরে ক্রমে দেখা যেতে লাগল—তাঁকে দরকার, জরুরী দরকার—ভারতবর্ষের। স্বাধীনতার আগে 'জাতিগঠন' নামক স্ফীত শব্দের মধ্যে বিবেকানন্দের 'মানুষ গড়া' নামক শব্দটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল—অন্তত বিশ ও ত্রিশের দশকে। ঐ শব্দদুটি কিন্তু আবার উঠে পড়ল বাঁচার দাবি নিয়ে—কেননা তারা না-বাঁচলে ভারতবর্ষ বাঁচেনা। বহুদিনের অনশনের পরে ক্ষুধাতুর জাতি গোগ্রাসে গেলবার সময়ে, ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দিয়েছে। নানা সাজানো ভোগদর্শন ঐ লোলুপতাকে মনোহারী পোশাক সরবরাহ করেছে। তাতে চরিত্রের শূন্য গহ্বর ভরাট হয়নি। আবার তাই দরকার হয়ে পড়ল বিবেকানন্দীয় আদর্শবাদের। স্বাধীন ভারতে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিল। পুরনো সমস্যাগুলির অধিকাংশই মেটেনি। মেটেনি ক্ষুধার সমস্যা। তা মেটাবার চেষ্টায় যে-যন্ত্রশিল্পায়ন হয়েছে, তা কিছু সম্পদ জুগিয়ে, বাকি অংশে অধ্যাত্মভাবহীন বস্তুবাদের প্রসার ঘটিয়ে, মানুষকে যান্ত্রিক ক'রে ফেলছে। অস্পৃশ্যতার সমস্যা ঘৃণা ও হিংসায় ফেটে পড়ছে। একদিকে সামাজিক উৎপীড়ন, অন্যদিকে অর্থের প্রলোভন নতুনভাবে সৃষ্টি করছে ধর্মান্তরকরণের সমস্যা। তদনুযায়ী বেড়েছে সাম্প্রদায়িকতা। সূচনা হয়েছে 'জাতি-সমরের'। আঞ্চলিকতা বৃদ্ধির পথে। সব জড়িয়ে বিপন্ন ভারতীয় সংহতি। একই সঙ্গে চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ছে অর্থনৈতিক অসাম্য। বৃদ্ধি পাচ্ছে পরিচালক ও কর্মীদের দায়িত্বহীনতা; স্বদেশ ও স্বদেশবাসী সম্বন্ধে সর্বস্তরে অনুভূতিহীনতা। এই পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দ পূর্বের মতোই, বা অধিকতর পরিমাণে প্রয়োজনীয়, নিঃসন্দেহে।

এরই টানে নতুন ক'রে যুব আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে সামাজিক ক্ষেত্রে। নেতৃত্ব অবশ্যই রামকৃষ্ণ মিশনের। স্বাধীনতার পরে জাতীয় প্রয়োজন অনুভব ক'রে রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের শক্তিকে বিশেষভাবে চালিত করতে শুরু করেন। সারা দেশে রামকৃষ্ণ মিশনের শতাধিক কেন্দ্র, বহু শত শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ঐসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত তরুণেরা সুনিয়ন্ত্রিত জীবননীতির সঙ্গে পরিচিত হয়; আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পাশাপাশি ভারতবর্ষের চিরায়ত সংস্কৃতির রূপ জানতে পারে। কর্মজীবনে প্রবেশ করার পরে এইসব যুবকদের অনেকেই দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যনীতি রক্ষা করেন। মিশনের দ্বারা প্রভাবিত অজস্র প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে আছে সারা ভারতে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের প্রাইভেট আশ্রমের সংখ্যা ২০০-র বেশি। পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিয়ে ভারতের অন্যত্র এই ধরনের প্রতিষ্ঠান অন্তত ৪০০। এগুলির পরিচালনায় যুবকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোনো-কোনো প্রতিষ্ঠান কেবল ভাবপ্রচারের কাজে নিযুক্ত, আবার কোনো প্রতিষ্ঠান তদুপরি অর্থনৈতিক প্রকল্পও নিয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদ ৬০০ গ্রামে কাজ করে। স্বামীজীর একটি নির্দেশকে লোকশিক্ষা পরিষদ বিশেষভাবে স্মরণে রেখেছে—শক্তি আকর্ষণ করতে হবে জনগণের ভিতর থেকেই। তদনুযায়ী এঁরা গ্রামে গিয়ে স্থানীয় মানুষ, প্রধানত যুবকগণকে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজে যুক্ত হতে তাগিদ দেন; কিভাবে তা সম্ভব হবে, তার পরামর্শও দেন। ঐসব গ্রামে পূর্বাবধি যেসব সংস্থা বর্তমান আছে, নতুন ভাবধারায় তাদের পুনরুজ্জীবিত ক'রে, তাদেরই সাহায্যে পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করতে চেষ্টা করেন। অস্পৃশ্যতা ও নানা সামাজিক সংকীর্ণতার সঙ্গে অনেক জায়গায় এঁদের লড়াই করতে হয়েছে, এবং সুখের বিষয়, আংশিক সাফল্যলাভ ঘটেছে। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের পরিচালনাধীন বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেলে প্রথমদিকে শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা বিবেকানন্দের চিন্তা- অনুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন। ক্রমে তাঁরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রকল্প গ্রহণ ক'রে ৩৬টি জায়গায় কাজ করছেন। এঁরা নিয়মিত যুব সম্মেলন ক'রে

থাকেন, তাতে আশাপ্রদ সংখ্যায় তরুণ তরুণীরা সমবেত হন। রামকৃষ্ণ আন্দোলন সমীক্ষার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক সমিতির অফিস গোলপার্কেই। এই সমিতি সর্বভারতীয় স্তরে অনেকগুলি সম্মেলন করেছে, এবং সেখানে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ভারতের নানা প্রদেশের তরুণেরা অংশগ্রহণ করেছেন। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্র ও শিক্ষকগণ ঐ অঞ্চলের আদিবাসী গ্রামগুলিতে ব্যাপক কাজ করছেন। কামারপুকুর, জয়রামবাটী, বালীদেওয়ানপুর গ্রাম ও সংলগ্ন স্থানে নানা প্রকল্পে যুবকগণ কাজ করছেন বেলুড় মঠের দ্বারা গঠিত 'পল্লীমঙ্গল' প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। বেলুড় সারদাপীঠের নেতৃত্বে তরুণ ডাক্তারেরা সংঘবদ্ধ হয়েছেন গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কাজের জন্য। বাঙলার বাইরে নানা আকারে যেসব কাজ চলেছে তাদের বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। এইটুকু বললেই যথেষ্ট, যুবশক্তি সংঘবদ্ধ হয়ে নানা জায়গায় বিস্ময়কর উদ্দীপনার সঙ্গে এমন কাজ করে যাচ্ছে, যা দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের বাইরে একই ভাবের বহু প্রতিষ্ঠান আছে। তাঁদের কেউ মিশনের সঙ্গে সম্পর্করক্ষা ক'রে চলেন, কেউ করেন না। মিশনের সঙ্গে সম্পর্করক্ষা করে চলে বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল। পূর্বভারতে এই প্রতিষ্ঠানের ছোটবড় ১০০টি কেন্দ্র আছে। এই প্রসঙ্গে সহজেই মনে আসবে সুবিখ্যাত কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ কেন্দ্রের কথা—ভারতজোড়া যাঁদের কর্মপরিধি—এবং কর্মীরা তাজা যুবক অধিকাংশই।

(১৯৮৬ সালের গোড়ায় লেখা এই প্রবন্ধের পরে দেড় দশকে রামকৃষ্ণ সংঘের এবং ভাবানুগত নানা প্রতিষ্ঠানের সমাজসেবামূলক কাজের বিপুল বিস্তার ঘটেছে। পুরাতন শাখাগুলির কাজ বেড়েছে এবং নতুন কেন্দ্রে, বিশেষত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে স্থাপিত কেন্দ্রগুলিতে, সুসংগঠিত কাজকর্ম চলছে। নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদ ১৯৮৬-তে যেখানে ৪০০ গ্রামে কাজ করত, এখন সে কাজ করছে ২০০০-এরও বেশি গ্রামে।)

ভারতবর্ষ বিরাট। বিপুল এর জনসংখ্যা। প্রয়োজনের তুলনায় উল্লিখিত প্রকারের কাজের পরিমাণ সামান্যই। কিন্তু যুবসমাজের একাংশ যে সামাজিক প্রয়োজন অনুভব ক'রে, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে সংগঠিত জনস্বার্থমূলক কর্মে অগ্রসর হচ্ছে—এটা দেখিয়ে দিচ্ছে, মানুষের জন্য মানুষের অনুভূতি এখনো আছে, আর সেই অনুভূতি বিবেকানন্দের জীবন ও চেতনার স্পর্শে সহজেই উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। একথা সাহসের সঙ্গে বলা যায়, ঠিক বর্তমানে রাজনৈতিক আন্দোলনের বাইরে সামাজিক ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শেই সর্বাধিক-সংখ্যক যুবক কর্মব্রতী। তাদের একটা অংশ স্বামীজীর নামে সংসার ত্যাগ ক'রে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় জীবন নিবেদন করেছেন। সকলেরই জানা আছে, রাজনীতি বৃহৎ সংখ্যায় যুবকদের দ্রুত দলবদ্ধ করতে পারে, কারণ রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ক্ষমতালাভ ও তার প্রয়োগ। কর্তৃত্ব পাওয়া ও কর্তৃত্ব করার লোভ মানুষের মজ্জাগত। বিবেকানন্দের আদর্শ কিন্তু কেবলই বলে—মানুষকে ভালোবাসো, মানুষের জন্য ত্যাগ করো, মানুষের স্বার্থে সংগ্রাম করো। তার মধ্যে পাইয়ে দেবার আমিষগন্ধ নেই। তবু এই দেওয়ার আদর্শই যে, বহুসংখ্যায় যুবকদের এখনো আকৃষ্ট করছে—বর্তমান ভারতবর্ষের ক্রমঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে তাই হলো কিছু-আলোকের সঞ্চরণ। ইতিহাস বলে, বিবেকানন্দগণ এই পৃথিবীতে জয়ী হবার জন্য আবির্ভূত হননা। কিন্তু তাঁরা নাছোড় সংগ্রামী। তাঁরা পরাজয়কে গৌরবান্বিত করেন—অমর

জীবনের তপস্যায় অমর মরণকে আলিঙ্গন ক'রে। বিবেকানন্দের বাণী তাই সর্ব যুগের সর্ব দেশের যুবমন্ত্র:

"যাও, মহাবলি দাও, জীবনবলি, তাদের জন্য, ঈশ্বর যাদের জন্য যুগে-যুগে আবির্ভূত, যাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন—সেই দীনদরিদ্র উৎপীড়িতদের জন্য।"

"পথ ভীষণ কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু তাঁর নামে, তাঁর প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রেখে, ভারতের শত-শত যুগসঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করো। তা ভস্মসাৎ হবেই হবে।"

"কাপুরুষ ও মূর্খরাই অদৃষ্টের দোহাই দেয়। বীরপুরুষরা মাথা উঁচু ক'রে বলে—আমাদের অদৃষ্ট আমরাই গড়ব।"

"যুদ্ধে নেমে পড়ো। পিছু হঠো না। আকাশ থেকে নক্ষত্র খসে পড়তে পারে, জগৎ বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, তবু যুদ্ধ করতে হবে। পশ্চাদ্ অপসরণ ক'রে যুদ্ধ এড়ানো যায় না।"

"যুদ্ধে যদি লক্ষ লোকের পতন হয় তাতেই বা কি—যদি জয়ী হয়ে দু'একজনও ফিরে আসে!"

"যে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের মৃত্যু হল তারা ধন্য—কারণ তাদের রক্তমূল্যেই জয় হয়েছে।"

"কখনো ভুলো না—মর্মান্তিক আঘাত পেলেই সিংহ দারুণতম গর্জন করে। মাথায় মার খেলেই সাপ সবচেয়ে বড় ফণা ধরে। আর মর্মের গভীরে বিদ্ধ হলেই মানুষের আত্মার বিপুল মহিমা প্রকাশ পায়।"

"আমার ভিতর যে আগুন জ্বলছে, তোমাদের ভিতর জ্বলে উঠুক সেই আগুন। তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মরতে পারো—তাই চাই।"

[দেশ পত্রিকার ১লা ফেব্রুয়ারি ও ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিত]

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কলকাতা

॥ এক ॥

কলকাতা নামক গ্রাম বা অঞ্চল বেশ পুরনো; তবে সাহেব-স্থাপিত 'শহর কলকাতা'র বয়স ৩০০ পূর্ণ হয়েছে। এই সূত্রে সরকারি বেসরকারি নানা মহলের আয়োজনে নানা আলোচনা হয়েছে, রচনাদিও বেরিয়েছে। ইতিহাস আমাদের জানা দরকার, আর যেহেতু দেহবাদের প্রকোপে আছি তাই কলকাতার দেহের হাড়হদ্দ জেনে ফেলেছি—প্রধানত সাহেব-কলকাতার কথা, বা সাহেবদের চোখে ভারতীয় কলকাতার চেহারা, কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য জনগোষ্ঠী ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা। মাঝে-মধ্যে কলকাতার শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাহিত্যিক এবং আন্দোলনকেন্দ্রিক ধর্মের উল্লেখও পেয়েছি। কিন্তু কলকাতার আত্মার ইতিহাস কতটুকু পেয়েছি ঐসব বিবরণ থেকে? আত্মার অস্তিত্ব সন্দেহজনক, এই ধারণায় বোধহয় কলকাতার আত্মিক সাধনার উল্লেখ করতে দেহবাদীরা বিরত থেকেছেন।

কিন্তু কলকাতা তীর্থভূমি, কেবল বৃহত্তর ভারতের কাছে নয়, বৃহত্তর পৃথিবীর বেশ কিছু মানুষের কাছেও। কেন? ধরা যাক, অন্য অনেক কারণের মধ্যে, তা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান বলেও। ভারতের রাষ্ট্রপতি, মহান দার্শনিক ডঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ দেশপ্রিয় পার্কে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সভায় (২০।১।১৯৬৩) বলেছিলেন:

> "এই কলিকাতা শহর শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে বহু প্রতিভাধর পুরুষের জন্ম দিয়েছে। **তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ**। এই দেশের আত্মার প্রতিভূ তিনি। এর আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধির বিগ্রহ তিনি। সেই চেতনাই অভিব্যক্ত হয়েছে আমাদের ভক্তদের সঙ্গীতে, ঋষিদের দর্শনে, সাধারণ মানুষের প্রার্থনায়। বিবেকানন্দ এই ভারতের চিরন্তন আত্মার স্পষ্টধ্বনিত কণ্ঠস্বর।"

কলকাতাসূত্রে এখানে 'আত্মা' কথাটা এসেছে। স্বামী বিবেকানন্দ 'ভারতীয় আত্মার প্রতিভূ', সেকথা অবশ্যই ঠিক, কিন্তু কলকাতার এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনসূত্রে সেই আত্মার উৎসের কাছে উপনীত হতে হবে—সে উৎসের নাম—সন্দেহ না রেখে—শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিষ্য ও অনুবর্তী মানুষদের সাধনা, সত্যদর্শন ও সেবার দ্বারা অধিকৃত হয়ে আছে এই শহরের বিস্তৃত

অংশ। এর শিকড়ে শিকড়ে তাঁরা ছড়িয়ে আছেন। শহর কলকাতার জন্মোৎসবে সে-ইতিহাসে বিস্মৃত হওয়ার অর্থ সত্যকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

॥ দুই ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ এই শহরে জন্মান নি। কিন্তু তরুণ যৌবনে, মাত্র ১৭ বছর বয়সে এই শহরের উপকণ্ঠে এসেছেন—এবং তাঁর মহাপ্রয়াণও হয়েছে এই শহরের এক প্রান্তেই। তিনি এই শহরের দ্বারে-দ্বারে ঘুরেছেন 'মানহুঁশে'র সন্ধানে—এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে সেকালের ভারতের সর্বোত্তম বহু মানুষের। এঁদের মধ্যে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণদাস পাল, মধুসূদন দত্ত, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শশধর তর্কচূড়ামণি। আর নরেন্দ্রনাথ দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ প্রতিভাবান শিষ্যমণ্ডলী তো ছিলেনই।

এই কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা, সিদ্ধি এবং বাণীর বিস্তার হয়েছে এই শহরের প্রান্ত ও মধ্যভাগ হতে। এই যুগের প্রধান ধর্মপুরুষ তিনি, তাঁর জীবনে মিলিত হয়েছে নানা ধর্মের ধারাগুলি, রচিত হয়েছে মহা-সঙ্গমতীর্থ, উচ্চারিত হয়েছে যুগের মহামন্ত্র—'যত মত তত পথ'—এবং মানবতার সত্যসার—'যত্র জীব তত্র শিব'—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। তাঁর পূর্ণাবির্ভাবের ক্ষেত্ররূপে এই শহর পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে সম্মুখ-স্থান গ্রহণ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বুদ্ধগয়া, সারনাথ এবং কুশীনগর—এই কলকাতাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় উপনীত হয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠাংশকে এখানে অর্পণ করলেন—সে কি কেবল ঘটনাচক্রে? তাঁর দাদা রামকুমার, গ্রামের পাঠশালা-পালানো ভাইটিকে শহরে এনেছিলেন তাঁর অন্নবস্ত্রের সুরাহা ক'রে দেবার অভিপ্রায়ে—এই আপাত কারণটিই কি মূল কারণ? শ্রীরামকৃষ্ণের মতো 'বহু যুগের ওপার হতে' আসা মানুষের পক্ষে কথাটা সর্বাংশে সত্য হতে পারেনা। বলা উচিত—তিনি কলকাতাকে 'নির্বাচন' করেছিলেন। সে কোন্ কলকাতা? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি যে-ভারতবর্ষ, তার রাজধানী কলকাতা। ইংরেজের শোষণ ও শাসনের মূল যন্ত্র যেখানে স্থাপিত—সেই কলকাতা। সেইসঙ্গে এই কলকাতাতেই বাঙালীদের জীবনের একাংশে পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিস্তার ঘটে মনোলোকে তুফান উঠেছে। প্রথমে উদ্‌ভ্রান্তি, পরে কিছুটা স্থিতি। তখন শিক্ষায়, সাহিত্যে, সংস্কার-আন্দোলনে, ব্রাহ্ম-আন্দোলনে, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার উন্মেষে, টগবগে টলমলো কলকাতা। নব্যভারতীয় কলকাতা বলতে তখন বিশেষভাবে বোঝায় উত্তর কলকাতা—'বাংলার এথেন্স' নামে যা তখন কথিত। শ্রীরামকৃষ্ণ স্থান নিয়েছিলেন উত্তর কলকাতার উত্তরতর উপকণ্ঠে। সেখান থেকে তিনি ছুটে আসতেন কলকাতায় মানুষের সন্ধানে—দামী পোশাকে ঢাকা নামী মানুষগুলি সত্যই কতখানি মানুষ? অথবা দরিদ্র, প্রায় অর্ধোলঙ্গ মানুষগুলির মধ্যে জ্বলজ্বল করছে কোন্ আশ্চর্য মনুষ্যত্ব? 'দ্বারে দ্বারে ছোটেন প্রভু, নেইকো অপমান'। তাঁর শুধু সন্ধান—কোথায় পাব 'মানুষ রতন'। কী দুঃসাহস, কী স্পর্ধা! প্রায় নিরক্ষর গ্রাম্য এক

পুরোহিত, তিনি যাচাই করছেন নানা রঙের আলোকে দীপ্যমান শহুরে বিখ্যাতদের!! একজন রামকৃষ্ণের পক্ষেই তা সম্ভবপর—মহাসাম্যের অবতার তিনি—একটি ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের ভেদরেখা তিনি মুছবেনই। কিন্তু কোন্ মাপে? একমাত্র মাপকাঠি, চরিত্র। সেই মাপে বড় ছোট হয়ে যায়, ছোট হয়ে ওঠে বড়। এই কঠিন বিচার সম্বন্ধে ক্রুদ্ধ আপত্তির নিরসন আজো হয়নি। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির অনুবর্তীই শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ প্রকার বিচারমূলক সিদ্ধান্তে রুষ্ট। তাঁদের ক্রোধের ওপরে জ্বলছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সত্য। অহঙ্কারী কলকাতার জানা দরকার ছিল—পদ বা পদমর্যাদা কত তুচ্ছ হতে পারে, অন্তত একজন মানুষের কাছেও। "তিনি ধনী, বড় মানুষ, জ্ঞানী পণ্ডিত কাহাকেও কিছুমাত্র ভয় করিতেন না, সকলকে স্পষ্ট কথা কহিতেন, অনেক সময় শক্ত [কথা] শুনাইয়া দিতেন। তাহাতে অনেক বড় লোক তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল।" [ধর্মতত্ত্ব (ব্রাহ্মপত্রিকা), ৩১ অগস্ট ১৮৬৬]। আচণ্ডালে প্রবাহিত ছিল তাঁর 'প্রেমপ্রবাহ'। যে-ব্রাহ্মণ বালক উপনয়নের পরে গ্রামে কামারনীর কাছে ভিক্ষা নিয়েছেন, যাঁর দিব্যতার প্রথম পূজা করেছেন সেখানে এক শাঁখারি, যিনি দক্ষিণেশ্বরে আশ্রয় পেয়েছেন মাহিষ্যজাতীয় রানী রাসমণি ও মথুরবাবুর কালী-মন্দিরে, বিলাতফেরত বৈদ্য কেশব সেনের বাড়িতে যিনি আহার করেছেন, যাঁর অধিকাংশ শিষ্য অব্রাহ্মণ—সেই তিনি যখন একদিন পতিতা অভিনেত্রী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন এই পরম উচ্চারণে—"তোমার চৈতন্য হোক"—কিংবা নটগুরু গিরিশচন্দ্রকে কোলের কাছে বসিয়ে তাঁর 'অশুচি' ওষ্ঠে স্বহস্তে খাবার তুলে খাইয়েছেন—তখন তাঁর পক্ষে সে-কাজ অস্বাভাবিক না হতে পারে, কিন্তু কলকাতার অভিজাত রক্ষণশীলতার বেড়ার মধ্যে তা বৈপ্লবিক ছিল নিঃসন্দেহে।

কলকাতার পথে ঘুরতে ঘুরতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই থেমে যেতেন বাগবাজারের একটি কায়স্থ বাড়িতে; সেখানে 'শুদ্ধ অন্ন' গ্রহণ করতেন, রাত্রিবাসও করতেন। সেই বলরাম বসুর ভবন (এখন 'বলরাম মন্দির') কলকাতার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ভবন। যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ শতাধিকবার এসেছেন; যেখানে বহুদিন বাস করেছেন শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ; যেখানে অতুলনীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সূচনা হয়েছে (১ মে ১৮৯৭)—সেই ভবনের তুল্য গৌরব কলকাতার আর কোন্ ভবনের—যদি আমরা দেহ অপেক্ষা প্রাণ, প্রাণ অপেক্ষা সত্তাকেই অধিক মূল্য দিই? আবার এও বলব, 'রামকৃষ্ণ মিশন' সূচনার দ্বারা এখানে স্বামী বিবেকানন্দ দেহ ও সত্তার মেলবন্ধন ঘটাবার আয়োজনও করেছিলেন—তার সূচনা এই ভবনেই হয়েছিল রামকৃষ্ণ-কর্তৃক রথ টানার ঘটনায়। জগন্নাথের পুরুষানুক্রমিক ভক্ত এই বসুবংশের ভবনে জগন্নাথের রথ ছিল—সেই রথ এখানে টেনেছিলেন গদাধর—তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন—আপামর মানুষের স্পর্শেই জগন্নাথের রথ চলে। রামকৃষ্ণ—'রামকৃষ্ণ মিশন' হয়ে সেই আপামর মানবসাধারণের মধ্যে প্রসারিত।

॥ তিন ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকালে শ্রীমা সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাও নিয়েছেন। তারপর শ্যামপুকুরের বাড়িতে, শেষে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে, ঠাকুরের দেহান্ত পর্যন্ত তাঁর সেবা-পূজা ক'রে গেছেন। তারও পরে বহু বছর নানা সময়ে উত্তর কলকাতার নানা বাড়িতে কাটিয়েছেন। শেষ অবস্থিতি বাগবাজারে স্ব-ভবনে—স্বামী সারদানন্দের আনন্দে গড়া সারদার সেই ভবনটিতে, 'মায়ের বাড়ীতে'—তাঁর মহাপ্রয়াণ। গাঁয়ের মেয়ে সারদাকে রামকৃষ্ণ বিশেষভাবে কলকাতায় থেকে যেতে বলেছিলেন কেননা কলকাতার 'পোকার মতো কিলবিল করা' মানুষগুলিকে দেখতে হবে তাঁকে। তিনি যে মাতা। তিনি কেবল সংঘজননী নন, তিনি বিশ্বজননী। কামনায় যন্ত্রণায় আশায় নৈরাশ্যে জর্জর পৃথিবীর একটি খণ্ড এই কলকাতা—সেখানে স্থাপিত হলেন তিনি—নিখিল মাতৃত্বের প্রতিমা। কেউ ফিরে গেল না মায়ের কাছ থেকে—শুচি-অশুচি, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ—সকলের জন্য তিনি—মা সারদা। প্রজ্ঞারও প্রতিমা তিনি। তাঁর পদার্পণ এবং আশীর্বাদের গৌরব নিয়েই নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সূচনা। তিনি চির বৈরাগিনী—তাঁকে কেন্দ্র ক'রে স্বামীজী-আকাঙ্ক্ষিত স্ত্রী-মঠের সূচনা—যা বর্তমানে দক্ষিণেশ্বরে সারদা-মঠে আকারিত। বিশ শতকের প্রথম দশকে নিবেদিতা পুলকিত হয়ে দেখেছিলেন, নতুন ভারত তার যাত্রাপথে 'মাতাদেবী'র কাছে আসছে—প্রণাম করতে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কণ্ঠ উদাত্ত হয়ে উঠেছিল 'চলো চলো' আহ্বানে:

> "...চন্দ্রমা ছাড়া যেমন চন্দ্রিকা থাকিতে পারেনা—তেমনি মা-লক্ষ্মী আমাদের—সেই যোড়শী পূজার দিন হইতে রামকৃষ্ণ-শশীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্র-মণ্ডলিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে তো একদিন সেই রামকৃষ্ণ-পূজিত লক্ষ্মীর চরণপ্রান্তে গিয়া বসিও, আর তাঁহার প্রসাদ-কৌমুদীতে বিধৌত হইয়া রামকৃষ্ণ-শশীসুধা পান করিও—তোমার সকল পিপাসা মিটিয়া যাইবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, গৃহ-সংসার ভাঙছে, ভাঙবে। সারা বিশ্বজোড়া সেই ভাঙার খেলা থেকে ভারতবর্ষও অব্যাহতি পাবেনা। সমুদ্রঝড়ে দিশাহারা পাখির যেমন মাস্তুলের আশ্রয়, তেমনি সম্পর্ক-ছেঁড়া উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের শান্তির আশ্রয়—মা। নিজের ঘরে সেই মাকে যখন মানুষ না পায়, আদর্শলোকে তাঁকে অন্তত সে যেন পায়। চির-মাতৃত্বের সেই আদর্শ-প্রতীককে শ্রীরামকৃষ্ণ রেখে গিয়েছিলেন—এবং এই কলকাতায় তাঁর পুণ্যপীঠ নির্মিত হয়েছিল। দেবকীর কোল-হারানো কৃষ্ণের জন্য ছিল যশোদার স্নেহাঞ্চল। আর সাধারণ ঘরের সাধারণ মায়ের কোল-হারানো কৃষ্ণের জীবগুলির জন্য ছিল, এখনো রয়েছে, জগতের মা সারদার আঁচল।

॥ চার ॥

বিবেকানন্দের জন্ম এই কলকাতা শহরে। তিনি খাঁটি 'কলকাত্তাই'। দেশ-বিদেশ-জোড়া খ্যাতির উষ্ণীষ খুলে ফেলে তিনি যখন শোভাবাজারে সংবর্ধনা-সভায় বলেছিলেন—"আমি এই কলকাতার ছেলে—এখানে পথের ধুলায় বসে খেলা করেছি"—তখন তাঁর স্নায়ু-শিরা-রক্ত এবং প্রাণসত্তা একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল। ঐকালে তিনি নিশ্চয় তাঁর বাল্য-কৈশোর-যৌবনের কলকাতাকে দর্শন করেছিলেন এক লহমায়। গৌরমোহন মুখার্জির পিতৃভবন; সেখানে বাল্যজীবন; কত মজা, কোচম্যানের সঙ্গে গাল-গল্পে কিংবা রাজার সাজে সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে বসে রাজকাজ চালানো; টাট্টুঘোড়ার পিঠে চড়ে হৈ-হৈ ছোটা; বাড়িতে সার-সার সাজানো নানা জাতের হুঁকোর সবকটি টেনে বাল্য-গবেষণা—'জাত কোথা দিয়ে উড়ে যায় দেখি', কেননা বলা হয়েছিল, এক জাত অন্য জাতের হুঁকো টানলে জাত চলে যায়; ব্রহ্মদত্যির সুখনীড় বলে কথিত চাঁপাগাছে দোল খেয়ে ব্রহ্মদত্যির সাক্ষাৎ-বাসনা এবং সাক্ষাৎ না পেয়ে নৈরাশ্য; তারই মধ্যে ঘরের ভিতরে একান্তে ধ্যান, হঠাৎ জ্যোতির্ময় মূর্তির দর্শন (বুদ্ধদেব নাকি!); স্কুলে অসম্ভব চঞ্চলতা; সত্যরক্ষার মূল্য দিতে শিক্ষক-প্রহারে রক্তাক্ত কর্ণমূল; হিন্দুমেলার আখড়ায় ব্যায়াম, ট্রাপিজে দোল খেয়ে পুরস্কার লাভ; আরও বড়ো পুরস্কার—পাগলা ঘোড়ার লাগাম ধরে ঝুলে পড়ে গাড়ি থামানো, তাতে প্রাণে বেঁচে-যাওয়া আরোহীদের কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদ; প্রেসিডেন্সি কলেজ; তারপর জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজে) পাঠ; সঙ্গীতচর্চা, গায়ক-খ্যাতি; ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মনেতাদের সঙ্গে নিকট-পরিচয়; ব্রাহ্মসমাজে গান, অভিনয়; অসাধারণ প্রতিভার-শক্তিতে সেই সময়েই দেশ-বিদেশের ধর্ম দর্শনের গভীরে প্রবেশ এবং সে-বিষয়ে খ্রীস্টীয় ধর্ম-দর্শন বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রেভাঃ হেস্টির মুক্ত স্বীকারোক্তি; কিন্তু অশান্ত প্রাণ-মন—'কোথায় আছে সেই পরম সত্য, কোথায় সেই নিত্য ঈশ্বর, কে আমাকে দেখিয়ে দেবেন তাঁকে'; হিন্দুধর্মের বিরোধী অথচ ছাত্রপ্রেমিক প্রিন্সিপাল হেস্টির মুখে আশ্চর্য এই সংবাদ লাভ—দক্ষিণেশ্বরে আছেন এমন এক সাধক যাঁর ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো সমাধি হয়; কেশবচন্দ্র সেনের কাগজেও সে-ধরনের সংবাদ বেরিয়েছে, কিন্তু মনে গেঁথে যায়নি; তারপর একদিন বাগবাজারে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে সেই মানুষটির সাক্ষাৎলাভ—পরমরহস্যের চাবি যাঁর হাতে ধরা; তারপর দক্ষিণেশ্বর এবং দক্ষিণেশ্বর—শ্যামপুকুর এবং কাশীপুর; শেষোক্ত স্থানে উদ্‌ভাসিত এই প্রত্যয়লাভ—ঈশ্বরই রামকৃষ্ণদেহে অবতীর্ণ—এবং তাঁর কাছ থেকে এই দায়লাভ—'নরেন শিক্ষে দিবে', অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ আচার্য;—'নরেন হাঁক দিবে', অর্থাৎ নরেন রামকৃষ্ণ-ঈশ্বরের বার্তাবহ প্রফেট। কখন 'হাঁক দিবে'? 'যখন ঘুরে বাহিরে' যাবে—অর্থাৎ ভারত-পরিব্রজ্যা সমাপ্ত ক'রে বাইরে অর্থাৎ পাশ্চাত্যে উপস্থিত হবে।

এইসঙ্গে এবং এর পরেও স্বামীজীর মনে পাক-খাওয়া ছবিগুলি ছিল—পিতার মৃত্যুর পরে দারিদ্র্য, অনাহার, বরাহনগর-মঠে অর্ধাহারের মধ্যেও সন্ন্যাসী গুরুভাইদের সঙ্গে 'পৃথিবীতে অসামান্য সমষ্টি-সাধনা', 'ঠাকুরের ভস্মাস্থি রাখবার মতো একটুকরো জমিও গঙ্গার ধারে জোগাড় করতে পারলাম না' এই কান্না—

এসবই কলকাতায়—এই কলকাতায়!!

নিঃস্ব পরিব্রাজক বিবেকানন্দ কলকাতা ছেড়েছিলেন। ধর্মোদ্ধারক মহিমান্বিত বিবেকানন্দ ফিরে এসেছিলেন। তাঁর গাড়ির ঘোড়া খুলে যুবকেরা সেই গাড়ি টেনেছিল। শোভাবাজারে সংবর্ধনা সভায় উঠে দাঁড়িয়ে 'কলকাতার পুরনো ছোকরা' নতুন ছোকরাদের উদ্দেশ্য ক'রে বলেছিলেন:

"কলিকাতাবাসী যুবকগণ, ওঠ জাগ, কারণ শুভমুহূর্ত আসিয়াছে।...সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবানে 'অভীঃ', এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে।... ওঠ জাগ, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি মহাবলি প্রার্থনা করিতেছে। যুবা—আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী... কলিকাতায় এইরূপ শত-সহস্র যুবা রহিয়াছে।... ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু আমার মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বর্তমান।...ভাবিও না তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বন্ধুহীন। কে কোথায় দেখিয়াছে টাকায় মানুষ করে—মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যাহা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে।... ভয় পাইও না, কারণ মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, যতকিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে সবই সাধারণ মানুষের মধ্যে...।"

"এসেছে সে একদিন।" সত্যই সে দিন এসে গেল। কলকাতার বাগবাজারে বলরাম বসুর ভবনে স্বামীজী সূচনা করলেন রামকৃষ্ণ মিশন, ১ মে ১৮৯৭। স্বামীজীর প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ ছুটে গেলেন মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষসেবার কাজে। কিন্তু এদিকে কলকাতার ওপরে ক্রমে ঘনিয়েছে করাল ছায়া। ১৮৯৫-৯৭ খ্রীস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে প্লেগ-মহামারী লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নিয়েছে, তার কঙ্কাল-হাত ছড়াল পূর্বভারতে, কলকাতায় তার প্রথম নখের আঁচড় পড়ল ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে। স্বামীজীর কবিতার লাইনগুলো তাঁরই ওপরে অট্টহাস্য ক'রে ফেটে পড়ল—"সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী—সুখ-বনমালী তোমার মায়ার ছায়া।" "মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি বিতরিছ জনে জনে।" কিন্তু না, রচনায় অন্য অংশও ছিল—"জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?"

অসুস্থতার জন্য স্বামীজী দার্জিলিঙে ছিলেন। সেখান থেকে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন (২৯. ৪. ১৮৯৮):

"আমি যে শহরে জন্মেছি সেখানে যদি প্লেগ এসে পড়ে তবে তার প্রতিকারকল্পে আত্মোৎসর্গ করব বলেই স্থির করেছি।"

কলকাতার অবস্থা ভয়াবহ—যতখানি প্লেগের জন্য, ততোধিক প্লেগের ভয়ের জন্য। চারিদিকে শুধু পলায়নপর বিপুল জনতরঙ্গ। কয়েকদিনের মধ্যে দু' লক্ষ লোক পলায়িত। ধনী পর্দানসীন মহিলারা পর্যন্ত পর্দাবন্ধন ফেলে প্রাণভয়ে ছুটেছেন। "সবাই পালাচ্ছে, শুধু পালাচ্ছে, প্রাণভয়ে।" ('মরাঠা', ৮.৫.১৮৯৮; অমৃতবাজার ৪.৫.১৮৯৮)। এরই মধ্যে কলকাতায় নামলেন স্বামীজী। মঠবাসীদের উদ্বুদ্ধ করলেন প্লেগ-সেবার জন্য। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে অভয় দিয়ে প্রচারপত্র বিলি করা হল:

"কলিকাতা-নিবাসী ভাইসকল! আমরা তোমাদের সুখে সুখী ও তোমাদের দুঃখে দুঃখী।...যে-মহা-রোগের ভয়ে বড়, ছোট, ধনী, নির্ধন সকলে ব্যস্ত হইয়া শহর ছাড়িয়া যাইতেছে, সেই রোগ যদি যথার্থই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তোমাদের সকলের সেবা করিতে-করিতে জীবন যাইলেও আমরা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব, কারণ তোমরা সকলে ভগবানের মূর্তি।...ধনী লোক পালায় পলাক; আমরা গরীব, গরীবের মর্মবেদনা বুঝি।...হে ভাই, যদি তোমার কেহ সহায় না থাকে, অবিলম্বে বেলুড় মঠে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-দাসদিগের নিকট খবর পাঠাইবে...।"

প্লেগের সত্যকার আক্রমণ ঘটল ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক ছাত্রের উপস্থিতিতে ২২ এপ্রিল ১৮৯৯ স্বামীজী এলেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগ-সভায় সভাপতিত্ব করতে। অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন তবু ধিক্কার ও আহ্বানে পূর্ণ কণ্ঠ তাঁর। বলেছিলেন ছাত্রদের সম্বোধন ক'রে, বাঙালীরা প্লেগ দূর করার জন্য কিছুই করেনি, কেবল আদুরে ছেলের ভাব দেখিয়েছে। এখন এসেছে কাজের সময়। কলকাতার যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে—তারা কাঁচে-ঢাকা পুতুল নয় প্রমাণ করতে। কাপুরুষের নরকেও স্থান নেই।

সভার মূল বক্তা ভগিনী নিবেদিতার কণ্ঠে ছিল আগুনের ভাষা। বর্ণনা করেছিলেন শহরের নরককুণ্ডের মতো বস্তিগুলির কথা, যেখানে কাতারে কাতারে "আমাদের অসহায় ভাইবোনেরা মরছে।" "ধিক সেই বস্তির মালিকদের যারা ঐ নরকে মানুষকে বাস করতে বাধ্য করে। ধিক্ সেই পৌরকর্তাদের যারা বস্তির মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না।" তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন "যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের কথা", যিনি "ব্রাহ্মণ হয়েও মেথরের পায়খানা পরিষ্কার করেছিলেন নিজের মাথার চুল দিয়ে।" তারপর শুরু হয়ে গিয়েছিল নিবেদিতা ও স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে বস্তি-সেবার কাজ: মুমূর্ষু প্লেগাক্রান্ত বালককে কোলে নিয়ে নিবেদিতার বসে থাকা। কলকাতা-পুরাণের মহত্তম এক অধ্যায় রচিত হয়েছিল সেদিন রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগ-সেবার কাজ দিয়ে। কলকাতার ইতিহাসে সেটিই ছিল প্রথম ব্যাপক বস্তিসেবার কাজ।

॥ পাঁচ ॥

কলকাতা শহর স্বামীজীকে সুখ দিয়েছে, দুঃখ দিয়েছে, কিন্তু ভালোবাসা কেড়ে নিতে পারেনি। কলকাতার বাঙালী বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন—স্বামীজী ধন্যধ্বনি দিয়েছেন দূর প্যারিস থেকে।

তিনি কলমের লড়াই করেছেন কলকাতার কথ্য বাঙলা ভাষাকে শিক্ষিত বাঙালীর ভাবপ্রকাশের বাহন করবার জন্য: "যদি বল... বাঙলা দেশের নানা স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে—অর্থাৎ কলকেতার ভাষা।... যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।"

কলকাতার পাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া গঙ্গা তাঁর কাছে প্রাণ-প্রবাহিণী। সেই গঙ্গায় জল পান,

স্নান, সন্তরণ এবং ঝড়ে নৌকায় বৈঠা বেয়ে রামকৃষ্ণের উদ্দেশে যাত্রা। এই গঙ্গার শোভায় তিনি মশগুল। কলকাতা বন্দর থেকে স্বামীজী পাশ্চাত্যে যাচ্ছেন, দুচোখ ভরে গঙ্গার শোভা দেখছেন; কখনও ঝরঝরানি বর্ষায় গঙ্গার ধারে গাছপালার রূপ, ভেকের ঘর্ঘর; তারপরে নীল আকাশে সাদা কালো সোনালী কিনারাদার মেঘের শোভা; নিচে তাল-নারিকেল-খেজুরের পাতার চামরের মতো দুলতে থাকা; গঙ্গার পাড়ে শ্যাম-শ্যাম ঘাস, যার সৌন্দর্যের কাছে ইয়ারকান্দি, ইরানী, তুর্কিস্তানি গালচে হার মেনে যায়; সেই পাড় ছুঁয়ে-যাওয়া গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল, দেখে রঙের নেশা ধরে যায়, "যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে।" এর পরেই স্বামীজীর কণ্ঠে বিষাদের সুর ঘনিয়েছে, সৌন্দর্যের ভাবী সুনিশ্চিত বিনাশ দেখছেন দূরদৃষ্টিতে, তাতে অশ্রুর আভাস—আমার কলকাতার সেরা সৌন্দর্যের মৃত্যু ঘটবে, ঘটবেই—

> "হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গা-মা'র শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইটের পাঁজা, আর নাববেন ইট-খোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট-ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট-বোঝাই ফ্ল্যাট, আর গাধাবোট। আর ঐ তাল-তমাল-আঁব-নিচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার—ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে ভূতের মতো অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি!!!"

স্বামীজী একবার-না বলেছিলেন, (৯.৮.১৮৯৫): "ভারতকে আমি সত্যই ভালোবাসি, কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলে যাচ্ছে। আমার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি!" ঠিক, অবশ্যই ঠিক। ব্রহ্মজ্ঞ মানবপ্রেমিকের উপযুক্ত কথা, সন্দেহ নেই। তবে এর কিছুদিনের মধ্যে ভারতের প্রান্ত স্পর্শ করতে না করতেই কেন বুকের ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল এই কথাগুলি: "যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনও দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে... তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতভূমি।" আর এই পুণ্য মাতৃভূমির মধ্যে একটি বিশেষ পুণ্যভূমি কলকাতা, কেননা রামকৃষ্ণের আত্মপ্রকাশের স্থল; এবং তা একান্ত প্রিয়ভূমি, কেননা নিজের জন্ম ও আত্মবিকাশের স্থল—সেই কলকাতা স্বামীজীর ভিতরে একেবারে গেঁথে ছিল। তাই যখন পাশ্চাত্যে অসুস্থ, সেখান থেকেই চিরবিদায় ঘটবে এমন সম্ভাবনা, তখন মিস ম্যাকলাউডকে সকৌতুকে সার কথাটি বলেছিলেন, (৩.৮.১৮৯৯):

> "আমার রোগ সারাতে দু-একটা পাঁজরা কেটে বাদ দেবে নাকি? উঁহু, তা হচ্ছে না।... আমার হাড় গঙ্গায় প্রবাল সৃষ্টি করবে, আমার বরাতে লেখা আছে।"

॥ ছয় ॥

বলরাম-ভবনের বারান্দায় স্বামীজী একদিন তন্ময় হয়ে পায়চারি করছিলেন, গুন্‌গুন্ ক'রে গান গাইছিলেন, চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, আর অস্ফুটে বলছিলেন, "ওরে আমার যন্ত্রণা কেউ বোঝে না, কেউ বোঝে না।" সৌভাগ্যের বিষয়, একজন কাছেই ছিলেন স্বামীজীর সেই মূর্তি দেখে নেবার এবং তাঁর কথাগুলি শুনে নেবার জন্য। তিনি আর কেউ নন, স্বামীজীকে গভীরে বুঝতে যাঁরা সমর্থ তাঁদেরই একজন—স্বামীজীর এক গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ। দৃশ্যটি বর্ণনা ক'রে তুরীয়ানন্দ মথিত স্বরে বলেছেন:

> "একটি তীরের মতো তাঁর কণ্ঠস্বর আমাকে বিদ্ধ করিল। তাঁহার দুঃখের কারণ আমি...যেন চকিতে বুঝিলাম। যে-করুণা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতেছিল, তাহারই রক্তধারা তাঁহার চোখের জল হইয়া প্রায়ই বিগলিত হইত।
>
> "এই যে রক্তধারা—অশ্রুধারা হইয়া বিগলিত হইয়াছিল, তাহা কি ব্যর্থ হইয়াছে? দেশের জন্য পরিত্যক্ত তাঁহার প্রতিটি অশ্রুবিন্দু, তাঁহার শক্তিমান হৃদয়ের প্রতিটি উদ্দীপ্ত উচ্চারিত ধ্বনি, অসংখ্য বীরের জন্মদান করিবে। এই বীরের দল তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম দ্বারা পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিবে।"

॥ সাত ॥

কাল নিরবধি, পৃথিবী বিপুল, ভারতবর্ষও বৃহৎ দেশ। বিবেকানন্দের প্রস্থানের পরে বহমান কালের উপরে, এবং পরিবর্তমান পৃথিবী ও ভারতের উপরে, বিবেকানন্দের অশ্রু-রক্তের কোন্ প্রভাব হয়েছে, তা আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। কিন্তু বিবেকানন্দের অশ্রুর রক্তবীজ-স্বরূপ রামকৃষ্ণপন্থীরা এই কলকাতায় কোন্ আকারে মানবসেবার কাজ ক'রে চলেছেন, তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করতেই হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর একটা বড় অংশ কলকাতাকে কেন্দ্র করেই, কারণ তাঁরা মনে করেন, কলকাতার জন্য যতটুকু সেবা করবেন তা হবে রামকৃষ্ণ-তীর্থের সেবা।

রামকৃষ্ণপন্থীরা এই শহরে ও উপকণ্ঠে জন-সেবাকর্মের যেসব প্রয়াসে ব্রতী, সংক্ষেপে তাদের কয়েকটির উল্লেখ করা যায়।

তাঁরা স্থাপনা ও পরিচালনা করছেন:

শহরের উত্তর প্রান্তে রহড়ায় ভারতের সর্ববৃহৎ অনাথ বালকাশ্রম।

দক্ষিণ কলকাতায় নানা বিভাগ সমন্বিত পূর্বভারতের সর্ববৃহৎ বেসরকারি হাসপাতাল—রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান।

দক্ষিণ কল্‌কাতায় গোলপার্কে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান—রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।

শহরের দক্ষিণপ্রান্তে নরেন্দ্রপুরে বিশ্ববিদ্যালয়তুল্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, যার অন্তর্গত রাজ্যের শ্রেষ্ঠ আবাসিক কলেজ, স্কুল, এবং পূর্ব-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অন্ধ বালক বিদ্যালয়।

পূর্বোক্ত রহড়ায়—একটি বৃহৎ কলেজ, এবং বি টি কলেজ।

বরাহনগরে বৃহৎ বিদ্যালয়।

গঙ্গার অপর তীরে বেলুড়ে বি টি ও ডিগ্রী কলেজ, পলিটেকনিক।

শহরের উত্তরপ্রান্তে বেলঘরিয়ায় পলিটেকনিক, স্টুডেন্টস্ হোম (যার পরিচয় কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম নামে)।

বড়িষায় বৃদ্ধ-আশ্রম।

অব্যাহতভাবে প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র—উদ্বোধন। (১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা, বর্তমানে তা শতবর্ষ অতিক্রান্ত)। কলকাতা থেকেই ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ হতে প্রকাশিত হচ্ছে ভারতের অন্যতম প্রাচীন ইংরেজী মাসিক প্রবুদ্ধ ভারত। [পত্রিকাটির] পরিচালনভার রামকৃষ্ণ মিশন ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে গ্রহণ করে; ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রথমে আলমোড়া ও পরে মায়াবতী থেকে বেরিয়েছে। [তারপর কলকাতা থেকে প্রকাশিত]। পত্রিকাটি ১৮৯৮ সাল থেকে অব্যাহতভাবে প্রকাশিত।

ভারতবর্ষে ধর্ম-দর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থের সুবৃহৎ (বৃহত্তম?) প্রকাশনালয়—উদ্বোধন কার্যালয়। কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ভারতের অন্যতম প্রধান ইংরেজী ভাষা গ্রন্থের প্রকাশনালয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখাকেন্দ্রগুলি অথবা রামকৃষ্ণ মিশন-প্রভাবিত বহুসংখ্যক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সপ্তাহের প্রায় প্রত্যেকদিন উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, কথামৃত, স্বামীজীর রচনাবলী, শ্রীশ্রীমায়ের কথা এবং অন্য শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনার দ্বারা ভারতের চিরায়ত সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ রূপের সঙ্গে অগণিত মানুষের পরিচয় ঘটাচ্ছেন, সেইসঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে আধুনিককালে অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছেন।

'খালি পেটে ধর্ম হয়না'—শ্রীরামকৃষ্ণ জানিয়েছেন।—ক্ষুধিত বঞ্চিত মনুষ্য-নারায়ণের সেবায় স্বামী বিবেকানন্দ আহ্বান করেছেন। তিনি সচেতন ক'রে দিয়েছেন একটি বিষয়ে—সারা পৃথিবীর ধনরাশি কোনও একটি জায়গায় ঢেলে দিলেও তার দারিদ্র্য দূর হবেনা, যদিনা সেখানকার মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে। স্বামীজীর সেই আদর্শে এই শহরে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মিশনের নানা আর্থ-সামাজিক প্রকল্প। কলকাতার উত্তরপ্রান্তে বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটি পলিটেকনিক কলেজের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। রহড়ায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। নরেন্দ্রপুর আশ্রমে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের একাধিক সংগঠন রয়েছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য—নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদ, যাঁরা কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের সহস্রাধিক গ্রামে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্রতী।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সূচনা হয়েছিল পাথুরিয়াঘাটার একটি ছাত্রাবাসকে অবলম্বন করে। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা নিকটবর্তী রামবাগান বস্তিতে শিক্ষাবিস্তার, সেইসঙ্গে অল্পাধিক সেবাকাজ আরম্ভ করেন। এই বস্তিটির অনেক অধিবাসী তথাকথিত ডোম-জাতীয়। পাথুরিয়াঘাটার তরুণ ছাত্ররা যখন এই পল্লীতে সেবাকাজ আরম্ভ করেন তখন তাঁরা জানতেন না যে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাসপূর্ব জীবনে এই পল্লীতে সেবাকাজ করেছেন। ["নিজের বাল্যকালের উদাহরণ দেখাইয়া স্বামীজী বলিলেন, তিনি বাল্যকালে ডোম পাড়ায় যাইয়া

তাহাদের কল্যাণসাধনের চেষ্টা করিতেন।"—('ভারতে বিবেকানন্দ', ১৯৭৩, ১৫শ সংস্করণ, পৃ. ৪১২)]। স্বামীজী ১০ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছেন: "কলিকাতার মিটিং-এর খরচ-খরচা বাদে যা বাঁচে, ঐ ফেমিন-এতে পাঠাও, বা কলিকাতার ডোমপাড়া, হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরিব আছে, তাহাদের সাহায্য কর।" স্বামীজীর ঐ বিশেষ কাজ বা ইচ্ছার কথা জেনে পাথুরিয়াঘাট-ছাত্রাবাসের কর্মীরা আবেগে আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণপ্রাণ হয়ে উঠেছিলেন। রামবাগান বস্তিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্নসংস্থান এবং গৃহনির্মাণের ব্যাপারে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন যে-কাজ করছেন, এবং এখনো ক'রে চলেছেন, তার চমকপ্রদ ইতিহাস বলবার স্থান এ নয়। তাঁদের কাজ এখন ছড়িয়েছে কলকাতার আরও ১৪টি বস্তিতে। এক কথায় বলা যায়, বস্তি-উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে সর্ববৃহৎ প্রকল্পে কাজ করছেন রামকৃষ্ণ মিশন এই কলকাতাতেই।

॥ আট ॥

তবু কতটুকু! কী বিশাল প্রয়োজন—তার কী সামান্য অংশকেই স্পর্শ করা সম্ভব হয়েছে! কী বিরাট ছিল বিবেকানন্দের বেদনা, আর ভালোবাসা! যে-হেদুয়া ছিল বিবেকানন্দের শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র এবং যৌবনের বিচরণক্ষেত্র, রামকৃষ্ণের স্পর্শে সর্বভূতে চৈতন্যের অনুভব ক'রে তিনি একদিন তরুণ বয়সে যে-হেদুয়ার লোহার পাঁচিলে মাথা ঠুকেছিলেন পাগলের মতো, কেননা পথ-ঘাট, গাড়ি, মানুষজন এবং লোহার বেড়াও সমান জীবন্ত—সেই হেদুয়াতেই তিনি তাঁর দেহান্তের মাত্র ৬ মাস আগে একদিন বেঞ্চে বসে ছিলেন। তাঁর যৌবনের বন্ধু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, তাঁকে চুপ ক'রে বসে থাকতে দেখে কাছে এসেছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব বন্ধুকে বলেন, "আমি ভাই তোমার জন্য আসর সাজাব, তুমি একবার সেই আসরে এসে বেদান্ত-বিজ্ঞানের রোল তোল।" স্বামীজী কাতরস্বরে বলেছিলেন: "ভবানী-ভাই, আমি আর বাঁচব না। যাতে আমার মঠটি শেষ ক'রে কাজের একটা সুবন্দোবস্ত ক'রে যেতে পারি, তার জন্য ব্যস্ত আছি, আমার অবসর নেই।"

বিবেকানন্দের তখনকার ছবিটি গভীর রেখায় এঁকেছেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়:

"সেইদিন তাহার সকরুণ একাগ্রতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লোকটার হৃদয় বেদনাময় ব্যথায় প্রপীড়িত। কাহার জন্য বেদনা, কাহার জন্য ব্যথা? দেশের জন্য বেদনা, দেশের জন্য ব্যথা।... ঐ ব্যথার কথা ভাবি, বেদনার কথা চিন্তা করি, আর জিজ্ঞাসা করি—বিবেকানন্দ কে?"

ব্রহ্মবান্ধব উত্তর দিয়েছেন:

দেশের জন্য ব্যথা কি শরীরিণী হয়? যদি হয় তো বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।"

এইখানেই যদি লেখাটি শেষ ক'রে দিতে পারতাম, সুন্দর সমাপ্তি হতো। কিন্তু—বিবেকানন্দ 'বেদান্ত-বিজ্ঞানের রোল' না তুলে, 'মঠটি'র কাজ শেষ ক'রে, যাবার জন্য উৎকণ্ঠা দেখালেন, আর ব্রহ্মবান্ধব তার থেকে কিভাবে বিবেকানন্দকে 'দেশের জন্য শরীরিণী ব্যথা'-রূপে অনুভব করলেন? এই ফাঁকটুকু পূরণ করা যায় এইভাবে—অধ্যাত্ম-মনীষার মহাবিগ্রহ বিবেকানন্দ

বেদান্ত-বিজ্ঞানের রোল তুলেছেন—আর দুঃখী মানুষের প্রেমিক-ভ্রাতা বিবেকানন্দ সেই বেদান্তকে জনজীবনে কর্ম-পরিণত করতে চেয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশন সেই বেদান্তকে কর্ম-পরিণত করার যন্ত্র-বজ্র। তাই স্বামীজী মঠটির সুবন্দোবস্ত করবার জন্য অত ব্যাকুল। আর রামকৃষ্ণ মিশনের কলকাতা-সহ ভারতব্যাপ্ত কর্মধারা বিবেকানন্দের বেদনার উত্তরাধিকার গ্রহণ ছাড়া আর কিছু নয়।

তবু 'শেষ হয়ে হইল না শেষ।' 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ'-এর একটুকরো রচনা এই:

"কাল—১৯০২। আজ বিকালে কলিকাতার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্য দেখিতে পাইল—কিছুদূরে একজন সন্ন্যাসী আহিরীটোলার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি নিকটস্থ হইলে শিষ্য দেখিল, সাধু আর কেহ নন—তাহারই গুরু স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর বামহস্তে তালপাতার ঠোঙায় চানাচুর ভাজা। বালকের মতো উহা খাইতে-খাইতে তিনি আনন্দে পথে অগ্রসর হইতেছেন। শিষ্য তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার হঠাৎ কলিকাতা-আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। স্বামীজী—একটা দরকারে এসেছিলুম। চল্, তুই মঠে যাবি? চারটি চানাচুর ভাজা খা না? বেশ নুন-ঝাল আছে।"

জীবনপ্রান্তেও সেই পথের ধুলায় খেলা-করা বালক!!

সেই ধূলিকে নমস্কার ক'রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন: "জন্মিল হেথা বিবেকানন্দ / দেশ-আত্মার কুণ্ঠা হরি; / এ পুরীর রাজপথের ধূলিরে / মোরা কহি রাজ-রাজেশ্বরী।"

[উদ্বোধন পত্রিকার ভাদ্র ১৩৯৭ সংখ্যায় প্রকাশিত]

বিবেকানন্দ-গবেষণার মহাগ্রন্থ: লুইস বার্ক প্রণীত 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন আমেরিকা: নিউ ডিস্‌কভারিজ্'

॥ এক ॥

গভীর আনন্দ এবং কিছু লজ্জার সঙ্গে স্বামীজী-বিষয়ক একটি মহাগ্রন্থের সম্বন্ধে বলতে যাচ্ছি, যে-গ্রন্থটি অনেকের কাছেই ইতিপূর্বে পরিচিত হয়ে গেছে। গ্রন্থের নাম *'Swami Vivekananda in America—New Discoveries'* —লেখিকা মেরী লুইস বার্ক।

কলকাতা 'অদ্বৈত আশ্রম থেকে বইটি বেরিয়েছে ১৯৫৮ সালে। তার বিষয়ে লিখতে লজ্জার কারণ, গ্রন্থটি পড়ে দেখলুম, আমরা আমাদের—জাতীয় নায়কদের সম্বন্ধে— কত উদাসীন—বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সর্বশেষ বিরাট গ্রন্থ এল পাশ্চাত্য দেশ থেকে আমাদের কাছে (স্বামী নিখিলানন্দ ব্যক্তিগত আলাপে আমাকে কৌতুক-মেশানো বিশেষ সত্য কথাটি বলেছিলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার দান ভারতবর্ষকে')—কিন্তু লজ্জার থেকে বড় হয়েছে গৌরববোধ, যে-গৌরব আমরা অনুভব করি যে-কোনো মহান চরিত্রের সর্বমানবীয় বন্দনায়। বিবেকানন্দের মতো চরিত্রকে কোন্ দেশের লোক উপস্থিত করল সেটা বড় কথা নয়, তাঁকে পেলুম, শেষপর্যন্ত এইটেই বড় কথা।

শ্রীমতী বার্কের এই গ্রন্থকে 'মহাগ্রন্থ' বলেছি, মহাগ্রন্থ শব্দের পূর্ণ তাৎপর্য মনে রেখে। এ গ্রন্থ বিপুলায়তন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে সাম্প্রতিক উত্তম সংযোজন শুধু নয়—ঐ সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে প্রথম থাকের রচনা। এবং স্বামীজীর জীবনীর ব্যাপারে গ্রন্থটির এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্যত্র প্রাপ্তব্য নয়। মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের রামকৃষ্ণ-কথামৃত (যা নিঃসন্দেহে ধর্মীয় ক্লাসিক সাহিত্য), স্বামী সারদানন্দের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ম্যাক্সমূলারের রামকৃষ্ণ-জীবনী, রোমা রোলাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ জীবনী, ভগিনী নিবেদিতার স্বামীজী সম্পর্কিত রচনাদি, ক্রিস্টোফার ইশারউডের ক্রমপ্রকাশিত রামকৃষ্ণ জীবনী, প্রাচ্য ও পশ্চাত্য শিষ্যগণ কর্তৃক রচিত বিবেকানন্দর জীবনী (যাকে রোমা রোলাঁ সর্বসময় 'মহাগ্রন্থ' বলে উল্লেখ করছেন)—এই তালিকায় সগৌরবে যুক্ত হলো শ্রীমতী বার্কের এই গ্রন্থ! অথচ এই গ্রন্থ স্বামীজীর জীবনের মাত্র দেড় বৎসরের কাহিনী! যদিও এর আকার রয়াল অক্টেভো সাইজে ৬৬০ পৃষ্ঠা।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লেখা বিশেষ কঠিন এবং নিতান্ত সহজ। সহজ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অমনোযোগী কোনো লেখক অসাবধানে এই বইটি সম্বন্ধে লিখতে শুরু করলেও এত বেশি আকর্ষক তথ্য দিয়ে দিতে পারবেন যে পাঠকরা খুশি হবেনই। কিন্তু যদি কেউ মনে করেন বইটির প্রতি সুবিচার তিনি করবেন এর পূর্ণ পরিচয় দিয়ে—তাঁকে ব্যর্থ হতে হবে।

বিপুল তথ্যকে স্মরণীয় দক্ষতার সঙ্গে যেভাবে লেখিকা গ্রথিত করেছেন—যেভাবে তথ্যস্তূপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবার কালে তাঁর মূল বক্তব্যের সূত্র ধরে রেখেছেন—এবং সর্বশেষে, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনোদ্দেশ্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যুক্তিসমর্থিত মৌলিক বক্তব্য উপস্থিত করেছেন—তার পূর্ণ পরিচয় দান কার্যত অসম্ভব—এবং পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, বর্তমান লেখক অঘটন ঘটানোয় পারদর্শী নন—সুতরাং আমার এই লেখা বিক্ষিপ্ত নমুনা পরীক্ষার বেশী কিছু হবেনা। সমালোচনাকে কেউ বলেন পূজা, কেউ বলেন সাজা। পূজায় অধিকারহীন এবং সাজাদানে সামর্থ্যহীন আমার পক্ষে একমাত্র পথ—কিছু পরিচয় দান।

একটি কথা বলে নিই, লুইস বার্কের গ্রন্থ কিন্তু ইতিমধ্যেই আমাদের অসাড় চৈতন্যে কিছু নাড়া দিয়েছে। অনেকেই স্বামীজী সম্বন্ধে নূতন তথ্যের আবিষ্কারে এখন আগ্রহী। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, গ্রন্থমধ্যে, বিশেষভাবে শেষ অধ্যায়ে, স্বামীজীর ধারণা ও কর্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে শ্রীমতী বার্ক যে নূতন থীসিস উপস্থিত করেছেন, সে-বিষয়ে কোনো আলোচনা (যতদূর জানি) হয়নি। শ্রীমতী বার্ক-প্রদত্ত চাঞ্চল্যকর তথ্যাদি ইতিমধ্যেই 'জনপ্রিয়' বাঙলা জীবনীসমূহের জনপ্রিয়তার কারণ হয়েছে, কিন্তু তাঁর এক প্রধান বক্তব্য অনালোচিত থেকে গেছে।

॥ দুই ॥

এই গ্রন্থ রচনার ইতিহাসটি চিত্তাকর্ষক। লেখিকার 'পূর্বকথন'-এর কিয়দংশ উদ্ধৃত করি :

"১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে যখন আমি নিউইয়র্কে ব্রুকলিন ও বস্টনের লাইব্রেরীগুলিতে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় রচনাদির সন্ধান করতে শুরু করি, তখন জানতাম না যে, এই সন্ধানকার্য স্বামীজীর আমেরিকা-জীবন বিষয়ে একটি গ্রন্থের রূপ নেবে। ঐ সময়ে আমি নিউইয়র্ক শহরে আছি—উত্তর-ক্যালিফোর্নিয়ার বেদান্ত-সোসাইটির আমারি মতো একজন সভ্য, আমাকে একটা কাজ ধরিয়ে দিলেন, আমি যেন পত্রপত্রিকা থেকে স্বামীজীর বিষয়ে রচনা সন্ধান করি, ও কোনো রচনা পেলে সেগুলির ফটোস্টাট নিয়ে নিই। কাজটা শুধু প্রয়োজনীয় নয়, পরম আকর্ষক হয়ে দাঁড়াল। এবং যোগ্য পুরস্কারও পেতে লাগলাম। কারণ সময়ে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে এমন সমস্ত সংবাদ মিলে যেতে লাগল, যা তাঁর জীবনীতে নেই, শুধু তাই নয়, জানাও আছে কিনা সন্দেহ। আবিষ্কারগুলি নিজমূল্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, আমি তখন তার বেশী কিছু চিন্তাও করিনি।

"এক বৎসর পরে, তখনও আমি নিউইয়র্কে আছি এবং হলদে-হয়ে-যাওয়া সংবাদপত্রের পাতা ওলটাচ্ছি—আমাকে অনুরোধ করা হলো, আমি যেন স্বামীজী সম্বন্ধে একটি কাহিনীর সত্যতা পরীক্ষা ক'রে দেখি, যে-কাহিনীটি হয়ত অবিশ্বাস্য নয়, কিন্তু নিশ্চয়ই আশ্চর্যজনক। উত্তর-ক্যালিফোর্নিয়ার বেদান্ত-সোসাইটির জনৈক সদস্য হঠাৎ কোনো সূত্রে জানতে পেরেছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ ম্যাসাচুসেট্সের সালেমে

গিয়েছিলেন ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে, এবং সেখানে জনৈক মিসেস উড্‌সের বাড়িতে তাঁর ট্রাঙ্ক, ছড়ি এবং শাল রেখে আসেন। আমি তদনুযায়ী সালেমে যাই এবং এসেক্স ইনস্টিটিউটে সন্ধান ক'রে দেখতে পাই যে, স্বামীজী সত্যই ঐ সহরে এসেছিলেন—শুধু তাই নয়, বক্তৃতাও করেছিলেন। সংবাদপত্রে স্বামীজীর বক্তৃতার রিপোর্টগুলিকে যথার্থই 'আবিষ্কার' বলা চলে, কারণ সেগুলি স্বামীজীর আমেরিকা-জীবনের এমন একটি অংশের সঙ্গে যুক্ত, যে-অংশটি সে পর্যন্ত অপরিচিতই ছিল।...সালেম-বক্তৃতাগুলি আবিষ্কারের পরে দুটি জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল—এক, স্বামীজী-সংক্রান্ত বহু উপাদান সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে অনাবিষ্কৃত হয়ে পড়ে আছে—দুই, এইসকল উপাদানের সন্ধান করা এবং সন্ধান পেলে সেগুলিকে ভক্তদের গোচর করা নিতান্ত কর্তব্য।

"সুতরাং আমি মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে শুরু করলাম। নতুন উপাদান অজস্রধারে আসতে লাগল।...শীঘ্রই বোঝা গেল উপাদানগুলি মাসিকপত্রে ধারাবাহিক রচনার অতিরিক্ত ('প্রবুদ্ধ ভারতে' এ বিষয়ে আমি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলাম) নূতন গ্রন্থের রূপ নেবার দাবি রাখে। অবশেষে, নিউইয়র্কের এক সংবাদপত্রে বিবেকানন্দের উল্লেখ পাওয়ার সাড়ে পাঁচ বছর পরে বর্তমান গ্রন্থটিতে হাত দেওয়া হয়।"

লেখিকা তাঁর পূর্ব-কথনে জানিয়েছেন, সকল উপাদান তিনি নিজে সংগ্রহ করেন নি, অনেককিছু তিনি পেয়েছেন, যেন অদৃশ্য ইঙ্গিতে। সে রকম কয়েকটি 'প্রাপ্তির' কাহিনীও তিনি দিয়েছেন। যেমন ১৯৫০ সালে কিউরিও-বিষয়ক একটি পত্রিকায় জনৈক বেদান্ত-ছাত্র এক বিজ্ঞাপনে দেখেন যে, জনৈক মিসেস প্রিন্স উডস্ স্বামীজীর ছড়ি, ট্রাঙ্ক ইত্যাদি বিক্রয়ের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। বিজ্ঞাপনদাত্রীর সঙ্গে অতঃপর পত্রালাপ চলে এবং সালেমে স্বামীজীর অবস্থান-সংক্রান্ত কাহিনী বেদান্তকেন্দ্রের গোচরীভূত হয়। জানা যায় যে, স্বামীজী ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে মিসেস কেট ট্যানাট উড্‌সের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে তাঁর সালেমের বাড়িতে যান; অবিলম্বে তিনি ও তাঁর পুত্র স্বামীজীর সান্নিধ্যে অভিভূত হয়ে পড়েন; স্বামীজী যাবার সময়ে মিসেস উড্‌সের পুত্র তরুণ ডাক্তার উড্‌সকে তাঁর ট্রাঙ্ক, ছড়ি ইত্যাদি দিয়ে যান উপহাররূপে; ঐ পরিবারের কাছে সেগুলি এতই স্মৃতিপূত ছিল যে, ডাঃ উড্‌স ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাছ থেকে ২০০ ডলার পাবার প্রস্তাব পেয়েও সেগুলি বেচেন নি, ফলে সেগুলি তাঁর পরিবারে থেকে যায় এবং বহুদিন পরে ডাঃ উড্‌সের বিধবা স্ত্রী মিসেস উড্‌সের কাছে থেকে সেগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

মিসেস উড্‌সের ঐ সংগ্রহে একটি অত্যন্ত দামী চিঠি ছিল। স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার পরে আমেরিকার বিখ্যাত মহিলা কবি এলা হুইলার উইলকক্স মিসেস কেট ট্যানাট উড্‌সকে ঐ চিঠি লিখেছিলেন। ঐ রকম চিঠি কত সহস্র সংখ্যায় লিখিত হয়েছিল আমরা কেউ জানিনা। ঐ চিঠিতে উইলকক্স লিখেছিলেন—

"I believe him to be the reincarnation of some great Spirit—perhaps Buddha—perhaps Christ."

আর একটি 'প্রাপ্তির' বিস্ময়কর ঘটনার কথা বলতে গিয়ে লেখিকা বলেছেন, এ-ধরনের জিনিস স্বামীজী-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। শিকাগোর এক ছোকরার কাছে এক বাণ্ডিল চিঠিপত্র, ফটো ও অন্যান্য জিনিস ছিল। সেগুলি তার ঠাকুমার প্রাণের জিনিস ছিল বলে ছেলেটি অনেকদিন সেগুলিকে ধরে রেখেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত রাখত কিনা সন্দেহ, যদিনা এ-ব্যাপারটা জেনে ফেলত বেদান্ত-অনুরাগী আর এক ছোকরা। চিঠিপত্র ও জিনিসগুলি আর কারো নয়—স্বামী বিবেকানন্দের! তৎক্ষণাৎ শিকাগো বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বানন্দ ছেলেটির কাছে হাজির। দেখেন মহামূল্য সব চিঠি—হেল ভগিনীদের অন্যতম ইসাবেলা ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে সেগুলি লেখা।

এইখানেই শেষ নয়। স্বামী বিশ্বানন্দ যে-সব জিনিস পেলেন, তার মধ্যে পেনসিলে স্বামীজীর হাতে লেখা তিনটে চিঠির কাগজ ছিল। বিষয়বস্তু—ভারতস্থ মিশনারীদের আসল রূপ। কিন্তু লেখাটি কার—স্বামীজীর নিজের? না-কি তিনি উদ্ধৃত করেছেন? যদি উদ্ধৃত করেন তার উৎস কি? সামান্য একটু ইঙ্গিত ছিল তৃতীয় পাতার শেষে—সেখানে একটি নাম লেখা—Louis Rousselet। কে এই ব্যক্তি, কেন তাঁর নাম স্বামীজী লিখেছেন—তার সন্ধান ক'রে সানফ্রানসিসকো বেদান্ত-সোসাইটির বিখ্যাত অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কূলকিনারা পেলেন না। একদিন হঠাৎ উক্ত বেদান্তকেন্দ্রে সেকেন্ড হ্যান্ডে কেনা এক প্যাকেট বই এসে হাজির। সেই বইগুলির মধ্যে দেখা গেল একটি সচিত্র ভারতভ্রমণ পুস্তক আছে—লেখক Louis Rousselet! এই বই থেকেই স্বামীজী ঐ তিন পৃষ্ঠা টুকে রেখেছিলেন, মিশনারী কুৎসার জবাবরূপে।

আর একটি ঘটনা বলে এই 'প্রাপ্তি' প্রসঙ্গ শেষ করি। স্বামীজী ডেট্রইটে যেসব বক্তৃতা করেছিলেন তার চারটি বক্তৃতা বহুদিন পরে প্রকাশিত হয় 'বেদান্ত কেশরীতে,' ১৯২৪ সালে। এতদিন পরে প্রকাশের কারণ কি? 'ডেট্রইট ফ্রি প্রেসে' প্রকাশিত ঐসব বক্তৃতার রিপোর্ট ১৯০৮ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে পাঠিয়ে দেন মিসেস মেরী ফাঙ্কি। মিসেস ফাঙ্কি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখেন:

"প্রিয় স্বামীজী, আমি পনের বছর আগেকার সংবাদপত্রের অংশ আপনার কাছে পাঠাচ্ছি; আমার মনে হয় এগুলিতে আপনাদের আগ্রহ আছে। এগুলি আমার কাছে অমূল্য সম্পদ; এবং এগুলির দ্বিতীয় কপি নেই আমার কাছে। তাই মনে হয়, যদি ঐগুলি আমি ফেরত চাই সেটাকে স্বার্থপরতা মনে করবেন না। অবশ্য আপনি সময়-সুযোগ মতোই ফেরত দেবেন, তাড়া নেই কিছু। তবে আমার সম্বল তাঁর সঙ্গের কয়েকটি মুহূর্ত—আর আপনারা পেয়েছেন তাঁর মঠ, তাঁর ঘর, বেলগাছের তলায় তাঁর পবিত্র ভূমি। যতদিন ইচ্ছা অবশ্য কাগজগুলি রাখবেন...।"

আরও তেরো বছর পরে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশনের এক আলমারীর গুদামের মধ্য থেকে আবিষ্কৃত হলো বস্তুটি! এবং তার ফলেই স্বামীজীর প্রেরণামহান কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা লোকচক্ষুর গোচর হতে পারল।

গ্রন্থরচনার ও উপাদান-প্রাপ্তির কিছু কথা এই পর্যন্ত। গ্রন্থের বস্তুপ্রকৃতি কি প্রকার?

গ্রন্থটি এক কথায় 'আবিষ্কার'-পূর্ণ। এর মধ্যে নূতন ৬৩টি বক্তৃতা, ৭টি ঘরোয়া আলোচনা, ৬টি সাক্ষাৎকারের সংবাদ যুক্ত হয়েছে। তদুপরি বেশকিছু সংখ্যায় স্বামীজীর নূতন চিঠি, একটি কবিতা ও কয়েকটি নূতন ফটো। ফটো কেবল স্বামীজীর নয়, সেইসঙ্গে তাঁর অনুরাগীদের ও তাঁর স্মৃতিসংশ্লিষ্ট বাসগৃহ, বক্তৃতাস্থান প্রভৃতির। স্বামীজীর জীবনেতিহাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় আরও কিছু বস্তুর ফটোও আছে, যেমন মিশনারীদের ভারত-কুৎসামূলক চিত্রাদি। স্বামীজীর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন অনেক আমেরিকান নরনারীর মূল্যবান জীবন-কথা এই গ্রন্থে পাচ্ছি, যেমন, মিঃ ও মিসেস হেল ও হেল কন্যাগণ, ডঃ জেনস, মিসেস ওলি বুল, অধ্যাপক রাইট, মিসেস বাগ্‌লি, মিস কেট সানবর্ন, মিঃ পামার প্রভৃতি। এ ছাড়া পাচ্ছি, ধর্মমহাসভার পূর্বেকার 'অজ্ঞাত' বিবেকানন্দজীবন, ধর্মমহাসভার পটভূমিকা, আমেরিকার ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা, মিশনারীদের ভারতকুৎসা, তাতে কিছু 'রিফর্মার' ভারতীয়ের সমর্থন, স্বামীজীর সংগ্রাম ও সাফল্য-কাহিনী, এবং তাঁর দিব্য প্রভাবের চমকপ্রদ বিবরণ। এক কথায় বলা চলে, স্বামীজীর আমেরিকা-জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণার আবছা দেহে শ্রীমতী বার্ক রক্তমাংস যোজনা করেছেন।

এতকিছু করেও লেখিকা তাঁর বইকে 'জীবনী' গ্রন্থ বলতে রাজি হননি। আমরা এই বইটি না-পড়ে, উপর-উপর পাতা উল্টে যে সমালোচনা করতে পারি, আগেভাগেই তিনি সেই 'নিন্দা'কে স্বীয় গ্রন্থচরিত্ররূপে স্বীকার ক'রে রেখেছেন:

"এই বইটিকে ঠিকভাবে জীবনীগ্রন্থ বলা যায়না। মূলত এটি গ্রন্থবর্ণিতকালে স্বামীজীর জীবনীর উৎস-গ্রন্থ। আমার দ্বারা আবিষ্কৃত বা অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত উপাদানের প্রতিটি টুকরোকে পর্যন্ত উপস্থিত করাই এই গ্রন্থরচনার আদি উদ্দেশ্য। জীবনীকারকে অবশ্যই তথ্য নির্বাচন করতে হয়। সেই নির্বাচিত তথ্যকে তিনি তাঁর বিষয়বস্তুর নানা দিকের দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করেন, কিংবা ঐসব তথ্যের দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। আমি কিন্তু তথ্যের সে ধরনের কোনো নির্বাচন করিনি। স্বামীজীর ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে এইসব নূতন ঘটনা বা সংবাদের কোনো অংশকে সরিয়ে রাখার দায়িত্ব গ্রহণ না-করে সমস্ত-কিছুকে একসঙ্গে হাজির করতে চেয়েছি। তার ফলে আমি এমন সব সংবাদ-প্রবন্ধ গ্রন্থবদ্ধ করেছি যেগুলি কখনো-কখনো পুনরুক্তিপূর্ণ এবং স্থানে-স্থানে বাইরের বিচারে মূল্যহীনরূপে প্রতীয়মান। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, স্বামীজীর জীবনের গভীর চর্চা যাঁরা করেন, তাঁদের কাছে এই নির্বিচার গ্রহণ ব্যাপারটি দোষের বস্তু বলে গৃহীত হবেনা। তাঁদের কাছে স্বামীজীর জীবনসংক্রান্ত সবকিছুই আকর্ষক ও মূল্যবান। দ্বিতীয় যে-কারণে বইটি জীবনী গ্রন্থরূপে বিবেচিত হবেনা তা হলো, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথমাংশকে বাদ দিলে আমি স্বামীজী সম্বন্ধে পূর্বপরিচিত তথ্যাদি ও সংশ্লিষ্ট সমসাময়িক মূল্যবিচারকে বাদ দিয়েছি। সেই কারণে আমার রচনা সম্পূর্ণ বা সর্বাত্মক নয়—জীবনীগ্রন্থের যা হওয়া উচিত।"

শ্রীমতী বার্ক নিজ গ্রন্থের যে-চরিত্রবিচার করেছেন, তার থেকে সুষ্ঠুতর বিচার করা সম্ভব কিনা জানিনা। কিন্তু তাই বলে তিনি অযথা বিনয়ে বিগলিত নন। তাঁর গ্রন্থ কোথায় 'সংবাদ সংকলন গ্রন্থ' বা 'উৎস-গ্রন্থকে' অতিক্রম করেছে, তাও তিনি জানিয়েছেন। তিনি তাঁর

'আবিষ্কার'গুলিকে, নিছক হাজির না-ক'রে সমসাময়িক সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশে, সেই সঙ্গে স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার পটভূমিকায়, স্থাপন করেছেন। এ না-করলে স্বামীজীকে ভুল বুঝবার সম্ভাবনা ছিল। স্বামীজীর বক্তব্য নিয়ে যে-বিবাদ-বিতর্ক বেধেছিল, সেগুলি লেখিকা বাদ দিতে পারতেন, কিন্তু তা করলে ইতিহাস গোপনের দোষ ঘটত; তদুপরি, বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকা অগোচর থেকে যেত। সুতরাং দুঃখজনক মনে হলেও বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে তিক্ত মিশনারী আক্রমণ পটভূমিকাসহ লেখিকাকে উপস্থাপিত করতে হয়েছে।

লেখিকা মিথ্যা বিনয় ত্যাগ ক'রে আরও একটি দাবি উপস্থিত করেছেন। প্রাপ্ত তথ্যের বিচার ক'রে তাঁর মনে হয়েছে, স্বামীজীর আমেরিকান 'মিশন' সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পূর্বাপর সকলের মনে রয়ে গেছে। তথ্য-সহযোগে লেখিকা এ-ব্যাপারে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়েছেন।

এবং একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন আধুনিক ভারতবর্ষের প্রতি। তিনি শুনেছেন, আধুনিক ভারতের কাছে বিবেকানন্দের বাণী নাকি পুরাতন হয়ে গেছে। (অবশ্য সে বাণী স্বামীজীর দেহত্যাগের ষাট বৎসর পরেও কত নূতন—চিন্তাশীল সকল ভারতবাসী স্বীকার করেছেন শতবার্ষিকী বৎসরে)। লেখিকা বলেছেন, বিবেকানন্দের বাণী ভুললে ভারতবর্ষ নিজের সর্বনাশকে ত্বরান্বিত করবে। এই বলবার সাহস লেখিকা অর্জন করেছেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস, বিবেকানন্দের বিশ্ববাণী ভুললে পৃথিবীরও সর্বনাশ।

যেসব কারণের জন্য লেখিকা তাঁর এই গ্রন্থকে 'জীবনী' বলতে রাজি হননি, সেই কারণগুলির মূল্য আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তবু শেষপর্যন্ত এই গ্রন্থ জীবনী ছাড়া আর কিছু নয়। ঠিকভাবে বলতে গেলে অবশ্য জীবনীর একটি অধ্যায়, কারণ স্বামীজীর জীবনের মাত্র দেড় বৎসরকে গ্রন্থ-বিষয় করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে দুটি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমত, স্বামীজীর জীবন মাত্র ৩৯ বৎসরের সমষ্টি। এই ক্ষুদ্র জীবনে তিনি অসীম জীবন যাপন করেছেন বলে তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত গভীরতায় ও ঘনত্বে অসাধারণ। দ্বিতীয়ত, ঐ গভীর ঘন জীবনের মধ্যেও ঘনতম কাল ১৮৯৩ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৮৯৫ সালের সূচনা পর্যন্ত। ১৮৯৩ সালের মধ্যভাগে তিনি আমেরিকা পৌঁছেছিলেন, এবং ১৮৯৫ সালের সূচনায় তাঁর ভাবনা শেষ সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। [লেখিকা পরবর্তী কালে এইমত কিছুটা ত্যাগ ক'রে বলবেন—১৮৯৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়াতেই স্বামীজীর মতাদর্শ সম্পূর্ণতা পায়।] জীবনের ঐ দীপ্তিময় আঠারো মাসের 'বৎসরটিকে' বিবেকানন্দ মহাকালের উপরে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং লেখিকার গ্রন্থ স্বামীজীর জীবনের একটি অধ্যায় হলেও পরম অধ্যায়রূপে গৃহীত হবার যোগ্য। বিবেকানন্দের জীবনীকে যদি মহাভারত বলি, লেখিকা তাঁর গ্রন্থে উদ্যোগ-পর্ব ও যুদ্ধ-পর্ব রচনা করেছেন।

আরও একটি কথা, লেখিকা তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যের নির্বাচন করেন নি বটে, এবং বাইরে থেকে তাঁর গ্রন্থ সংবাদসংকলন মনে হওয়া আশ্চর্য নয়, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, তিনি কোথাও মূল বক্তব্য বা উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হননি; এই গ্রন্থে বিবেকানন্দ কোথাও কেন্দ্রচ্যুত নন; বিপুল পরিমাণ তথ্য এখানে নিবিড় বন্ধনে শৃঙ্খলিত, এবং গ্রন্থের আকর্ষণীয়তা প্রতি পত্রে বজায় আছে। এখানেই লেখিকার প্রতিভার প্রমাণ—তিনি সর্বত্র তাঁর নির্ধারিত উদ্দেশ্যের দ্বারা অতন্দ্রভাবে চালিত।

সব চেয়ে বড় কথা—জীবনদর্শন ছাড়া মহৎ জীবন হয়না। বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের এমন সরল প্রত্যক্ষ সুগ্রথিত উপস্থাপনা অন্যত্র দেখেছি কিনা সন্দেহ।

॥ তিন ॥

গ্রন্থটি এত বেশি প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ যে, প্রয়োজনীয়ের স্তরভাগ ক'রে কয়েকটি বিষয়ের সামান্য উল্লেখমাত্র করতে পারব। লেখিকার এই গ্রন্থ একদিক থেকে স্বামীজীর (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ রচিত) বিখ্যাত জীবনীর পরিপূরক, আবার অনেক সময়ে সেখানে প্রদত্ত তথ্যের সংশোধক।

গ্রন্থটি যে যথার্থই পরিপূরক হবার গৌরব-ভাজন হয়েছে, তার প্রথম প্রমাণ, স্বামীজীর ধর্মমহাসভাপূর্ব আমেরিকান জীবনের অনালোকিত অধ্যায়ে যথেষ্ট আলোকসম্পাত করা হয়েছে এখানে। লেখিকা এমনকি স্বামীজীর আমেরিকায় পদার্পণের তারিখ পর্যন্ত নির্ণয়ে প্রয়াসী। সে তারিখ তাঁর মতে, 'খুব সম্ভব' ২৫শে জুলাই, শুক্রবার, ১৮৯৩, যেদিন তিনি ভ্যাঙ্কুভারে অবতরণ করেন।

ধর্মমহাসভাপূর্ব স্বামীজীর আমেরিকা-জীবন নূতনভাবে পরিজ্ঞাত হওয়ার কারণেই মূল্যবান নয়—তার নিজস্ব মূল্যও সবিশেষ। প্রথমেই একটা জমকালো দৃশ্য পাচ্ছি—স্বামীজীকে 'কিউরিও'-রূপে যিনি সাদরে আতিথ্য দিয়েছিলেন, সেই লেখিকা ও সমাজসেবিকা (বা সমাজনায়িকা) মিস কেট সানবর্নের সঙ্গে স্বামীজী শকটচালিত হয়ে পথ দিয়ে চলেছেন—। পথবর্তী শত শত বিমুগ্ধ দৃষ্টি ভাষারূপ পেল স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রে—

> "শুক্রবার ২৫ শে অগস্ট, ১৮৯৩, হলিস্টন। পাশ্চাত্য দেশ হইতে সম্প্রতি প্রত্যাগত মিস কেট সানবর্ন গত সপ্তাহে ভারতীয় রাজা স্বামী বিবেকানন্দকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। লিভারিম্যান এফ ডবলু ফিপসের দ্বারা সজ্জিত অশ্বদ্বয়ের পিছনে বসিয়া মিস সানবর্ন ও ঐ ভারতীয় রাজা হানিওয়েলের দিকে শহরের মধ্য দিয়া গিয়াছেন।"

শুধু অশ্বরথে ভারতীয় রাজা পথবাহন করলেন না, তিনি ঘরোয়া সভায় বক্তৃতা পর্যন্ত করলেন, এবং তারো বড় কথা, কেট সানবর্নের সূত্রে পরিচিত হলেন অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে। অধ্যাপক রাইট তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে বললেন, "কী প্রতিভা! আমাদের সব কটা পণ্ডিত একত্র হলেও এঁকে আঁটবে না," —এবং বিবেকানন্দের প্রতিভার প্রশস্তিতে অব্যর্থ কাব্যের সৃষ্টি করলেন—"এঁর কাছ থেকে পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে আলো দেখাবার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা একই কথা।"

অধ্যাপক রাইটের ঐ কথাগুলি বিবেকানন্দের জীবনী-পাঠকের কাছে পরিচিত, কিন্তু পরিচিত নয় মিসেস রাইটের একটি চিঠি, বা ঐকালে প্রদত্ত স্বামীজীর একটি বক্তৃতার সম্পূর্ণ বিবরণী। স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হয়েই মিসেস রাইট তাঁর মাকে লিখেছিলেন:

'He was a most gorgeous vision. He had a superb carriage of the head, was very handsome in an Oriental way, about thirty years old in time, ages in civilization.'

এর থেকেও অনেক মূল্যবান বিষয়—স্বামীজীর একটি বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ প্রাপ্তি। মিসেস রাইট-লিখিত এই বিবরণটি অংশত স্বামীজীর জীবনীতে বেরিয়েছিল, কিন্তু বাদ গিয়েছিল স্বাধীনতার পূর্বে ভারতবর্ষে প্রকাশিত জীবনীতে— স্বামীজীর উক্তির প্রচণ্ড রাজদ্রোহকর অংশটি। বৃটিশশাসন সম্বন্ধে স্বামীজীর সেই ভয়াবহ বক্তব্যের মূল কথা— ইংরেজরা বন্য, বর্বর, রাক্ষস। তারা মুখে ভালবাসার কথা বলে কিন্তু গলা কাটে। তারা রক্ত চুষে খায়। তারা যখন ভারত ছেড়ে যাবে সভ্যতার কোনো নিদর্শনই রেখে যাবেনা। তাদের পিছনে পড়ে থাকবে মণ-মণ ভাঙা ব্র্যান্ডির বোতল। তবে তাদের পাপের শাস্তি হবেই। ভগবানের প্রতিহিংসা, কিংবা ইতিহাসের প্রতিহিংসা থেকে তারা বাঁচতে পারবে না। ইতিহাসের প্রতিহিংসারূপী কোটি কোটি হূন-চীনেরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের লাথি মেরে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেবে, ইত্যাদি।

ইংরেজশাসন সম্বন্ধে এই ধরনের কথা স্বামীজী আমেরিকায় বহুবার বলবেন। এই কথাগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে তাঁর ধারণাকে দেখিয়ে দেয়। এ ছাড়া ধর্মমহাসভাপূর্ব ঘরোয়া সভায় স্বামীজী ভারতের ভয়াবহ দারিদ্র্যের কথা বলে আমেরিকায় আসার মূল উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। সে উদ্দেশ্য হলো, অর্থসংগ্রহ ক'রে দেশে ফিরে শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

ভারতের শিল্পোন্নয়ন সম্বন্ধে স্বামীজীর আগ্রহের বিষয় এখানে প্রথম দেখি, পরে বহুভাবে দেখতে পাব, এই গ্রন্থে, ও অন্যত্র।

'ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ' অধ্যায়টিও সুলিখিত। বিবেকানন্দের-জীবনের এই অংশটি সর্বজনপরিচিত। তবু এই অধ্যায়েও বহু অজানিত তথ্যের সমাবেশ লেখিকা ঘটাতে পেরেছেন। প্রথমে তিনি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন—ধর্মমহাসভার সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতিবিবরণ দিয়েছেন। সে আয়োজন যে কী বিপুল, আয়োজনের জন্য পরিশ্রম কত অক্লান্ত, বিশেষত মিঃ বনি ও ডাঃ ব্যারোজের—ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠানের পথে খ্রীস্টান প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের বাধা দান, তা সত্ত্বেও অদম্য প্রয়াসে অনুষ্ঠান সম্ভব করা, এবং এই খ্রীস্টীয় আয়োজনের পশ্চাতের অখ্রীস্টীয় অভিপ্রায়—সর্বসমক্ষে হিদেন-প্রদর্শনীর ইচ্ছা—এ সবকিছুই লেখিকা নিপুণভাবে ফুটিয়েছেন।

ধর্মমহাসভার অধিবেশনের চমৎকার বর্ণনাও পেয়েছি—বিভিন্ন সংবাদপত্রের মূল্যবান রিপোর্ট লেখিকা সংগ্রহ ক'রে উপস্থিত করেছেন; তার মধ্যে কবি হ্যারিয়েট মুনরো, ও তাঁর বোন লুসি মুনরোর বিবরণ উৎকৃষ্ট। লেখিকা ভারতের ইতিহাসের পক্ষে এক বিশেষ দরকারী বিবরণও উদ্ধৃত করেছেন। 'বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্টের' সেই বিবরণ প্রথমে স্টেটসম্যান, পরে ইন্ডিয়ান মিররে উদ্ধৃত হয়ে বাঙলা দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে—এবং বাঙলা ও ভারতবর্ষ বিবেকানন্দ নামক নূতন তারকার অভ্যুদয়ের কথা জানতে পারে।

স্বামীজীর যেসব টুকরো পরিচয় লেখিকা উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলি এখন খুবই আমোদজনক মনে হবে। তিনি 'ভারতীয় রাজা', 'ব্রহ্মের মুখ্য পুরোহিত', 'বৌদ্ধ পুরোহিত,' 'বোম্বায়ের ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী', কত-না আখ্যা পেয়েছিলেন।

স্বামীজীর গভীর পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন অনেক সাংবাদিক। কারো কাছে তিনি ওথেলোর ট্রাজিক মহিমামূর্তি, কোথাও তাঁর ভাষণ 'পরমতম অনুভূতির মহান উৎস', এবং

তিনি 'ঐশ্বরিক অধিকারপ্রাপ্ত বাগ্মী'; একজন পাদরীর মতে—

"It will be the opportunity of a lifetime for the cities of our land to see and hear this noble earnest loving Brahman, dressed in the costume of his order, telling the true story of the religion and custom of his far-off country."

কিন্তু বিবেকানন্দ নামক Divine-warrior কখনো কখনো এইসব কল্পনা-সীমাকে ছাড়িয়ে গেছেন। তখন তিনি আর সাহসী নন—স্বয়ং সাহস, প্রেরণা-প্রেরিত নন, স্বয়ং প্রেরণা। সাপ বাঘ ও হিদেন-সমাকীর্ণ দেশের শ্বেতগর্বের রক্তমুখের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন—

"We who have come from the East have sat here day after day and have been told in a patronizing way that we ought to accept Christianity because Christian nations are the most prosperous. We look about us and we see England the most prosperous Christian nation in the world, with her foot on the neck of 250,000,000 Asiatics. We look back into history and see that the prosperity of Christian Europe began with Spain. Spain's prosperity began with the invasion of Mexico Christianity wins its prosperity by cutting the throats of its fellowmen." (ধর্মমহাসভার এক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাযণের অংশ)।

আর স্বামীজী আঘাত করেছিলেন খ্রীস্টানী পাপবাদকে তাদের দুর্গে দাঁড়িয়ে—

"The Hindu refuses to call you sinners. Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divinities on earth—sinners! It is a sin to call a man so; it is a standing libel on human nature."

॥ চার ॥

স্বামীজীর প্রচলিত জীবনী থেকে জেনেছি, তিনি ধর্মমহাসভার পরে এক বক্তৃতা-কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা ক'রে বেড়ান। পরে ব্যাপারটি তাঁর কাছে অসহ্য বোধ হওয়ায় প্রভাবশালী বন্ধুদের দ্বারস্থ হয়ে তিনি চুক্তিবন্ধন ছিন্ন করতে সমর্থ হন, ইত্যাদি। শ্রীমতী বার্ক বক্তৃতা-কোম্পানীর ব্যাপারটিতে চিত্তাকর্যক তথ্য-সংযোগ করতে পেরেছেন। সেই তথ্যগুলি পড়ে আমরা 'ভাগ্যের পরিহাস' কাকে বলে তা আর একবার বুঝলুম।

পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী টাকাকড়ির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় না-রাখার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯২ সালে যখন তিনি তিলকের পুনার বাড়িতে ছিলেন, তখনকার কথায় তিলক বলেছেন, তাঁর কাছে একেবারে কোনই টাকাকড়ি ছিলনা। শুধু ছিলনা তাই নয়, তিনি রাখতেও চাইতেন না, এরকম নানা সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আমেরিকা পৌঁছবার পরবর্তী চিঠিপত্রে দেখতে পাই, টাকা নাড়াচাড়ায় তাঁর অসুবিধার কথা তিনি বারবার

বলছেন। এবং বলছেন—নাড়াচাড়া করতে না-পারার মতো টাকা না-থাকার কথাও!

ভাগ্যের কৌতুক এইখানে—অর্থ-বিতৃষ্ণ বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়েছিলেন অর্থসংগ্রহের জন্যই। ডলারপূজার জন্য আমেরিকানদের ধিক্কার দেবার পরেও সেই ডলার চাইতে হয়েছে ভারতের জন্য।

'ভিক্ষা' শব্দটা অবশ্য বিবেকানন্দের কাছে ঘৃণ্য শব্দ। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, অর্থ তিনি অর্জন করবেন। নিজের প্রতিভাকে তদনুযায়ী তিনি 'পণ্য' করলেন—এক বক্তৃতা-কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন। এ কাজ করলেন কে?—বিবেকানন্দ। কেন?—ভারতের জন্য। একজন মুক্তপুরুষের কাছে বদ্ধমানুষের দাবি আর কত বড় হতে পারে! অধিকন্তু, ঐ মুক্তমানুষ প্রতিভাবান হতে পারেন কিন্তু বুদ্ধিমান নাও হতে পারেন, অন্তত অর্থের ব্যাপারে। সুতরাং বিবেকানন্দ চুক্তিবদ্ধ হয়ে পড়লেন একেবারে তিন বৎসরের জন্য! তার মানে তিন বৎসরের জন্য বক্তৃতার চাকরি। এবং যদি কোম্পানী সাধু না হয় তাহলে তিন বৎসরের জন্য বাধ্যতামূলক প্রবঞ্চনার শিকার। স্বামীজী যে-কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, অল্পদিনের মধ্যে তিনি দেখলেন, সে-কোম্পানীর মূলধন সাধুতা নয়।

আরও মজার কথা, বিবেকানন্দের আত্মসম্মানী স্বভাব অন্য একটি উপাদেয় উপহার পেতে লাগল দিনের পর দিন। ধর্মমহাসভার পূর্বে, যখন তিনি টাকার থলি শূন্য হয়ে আসার জন্য শিকাগোয় থাকতে পারেন নি, যখন উদারহৃদয়া আমেরিকান মহিলার আতিথ্য তাঁর কাছে আশীর্বাদ-স্বরূপ মনে হয়েছিল, তখনও মিস কেট সানবর্নের অতিথি ঐ 'ভারতীয় রাজা' স্বামী বিবেকানন্দ তিক্ত হাসির সঙ্গে চিঠি লিখেছেন ভারতে—এখানে আছি বড় সুখে, তবে কিনা আমি গৃহকর্ত্রীর ও তাঁর আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের কাছে বড় আমোদের সামগ্রী—'ভারতাগত অদ্ভুত জীব-বিশেষ'—আর সেইজন্যই আমার আপ্যায়ন। পত্রশেষে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন—"আজ একজন লোক আমাকে দেখিতে আসিবেন।" আমার বিশ্বাস, এইকথা লিখবার সময়ে স্বামীজীর মনে বাঙলা দেশের মেয়ে-দেখার ছবিটা ফুটে উঠেছিল।

এ তো গেল জনৈক অখ্যাত, সম্বলহীন, বিদেশে বিপদ্‌গ্রস্ত তরুণ সন্ন্যাসীর কথা। ধর্মমহাসভার পরে, বিশ্ববিখ্যাত হবার পরেও, ডায়ন্যামিক হিন্দুসন্ন্যাসী সানন্দে, স্বেচ্ছায়, ভারতাগত অপূর্ব মনুষ্যরূপে (অদ্ভুত জীব আর নয়) প্রদর্শিত হবার চুক্তিতে সই করলেন তিন বৎসরের জন্য, কারণ তিনি ভারতকে ভালোবাসেন, ও সেই ভারতের টাকা চাই ঐহিক উন্নতি বাড়াতে!

শ্রীমতী বার্ক স্বামীজীর বক্তৃতার অনেকগুলি বিজ্ঞাপনের ছবি দিয়েছেন তাঁর বইয়ে। আমি একটির বক্তব্য তুলে দিচ্ছি। ডেট্রইট ট্রিবিউনে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারির বিজ্ঞাপন—

VIVE KANANDA,

Brahmin Monk of India

In the Costume of His Order.

Wednesday, Thursday, Saturday evenings at Unitarian Church. Tickets : Single lecture, 50 cents : Course, $ 1. For sale at Mac Farlane's and Wright & Kay's.

"Orator by Divine Right", "Giant of the Platform." "A Master of English," "Sensation of World's Parliament."

পাঠকরা দেখছেন, বিবেকানন্দ মানুষটির উপরই শুধু নয়, তাঁর নামটির উপরও কিরকম অত্যাচার করা হয়েছে। 'বিবেকানন্দ'কে আমরা ভেঙে করি—'বিবেক-আনন্দ,' ব্যাকরণ মান্য ক'রে। আমেরিকানরা ভেঙেছিল 'বিবে-কানন্দ' রূপে, ব্যবসাকে মান্য ক'রে। এ বিষয়ে চমৎকার মন্তব্য করেছেন শ্রীমতী বার্ক:

"স্বামীজী যখন মেমফিসে পৌঁছলেন তার মধ্যেই তাঁর নাম 'বিবে-কানন্দ'রূপে (Vive Kananda) প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে ফেলেছে। 'বিবেকানন্দের' মাঝ-বরাবর এই বিভাগ, এবং ঐ বিভাগের দ্বারা এক 'বিবেকানন্দে'র থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি নাম বার ক'রে নেওয়া হয়েছে, এটা মনে হয় বক্তৃতা-কোম্পানীর প্রতিভার দান। এইভাবে ভাগ করলে মনে রাখা সহজ হয়, বানান ও উচ্চারণের গণ্ডগোল কমে, এবং এটা, আধুনিক পাবলিসিটির চলতি ভাষায় বলতে গেলে, 'ভালো বক্স-অফিস'। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিশেষত অগ্রিম বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে, 'বিবে' (Vive) খসে পড়ত একেবারে এবং স্বামীজী সংবাদপত্রে এক ইঞ্চি টাইপে 'কানন্দ' (Kananda) নাম নিয়ে বিঘোষিত হতেন।"

কিন্তু টাকা বিবেকানন্দের বরাতে নেই। তিন বছরের চুক্তির চার মাস পেরোতে না পেরোতে স্বামীজী অস্থির হয়ে পড়লেন। দেখলেন নির্বোধ ভারতীয়টিকে পরমানন্দে ঠকাচ্ছে বক্তৃতা-কোম্পানী! (নির্বোধ ভারতীয়ও ধরে ফেললেন যে, যেখানে একটি বক্তৃতায় আয় হলো আড়াই হাজার ডলার, বক্তা পেলেন ২০০ ডলার মাত্র), আর, তিনি অধিকন্তু অনুভব করলেন, ভারতের ও পৃথিবীর সেবা করা সম্ভব হবেনা এই বক্তৃতা-কোম্পানীর 'দিব্য বক্তা' হয়ে। সুতরাং এবার নূতন অস্থিরতা—চুক্তিভঙ্গের জন্য। প্রভাবশালী বন্ধুদের সহায়তায়, চারমাসে যা জুটিয়েছিলেন তার প্রায় সবকিছু দণ্ড দিয়ে চুক্তির দায়মুক্ত হয়ে, আমেরিকার মুক্ত আকাশতলে প্রাণভরে শ্বাস নিলেন বন্ধনবিরোধী স্বামী বিবেকানন্দ!!

॥ পাঁচ ॥

সাধারণত স্বামীজীর যে-সমস্ত প্রচলিত জীবনী হাতে এসে পড়ে তাদের মধ্যে দেখি যে, স্বামীজীর গোটা ব্যাপারটাই অলৌকিক—ঐ অলৌকিক শক্তির জন্যই ধর্মমহাসভায় তাঁর কণ্ঠে সরস্বতী ভর করল, তিনি এক বাক্যে সারা আমেরিকাকে মাতিয়ে দিলেন, তারপরে তাঁর জয়ের রথ গড়িয়ে চলল আমেরিকায় এবং তারো পরে ভারতের পথে প্রান্তরে। গোটা ব্যাপারটাই খুব সোজা, কারণ গোটা ব্যাপারটা অলৌকিক।

শ্রীমতী বার্ক তাঁর রচনার দ্বারা আমাদের ঐ জাতীয় ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে পেরেছেন। তাঁর গ্রন্থপাঠের পরে অবশ্য শেষপর্যন্ত মনে হয় ব্যাপারটা অলৌকিকই ছিল—কারণ কোনো মানুষের পক্ষে একক এত বড়ো লড়াই চালানো সম্ভব তা বিশ্বাস হতে চায়না। বিবেকানন্দ

আমেরিকায় একটা লড়াই চালিয়েছিলেন, সেটা খাপছাড়াভাবে স্বামীজীর বিখ্যাত ইংরেজী জীবনী পড়ে জেনেছিলাম। কিন্তু সে লড়াই যে কী প্রচণ্ড হয়েছিল, যার একদিকে ছিল দলবদ্ধ জ্বালা, দংশন ও গরল—অন্যদিকে একক পুরুষসিংহ—মানবমহিমার এই অসাধারণ ইতিহাস উন্মোচন করার জন্য সকল সুস্থ মানুষের উজাড়-করা কৃতজ্ঞতা শ্রীমতী বার্ক পাবেন।

বাস্তবিক, লুই বার্কের বই পড়বার আগে বিবেকানন্দের সংগ্রামী চেহারা যথার্থ কী ছিল তা যেন কিছুই জানতাম না। শুনেছিলাম তিনি প্রচণ্ড সাহসী ছিলেন, নির্ভয় মানুষ, কিন্তু প্রমাণ কোথায়? সে প্রমাণ কি কয়েকটি তীব্র বক্তৃতা কিংবা শারীরিক সামর্থ্যের কিছু দৃষ্টান্ত? শ্রীমতী বার্ক আমাদের স্বামীজীর আসল সংগ্রামক্ষেত্রের মধ্যে নিয়ে গেছেন।

আমেরিকায় সে লড়াই হয়েছিল মূলত খ্রীস্টান মিশনারীদের সঙ্গে। তাঁদের সহায়তা করেছিলেন কিছু ভারতীয় খ্রীস্টান, কয়েকজন ব্রাহ্ম প্রচারক, ও থিয়জফিস্ট দল।

বিবেকানন্দ আমেরিকায় খ্রীস্টান মিশনারীদের অর্থসংগ্রহ ও ধর্মপ্রচারের পক্ষে বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মিশনারীরা ভগবান্ খ্রীস্টের শুভনাম প্রচারের জন্য পৃথিবীর নানাদিকে বেরিয়ে পড়তেন—নানা অসভ্য দিকে—এবং তার জন্য তাঁদের টাকা দরকার হতো। টাকা উঠত চাঁদা থেকে। যাঁরা চাঁদা দিতেন তাঁদের হৃদয় বিগলিত হতো অনালোকিত মনুষ্যগণের করুণ অবস্থায়। অবস্থা যত করুণ, তত চাঁদার স্রোত। সুতরাং ভারতের কালা মানুষগুলির অসহ্য কুসংস্কারের চেহারা হাজার-হাজার সচিত্র পুস্তকের দ্বারা লক্ষ-লক্ষ আমেরিকানের কাছে পৌঁছে, তাদের হৃদয়ে ব্যথা-বেদনার সৃষ্টি ক'রে, রৌপ্যপ্রবাহরূপে বাঁধা পড়ত মিশনারী-বাঁধে। সুন্দরভাবে সবকিছু চলছিল—অজস্র কুৎসা-গ্রন্থ, তাদের অপরিসীম জনপ্রিয়তা, কালা মানুষদের দেশে মুক্তিবাণী বাহকদের জয়যাত্রা. গায়ের কালো চামড়া ছাড়াতে না-পেরে তাদের ঐ কালো বুকেই সাদা ক্রশ ঝুলিয়ে দেওয়া—এহেন সময়ে বিবেকানন্দ নামক এই উৎপাত! তাঁর বক্তৃতা শুনে খ্রীস্টানদের কেউ-কেউ বলেই ফেললেন—এমন মানুষের দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠানো! বিবেকানন্দ আবার সেই প্রশংসাতেও সন্তুষ্ট না থেকে ভারতের যে সত্যই ভাল কিছু আছে তার ব্যাখ্যান শুরু করলেন। শুধু তাই নয়, বিশ্রীরকম স্পর্ধাভরে বলতে লাগলেন—ধর্মের দিক দিয়ে ভারত পেছিয়ে তো নেইই, বরং বহু দিকে এগিয়ে আছে। আর সেসব কথা তিনি বললেন অকাট্য বচনে, অপূর্ব ভাষণে। মিশনারীদের চাঁদার পরিমাণ পড়ে গেল বিশেষরকম।

সর্বনাশ! ব্যাপারটা যতক্ষণ ধর্মনৈতিক স্তরে থাকে বরং সহ্য করা যায়—কিন্তু অর্থনৈতিক অসুবিধা ঘটানো! সমস্ত আমেরিকার ধর্মবেদী থেকে ধূলো উঠে আকাশ ঢেকে ফেলল। বিবেকানন্দ এক নম্বর শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন মিশনারীদের কাছে। VIVE KANANDA হয়ে দাঁড়ালেন VALE KANANDA.

বিবেকানন্দ ঝঞ্ঝার মতো ধেয়ে চললেন সমস্ত আমেরিকার উপর দিয়ে। শ্রীমতী বার্ক বলেছেন, বহু দিনের সঞ্চিত মন্দ ধারণা একটি মানুষ যেন বদলে দিল এক বছরের চেষ্টায়। ভারত সম্বন্ধে এই ধারণা-বদল ব্যাপারটা কি দুঃসহ! একজন ভারতগামী আমেরিকান যখন শুনেছিলেন, তিনি ভারতে গিয়ে সতীদাহ দেখতে পাবেন না, বা জগন্নাথের রথের তলায় আত্মহত্যা দেখার সুযোগ ঘটবে না—তখন প্রচণ্ড রাগে দুঃখে তিনি বলেছিলেন—তাহলে

ঐ পোড়া দেশে আমার যাওয়া কিসের জন্য? প্রাচ্যরহস্যের তাহলে রইল কি? ইস্, কবিতাই যে নষ্ট!

অগণিত মিশনারীর সম্মুখীন বিবেকানন্দের সেই পুরুষমূর্তি দেখে চমৎকৃত হয়ে সুবিখ্যাত আবিষ্কারক হিরাম ম্যাকসিম বলেছিলেন:

"When Vivekananda spoke, they (The Missionaries) saw they had a Nepolean to deal with."

অ্যানী বেশান্ত সেই মূর্তিরই বন্দনা করেছেন:

"সন্ন্যাসী—তাঁর পরিচয়? নিশ্চয়ই। কিন্তু সৈনিক সন্ন্যাসী তিনি;—প্রথম দর্শনে বরং সন্ন্যাসীর চেয়ে সৈনিকই বেশি মনে হয়—মঞ্চ থেকে এখন নেমে এসেছেন, দেশ ও জাতির গর্ব ফুটে আছে দেহের রেখায় রেখায়, পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মের প্রতিনিধি, পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন কৌতূহলী অর্বাচীনদের দ্বারা..."

আর একটি কৌতুক-কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে একই ইতিহাস:

Called himself Kananda did he,
Put his Hindoo logic neatly,
And overthrow our force completely.
All was silence round about us—
The heathen monk, by George, did rout us—
And we were feeling rather sickly
Till other forces gathered quickly.
They rose like locusts in the air...

শ্রীমতী বার্ক এই সংগ্রাম বর্ণনাকালে তাঁর গ্রন্থের অধ্যায়গুলির নামকরণও অনুরূপ

'The Climax at Detroit', 'The Christian Onslaught.' 'Return of the Warrior,' 'Trials and Triumph,' 'The Last Battle.'

এই সংগ্রামের ব্যাপারে মহাভারতের অভিমন্যু-কাহিনী পাঠককে স্মরণ-করিয়ে দিতে চাই। অভিমন্যুকে মারবার পক্ষে সপ্ত-রথীর সমবেত 'ন্যায়'-সমর যথেষ্ট মারাত্মক হয়নি—অন্যায়-সমরের দরকার হয়েছিল। মিশনারীরা তাঁদের ভারতীয় ভ্রাতৃগণের সহায়তায় সমবেতভাবে একক বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে সেই কুরুক্ষেত্র শুরু করলেন। মিশনারীদের ভারতীয় বন্ধু? অবশ্যই। একই স্বার্থে সকলে মিলিত। দোষপূর্ণ ভারতীয় সমাজের কিছু সাধু সংস্কারক বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে মিশনারীদের সঙ্গে হাত মেলালেন। ভারতীয় সমাজের দোষের বিষয় সর্ববিদিত, তার সংস্কার অবশ্যই আবশ্যক, সংস্কার ঘটানোর জন্য সংস্কারকও

দরকার, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু উক্ত সংস্কারকগণের কি প্রয়োজন হয়েছিল বিদেশে গিয়ে স্বদেশের কুৎসা করার? নিশ্চয় সাধুতায় ও সরলতায় তাঁরা তা করেছিলেন। তাই যদি সত্য হয়, তাহলে ঐ একই সরলতা তাঁরা বিস্তৃত করেন নি কেন আমেরিকান সমাজের দোষ উদ্‌ঘাটনে?

এক্ষেত্রে বিবেকানন্দ যদি দেখিয়ে দেন সর্বদোষ সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজের ধর্মবোধ কারো থেকে কম নয়, তাহলে 'সংস্কৃত' ধর্মবাদীদের অসুবিধা হয়। এবং আরও নানা অসুবিধা হয়—অর্থনৈতিক অসুবিধা পর্যন্ত। তাছাড়া বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তা—অসহ্য! স্বামীজী বলেছিলেন, সব যায়, পোড়া হিংসেটা যায় না।

সর্বদিকে আক্রান্ত বিবেকানন্দের জীবনের সেই 'অন্ধকার যুগের' বেদনামথিত চিত্র, আহত বেদনার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন লেখিকা। ১৮৯৪ সালের জুন মাস তাঁর মতে স্বামীজীর জীবনের 'dark age'। বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে মিশনারীরা ভারত-কুৎসার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রায় প্রতিটি প্রচারবেদী ও সংবাদপত্রের কলম থেকে গরল উঠেছিল ভারতের বিরুদ্ধে। কিন্তু এতে বিবেকানন্দকে অন্তত দমানো যায়না। তখন তাঁরা শুরু করলেন বিবেকানন্দকে অন্যভাবে বিপাকে ফেলতে। মিশনারীরা অতঃপর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নাগরকার প্রভৃতির মারফত এই সংবাদ সংগ্রহ ক'রে ফেললেন যে, বিবেকানন্দ নিজেকে এখন সন্ন্যাসী বলে প্রচার করছে, সেটা একদম মিথ্যা, সে আসলে ভ্যাগাবন্ড ছোঁড়া, আমেরিকায় এসে গেরুয়া চড়িয়েছে, সে কারও প্রতিনিধি নয়। বিবেকানন্দ আত্ম-প্রতিনিধি! কথাটা বড় আপত্তিকর ঠেকল আত্মনির্মিত, কৌলীন্যবিরোধী আমেরিকানদের কাছে। স্বামীজী ভাবলেন, এ নিন্দা এখনি দূর করা যাবে, কারণ, যে-মাদ্রাজীরা আমাকে আমেরিকায় পাঠিয়েছে, তারাই আমার সার্টিফিকেট পাঠাবে, এবং যে-কলকাতায় আমার জন্ম, সেখানকার মানুষ তাদের ধর্মের জন্য এত করেছি এই কৃতজ্ঞতায় অন্তত আমার কাজ সমর্থন করতে দেরী করবে না।

হায়! বিবেকানন্দ কত অল্প জানতেন তাঁর দেশবাসীকে—৬ বছর পায়ে হেঁটে সারা ভারত বেড়িয়েও! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কাটতে লাগল—এক টুকরো সমর্থনের কাগজ এসে পৌঁছল না স্বামীজীর কাছে। ভারত তখন স্বামীজীর গৌরবে মগ্ন, তাঁর প্রতি দায়িত্বের ঝঞ্ঝাট নিয়ে ঐ সুখনিদ্রায় বিঘ্ন ঘটাতে সে রাজি নয়। এদিকে মিশনারী ও মজুমদার, শুধু 'পূর্বতন ভ্যাগাবন্ড'—এই আখ্যাদানে খুশি না হয়ে আরও মুখরোচক—'ইদানীং চরিত্রহীন'—কথাটা ছড়াতে লাগলেন। তাঁরা বিবেকানন্দের বন্ধুদের প্রতি প্রীতিতে অস্থির হয়ে তাঁদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ঐ জঘন্য মানুষটি সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে আসতে লাগলেন। বিবেকানন্দের 'বন্ধু' শুধু আমেরিকায় নয়, ভারতেও কিছু আছে। পত্রযোগে সেখানেও শুভসংবাদ পৌঁছতে লাগল। তারপর সাত সমুদ্র পার হয়ে সশরীরে দেশে ফিরে কেউ-কেউ স্বীয় পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতাকে আকর্ষক করবার জন্য বিখ্যাত ভারতীয়ের কীর্তিকাহিনী মহাসুখে প্রচার করতে লাগলেন। বিবেকানন্দ বুকের রক্ত তুলে আমেরিকায় গিয়েছিলেন দেশের হিত করতে ও সত্য জানাতে—তিনি দাঁড়ালেন মিথ্যাবাদী! অতি শুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী হয়েও প্রচারগতিকে হয়ে দাঁড়ালেন চরিত্রহীন!!

বিবেকানন্দের এই কালের অন্তর্দহন তাঁরই কথায় দেখানো যায়। তাঁর ২৯শে জুনের চিঠির কয়েক লাইন—

"Every moment I expected something from India. No, it never came. Last two months especially I was in torture every moment. Not even a newspaper from India! My friends waited—waited month after month, nothing came, not a voice." (আলাসিঙ্গাকে লেখা—২৯শে জুন, ১৮৯৪)

কোনো একটি মানুষের ঈর্ষাকলুষিত নিষ্ঠুরতায় অন্য একটি মানুষের কী অপরিসীম যন্ত্রণা ঘটে তার রক্তচ্ছবি ফুটেছে নিম্নের কয়েক লাইনে—

"I do not care what they even of my own people, say about me—except for one thing. I have an old mother. She had suffered much all her life, and in the midst of all she could bear to give me up for the service of God and man—but to have given up the most beloved of her children—her hope—to live a beastly immoral life in a far distant country—as Mazoomder was telling in Calcutta—would have simply killed her." (ইসাবেলা ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লেখা—২৬ এপ্রিল, ১৮৯৪)

শ্রীমতী বার্ক পরম দুঃখের সঙ্গে বেদনাময় ইতিহাসকে উদ্‌ঘাটিত করতে বাধ্য হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শেষ করছি বিখ্যাত আমেরিকান কবি এলা হুইলার উইলকক্সের স্বামীজী সম্বন্ধে একটি উক্তি দিয়ে—

"It would be surprising to me that people could misunderstand or malign such a soul if I do not know how Buddha or Christ were persecuted and lied about by small inferiors." [May, 1895]

॥ ছয় ॥

কিন্তু বিবেকানন্দ যখন বাইরে লড়াই চালাচ্ছেন, এমনকি যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, তখনো অন্তরের সুগভীর অংশে সর্বাধিক শান্ত। অন্ধকারের অন্তর্লীন সেই অন্তরজ্যোতির কথা বলতে লেখিকার ভুল হয়নি। এইখানেই তাঁর বড়ো কৃতিত্ব—তিনি কখনো ভুলে যাননি যে, বিবেকানন্দ মূলে অধ্যাত্মচরিত্র। বিবেকানন্দের 'ডায়ন্যামিক' বিশেষণ তাঁর স্বভাব ও ব্যবহার সম্বন্ধে যে-ধারণাগত ভ্রান্তি ঘটায়, তাকেও লেখিকা দূর করেছেন। ডায়ন্যামিক তিনি, নিশ্চয়ই, কিন্তু 'এক্সপ্লোসিভ' নন। স্বামীজীর পত্র থেকে অংশ তুলে লেখিকা দেখিয়েছেন, ঈশ্বরসান্নিধ্যের কী অপূর্ব কাব্য তিনি রচনা ক'রে চলেছেন যখন দুর্ভাগ্যের রূপ দেখে মনে হয়, বুঝি ঈশ্বর তাঁকে ত্যাগ ক'রে গেছেন।

বিবেকানন্দের এই পরমহংস-স্বরূপকে—ঈশ্বরাদিষ্টের ভূমিকাকে—লেখিকা ঘটনার পর ঘটনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। আশ্চর্যজনক সেই সব কাহিনী, বিদ্যুৎ-চমকের মতো তা মানুষের

অন্তর্জীবনের রহস্যে আলোকসম্পাত ক'রে তার গভীরে আমাদের ব্যগ্র নয়নকে আকৃষ্ট করে। আমি দুটি ঘটনার উল্লেখ করব, যেগুলি বহির্গতভাবেও বিশেষ চমকপ্রদ। প্রথম ঘটনাটি বিখ্যাত আমেরিকান ধনকুবের ও দানবীর জন ডি রকফেলার সংক্রান্ত।

"স্বামীজী তখন শিকাগোয় মিঃ 'এক্স'-এর শিকাগোর বাড়িতে ছিলেন। মিঃ এক্স, জন ডি রকফেলারের সঙ্গে কোনো এক ব্যবসায়ের সূত্রে জড়িত ছিলেন। বহু সময়ই রকফেলার 'অপূর্ব অত্যাশ্চর্য' হিন্দুসন্ন্যাসীর সম্বন্ধে তাঁর বন্ধুদের কথা বলতে শুনেছিলেন, এবং বহু সময়ই স্বামীজীর সঙ্গে তাঁকে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, তিনি সকল সময়েই সাক্ষাতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। সে সময়ে রকফেলার তাঁর সৌভাগ্যের সর্বোচ্চ শিখরে ওঠেন নি, তবু তখনি তিনি যথেষ্ট শক্তির অধিকারী। এই দৃঢ়চেতা মানুষটিকে ইচ্ছামত নাড়ানো যেতনা এবং উপদেশ শুনবার পাত্রও তিনি ছিলেন না।

"কিন্তু একদিন রকফেলার, স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের যদিও কোনো ইচ্ছা তাঁর ছিলনা, তবু কোনো এক আকর্ষণে চালিত হয়ে বন্ধুর বাড়িতে সোজা চলে এলেন এবং যে-বাটলার দরজা খুলে দিল তাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, তিনি হিন্দুসন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

"বাটলার স্বামীজীর অবস্থানকক্ষে তাঁকে নিয়ে গেলে বিনা ঘোষণায় রকফেলার সংলগ্ন পাঠকক্ষে ঢুকে পড়লেন। এবং তিনি বিশেষ বিস্মিত হলেন যখন দেখলেন, কে এসেছে দেখবার জন্য স্বামীজী লেখার টেবিল থেকে চোখ পর্যন্ত তুললেন না!

"কিছু পরে স্বামীজী, মাদাম কালভেকে যেমন বলেছিলেন, তেমনি রকফেলারকেও তাঁর অতীতের অনেক কথা বলে গেলেন, যা স্বয়ং রকফেলার ছাড়া আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, যে-টাকা তিনি ইতিমধ্যে অর্জন করেছেন, তার মালিক তিনি নন, তিনি নিমিত্ত মাত্র—পৃথিবীর মঙ্গল করাই তাঁর কর্তব্য—ভগবান তাঁকে সম্পদ দিয়েছেন, যাতে ক'রে তিনি মানুষকে সেবা ও সাহায্য করতে পারেন।

"রকফেলার বিরক্তিতে ও অস্বস্তিতে পড়লেন—তাঁর সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে বা তাঁকে উপদেশ দিতে পারে, এমন সাহস! তিক্ত মনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময়ে বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত করলেন না। কিন্তু প্রায় সপ্তাহখানেক পরে আবার বিনা ঘোষণায় স্বামীজীর পাঠকক্ষে তিনি প্রবেশ করলেন, এবং স্বামীজীকে পূর্ববৎ উপবিষ্ট দেখে ডেস্কের উপরে একটা কাগজ ছুঁড়ে দিলেন, যার মধ্যে জনহিতকর একটি প্রতিষ্ঠানে বিপুল অর্থদানের পরিকল্পনা লিখিত আছে।

" 'আপনার কথামতই কাজ হয়েছে, খুশী হলেন তো? আশাকরি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন'—রকফেলার বললেন।

"স্বামীজী চোখও তুললেন না, নড়লেনও না। তারপর কাগজটি নিয়ে শান্তভাবে পড়ে বললেন, 'আপনার আমাকেই ধন্যবাদ জানানো উচিত।'

"এইখানে শেষ। এবং এইটেই জনকল্যাণে রকফেলারের প্রথম বড় দান।"

রকফেলার-সংক্রান্ত এই কাহিনীর চেয়েও অনেক বেশি গভীর জীবনরসময় একটি

কাহিনী পাচ্ছি মাদাম কালভের ক্ষেত্রে। মাদাম কালভে ফরাসিনী, তখনকার পাশ্চাত্য পৃথিবীর সেরা অপেরা গায়িকা—তিনি স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। মাদাম কালভে তাঁর আত্মজীবনীতে স্বামীজীর অপূর্ব স্মৃতিকথা রেখে গেছেন। বিবেকানন্দের মধ্যে ঈশ্বরপুরুষকে দর্শন ক'রে 'ঈশ্বর-জানিত বিবেকানন্দের' শিষ্যত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজীর সংস্পর্শে প্রথম আসার যে-কাহিনী মাদাম কালভে পরবর্তীকালে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন, সেটিও মনোহারী, কিন্তু শ্রীমতী বার্ক জানিয়েছেন—মাদাম কালভে গোটা কাহিনীটি বলেন নি। সেই পূর্ণ কাহিনী তিনি বলেছিলেন ঘটনাটি ঘটে যাবার পরেই তাঁর বান্ধবী মাদাম পল ভার্দিয়ে-র কাছে। মাদাম ভার্দিয়ে তখনি ঐ ঘটনার যে-নোট রাখেন, সেই নোটটি শ্রীমতী বার্ক উপস্থিত করেছেন। ঐ নোট থেকে যে-ঘটনাকে পাচ্ছি—সে যেন কোনো এক মহান সাহিত্য—বেদনা ও পাবনের গদ্যকাব্য। আমি এখানে শ্রীমতী বার্কের রচনা উপস্থিত করছি:

"বেশ বোঝা যায়, ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে, যখন এমা কালভে মেট্রোপলিটান অপেরা কোম্পানীর সঙ্গে শিকাগোয় আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। ঐসময়ে তিনি সামর্থ্যের শিখরে, সদ্য ইউরোপ ও নিউইয়র্কে কার্মেনের ভূমিকায় অসামান্য সাফল্য অর্জন ক'রে এসেছেন। পৃথিবী তখন তাঁর পায়ের তলায়, সমাজের মাথা-মানুযেরা তাঁকে আপ্যায়ন করছেন। স্বামীজী ঐকালে যাঁদের বাড়িতে আছেন (খুব সম্ভব হেল পরিবারে নয়) তাঁদের সঙ্গে কালভের বন্ধুত্ব হয়েছে। দুই মহাদেশের মাথার মণি এমা কালভে কিন্তু সুখী হবার মতো স্বভাব নিয়ে আসেন নি। প্রবল আবেগপ্রবণ, উষ্ণমস্তিষ্ক, বাসনাময় কালভে প্রায়ই হৃদয়-ঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তেন। ঐ জাতীয় ব্যাপারের মধ্যে সবচেয়ে গভীর একটি হৃদয়ঘটিত ব্যাপারের বেদনাময় সমাপ্তি ঘটেছে সম্প্রতি। নিঃসঙ্গতায় ভরে আছে তাঁর মন। একমাত্র সান্ত্বনা তাঁর কন্যা, যে শিকাগোয় তাঁর সঙ্গে এসেছে, যাকে বুকজোড়া ভালবাসায় তিনি আঁকড়ে রাখতে চান। এবার আমি মাদাম ভার্দিয়ে-র নিজের কথা তুলে দিচ্ছি, কারণ তার মধ্যে মাদাম কালভের মুখের কথা যথাসম্ভব বজায় আছে।

কালভে আমাকে বলেছিলেন, অপেরায় একদিন সন্ধ্যায় তিনি যখন কার্মেনের গান গাইছেন তখন তাঁর সুর এত মধুর হয়ে উঠল যা পূর্বে কখনো হয়নি; থিয়েটারে যেতে সেদিন যদিও তিনি নার্ভাস বোধ করেছিলেন, তবু প্রথম অঙ্কের পরে তাঁর ভূমিকা অভূতপূর্ব সাফল্যের অভিনন্দন লাভ করল।
প্রথম বিরতির পরে কালভে সহসা যেন দারুণ ভগ্নশ্রান্ত হয়ে পড়লেন, ভাবলেন, দ্বিতীয় অঙ্কে নামতে পারবেন না। তবু বিশেষ চেষ্টায় তিনি নিজেকে তৈরী ক'রে নিলেন, এবং যদিও তাঁর মনে হয়েছিল যে, গাইতে পারবেন না, তবু গাইলেন অপূর্ব কণ্ঠে। দ্বিতীয় অঙ্কের পরে ড্রেসিংরুমে এসে তিনি প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়লেন; ম্যানেজারকে ঘোষণা ক'রে দিতে বললেন, তিনি অসুস্থ। তিনি পূর্বের থেকেও নিজেকে মানসিকভাবে বিধ্বস্তবোধ করতে লাগলেন, নিশ্বাস নিতেও তাঁর যেন কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু ম্যানেজার ও সেখানকার অন্য সকলে তা সত্ত্বেও এত জোর

করতে লাগলেন যে, অবশেষে তাঁকে স্টেজে যেতেই হল। শেষ অঙ্কে তো তাঁকে কার্যত ধরাধরি ক'রে স্টেজে নিয়ে যেতে হয়েছিল। কালভে আমাকে বলেছিলেন যে, এই অনুষ্ঠান শেষপর্যন্ত চালিয়ে যেতে তাঁকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল। কালভে আরও বলেছিলেন, এই দিনই জীবনের সেরা গান তিনি গেয়েছিলেন, আর শ্রোতারাও অভূতপূর্ব অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু অভিনয় শেষ হওয়া মাত্র, শ্রোতাদের অভিনন্দনের অপেক্ষা না করেই, তিনি ড্রেসিংরুমে ছুটে চলে এসেছিলেন—সেখানে দেখলেন ম্যানেজার ও কয়েকটি লোক দাঁড়িয়ে আছে বিষণ্ণ মুখে—কালভে বুঝলেন, মর্মান্তিক কিছু ঘটেছে।

ট্রাজিক ঘটনা হল, তাঁর কন্যা সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর বন্ধুর বাড়িতে ছিল—সে মারা গেছে—পুড়ে মারা গেছে—যখন কালভে কার্মেনের গান গাইছিলেন। কালভে লুটিয়ে পড়লেন।

তারপর একটা সময় এল যখন কালভে চাইলেন আত্মহত্যা করতে। তাঁর বান্ধবী শ্রীমতী 'ক' এই সময় তাঁর সঙ্গে সর্বসময় থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতেন, আর বার বার অনুরোধ জানাতেন, তাঁর বাড়িতে এসে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কালভে প্রতিবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। কালভে আমাকে বলেছিলেন, তাঁর একমাত্র চেষ্টা তখন হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করা। তিনবার তিনি ঐ উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে হ্রদের দিকে গেছেন, তিনবারই, যেন কিসের ঘোরে, স্বামীজীর বাড়ির পথ ধরেছেন। কালভে বলেছেন, সে যেন হঠাৎ স্বপ্ন থেকে জাগরণ। প্রতিবারই তিনি বাড়ি ফিরে এসেছেন। অবশেষে, চতুর্থ কি পঞ্চম বারে তিনি দেখলেন যে, তাঁর বান্ধবীর বাড়ির সদর দরজার সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আর বাটলার দরজা খুলে দিচ্ছে। প্রবেশ ক'রে ভিতরের ঘরে একটা চেয়ারে তিনি ডুবে বসে পড়লেন। সেখানে কিছু সময় তিনি যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে রইলেন, তারপরে ঠিক পাশের ঘর থেকে এক আহ্বানের স্বর শুনলেন, 'বৎসে, এখানে এস। ভয় নেই কিছু।' কালভে যন্ত্রবৎ উঠে পাশের ঘরে গেলেন, সেখানে স্বামীজী একটা বড় টেবিলের ওধারে বসেছিলেন।"

স্বামীজীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ, স্বামীজীর অধ্যাত্মশক্তিতে তাঁর সান্ত্বনা ও শান্তিলাভ এবং স্বামীজীর দলবলের সঙ্গে পরবর্তী ভ্রমণাদির বিস্তৃত স্মৃতিকথা মাদাম কালভে স্বয়ং লিখে গেছেন। সে স্মৃতিকথা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই, স্বামীজীর সকল বড় জীবনীতে তা পাওয়া যাবে, কিন্তু শ্রীমতী বার্ক যেটি বলতে চেয়েছেন তা হলো, এ-রকম ঘটনা অজস্র ঘটেছে আমেরিকায়, প্রফেটদের জীবনে এরকম ঘটনা অজস্র ঘটেই থাকে, লিপিবদ্ধ হয় অল্পই। কিন্তু এক মহিলার শ্রদ্ধাকোমল উক্তি এই প্রসঙ্গের শেষে উদ্ধৃত না ক'রে পারছি না।

স্বামীজী তখন ডেট্রইটে; তাঁর বক্তৃতার বন্যাশক্তিতে শহর প্লাবিত। এই কালের একটি ঘটনা বলেছেন মহিলা-কবি মিসেস চার্লস ইরস্‌কিন স্কট উড। সে ঘটনা হচ্ছে—মিস্ মার্গারেট কুক নামে এক জার্মান শিক্ষিকা স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন। মিস্ কুকের কঠোর জার্মান স্বভাব আবেগের ধার ধারেনা। কিন্তু স্বামীজীর শক্তিতে তিনি এমনই অভিভূত হলেন যে, জীবনে প্রথম তাঁর ইচ্ছা জাগল বক্তাকে অভিনন্দিত করবেন। বক্তৃতান্তে

স্বামীজীর সঙ্গে করমর্দন করতে এগিয়ে গেলেন। করস্পর্শ ক'রে তিনি এতই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, তাঁর সব কথা হারিয়ে গেল। স্বামীজী কয়েক মুহূর্ত তাঁর হাত ধরে রইলেন। মিস্ কুক মিসেস উডকে বলেছিলেন পরবর্তী কালে—'আমি সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে কখনো ভুলব না। তার বিরাটত্ব আর পবিত্র মহিমা আমাকে এমন গ্রাস ক'রে ফেলল যে, আমি তাঁর স্পর্শপূত হাত তিন দিন পর্যন্ত ধুতে পারলুম না।'

॥ সাত ॥

সর্বশেষ প্রসঙ্গে এসে গেছি। আগেই বলেছি, শ্রীমতী বার্ক এই গ্রন্থে স্বামীজীর মত-বিষয়ে একটি নূতন থীসিস উপস্থিত করেছেন, এবং তার উপর এই গ্রন্থের মূল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। অবশ্য আমরা স্বামীজী সম্পর্কে নানা অজানিত তথ্যের আবিষ্কারকে গৌণমূল্য করছি না, সেই 'উৎস'-তথ্যগুলি পরবর্তী লেখকদের পরম সহায়ক হবে, কিন্তু আমার বলবার কথা এই, শ্রীমতী বার্ক এখানেই না থেমে, তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যের উপর নির্ভর ক'রে, স্বামীজীর মনোজগতে আলোকসম্পাত করতে পেরেছেন আশ্চর্য মনস্বিতায়। তার ফলে তিনি স্বামীজী-জীবনের তথ্যদাতা ও ব্যাখ্যাতা দুইই হতে পেরেছেন।

স্বামীজীর কার্যধারা সম্বন্ধে নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন লেখিকা এইসব তথ্যের আবিষ্কারের পূর্বেই বোধ করেছিলেন। লেখিকার মতে, স্বামীজীর জীবনীর যে-কোনো অভিনিবিষ্ট পাঠকই সেই প্রয়োজন অনুভব করবেন। স্বামীজী, দেখা যাবে যে, ধর্মমহাসভার পরে বৎসরখানেক আমেরিকার চতুর্দিকে ঝড়ের মতো বক্তৃতা ক'রে বেড়িয়েছিলেন। বক্তৃতা-কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পরেও তাঁর বক্তৃতাগতি বেশ কিছুদিন অব্যাহত ছিল। কেন? স্বামীজী নিজের কষ্টের কথা বেশি বলতেন না, তবু বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ-পরিশ্রম অমানুষিক। বরফ-ঢাকা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে রাত একটা-দুটো পর্যন্ত তিনি ট্রেনে ভ্রমণ করেছেন—এইভাবে একই দিনে দুই জায়গায় বক্তৃতা করার জন্য কয়েক শো মাইল ছুটেছেন —ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের কথা না-ভেবে যে-কোনো আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন—কেন? ১৮৯৪ সালে তাঁর তখন পূর্ণ শক্তির কাল—কেন তিনি জীবনের এই সেরা বছরে নিজেকে উজাড় ক'রে দিলেন আমেরিকার শহরে শহরে—এ-প্রশ্ন স্বভাবতই লেখিকার মনে জেগেছে। স্বামীজীর বিখ্যাত ইংরেজী জীবনীতে তিনি এই উত্তর পেয়েছেন—স্বামীজী ভারতের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে, ভারতের সম্বন্ধে মিশনারী-প্রচারিত ভুল ধারণা দূর করতে, এবং আমেরিকান শ্রোতাদের কাছে হিন্দুধর্মের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে, একাজ করেছিলেন। দুঃখের হাসিতে পূর্ণ হয়ে লেখিকা প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছেন:

> "এইসব কথা শুনে আমরা এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হই যে, বিবেকানন্দের মতো প্রথম থাকের জ্যোতির্ময় মুক্তপুরুষ তাঁর সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করেছেন ভারতের জন্য টাকা জোগাড় করতে, আমেরিকার লোকের কাছে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুরীতি ব্যাখ্যা করতে এবং শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দান করতে—যে শ্রোতাদের বড় অংশ অজ্ঞান, গোঁড়া এবং নির্বোধ!"

দুঃখের সঙ্গে হলেও দৃঢ়ভাবে লেখিকা এক্ষেত্রে স্বামীজীর জীবনীকারদের ব্যর্থতা তুলে ধরেছেন। তাঁরা অনেক সময়ই স্বামীজীর জীবনের গভীর দিকে দৃষ্টি দেননি। স্বামীজীর বহিরঙ্গ কাজের প্রতি জোর দিয়ে তাঁরা তাঁকে দেশপ্রেমিক ও সমাজনায়ক ক'রে তুলেছেন। স্বামীজী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ভুলে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণপন্থীরা এমনকি একথাও বলেছেন—স্বামীজী, রামকৃষ্ণ মিশনের বহিরঙ্গ কার্যাবলীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যেরা নিয়েছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিকতা বিস্তারের ভার। এবং বিবেকানন্দ নাকি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত না হলে ভারতের প্রথম পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা হয়ে দাঁড়াতেন—এহেন অদ্ভুত কথা স্তম্ভিত হয়ে শুনেছেন লেখিকা। তারপর তিনি মধুরভাবে প্রশ্ন করেছেন, ভারতবাসীর কাছে না-হয় বিবেকানন্দের দেশপ্রেম বড় হতে পারে, কিন্তু একজন আমেরিকানের কাছে তার মূল্য কী? সে যদি মানবজীবনে দেশপ্রেমের মূল্য স্বীকার করেও, তবু বিবেকানন্দের দেশহিতৈষণা কি তার কাছে অল্প গুরুত্বের বস্তু নয়? শ্রীমতী বার্ক না জানিয়ে পারেন নি, স্বাধীনতার পরে ভারতের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর কাছেই বিবেকানন্দের দেশপ্রেম তার গুরুগৌরব হারিয়ে ফেলবে।

তাহলে? স্বামীজীর আমেরিকা-ব্যাপ্ত ধাবমান বক্তৃতাধারার কোন্ সঙ্গত কারণ লেখিকা দেখাচ্ছেন? বিবেকানন্দের অন্য জীবনীকারদের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কোন্ সার্থক উত্তর তিনি উপস্থিত করেছেন?

স্বীকার করতেই হবে অপূর্ব উত্তর দিয়েছেন লেখিকা। গভীর শ্রদ্ধা ও ধ্যানের ভিতর থেকেই এমন একটা উত্তর বেরিয়ে আসে। লেখিকা বলেছেন—'নতুন মহাদেশ আমেরিকায় বিবেকানন্দ হলেন প্রথম ঈশ্বরাদিষ্ট পুরুষ'—তাই তাঁর ঐ ব্যাপক ভ্রমণ।

লেখিকা ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন—ঋষিদের জীবনে থাকে দুটি কর্মস্তর। এক স্তরে তাঁরা সচেতন, যেখানে বহিরঙ্গ দায়িত্বপালনে নিযুক্ত আছেন। অন্য স্তরে তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতে নিজেদের বিতরণ করেন। ঈশ্বরচালিত বিবেকানন্দ যখন কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি ক'রে বা তার পরে, স্বেচ্ছায় চতুর্দিকে বক্তৃতা ক'রে বেড়িয়েছেন, তখন তিনি জানতেন, তিনি ভারতের জন্য অর্থসংগ্রহ করছেন, ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমেরিকানদের ভ্রান্তি দূর করছেন—ঠিক তখনি বিবেকানন্দের ঈশ্বর জানতেন, তাঁর পুত্র আমেরিকার শহরে প্রান্তরে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে বক্তৃতাচ্ছলে উপস্থিত হয়ে আলো ছড়াচ্ছেন সূর্যের মতোই, যে-সূর্য আলো দেয়, এবং দেবার সময়ে স্থান কাল পাত্র বিচার করেনা।

লেখিকার সিদ্ধান্ত, ১৮৯৩ সালের শেষভাগ থেকে ১৮৯৪ সালের শেষভাগ পর্যন্ত সমগ্র আমেরিকাব্যাপী স্বামীজীর বক্তৃতা-সফর বাইরে থেকে পরিকল্পনাহীন বলে মনে হলেও ঊর্ধ্বতর ঐশ্বরিক পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং এই এক বৎসর তাঁর জীবনের গুরুত্বহীন সময় তো নয়ই, পরন্তু শ্রেষ্ঠ গুরুত্বে পূর্ণ।

স্বামীজীর কর্মধারা সম্বন্ধে লেখিকার যে নতুন বক্তব্যের কথা আগে বলেছি, এটি তার সূচনা-অংশ। মূল বক্তব্যে আসা যাক।

এ-বিষয়ে এক কথায় বলা যায়, লেখিকা স্বামীজীর ভাব ও কর্মধারার ক্রমবিকাশের রূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন। অবশ্য সমস্ত ভাবধারার নয়—একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের।

চিন্তাশীল পাঠক স্বামীজীর গ্রন্থাবলী ও জীবনী পড়বার সময়ে সাধারণত দুটি জিনিস লক্ষ্য

করেন, এক, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী উক্তির উপস্থিতি, দুই, ধারণার ক্রমবিকাশের অভাব। প্রথম বিষয়টি বহুল আলোচিত, এবং এখানে একটি কথা বললেই যথেষ্ট হবে, বিবেকানন্দের আপাত-বিরোধী বক্তব্যগুলি গভীর স্তরে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত, এবং সেগুলি অনেক সময়ে একই বক্তব্যের নানামুখী দিক।

কিন্তু স্বামীজীর চিন্তার ক্রমবিকাশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে কিনা সন্দেহ। এই বিষয়ে আলোচনা না-হবার কারণ অনুমান করা যায়। প্রথমত সর্বসমক্ষে 'প্রথম আবির্ভাবেই' বিবেকানন্দ বিজয়ী বীর। অনুভূতি ও মনীষার ব্যাপারে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঐ 'প্রথম আবির্ভাবেই' এমনভাবে উদ্‌ঘাটিত হলো যে, সকলেই পূর্ণ পরিণত প্রতিভারূপে তাঁকে স্বীকার ক'রে নিলেন—তাঁর মাত্র ৩০ বৎসর বয়স সত্ত্বেও। ঐ ৩০ বৎসর আর মাত্র ৯ বৎসর বৃদ্ধি পাবে—তার পরেই ঊনচল্লিশে অবসান—এবং সেই নয় বৎসর বিবেকানন্দের স্বীকৃত আচার্যত্বের কাল। ঐকালে ক্রমবিকাশ ব্যাপারটা প্রত্যাশিত নয়। সুতরাং যদি ৩০ বৎসরে পূর্ণ প্রকাশের পূর্ববর্তীকালে স্বামীজীর চিন্তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য, বা তাঁর ঐকালে লিখিত রচনা, যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যেত, তাহলে তাঁর ভাবের ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনায় অসুবিধা হতো না, কিন্তু ৩০ বৎসরের পূর্বে তাঁর রচিত কিছু পত্র এবং তাঁর সম্বন্ধে পরবর্তীকালে কথিত কিছু স্মৃতিকথা ছাড়া খুব বেশি কিছু পাওয়া যায়না। ফলে বিশ্লেষণও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

অবশ্য আমি এখানে নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দে রূপান্তরের ব্যাপারটি বাদ দিচ্ছি। কৈশোর-যৌবনে ইউরোপীয় দর্শন-প্রভাবিত তাঁর নাস্তিকতা বা অজ্ঞেয়বাদ কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়, সে ইতিহাসকে ধরছি না। সেই আমূল পরিবর্তনকে 'ক্রমবিকাশ' না বলাই ভালো। (যদিও একথা স্বীকার্য, নরেন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের সকল সংশয় আস্তিক্যের গভীর জিজ্ঞাসা-সঞ্জাত)। আমি এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরবর্তী ক্রমবিকাশের কথাই বলছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে বিবেকানন্দের ভারতভ্রমণ; এই সময়টি তাঁর আত্মগঠনের কাল। আত্মগঠন এই অর্থে—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে যে-আত্মাকে পেয়েছিলেন তার দেহগঠন করেছেন এইকালে। স্বামীজীর পত্রাদি সন্ধান করলে দেখব, পরিব্রাজক জীবনের প্রথম দিকে তীব্র বৈরাগ্য—ক্রমে সেই বৈরাগ্যের সঙ্গে তীব্র মানবপ্রেমের সংযোগ। এরই চূড়ান্ত পরিণতি কন্যাকুমারিকার ধ্যানসিদ্ধান্তে—'বাঁচতে গেলে রুটি চাই'।

রুটি চাই—এই তাগিদ তাঁকে আমেরিকায় টেনে নিয়ে গেল। আমেরিকায় যাওয়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য তাই। সেই প্রাথমিক উদ্দেশ্য কিভাবে ক্রমপরিবর্তিত হয়ে স্বামীজীর সর্বশেষ ও সর্বোত্তম জীবনোদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে—সেই তত্ত্বই তথ্যযোগে উপস্থিত করেছেন লেখিকা। এবং একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়, তাঁর পূর্বে এই বক্তব্যকে কেউ এইভাবে উপস্থিত করেন নি।

লেখিকার সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে দাঁড়ায়—১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগের আগে আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারের অভিপ্রায় স্বামীজীর মধ্যে জাগেনি। কিন্তু এই সামান্য কথা-কটির মধ্যে এমন কি বড় বক্তব্য আছে? আমরাও তো স্বামীজীর প্রচলিত জীবনীতে পড়েছি, প্ল্যাটফর্ম-বক্তৃতার অসারতা উপলব্ধি ক'রে স্বামীজী ১৮৯৫ সালের গোড়ার

দিকে মনস্থ করেন, এবার তিনি ক্লাস ক'রে বেদান্ত ও যোগপদ্ধতি ইত্যাদি শেখাবেন।

বিবেকানন্দের জীবনী-সাহিত্যে শ্রীমতী লুই বার্কের বড় দান এইখানে—প্রচলিত জীবনীতে সাধারণ একটা তথ্যরূপে উল্লিখিত জিনিসটির অন্তর্নিহিত অতি গভীর তাৎপর্য তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন—স্বামীজীর মূল জীবনোদ্দেশ্যের সঙ্গে যা যুক্ত।

শ্রীমতী বার্ক তাঁর সিদ্ধান্তকে অতি সংক্ষেপে যেভাবে হাজির করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে—স্বামীজী ১৮৯৪ সালের শেষভাগ থেকে 'বেদান্ত'-প্রচার করতে মনস্থ করেন। অথচ আমরা জানি, তার অনেক আগে থেকেই তিনি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম প্রচার করছেন, আর হিন্দুধর্ম মানেই তো বেদ-বেদান্ত!

তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—শ্রীমতী বার্ক 'বেদান্ত' শব্দকে বিশিষ্টার্থে ধরেছেন। কী সে অর্থ?

এ-বিষয়ে শ্রীমতী বার্ক এক জায়গায় লিখেছেন—

"It was a complex and profound idea, involving an intimate and mature knowledge of the characteristics and needs of the Western mind. As Swamiji later conceived it, Vedanta was the one unifying force of all the diverse religious, philosophical and cultural outlooks of man. He made it the philosoply of all religions, the ultimate goal of science, the justification of all social, moral, psychic and philosopical efforts of man to realise his own glory, and he made it also the method by which that glory, might be fully attained. Vedanta, as he cenceived it, was India's saving gift to the world."

এর অর্থ, 'বেদান্ত' স্বামীজীর ক্ষেত্রে অর্থব্যাপ্তি লাভ করেছে। আগে বেদান্ত ছিল অদ্বৈততত্ত্বের সমার্থক, কিংবা উপনিষদপ্রোক্ত দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মতের সমাহার;—স্বামীজী নিজ বেদান্তের মধ্যে ঐ সকল প্রত্যয়কে গ্রহণ করার পরেও তার অধিকতর ভাবপ্রসার ঘটালেন—তা শুদ্ধ ধর্মের বা আধ্যাত্মিকতার প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়াল, যার মধ্যে কেবল ধর্মতত্ত্বই নয়—ঐ ধর্মকে প্রাপ্তির পন্থাও নির্দেশিত। সুতরাং বিবেকানন্দের বেদান্তের মধ্যে যোগমার্গ এসেছে, এবং এসেছে সাংখ্যদর্শন, এসেছে বিজ্ঞান ও মিস্টিসিজম। ফলে বেদান্ত হয়ে দাঁড়াল বিবেকানন্দের বিশ্ববাণী, আধুনিক ও আগামী মানুষের উদ্দেশ্যে।

শ্রীমতী বার্ক বলতে চান, উপরের অর্থে বেদান্ত শব্দের প্রয়োগ স্বামীজী প্রথমাবধি করেন নি। তিনি আমেরিকাকে বদলে দিয়েছিলেন বক্তৃতার দ্বারা, এবং বক্তৃতাকালে আমেরিকার ও বিশ্বের প্রয়োজন বুঝে নিজেও বদলে গিয়েছিলেন আইডিয়ার ব্যাপারে। ঐ আইডিয়ার সর্বশেষ পরিণতি 'বেদান্তে'।

শ্রীমতী বার্ক দীর্ঘ আলোচনায়, তন্নতন্ন ভাবে তথ্যবিচার ক'রে নিজ মত প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। আমি এখানে সামান্যভাবে তার সারসংক্ষেপ করতে পারি মাত্র।

পুরনো প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দিই। স্বামীজীর আমেরিকায় যাওয়ার মূল দুটি উদ্দেশ্য ছিল—১) ভারতের জন্য টাকা তোলা, ২) হিন্দুধর্মের যথার্থ রূপ জানানো। এখানে সমগ্র বিশ্বের জন্য কোনো মেসেজের কথা নেই।[১]

সেই মেসেজ কখন কিভাবে এল, তা নির্ণয়ের একমাত্র উপায় তাহলে ঐ মেসেজের পূর্ণতালাভের পূর্ববর্তী স্বামীজীর রচনা ও বক্তৃতাদি বিশ্লেষণ করা। শ্রীমতী বার্ক তাই করেছেন।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের সূচনায় স্বামীজীর 'বেদান্ত' পরিণতি লাভ করার পূর্বে আমেরিকায় তিনি যেসব বক্তৃতাদি করেছেন সেগুলিকে বিষয়ানুযায়ী তিন ভাগে লেখিকা ভাগ করেছেন—(১) ভারত সংক্রান্ত, (২) ধর্মসমন্বয় সংক্রান্ত, (৩) বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত।

সাধারণভাবে বলা যায়, এইসব বক্তৃতার উদ্দেশ্য, ভারতের অবস্থার ব্যাখ্যা দেওয়া, এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পক্ষে প্রচার করা। শেষোক্ত ব্যাপারে বুদ্ধের করুণার উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন।

ধর্মমহাসভার পূর্বে ও পরে স্বামীজীর বক্তৃতার সুরে একটি পার্থক্য লেখিকা লক্ষ্য করেছেন। ধর্মমহাসভার পূর্বে এবং ধর্মমহাসভায় দাঁড়িয়ে স্বামীজী খ্রীস্টানদের আক্রমণ ক'রে বলেছিলেন, তোমরা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ভারতে যাও ধর্ম দিতে, রুটি দিতে যাওনা কেন? স্বামীজীর আশা ছিল, ভারতের শোচনীয় দারিদ্র্যের কথা বুঝিয়ে বলে আমেরিকানদের তিনি ভারতে শিল্পবিস্তারে আগ্রহী করতে পারবেন।

আমেরিকানরা ভারতে শিল্পবিস্তার করবে, এ-ধারণা তাঁর দূর হল অচিরে। তখন স্থির করলেন, নিজে টাকা জোগাড় ক'রে ভারতে শিক্ষাবিস্তারে লাগাবেন। ধর্মমহাসভার পরবর্তী বক্তৃতাবলীতে স্বামীজী ভারতের এই শিক্ষাপ্রয়োজনের কথায় জোর দিয়েছেন। ভারতের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার কথা বলা কমিয়েছেন, কারণ তাতে দারিদ্র্য দূর তো হয়ই না, শুধু অপমান বাড়ে। তার বদলে তিনি হিন্দুর মূল জীবননীতির ব্যাখ্যা শুরু করলেন। শিক্ষিত হিন্দুরা পাশ্চাত্যে গিয়ে যে-নিম্নস্তরের হীনম্মন্যতার পরিচয় দিত আত্মাবমাননার ঘোষণায়—স্বামীজী তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। যথার্থ ভারতকে জানাতে গিয়ে স্বামীজী বললেন (মিস মেয়োর বিরুদ্ধে গান্ধীজীর স্মরণীয় উক্তির বহু আগে)—"The product of the slums of any nation can not be the criterion of our judgment of that nation." বস্তির পাঁক দিয়ে দেশের বিচার হয়না। স্বামীজীর প্রচারের আগে আমেরিকা জানত, ভারত হলো ভূতপ্রেত-কিলবিলকরা একটা দেশ, সে এমন রাক্ষসের দেশ যেখানে মায়েরা ছেলেদের খেয়ে ফেলে। সহসা তাদের সামনে উন্মোচিত হলো এক নতুন জগৎ—প্রাচীন সভ্যতার ধাত্রীভূমি, চরম আত্মত্যাগ ও পরম পবিত্রতার আধারক্ষেত্র এক দেশ—ভারতবর্ষ।

বিবেকানন্দ এই ভারত-ব্যাখ্যাতেই তাঁর কাজ শেষ করলেন না, এমনকি ধর্মসমন্বয়বাণী প্রচারেও নয়—তিনি এ সবকিছুকে অতিক্রম ক'রে বিশ্বধর্মে উপনীত হলেন। 'ধর্মসমন্বয়' থেকে 'বিশ্বধর্মে' উত্তীর্ণ হয়েই বিবেকানন্দের ভাবনা চরম পরিণতি পেয়েছে।

'ধর্মসমন্বয়' ও 'বিশ্বধর্ম' আপাতভাবে সমার্থক মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়—লেখিকা নিপুণ বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন। স্বামীজী ধর্মমহাসভায় প্রথম ভাষণে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বা ধর্মসমন্বয়ের কথায় জোর দিয়েছিলেন। ধর্মসমন্বয়ের অর্থ, প্রতি ধর্মের লোক অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার ও শ্রদ্ধার মনোভাব রাখবে, কারণ প্রতিটি ধর্মই ঈশ্বরকে পাবার পথস্বরূপ। কিন্তু স্বামীজী নিশ্চয়ই এই 'নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাঁচতে দাও' মত গ্রহণের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত দেখেছিলেন। তখন তিনি বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যের উপর জোর দিলেন। ধর্মমহাসভার নবম দিনে 'হিন্দুধর্ম' নামক তাঁর সুবিখ্যাত রচনায় ধর্মসমূহের

মধ্যে ঐক্যসন্ধান চেষ্টা দেখা যায়। সেখানে সর্বজনীন ধর্মের প্রকৃতি বলতে গিয়ে তিনি বলেন, সে ধর্ম এমন হবে যা—

"...দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ নয়। যে অসীম ভগবান্ ঐ ধর্মের প্রচারের বিষয়— তাঁরই মতো অসীম-স্বরূপ ঐ ধর্ম।...সে সাদরে আলিঙ্গন করবে তার প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নরনারীকে।...তা স্বীকার করবে বিশ্বভুবনের সকল মনুষ্যের দেবস্বভাব।"

পরবর্তী পর্যায়ে স্বামীজী ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যের ধারণা বৃদ্ধির পক্ষে চেষ্টা করেছেন নানাভাবে। যথা ১) প্রতি ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও শক্তি স্বীকারের দ্বারা ; ২) সহিষ্ণুতার মনোভাব বৃদ্ধির পক্ষে প্রচারের দ্বারা; ৩) প্রতি দেশের ধর্মে অন্য দেশীয়কে আহ্বানের দ্বারা। অবশ্য শেষোক্ত মতটি (যথা ভারতে 'হিন্দু-খ্রীস্টান' কিংবা আমেরিকায় 'খ্রীস্টান-হিন্দু') পরিত্যাগ করেছিলেন অল্পদিনের মধ্যে। স্বামীজী বিভিন্ন ধর্মসমূহের মধ্যে ভাবগত সংমিশ্রণের স্বরূপও উদ্‌ঘাটন করতে লাগলেন এইকালে। এবং সর্বজনীন ধর্ম প্রচারের প্রতিষ্ঠানরূপে তিনি আমেরিকায় 'সর্বজনীন ধর্মমন্দির' এবং মাদ্রাজে 'ধর্মশিক্ষায়তনের' পরিকল্পনাও করলেন।

স্বামীজী ধর্মসমূহের ঐক্যসন্ধান করেছিলেন নানা প্রেরণায়। প্রথমত তিনি ছিলেন দার্শনিক এবং ঋষি একই দেহে। দার্শনিক হিসাবে সকল বস্তুর অদ্বয়তত্ত্ব তিনি অনুভব ও প্রতিপাদন করবেনই। দ্বিতীয়ত, যেহেতু তিনি মূলে ঋষি বা দ্রষ্টা—তিনি দেখছিলেন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, এই সকল দিক দিয়ে পৃথিবী একত্রবদ্ধ হয়ে যাবে শীঘ্রই—সেই বন্ধন যাতে শীঘ্র ভেঙে না-যায়, তার জন্য মানবস্বভাবের শ্রেষ্ঠ অংশে অর্থাৎ ধর্মে, ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য—এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মূল বাণী এই ধর্মৈক্যের।

ধর্মসমূহের ঐক্যসন্ধান করার চেষ্টায় স্বামীজীর কাছে একটি সত্য প্রতিভাত হলো— পৃথিবীর প্রচলিত ধর্মসমূহকে ধর্ম না-বলে সম্প্রদায় বলাই উচিত। সেই ধর্মই যথার্থ 'ধর্ম-নাম' নাম নিতে পারবে, যে-ধর্ম মূল লক্ষণরূপে মানবের দেবত্বে বিশ্বাস ক'রে সকলকে ঐ সত্য স্বাধীনভাবে অনুভব করার আহ্বান করতে পারবে।

সেই ধর্মের নাম বেদান্ত।

স্বামীজী অনুভব করলেন এবং দেখালেন, বেদান্তের মধ্যে সর্ব মতের সম্মিলন। যে-বেদান্ত হিন্দুধর্মকে অতিক্রম ক'রে বিশ্বধর্ম হবে, সেই বেদান্তের অদ্বৈত শাখায় পড়বে বৌদ্ধধর্ম ও যোগধর্ম, দ্বৈত শাখায় পড়বে খ্রীস্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম। এই বেদান্তের অদ্বৈত শাখার মতের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ থাকবে না এবং আধুনিক জীবনের গভীর প্রশ্নের সমাধান সেখানে হবে।

এই বৈদান্তিক বিশ্বধর্মকে উপস্থিত করার সময়ে স্বামীজীকে বারংবার একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল- - ভারত যদি এই বেদান্তধর্মের আবিষ্কর্তা হয় তাহলে সে ভারতের এমন দুর্দশা কেন? স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন—ঐহিকতার সঙ্গে পারমার্থিকতার চির বিরোধ, সুতরাং ধর্মে-অগ্রসর জাতির এই লৌকিক পতনে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু মানুষ কি আধ্যাত্মিক উন্নতির বিনিময়ে লৌকিক পতনে রাজি হবে? রাজি হলেও তাকে রাজি করানো উচিত হবে কি? প্রশ্নটা কেবল অপরপক্ষের নয়—স্বয়ং বিবেকানন্দেরও। ভারতের ঐহিক পতনে তাঁর থেকে বেদনাহত কে? তাই ভাবী বিশ্বধর্মে ঐহিকতা ও

পারমার্থিকতার সমন্বয়ের প্রশ্ন আছেই, ভারতের এবং বিশ্বের সকলের জন্যই। এক্ষেত্রে স্বামীজী বুদ্ধের কর্মযোগের আদর্শকে তুলে ধরেছেন। এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরসমর্পিত কর্মাদর্শকেও।

বিবেকানন্দ তাঁর এই বিশ্বধর্মকে—যাকে তিনি **'The Religion'** বলতেন, যা হিন্দুধর্মও নয়, খ্রীস্টধর্মও নয়, তাকে 'বেদান্ত' নাম দিলেন এই জন্য যে, এই ধর্ম বহু সহস্র বৎসর ধরে 'বেদান্ত' নামে প্রচলিত আছে ভারতবর্ষে। তাছাড়া একটা ধর্মতত্ত্ব দেওয়াই বড় কথা নয়—তার প্রয়োগ-সাফল্য দেখাবার জন্য পরীক্ষিত পথের সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে হয়। 'বেদান্ত' নাম দিয়ে স্বামীজী তাঁর প্রচারিত বিশ্বধর্মের তাত্ত্বিক অস্পষ্টতা দূর করেছেন, আবার ঐ বেদান্তকে হিন্দুর প্রচলিত ধর্মাচরণের গণ্ডীমুক্ত করেছেন।

সবই বুঝলুম, কিন্তু স্বামীজী তাঁর বেদান্তকে মানসিক ক্রমবিকাশের পথে লাভ করেছেন তার প্রমাণ কী? লেখিকা বলেছেন, আমেরিকায় স্বামীজীর প্রথমদিকের বক্তৃতাদি বা চিঠিপত্র থেকে ঐ পরিণত বেদান্তের পরিচয় মেলে না। তিনি এ-ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তথ্যবিচার করেছেন। একটি মনাকর্ষক তথ্য তিনি জানিয়েছেন—যতদিন স্বামীজীর মাথায় এই বেদান্তের মেসেজ প্রচারের ইচ্ছা জাগেনি, ততদিন তিনি ভারতে ফিরতে ব্যস্ত ছিলেন; যখন থেকে মনে 'বেদান্তের' আবির্ভাব হলো—তিনি আশু প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। সমগ্র আমেরিকা পরিভ্রমণ ক'রে দেখলেন, সম্পন্ন আমেরিকানরা ভারতীয়দের মতই অভাবী। তারা বিদ্যুতের আলো পেয়েছে—তাদের প্রয়োজন আত্মার আলো। যে-কোনো অভাবই বিবেকানন্দের কাছে চ্যালেঞ্জ। ভারতে খাদ্যের অভাব তাঁকে আমেরিকায় টেনে এনেছে, আমেরিকায় ধর্মের অভাব তাঁকে আমেরিকায় ধরে রাখল। এখানে আমেরিকা অর্থে পাশ্চাত্যজগৎ ধরতে হবে। এই সময় থেকেই তিনি ভারত ও পাশ্চাত্যের দেওয়া-নেওয়ার কথা বলতে লাগলেন। ভারত দেবে তার ধর্ম, আমেরিকা দেবে তার বিজ্ঞান। এই দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে এতদিন আমরা বিবেকানন্দের আত্মসম্মানী স্বভাবের সান্ত্বনাসন্ধান দেখেছি; লেখিকা দেখালেন, এর মধ্যে আছে আরও বড় কথা—বিবেকানন্দের মতো মানুষের ক্ষেত্রে 'দেওয়া-নেওয়া' নামক আদানপ্রদান ব্যাপারটা আসল কথা নয়—দেওয়াটাই মূল কথা—শুধু আমেরিকাকে নয়, ভারত-সুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীকে—ঐ বিশ্বধর্ম। সেই কারণেই, যদিও লেখিকা তাঁর পরিধির বহির্বর্তী বলে একথা বলেননি, তবু আমরা জানি, স্বামীজী ভারতে এসে হিন্দুদের 'হিন্দু' নামের বদলে 'বেদান্তী' নাম নিতে বলেছিলেন, এবং বলেছিলেন, রাজনীতি সমাজনীতি সবই ভারতকে করতে হবে, কিন্তু ধর্মের মধ্য দিয়ে।

প্রথম দিকে যে-বিবেকানন্দ ঘরে ফিরতে অস্থির ছিলেন, তিনি কিভাবে বদলে গেলেন—কিভাবে আমেরিকাকে নিজ কর্মক্ষেত্ররূপে বরণ ক'রে বললেন—'আমার আবার আলাদা ঘর কি, সব দেশই আমার ঘর'—এমন-কি ভারতের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহের বাসনাতেও তাঁর কিরকম ঔদাসীন্য এল—সেসব প্রসঙ্গ লেখিকা স্বামীজীর পত্রের কালানুক্রমিক বিচার ক'রে যুক্তিসিদ্ধভাবে উপস্থিত করেছেন।

স্বামীজীর প্রয়োগে 'বেদান্ত' শব্দটির অর্থপরিবর্তন কিভাবে ঘটেছে, তার চমৎকার আলোচনাও পাচ্ছি। নিজ রচনায় স্বামীজী বেদান্ত শব্দের প্রথম ব্যবহার করেন ১৮৮৯

খ্রীস্টাব্দের ১৭ই অগস্ট প্রমদাদাস মিত্রের কাছে লেখা চিঠিতে। এখানে বেদান্ত হিন্দুর অন্যতম ধর্মশাস্ত্ররূপে উল্লিখিত। পরে এই ব্যক্তিকে লেখা এক চিঠিতে বেদান্ত শব্দকে 'অদ্বৈত বেদান্ত' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র অর্থে ১৮৯২-৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি মাদ্রাজে 'বেদ-বেদান্ত' শব্দের ব্যবহার করেছেন। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে রাইট সাহেবকে লেখা চিঠিতেও 'অদ্বৈত বেদান্ত' অর্থেই বেদান্ত শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। বেদান্ত শব্দের প্রথম অর্থব্যাপ্তি পাওয়া গেল ১৮৯৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে আলাসিঙ্গাকে লিখিত পত্রে। তিনি লিখেছিলেন, "আমি নানা দিক দিয়ে বেদান্ত শিক্ষা দিচ্ছি।" এই সূচনা— বেদান্ত শব্দের অর্থব্যাপ্তির— যা ক্রমেই ব্যাপ্ততর হয়ে কিভাবে কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর কাছে বিশ্ববাণীর রূপ নেবে তা কালক্রমিক উদ্ধৃতিযোগে লেখিকা দেখিয়েছেন।

এই ক্রমপরিবর্তনের প্রমাণ লেখিকা অন্য দিক দিয়েও দিয়েছেন। বেদান্তের এই নূতন ভাব যখন তাঁকে অধিকার করল তখন এই তত্ত্বের উপর গ্রন্থরচনার প্রবল ইচ্ছার কথা তিনি বারবার বলতে লাগলেন। ১৮৯৪ সালে ১৩ই সেপ্টেম্বর মেরী হেলকে, ১৯শে সেপ্টেম্বর মিসেস ওলি বুলকে, ২১শে সেপ্টেম্বর ও ২৭শে অক্টোবর আলাসিঙ্গাকে, ঐ বিষয়ে লিখলেন। এইকালে রচিত 'মাদ্রাজ অভিনন্দনে'র উত্তরে স্বামীজী উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডের উপর জোর দিয়েছেন এবং ভারতের প্রয়োজনের মতোই পাশ্চাত্যের প্রয়োজনের কথাও তুলেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাববিনিময়ের কথা পরবর্তী 'কলিকাতা অভিনন্দনে'র উত্তরেও পাওয়া যাচ্ছে। গ্রন্থরচনার বাসনা স্বামীজীকে ত্যাগ করল না। এইকালে লিখিত বলে অনুমিত একটি প্রবন্ধের খসড়ায় সর্বজনীন ধর্মপ্রসঙ্গ তুলে স্বামীজী বলেছেন, মানুষের দুটি পুরাতন স্বপ্ন—পৃথিবীতে এক সাম্রাজ্য ও এক ধর্ম। ঐ খসড়া প্রবন্ধে স্বামীজী আরও বলেছেন, খ্রীস্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধধর্মে মানববৃত্তির সর্বমুখী বিকাশের সুযোগ না থাকায় ওগুলি বিশ্বধর্ম হতে পারেনা। বেদান্ত সম্বন্ধে গ্রন্থরচনার ইচ্ছা ও চেষ্টা ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ সালের বিভিন্ন পত্রেও পাওয়া যায়।

সুতরাং উপরিউদ্ধৃত তথ্যানুযায়ী দেখা যাচ্ছে, ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামীজীর মনে 'বেদান্ত' সক্রিয় ভাবনার রূপ নেয়। ঠিক এর পূর্বে স্বামীজীর জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার দিকে লেখিকা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স্বামীজী জুলাই-অগস্টে 'গ্রীনএকার কনফারেন্সে' যোগ দেন। শ্রীমতী বার্ক বলতে চান, স্বামীজীর মিশনের ব্যাপারে এই গ্রীনএকার কনফারেন্সের মূল্য অপরিসীম।

গ্রীনএকার কনফারেন্স শুরু করেন মিসেস সারা ফার্মার। গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে গ্রীনএকারে নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে নরনারীরা সমবেত হয়ে মুক্ত স্বাধীনতায় সর্বমতের চর্চা করবে, এই হলো এই কনফারেন্সের উদ্দেশ্য। স্বামীজী এই কনফায়েন্সে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে ধর্মের উন্মাদনা বয়ে গিয়েছিল সমাবেশে। মানুষগুলি ছিল স্বাধীন, বিচিত্র, আন্তরিক এবং আনন্দময়। স্বামীজী নিশীথরাত্রে মুক্ত আকাশের তলে একটি পাইন গাছের তলায় (যেটি পরে 'স্বামীজীর পাইন' নামে পরিচিত হয়) পদ্মাসনে বসে সকলকে শিবোঽহম্, শিবোঽহম্' মন্ত্র বলতে শিখিয়েছিলেন।

এইখানেই প্রথম স্বামীজী অদ্বৈত-বেদান্ত শিক্ষা দিলেন। এইখানেই 'বেদান্ত' বিশ্বধর্মরূপে তাঁর মনকে অধিকার করল, এবং কয়েকমাস পরে থাউজ্যান্ড আইল্যাণ্ড পার্কে ঐ বেদান্তের দিব্যবাণী উচ্চারিত হলো তাঁর কণ্ঠে।

শ্রীমতী বার্কের দীর্ঘ গ্রন্থের দীর্ঘ পরিচয় দিলাম। আমার অসামর্থ্য সম্বন্ধে আমি সচেতন। প্রথম শ্রেণীর বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পরিচয় প্রথম শ্রেণীর হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় সে চেষ্টায় কেউ এগিয়ে আসেন নি। তাই অগত্যা সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে আমাদের সে-চেষ্টা করতে হয়েছে। স্বামীজীর World Mission-এর স্বরূপ ও সেই 'মিশনের' ক্রমবিকাশের রূপ সাফল্যের সঙ্গে উপস্থিত করার পরে লেখিকা সগৌরবে স্বামীজীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—"I have a message to the West as Buddha had a message to the East." স্বামীজীর এই কথাগুলি আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম পাতাতেও উদ্ধৃত আছে দেখা যাবে। গ্রন্থ শুরু করবার সময়ে যদি স্বামীজীর ঐ উক্তির মধ্যে কেউ দাবির অহংকার লক্ষ্য করেন, গ্রন্থ শেষ করার পরে, তিনি যদি গোঁড়া না হন, ঐ দাবিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। বিবেকানন্দ পৃথিবীর জন্য জীবন দিয়ে গেছেন; তিনি কোন্ জীবন দিয়েছেন লেখিকা তা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১। এইখানে একটি প্রশ্ন ওঠানো যায়। আমেরিকায় যাত্রার আগে স্বামীজী নাকি বলেছিলেন—'আমি এমন একটি ধর্ম প্রচার করতে যাচ্ছি, বৌদ্ধধর্ম যার বিদ্রোহী সন্তান, খ্রীস্টধর্ম যার সুদূর প্রতিধ্বনি।' এ ধর্ম কোন্ ধর্ম? নিশ্চয়ই প্রচলিত হিন্দু ধর্ম নয়—নিশ্চয়ই বিবেকানন্দ-দৃষ্ট হিন্দুধর্ম—বেদান্ত নাম নিয়ে যা তাঁর মেসেজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরে।

[জয়শ্রী পত্রিকার চৈত্র ১৩৭০ এবং বৈশাখ ১৩৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত]

সংযোজন

মেরী লুইজ্ বার্কের আলোচিত গ্রন্থটি ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হবার পরে অনুরূপ আকারের দ্বিতীয় গ্রন্থ **Swami Vivekananda : His Second Visit to the West : New Discoveries** প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে, অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা থেকেই। এতেও আছে অনেক নতুন 'আবিষ্কার', নতুন ছবি এবং স্বামীজীর প্রচুর চিঠিপত্র। এই গ্রন্থে আমেরিকায় স্বামীজীর দ্বিতীয় আগমন ও কার্যকলাপের সঙ্গে ইংল্যান্ডে তাঁর ভাষণাদির প্রসঙ্গ আছে, ইউরোপে ভ্রমণাদির কথাও।

এই দুটি বই পুনর্বিন্যস্ত ক'রে, নতুন তথ্যাদিও যুক্ত ক'রে, শ্রীমতী বার্ক মোট ৬ খণ্ডে প্রকাশ করেছেন অদ্বৈত আশ্রম থেকে ১৯৮৩-১৯৮৭-এর মধ্যে। গ্রন্থনাম: **Swami Vivekananda in the West: New Discoveries.** বিভিন্ন খণ্ডের আবার মুখ্য বিষয়-নির্দেশক পৃথক পৃথক নামকরণ করা হয়েছে, যথা, **His Prophetic Vision** (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড); **The World Teacher** (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড); **A New Gospel** (পঞ্চম ও

ষষ্ঠ খণ্ড)। এই ৬ খণ্ডের মোট ছবির সংখ্যা ২৭৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৬০।

এছাড়া শ্রীমতী বার্ক আরও দুটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন—রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের জীবনী, যিনি ভারত থেকে আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার করতে গিয়েছিলেন এবং উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রানসিসকোয় বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষতা করেছেন এক দশকের উপর। বইটির নাম—**Swami Trigunatita: His Life and Work**। দ্বিতীয় গ্রন্থ স্বামী অশোকানন্দের জীবনী— **A Heart Poured out: A Story of Swami Ashokananda** (২০০৩)।

স্বামী অশোকানন্দ (১৮৯৩-১৯৬৯), সানফ্রানসিসকো বেদান্ত সোসাইটিতে যোগদান করেন ১৯৩১ সালে, অল্পদিনের মধ্যে তার অধ্যক্ষ হন এবং ১৯৬৯ সালে দেহান্ত পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় একাধিক বেদান্ত সোসাইটি-সহ কনভেন্ট ও রিট্রিট স্থাপন করেছেন। শ্রীমতী বার্ক এই দীপ্ততেজা মনীষী বাগ্মী সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং নিজের বিবাহিত জীবনে ছেদ ঘটিয়ে প্রায় চার দশক ব্রহ্মচারিণী ও শেষের দিকে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করেছেন।

শ্রীমতী বার্কের আর একটি উল্লেখযোগ্য বই—**A Disciple's Journal: In the Company of Swami Ashokananda** (২০০৩)। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য, স্বামী অশোকানন্দের সান্নিধ্যে শ্রীমতী বার্ক কিভাবে নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পুরোপুরি বেদান্ত ভাবধারাকে গ্রহণ করেছেন। স্বামী অশোকানন্দ কিভাবে তাঁকে বিবেকানন্দ-গবেষণায় প্রণোদিত ও চালিত করেছেন, সেকথাও আছে। এছাড়া তিনি কয়েক খণ্ডে স্বামী অশোকানন্দের বক্তৃতাদি সম্পাদনা করেছেন এবং অশোকানন্দের ব্যক্তিগত কথাবার্তা ও ভাষণাদি থেকে সুগভীর কিছু উক্তি সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করেছেন (ডাঃ শেলী ব্রাউনের সহযোগিতায়) **Shafts of Light : Selected Teachings of Swami Ashokananda for Spiritual Practice** (2004)। কয়েকটি ছোট ছোট গ্রন্থের রচয়িতাও তিনি।

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে মারী লুইজ্ বার্কের দান' বিষয়ে আলোচনার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতায় ১২ জুন ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় ইনস্টিটিউটের সম্পাদক এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের গণ্য লেখক স্বামী প্রভানন্দ সংক্ষেপে সুন্দরভাবে শ্রীমতী বার্কের জীবনচিত্র উপস্থিত করেন। তার থেকে নিম্নের তথ্যগুলি সংকলন করেছি।

মারী লুইস রাইখের (Marie Louise Raisch) জন্ম ২৩ জুন ১৯১২ সালে, এক ধনশালী ব্যবসায়ী পরিবারে। তিনি তাঁর ৯২ বছরের জীবনে দেখেছেন, যে-রাজ্যে তাঁর জন্ম তা প্রধানত কৃষিভিত্তিক থেকে শিল্পভিত্তিক রাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। মারী লুইসের উপরে এক বড়ভাই ও দুই বোন। তাঁর মা একনিষ্ঠভাবে 'ক্রিশ্চান সায়েন্স' মতবাদী, যা দেহের উপর মনের আধিপত্য স্থাপনের দর্শন। মারী লুইস মায়ের এই মতাদর্শের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত ছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়ার নগরায়ণ সংক্রান্ত বিবিধ ব্যবসায়ে নিযুক্ত থেকে তাঁর পিতা বিপুল অর্থোপার্জন করেছেন। তাঁদের প্রধান ভূসম্পত্তি ছিল সেন্ট ক্লার' উপত্যকার লাস গ্যাটোস-এ। সেই সুন্দর উপত্যকায় গ্রাম্য কৃষি-পরিবেশে মারী লুইস তাঁর উঠতি বয়স কাটিয়েছেন।

মারী লুইস নানা দিকে গুণান্বিত। তাঁর স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পিতামাতা কোনো

বাধা দেননি। সঙ্গীতশিক্ষার জন্য একটি সুন্দর ভায়োলিন কিনে দেওয়া হয়েছিল। পিতার অনুমতিতে সানফ্রানসিসকোয় গিয়ে ব্যালে-শিক্ষাও করেছেন। খুব ভালো ড্রাইভার ছিলেন, এবং কদাপি গাড়ি নেই এমন অবস্থা তাঁর আমেরিকার জীবনে ঘটেনি।

সানফ্রানসিসকোয় এক প্রাইভেট স্কুলে তাঁর প্রথম শিক্ষাজীবন, পরে নিউইয়র্ক গেছেন কলেজীয় শিক্ষা নিতে। সেখানে বিশেষভাবে শিখেছেন রচনারীতি। কাব্য-কবিতায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কলেজীয় শিক্ষা শেষ না করেই সানফ্রানসিসকোয় ফিরে এসে বিয়ে করেন ধনী বার্ক পরিবারে। স্বামীর নাম জ্যাকসন বার্ক। এক বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থার এঞ্জিনীয়ার রূপে জ্যাকসন নিউইয়র্ক আসেন, মারী লুইসও সঙ্গে আসেন। ১৯৪৯ সালে মারী লুইসের সঙ্গে স্বামী অশোকানন্দের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। অশোকানন্দ তাঁকে বলেন, দুই নৌকায় পা দিয়ে এগোনো যায় না। সত্যকার বেদান্তী ও ঈশ্বরসন্ধানী হতে হলে সংসার জীবন ছাড়তে হবে। মারী লুইস বেদান্তকেই জীবনের ধ্রুব আদর্শ করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫৩ সালে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে বেদনাদায়ক সেই বিচ্ছেদ।

লেখক এবং সম্পাদকরূপে সুবিদিত অশোকানন্দ-স্বামী বেদান্ত শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে রচনার ও রচনাশোধনের শিক্ষাও দেন। তারই ফলে লুইস্ বার্ক তাঁর ছয় খণ্ডের মহিমান্বিত বিবেকানন্দ গ্রন্থগুলি এবং পরবর্তী একাধিক গ্রন্থ উপযুক্ত ভাবে লিখতে সমর্থ হয়েছেন। স্বামীজী বিষয়ক গ্রন্থের জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের কাছ থেকে ১৯৮৩ সালের ৩ জানুয়ারি 'বিবেকানন্দ অ্যাওয়ার্ড' পান। তিনিই প্রথম প্রাপক। পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন রামকৃষ্ণ সংঘের দশম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দের শ্রীহস্ত থেকে। এই বিদ্যাবতী নারীকে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 'সিস্টার গার্গী' নামে ভূষিত করেন।

১৯৭৪ সালে তিনি প্রথম ভারতে আসেন—স্বামীজীর জন্মভূমি ও কর্মভূমি দেখবার জন্য। ভারতের নানা স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রে তিনি অবস্থান করেছেন। ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি অনেকবার বেলুড়মঠে এসে ধ্যানে, তপস্যায়, রচনাকার্যে এবং প্রবীণ সাধুদের সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ এবং স্বামী অভয়ানন্দের (ভরত মহারাজ) বিশেষ আশীর্বাদ তিনি পেয়েছেন। স্বামী অভয়ানন্দ গার্গীর গুরু স্বামী অশোকানন্দের বন্ধু ছিলেন।

১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর ক্যানসার অসুখ ধরা পড়ে। রোগের যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুর একমাস আগে পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। ২০ জানুয়ারি ২০০৪ প্রভাতে তিনি পরম শান্তির মধ্যে দেহত্যাগ করেছেন। "শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চিত্তের আনন্দ ও তেজ-শক্তি বজায় রাখেন। আমার বিশ্বাস [স্বামী প্রভানন্দ বলেছেন] সিস্টার গার্গী মহিমান্বিত ও সার্থক জীবন যাপন করার পরে রামকৃষ্ণলোকে স্বামীজী মহারাজের অঙ্কে গভীর শান্তিময় নিদ্রায় মগ্ন আছেন।"

আমেরিকার একটি মূর্তি, স্বামীজীর দুটি বাড়ি এবং কিছু সংবাদ

॥ এক ॥

স্বামী বিবেকানন্দ কি 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' দেখেছিলেন?

১৩ জুলাই ১৯৯৩ তারিখে নিউ ইয়র্কের লাগোয়া সমুদ্রগর্ভে এক দ্বীপে সুবিখ্যাত লিবার্টি স্ট্যাচুর সামনে দাঁড়িয়ে, তারপরে তার ভিতরে মিউজিয়ামে যেখানে এই মূর্তির প্রথম পরিকল্পনা এবং ক্রমপরিণতির বিষয়টি বস্তুতে ও বর্ণনায় তুলে ধরা আছে, সেইসব দেখতে দেখতে, বারেবারে ঐ কথাটা মনে হচ্ছিল—স্বামীজী কি এই মূর্তি দেখেছেন? একথা কিন্তু মনে হয়নি চার বছর আগে যখন শ্রীযুক্ত তড়িৎ সরকার ও শ্রীমতী লক্ষ্মী সরকারের সঙ্গে এই মূর্তি ঘুরে-ফিরে দেখেছি। এবার যখন ডাঃ তপন সরকার আমাকে ও আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী মায়াকে সংশ্লিষ্ট জাহাজঘাটায় পৌঁছে দিলেন এবং সেখান থেকে স্টিমারে ক'রে লিবার্টি দ্বীপে পৌঁছলুম, তাকালুম সেই পাদপীঠ-সহ ৩০৫ ফুট উঁচু আলোর মশাল-ধরা, অসাধারণ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ভাবকল্পনাময় মূর্তির দিকে—তখন ঐ প্রশ্নটি মনে জেগেছিল।—কিন্তু কেন?

কারণ এই হতে পারে—আমার এইবারকার আমেরিকা দর্শনের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ওতপ্রোত। ১৯৮৯ সালের অগস্ট মাসে নিউ ইয়র্কের লঙ আইল্যান্ডে বঙ্গসম্মেলনে এসেছিলুম সাধারণ এক লেখক হিসাবে, যে দশটা-পাঁচটা বিষয়ে কলম চালিয়ে থাকে। আর এই ১৯৯৩-এর লস এঞ্জেলেস বঙ্গসম্মেলনে আমার আগমনের হেতু—সম্মেলনের একাংশে অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে এক সেমিনারে যোগদানের জন্য।

১৮৯৩ সাল, বিবেকানন্দের জীবনে এবং ভারত ও বিশ্বের ইতিহাসে স্মরণীয়, কেননা এই বৎসরের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ নামক এক অখ্যাত পরিচয় ৩০ বছরের তরুণ সন্ন্যাসী আবির্ভূত হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, যার তরঙ্গ আমেরিকার ধর্মবোধের অন্তর্গত অনেক সংস্কারকে বিচলিত করেছিল এবং যা বিস্তারিত হয়ে ভারতের বদ্ধ জীবনে আছড়ে পড়ে সূচনা করেছিল নবচেতনা ও বিপুল কর্মোদ্দীপনার। ভারতে ব্যাপক জাগরণ তাতে সম্ভব হয়েছিল। বঙ্গসম্মেলনের কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাপারটার স্মরণযোগ্যতা এড়ায় নি, বিশেষত ডাঃ মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ প্রসূন দে প্রমুখ কয়েকজন বিদগ্ধ ইতিহাস-সচেতন মানুষের কাছে। আর যেহেতু আমি স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে ভাল-মন্দ লেখায় জীবনের অনেকগুলো বছর ব্যয় করেছি এবং আমার সেই কাজে

ও অন্য লেখায় সহযোগিতা করেছেন আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী মায়া, তাই আমাদের কাছে সম্মেলনে উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ পৌঁছেছিল।

বিবেকানন্দ সেমিনারের নির্ধারিত দিনটিও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। ৪ জুলাই বিবেকানন্দের মর্ত্য থেকে মুক্তিদিবস। দেহত্যাগের চার বছর আগে তিনি কাশ্মীরে এক প্রভাতে '৪ঠা জুলাইয়ের উদ্দেশে', *(To the Fourth of July)* নামক এক কবিতা-হাতে উপস্থিত হয়েছিলেন দুই আমেরিকান মহিলাকে শুভেচ্ছা জানাবার জন্য, তাঁদের স্বাধীনতা দিবসে। স্বতই আমি বঙ্গসম্মেলনের ৪ জুলাই তারিখের বিবেকানন্দ-সেমিনারে স্বামীজীর কবিতাটির কথা তুলেছিলুম, যা আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসকে স্মরণ ক'রে লিখিত, যাতে নিখিল মানুষের মুক্তির বার্তা উচ্চারিত, অধিকন্তু যা তাঁর নিজের মহামুক্তির জন্মপত্রিকা। লিবার্টি দ্বীপে, লিবার্টি মূর্তির নিকটে থাকা-কালে, ঐসব কথা মনকে স্বতই গ্রাস করেছিল।

কিন্তু স্বামীজী লিবার্টি স্ট্যাচু 'দেখেছিলেন'—এই কথাটা বিশেষভাবে উঠছে কেন? দেখাটা আশ্চর্যজনক কিছু নয় (তবে কোনো লেখায় তার উল্লেখ আমি পাইনি) কারণ তিনি নিউ ইয়র্কে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছেন এবং তাঁর আমেরিকায় পৌঁছবার কয়েক বছর আগে, ২৮ অক্টোবর ১৮৮৬ তারিখে, প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড মূর্তিটি 'নিবেদন' করেছেন সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রধান বিদেশী সহায়ক-রাষ্ট্র ফ্রান্সের নাগরিক আদোয়ার্দ দ্য লাব্যুলে এক ভোজসভায় বসে একটি অসাধারণ আকারের স্বাধীনতা-স্মারক ফ্রান্সের পক্ষে আমেরিকাকে উপহার দেবার কথা ভাবেন এবং সেই কল্পনার বাস্তব রূপদান করেন অগুস্ত বার্থোলডি। মূর্তি নির্মাণের বিপুল ব্যয় বহন করেন ফ্রান্সের মানুষ, এর পাদপীঠ নির্মাণ করেন আমেরিকার মানুষ। স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে নির্মিত এহেন বিশাল স্মারক পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। এর পিছনে দুটি দেশের দেহ ও সত্তা মিলিত এবং তা প্রসারিত পৃথিবীর সকল দেশের জন্য। মূর্তির নিম্নে আয়োজিত প্রদর্শনীর শেষভাগে কিছু বিখ্যাত মানুষের স্বাধীনতাসূচক বাণী উৎকীর্ণ আছে, ভারতের মহাত্মা গান্ধীর উক্তিও তার অন্তর্গত।

সেখানে রয়েছে মার্কুইস দ্য লাফায়েত-এর উক্তি:

"আমি এই জেনে পরিতৃপ্ত যে, সুনিশ্চিত হয়েছে আমেরিকার স্বাধীনতা; প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবসমাজের মহান আদর্শ। এই পৃথিবীতে স্বাধীনতা আর গৃহহীন নয়।"

রয়েছে আরো নানা উক্তি:

"যেখানে স্বাধীনতা সেখানে আমার স্বদেশ।" (অজ্ঞাত লেখক)

"স্বাধীনতার জন্য বিরাট মূল্য দিতে হয়। মানুষ পরাধীনতার কাছে হয় আত্মসমর্পণ করবে, না হয় তার মূল্য দেবার সিদ্ধান্ত করবে।" (জোসে মার্তি)

"অনেক ভেবে এই সিদ্ধান্ত করেছি—দুটি জিনিসে আমার অধিকার; মুক্তি অথবা মৃত্যু। আমি একটিকে যদি না পাই তাহলে অপরটি আসবে আমার জীবনে।" (হ্যারিয়েট টাবম্যান)

যে স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে এসব ক্ষেত্রে, তা প্রধানত রাজনৈতিক স্বাধীনতা। কিন্তু যখন স্বাধীনতা-মূর্তির পরিকল্পনা করা হয়, তার আগেই আমেরিকার গৃহযুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে দেশের অভ্যন্তরে বলবৎ ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তির নতুন মাত্রা ওতে যোজিত হয়েছিল। দুই মুক্তির যুদ্ধই ছিল সশস্ত্র এবং রক্তাক্ত। যাঁরা মূর্তিটি উপহার দিয়েছিলেন সেই

ফ্রান্স, বিপ্লবের রক্তস্নান করেছে দীর্ঘদিন। তাই 'লিবার্টি' শব্দটি ফ্রান্সের বৈপ্লবিক রণধ্বনির সঙ্গে যুক্ত। অথচ লিবার্টি মূর্তির কল্পনাকার ও রূপকার লাব্যুলে ও বার্থোল্‌ডি মূর্তিটিকে সশস্ত্র উত্থানের প্রেরণাদাত্রী হিসাবে দেখাতে চাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন, সমুচ্চে আলোকধারিণী এক নারীমূর্তি প্রশান্তভাবে পৃথিবীর মানুষকে আলোকিত মুক্তির পথ দেখাচ্ছেন।

কিন্তু কোনো মুক্তিই কি রক্তহীন পথে শান্তিপূর্ণ ভাবে হওয়া সম্ভব, বিশেষত তা যদি রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মুক্তি হয়? দেখা যায়, মূর্তির উত্তোলিত দক্ষিণ হস্তে আলোকদীপ, বাম হস্তে আইন-পুস্তক কিন্তু পাদমূলে দাসত্বের ছিন্ন শৃঙ্খল!! ('At her feet lie the broken shackles of slavery')। তাই পরিকল্পনাকারী ও রূপকারদের ইচ্ছা যাই হোক, ছিন্নশৃঙ্খল-পদের রক্তদ্যোতনা মুছে ফেলা যায়নি মূর্তি থেকে।

বিবেকানন্দ এই মূর্তি দেখেছেন, কথাটা মনে এসেছিল এইজন্য যে, বিবেকানন্দ মানুষের সকল প্রকার মুক্তির বার্তাদূত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক সংগ্রামের দ্বারা আরব্ধ মুক্তিকে তিনি অগ্রাহ্য করেন নি, আবার মানুষের আত্মশক্তি বিস্তারের দ্বারা নিত্যমুক্তির ধ্বনিও তিনি তুলেছেন। তাঁর '৪ঠা জুলাইয়ের প্রতি' কবিতায় যেন লিবার্টি মূর্তি-দর্শনের ব্যঞ্জনা রয়েছে। কবিতাটির একাংশ লক্ষ্য করা যায়:

"হে আলোকের পরম প্রভু! স্বাগত! সুস্বাগত!
হে সূর্য, তোমারই ধন্যধ্বনি আজ।
তুমি বিকীর্ণ করেছ—স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!"

'All hail to thee—thou lord of Light!
Welcome now to thee, to-day,
O Sun! Today thou shadest 'Liberty'.

"প্রতীক্ষা করেছে পৃথিবী কতকাল—
দেশে দেশে, কালে কালে, তোমারি সন্ধানে,
গৃহ ছাড়ি, ছাড়ি প্রিয় পরিজন, প্রেম,
আত্মনির্বাসনে যাত্রী ভীষণ সমুদ্রে,
কভু আদিম অরণ্য ভেদি—
আকীর্ণ প্রতিটি ক্ষণ জীবন ও মৃত্যুর
দারুণ সংগ্রামে।"

Bethink thee how the world did wait
And search for thee, through time and clime.
Some gave up home and love of friends,
And went in quest of thee, self-banished,

Through dreary oceans, through primeval forests.
Each step a struggle for their life or death.

"অগ্রসর হও, হে প্রভু, তোমার বাঞ্ছিত লক্ষ্যে, চূর্ণ করি সব বাধা,
অগ্রসর হও, যদ্যপি প্লাবিত না হয় বিশ্ব
তোমার আলোকে,
পৃথিবীর প্রতি দেশ করে জ্যোতিষ্মান,
প্রতি নরনারী সমুন্নত শিরে, গর্বিত নয়নে,
দ্যাখে—ভেঙেছে শৃঙ্খল, অর্জন করেছে তারা
অপূর্ব জীবন—পূর্ণ প্রাণ।"

Move on, O Lord, to thy resistless path,
Till thy high noon, O' spreads the world.
Till every land reflects thy light.
Till men and women with uplifted head
Behold their shackles broken,
And know in springing joy, their life renewed.

আরো স্মরণ করব বিবেকানন্দের অন্য উক্তিকে:

"মানুষের দেহে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে অনন্ত শক্তি, কুণ্ডলী খুলে ছড়িয়ে পড়ে তা, যতহ প্রসারিত হয় ততই অশক্ত শরীরকে ফেলে দিয়ে গ্রহণ করে নতুন দেহ। বন্ধন ছিঁড়ে যায় শৃঙ্খলিত প্রোমিথিউসের। এরই নাম মানুষের ইতিহাস, এরই নাম ধর্মের ইতিহাস, এরই নাম সভ্যতা ও প্রগতির ইতিহাস।"

বিবেকানন্দের মুক্তি কেবল দেহজগৎ বা মনোজগতে নয়, তা আত্মিক জগতেও। নিবেদিতা একদা স্বামীজীর সম্বন্ধে বন্ধনহারা প্রোমিথিউস অভিধা ব্যবহার করেছিলেন। কিছুদিন আগে এক লেখিকা, মারিয়া আরোকিয়াম কাঙ্গা, তাঁর বিবেকানন্দ বিষয়ক এক গবেষণাপত্রের নাম দিয়েছেন, *Man Without Forntiers: The Ultimate Concern of Swami Vivekananda*। সে বিবেকানন্দ বলেন:

'সর্ব বস্তুর পরিণতি একত্বে। ... যেসব বিভেদকে সমাদরে বরণ করি, তারা চরম ও পরম অস্তিত্বের অংশমাত্র, সে অস্তিত্বের নাম—মুক্তি। আমাদের সকল সংগ্রাম মুক্তির জন্য। আমরা সুখও চাইনা, দুঃখও চাইনা, মুক্তি চাই। মানুষের জ্বলন্ত অশান্ত অতৃপ্ত তৃষ্ণা—আরও আরও আরও। সে বাসনা মানুষের অসীমত্বের দ্যোতক। অসীম মানুষ তৃপ্তি পেতে পারে কেবল অসীম কামনায়, আর অসীম প্রাপ্তিতে।'

বিবেকানন্দের কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়েছিল বুকে বাণ-বেঁধা সকরুণ যাতনা, যখন বলেছিলেন—'আমরা—অনন্তের স্বাপ্নিকেরা—আমরা দেখব সীমার স্বপ্ন—হায়!'

এই বিবেকানন্দের নিত্যরূপের কোনো মূর্তি হয়নি কেন এখনো, এই প্রশ্ন লিবার্টি-মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে মনকে বিচলিত করেছিল। উত্তর পেয়েছিলাম—হয়েছে অন্তত ভারতবর্ষে, কন্যাকুমারিকায় যেখানে তিন সমুদ্র মিলিত, তারই তরঙ্গভঙ্গের উপরে—যার নির্মাণে সারা ভারত মিলিত। সেই মন্দিরটিই একটা মূর্তি—একটি মহাস্বপ্নের—ভারতের মানুষের ঐহিক মুক্তির স্বপ্ন, বিশ্বের মানুষের আত্মিক মুক্তির স্বপ্ন।

বেলুড়ের রামকৃষ্ণ-মন্দিরও কি বিবেকানন্দের মূর্তি নয়, যা বুকের ভিতরে ধারণ করে আছে রামকৃষ্ণকে—আর সে মূর্তির নির্মাণে কি দুটি দেশ মিলিত নয়—ভারত এবং আমেরিকা?

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতা-কথিত 'প্রোমিথিউস' শব্দটি মনের মধ্যে বিশেষভাবে নড়াচড়া করছিল। শব্দটি প্রয়োগের পটভূমি নিম্নোক্ত প্রকার:

১৮৯৮ সালের ৯ই মে বেলুড়ে গঙ্গাতীরে একটি ছোট বাড়ির সামনে গাছের তলায় বসে স্বামীজী কথা বলছিলেন মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড ও ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে। সহসা প্রবল ঝড় ধেয়ে এল, ঢেকে গেল চারিদিক অন্ধকারে, তারপর মুষলধারে বৃষ্টি, বিদ্যুৎচমক ও কড়্-কড়্ বজ্রপাত। সকলে দ্রুত উঠে এসে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। নিবেদিতা তাঁর ডায়েরিতে লিখছেন, বাইরে যখন প্রকৃতির মধ্যে ভয়ানক আলোড়ন, তখন ঘরের রঙ্গমঞ্চে নতুন অভিনয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। অভিনেতা সেখানে একজনই—অভিনয়ের বিষয়, জ্বলন্ত ঈশ্বরপ্রেম। সে এমনই প্রেম যাকে প্রবল নদীস্রোতও নির্বাপিত করতে পারেনা, বিচলিত করতে পারেনা দারুণ ঝঞ্ঝা। সেই দিব্য অভিনয়ের দর্শকদের মনের মধ্যে জ্বলে উঠেছিল অপূর্ব আলোক। নিবেদিতা লিখেছেন:

> 'প্রোমিথিউস বিদায় নেবার আগে আমরা তাঁর সামনে নতজানু হয়েছিলাম, তিনি আমাদের আশীর্বাদ করেছিলেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 'প্রোমিথিউস' কথাটি যখন বিদগ্ধ পাশ্চাত্য মহিলা নিবেদিতা ব্যবহার করেছিলেন—তখন তাঁর মনে প্রোমিথিউস-সংক্রান্ত পুরাণস্মৃতি এবং বহুবিধ কাব্যস্মৃতি অবশ্যই জাগরূক ছিল। 'প্রোমিথিউস বদ্ধ'—'প্রোমিথিউস মুক্ত'—কত না রচনার বিষয়!

প্রোমিথিউস বদ্ধ কেন? গ্রীক পুরাণে যা পাই সংক্ষেপে তা এই:

> প্রোমিথিউস মানুষের জন্য অগ্নি আহরণ করেছিলেন,
> সেজন্য দেবরাজ জিউস তাঁকে ক্ষমা করেন নি।
> হঠকারী এপিমিথিউস যা-কিছু ভালো সবই দিয়ে দেন পশুদের—

শক্তি ও দ্রুতগতি, সাহস ও চতুরতা,
লোম, পালক, পাখা এবং খোলস।
এখন কী রইল মানুষকে দেবার জন্য?
বাকি যা ছিল প্রোমিথিউস তাই দিলেন মানুষকে:
দেবতার মতো উন্নত আকার।
আর, তিনি সূর্যের কাছে জ্বালিয়ে নিলেন মশাল,
মানুষকে দিলেন সেই অগ্নি।

এত বড় দান মানুষের জন্য?
ক্ষিপ্ত জিউস বন্দী করলেন মানববন্ধু প্রোমিথিউসকে,
পাঠিয়ে দিলেন ককেশাস পর্বতে,
বন্ধুর কর্কশ পাথরে বাঁধা হলো তাঁকে—কঠিন শৃঙ্খলে।
বলা হলো—
অসহ্য ঐ দান তোমার।
তার জন্য বাঁধা থাকো এখানে চিরদিনের জন্য,
মানুষকে ভালবাসার ফল নাও।
স্বয়ং দেবতা হয়ে দেবরাজের ক্রোধকে ভ্রূক্ষেপ করলে না!
অযোগ্যকে দিলে অপ্রাপ্য সম্মান!!
তাই এই নিরানন্দ পর্বতের চিরপ্রহরী হও,
শান্তিহীন, ক্লান্তিহীন, নিদ্রাহীন,
গোঙানি হোক ভাষা তোমার, আর্তনাদ হোক বাণী।
এই শেষ নয়—
একটি ঈগল আসবে রক্ত-নখদন্তে, ভোজ-উৎসবের জন্য।
সারাদিন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে তোমার দেহ,
হিংসার দারুণ আনন্দে বাঁকা ঠোঁট ডুবিয়ে থাকবে
তোমার কালো হৃৎপিণ্ডে।

মানুষের জন্য অগ্নি আহরণের শাস্তিকে আবাহন ক'রে প্রোমিথিউস উত্তর দিয়েছিলেন:

যদি চান জিউস, নিক্ষেপ করুন অগ্নিবজ্র;
তুষারের শীতল শুভ্র ডানার ঝাপটে,
ভূমিকম্পের উন্মাদ আলোড়নে,
বিদ্যুতে—ঝঞ্ঝায়—বর্ষণে—
মথিত করুন পৃথিবীকে।
কিন্তু কোনো কিছুই পারবে না দমিত করতে
আমার কঠিন ইচ্ছাশক্তিকে।

মানুষের জন্য অগ্নি আহরণের সাধনা বিবেকানন্দের। বড় যন্ত্রণাময় সেই সাধনা। সে যন্ত্রণাকে বহন করা ছাড়া তাঁর উপায় ছিলনা। রামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে আলোভরা আগুন দিয়ে গিয়েছিলেন। তাতে পুড়তে পুড়তে বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীতে ছুটেছেন যাতে মানুষ তাঁর জ্বলন্ত শরীর থেকে জ্বালিয়ে নিতে পারে নিজ জীবনের দীপ।

স্বামীজী নিজের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা অল্পই বলতেন। নিজের মা ভাই বোনদের কষ্ট কিভাবে শতগুণ বেশি ক'রে তাঁকে আঘাত করেছিল, তার কিছু কথা কেবল তাঁর চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে। তাঁর প্রাণপ্রিয় আত্মীয়রা অনাহারে ছটফট করেছে; যখন মানুষের জন্য সাহায্য চেয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন তখন তাঁকে বলা হয়েছে, জুয়াচোর ভণ্ড বদমাশ; বুকের রক্ত ঝরিয়ে গেছেন পৃথিবীর অন্য প্রান্তে সাহায্য চেয়ে; সেখানেও কুৎসা, লাঞ্ছনা, আঘাত, অনাহার। দৈবের সহায়তা যখন পেয়েছেন, তখন পিছন ফিরে দেখেছেন নিজের রক্তাক্ত পদচিহ্ন, যা তাঁরই বুকের রক্তে সিক্ত। কিন্তু মানুষকে তার জন্য অভিশাপ দেননি, যেহেতু জেনেছেন, এ জগৎ দুঃখের আগার, এ জগৎ শিক্ষার আলয়। যাঁরা জগতের কল্যাণ করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়ে মানুষকে অভিশাপ দেন তাঁদের উদ্দেশে বলেছেন, যদি পারো জগতের দায় বহন করো, কিন্তু সেজন্য তোমার কষ্টের কথা যেন কাউকে শুনতে না-হয়, তোমার অভিসম্পাত শুনে কেউ যেন মনে না-করে যে, নিজের দুঃখ-যন্ত্রণা নিয়ে বেশ ছিলাম, এ যে নতুন আতঙ্ক। তিনি বললেন, যিনি সত্যই জগতের দায় তুলে নেন, তিনি জগৎকে আশীর্বাদ করতে-করতে চলে যান নিজের পথে। পরিত্রাতা চলেন পরম আনন্দে। দু' হাত বাড়িয়ে তিনি ডাক দিয়েছেন—দুঃখভার-জর্জরিত যে যেখানে আছো সব এসো, তোমাদের সব বোঝা আমার উপর ফেলে দাও, তোমরা সুখী হও।

তাই বলে কি তাঁর অভিমান ছিল না? ছিল—মানুষের বিরুদ্ধে নয়, মানুষের স্রষ্টা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে।

> কিন্তু আমার যুদ্ধ কি শুধু জগতের সাথে—নরকের সাথে—
> অথবা শয়তানের?
> যুদ্ধ আমার তোমারও সঙ্গে—হে প্রভু আমার।
> তোমারই জন্য তোমারই সঙ্গে—হে প্রভু আমার।
> মৃত্যুও তাতে যদি হয় কভু রাস্তায় পড়ে থুবড়ে মুখ
> ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মতন রক্তবমনে ভাসিয়ে বুক,
> তবে তাই হোক, গৌরব সেই, হে প্রভু আমার।

বিবেকানন্দ প্রোমিথিউস। তিনি মানুষের জন্য আলোক আহরণ করেছেন। নিবেদিতার ক্রমে মনে হয়েছিল— তিনি আলোক আহরণ করেছেন, এটা অর্ধ সত্য। পূর্ণ সত্য হলো—তিনি স্বয়ং আলোক।

১৯০৯ সালের ৪ জুলাই নিবেদিতা লিখেছেন:

"তিনি ছিলেন বুদ্ধ এবং শঙ্কর—না না—প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্বে তিনি স্বয়ং আলোক।"

॥ দুই ॥

বিবেকানন্দের মানবমুক্তির বার্তা কিভাবে শিখাবিস্তার করে আলোকিত করছে গ্রহিষ্ণু মনকে, তার দু'একটি আধুনিক দৃষ্টান্ত দিতে পারি।

কিছুদিন আগে বিবেকানন্দ-বিষয়ে একটি বই লিখেছেন এক আমেরিকান লেখিকা, নাম এলিনর স্টার্ক। বইয়ের নাম দিয়েছেন—*The Gift Unopened: A New American Revolution*। গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছেন লেখিকার স্বামী—আর্চিবল্ড স্টার্ক। ইতিহাসের অধ্যাপকের লেখা এই ভূমিকা শুরু হয়েছে নাটকীয়ভাবে:

'আমি আমেরিকান।'

শান্ত দৃঢ়তা এবং গৌরবের সঙ্গে কথাগুলি লেখক উচ্চারণ করেছিলেন ১৯৩৭ সালের এক গ্রীষ্মদিবসে, হিটলারের জার্মানীতে, এক গেস্টাপো অফিসে। ভদ্রলোক তখন বয়সে তরুণ, জার্মানিতে ছিলেন। তিনি এবং তাঁর বন্ধু ফ্রিৎস, আমেরিকায় ফিরে যেতে চান। লেখকের ফেরার অনুমতি পেতে অসুবিধা ছিলনা কিন্তু ফ্রিৎস-এর পাসপোর্ট আটক করা হয়, যেহেতু তিনি প্যাসিফিস্ট কোয়েকার, যুদ্ধ-ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত না-হবার ব্রতধারী। সুতরাং হিটলারের জার্মানীতে তাঁর স্থান নেই। সেইসঙ্গে যাতে পৃথিবীতে তাঁর স্থান হারিয়ে যায়, তার ব্যবস্থা চলছে। আর্চিবল্ড স্টার্ককে যখন বলা হল, তুমি চলে যাও, তোমার বন্ধু পরে যাবে, তখন ইনি অনুভব করেছিলেন, যদি বন্ধুকে এখনি সঙ্গে নিয়ে যেতে না-পারেন তাহলে হয়তো কোনোদিনই তাঁদের দেখা হবেনা। তা বুঝেই তিনি বলেছিলেন, 'না, যতক্ষণ না ফ্রিৎসকে তোমরা এখানে এনে হাজির করো আমি যাবনা—আমি আমেরিকান।'

এই দৃঢ়তার ফল হয়েছিল। সে যাত্রা লেখকের বন্ধুর প্রাণরক্ষা হয়। তাঁরা আমেরিকায় ফিরতে পেরেছিলেন।

'আমি আমেরিকান'—এই গর্ব ও আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি· আমেরিকার স্বাধীনতা-ঘোষণাবাণী এবং সমকালের পৃথিবীতে 'অতুলনীয়' আমেরিকার সংবিধানে ঘোষিত স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং আত্মবিকাশের বিপুল সুযোগ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাদি। আমেরিকার নববিধান তার মুদ্রায় লিপিবদ্ধ: 'In God We Trust'। লেখকের পূর্বপুরুষগণ কঠিন, অমসৃণ, উদ্যমী, দুঃসাহসিক—নতুন পৃথিবীর নির্মাণে দায়বদ্ধ; নানা জাতির মানুষকে এক দেশ ও এক পতাকার নীচে মর্যাদা ও সমস্বার্থের বন্ধনে একত্রিত করতে সচেষ্ট। সে আমেরিকা কিন্তু ক্রমে হারিয়ে গেল। বিশ্বযুদ্ধ, জাপানে আণবিক বোমাবর্ষণ, তাতে লক্ষ-লক্ষ মানুষের প্রাণহানি, তার তেজস্ক্রিয়ায় বিকৃত বিকলাঙ্গ অগণিত মানুষ, ভিয়েতনাম যুদ্ধের যন্ত্রণা ও নৈরাশ্য, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী, যাতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কলঙ্কিত, কম্যুনিজমের আতঙ্কে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা, গোটা পৃথিবীকে মুহূর্তে গুঁড়িয়ে দেবার অন্ধ শক্তি, ড্রাগের নেশায় আত্মসম্মোহন, সকল মূল্যবোধকে ছাপিয়ে অর্থমূল্যের বিকট হাসি—'The God We Trust' থেকে 'The Gold We Trust'-এ পরমগতি। এর থেকে অব্যাহতি ঘটবে কিভাবে? আমেরিকা ইতিমধ্যে তিনটি 'বিপ্লবে'র মধ্য দিয়ে গিয়েছে—স্বাধীনতা-যুদ্ধের বিপ্লব, গৃহযুদ্ধের বিপ্লব, এবং শিল্পবিপ্লব। পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিধর দেশ যদি চতুর্থ বিপ্লবকে, 'আত্মিক বিপ্লব'কে না পায়, তাহলে তার নিশ্চিত বিনাশ। অন্তত আর্চিবল্ড স্টার্ক (ভূমিকা-লেখক) এবং গ্রন্থলেখিকা তাঁর পত্নী এলিনর স্টার্ক তাই মনে করেছেন। এই

চতুর্থ আমেরিকান বিপ্লব সম্ভব হতে পারে যদি তার জন্য যে 'উপহার' রেখে দেওয়া হয়েছে—যার ডালা এখনো খোলা হয়নি—সেই উপহারকে উন্মোচন করা হয়। উপহারটি হল—বিবেকানন্দ ও তাঁর বার্তা।

আর্চিবল্ড স্টার্ক এবং এলিনর স্টার্ক সন্ধান করেছিলেন, এমন কোনও বস্তু কি আছে যা তাঁদের পারিপার্শ্বিক জীবনের শূন্যতাগুলি পূরণের পথ দেখাতে পারে। "আমার পত্নীই [আর্চিবল্ড স্টার্ক লিখেছেন] সাম্প্রতিক আমেরিকার ইতিহাসের একটি অস্বাভাবিক ঘটনার উপরে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েন, যে-ঘটনাটি অধিকাংশ আমেরিকানের কাছে প্রায় পুরোপুরি অলক্ষিত ও অঘোষিত থেকে গেছে, কিন্তু যা গত শতাব্দী ও এই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে সব ধরনের শত শত আমেরিকানের জীবনকে বিদ্যুৎশিহরিত ক'রে, অন্তর্নিহিত অনন্ত সম্ভাবনার পথে তাদের এগিয়ে দিয়েছিল, সচেতন ক'রে তুলেছিল তাদের জীবনের অর্থপূর্ণতা, উদ্দেশ্যমুখিতা ও মহনীয়তা সম্বন্ধে। আমাদের দেশ এবং পৃথিবীর এই দারুণ সংকটের কালে আমরা সেই ঘটনাটির কাহিনী উপহার দিতে চাই, যাতে তারা সিদ্ধান্ত করতে পারে, সত্যই কি তার সাহায্যে তারা ফিরে পাবে অপহৃত আশা ও বিশ্বাস? বহু বৎসরের নৈতিক বিভ্রান্তি ও আধ্যাত্মিক শূন্যতার মধ্যে তা কি তাদের স্বরূপকে ফিরিয়ে দেবে তাদের কাছে?"

গ্রন্থলেখিকা, পাশ্চাত্যের কাছে 'প্রাচ্যের নূতন তারকার' বার্তা উপস্থিত করার পূর্বে, বিবেকানন্দ ভবিষ্যতের যে-নূতন মানুষের পুরশ্চরণ করেছেন—পাশ্চাত্যের বীরোচিত ও সক্রিয় গুণাবলীর সঙ্গে হিন্দুর প্রশান্ত চরিত্রনীতির সম্মিলন ঘটলে যার অভ্যুদয় ঘটতে পারে—তার জয়ধ্বনি দিয়ে, এই আশা প্রকাশ করেছেন—বিবেকানন্দ-প্রদত্ত উপহারের পেটিকার আবরণ যেন তাঁর দেশবাসী উন্মোচন করতে পারে।

এই গ্রন্থের পরবর্তী দুই শতাধিক পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুর আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, সমকালীন আমেরিকান জীবনের নানা শক্তি, সংঘাত ও যন্ত্রণার চিত্রাবলী একে একে তুলে ধরে, বহু বিশ্বমনীষীর চিন্তার পাশে বিবেকানন্দের চিন্তাকে লেখিকা হাজির করেছেন সর্বোচ্চ নিরাময়কারী চিন্তা বলে এবং তা করেছেন উচ্চাঙ্গের মনস্বিতা এবং বিরল স্বচ্ছতার সঙ্গে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ে পাশ্চাত্যে আরো যেসব বই ইদানীং বেরিয়েছে (যাদের দু'একটির সন্ধানই মাত্র আমি রাখি) তাদের মধ্যে পূর্বোক্ত কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি। বয়স্ক-শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, সাহিত্য এবং পিয়ানোয় আবিষ্ট, ইংরাজ লেখক মার্কাস টয়েন-এর বিবেকানন্দ-বিষয়ক গ্রন্থ 'ইনভল্‌ভড্ ইন ম্যানকাইন্ড'-এর *(Involved in Mankind)* সূচনায় আছে:

> "যখন এই বই লিখছি তখন আমাদের চারপাশে পৃথিবীতে চলেছে ওলটপালট, পাশ্চাত্যের দীর্ঘদিনের আধিপত্য সমাপ্ত হবার পথে। এই শতাব্দীর শেষাংশে কিসের আগমন হবে, তা এখনো অদৃশ্য। কিন্তু একটি বিষয় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যাই ঘটুক না কেন তার মোকাবিলা যোগ্যতরভাবে আমরা করতে পারব যদি বিবেকানন্দের বাণী আমরা শুনি এবং উপলব্ধি করি।"

এই লেখকেরই পত্নী বারবারা ফক্স (ছোটগল্প লেখক, নাট্যকার, বিবিসি-র ঘোষক

ইত্যাদি) নিবেদিতার জীবনী আগে লিখেছেন *Long Journey Home*, পরে লিখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে আর একটি গ্রন্থ, *Harmony in Chaos*। ছিন্নভিন্ন বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে রামকৃষ্ণের জীবন কিভাবে সমন্বয়ের পথ দেখিয়েছে, লেখিকা স্বচ্ছন্দ ও ভাবময় রচনায় তা উপস্থিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, শুধু কথায় কাজ হয়না, কথিত কর্তব্যের প্রতিষ্ঠা জীবনে দেখাতে পারলেই তা ঘটবে এবং রামকৃষ্ণের জীবনে তার দৃষ্টান্ত আছে। সেইজন্য ছন্দহারা পৃথিবীতে মহাছন্দের মহাকবি রামকৃষ্ণ।

> "The swan sails on its lake, as Kabir said—here and now. The loving and joyful life, the heights of spiritual experience, and the teaching of Ramakrishna, demonstrated that, as a fact, not a theory. In the symbol which Vivekananda chose to represent the harmony of the four great yogas in the psyche of Man, the swan represents the Great Soul —the Lord within, in the words of Kabir. And the swan sails on the waters of Karma—even when they seem to be very stormy waters. The seeker's 'Yes!' is the true, instinctive response, but Ramakrishna also encouraged the 'But—?' and answered it fully. For it is in this world that we live at the moment, and truth must stand the test of everyday living, or it is not truth. We know that progress can only develop, for each one of us, from exactly where we stand now."

কিছু বছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও উপলব্ধির নানা রূপের সঙ্গে অন্য ধর্মের সাধকদের ধর্মীয় উপলব্ধির তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন ক্লড অ্যালান স্টার্ক *God of All: Sri Ramakrishna's Approach to Religious Plurality* নামক গ্রন্থে। লেখক খ্রীস্টান ধর্মযাজক। তিনি আগে খ্রীস্টান ছিলেন না। রামকৃষ্ণ-পন্থী সন্ন্যাসী স্বামী অখিলানন্দের কাছে রামকৃষ্ণ-সত্য লাভ করার পরে খ্রীস্টান হন। আর এক লেখক, লেক্স হিক্সন, বিচিত্র মানুষ—অদ্বৈত বেদান্ত, ইসলামী সুফীধর্ম, বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম, রক্ষণশীল প্রাচ্য খ্রীস্টধর্ম, জেনধর্ম—সব কিছুকে নিজ ধর্ম করেছেন—তিনি *Great Swan: Meetings with Ramakrishna* গ্রন্থে কথামৃতের অন্তর্গত বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণের কথালাপের নূতন ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। সেসব ব্যাখ্যা সর্বতোগ্রাহ্য হবার নয়, তবে তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট—ধর্মীয় বিশ্বে নানা দেশভাগের মধ্যে রামকৃষ্ণ কিভাবে বিশ্বরাজ্যস্থাপনে ব্রতী ছিলেন তা দেখিয়ে দেওয়া। তাঁর রামকৃষ্ণ "প্রাচীন সংস্কৃতিজাত উদ্ভট চরিত্রের মানুষ নন,...তিনি নিকট-ভবিষ্যতের মহাকাশময় সভ্যতার এক আইনস্টাইন—মানবসমাজের ভাবী বিবর্তনের গর্ভগৃহ।" আর রিচার্ড শিফম্যানের রামকৃষ্ণ-জীবনী *Sri Ramakrishna: A Prophet for the New Age* বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, যার মধ্যে লেখক আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে ভারতীয় ধর্মজীবন ও ধর্মসংস্কারের রূপ ধরতে পেরেছেন। পাশ্চাত্য লেখকদের মধ্যে খুব কম লেখকই এইক্ষেত্রে এঁর মতো সাফল্যের অধিকারী।

॥ তিন ॥

হলিউড বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দের সাদর আমন্ত্রণে হলিউড বেদান্তকেন্দ্রের এক সভায় যোগদান করেছিলুম, ৫ জুলাই তারিখে। অনেকদিন ধরেই এই কেন্দ্রটি দেখার অভিপ্রায় ছিল, যা স্বামী প্রভবানন্দের নেতৃত্বে বৃহৎ বিশ্বের বিদগ্ধ মহলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। অলডাস হাক্সলি, জেরাল্ড হার্ড, ক্রিস্টোফার ইশারউড প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ এই আশ্রমের সঙ্গে জড়িত থেকে বেদান্তচর্চা করেছেন, এখান থেকেই *Vedanta and the West* নামক পত্রিকা বেরিয়েছে, বিখ্যাত লেখকদের বেদান্তবিষয়ক রচনার সংকলনগ্রন্থও বেরিয়েছে, যথা ক্রিস্টোফার ইশারউড-সম্পাদিত *Vedanta for the Western World*। ইশারউড তাঁর বিখ্যাত রামকৃষ্ণ-জীবনী, *Ramakrishna and His Disciples*, লিখেছিলেন এই কেন্দ্রেরই আশ্রয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারাযুক্ত এবং ভারতীয় শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বহু পুস্তকের প্রকাশক এই প্রতিষ্ঠান। দেশ পত্রিকায় এক প্রবন্ধের মধ্যে, (**ইশারউডের রামকৃষ্ণ জীবনী: পটভূমি ও পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়া**) প্রভবানন্দের নিকটস্থ হয়েছেন এমন আরো কয়েকজন লেখকের উল্লেখ করেছিলুম, যাঁদের মধ্যে আছেন ঔপন্যাসিক ও গল্পকার সমারসেট মম, নাট্যকার ও কথাশিল্পী জন ভন ড্রুটেন, নাট্যকার টেনেসি উইলিয়মস, অভিনেতা ও লেখক বেন টমকিনস। স্বামী প্রভবানন্দের উত্তরাধিকার বর্তেছে স্বামী স্বাহানন্দের উপর। মূল কেন্দ্রের নাম 'বেদান্ত সোসাইটি অব সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া', প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩০ সালে। এই মূল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীনে আছে হলিউডে মন্দির, কনভেন্ট এবং মন্যাস্ট্রি, সান্টা বারবারাতেও তাই, ট্রাবুকো-তে মন্যাস্ট্রি, সান ডিয়েগোতে মন্যাস্ট্রি। এইসঙ্গে দক্ষিণ পাসাডেনায় বিবেকানন্দ-স্মৃতিগৃহ। এই তালিকা থেকেই এঁদের কর্মব্যাপকতা বোঝা যায়। তাছাড়া বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থরচনা এবং শিক্ষার্থীর প্রশ্ন-মীমাংসার কাজ তো আছেই। এক কথায় নিশ্ছিদ্র ধর্ম-কর্ম জীবন। স্বামী স্বাহানন্দ স্বচ্ছন্দ নৈপুণ্যে কাজ ক'রে যাচ্ছেন। প্রভাব-বিস্তারও করেছেন—হলিউডের উল্লিখিত ৫ জুলাইয়ের সভা থেকেই, (যেখানে বস্টন-কেন্দ্রের অশীতিপর অধ্যক্ষ স্বামী সর্বগতানন্দ মুখ্য বক্তা ছিলেন) তা কিছুটা বুঝতে পেরেছি। শুনলুম, তার পূর্বদিন ৪ জুলাই, ট্রাবুকো মন্যাস্ট্রি-তে ৪০০-র উপর অনুরাগী মানুষের সমাবেশ হয়েছিল—ওখানের পক্ষে তা রীতিমতো বৃহৎ সমাবেশ।

হলিউডে দেখা হয়ে গেল স্বামী সর্বদেবানন্দের সঙ্গে। অতি অল্পদিন হলো সেখানে তিনি ভারত থেকে পৌঁছেছেন। আমাদের অতি প্রিয় এই তরুণ সন্ন্যাসী, সুকুমার-মহারাজ, দীর্ঘদিনের পরিচিত। হলিউডে স্বামী স্বাহানন্দের সহকারী হিসাবে তিনি কাজ করবেন। কিছুদিন আগে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মস্থান শিকড়া কুলীন গ্রামে রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই তিনি অজ পাড়াগাঁ থেকে এক সর্বোচ্চ বিলাসভুবন হলিউডে উপস্থিত। ব্যাপারটা বিস্ময়কর বটে। এবং তা রামকৃষ্ণের কারসাজি—অন্তত সুকুমার-মহারাজ তাই মনে করেন।

হলিউড থেকে আমাদের যেতে হবে বেশ-কিছু মাইল দূরে আরভাইনে, শ্রীযুক্ত শোভন ও সমাপিকা বসুর বাড়িতে। আমাদের কাছে যা বেশকিছু মাইল তা আমেরিক ভারতীয়দের কাছে নস্য—বিপুল-বপু গাড়ির ভিতরে ঢুকে, বোতাম টিপে দরজা জানালা বন্ধ ক'রে, তাপ

নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র চালিয়ে, শ্লেট পাথরের মতো মসৃণ রাস্তায় স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি ভাসিয়ে দিলেই হল। কেবল পথের ঘাটে-ঘাটে রঙ-বেরঙের নির্দেশিকার দিকে নজর রাখতে হয়, পুলিশের গাড়ির দিকেও, কারণ গাড়ির বাড়াবাড়ি-রকম গতিবৃদ্ধি হলেই বেশ-কিছু ডলারের টিকিট খাওয়া, মানে জরিমানা, অথচ ওহেন রাস্তায় এবং ওহেন গাড়িতে যদি শ'খানেক মাইল (না কিলোমিটার নয়, আমেরিকায় এখনও মাইল বলবৎ ইংল্যান্ডের মতই) দৌড়তে না পারলুম তাহলে তো রবীন্দ্রনাথের কবিতার 'প্রাণের আবেগ, প্রাণের বাসনা রুধিয়া রাখিতে নারি' মিথ্যে হয়ে যায়। আমেরিকানদের নাকি চিত্তে সংযম নেই, কেবল পুলিশী সংযম, আর আমাদের চিত্তে সংযম কিন্তু পুলিশী অসংযম—আমরা আমরা, তোমরা তোমরা, যেকথা প্রমথ চৌধুরী বলেছেন। যাবার পথে ট্রাবুকো মন্যাস্ট্রি ঘুরে যাব। বেশ খানিকক্ষণ একসঙ্গে থাকা যাবে এবং কথা ও গল্প বিনিময় ক'রে নেওয়া যাবে, এই অভিপ্রায়ে সুকুমার-মহারাজ সহযাত্রী হলেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝলুম, এসেছেন আমেরিকায় কিন্তু তিনি কেবল গাছের উপরে ফুলটি হয়ে থাকবেন না, ভারতের শিকড়ও মাটির নীচে ছড়াতে চেষ্টা করবেন—এই তাঁর অভিপ্রায়। সদভিপ্রায়।

সংরক্ষিত বনভূমির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ট্রাবুকো সাধুনিবাসে পৌঁছেছিলাম। বহু একর জমিসমেত এই সাধুনিবাস আগে ছিল মনীষী লেখক জেরাল্ড হার্ডের সম্পত্তি। তিনি দান করেছেন। নানা বয়সের কয়েকজন পাশ্চাত্য সন্ন্যাসী এখানে থাকেন। বাড়িঘর রক্ষা করা, পথ পরিষ্কার করা, বাগান করা, রান্না করা, সবই নিজেদের করতে হয়। তাছাড়া ধ্যানজপের সাধুকৃত্য তো আছেই। সাধুনিবাস হবার যোগ্য স্থান সত্যিই। সৌন্দর্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ, নির্জনতা, ভূমির সঙ্গে একাত্মতা, দিনকৃত্যের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া হাত-পায়ের ব্যবহার, এই সবকিছু এক ধরনের যোগসাধনা, যা গভীরতর হয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় নিজের মুখোমুখি—তারপরে অনুভূত হয়, আমার আমি বিশ্বতোমুখ। তবে একথাও স্বীকার্য, গতিশীল আমেরিকান জীবনের পক্ষে এতখানি নৈঃসঙ্গ্য এবং স্থিরতা, অনেক সময় মানসিক অস্থিরতার কারণ হয়ে ওঠে, বহু বৎসর এখানে কাটিয়েও অনেকে চলে যান, কেননা যৌবনের নৈঃসঙ্গ্য থেকে বার্ধক্যের নৈঃসঙ্গ্য ভয়াবহ। আবার কেউ-কেউ ফিরেও আসেন, কারণ দূরে গিয়ে বুঝতে পারেন তাঁরা কতখানি ভিতরে ভিতরে বদলে গেছেন—নিজের ফেলে-আসা জগতে তাঁরা তখন অপরিচিত আগন্তুক ছাড়া কিছু নন।

মন্যাস্ট্রি-র বড় হল-ঘরটিতে চা-পান করতে করতে চারদিকে তাকিয়েই দেখি—কেবল ছবি আর ছবি—সব আঁকা ছবি—শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও অন্য রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের, ভগবান যীশু ও অন্য অবতার পুরুষদের ছবি। অন্য ঘরগুলিতেও এমনি আঁকা বহু ছবি। এঁকেছেন স্বামী তদাত্মানন্দ। প্রৌঢ়, দীর্ঘাকার, নম্র, ঈষৎ লাজুক এই সন্ন্যাসী যথার্থই সাধক শিল্পী। অন্য সাধনা ইনি কী করেন জানিনা, ভিতরে কোনও দর্শন তাঁর হয় কিনা তাও আমার অজ্ঞাত, কিন্তু ইনি-যে রূপের পটে নিজের আরাধ্যদের ধরতে চান, তা অজস্র অঙ্কিত ছবি দেখে বুঝলুম। স্বামী বিবেকানন্দ শিল্পের মস্ত সমঝদার ছিলেন। ধর্ম ও শিল্পের যোগ সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি বলে গেছেন। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্পী ছিলেন, একথা স্বামীজী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ-পন্থী সন্ন্যাসীদের একজন অন্তত পাশ্চাত্যে শিল্পকে ধর্মসাধনা রূপে গ্রহণ করেছেন (ভারতে শিল্পচর্চা করেন এমন সন্ন্যাসী অবশ্য আছেন), সেই তাঁকে দেখে মনে হল, স্বামীজীর একটি আলোকশিখা তাঁর উপর পড়েছে।

তদাত্মানন্দের স্টুডিওতে গিয়ে অর্ধসমাপ্ত নানা চিত্র ও মূর্তি দেখেছি এবং মনে পড়েছে অজন্তার গুহাবাসী শিল্পী বা শিল্পরসিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কথা।

এই মন্যাস্ট্রি-তে বিখ্যাত ভাস্কর মালভিনা হফম্যানের করা স্বামীজীর উপবিষ্ট মূর্তিটি রয়েছে।

॥ চার ॥

ট্রাবুকো মন্যাস্ট্রি-তে থাকাকালেই টেলিফোন এল স্বামী তথাগতানন্দের কাছ থেকে, তিনি হলিউড-কেন্দ্র থেকে কথা বলছেন। টেলিফোন ধরতেই সেই বহুদিন আগে শোনা কিন্তু যেন সদাপরিচিত উত্তপ্ত দ্রুত কণ্ঠস্বর—কবে এলেন, কতদিন থাকছেন, কী করছেন, কিভাবে দেখা হবে, বলেন তো এখনই যাচ্ছি। স্বামী তথাগতানন্দের কণ্ঠস্বর বোধহয় শেষ শুনেছি ১৯৭১ সালে মাদ্রাজে, যখন গবেষণার জন্য অ্যাডেয়ারে ঘর ভাড়া ক'রে কয়েকমাস থাকতে হয়েছিল। দারুণ তাঁর জীবনীশক্তি, ব্যবহারে সহজতা এবং উত্তাপ, মানুষকে নিকট ক'রে নিতে পারেন মুহূর্তের মধ্যে। কথাবার্তার মধ্যে কোনো রাখ-ঢাক নেই, ভঙ্গি নেই—আমি আছি, তুমি আছ এবং ঠাকুর আছেন—এই তো ব্যাপার! তথাগতানন্দের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা বহুদিনের। ১৯৮৯ সালে যখন নিউ ইয়র্কে আছি, তখন তিনি ভারতে তীর্থভ্রমণ করছেন। এইবার যখন আবার আমেরিকার পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূলে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন শুনলুম গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি আমেরিকার না-জানি কোন্ জায়গায় ঘুরছেন। ভাগ্যবশে এসে গেছেন হলিউড কেন্দ্রে। কিন্তু দেখা হবে কিভাবে? আমার যাতায়াত ছকবাঁধা—এখনি চলে যেতে হবে আরভাইনে শোভন বসুদের বাড়িতে। তথাগতানন্দ-স্বামী বললেন, কুছপরোয়া নেই, কাল সকালে সেই বাড়িতে হাজির হচ্ছি, জায়গাটা কোথায় বলে দিন, জল-ঝড় এমনকি প্রলয় হলেও আমাদের দেখা হবে। অভিভূত হলাম। একেই বলে প্রাণের প্লাবন। আমার চেনা-জানা যাঁদের সঙ্গে তথাগতানন্দের পরিচয় আছে তাঁরাই তাঁর গুণমুগ্ধ। এমন কাছের মানুষ আর হয়না।

শোভন বসুদের বাড়িতে তথাগতানন্দ এসেছিলেন, অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল। তিনি যে নিউ ইয়র্কের একটি বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ, (Vedanta Society, 34W, 71st Street, New York) যার প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়ই বক্তৃতাদি করতে হয়—সেই তিনি সুস্পষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, ধর্ম বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্য নয়, ধর্ম সাধারণ মানুষের। বিখ্যাতরা বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ ক'রে তারিফ করেন, তাতে প্রচারের সুবিধা হয় কিন্তু সত্যকার ধর্ম আসে দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবনে, যারা আলোর ঝলকের বাইরে থাকে এবং নিজেকে নিঃশব্দে নিবেদন করতে পারে ঈশ্বরের কাছে। ধর্ম আছে, ধরুন ঐ বৃদ্ধা নারীটির মধ্যে, যাঁর বহু বৎসরের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জড়িয়ে আছে নিউ ইয়র্ক বেদান্তকেন্দ্রের প্রতি ধূলিকণায়।

তথাগতানন্দ জোর দিয়ে বললেন, নিবেদিতার মৃত্যু হয়নি, তিনি আছেন, হয়তো অগ্নিময় রূপে নয়, এখন শান্তজ্যোতি। স্বামীজীর দেওয়া 'নিবেদিতা' নামটি বস্তুতপক্ষে একটি

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ। ডিসেম্বর ১৮৯৬।
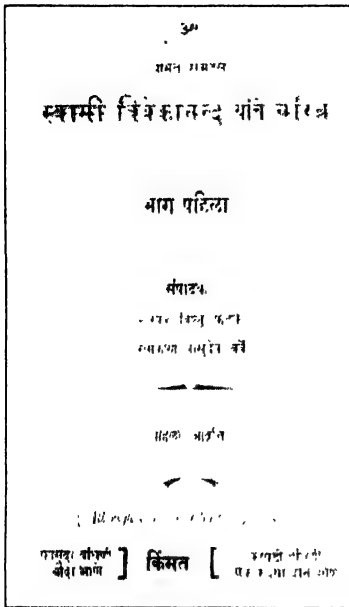
ভাস্কর বিষ্ণু ফড়কে ও রামকৃষ্ণ বর্বে সম্পাদিত স্বামীজীর মরাঠি জীবনী, ১ম ভাগ.
শ্রীমৎ পরমহংস/ স্বামী বিবেকানন্দ যাঁচে চরিত্র / ভাগ পহিলা/ সম্পাদক/ ভাস্কর বিষ্ণু ফড়কে/ রামকৃষ্ণ বাসুদেব বর্বে/ পহিলী আবৃত্তি/ [All rights recerved (sic) by the publisher] কিম্মত কাগদী বাঁধনী চৌদা আণে, কাপড়ী বাঁধনী এক রূপয়া দোন আণে/

রামচন্দ্র নারায়ণ মাণ্ডলীক সম্পাদিত মরাঠিতে বিবেকানন্দ-জীবনী, নবম ভাগ।
শ্রীমৎ পরমহংস/ স্বামী বিবেকানন্দ যাঁচে চরিত্র/ ভাগ নববা/ সম্পাদক/ রামচন্দ্র নারায়ণ মাণ্ডলীক/ পাহিলী আবৃত্তি/ [All reights reserved by the publisher] কিম্মত, কাগদী বাঁধনী চৌদা আণে, কাপড়ী বাঁধণী এক রূপয়া দোন আণে/

মরাঠিতে গোগটে অনূদিত স্বামীজীর সমগ্র গ্রন্থাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড। বিবেকানন্দ/ ১৩/ কিম্মত ২-০-০/
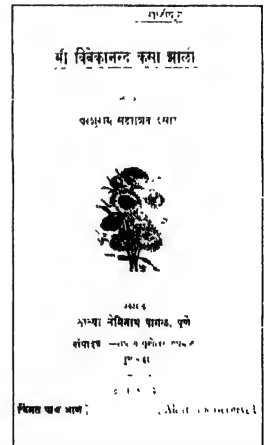
পরশুরাম সদাশিব দেশাই-কৃত মরাঠি গ্রন্থ, 'আমি কিভাবে বিবেকানন্দ হলাম', ১৯২৩।
১-রাষ্ট্রীয়/ 'মী বিবেকানন্দ কসা ঝালোঁ'?/ লেখক/ পরশুরাম সদাশিব দেশাই/ প্রকাশক/ তাত্যা নেমিনাথ পাঙ্গল/ পুনেঁ/ সম্পাদক — রাষ্ট্রীয় গুণোৎকর্ষ গ্রন্থমালা/ পুনেঁ-শহর/ ঈ. স. ১৯২৩/ কিম্মত পাঁচ আণেঁ/ All reights reserved/

ধর্মমহাসভামঞ্চে স্বামীজী। ডানপাশে বৌদ্ধ-প্রতিনিধি অনাগারিক ধর্মপাল। সেপ্টেম্বর ১৮৯৩।

श्रीभगवान्

रामकृष्ण परमहंसदेव

यांचे चरित्र.

भाग दुसरा.

न. रा. परांजपे.

ন. রা. পরাঞ্জপে লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের মরাঠি জীবনী, দ্বিতীয় ভাগ, ১৯২৫, নামপত্র:

শ্রীভগবান/রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব/যাঁচে চরিত্র/ভাগ দুসরা/ ন. রা. পরাঞ্জপে/ সপ্টেম্বর ১৯২৫/ কাগদী বাঁধনী ২॥ রূ, কাপডী বাঁধনী ৩ রূ

स्वामी विवेकानंद यांची

खासगी पत्रें.

प्रथम खंड

(द्वितीयावृत्ति)

मनोरंजक ग्रंथप्रसारक मंडळी,

गिरगांव-मुंबई.

স্বামীজীর পত্রাবলীর মরাঠি অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ ১৯২৩।

মনোরঞ্জক গ্রন্থপ্রসারক মণ্ডলীচী পুস্তকমালা/ পুস্তক ৪৬ বেঁ/ স্বামী বিবেকানন্দ যাচী/ খাসগী পত্রেঁ/ প্রথম খণ্ড/ [দ্বিতীয়াবৃত্তি]/ মনোরঞ্জক গ্রন্থপ্রসারক মণ্ডলী/ গিরগাঁব—মুম্বই/ কি. ০-৩-০ সর্ব হক স্বাধীন/ মার্চ ১৯২৩/

(श्रीमद्विवेकानंदस्वामी.) 16 SEP 1926

भक्तियोग.

केरळकोकिळचे एडिटर

यांनी

मराठींत लिहिला.

'কেরল কোকিল' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণাজী নারায়ণ অঠল্যে-কৃত স্বামীজীর 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থের মরাঠি অনুবাদ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯১৯।

(শ্রীমদ্বিবেকানন্দ স্বামী)/ ভক্তিযোগ/ কেরল কোকিলচে এডিটর / হ্যাঁনীঁ/ মরাঠীত লিহিলা/ আবৃত্তি তীসরী/ ত্র্যম্বক জনার্দন গুর্জর—রামবাডী নাকা/ হ্যাঁনীঁ/ মুম্বইত/ "নেটিভ ওপিনিয়ন" ছাপাখান্যাত ছাপকিলা/ সন ১৯১৯/ (সর্ব হক প্রসিদ্ধকর্ত্যানেঁ রাখলে আহেত)/

श्रीरामकृष्णांचीं बोधवचनें.

নাগেশ বাসুদেব গুণাজী-কৃত রামকৃষ্ণ-জীবনী, মরাঠিতে; দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯২৩।

মনোরঞ্জক গ্রন্থপ্রসারক মণ্ডলীচী পুস্তকমালা/ পুস্তক ৬৩ বেঁ/ শ্রীরামকৃষ্ণাচীঁ বোধবচনে/ হেঁ/ পুস্তক/ শ্রীযুত নাগেশ গুণাজী, বী. এ. এলএল বী/ বেলগাঁব, যাঁনী লিহিলেঁ/ [দ্বিতীয়াবৃত্তি]/ মনোরঞ্জক গ্রন্থপ্রসারক মণ্ডলী/ গিরগাঁব—মুম্বই/ কিম্মত ০-১২-০, সর্ব হক স্বাধীন, এপ্রিল ১৯২৩/

LIFE IN THE NATIVE QUARTER.

BY AN ENGLISHWOMAN

II. THE PLAGUE

এমপ্রেস, মে ১৮৯৯। 'ইংলিশওম্যান' ছদ্মনামে নিবেদিতার লাইফ ইন দ্য নেটিভ কোয়ার্টার রচনার দ্বিতীয় ভাগ 'প্লেগ'।

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর ইংরেজী জীবনীর মরাঠি অনুবাদক ভাস্কর বিষ্ণু ফডকে, জন্ম শকে ১৮০০, মৃত্যু শকে ১৮৪০।

श्रीरामकृष्ण.
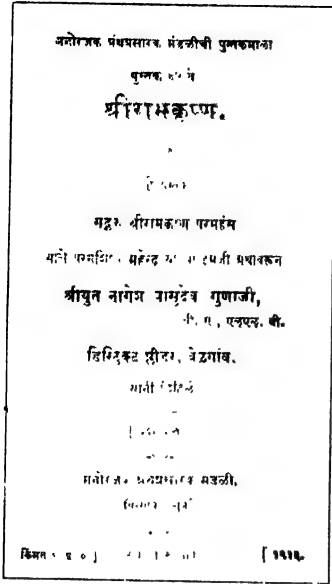
गणेश बासुदेव गुणाजी कर्तृक श्रीम कथित कथामृतের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে মরাঠি গ্রন্থ, 'শ্রীরামকৃষ্ণ', প্রথম প্রকাশ ১৯১৩।

মনোরঞ্জক গ্রন্থপ্রসারক মণ্ডলীচী পুস্তকমালা/ পুস্তক ৬৫ বেঁ/ শ্রীরামকৃষ্ণ/ হেঁ পুস্তক/ সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস/ যাঁচে পরমশিষ্য মহেন্দ্র যাঁচ্যা ইংগ্রজী গ্রন্থাবরুন/ শ্রীযুত নাগেশ বাসুদেব গুণাজী,/ বী এ এলএল. বী./ ডিস্ট্রিক্ট প্লীডর, বেলগাঁব,/যানী লিহিলে,/[প্রথমাবৃত্তি]/ মনোরঞ্জক গ্রন্থপ্রসারক মণ্ডলী/ গিরগাব—মুম্বই/ কিম্মত ১-৪-০, সর্ব হক স্বাধীন, ১৯১৩/

मुलाखती व संभाषणें.
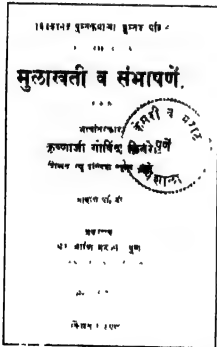
কৃষ্ণাজী গোবিন্দ কিনরে অনূদিত স্বামীজীর কথোপকথন, প্রথম সং, ১৯১২।

বিবেকানন্দ-পুস্তকমালা-পুস্তক পহিলেঁ/ (স্বামী বিবেকানন্দ যাঁচ্যা)/ মুলাখতী ব সম্ভাষণেঁ/ ভাষান্তরকার/ কৃষ্ণাজী গোবিন্দ কিনরে/ শিক্ষক, ন্যু ইংগ্লিশ স্কুল, পুণেঁ/ আবৃত্তি পহিলী/ প্রকাশক/ ভট আণি মণ্ডলী, পুণেঁ/ (সর্ব হক ভাষান্তরকর্ত্যাচে স্বাধীন)। সন ১৯১২/ কিমত ১ রূপয়া/

स्वामी विवेकानन्द.
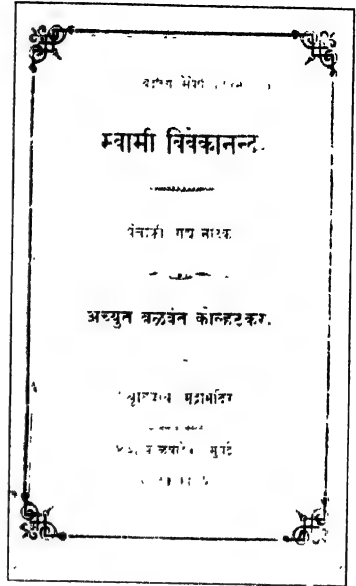
বোম্বাইয়ের 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদক অচ্যুত বলবন্ত কোল্‌হটকর-কৃত মরাঠি পঞ্চাঙ্ক নাটক, 'স্বামী বিবেকানন্দ'।

বেদাঙ্গ সেবে প্রীত্যর্থ (নং ৪)/ স্বামী বিবেকানন্দ/ পঞ্চাঙ্কী গদ্য নাটক/ অচ্যুত বলবন্ত কোল্‌হটকর/ 'শ্রুতিবোধ' মুদ্রামন্দির/ ৪৭ কালবাদেবী, মুম্বই/ সর্ব হক্ক স্বাধীন/

রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগসেবা কাজে নিবেদিতার প্রধান সহযোগী স্বামী সদানন্দ।
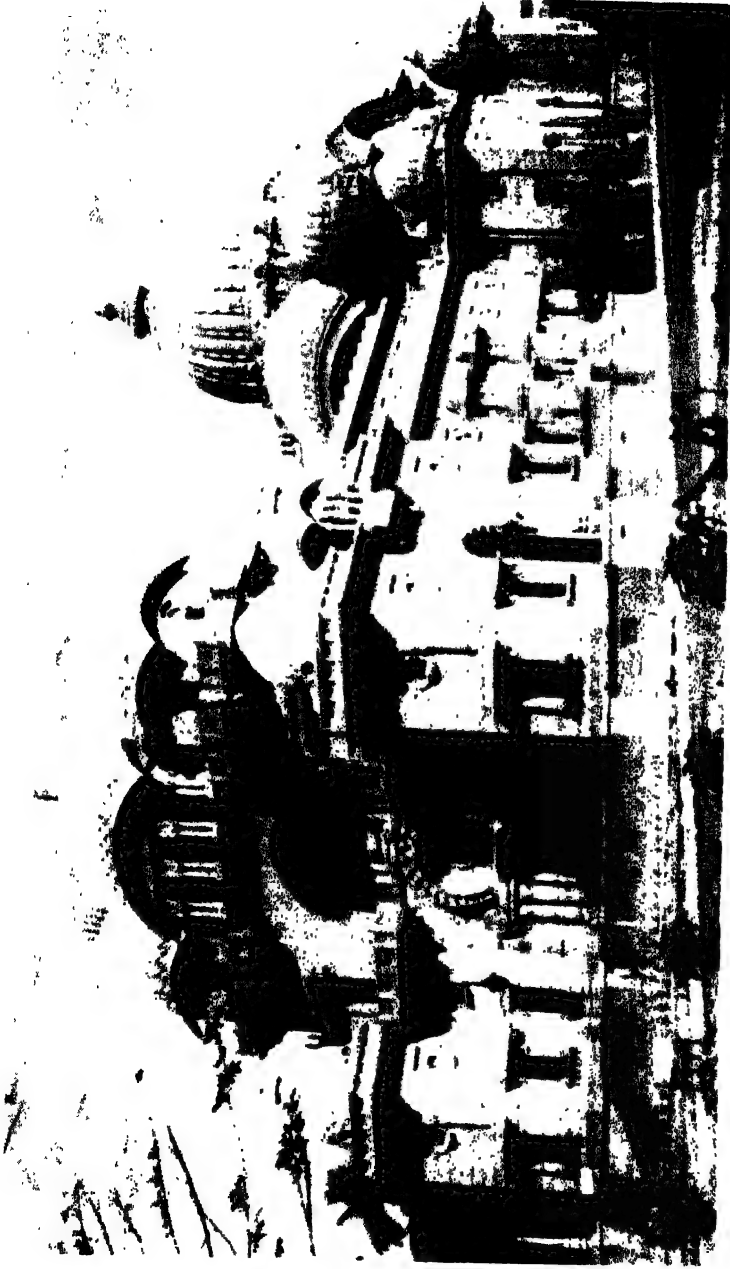
স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ রামকৃষ্ণ-মন্দিরের নকশা প্রস্তুত করেন, যার মধ্যে সমন্বয়াবতার রামকৃষ্ণের আদর্শ অনুসরণ ক'রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পরীতির মিশ্রণ ঘটেছে। সেই নকশার অদলবদল ঘটিয়ে বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেন মার্টিন বার্ন এন্ড কোম্পানি। মন্দিরে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুঘল-রাজপুত, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতীয় এবং বাঙলা রীতির সঙ্গে গ্রিক ও খ্রীস্টীয় গির্জারীতি মিলেছে অপূর্ব সামঞ্জস্যে—যার দ্বারা এটি হয়ে উঠেছে এ যুগের মন্দির স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সামনে স্থাপিত রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতীক, যেটি জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের সমন্বয়চিত্র—অর্থাৎ রামকৃষ্ণের প্রতীকচিত্র—ভেতরে তাঁরই মর্মর বিগ্রহ।

বেলুড় মঠে স্বামীজীর সমাধি-মন্দির। অত্যন্ত অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে সমাধি-মন্দির কিভাবে নির্মিত হয়েছিল, তার কাহিনী এক প্রবন্ধে আলোচিত।

উপাধি, যা অধিকারী পেলেই তার ঘাড়ে গিয়ে চাপে। জেনে রাখুন সেই নারীর কথা, যিনি বাইরে যখন সশব্দ ধর্মের শোভাযাত্রা চলেছে তখন নীরবে হৃদয়মধ্যে ধর্মের আরাধনা করছেন, আর সেই হৃদয়যন্ত্রকে নিবেদনের সুরে বাজিয়ে তুলছে তাঁর কর্মময় দুটি বাহুর কাঁপন।

কী চাও নচিকেতা? বিত্ত, আয়ু, ভোগ, সুখ—?

না, চাই শুধু তোমাকে—তোমার সত্যকে। 'আবরণ করো উন্মোচন জ্যোতিষ্মান!' হে মৃত্যু, দান করো অমৃত।

সেই নারী পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল, ধর্মকে বহন ক'রে চলেছেন। সাধুরাও তাঁর কাছে ধর্মার্থী।

কে তিনি? কিবা পরিচয়?

তিনি একক নন। একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের তিন নারী তাঁরা—মাতা ম্যামান জেনিট, তাঁর দুই কন্যা, জীন জেনিট (জন্ম ১৯০৬) ও রোনাল্ড জেনিট (জন্ম ১৯০৭)। অভিজাত ফরাসী-কানাডীয় পরিবার এঁদের। কর্তা ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। বালিকা দুটির মধ্যে গোড়া থেকেই সাধারণ স্ফূর্তির জীবন অপেক্ষা কনভেন্ট-জীবনের প্রতি আকর্ষণ ছিল। স্বভাবগতভাবে জীন শান্ত, আত্মমগ্ন, আর রোনাল্ড আনন্দোচ্ছল, উদ্যমী, আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী। বালিকাদের সন্ন্যাসিনী হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, যা তাঁদের মা মোটেই পছন্দ করেন নি। তিনি বাস্তববাদী প্রগতিশীল দৃঢ়চরিত্রের মহিলা, বৃহৎ পৃথিবীতে তাঁর কন্যারা স্বাভাবিক ভূমিকা গ্রহণ করুক, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। তাই স্বামীর মৃত্যুর পরে কনভেন্ট স্কুল থেকে কন্যাদের সরিয়ে নিলেন। তারপর ১৯২০-র দশকে চলে গেলেন নিউ ইয়র্কে, যে বৃহৎ শহরে কন্যারা উপযুক্ত কর্মজীবন পেয়ে যাবে।

জীনের ছিল যন্ত্রবাদ্যে—পিয়ানো ও ভায়োলিনে-দক্ষতা। সঙ্গীতের বৃত্তিকেই তিনি গ্রহণ করেন। আর রোনাল্ড হলেন নৃত্যশিল্পী। দুই বোন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। সঙ্গীতের জগতে এগোচ্ছেন জীন, নৃত্যের জগতে রোনাল্ড। রোনাল্ডের দেহকে ঘিরে যখন পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোক, দেহচ্ছন্দের তালে-তালে যখন বাজছে প্রেক্ষাগারে দর্শকের করবাদ্য—তখন অকস্মাৎ অমাবস্যা নেমে এল পূর্ণিমার উপরে। জীবনের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে গহন শূন্যতা—এসব কেন, কিসের জন্য, এই-যে এত আলো, এ কি সত্য, পর্দা পড়লেই তো আলো নিভে যায়, তখন কে জ্বালাবে সেই আলো যা কখনো নিভবে না!

এইসময়ে রোনাল্ডের হাতে পড়ল রোমা রোলাঁর দুটি বই—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনী। তাঁর অন্তরাত্মা সহর্ষে চিৎকার ক'রে উঠল—পেয়েছি, বাঞ্ছিতের সন্ধান পেয়েছি।

পেয়েছি—পবিত্রতা, শক্তি, হৃদয়ের অসীম বিস্তার, অভেদচৈতন্য এবং সত্যের নিত্যরূপকে। পেয়েছি রামকৃষ্ণকে—ঐ সত্যের বিগ্রহ; পেয়েছি বিবেকানন্দকে—ঐ সত্যের বার্তাবহ।

রোনাল্ডের মতো জীনও পেলেন। কিভাবে এই সত্যের পরীক্ষা ঘটবে জীবনে, তার ক্ষেত্রও তাঁরা আবিষ্কার করলেন যখন জানতে পারলেন ১৮৯৪ সালে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির কথা, নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর এক সংবাদ থেকে। সেখানে তখন অধ্যক্ষ স্বামী বোধানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য, কঠোরতপা, চরিত্রগুণে সকলের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর কাছে ভগিনী দুজন উপস্থিত

হলেন এবং গভীরভাবে প্রভাবিত হলেন বোধানন্দের উচ্চ আদর্শের জীবন দেখে। বোধানন্দ এঁদের আধ্যাত্মিক পিতা হয়ে দাঁড়ালেন। এঁরা স্থির করলেন, সক্রিয় বেদান্তের পথ নেবেন। সংস্কৃত শিখতে লাগলেন। অনুভব করলেন, বেদান্ত সোসাইটিই তাঁদের আত্মার আশ্রয়। বেদান্ত সোসাইটির কাছাকাছি একটা বাড়িতে তাঁরা উঠে এলেন।

না, কাছাকাছি নয়, আশ্রয় চাই একেবারে ভিতরে। একদিকে মাতার স্নেহ, গৃহের সুখ, আর্থিক নিরাপত্তার জীবন, অন্যদিকে বিচিত্র এক ধর্মের জন্য সর্ববন্ধন ছিন্ন ক'রে নূতন বন্দরে নোঙর। নূতনের মধ্যে নিত্যকে দর্শন ক'রে রোনাল্ড ঘর ছেড়ে বেদান্তকেন্দ্রে গিয়ে উঠলেন। আর বেদান্ত সোসাইটি রোনাল্ডের মধ্যে এমন একজনকে পেয়ে গেল, স্বতঃস্বচ্ছ যাঁর ঐকান্তিকতা, দূরপ্রসারী যাঁর কল্পনাশক্তি, তীক্ষ্ণ যাঁর বিচারবুদ্ধি এবং বোধের উচ্চারণে যিনি মুক্তকণ্ঠ। রোনাল্ডের জননী কন্যাকে ফেরাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, বিশেষত ১৯৫০ সালে স্বামী বোধানন্দের দেহত্যাগের পরে বেদান্ত সোসাইটি যখন অস্তিত্বের সংকটের মধ্যে আবর্তিত। আত্মীয়-পরিজনরাও একই চেষ্টা করেছেন, বুঝিয়েছেন, যদি মানবসেবা করতে হয় তাহলে ঘরে থেকেও তো তা করা যায়। কিন্তু রোনাল্ড অনড়। "মানবতার কেন্দ্রে আছে মানুষ, তার বাইরের বৃত্ত সমাজ, (স্বামী তথাগতানন্দ বলেছেন), আর বৈদান্তিক আদর্শের কেন্দ্রে আছেন ঈশ্বর কিংবা পরম সত্য, তার বাইরের বৃত্ত মানবসমাজ। রোনাল্ড কঠিন সাহসের সঙ্গে নিজের ভূমিতে দাঁড়িয়ে রইলেন, চাপা শাসানি, নিন্দাত্মক মন্তব্য, এমনকি সামাজিক বয়কটের সম্মুখীন হলেন, তবু বিচলিত হলেন না এতটুকু।" সোসাইটির ঘনীভূত সংকটের মধ্যে সত্যশিখায় তিনি জ্বলতে লাগলেন। অত্যন্ত অসুবিধাজনক এক কক্ষে তাঁকে থাকতে হত, ভ্রূক্ষেপ করলেন না, কারণ ভয়ে নয়, আন্তরিক ভালবেসে তিনি সত্যকে গ্রহণ করেছেন। ১৯৫১ সালে সোসাইটির অধ্যক্ষতার ভার নিতে এসেছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য স্বামী পবিত্রানন্দ। সোসাইটির জীবনে নব পর্ব শুরু হল। বিস্ময়ের কথা, এবার সোসাইটিতে থাকবার জন্য অপর কন্যা জীনকে নিয়ে চলে এলেন তাঁদের মা মিসেস ম্যামান। তিনিও থাকবেন। উন্নত স্বভাবের মহিলা তিনি, পুরাতন ভাবধারায় লালিত, সন্দিগ্ধ ছিলেন কন্যার নূতন আদর্শ সম্বন্ধে। কিন্তু যে-আদর্শ একজনের জীবনে আশ্চর্য ত্যাগের আগ্নেয় মহিমা সৃষ্টি করতে পারে, তার বিষয়ে উদাসীন থাকা সম্ভব ছিলনা। অথচ সোসাইটির সংকীর্ণ বাসস্থানে তাঁর অবস্থান নিরতিশয় কষ্টকর ছিল—কেননা রীতিমত স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনযাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। জীন ছেড়ে দিলেন পিয়ানো-বাদকের জীবন, পরিবারটিকে পালনের জন্য অফিস-সেক্রেটারির কাজ নিলেন। এঁদের চরিত্র সংক্রামিত হল আরো কয়েকজনের মধ্যে, নতুন কর্মীরা উপস্থিত হলেন। স্বভাবে প্রদীপ্ত রোনাল্ড কিন্তু নিজেকে অনেক সময়েই আবদ্ধ রাখতে লাগলেন অপরের সেবার জন্য ক্ষুদ্র রান্নাঘরটির মধ্যে, যা আখ্যা পেয়ে গেল, 'রোনাল্ডের পূজাগৃহ' এবং ১৯৬০ সালে গুড ফ্রাইডের দিন, তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে, সাতাশ বৎসরের বেদান্তসেবার জীবন শেষ ক'রে, যখন তিনি চলে গেলেন, তখন (তার পূর্বেও) তাঁর দেহ সত্যই যেন দিব্যবিভায় মণ্ডিত।

কন্যা গেলেন, কিন্তু আর এক কন্যার সঙ্গে মাতা রইলেন, সেবায় ও সাধনায়, ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত। পঁচানব্বই বৎসর বয়সে মায়ের জীবনান্ত হল। এবার রইলেন কেবল জীন, সেই অন্তর্মুখ শান্তস্বভাব নত-নম্র নারী, পরম পবিত্রতায় আচ্ছাদিত যাঁর

তনু-মন। তিনি আছেন এখনো। প্রতিটি কাজ তাঁর, প্রতিটি কক্ষ তাঁর, পূজাগৃহ তাঁর, বেদান্ত সোসাইটি তাঁর, বেদান্ত তাঁর।

স্বামী তথাগতানন্দ বললেন: জীবনে যখন নৈরাশ্যের মুহূর্ত আসে, অবসন্ন হয় হৃদয়, প্রয়োজন হয় সঞ্জীবনী শক্তির, তখন এই তিনজনের জীবনের কথা ভাবি, যাঁরা মূর্তিমতী বেদান্ত, স্বামীজীর প্রেরণার প্রতিমা—তখন জেগে উঠি নূতন উদ্যমে।

॥ পাঁচ ॥

স্বামী অশোকানন্দের কথা অনেক শুনেছি ও পড়েছি। রোমা রোলাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনী যাঁরা পড়েছেন তাঁরা গ্রন্থের ভূমিকায় এবং গ্রন্থমধ্যে পাদটীকায় স্বামী অশোকানন্দের বিশেষ উল্লেখ দেখেছেন। প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার মনস্বী সম্পাদক অশোকানন্দ রোলাঁকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন সম্বন্ধীয় তথ্যাদি সরবরাহ করেছিলেন এবং যখন ঐ জীবনীর অংশ প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন প্রয়োজন হলেই রোলাঁর বক্তব্যের উপর সংশোধনী মন্তব্য করেছেন সুদৃঢ় যুক্তির সঙ্গে। ইউরোপে তাঁর সঙ্গে রোলাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, রোলাঁ তাঁর ডায়েরিতে এই আত্মবিশ্বাসী তত্ত্বদর্শী অনমনীয় সন্ন্যাসীর রেখাচিত্র দিয়েছেন। অশোকানন্দ দুঃসাহসী, প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক থাকাকালে (১৯২৮-৩০) তৎকালীন ভারতের দেবতাবিশেষ মহাত্মা গান্ধীর অর্থনৈতিক মতের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন ধারাবাহিক রচনায়। সে রচনাগুলি গান্ধীজীকে এমনই বিচলিত করেছিল যে, একাধিকবার নিজ পত্রিকায় তার উত্তর দিয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে (১৯৩১) অশোকানন্দ আমেরিকায় চলে যান; এবং চারিত্রশক্তি, বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা বিরাট প্রভাব বিস্তার করেন। একাধিক বেদান্তকেন্দ্র তিনি স্থাপন করেছিলেন। সানফ্রানসিস্‌কোয় স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং যে-একটি বেদান্তকেন্দ্র স্থাপন করেন, (এপ্রিল ১৯০০), অশোকানন্দ তাতে কাজ শুরু ক'রে কাজের বিস্তার ঘটান। তাঁর বক্তৃতায় অনেক দূর থেকে মানুষ আসত, তাঁদের তাগিদে স্যাক্রামেন্টোয় বেদান্তকেন্দ্র শুরু করেন এবং বিখ্যাত বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে স্থাপন করেন 'বেদান্ত সোসাইটি অব বার্কলে'। সানফ্রানসিস্‌কো বেদান্ত সোসাইটি স্থান পরিবর্তন করেছে একাধিকবার, নাম পরিবর্তনও করেছে। বর্তমান নাম, 'বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দান ক্যালিফোর্নিয়া'। সানফ্রোনসিস্‌কোয় তার নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে। এই বেদান্তকেন্দ্রে যাবার খুবই ইচ্ছা ছিল আমার, কারণ প্রথমত এর সূচনা করেছেন স্বয়ং স্বামীজী, দ্বিতীয়ত এটি স্বামী অশোকানন্দের কর্মকেন্দ্র, শেষত ও বিশেষত এখান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বিবেকানন্দ-গবেষণার মহাগ্রন্থ—মেরী লুইস বার্ক-এর 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন দ্য ওয়েস্ট: নিউ ডিসকভারিজ'। ছয় খণ্ডের এই বই, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৮২, চিত্রসংখ্যা ২৫১, অগণ্য আবিষ্কারে পূর্ণ, তার মধ্যে আছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবেকানন্দের অজস্র সংবাদ ও বক্তৃতার প্রতিবেদন, তাঁর শত শত নূতন চিঠি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বহুসংখ্যক স্মৃতিকথা ও চিঠি, সংকেতলিপিতে ধৃত অপ্রকাশিত বক্তৃতা, তাঁর এবং তাঁর সঙ্গে জড়িত মানুষ ও স্থানের চিত্রাবলী, তাঁর বৈদান্তিক চিন্তার উপস্থাপনা, ব্যাখ্যা ও ক্রমবিকাশের রূপ, এবং কী তাঁর চরম বার্তা তা নির্ণয়ের চেষ্টা। এর

সঙ্গে আছে সন তারিখ, পাঠভেদ, ইত্যাদির খুঁটিনাটি বিচার। এই কাজে জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বছর ব্যয় করেছেন অশোকানন্দ-শিষ্যা এই মহীয়সী নারী, যাঁকে সঙ্গত কারণেই পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী 'গার্গী' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আমাদের সামনে বিবেকানন্দচর্চার দিগ্‌দর্শন করিয়েছেন, তিনি দেখিয়েছেন সেই মহাকায় পুরুষকে যিনি ভারতের মর্যাদা, সত্যের গৌরব এবং দিব্য-মানবতার প্রতিষ্ঠায় এক বিরাট দেশের সমবেত স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর ক্রুর বিদ্বিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে উন্নত অবিচলিত মহিমায় দাঁড়িয়ে ছিলেন নিজ ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, বাগ্মিতা ও অপূর্ব আধ্যাত্মিকতার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে। বিবেকানন্দ অপরিমেয়, অশেষ, তাঁকে পূর্ণত জানা সম্ভব নয়, কিন্তু আগে আমরা যেটুকু জানতাম, তার পরিধি বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছেন যিনি, সেই সর্বপ্রধান বিবেকানন্দ-বিশেষজ্ঞের জ্ঞানতপস্যাভূমি দেখার ইচ্ছা স্বতঃই ছিল।

ডাঃ মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ব্যবস্থামতো আমরা বার্কলেতে উঠেছিলুম ডাঃ শ্যামল নন্দী ও ডাঃ প্রণতি নন্দীর সুন্দর বাসভবনে। শ্যামল নন্দী মহাশয়ের পেশা ডাক্তারি, নেশা বইপড়া, বাগান করা ও মাছ-ধরা। ৩০ জুলাই খুবই সকালবেলায় শ্রীমতী নন্দী চাকরিতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, (এখানকার মানুষ চাকরি করলে চাকরিটা করেন), শ্রীমতী মায়া ও আমি শ্রীযুক্ত নন্দীর সঙ্গে আঁকাবাঁকা মনোরম পার্বত্যপথ পেরিয়ে একটি অসাধারণ সুন্দর হ্রদের ধারে পৌঁছেছিলুম। নন্দী মহাশয়ের মৎস্যশিকার এবং আমাদের ইতস্তত সৌন্দর্যভক্ষণের পরে, দুপুর ১২টার সময়ে নন্দীভবনে ফিরে শুনলুম, সেই সবে শ্রীমতী নন্দী কর্মস্থল থেকে ফিরেছেন। আরো আগে ফেরার কথা ছিল, আমাদের নিয়ে তিনি সানফ্রানসিস্‌কোর বেদান্তকেন্দ্রে যাবেন, কিন্তু এখন তিনি ক্লান্ত, যাবেন কি করে? অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছা নয় আমরা যাই। কে বলে সে কথা। 'ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার ইচ্ছায় সকলি হয়'। শ্রীমতী নন্দী তাঁর ছাঁটা চুলে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, চলুন যাওয়া যাক। সুতরাং ভরদুপুরে যাত্রা শুরু হল। শ্রীমতী মহাশয়া স্টিয়ারিং ধরলেন, শ্রীযুক্ত মহাশয় কোলের উপরে মেলে ধরলেন ম্যাপ, কারণ সানফ্রানসিস্‌কোর এই কেন্দ্রে এঁরা বিশেষ যাননি। এর পরে ম্যাপ দেখাদেখি, পথ-সন্ধান, অতি সুন্দর পথের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক, ৮/৯ মাইল দীর্ঘ সেতু অতিক্রম, জলপ্রপাতের মতো নীচে আছড়ে-পড়া একটা রাস্তায় গড়গড় করে নেমে-পড়া ইত্যাদি শেষ ক'রে, সানফ্রানসিস্‌কোর সাজানো শহর-দর্শনের মুগ্ধতার সঙ্গে উদ্বেগ মিশিয়ে, অবশেষে পৌঁছেছিলুম দুপুব দুটো নাগাদ বেদান্তকেন্দ্রের বন্ধ দরজার সামনে। ঘণ্টা বাজাতে দরজা খুলে দিলেন এক বৃদ্ধা সৌম্যদর্শনা নারী। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় স্বামী আত্মস্থানন্দ পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন, সেটি পেশ করলুম। অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ এখন নেই, সেই মহিলাই আমাদের মন্দিরাদি দেখালেন, আমরা পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র দেখতে চাইলুম, নীচে সেই ঘরের দরজায় আমাদের পৌঁছে দিয়ে তিনি জানালেন, যিনি বই বিক্রয় করবেন তাঁকে ডেকে দিচ্ছি। আমরা কিছুক্ষণ বই ওল্টাচ্ছি, পিছনে ঈষৎ শব্দে বুঝলুম কেউ এসেছেন, ফিরেই দেখি, দাঁড়িয়ে আছেন—মেরী লুইস বার্ক! পৃথিবীতে তো নাটক আছে, সুতরাং নাটকীয় ঘটনা থাকবেই। হতভম্ব হয়ে বললুম, গার্গী, আপনি এখন এখানে! গার্গীও বিস্ময়ে সামলে বললেন, কী আশ্চর্য, আমিও তো আপনার সম্বন্ধে সেই প্রশ্নই করব। অতঃপর কিছুক্ষণ বার্তাবিনিময় । গার্গী জানলেন, আমি কেন, কিভাবে

এসেছি, আর আমি জানলুম, তিনি কাছেই থাকেন, বেদান্ত কেন্দ্রে নানা কাজ করেন, তার মধ্যে বই বিক্রিও আছে।

ফিরবার সময়ে ভাবছিলুম, তাহলে শ্রীমতী বার্ককে তাঁর স্বস্থানে 'আবিষ্কার' করা গেল, যিনি স্বামী বিবেকানন্দকে আমেরিকার প্রান্তে-প্রান্তে আবিষ্কার করেছেন। সেইসব আবিষ্কারের কাহিনী বলার স্থান এ নয়। তবু দু'একটা চিত্তাকর্ষক কথা মনে পড়ছিল। যেমন স্বামীজী ভারতে ফেরার পরে আমেরিকার একটি সংবাদপত্রে তাঁর সংবর্ধনা সম্বন্ধে বিচিত্র সংবাদ বেরিয়েছিল: বিবেকানন্দের কৃতিত্বের সংবাদে তাঁর দেশবাসী এমনই উল্লসিত হয় যে, বিবেকানন্দকে তারা হাতের উপর তুলে নেয় এবং হাতে-হাতে করেই গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে নিয়ে যায়, এমন যে ১৭ মাইল পথ তাঁর পা মাটিতে ঠেকেনি। কিংবা সেই ছবিটি—স্বামীজী হেসে গড়িয়ে পড়েছেন 'My Friend from India' নামক প্রহসন দেখে, যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'শতাব্দীর সবচেয়ে সাফল্যমণ্ডিত ফার্স-কমেডি', অভিজাতমহলে বিবেকানন্দকে নিয়ে কাড়াকাড়ি ঘটনার ছায়া-অবলম্বনে সেটি লেখা হয়। আরো একটি সংবাদ: আমরা মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী থেকে জেনেছি, তিনি ১৯০২ সালের গোড়ার দিকে স্বামীজীর দর্শনলাভের জন্য কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে বেলুড়মঠে গিয়েছিলেন কিন্তু স্বামীজী অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় ছিলেন বলে দেখা না-পেয়ে হতাশ হন। শ্রীমতী বার্কের গ্রন্থমধ্যে গান্ধীজীর এতাবৎ অজ্ঞাত একটি চিঠি রয়েছে, যাতে দেখা যায়, গান্ধীজী ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বি. এন. ভাজেকরকে লিখেছিলেন:

> "...আমাদের এখানে দর্শন দেবার জন্য স্বয়ং স্বামীজীকে কি প্রণোদিত করা যায়না? তাঁর মিশন সফল করার জন্য আমি যৎপরোনাস্তি করব। তিনি ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচারকাজ করতে পারবেন। আমি ধরে নিচ্ছি, তিনি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন, সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন। যদি আসেন, তাহলে একটা কাজ নিশ্চয়ই করতে পারবেন। তিনি তাঁর বাগ্মিতার দ্বারা ইউরোপীয়দের বিদ্যুৎশিহরিত করতে এবং তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'কুলিদের' পছন্দ করার মতো সম্মোহিত করতে পারবেন।"

সম্মোহিত স্বামীজী সত্যই করতে পারতেন, কথাটা ঠিকভাবে বলতে গেলে, 'উত্তোলিত' অথবা 'উন্নীত'। ক্রিশ্চিনা অ্যালবার্স তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। স্বামীজী অসুস্থ ছিলেন। ক্লান্ত ভারী পদক্ষেপে মঞ্চে উঠেছেন, দেখে মনে হল, খুবই শারীরিক যন্ত্রণায় আছেন।

"কথা শুরু করার আগে নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে দেখতে পেলাম। তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সমস্ত চেহারাটাই নতুন রূপ নিয়েছে। বলতে শুরু করলেন—একেবারে পরিবর্তিত আকার। সেই বিরাট পুরুষের আত্মিক শক্তি এখন যেন দৃশ্যমান। তাঁর ভাষণের প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করতে লাগলাম—শব্দগুলি শোনার চেয়ে যেন অনুভূত হল অনেক বেশিভাবে। বিশাল আত্মার সমুদ্রে আমাকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ঊর্ধ্বতর উপলব্ধির স্তরে উপনীত হয়েছি, বক্তৃতাশেষে সেই অবস্থা থেকে

অবতরণ কী যন্ত্রণাদায়ক! সেই দুই আঁখি—অপূর্ব—আকাশ থেকে খসে-পড়া তারার মতো জ্যোতি বিকীর্ণ করতে-করতে গতিশীল।”

আর বিবেকানন্দের সেই গর্বিত সত্যঘোষণা—অযথা নিন্দার সম্মুখীন হয়ে যা বলেছিলেন:

“আমি যা, তা লেখা রয়েছে আমার ললাটে। যদি সে লেখা পড়তে পারো, ধন্য তুমি, যদি না-পারো সে ক্ষতি তোমারই—আমার নয়।”

বিবেকানন্দের চরম বাণী—দিব্য-মানবতা। ক্যালিফোর্নিয়ায় তা ঘোষিত হয়—এই দাবি নানা যুক্তির সঙ্গে উত্থাপন করেছেন শ্রীমতী বার্ক। কিন্তু একটি প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে তিনি বিমূঢ়—স্বামীজী কেন অসীম শারীরিক ও মানসিক কষ্ট স্বীকার ক'রে আমেরিকার এ-প্রান্তে, ও-প্রান্তে, শহরে-গ্রামে-গঞ্জে বেড়ালেন, বক্তৃতা করলেন অনেক সময়েই শত শত রূঢ়, অমার্জিত, সূক্ষ্ম অনুভূতিবর্জিত আমেরিকান শ্রোতার সামনে—সে কি কেবল ভারতের উন্নয়নমুখী কাজে অর্থসংগ্রহের জন্য, কিংবা ভারতের ধর্ম ও সভ্যতার বিরুদ্ধে জমে-ওঠা মিশনারি-কুৎসার জঞ্জাল পরিষ্কারের জন্য, কিংবা এমনকি মানবের দিব্যতা-ঘোষক বিশ্ববাণী প্রচারের জন্য? এর প্রত্যেকটি কারণ স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থানের পিছনে রয়েছে। কিন্তু আরো একটি উত্তর ভাববার বা দেবার চেষ্টা করেছেন লেখিকা—সে উত্তর এক আর্ত কিন্তু বিশ্বাসী আমেরিকানের। সুবৃহৎ দেশ আমেরিকা, প্রচুর তার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, বহুদেশের ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসী মানুষ এখানে সমবেত হয়ে অপরিসীম শ্রমের মূল্যে এই দেশকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ক'রে তুলেছে—কিন্তু এক জায়গায় বিরাট শূন্যতা, ঈশ্বরের এতবড় সৃষ্টিভূমি কোনো ঈশ্বরপুত্রকে পায়নি। রামকৃষ্ণ-নিয়ন্ত্রিত বিবেকানন্দ যখন আমেরিকার দিকে দিকে ভ্রমণ করেছেন, অগণিত মানুষকে দেখেছেন, স্পর্শ করেছেন, তারাও তাঁকে স্পর্শ করেছে, তাঁর কণ্ঠধ্বনি শুনেছে—তখন তাদের অজ্ঞাতে, অনির্বচনীয় অধ্যাত্মতরঙ্গ তাদের স্পর্শ ক'রে গেছে। নতুন পৃথিবী-স্রষ্টা আমেরিকা তার সমস্ত সৃষ্টিসম্ভার সাজিয়ে অবশ্যই দাবি করতে পারে তাদের মধ্যে ঈশ্বরপুত্রের আবির্ভাবকে। তা সে পেয়েছিল।

বলা বাহুল্য এ হলো এক বিশ্বাসীর ধারণার কথা—সে এমন বিশ্বাস যা জীবনের প্রধান অংশকে বিবেকানন্দ-দর্শনের একাগ্র সাধনায় একজনকে নিয়োজিত করতে পারে।

উত্তর-ক্যালিফোর্নিয়া বেদান্ত-মঠ থেকে ফেরার পথে আমরা বেলা চারটে নাগাদ বার্কলে বেদান্তমঠে কিছুক্ষণ কাটিয়েছি। সেখানকার অধ্যক্ষ স্বামী অপরানন্দ এবং স্বামী স্বাহানন্দ বিশেষ নিমন্ত্রণে নন্দীভবনে এসেছেন সন্ধ্যায়। এঁদের সুন্দর পূজাঘরে আরতির কাজ তাঁরা করেছেন, আমরা সেখানে বসেছি, তখন এই কথাটা মনে জেগেছে, আরতির তো একটা রূপ নয়, বিবেকানন্দ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ আমেরিকাকে দান করেছিলেন, তার বিরাট সংবাদ এবং ভিতরের গভীর বার্তা যিনি সংগ্রহ ক'রে ভারত ও পৃথিবীকে ফিরিয়ে দিলেন, তাঁর জীবনময় আরতির কি তুলনা আছে—অন্তরে দীপ জ্বেলে, বিবেকানন্দের আচ্ছন্ন প্রকাশগুলির সামনে দাঁড়িয়ে, সেগুলিকে আলোকিত ক'রে আমাদের গোচর যিনি করলেন! তিনি বিশ্ব-ভারতের গার্গী।

॥ ছয় ॥

ডাঃ মদনগোপাল ও ডলি মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কল্যাণীয়া মিষ্টি মুখোপাধ্যায় কলেজীয় শিক্ষা সাঙ্গ ক'রে, চাকরি নিয়ে, তা ছেড়ে, আবার একটা চাকরি নিয়ে, সানফ্রানসিস্‌কোয় অবস্থান করছিলেন। অল্প বয়স, ছোটখাট উজ্জ্বল চেহারা, হাসিমুখ, চকচকে চোখ, এবং গাড়ির স্টিয়ারিং-এ নিশ্চিত হাত।

আমাদের মতো প্রবীন ও প্রবীণার শত শত মাইলের বহু যাত্রার তিনি সারথি। তাঁর সঙ্গে ১ জুলাই সকাল সাড়ে ৯টায় বার্কলে থেকে বেরিয়ে পড়া গেল স্যাক্রামেন্টোর উদ্দেশে—সেখানে বেদান্ত-মঠ আছে, সর্বোপরি সেখানে সাধুদর্শন করা যাবে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সেখানে আছেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আমাদের স্কুল-জীবনের বিমলদা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদীপ্ত ছাত্র, মহাপুরুষ-মহারাজের (শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী শিবানন্দ) সান্নিধ্যে তাঁর ধর্মদীক্ষা, বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী বিরজানন্দের মতো মহাপুরুষের এক যুগের তিনি সেবক-সেক্রেটারি, উদ্বোধন পত্রিকার পাঁচ বছরের সফল সম্পাদক, ১৯৫৭ থেকে একাদিক্রমে পঁয়ত্রিশ বৎসর আমেরিকাবাসী—ধর্মদানের জন্য—(স্বামী শ্রদ্ধানন্দের ক্ষেত্রে 'ধর্মপ্রচার' অপেক্ষা 'ধর্মদান' কথাটি অধিক প্রযোজ্য)—তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এবং তাঁকে প্রণাম জানাতে আমরা খুবই উৎসুক ছিলাম, কল্যাণীয়া মিষ্টিও তাই, কারণ মহারাজ তাঁকে খুবই স্নেহ করেন।

একশ মাইলের উপর পথ পেরিয়ে এবং চোখের আনন্দ সংগ্রহ ক'রে, কেননা উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া ফলভারে আনত ও অরণ্যে আন্দোলিত, বেলা সাড়ে এগারোটার সময়ে স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত-মঠে পৌঁছেছিলুম। সেটি কি মঠ, নাকি বিশাল সুরচিত উদ্যান? অভ্যর্থনা জানালেন স্বামী প্রপন্নানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সহকারী। কিছু পরে শ্রদ্ধানন্দ-স্বামীর দেখা পেলুম, লাঠি ধরে ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, বীণার ঝঙ্কারের মতো মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর, আমাদের প্রণাম নিয়ে, আশীর্বাদ জানিয়ে, স্বামী প্রপন্নানন্দকে বললেন, এদের সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দাও। স্বামী প্রপন্নানন্দের সঙ্গে বেশ খানিক সময় নিয়ে আশ্রমের চারপাশে ঘুরলুম। মধ্যবয়সী এই সন্ন্যাসী—চেহারা, কণ্ঠস্বর এবং বক্তব্যে স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা। আগে রাজকোট আশ্রমে ছিলেন, কয়েক বছর এখানে আছেন। স্বদেশীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে কৌতূহল আছে, বিশেষত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে। এই বেদান্ত-মঠ সম্বন্ধে নানা কথা জানতে পারলুম। ১৯৪৯ সালে স্বামী অশোকানন্দের প্রেরণায় তাঁর গুণমুগ্ধরা এর সূচনা করেন; ১৯৫০ সালে বর্তমান স্থানটি কেনা হয়; ভক্তদের স্বেচ্ছাশ্রমে আশ্রম গড়ে ওঠে (যা আশ্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এখনো অব্যাহত); ১৯৬৪ সালে মূল ভবন ও মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত হয়; সেই সময় থেকে এটি উত্তর-ক্যালিফোর্নিয়া বেদান্তকেন্দ্রের শাখা না থেকে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের রূপ নেয়। ফুলের সমারোহ, বৃহৎ সার-সার সাইপ্রাস গাছের উন্নত গাম্ভীর্য, আরো নানা বৃহৎ বৃক্ষের ছায়া, এবং তারই মাঝে-মাঝে সেন্ট ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসি, মোজেস, বুদ্ধ, নানক, শ্রীচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ মহাপুরুষ ও অবতারদের মূর্তি। উদ্যানটির নাম তাই 'সন্তোদ্যান'। মূর্তিগুলির পাদমূলে তাঁদের আবির্ভাব তিথিতে ভক্তরা সমবেত হয়ে উপাসনাদি করেন। তাছাড়া গৃহী-ভক্তদের সাময়িক অবস্থানের জন্য রয়েছে 'অশোক কটেজ' ও 'হোলি মাদারস্ কটেজ'। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কবি-স্বভাব। উদ্যানের বারোটি বৃহৎ গাছকে

বলেন বারোজন ঋষি। প্রতিটি গাছের সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক—কণ্ব মুনির মতোই। তিনি বাংলা ও ইংরেজীতে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন, তাঁর ইংরেজী বক্তৃতার ক্যাসেট বিক্রয় হয়, কিন্তু তিনি যে নয়টি গ্রন্থের লেখক, তার সবগুলিই বাংলায় লেখা—তার মধ্যে স্বামী বিরজানন্দের জীবন ও স্মৃতির সূত্রে রামকৃষ্ণ আন্দোলনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থ 'অতীতের স্মৃতি'—এই ক্ষেত্রে ক্লাসিক সৃষ্টি। বইটির ইংরেজী ভাষান্তর অবশ্য হয়েছে।

এই বেদান্তকেন্দ্রের বহুবিধ কার্যাবলীর হিসাব নেওয়ার চেয়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সান্নিধ্যলাভের জন্যই উৎসুক ছিলুম। প্রতিভাদীপ্ত অথচ ভাবগম্ভীর মন নিয়ে যিনি স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দের সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন, তাঁর সঙ্গ সবচেয়ে বড় পুরস্কার। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে মধ্যাহ্ন ভোজনের কালে সেই সুযোগ যথেষ্ট মিলল। সেই আসরে রীতিভঙ্গ ক'রে আমরা বাংলাতেই কথাবার্তা বলেছিলুম। ভোজসভায় বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ আমেরিকান সাধু ছিলেন—যাঁদের বয়স আশি পেরিয়ে গেছে। শ্রদ্ধানন্দ বললেন, এ হল আমাদের আশির ক্লাব। ওঁদের দেখিয়ে বললেন, এই আশ্রমের গঠনে এঁরা জীবন দান করেছেন। বললেন, আমার বয়স ছিয়াশি, অন্যদের কারো সাতাশি, কারো একাশি, কারো তিরাশি ইত্যাদি। যাঁর বয়স তিরাশি, তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন—বিরাশি। তাতে সেই বৃদ্ধ সাধু আপত্তি জানালেন, 'No no, I am not that young!' শ্রদ্ধানন্দের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে মহাপুরুষ-মহারাজের কথা বিশেষভাবে এল। আমার শিক্ষক, হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের প্রয়াত সম্পাদক মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাদলবাবু) ভক্তিসঙ্গীতের বড় গায়ক ছিলেন। তাঁর গান শুনে মহাপুরুষ-মহারাজ সমাধিস্থ হয়েছিলেন, সে কথা উনি স্মরণ করিয়ে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্য শিষ্যদের প্রসঙ্গ উঠল, প্রতিভাধর গিরিশচন্দ্র ঘোষের কথা বিশেষভাবে। বহুক্ষণ কথাবার্তার পরে মহারাজ উঠলেন এবং আমাদের নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। সারদা-মঠের পক্ষ থেকে ওঁদের মন্দিরের ছবি উপহার দিয়েছেন, তা দেখিয়ে বললেন , 'দ্যাখ, ওঁরা মাকে (সারদাদেবী) মাঝখানে বসিয়েছেন, ঠাকুরকে নয়, এটা কি ঠিক, তুমি কি বল?' আমি বললুম, আপনি বলুন। উনি খানিক চুপ থেকে বললেন, 'এই জগতে সব একাকার, আগে পরে কেউ নেই।'

ভরা মন নিয়ে বেলা তিনটের সময় বেরিয়ে—একটানা তিনশ মাইলের উপর মিষ্টি-চালিত চক্রনির্ভর আমাদের যাত্রা রাত্রি ৯টার পরে বেকারস্‌ফিল্ডে ডাঃ মদনগোপালের বাড়িতে শেষ হয়েছিল। নৈশ আহারাদির পরে বসে আছি, টেলিফোন বাজল—আমাকে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ডাকছেন। টেলিফোন ধরতে বললেন, নিরাপদে পৌঁছেছ তো? বললুম, হ্যাঁ। উনি বললেন, শোনো, ডায়েরিতে লিখেছিলুম, তোমরা যাত্রা করেছ, লিখে বসে আছি। এবার লেখাটা শেষ করব, তোমরা পৌঁছে গেছ, কথাগুলি লিখে। বলেই ঝরঝর করে হাসি। অপূর্ব স্নেহের জলতরঙ্গ।

॥ সাত ॥

২৫ জুন অ্যানাহেইমে শ্রীযুক্ত দিলীপ ও শ্রীমতী সুনন্দা ব্যানার্জির সুসজ্জিত ও আরামদায়ক বাসভবনে নৈশ আহারের কালে ও পরে আমন্ত্রিত নানা বিদগ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা রীতিমত জমে উঠেছিল। শ্রীযুক্ত পিনাকী চক্রবর্তী, ডাঃ মণি ঘোষ, শঙ্কর বসু, দীপক রায় এবং আরও কেউ কেউ সস্ত্রীক এসেছিলেন। এঁরা বিজ্ঞানের নানা শাখার বিদ্যাধারী। স্বভাবতই এঁদের এবং এঁদের বিদুষী সহধর্মিণীদের মতামত স্পষ্ট ও প্রখর। ধর্ম কী প্রকার বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, সে বিষয়ে এঁরা রীতিমত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ভারতবর্ষে মৌলবাদের প্রসার ঘটছে, তার ভবিষ্যৎ কী? এসব ক্ষেত্রে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা স্বতই উঠেছিল। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে অবশ্যই ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে কিন্তু সে আন্দোলন একপাক্ষিক হলে কি সফল হবে? ভারতবর্ষ এখন মৌলবাদী দুই রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী; ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় মুসলিম মৌলবাদ হিংস্র রূপ নিয়েছে; ষাট বছরের না-ধর্মের কম্যুনিস্ট লৌহশাসন—রাশিয়াতে বা পূর্ব ইউরোপে ধর্মীয় মৌলবাদকে একটুও দুরস্ত করতে পারেনি; এই অবস্থায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ভারতীয় হিন্দুরা অনুচিত মৌলবাদের চর্চা থেকে বিরত থাকতে পারবে কি—বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠেছিল কিন্তু কেউই সদুত্তর দিতে পারেন নি। এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের মতামতের প্রশ্ন কেউ কেউ তুলেছিলেন। আমি যথাসাধ্য স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম—তার মধ্যে তাঁর ধর্মীয় বক্তব্য-সহ অর্থনৈতিক, শিল্পগত, শিক্ষাগত নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ ছিল। দেখা গেল, ঐ সমাবেশে অন্য বিষয়গুলিতে যতই মতান্তর থাক, স্বামীজী প্রসঙ্গে তাঁরা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি পিনাকী চক্রবর্তী-সহ সকলেই, বললেন যে, স্বামীজীর কথা আলাদা— তিনি বিরাট ব্যাপার।

সপ্তাহখানেক ধরে দক্ষিণ ও উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার কয়েকটি বেদান্তকেন্দ্র দেখার পরে, ২ জুলাই বেকারস্‌ফিল্ড থেকে লস্ এঞ্জেলেসে বঙ্গসম্মেলনের উদ্দেশে মায়া ও আমি চলেছি ডলি মুখোপাধ্যায় ও মিষ্টি মুখোপাধ্যায়ের গাড়িতে, পথে একটু ঘুরে উপস্থিত হলুম সান্টা বারবারা কনভেন্টে। হলিউড বেদান্তকেন্দ্রের দ্বারা এটি পরিচালিত। শ'দেড়েক মাইলের অনবদ্য পথ পেরিয়ে এসেছি, পথের পাশে কখনো পাহাড়, কখনো সমুদ্র, বনভূমি, শস্যক্ষেত্র, চঞ্চল বাতাসে সৌন্দর্যের লুটোপুটি। পৌঁছেছিলুম অপার্থিব শান্তির আবাসে। অনেকখানি জায়গা নিয়ে কনভেন্ট; এক মস্ত পুরোনো ঘণ্টার পাশ দিয়ে (দ্বাদশ শতাব্দীর চীনা ঘণ্টা, মিঃ ডোনাহু নামক ভক্তের দ্বারা উপহৃত) মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি; ভিতরে গর্ভমন্দিরে সঘন পরিবেশে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশাল পট; গর্ভমন্দিরে প্রবেশমুখে দুই পাশে দুই মানুষ-প্রমাণ ভগবান বুদ্ধ ও যীশুখ্রীস্টের ছবি—তিনটি চিত্রই স্বামী তদাত্মানন্দের আঁকা। মন্দিরটি সান্টা বারবারার শ্রেষ্ঠ এক স্থপতি লুটা মারিয়া রিগস্-এর পরিকল্পনায় নির্মিত এবং ১৯৫৬ সালের শ্রেষ্ঠ নাগরিক ভবনের পুরস্কার প্রাপ্ত। মন্দির থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে দাঁড়াতেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি, দূরে নীলসমুদ্র ধূসর, চারপাশে যেন কোনো মানুষ নেই, অতল শান্তির রাজ্যে আমরা কয়েকজন। ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি, সুতরাং মনের প্রয়োজনমাফিক শান্তিভঙ্গ ক'রে আমরা হাজির হলুম সেল্‌স কাউন্টারে। সেখানে বইপত্র এবং ধর্মীয় নানা

বিক্রেয় বস্তুর মধ্যে বসেছিলেন অত্যন্ত প্রসন্নমূর্তি এক প্রৌঢ়া—প্রব্রাজিকা কৃষ্ণপ্রাণা, আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন, তারপর পৌঁছে দিলেন ওঁদের অভ্যর্থনাকক্ষে তপস্বিনী নারী আনন্দপ্রাণার কাছে, তিনি আশপাশ ঘুরিয়ে দেখালেন তারপর নিয়ে গেলেন পুরোনো ঠাকুরঘরে। ছোট ঘরটি। কিন্তু আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের পট বসানো সেই পূজাঘরে যেন খুঁজে পেলুম আমাদের পরিচিত ঠাকুরঘরকে, যেখানে সবকিছুকে খুবই নিজের বলে মনে হয়।

॥ আট ॥

লস্ এঞ্জেলেসে প্রথম পৌঁছে প্রায় ধুলোপায়ে গিয়েছিলুম প্যাসাডেনায় 'বিবেকানন্দ হাউস'-এ। ২৪ জুন এয়ারপোর্টে আমাদের গ্রহণ করেছিলেন ডঃ প্রসূন দে, সঙ্গে তাঁর তরুণ নাতি। ডঃ দে বঙ্গসম্মেলনের সেমিনার-অংশের অধ্যক্ষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের প্রাক্তন অধ্যাপক তিনি, আমেরিকাতেও অধ্যাপনা করেছেন; তাঁর স্ত্রী ও কন্যা বিদুষী ও সহৃদয়া; জামাতা শ্রীযুক্ত সাগর রক্ষিতও প্রাক্তন অধ্যাপক, এখন সরকারী চাকুরে, কিন্তু তার বাইরে অত্যন্ত সামাজিক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রখর-বচন; একদা খেলাধুলা-জগতে নাম করেছিলেন।

এই পরিবারে আলোচনার সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ উঠেছিল এবং ডঃ দে আমার মনোভাব জানতেন বলে অবিলম্বে শ্রীমতী মায়া-সহ আমাকে নিয়ে চললেন সেই বাড়িটিতে যেখানে স্বামীজী ১৯০০ সালের জানুয়ারিতে ও ফেব্রুয়ারিতে মাসাধিক কাটিয়েছিলেন। আমেরিকায় স্বামীজী নানা স্থানে ছিলেন কিন্তু থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে অবস্থান বাদ দিলে একটানা এত বেশিদিন আর কোথাও থাকেননি। স্বামীজীর স্মৃতিজড়িত এই ভবনটির স্বত্বাধিকার—সৌভাগ্যের বিষয়, ১৯৫৫ সালে সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার বেদান্ত-সোসাইটি লাভ করে। স্বামীজীর কালে প্যাসাডেনা ছিল মফঃস্বল শহরের মতো, জনসংখ্যা বেশি নয়, কিন্তু এখন বিশাল বিশাল বাড়ি ও কলকারখানা নিয়ে তা বিরাট শহর হয়ে উঠেছে—তারই মধ্যে নিজ গৌরবে অবস্থিত এই ছোট দোতলা বাড়িটি, ভিক্টোরীয় স্থাপত্যের উত্তম নমুনা। বাড়িটির আকার বদলানোও যাবেনা, 'কালচারাল হেরিটেজ কমিশন' এটিকে 'হিস্টরিক্যাল ল্যান্ডমার্ক' বলে ঘোষণা করেছে এবং তা লিখিত আছে স্মারক ফলকে। অর্থাৎ বিবেকানন্দের বাড়ি বিবেকানন্দের স্পর্শ নিয়ে আছে এবং থাকবে। স্বামী বেদরূপানন্দ, আমেরিকান সাধু, বাড়িটির ভার নিয়ে আছেন। বাড়িটি দেখাতে দেখাতে বলতে লাগলেন, অভ্যন্তর অংশ যথাসম্ভব স্বামীজীর কালের মতই রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, উপর তলায় স্বামীজীর শয়নঘরটি এখন ধ্যানঘর। নীচের তলায় যে-টেবিলে তিনি আহারাদি করতেন, সেটি ফায়ারপ্লেসের কাছে রাখা আছে। যে-রান্নাঘরে তিনি রাঁধতেন, যে-ছোট বাগানটিতে বেড়াতেন ও শিশুদের সঙ্গে খেলা করতেন, তা একইভাবে রক্ষিত।

বাড়িটি ছোট, ঘরের সংখ্যা বেশি নয়। দেখতে দেখতে শ্রীমতী বার্কের বিস্ময়সূচক উক্তি মনে পড়ে গেল—ঐ রকম একটা ছোট বাড়িতে অতগুলি মানুষ কী ক'রে থাকতেন এবং

স্বামীজী কিভাবে-বা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন! বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পাঠকের কাছে এই ভবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্মৃতির সুবাস।

স্বামীজী এখানে সত্যই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন। তার আগে তাঁকে সাড়ম্বরে আমন্ত্রণ ক'রে নিজ বাড়িতে অতিথি করেছিলেন এক ধনী অভিজাত মহিলা, যে-ধরনের ব্যাপার তাঁর জীবনে সুপরিচিত। কিন্তু তিনি চাইলেন সহজ স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের সান্নিধ্য। আর মিড ভগিনীত্রয় (মিসেস ক্যারী মিড ওয়াইকফ, মিসেস অ্যালিস মিড হ্যানস্‌বরো, মিস হেলেন মিড) ছিলেন নিতান্তই মধ্যবিত্ত, আচরণে সাদামাটা, বিদ্যা-বৈদগ্ধ্যে অনুজ্জ্বল, কিন্তু আনুগত্যে সেবায় আন্তরিক। একদিন সকালে দক্ষিণ প্যাসাডেনায় মিডদের বাড়ির সামনে একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল, দরজার সামনে ঝুপঝাপ ক'রে কয়েকটি ব্যাগ পড়ল, এবং স্বামীজী হাসিমুখে সেখানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে জানিয়ে দিলেন, "তোমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আমি এসেছি। বাপ্‌রে, যাঁর বাড়িতে ছিলাম—কী দারুণ রকমের লেডি তিনি!"

বলা বাহুল্য, মিড ভগিনীদের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা ছিলনা। স্বামীজীর সেই দ্বিতীয় আমেরিকা প্রবাস এবং আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে প্রথম বার্তাদানের কার্যসূচনা। লস্‌ এঞ্জেলেসে তিনি ১৯০০ সালের ডিসেম্বরের গোড়ায় পৌঁছন; শুরু হয়েছিল তাঁর নববার্তা দানের শেষ পর্ব। বক্তৃতা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে জনসমাগম ঘটল এবং সংবাদপত্রে বিস্তৃত বিবরণ বেরুতে লাগল, যার মধ্যে ছিল: "তিনি সত্যসত্যই ভারতীয় রাজা—মনীষার রাজা, জ্ঞানের রাজা এবং সেই অদ্ভুত রাজ্যের রাজা যাকে অস্পষ্টভাবে বলা হয় আধ্যাত্মিক।" ('লস্‌ এঞ্জেলেস ক্যাপিটাল')। "তাঁর মুখ থেকে যে-ভাষা নির্গত হয়, তার সৌন্দর্য কেবল হোরেসের কাব্যের তরঙ্গধ্বনির সঙ্গে তুলনীয়।" ('লস্‌ এঞ্জেলেস হেরাল্ড')। ব্ল্যানচার্ড-হলে এই মিড ভগিনীরা স্বামীজীর বক্তৃতা শুনেছিলেন, "যিনি অনন্তকে সর্বাঙ্গে বহন করেন।" অজস্র শ্রোতার সামনে বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়ে গেলেন স্বামীজী, শ্রোতারা দেখল "তাঁর মধ্যে ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্টের বিদ্যাবত্তা, আর্চবিশপের মর্যাদা এবং স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ এক শিশুর লাবণ্য ও মোহন আকর্ষণ।" ('ইউনিটি')। কিন্তু স্বামীজী কেবল মোহিত করতে চাননি, তিনি আঘাত ক'রে, বিদ্ধ ক'রে, ধাক্কা দিয়ে, নবচেতনায় উদ্দীপ্ত করতে চাইতেন। কঠিন তাঁর

"যে একদিকে চায় সুন্দর আরামের জীবন, অন্যদিকে চায় আত্মদর্শন, সে হল সেই নির্বোধ মানুষটির মতো, নদী পার হবার জন্য কাষ্ঠখণ্ড ভেবে কুমীরকে যে আঁকড়ে ধরেছিল।"

অপরিচিত এবং ভয়ঙ্কর তাঁর বক্তব্য:

"যতক্ষণ না মুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ যন্ত্রে-বাঁধা জীব তুমি। তুমি ভালো হয়েছ বলে গর্ব করছ? তোমার পক্ষে ভালো না-হয়ে উপায় নেই বলেই তুমি ভালো। অন্য একজন একইভাবে মন্দ। তার অবস্থায় পড়লে, হে ভালো, তোমার অবস্থা কী দাঁড়াত কে বলতে পারবে? পথে বেসাতি-করা ঐ যে মেয়েটি, জেলের মধ্যে রয়েছে ঐ যে চোরটি—ওরাও যীশু, তোমাদের ভালো রাখার জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছে। এরই নাম ভারসাম্যের নীতি।...আমি ঈশ্বর-খ্রীস্টের পূজারী, আমি দানব-খ্রীস্টের পূজারী। এই আমার বার্তা—না জানিয়ে উপায় নেই।...পথের ব্যবসায়িনী নারীকে আমি ঘৃণা করব, কেননা সমাজ তাই চায় বলে? যে নারী পরিত্রাতা, পথে পথে ঘুরে যে নারী অপর নারীদের সতীত্ব রক্ষা করছে—ঘৃণা করব তাকে?"

স্বামীজীর মুখে বক্তৃতামঞ্চ থেকে এইসব কথা মিড ভগিনীরা শুনেছেন, জ্যোতির্ময়

খ্রীস্টের আকারে তাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তথাপি খুবই স্বচ্ছন্দে তাঁকে গ্রহণ করেছেন নিজেদের বাড়িতে, কারণ তাঁরা কিভাবে যেন অনুভব করেছিলেন, স্বামীজীর শরীর ভালো নয়, তিনি শান্তির অবসর চান বক্তৃতার ফাঁকে, তা এই ছোট গৃহস্থ বাড়িটিতে তিনি পাবেন। দুই-তলা বাড়িটি খুবই ছোট, চার-পাঁচটি ঘরের বেশি নেই, স্বামীজীকে একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে 'একাধিক অতিথিসুদ্ধ' বাকি আট-নয়টি মানুষ ঐ বাড়িতে থাকতেন, অথচ নির্জনতার শান্তি রক্ষিত হতো—ব্যাপারটা সত্যই বিস্ময়কর। এক মাসের উপর সেখানে তিনি ছিলেন; ইউনিভার্সালিস্ট চার্চ, গ্রীন হোটেল এবং শেক্সপীয়ার ক্লাবে তিনি অসাধারণ কতকগুলি বক্তৃতা করেছেন; নিজেকে উন্মোচন করেছেন অকৃপণভাবে; তারপর ফিরে এসেছেন মিড-ভবনে দৈনন্দিনের সহজ জীবনে; রান্না করেছেন, গল্প কবেছেন, গান গেয়েছেন, ছেলেদের সঙ্গে খেলা করেছেন। বাড়ির কিশোর ছেলে র‍্যালফ্, স্বামীজীর টুকিটাকি কাজ করতে পারলে নিজেকে ধন্যবোধ করত। স্বামীজী তাকে বলেছিলেন, "তুমি কি নিজের চোখ দেখতে পাও, আয়না ছাড়া? ঈশ্বর তেমনি। তিনি তোমার চোখের মতই তোমার অন্তর্গত—তিনি তোমারই—যদিও তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না।"

"নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই!"

প্যাসাডেনার মিড ভবনে (যা এখন বিবেকানন্দ হাউস) থাকার সময়ে ভাববার চেষ্টা করেছিলুম, স্বামীজী এখানে আছেন, এই বাড়ির মধ্যেই, কিন্তু হায়, তাঁকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না!

॥ নয় ॥

পশ্চিম উপকূলে লস্ এঞ্জেলেস বঙ্গসম্মেলনে বিবেকানন্দ-সেমিনারে অংশ নেবার পরে—(অন্য বক্তা ছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে গবেষণার জন্য পি.এইচ.ডি. উপাধিপ্রাপ্ত, হার্ভার্ডের তরুণ অধ্যাপক ডঃ ব্রাইসন)—তিন হাজারের বেশি মাইল উড়ন্ত অবস্থায় সস্ত্রীক অতিক্রম ক'রে, হাজির হয়েছিলুম নিউ জার্সির শ্রীযুক্ত নারায়ণ মজুমদার ও শ্রীমতী লীলাবতী মজুমদারের গৃহে। আমরা হাওড়া ছাড়ার আগে থেকেই নায়ারণবাবু আমাদের 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ফেলানথ্রফিক সোসাইটি'র পক্ষে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ ও বিশ্বধর্ম বিষয়ে আলোচনাচক্রে যোগদানের জন্য। মজুমদার-গৃহে আদরযত্ন যথেষ্টই ছিল এবং সম্মেলন সফল করার জন্য নারায়ণবাবুর উদ্‌ভ্রান্ত পরিশ্রমও চমকপ্রদ। নিউ জার্সিতে ১০ জুলাই প্রচণ্ড গরম, দুপুর দুটোয় সভা, লোকজনের আসার পক্ষে সময়টা অনুকূল নয়, সভাস্থলে পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল, অনুষ্ঠান শুরুও হয়ে গিয়েছে, মঞ্চে দেখলুম চমৎকার দৃশ্য—সাদা পোশাক-পরা দশ বারো জন ছোটবড় ছেলেমেয়ে বসে আছে, এক সৌমদর্শন প্রৌঢ় ব্যক্তি মর্যাদা-গাঢ় গলায় স্বামীজী সম্পর্কে দু-চার কথা বলছেন, তারপরে উপবিষ্ট ছেলেমেয়েদের দিকে ইঙ্গিত করছেন আর এক-একজন উঠে এসে সুস্পষ্ট কণ্ঠে পরিচ্ছন্ন ইংরেজীতে হয় স্বামীজীর বাণী আবৃত্তি করছে, না-হয় তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলছে। মাঝে মাঝে বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত স্তোত্র-গান বা আবৃত্তিও করছে। অনুষ্ঠানটি বিস্মিত করল। সন্ধান নিয়ে জানলুম, ভদ্রলোকের নাম

ডঃ মহেন্দ্র জানী, কলেজের অধ্যাপক, 'বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ' নামক একটি সানডে স্কুলের প্রধান কর্মকর্তা। ভদ্রলোক এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছেলেমেয়েগুলি গুজরাটি।

নিউ জার্সির এই বিবেকানন্দ সেমিনারে অধিকাংশ বক্তা স্বামীজীর বিষয়ে যথাসাধ্য আলোচনা করেছিলেন। নিউ ইয়র্কের ভারতীয় কনসাল জেনারেল জি ওয়াকান্‌কর ছিলেন বিশেষ অতিথি, তাঁর আলোচনা শুনে বোঝা গেল, স্বামীজীর বিষয়ে তিনি রীতিমত পড়াশোনা করেছেন। শ্রীমতী মায়া 'স্বামীজীর জীবনে সারদাদেবীর প্রভাব' বিষয়ে একটি পেপার পড়েছিলেন। শ্রীমতী অণিমা রায়চৌধুরী, লক্ষ্মী সরকার, ডাঃ মায়া সরকার, জয়শ্রী চক্রবর্তী সুন্দরভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক সংগীতাদি করলেন। সবই ভাল কিন্তু মন জুড়ে ছিল বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ঐ ছেলেমেয়েগুলি এবং তাদের পরিচালকের কথা। সভার মধ্যে বসে ডাঃ ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে প্রতিষ্ঠানটির বিষয়ে সামান্যই জানতে পেরেছিলুম—যেটুকু বলেছিলেন তাতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিল।

নিউ ইয়র্কে আমাদের পরমবন্ধু ডাঃ তপন সরকার ও ডাঃ মায়া সরকারের বাড়িতে কয়েকদিন কাটাবার পরে, শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায় ১৭ জুলাই নিউ জার্সির অপরাংশ এবং অধিকতর সুন্দর অংশ, ওয়েন-এ নিয়ে গেলেন তাঁদের বাড়িতে। তাঁদের বলতে ভবানী ও আলোলিকা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। ভবানীবাবু বিরাট এক ঔষধ-কারখানার বড় চাকুরে, কিন্তু রীতিমত ব্রাহ্মণ, সুতরাং অপেশাদার পূজারী, দুর্গাপূজা ছাড়াও দূরে-দূরে গাড়ি চালিয়ে গিয়ে সত্যনারায়ণ পূজা করতে হয়। এই নিষ্কাম সৎকার্যে সুরসিক মানুষটির খুশির অন্ত নেই। আর তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী আলোলিকা লেখিকা হিসাবে ইতিমধ্যে এমনই দাগ কেটেছেন যে, তাঁর বিষয়ে আর বলা যাচ্ছে না 'প্রবাসী লেখিকা'। তাঁরা টেলিফোনে যোগাযোগ ক'রে ১৮ জুলাই সায়ংকালে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে আমাদের নিয়ে গেলেন—সেখানে তখন কয়েকদিনব্যাপী ক্যাম্পের সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে।

হাজির হয়ে চমৎকৃত। শ'খানেক খুশিতে উচ্ছল ছেলেমেয়ে, তারা তৈরি হচ্ছে চট্‌জলদি নাটক দেখাবার জন্য। আমাদের হলঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে কেবল শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের পট—(ওখানকার একটি ছোট মেয়ে একবার তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আচ্ছা, তোমরা শিব, গণেশ, নারায়ণ এইসব ঠাকুরের পুজো না ক'রে ঐ ঠাকুরদার মতো লোকটির পুজো করো কেন? মা বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়ে, উনি তোমার ঠাকুরদার মতোই আপন, তাঁর মতোই তোমাকে ভালবাসেন)—সেখানে হৈ-চৈ হাসির মধ্যে ছেলেমেয়েরা অভিনয় করল, অধিকাংশ পৌরাণিক বা লোকসাংস্কৃতিক কাহিনী। বিস্ময়কর শুদ্ধ উচ্চারণে, মাত্রা, যতি রক্ষা ক'রে, সুদীর্ঘ সংস্কৃত স্তোত্রাদিও শোনালো। আমি ভাবছিলুম এ কী কাণ্ড! যেখানে ভারতীয় ছেলেমেয়েরা ঊর্ধ্বশ্বাসে মার্কিনী হবার জন্য ছুটছে সেখানে এমন একটি ভারতীয় দ্বীপখণ্ড রচিত হলো কিভাবে—যার তুল্য ভারতীয়ত্ব ভারতবর্ষেও সুশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রায় দেখা যাচ্ছেনা! কল্যাণীয়া আলোলিকা সেই সভায় আমার সম্বন্ধে সময়োচিত কিছু অত্যুক্তি করলেন, তার ফলে অতিশয় অপ্রস্তুত অবস্থায় পুরস্কার বিতরণ করতে উঠতে হলো। ডাঃ জানী তাঁর ভাষণে একাধিকবার বলেছিলেন, আমাদের এখানকার ছেলেমেয়েরা চ্যালেঞ্জ নিয়েছে—বিবেকানন্দকে জানার, ভারতকে জানার, ভারতীয় সংস্কৃতিকে জানার। ছাত্র-ছাত্রীদের আমি অল্প কিছু বলেছিলুম: স্বামীজী তো জীবন বলতে নিয়ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে

লড়াই করার চ্যালেঞ্জ নেওয়া বুঝতেন। বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্যই তা গ্রহণ করবে। আমি যে-স্কুলে পড়তাম সেই হাওড়া বিবেকানন্দ স্কুলের প্রয়াত প্রধান শিক্ষক সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্যের একটা কথা সেখানে শুনিয়েছিলুম—"The word 'Vivekananda,' starts with the letter 'V'—'V' means victory. Vivekananda is for Victory."

প্রকারান্তরে এই কথাগুলিই 'বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি'-র অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ বলেছিলেন ডঃ জানীকে, যখন একদা তাঁর মতো আশাবাদীও হাল ছেড়ে দেবার অবস্থায় পৌঁছন। অনুষ্ঠান-শেষে আমরা তাঁদের বসার ঘরে বসে কথাবার্তা বলছিলুম। কিভাবে তিনি এই ধরনের বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন, স্বভাবতই সে বিষয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা ছিল। ডঃ জানী বললেন:

"আমার বাবা ছিলেন স্বামীজীর দারুণ ভক্ত, আদি প্রেরণা তাঁর; রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সাহচর্যও আছে; তাছাড়া আছে স্বামীজীর রচনাবলী, সেই তো মহাসঞ্জীবনী। এখানে এসে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মনের অবস্থা দেখে ভেবেছি, তাহলে কি এদের কাছে ভারতবর্ষ চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে? তখনই ভারতীয় সংস্কৃতি এবং তার প্রতিভূ স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ শিক্ষাদানের জন্য সানডে স্কুল-ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ইচ্ছা হয়। সন্তর্পণে এগিয়েছি। আমার স্ত্রী ও কয়েকজন বন্ধু সহায়ক। আশ্চর্যের বিষয়, সেই স্কুল সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের আগ্রহ ক্রমে বেড়েছে। যখন নিজের বাড়িতে স্কুল চালাচ্ছিলুম তখন রান্নাঘর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীতে ভরে যেত। ফলে নিজস্ব জমি ও বাড়িতে প্রতিষ্ঠানটি গড়বার ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই জায়গাটিতে জমির দাম এমনই বেশি যে, শেষপর্যন্ত কিছু করা যাবেনা ভেবে হতাশ হয়ে পড়েছি, তখন স্বামী ভাষ্যানন্দ বলেছিলেন, 'স্বামীজীর নামে নেমে পড়লে কিছু আটকায় না।' নেমে পড়েছি, জমি বাড়ি হয়েছে বিদ্যাপীঠের, বিপুল দেনাও রয়েছে কিন্তু এই ভরসায় আছি, আটকাবে না।"

সময় কম ছিল, তাঁর অভিজ্ঞতার কথা যথেষ্ট শোনা হল না; শ্রীমতী আলোলিকা ভালভাবে এঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমেরিকায় ভারতরক্ষার কাহিনী লিখতে রাজি হলেন; ডঃ জানী নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টারের স্বামী আদীশ্বরানন্দের উপদেশ ও নির্দেশের মূল্যের কথা জানালেন; তারপর সামনে দিয়ে চলে-যাওয়া একটি কিশোরীকে দেখিয়ে আনন্দিত মুখে বলেন, জানেন, গোটা গীতা ঐ মেয়েটির কণ্ঠস্থ, তেমনি আরো তিন-চার জনের।

বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে বাঙালী ছেলেমেয়েরা বিবেকানন্দ ও ভারতচর্চায় যায়, এমন শুনিনি।

॥ দশ ॥

স্বামী চেতনানন্দ আমার বহু বৎসরের পরিচিত মানুষ। বেশ কিছুদিন যাবৎ তিনি মধ্য আমেরিকার সেন্ট লুই বেদান্ত সেন্টারের অধ্যক্ষ। সেখানে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা, বিশেষত তিনি গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে লস্ এঞ্জেলেস থেকে মাইল-পঞ্চাশ দূরে লাগুনা বীচ্-এ একটি কটেজে থাকেন পড়াশোনা ও রচনাকার্য নিয়ে। কটেজটি ডিজনি আইল্যান্ডের ভাইস প্রেসিডেন্টের সম্পত্তি, চেতনানন্দকে ব্যবহার করার অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। ভারতে থাকতেই চেতনানন্দের চিঠি পেয়েছিলুম—"অবশ্যই এখানে

এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।" আমারও সে ইচ্ছা 'অবশ্যই' ছিল। কারণ প্রথমত স্বামীজী বিষয়ে (এবং নিবেদিতার পত্রাবলীর বিষয়েও) তথ্যের ব্যাপারে আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী, দ্বিতীয়ত, আরো বড় কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তায় সদা-নিমজ্জিত এই ভাবময় মানুষটির সান্নিধ্য আমার খুবই ভাল লাগে। ঐসব বিষয়ে কিছু-একটা নতুন জিনিস পেয়েছেন, একথা বলবার সময়ে তাঁর শিশুর মতো আনন্দ দেখবার মতো। তাঁর প্রধান নেশা দুটি—বই এবং ছবি। বলা বাহুল্য, বই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের, এবং ছবি তাঁদের কেন্দ্র করেই। এসব ব্যাপারে আমিও যেহেতু কিঞ্চিৎ নেশাগ্রস্ত তাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা ডাঃ মদনগোপালের কাছে প্রকাশ ক'রে ফেলেছিলুম এবং উক্ত সুভদ্র মানুষটি ও তাঁর পত্নী অতিথিদের ইচ্ছা-রক্ষায় যৎপরোনাস্তি করতে বদ্ধপরিকর বলে আমাকে ও শ্রীমতী মায়াকে নিয়ে ১৯ জুলাই ঘণ্টাখানেক গাড়ি ভাসালেন লস্ এঞ্জেলেসের সুমসৃণ সৌন্দর্য-আবৃত পথ দিয়ে। তবে আমাদের ইচ্ছাপূরণের জন্যই কেবল মদনগোপাল গিয়েছিলেন, একথা বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। বেলুড় বিদ্যামন্দিরের এই প্রাক্তন ছাত্রের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভক্তি অধিক উচ্চারিত না হলেও সুগভীর, যে-কারণে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সন্ন্যাসী-লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী ছিলেন। স্বামী চেতনানন্দ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রস্তুত করে ফেলেছেন। যেমন, স্বামী বিবেকানন্দের কিছু রচনার সম্পাদিত সংকলন: *Vendanta: Voice of Freedom*, (য়ার দীর্ঘ ভূমিকা তিনি লিখেছেন, মুখবন্ধ লিখেছেন ক্রিস্টোফার ইশারউড এবং দার্শনিক হাস্টন স্মিথ); *Ramakrishna: As I Saw Him* (শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতির অনুবাদ, তৎসহ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী: এক বৃহৎ পুস্তক;) *They Lived with God*. (শ্রীরামকৃষ্ণের আটাশ জন ভক্তের জীবনচিত্র, ভূমিকাসহ, বৃহৎ পুস্তক); *A Guide to Spiritual Life: Spiritual Teachings of Swami Brahmananda; Spiritual Treasure: Letters of Swami Turiananda* (অনূদিত পত্রাবলী এবং ভূমিকা); *Meditation and its Methods; Swami Adbhutananda: Teachings and Reminiscences*. ভারতে থাকাকালে ইনি প্রস্তুত করেছিলেন Ramakrishna: A Biography in Pictures; Sarada Devi: A Biography in Pictures.

ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের কোলে সুন্দর কটেজটিতে পৌঁছেছিলুম, স্নিগ্ধ হাসিমাখা মুখে স্বামী চেতনানন্দ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, বসিয়েছিলেন সামনের ঘরটিতে, একটিই ঘর, মেঝেয় ছড়ানো কাগজপত্র, বই, সেখানে ভারতীয় প্রথায় বসেই তিনি লেখাপড়া করেন, এখন বিশেষভাবে ব্যস্ত পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ বিষয়ে সচিত্র বিরাট এক পুস্তক প্রণয়নে। চেতনানন্দ প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেছেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ এলেই স্বপ্নময় উন্মাদনায় আত্মহারা হয়ে পড়েন, অপরের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেন একটি অনুভূতি—কত কি করার আছে, কত সামান্যই করা গেছে! সেই উদ্বেল আশা-আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষার স্পর্শ নিয়ে, বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে মুখ ক'রে, ফিরতে শুরু করেছিলুম।

॥ এগারো ॥

না, এবার যাওয়া সম্ভব হয়নি সেই মহাতীর্থে, আমেরিকায় প্রধান বিবেকানন্দ-তীর্থে, যেখানে রামকৃষ্ণ-রূপান্বিত হয়ে বিবেকানন্দ প্রায় দু'মাস অবস্থান করেছিলেন—নিউ ইয়র্ক থেকে পাঁচশ মাইল দূরে থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে একটি কটেজে। সৌভাগ্যের বিষয়, এই বাড়িটিও নিউ ইয়র্কের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

১৯৮৯ সালে ১১ অগস্ট সেখানে গিয়েছিলুম নিউ জার্সির শ্রীযুক্ত সুহাস চৌধুরী ও শ্রীমতী চৌধুরীর গাড়িতে। তাঁদের কন্যা, শ্রীমতী চৌধুরীর মাতা এবং সুখ্যাত সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ও সঙ্গে ছিলেন। বিশাল সেন্ট লরেন্স নদীর উপরে ছোটবড় প্রায় দু'হাজার দ্বীপ, দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ ওয়েলেস্‌লি, তারই অন্তর্গত থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক—সেই সৌন্দর্যের রম্য-নিকেতনে পৌঁছেছিলুম বিকাল চারটা নাগাদ। সাড়ে চারটার সময়ে যে-ঘরে স্বামীজী থাকতেন, বর্তমানে উপাসনালয়ে রূপান্তরিত সেই কক্ষে সান্ধ্য আরতি শুরু হয়েছিল, আরতির পরে ধ্যান, ছয়টা পর্যন্ত। দীর্ঘাকার, শ্যামবর্ণ, শুভ্রকেশ, মর্যাদাগম্ভীর, ব্যক্তিত্বশালী, বাগ্মী ও লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন, স্বামী আদীশ্বরানন্দ (নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টার-এর বর্তমান অধ্যক্ষ) স্থির ব্রোঞ্জ মূর্তির মতো ধ্যান করছিলেন, আমাদের ধ্যান যথেষ্ট পাকা নয় বলে কিছুটা উশখুশ ক'রে, স্বামীজীর কথা ভাববার চেষ্টা করছিলুম। তারপর ধ্যানান্তে নীচে নেমে মহারাজ অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে আলাপচারি শুরু করেন। বারান্দায় বেরিয়ে তিনি দেখালেন, কোন্ পথ দিয়ে নদী পেরিয়ে স্বামীজী ঐ বাড়িটিতে এসেছিলেন, এবং বাড়ির পিছনে কোন্ পথ দিয়ে স্বামীজী বেড়াতে যেতেন। বললেন, স্থানীয় ইতিহাস স্বীকার করেছে, ধর্মসংস্থা হিসাবে এই বাড়িটি সহস্রদ্বীপোদ্যানে দ্বিতীয় সর্বপ্রাচীন।

বাড়িটি সম্বন্ধে কিছু কাগজপত্র স্বামী আদীশ্বরানন্দের কাছ থেকেই পেয়েছি। বিবেকানন্দ-জীবনের পাঠকদের কাছে সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর গমন ও অবস্থানের কাহিনী পরিজ্ঞাত। বৎসরাধিক বক্তৃতা ক'রে স্বামীজী ক্লান্ত। তাঁর বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন, তাঁর এক ভক্ত মহিলা মিস মেরী এলিজাবেথ ডাচার জানালেন, থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক-এ (বাংলায় বলা হয় 'সহস্রদ্বীপোদ্যান') তাঁর একটি কটেজ আছে, সেখানে স্বামীজী বিশ্রাম নিতে পারেন। স্বামীজীর জন্য বিশেষ ক'রে সেই বাড়ির লাগোয়া একটি নতুন অংশ তৈরি করাও হলো। বাকি অংশে, স্বামীজীর সাহচর্যে যাঁরা একান্তে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাঁরা থাকতে পারবেন। সহস্রদ্বীপোদ্যানের সর্বোচ্চ অংশে বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল, সেজন্য মিস ডাচার খ্রীস্টীয় অনুষঙ্গে বলতেন, 'পর্বতোপরি নির্মিত'। দেখা গেল, সেখানে স্বামীজীর থাকাকালে বিভিন্ন সময়ে আগত ভক্ত-শিষ্যদের সংখ্যা সব জড়িয়ে বিস্ময়করভাবে হয়ে উঠেছিল বারো। 'পর্বতোপরি উচ্চারিত' বিবেকানন্দের বাণী সংকলনের নামও *'Inspired Talks'*, বাংলায় 'দেববাণী'। অভ্রান্ত যাঁর ধর্মপ্রজ্ঞা, বিচারশীলতা ও নিষ্ঠা, সেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পর্যন্ত বলেছেন, "এই বাণীগুলি অপেক্ষা আর কিছুই মানবজাতির নিকট অধিক হিতকর বন্ধু ও মহত্তর পথপ্রদর্শক হইতে পারেনা।" মিস ম্যাকলাউড-সহ অনেকের বিবেচনায়,

স্বামীজীর সর্বোচ্চ অবস্থান ও উচ্চারণ এখানেই পাওয়া যাবে। এখানেই স্বামীজী রচনা করেন *'Song of the Sannyasin'* কবিতা ('সন্ন্যাসীর গীতি'), যা রামকৃষ্ণানন্দ মাতোয়ারা হয়ে আবৃত্তি করতেন। 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় সে কবিতা বেরোবার পরে 'মাদ্রাজ টাইম্‌স' নামক ভারতের এক সাহেবী কাগজে প্রধান সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল—*The Swami as s Poet.*

এসব কথার অনেকটাই স্বামীজীর জীবনী-পাঠকের পরিচিত। 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ম্যালকম উইলিস (*Historical Sketch of Vivekananda Cottage at Thousand Island Park, New York,* 'Vedanta Kesari,' Aug. 1963) ইউরোপীয়গণ কর্তৃক এই স্থানটির আবিষ্কার-কাহিনী ও পরবর্তী উন্নয়নকাহিনীর কথা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এমনই যে, স্মরণাতীত কাল থেকে রেড ইন্ডিয়ানরা এখানে মৃত মানুষদের কবর দিতে নিয়ে আসত, কেননা এ হলো 'মহান আত্মাদের উদ্যান'। ফরাসিরা ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এর সন্ধান পায়। ইউরোপীয় রীতিতে স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে, তাদের উৎসাদন অথবা বিতাড়ন ক'রে, বাণিজ্যিক কারণে শ্বেত মনুষ্যেরা এখানে বসতি করতে থাকে, স্মাগ্‌লারদের কর্তৃত্ব বলবৎ হয়, ১৮১২ সালের পরে কিছু শান্তি-শৃঙ্খলা ফেরে, শুরু হয় বড় আকারে দামী কাঠের ও জাহাজ তৈরির ব্যবসা। তারপর উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিভিন্ন খ্রীস্টান ধর্মগোষ্ঠী এখানকার বিভিন্ন দ্বীপে আসতে থাকেন, ওয়েলে্‌সলি দ্বীপে (৯×৪ মাইল) মেথডিস্টরা আস্তানা গাড়েন। এই দ্বীপেরই দক্ষিণতম প্রান্তে ১৮৫০ সালে থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কের সূচনা হয়—তারই শেষ সর্বোচ্চ অংশে নির্মিত হয়েছিল মিস ডাচারের কটেজ।

১৮৩২ সালে মিস ডাচারের জন্ম—নিউ ইয়র্কের নিকটবর্তী অসওয়েগো-তে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে। চিত্রাঙ্কনে তাঁর বাল্যাবধি আকর্ষণ, নিউ ইয়র্কে গিয়ে 'অ্যাকাডেমি অব ডিজাইনে' শিল্পশিক্ষা করেন এবং শিল্পশিক্ষা-দানকেই বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। ফরাসি ইমপ্রেসনিস্টদের প্রভাব তাঁর ছবিতে ছিল অর্থাৎ তিনি সচেতন ছিলেন আধুনিক ভাবধারা সম্বন্ধে, যে-কারণে স্বামীজীর বিষয়ে অবহিত না-হয়ে পারেন নি। তিনি ১৮৯৪-৯৫-এর শীত-ঋতুতে নিউ ইয়র্কে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনেছেন, গোঁড়া মেথডিস্ট হিসাবে তিনি স্বামীজীর কথায় মুগ্ধ হয়েও আচ্ছন্নতা কাটিয়ে প্রশ্ন করেছেন—'কিন্তু স্বামীজী—'। ক্রমে তাঁর গোঁড়ামির ভিত টলে যায়, মেথডিস্ট থেকে তিনি 'ক্রীশ্চান সায়েন্টিস্ট' হয়ে পড়েন (যে মতটির বিকাশের পিছনে স্বামীজীর প্রভাব অনুমান করা হয়), তাঁর কটেজ উক্ত মতানুসারে রোগ সারাবার আড্ডা হয়ে দাঁড়ায়। স্বামীজীর বিশ্রামের জন্য তিনি যে, নিজ কটেজের সঙ্গে নতুন একটি অংশ নির্মাণ করিয়েছিলেন, তা স্বামীজীর বাণী ও ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার পরিচায়ক এবং স্বামীজীর আচার্য-ভূমিকার স্বীকৃতি-সূচকও।

স্বামীজী এই কটেজে সাত সপ্তাহ কাটান (জুন-অগস্ট, ১৮৯৫)। তিনি চলে যাওয়ার অর্ধশতাব্দী কালেরও বেশি সময় পরে, ১৯৪৭ সালে কিভাবে সেটি নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টারের অধিকারে আসে, সে কাহিনীও জেনেছি। সে এক তীর্থোদ্ধারের কাহিনী। স্বামীজীর প্রস্থানের পরে মিস ডাচার কটেজটিকে নিজের স্টুডিও

ও বোর্ডিং-হাউস রূপে ব্যবহার করতে থাকেন। সেখানে প্রতি গ্রীষ্মে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী হতো। ১৯০২ সালে মিস ম্যাকলাউড সন্ধান ক'রে বাড়িটিতে আসেন (স্বামীজীর থাকাকালে তিনি আসতে পারেন নি) এবং স্বামীজীর কক্ষে গিয়ে (স্বামীজী কিছুপূর্বে লোকান্তরিত) অশান্ত কান্নায় ভেঙে পড়েন। স্বামীজীর অন্য ভক্তরাও কখনো-কখনো এখানে এসেছেন। ১৯২২ সালে মিস ডাচারের মৃত্যুর পরে বাড়িটি মিস মার্গারেট ওটিস-এর অধিকারে আসে। এই মহিলা সংস্কৃত জানতেন, ঋগ্বেদ ও অন্য সংস্কৃত গ্রন্থ নকল করেছেন। বিবেকানন্দ-স্মৃতিধারাপথে যোগ্য সে কাজ। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত তিনি গ্রীষ্ম কাটিয়েছেন এখানে। একদিন অদ্ভুত একটি ঘটনা ঘটেছিল। যেন কোনো এক অজ্ঞাত স্থান থেকে এক ব্যক্তি সহসা আবির্ভূত হয়ে গৃহদ্বারে এসে দাঁড়ান, গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে ডাইনিং রুমে লম্বিত একটি দণ্ড দেখিয়ে বলেন, "এটি স্বামী বিবেকানন্দের, আমি কি এটা নিয়ে যেতে পারি?" অনুমতি পেয়ে সেই লোকটি দণ্ডটি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, কোনো পরিচয় না দিয়ে। মিস ওটিস ১৯৩৩ সালে ভূতের ভয়ে কটেজটি ত্যাগ ক'রে নিকটবর্তী আত্মীয়দের বাড়িতে উঠে যান। ১৯৩৩-৪৭ পর্যন্ত বাড়িটি খালি পড়ে থাকে। ১৯৪৭ সালে স্বামী নিখিলানন্দ, আমেরিকায় স্বামীজীর অধ্যাত্মপ্রকাশের এই শ্রেষ্ঠ স্থানটির সন্ধানে কয়েকজন শিক্ষার্থীসহ এসে হাজির হন। স্থানটির ঠিকানা তাঁরা মিস ম্যাকলাউডের কাছে পেয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন, বাড়িটির ভগ্নাবস্থা, এধারে-ওধারে অংশবিশেষ খসে পড়েছে, এমনই নড়বড়ে যে, উপরতলায় উঠতে ভয় হয়। ভিতরের অবস্থা শোচনীয়। জঞ্জাল-ধুলোয় ভর্তি। বাইরের অংশ ঢেকে গেছে ঝোপ-ঝাড় ও ছোট-বড় গাছে। নিখিলানন্দ ভাবলেন, এ বাড়িকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। তা জেনে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ তাঁকে লিখলেন: "না, বাড়িটি নিতে হবে এবং মেরামত ক'রে সংরক্ষণ করতে হবে; যদি নিউ ইয়র্ক কেন্দ্র অর্থাভাবে তা করতে না পারে তাহলে ভারত থেকে তার জন্য টাকা পাঠানো হবে। ও বাড়ি যেন হাতছাড়া না হয়, ও বড় পুণ্যভূমি।" বিবেকানন্দের শিষ্য ও সেবক স্বামী বিরজানন্দ আরো লিখেছিলেন, "অসুস্থ শরীর আমার, দেহ থাকতে ওখানে যেতে পারব না, কিন্তু মৃত্যুর পরে আমার সত্তা ওখানে সঞ্চরণ করবে।"

ইতিমধ্যে বাড়িটির কাঠামোর কাঠ পাঁচশ ডলারে বিক্রি ক'রে দেওয়া হয়েছিল। সেই টাকা এবং আরো পাঁচশ ডলার দিয়ে বাড়িটি কেনা হয়; নিউ ইয়র্ক কেন্দ্র থেকে ছাত্রগণ এসে বাড়িটির সংস্কারের কাজে লেগে পড়েন; ১৯৪৮ সালে প্রবীণ সন্ন্যাসিগণের উপস্থিতিতে গৃহপ্রবেশের আনুষ্ঠানিক পূজাদি করা হয়; গঙ্গার জলের সঙ্গে সেন্ট লরেন্স নদীর জল মিশিয়ে বাড়িটিতে সিঞ্চিত ক'রে সমাপ্ত হয়—তীর্থোদ্ধার।

এখানেই, বিচিত্রভাবে পাওয়া যায়, স্বামীজীর পূর্বোক্ত বিখ্যাত *Song of the Sannyasin* কবিতার পাণ্ডুলিপি। বেশ কিছু বছর আগে বাড়ির তৎকালীন মালিক যখন বাড়িটির অল্পস্বল্প সংস্কার-কাজ করছিলেন, তখন ঐ পাণ্ডুলিপি আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া হয়। ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর পুত্র সেটিকে কুড়িয়ে রাখে, শুধু তাই নয়; সাত বছর রক্ষা করে—তারপরে সেটি অর্পণ করে স্বামী নিখিলানন্দের হাতে। কবিতাটি স্বামীজী সম্ভবত লিখেছিলেন ২৩ জুলাই। (লুইস বার্কের সেইরকমই সঙ্গত অনুমান)। কবিতাটির রচনার পটভূমিকা সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায়, স্বামীজী যেন 'জ্বালাময়ী ঐশী শক্তিতে' চালিত হয়ে

একদিন অপরাহ্নে [মিসেস ফাঙ্কি লিখেছেন] "ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসিগণের আনন্দ ও স্বাধীনতার বর্ণনা করিতে করিতে সহসা উঠিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণেই ত্যাগবৈরাগ্যের চূড়ান্ত প্রকাশক 'সঙ অব দি সন্ন্যাসিন্' কবিতাটি লিখিয়া ফেলিলেন।" তার একটি স্তবক:

There is but one—the free—The Knower Self
Without a name, without a form or stain.
In Him is Maya dreaming all the dream.
The witness, He appears as nature, soul.
Know thou art That Sannyasin bold! Say—
Om Tat Sat Om!

১৯৮৯, ১১ অগস্ট সন্ধ্যায় স্বামী আদীশ্বরানন্দের মুখে যখন শুনেছিলুম—বর্তমানে প্রতি গ্রীষ্মে এই কুটিরে শিক্ষার্থীরা আসেন, জীবনের গভীরতর অর্থের সন্ধানে পাঠ ও ধ্যানাদি করেন—তখন কিন্তু আমার মন বর্তমানের চেয়ে পুরাতনেই ডুবে ছিল: স্বামীজী এখানে কম নয়, একাদিক্রমে প্রায় দু' মাস ছিলেন!! "বিবেকানন্দের মতো মানুষের সান্নিধ্যে বাস করার অর্থ অবিশ্রান্ত উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ করা; প্রভাত থেকে রাত্রি পর্যন্ত একই ভাব, ঘনীভূত ধর্মভাবের রাজ্যে অবস্থান।" "তিনি যেন কথা বলতেন নিজ আত্মার সঙ্গে, শিষ্যরা শুধু শুনে যেত।" "তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সূক্ষ্মশরীরে তাঁর মুখ দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন, আমাদের সকল সন্দেহ মিটিয়ে দিতেন, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন, সকল ভয় দূর করতেন।" সান্ধ্যভোজনের অন্তে শিষ্যরা উপরের বারান্দায় গিয়ে আচার্যের জন্য অপেক্ষা করতেন, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হতো না, অচিরে উন্মুক্ত হতো গৃহদ্বার, স্বামীজী ধীর পদে এসে আসন গ্রহণ করতেন, কথা বলতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। "এক অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী রাত্রিতে (সেদিন চন্দ্র প্রায় পূর্ণাবয়ব) কথা কহিতে কহিতে চন্দ্রাস্ত হইয়া গেল। আমরা কালক্ষেপের বিষয়ে কিছুই জানিতে পারি নাই, স্বামীজীও পারেন নাই।"

সেদিনকার বাস্তব সত্য আমাদের মনে অপার্থিব রহস্যভরা কুয়াশার মতো নেমে এসেছিল। সেদিন সেখানে উপস্থিত বস্তু-সচেতন মনস্বিনী এলান ওয়ালডো-ও ধরা দিয়েছিলেন দিব্য সম্মোহনে:

"সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে নির্বাক হইয়া বসিয়া তাঁহার অপূর্ব জ্ঞানগর্ভ বচনামৃত সাগ্রহে পান করিতাম। স্থানটি যেন সত্যই পুণ্যনিকেতন। নিম্নে শ্যামল পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষশীর্ষগুলি, সবুজ সমুদ্রের মতো আন্দোলিত হইত। স্থানটি পরিবৃত ছিল ঘন অরণ্যে। সুবৃহৎ গ্রামটির একটি বাড়িও সেখান হইতে দৃষ্টিগোচর হইত না। আমরা যেন লোকালয় হইতে বহু যোজন দূরে কোনো নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে বাস করিতাম। বৃক্ষশ্রেণী হইতে দূরে বিস্তৃত সেন্ট লরেন্স নদী। তার উপর মাঝে-মাঝে দ্বীপগুলি। তাহাদের কতকগুলি আবার হোটেল ও ভোজনালয়ের উজ্জ্বল আলোকে

ঝিকমিক করিত। সেগুলি এত দূরে অবস্থিত ছিল যে, তাহারা সত্য অপেক্ষা চিত্রিত দৃশ্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। আমাদের এই নির্জন স্থানে জনকোলাহল কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না। আমরা শুধু কীট-পতঙ্গাদির অস্ফুট রব, পক্ষিগণের মধুর কাকলি অথবা বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পবনের মৃদু মর্মরধ্বনি শুনিতে পাইতাম। দৃশ্যটির কিয়দংশ স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্‌ভাসিত থাকিত এবং নিম্নের স্থির জলরাশির উপর দর্পণের ন্যায় চন্দ্রচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইত। এই গন্ধর্বরাজ্যে আমরা আচার্যদেবের সঙ্গে সাতটি সপ্তাহ দিব্যানন্দে তাঁহার অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অপূর্ব বার্তা শ্রবণ করিতে করিতে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। তখন আমরা জগতকে ভুলিয়াছিলাম, জগৎ-ও আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছিল।"

॥ বারো ॥

শুরু করেছিলুম লিবার্টি-স্ট্যাচু দিয়ে। আকাঙ্ক্ষাভরা প্রশ্ন ছিল—মুক্তিদূত বিবেকানন্দের মূর্তি কি ঐভাবে প্রতীকরূপে নির্মাণ করা যায়না? যদি সে চেষ্টা করা হয় তাহলে তাঁর কোন্ আকারকে মডেল করা হবে? একটি আকার তো প্রস্তুত আছেই, পরিব্রাজক বিবেকানন্দের ছবি: চরৈবেতি চরৈবেতি, চলো চলো, 'পদে পৃথ্বী শিরে ব্যোম,' চলো সম্মুখ-লক্ষ্যে, এ ভূমি তোমার, এ পৃথিবী তোমার, তুমি পরিব্রাজক, বিশ্বপ্রাণের ছন্দের সঙ্গে মিশে যাক তোমার চলার ছন্দ। হাঁ, অবশ্যই সে ছবিকে বিবেকানন্দের প্রতীক করা যায়। তারই ছন্দে ইতিমধ্যে অঙ্কিত হয়েছে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর ডাণ্ডী-মার্চ-এর গান্ধী-চিত্র, এবং দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর গান্ধী-ভাস্কর্য।

বিবেকানন্দের আর এক ছবিই বা মডেল হবেনা কেন? ভূমি বিদীর্ণ ক'রে শিকাগোয় সহসা-আবির্ভূত বিবেকানন্দ সেই বাহুবদ্ধ বিশাল বক্ষ, বিদ্যুৎ-বিস্ফারিত নয়ন, মহাকায় বীরমূর্তি, যাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত', 'বলো বীর উন্নত মম শির', 'কণ্ঠে যাঁহার বাণীর বিকাশ বিদ্যুন্ময়ী বজ্রধরা, মহাভারতের নূতন বেদের সৃষ্টি যাঁহার মন্ত্রভরা'—এই মূর্তির ভাস্কর্যই তো সর্বত্র দেখা যায়।

বিবেকানন্দের শেষ বার্তা কি তাঁর ঐ দুই রূপের মধ্যে উন্মোচিত কিংবা অন্য কিছু?

সহস্রদ্বীপোদ্যানে তাঁদের অবস্থানের শেষ দিন। স্বামীজী, কৃস্টিন গ্রীনস্টাইডেল ও মেরী ফাঙ্কিকে বললেন, চলো আমার সঙ্গে অরণ্যপথে। ঐ দুই নারী বহুদূর থেকে বর্ষণসিক্ত কর্দমাক্ত পার্বত্যপথ দিয়ে এক অন্ধকার রাত্রিতে স্বামীজীর সন্ধানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন মিস ডাচারের কুটিরে। সেখানে স্বামীজীর অবস্থানের মধ্যপর্ব তখন। ছোট কুটিরটি লোকজনে ভর্তি। তবু তাঁরা আশ্রয় পেয়েছিলেন। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে নম্রতায় পূজারিণী দুই নারী। প্রস্থানের পূর্বে স্বামীজী তাঁদের নিশ্চয় কোনো গভীর কথা বলে যেতে চান। সংকীর্ণ বনপথ দিয়ে তাঁরা এগিয়ে চললেন। মাইল খানেক দূরে, একটি বৃহৎ ওক গাছের তলায় এসে, স্বামীজী বললেন, এখানে ধ্যানে বসা যাক। তিনি ধ্যানে বসলেন। ধ্যানী বুদ্ধের নব ভাস্কর্য। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে এল। স্বামীজী

প্রস্তরীভূত। দুই নারী ব্যস্ত হয়ে ছাতা ইত্যাদি দিয়ে যথাসাধ্য বৃষ্টি থেকে তাঁকে বাঁচাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। বৃথা চেষ্টা। ব্রোঞ্জের মূর্তি ধুয়ে যাচ্ছে আকাশবারিতে। বেশ কিছুক্ষণ পরে দূরে শোনা গেল কোলাহল। লণ্ঠনাদি নিয়ে এঁদের সন্ধানে লোকজন আসছে। স্বামীজী চোখ মেলে তাকালেন। মহাবিস্ময়ের সমুদ্র থেকে উঠে-আসা সিক্ত স্বপ্নাতুর আকার।

স্বামীজী বিশেষ কোনো কথা বলেন নি। কিন্তু তারই মধ্যে উচ্চারিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর শেষ বার্তা। অনির্বচনীয় সে উচ্চারণ। যদি সত্যের সাক্ষাৎ চাও, প্রস্থান করো নিজের মধ্যে। একদা তিনি শিল্প-সত্যের আলোচনায় বলেছিলেন, ইউরোপীয়রা উপাসনার ছবি আঁকতে গেলে উপাসনারতকে ঊর্ধ্বমুখ ঊর্ধ্বদৃষ্টি ক'রে দেখান, অপরদিকে ভারতীয়রা দেখান তাঁকে অন্তর্মুখ ক'রে—মূর্তিও তৈরি হয় সেইভাবে।

ধ্যানী বুদ্ধ এবং ধ্যানী বিবেকানন্দের বার্তা একই প্রকার। সেই তাঁদের শেষ বার্তা। সমাধিস্থ রামকৃষ্ণেরও।

চরম সত্য—অন্তর্গহনে। নিমজ্জিত হও।

['নিবোধত' পত্রিকার ১৪০০ সালের পৌষ, চৈত্র এবং ১৪০১ সালের আষাঢ় ও আশ্বিন মাসে প্রকাশিত]

সংযোজন

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-সম্পাদিত
সচিত্র সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' পত্রিকায়
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ

প্রস্তাবনা

[সংযোজন অংশে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-সম্পাদিত 'স্বরাজ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক লেখাগুলি সংকলিত হয়েছে। সংকলনের কারণ, লেখাগুলির ঐতিহাসিক মূল্য। এদেশের ইতিহাসের এক পর্বে বৈপ্লবিক এক চরিত্র ব্রহ্মবান্ধব—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে তিনি তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে কী চোখে দেখেছিলেন তা জানার প্রয়োজন আছে। ঐ দুই বিরাট পুরুষ ইতিহাসের নানা পর্বে নানাভাবে ব্যাখ্যাত ও গৃহীত হয়েছেন। সমকালের আর এক অসাধারণ পুরুষের চোখে তাঁরা কোন্ আকারে প্রতিভাত, তা জানতে পারলে ঐতিহাসিক পুরুষরূপে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভূমিকার মূল্যায়ন উপযুক্তভাবে করা যাবে। একথা স্মরণ করা যায়, অসীম সম্ভাবনাময় ঐ দুই জীবন—সুতরাং ওঁদের জীবনের প্রকাশও কালগতে পরিবর্তিত হয় জনমানসে।

সংকলিত রচনাগুলির কোনো কোনো অংশ ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ রচনা নয়। উল্লিখিত বা উদ্ধৃত হয়নি, এমন রচনাও আছে। এই সংকলনে স্বরাজের প্রাসঙ্গিক সব রচনাই গৃহীত। একটি রচনা আবার ব্রহ্মবান্ধবের নয়—সেকালের সুপরিচিত সাহিত্যিক ও সম্পাদক জলধর সেনের।

'স্বরাজ' দীর্ঘায়ু পত্রিকা নয়। "ব্রহ্মবান্ধব ২৬শে ফাল্গুন, ১৩১৩ (১০ই মার্চ, ১৯০৭) দিবসে সারস্বত যন্ত্র হইতে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।...ইহার মাত্র বারো সংখ্যা বাহির হয়। শেষ সংখ্যার তারিখ ১৫ই আষাঢ়, ১৩১৪।" বন্ধ হবার কারণ, ব্রহ্মবান্ধব-সম্পাদিত দৈনিক 'সন্ধ্যা' পত্রিকার কয়েকটি লেখা রাজদ্রোহকর বিবেচিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়; মামলা চলাকালে হার্নিয়া অস্ত্রোপচারের সূত্রে রক্তদূষিত হওয়ায় ব্রহ্মবান্ধব ২৭ অক্টোবর ১৯০৭ দেহত্যাগ করেন।

জনগণের রক্তে আগুন ধরানোর উপযুক্ত ভাষা ছিল 'সন্ধ্যা'র। 'সন্ধ্যা'র সঙ্গে 'স্বরাজে'র আকার-প্রকারগত পার্থক্য ছিল। "সন্ধ্যা সাধারণের ব্যবহৃত কথায় এবং সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত হইত, কিন্তু স্বরাজের ভাষা ছিল উচ্চগ্রামের এবং বিদগ্ধজনগ্রাহ্য।...স্বরাজের অনুষ্ঠানপত্রে ব্রহ্মবান্ধব লেখেন: "বিশুদ্ধ ভাষায় বলে—স্বরাজ্য; চলিত ভাষায় স্বরাজ। অথবা স্বে মহিম্নি রাজতে—নিজের মহিমায় যাহা বিরাজ করে, তাহাই স্বরাজ।... যে পূর্ণতা ভেদ-বিরোধে সমন্বয় ঘটায়—যে উদারতা বিষম দ্বন্দ্বে সুষমা আনয়ন করে, তাই মহতের ভাব—মহিমা।"

ব্রহ্মবান্ধব নিজ কালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চরিত্রে ঐ 'মহিমা'-র চূড়ান্ত স্ফূর্তি দেখেছিলেন।

বিস্ময়কর এক গতিশীল চরিত্র—ব্রহ্মবান্ধব। তাঁর জীবনের সূচনা হয় স্থিতির ভিত্তিতে, তারপর অগ্নিপতাকা নিয়ে তাঁর পথচলার শুরু, সেই পতাকা নিয়েই তাঁর জীবনান্ত। শেষ

পর্বে তিনি গতির মধ্যে স্থিতির ভূমি সন্ধান করেছিলেন। স্থিতিতে অধিষ্ঠিত হবার যথেষ্ট সময় কিন্তু পাননি। 'স্বরাজ' পত্রিকায় সেই স্থিতির ভূমিপূজা।

ব্রহ্মবান্ধবের পূর্বনাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলী জেলার খন্নান গ্রামে তাঁর জন্ম, পিতা দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মেধাবী ছাত্র তিনি, প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। শৈশবে পিতামহীর কাছ থেকে কথা-কাহিনী শুনে গ্রামীণ সংস্কৃতির নানা রূপ জেনেছেন ও তার রসপান করেছেন। কৈশোরে ভট্টপল্লীতে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার সূচনা; পরে বিভিন্ন সময়ে অনুশীলনের দ্বারা তা পুষ্ট। বাল্যাবধি বহুমুখী চিন্তায় আলোড়িত হয়েছেন, ক্রমে তা দুই ধারায় প্রবাহিত হয়—ধর্ম ও জাতীয়তা। কৈশোর ও যৌবনে তিনি কেশবচন্দ্র সেন ও শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছেন, প্রভাবিতও হয়েছেন। তাঁর জাতীয়তাবোধ জেগেছিল তাঁর খুল্লতাত খ্রীস্টান ধর্মযাজক কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে। কালীচরণ নিষ্ঠাবান খ্রীস্টান ধর্মযাজক হয়েও জাতীয়তার সমর্থক ছিলেন। তা ছাড়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি-ঘেঁষা বক্তৃতার প্রেরণাও ছিল। জাতীয়তায় আলোড়িত ব্রহ্মবান্ধব যৌবনে একবার সমরবিদ্যা শিখতে গোয়ালিয়র পর্যন্ত গিয়েছিলেন। পরে সে পথ থেকে সরে এসে ধর্মপথে ছুটেছেন। নবধর্মপথে যাত্রার প্রথম পর্যায়ে কেশবচন্দ্রের প্রভাবে নববিধান ব্রাহ্মমতে দীক্ষা নিযেছেন (১৮৮৭)। সেখানে থামবার পাত্র তিনি নন। কালীচরণের প্রভাবে, এবং কেশবচন্দ্রেরও, যিনি ঘোর খ্রীস্টপন্থী ছিলেন—ব্রহ্মবান্ধব হয়ে পড়লেন প্রোটেস্টান্ট খ্রীস্টান (১৮৯১)। কিন্তু তৃপ্তি সেখানে নেই, ত্যাগজীবনের প্রতি আসক্তি প্রবল, বিবাহ্ করবেন না স্থির করেছেন—প্রোটেস্টান্ট মতে সে সকল বিষয়ে প্রবণতা নেই। অচিরে প্রোটেস্টান্ট মত ত্যাগ ক'রে হয়ে পড়লেন ক্যাথলিক খ্রীস্টান। ক্যাথলিক মতানুবর্তী হয়েই তাঁর জীবনের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পর্ব কাটে—৮ বৎসর। কিন্তু ক্যাথলিক মতের পরিধির মধ্যেও তিনি বাধ্য ধর্মব্রতীর ভূমিকায় ছিলেন না। তিনি অনুভব করেছিলেন ভারতবর্ষে ক্যাথলিক ধর্মের প্রচারক-সন্ন্যাসী হিসাবে এদেশীয় সন্ন্যাসীর বহির্বাস গেরুয়া ধারণ ও আশ্রম স্থাপন কর্তব্য। সে কাজ ক'রে কিন্তু ক্যাথলিক কর্তাদের বিরাগভাজন হলেন। প্রথমে ছিলেন ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, ক্রমে হলেন বৈদান্তিক ক্যাথলিক, তারপরে বৈদান্তিক হিন্দু। সেখানেও গতির শেষ নয়। জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ করা তাঁর ভবিতব্য। তাই কালীঘাটে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দুমতে ফিরে এসেছেন, এমনকি কার্যত সন্ন্যাস ত্যাগ ক'রে, উপবীত ধারণ ক'রে, তাঁর পিতৃদত্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে জীবন শেষ করেছেন। এই শেষ পর্বে তাঁর মধ্যে প্রথম যৌবনের জাতীয়তার উন্মাদনা ফিরে এসেছে তা নিরামিষ জাতীয়তা নয়—ভেসেছেন জাতীয়তার অগ্নিস্রোতে—তাঁর হাতে 'সন্ধ্যা' পত্রিকা রক্তসন্ধ্যার দ্যুতি বিকিরণ করেছে—দিগন্তে দিগন্তে।

ব্রহ্মবান্ধবের জীবন নানা লক্ষণাক্রান্ত। অক্লান্ত পরিব্রাজক তিনি। কেবল ভারতের নানা স্থানে ঘুরেছেন, তাই নয়, সুদূর বিলাতে পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছিলেন—খ্রীস্টধর্ম নয়, বেদান্ত প্রচারের জন্য। ভারত পরিক্রমণ অবশ্য খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্যই।

প্রচারধর্মিতাও তাঁর স্বভাবে। সেজন্য নানা সংগঠন তৈরি করেছেন, শিক্ষকতা করেছেন এবং পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। সব কিছুই অবশ্য অচিরস্থায়ী—তারকার উদয় এবং তারকার বিলয় দ্রুত পরম্পরায়।

স্থাপন করেছিলেন—কলকাতায় 'ঈগল নেস্ট' (১৮৮৩), 'কংকর্ড ক্লাব' (১৮৮৬)। 'ইন্ডিয়ান একাডেমী' বিদ্যালয়—সিন্ধুপ্রদেশের হায়দরাবাদে (১৮৮৮)। জব্বলপুরে নর্মদাতীরে ক্যাথলিক মঠ (১৮৯৯)। কলকাতায় সারস্বত বিদ্যায়তন (১৯০২)। রবীন্দ্রনাথ

১৯০১-এ বোলপুর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করলে তার সংগঠনে অংশ নিয়েছেন।

পত্রিকা স্থাপন তাঁর অভ্যাসগত। যথা, 'ইয়ংম্যান', (১৮৮৩), 'দ্য হার্মনি' (১৮৯০), 'সিন্ধ্ টাইমস্' (১৮৯১), 'সোফিয়া' (১৮৯৪), 'টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী' (১৯০১, নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায়), 'সন্ধ্যা' (১৯০৪), 'করালী' ('সন্ধ্যা'র অর্ধসাপ্তাহিক সংস্করণ) এবং 'স্বরাজ' (১৯০৭)। এছাড়া বহু পত্রিকার নিয়মিত লেখক।

বিরাট পাণ্ডিত্য ছিল, বিশেষত হিন্দু ও খ্রীস্টান ধর্মশাস্ত্রে। অনেক ভাষা জানতেন। মাতৃভাষা বাংলা বাদে সংস্কৃত ও হিন্দীতে ব্যুৎপন্ন। অল্প-বিস্তর জানতেন—উর্দু, ফার্সী, সিন্ধী, গুরুমুখী [পাঞ্জাবী], মারবাড়ী, ভাটিয়া, মারহাট্টী! বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরেজী ছাড়া লাটিন, গ্রীক, হিব্রু।

একেবারে প্রথম যৌবনের রাজনৈতিক বাসনার কথা বাদ দিলে, ১৯০২ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মবান্ধব রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব রাখেননি। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন: "বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তখন আমার সহায় ছিলেন—তখন তাঁহার মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক উৎসাহের অঙ্কুর-মাত্রও কোনও দিন দেখি নাই—তিনি তখন একদিকে বেদান্ত অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান ধর্মের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন।" ('আত্মপরিচয়')। বঙ্গদেশ বিভাগের সরকারী পরিকল্পনা শোনার পর থেকেই তিনি খোলাখুলি রাজনৈতিক প্রচার-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এখানে উল্লেখ্য, ব্রহ্মবান্ধবের বেদান্তের সঙ্গে বিবেকানন্দের বেদান্তের মাত্রাগত পার্থক্য আছে। বিবেকানন্দের কাছে বেদান্ত যেখানে সর্বমানবের জীবনসত্য, তদনুযায়ী বিশ্ববাণী, ব্রহ্মবান্ধব সেখানে বেদান্তকে হিন্দুদের সমাজসংগঠনের ভিত্তিরূপে দেখেছেন, যার মূলে আছে বর্ণাশ্রম। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনে তিনি হিন্দুধর্ম-দর্শন সংক্রান্ত একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন, তার মধ্যে ফাল্গুন ১৩০৮ সংখ্যায় "হিন্দুজাতির মূল ভিত্তি যে বর্ণাশ্রম ধর্ম...তাহা সবিশেষ যুক্তিপ্রমাণ সহযোগে" বর্ণনা করেছেন। তিনি 'সন্ধ্যা'র অনুষ্ঠানপত্রে লিখেছিলেন: "যতই ঘুরপাক খাই না কেন, খোঁটা ছাড়িবার যো নাই। সেই বেদবেদান্ত, সেই ব্রাহ্মণ, সেই বর্ণধর্ম ছাড়া হিন্দু সন্তানের আর গতি নাই।" "বেদ-ব্রাহ্মণ-বর্ণধর্মে" দৃঢ় বিশ্বাস রক্ষা ক'রে স্বরাজ পত্রিকার অনুষ্ঠানপত্রে তিনি লেখেন: "অদ্বৈতরসসঞ্জীবিত বৈদিক সংস্কার-পরিপুষ্ট শ্রীকৃষ্ণচরণকমল-সুবাসিত অচল অটল হিন্দুসমাজ।" স্বরাজ পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা নির্ণয় এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ সমর্থক কিনা সন্দেহ, বরং বলা চলে বড় অংশে ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ছিল। বিবেকানন্দের বেদান্ত কী, সেকথা আগেই বলেছি; বিবেকানন্দ বেদান্তকে গ্রহণ করলেও বেদের কর্মমার্গের সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন না, এবং প্রাচীন বর্ণধর্মের উপর সমাজভিত্তিকে স্থাপন করলে দেশ গতিশীল হবে, এই বিশ্বাসও তাঁর ছিলনা। বিবেকানন্দের বেদান্ত সর্বোচ্চ মানবদর্শন—সর্বমানবের নিত্য আশ্রয়।

তবু, সমকালের প্রচণ্ড দুই শক্তিধর পুরুষ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে জীবনের শেষ পর্যায়ে কিভাবে ব্রহ্মবান্ধব গ্রহণ করেছেন, সে ইতিহাস প্রণিধানযোগ্য। বিবেকানন্দ এবং বেদান্তের বিরুদ্ধে তিনি রোমান ক্যাথলিকরূপে ক্ষুরধার অস্ত্র শানিয়েছিলেন—তাঁর সম্পাদিত 'সোফিয়া' পত্রিকায় তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সেই ব্রহ্মবান্ধব কর্তৃক বিলাতে বেদান্ত প্রচার এবং বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের প্রশস্তি অবশ্যই বিস্ময়কর পরিবর্তন। সোফিয়া

পত্রিকায় দেখা যায়, ব্রহ্মবান্ধব শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যপ্রাপ্তির কথা স্বীকার করেছেন এবং অধ্যাত্মপুরুষরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমার কথাও বলেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতাররূপে প্রচারের বিরোধিতা করেছেন জোরালোভাবে। অথচ স্বরাজ পত্রিকার লেখাগুলিতে কার্যত অবতাররূপেই তাঁর রামকৃষ্ণবন্দনা—যদিও অবতার শব্দটি উচ্চারিত হয়নি।

[ব্রহ্মবান্ধবের জীবনের ঘটনাগুলি শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-রচিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত "ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়" পুস্তক থেকে সংগৃহীত। উদ্ধৃতিগুলিও ঐ রচনার।

স্বরাজ পত্রিকায় প্রকাশিত বানান অশুদ্ধি-শুদ্ধ রক্ষিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ কে। কে তাই জানি না। এই পর্য্যন্ত জানি যে এই সোণার বাঙলায় এমন সোণার চাঁদ—গোরাচাঁদের পর—আর উদয় হয় নাই। চাঁদেও কলঙ্ক আছে—কিন্তু রামকৃষ্ণ-চাঁদে কলঙ্করেখাটুকুও নাই। আহা—তাঁহার ভগবতী-তনু পাবকের ন্যায় পবিত্র ও নির্ম্মল ছিল। বণিতা-বিলাস-দোষে উহা কখনও কলুষিত হয় নাই। তাঁর যখন বিবাহ হয়—তখন তাঁহার পত্নীর বয়স আট বৎসর। বিবাহের আট বৎসর পরে ঐ সতীলক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। লক্ষ্মী তখন যোড়শী যুবতী। রামকৃষ্ণ দেব ঐ লক্ষ্মীকে বিধিমতে পূজা করেন ও নিজের জপের মালা তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গের পর রামকৃষ্ণ-চন্দ্রে যোড়শ-কল-চন্দ্রিকা ফুটিয়া উঠে। ঐ শোভা ইতিহাসে অতি দুর্ল্লভ। অনেক অনেক সাধু মহাজন সহধর্ম্মিণী ত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু রামকৃষ্ণের ত্যাগ—ত্যাগ নয়—অঙ্গীকারের পরাকাষ্ঠা।—চন্দ্রমা ছাড়া যেমন চন্দ্রিকা থাকিতে পারে না—তেমতি মা লক্ষ্মী আমাদের—সেই যোড়শী পূজার দিন হইতে রামকৃষ্ণ-শশীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্রমণ্ডলিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে ত এক দিন সেই রামকৃষ্ণ-পূজিত-লক্ষ্মীর চরণপ্রান্তে গিয়া বসিও আর তাঁহার প্রসাদ-কৌমুদীতে বিধৌত হইয়া রামকৃষ্ণ-শশিসুধা পান করিও—তোমার সকল পিপাসা মিটিয়া যাইবে।

রামকৃষ্ণ কে। রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানী। রামকৃষ্ণ বলিতেন যে বেদ পুরাণ সমস্ত শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে—কেন না উহা মানুষের দ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে। কেবল একমাত্র ব্রহ্মবিজ্ঞান উচ্ছিষ্ট হয় নাই। উহা বোবার স্বপ্নের মত। যে দেখে সেই জানে—অপরকে উহা বলিতে পারে না।

রামকৃষ্ণ কে। তিনি সাধক-চূড়ামণি। উচ্ছ্বাসময়ী আবেগময়ী ভাবময়ী সাধনার বলে তিনি সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ ভাব আহরণ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্ণতা প্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে—যোগীর সমাধি গোপীজনের মাধুর্য্য শাক্তের ভৈরব-ভাব অভেদ-সমন্বয় লাভ করিয়াছিল। তিনি মহম্মদীয় সাধনাও করিয়াছিলেন। এমন কি—তিনি যীশুভাবেও ভাবিত হইয়াছিলেন।

ভগবান্ রামকৃষ্ণ নিজ জীবনে—অচল অটল ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া—সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া—সকল ভেদভাবকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন—নবাগত শক্তির খেলাকে অদ্বৈতবিলাসিনী করিয়া ভারতকে ধন্য করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ—কামিনী-কাঞ্চন-বিজয়ী—ব্রহ্মবিজ্ঞানী—ভক্ত-চূড়ামণি—লোকরক্ষার সেতু—ভাবসমন্বয়ের সাগর।

নমস্তে রামকৃষ্ণায়।

[রবিবার ১০ই চৈত্র, ১৩১৩ সাল। ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

রাণী রাসমণির কালীবাটী

[ভাগীরথীর] শ্যামল-কাননচ্ছায়া-বহুল তটদেশ শোভা করিয়া গত শতাব্দীতে কত না ভক্তের ঐকান্তিকী বাসনা আকার ধারণ করিয়া আজ আমাদের নয়ন চরিতার্থ করিতেছে। ইহার কূলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে সকল উদ্যানবাটিকা বা দেবমন্দির আজও পথিকের চক্ষে পড়ে রাণী রাসমণির কীর্ত্তি উহাদের মধ্যে একটী। যাঁহার প্রসাদে আজ রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী এক তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে তাঁহার কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঐ স্বর্গীয়া রাণীর কীর্ত্তি-কাহিনীর দুই একটা উল্লেখ করিব।

রাসমণি দরিদ্রের কন্যা। পিতা হরেকৃষ্ণ দাস হালিসহরের নিকট কোনা গ্রামে বাস করিতেন। সেই সময়ে কলিকাতার জানবাজারের প্রীতরাম মাড় ব্যবসাদারি ও মুৎসুদ্দিগিরি করিয়া ধনী হইয়াছিলেন। এই প্রীতরামের দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্রের তৃতীয় পক্ষের পত্নী রাসমণি। রাসমণির বিবাহের পূর্ব্বে প্রীতরামের প্রথম পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত হন, দ্বিতীয়পুত্রও এতদিন নিঃসন্তান, সেই জন্য রাসমণি বিবাহ হইয়া অবধি অত্যন্ত আদরের পুত্রবধূ হইয়াছিলেন। সেই আদরে তাঁহার হৃদয় ও মনে যে সকল গুণ ছিল তাহা প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। যদিও তাঁহার বুদ্ধিমত্তা উদারতা ও দানশীলতা প্রভৃতি গুণ সকল বিধবাবস্থাতেই প্রকাশ পায়। তথাপি সধবাবস্থাতেও তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর চতুর্থদিবসে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন ঘাটে নামিবার বড় কষ্ট। সুবিধা মত একদিন পতিকে এই কথা জানাইয়া তাঁহাকে সাধারণের জন্য একটী ঘাট করিয়া দিতে বলিলেন ও সেই ঘাট প্রস্তুত হইল। ইহাই রাজচন্দ্র দাসের ঘাট বা বাবু ঘাট বলিয়া বিখ্যাত। যে রাস্তা এখনও মাড়বাবুদের বাটী হইতে এই ঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহাও বিস্তর খরচে রাজচন্দ্র বাবু প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, ও এখনও বাবুরোড বলিয়া উহা পরিচিত। ১২৪৩ সালে রাণী রাসমণি বিধবা হন। ধনী হিন্দুর বিধবা ব্রত পর্ব্ব তীর্থযাত্রা ইত্যাদিতে মন দিলেন। এক দিকে বৈষয়িক তত্ত্বাবধান করিতেন অপরদিকে দান ধ্যানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাঁহার জীবনের দুই একটী ঘটনা হইতে পাঠক বুঝিয়া লইবেন।

জানবাজার মাড়েদের রূপার রথ আছে অনেকেই জানেন। ১২৪৫ সালে রাসমণি এই রথোৎসব আরম্ভ করেন। তাঁহার রৌপ্যরথ নির্ম্মাণের অভিলাষ জানিয়া জামাতারা এক ফিরিঙ্গি স্বর্ণকার হ্যামিল্টন কোম্পানিকে রথ নির্ম্মাণের ভার দিবার উদ্যোগ করেন। তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া বলেন—ম্লেচ্ছদের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ? আমাদের দেশে কি আর স্বর্ণকার নাই? তখন সময় অতি অল্প আছে বলিয়া জামাতারা আপত্তি করেন। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কথানুসারেই চলিতে হইল—দেশীয় স্বর্ণকারে রথ নির্ম্মাণ করিল।

এক বৎসর ধুমধামের সহিত দুর্গোৎসব আরম্ভ হইল। সপ্তমীর প্রাতে কলা-বৌ স্নান করাইতে যাইতে হইবে। জানবাজারের রাস্তা দিয়া জয়ঢাক বাজাইয়া স্নান যাত্রা হইল। একজন ফিরিঙ্গি তাহার বাটীর সম্মুখে ঢাক বাজাইতে নিষেধ করে। রাসমণির নিকট এই সংবাদ আসিলে তিনি সে নিষেধ মানিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া আদেশ দেন। পুলিসে খবর গেল। পর দিবস রাসমণি আদেশ করিলেন—পঞ্চাশ জন ঢাকী তাঁহার বাটী হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত ঢাক বাজাইয়া

যাইবে। পুলিস বিজ্ঞাপন দিল—বিনা পাশে যাইতে পারিবে না। ইহা হইতেই পাশের সৃষ্টি। রাণী কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। জানবাজার বাবু রোড তাঁহার রাস্তা। তিনি সে রাস্তা হইতে অন্য রাস্তায় যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন কোম্পানি অনুরোধ করিয়া পথ খোলাইলেন—রাণীর প্রতিজ্ঞা রহিল। রাণী শেষ কাল পর্য্যন্ত ঐ রাস্তা তাঁহার খাসে রাখিয়াছিলেন! এই ঘটনা লইয়া সে সময় একটী ছড়া চলিয়া গিয়াছিল—"অষ্ট ঘোড়ার গাড়ী দৌড়ায় রাণী রাসমণি—রাস্তা বন্ধ কর্‌তে পার্‌লে না কোম্পানি।"

এই সময় গঙ্গায় মাছ ধরিবার জন্য সরকার হইতে এক কর আদায় করিবার প্রস্তাব উঠে। ধীবরেরা উত্ত্যক্ত হইয়া তাঁহার আশ্রয় লয়। তিনি তাহাদের অভয় দান করিলেন। জামাতাদের আদেশ করিলেন—হিসাব করিয়া দেখ—কাশীপুর হইতে মেটিয়াবুরুজ পর্য্যন্ত মাছ ধরিবার জন্য কত খাজনা দিতে হইবে। হিসাব হইলে সরকারে দশ হাজার টাকা জমা দিলেন ও রেজেষ্টারী করা পাট্টা লইলেন। কয়েকদিন যায়— এক দিন হঠাৎ রাণী আদেশ দিলেন—আজ নদীতে জাহাজ ষ্টীমার বা অন্য কিছু যাইতে দিও না—বয়ায় বয়ায় শিকল দিয়া পথ বন্ধ কর। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। পুলিশের সহিত গোল বাধিল, মোকদ্দমা উঠিল। সরকার বাহাদুর বুঝিলেন—এ বড় কঠিন ঠাঁই। গঙ্গার জলকর রহিত হইল।

সিপাহীদিগের হাঙ্গামার সময় একদিন রাণী রাসমণির দৌহিত্রেরা বাড়ীর বারেন্দায় বৈকালে বসিয়া আছেন, দেখিলেন কয়েকজন গোরা সম্মুখের দোকানে উৎপাত করিতেছে। তাঁহারা দ্বারবানদিগকে আদেশ করিলেন উহাদের তাড়াইয়া দাও। তাড়াইতে যাইয়া সেই গোরা কয়টী প্রহৃত হয়। তাহারা ফিরিয়া এক দল সৈন্য আনিয়া রাসমণির বাটী অবরোধ করে। দ্বারবানেরা ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিল। অন্তঃপুরে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। অন্তঃপুরবাসিনী সকল রমণী পিছনের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া অপর এক বাটীতে প্রস্থান করিলেন। রাসমণি কিন্তু গৃহ পরিত্যাগ করিলেন না। কতকগুলি চাবি ও একখানা তরবারি হস্তে লইয়া নিজ গৃহে বসিয়া রহিলেন। এদিকে গোরারা বহির্বাটীতে প্রবেশ করিয়া দ্বারবান দুই একজনকে আহত করিতে লাগিল ও আসবাব আদি অনেক নষ্ট করিতে লাগিল। জামাতা মথুরামোহন তখন বাটীতে ছিলেন না। তিনি আসিয়া কর্ণেলকে বলিয়া সৈন্যদিগকে নিবৃত্ত করেন। সে দিনের উৎপাত থামিল বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ উৎপাতের আশঙ্কায় রাণী রাসমণি আদেশ করেন বার জন গোরা তাঁহার বাটীতে পাহারায় নিযুক্ত থাকিবে। সেই সময় হইতে প্রায় দুই বৎসর তাঁহার বাটীতে এইরূপ পাহারা নিযুক্ত ছিল। ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহার যে সমস্ত আসবাব নষ্ট হইয়াছিল সে সমস্তের ক্ষতিপূরণ বাবত সমস্ত টাকা সরকার হইতে আদায় করিয়াছিলেন।

তাঁহার জমিদারী মকিমপুর পরগণায় নীলকরের উৎপাত হয়। উৎপীড়িত প্রজার কষ্ট শুনিয়া তিনি পঞ্চাশ জন দ্বারবান পাঠাইলেন এবং স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা নায়েবকে উপদেশ দিলেন অত্যাচারী নীলকর সাহেবকে সমুচিত শাস্তি দিবে। নীলকর ডোনালড যে উত্তম মধ্যম শিক্ষা পায় তাহাতে প্রায় মৃতপ্রায় হয়। মোকর্দ্দমা হয়, কিন্তু মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হয়। সেই অবধি সেখানে নীলকরের উৎপাত স্থগিত হইল। রাণী রাসমণি ১২৬৭ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

এই সহৃদয়া, তেজস্বিনী, কীর্ত্তিমতী, ঐশ্বর্য্যশালিনী বঙ্গমহিলার জীবনের আরও অনেক আখ্যান আছে। সেই আখ্যান-মালার দুই একটা স্তবক ধরিয়া তুলিয়া দেখিলে যে গুণরাশির সৌরভ ফুটিয়া উঠে তাহারই সুমিষ্টতম বিকাশ—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে। ইহার প্রতিষ্ঠায় হিন্দুস্থাপত্য বিদ্যার মহিমা রক্ষিত হইয়াছে, তখনকার শিল্পিচাতুর্য্য প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, হিন্দুর ঐশ্বর্য্যভোগের সার্থকতার আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। আর ভোগের সহিত ত্যাগের,

সম্পদের সহিত নিস্পৃহতার, বিষয়ের সহিত সাধনার, লীলার সহিত শ্মশানের, রাধাবল্লভের সহিত শিব-শিবানীর সম্মিলন যে এখনও হিন্দুর দেশে সম্ভব, তাহা ঐ মন্দিরের পাদমূলে গঙ্গার তরঙ্গরাজি গাহিয়া গাহিয়া বহিয়া যাইতেছে।

রাণী রাসমণি অনেক তীর্থপর্য্যটন করেন। নানা তীর্থ ভ্রমণের পর তাঁহার বারাণসী যাইবার অভিলাষ হইল।

পঁচিশখানি বজরা সজ্জিত হইল, লোকজন পরিজন আমলা ডাক্তার বৈদ্য গাভী সঙ্গে লইবার আয়োজন হইল। সেই সময় বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত। রওনা হইবার পূর্ব্বরাত্রিতে রাসমণি স্বপ্ন দেখিলেন বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া দরিদ্র বিপন্নদিগকে অন্নদান আর গঙ্গাতীরে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে বলিতেছেন। প্রত্যূষে উঠিয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া যাহা কিছু দ্রব্যসম্ভার কাশীধামে লইয়া যাইবার জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা সমস্তই অন্নপূর্ণার নামে উৎসর্গীকৃত করিয়া দান করিতে আদেশ দিলেন, আর জামাতাদিগকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া কালীপ্রতিষ্ঠার জন্য গঙ্গাতীরে ভূমির সন্ধান করিতে বলিলেন। জামাতা মথুরামোহন কলিকাতার তিন ক্রোশ উত্তরে এক শত বিঘা জমি ক্রয় করিলেন। এই জমি লইয়া মোকদ্দমা হইয়াছিল। কিন্তু অধ্যবসায় বলে রাসমণি সকল বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া ফেলিলেন।

১২৫৯ সালে স্নানযাত্রার দিন দেবালয় প্রতিষ্ঠা হইল। ইহা প্রস্তুত ও প্রতিষ্ঠা করিতে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। আমরা এই দেবালয়ের মনোরম চিত্র দিলাম। প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কান্যকুব্জ, বারাণসী ও উড়িষ্যা প্রভৃতি নানাদেশ হইতে অনেক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ সমাগত হন। তাঁহারা যথাযোগ্য সমাদরে সৎকার লাভ করেন।

এই দেবালয়ের উত্তরে বৃহৎ পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যানের মধ্যে পঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠা আছে। গঙ্গার গর্ভ হইতে এক সুপ্রশস্ত ঘাট উঠিয়া চাঁদনী পর্য্যন্ত গিয়াছে। চাঁদনীর উত্তরে ও দক্ষিণে ছয় ছয় করিয়া দ্বাদশ মহাদেবের মন্দির। আর চাঁদনীর পূর্ব্বে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ দশ বিঘা পরিমাণ হইবে। এই প্রাঙ্গণেরও চিত্র দেওয়া গেল। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে ঐ দ্বাদশ শিবমন্দির আর তিন পার্শ্বে পরিচারক পূজারী প্রভৃতির থাকিবার স্থান। নবরত্ন মন্দির মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই মন্দিরেই নৃমুণ্ডমালিনী কালী মূর্ত্তি। মন্দিরের ভিতরে বাহিরে কারুকার্য্যনিপুণ শিল্পীর চারু কৃতিত্বের পরিচয়। মন্দিরের উত্তরে গোপীনাথের যুগলমূর্ত্তি দক্ষিণে নাট মন্দিরের প্রশস্ত দালান।

এখানে সদাব্রত আছে। তাহার জন্য প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা আয়ের দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। রাসমণি নিজেই এই সমস্ত সম্পত্তি দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত করিয়া যান। ইঁহাই রাণী রাসমণির প্রধান কীর্ত্তি। দানেই ইঁহার বীরত্ব। প্রকৃতই এমন দানশীলা নারী যে এই সে দিন বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিল, আমাদের বাঙ্গালী রমণীর হৃদয়ে যে এমন তেজ এমন বুদ্ধি এমন অধ্যবসায় এমন সহৃদয়তা ফুটিতে পাইয়াছিল ইহা ভাবিয়া কেবল কি তাহার বংশধরগণই গৌরবমণ্ডিত হইবেন—না সমস্ত বঙ্গবাসীও গৌরব বোধ করিবেন? যে কেহ এই কীর্ত্তি দেখিয়াছেন তিনিই বলিবেন যে এই গঙ্গাতীরবর্ত্তী দেবালয়ে মহতের প্রতিষ্ঠা আছে—সুকৃতির সৌরভ আছে। আর তাহা না হইলেই কি আর এখানে রামকৃষ্ণের মত ফুল ফোটে?

[১০ই চৈত্র, ১৩১৩ সাল]

রামকৃষ্ণ-কথা

অবতারণা

ভারতেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে। ভারতেই বেদবিহিত আশ্রমধর্ম্মের সুদৃঢ় বেষ্টনে উহা সুরক্ষিত হইয়াছে। আর বিধাতার নির্দ্দেশে পৃথিবীতে যত অংশাংশি ভেদবিরোধ আছে তাহা সমস্তই এই পুণ্যভূমি ভারতে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়-সূত্রে গ্রথিত হইয়া অদ্বৈত-তত্ত্বে পূর্ণতালাভ করিবে। পরে সেই পূর্ণ সমন্বয়ের আদর্শ পৃথিবীর সকল জাতিকে নিবৃত্তির আনন্দে সম্মিলিত করিবে। এই কারণেই ভারতে নানা শক্তির নানা জাতির মেলা লাগিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গীতোপনিষদে ঐ উদার সমন্বয়ের মন্ত্র শিখাইয়া গিয়াছেন। ঐ মন্ত্রবলে কতই না নব নব ভাব-সংঘর্ষ একতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। এখন আবার বিরোধ বাধিয়াছে। নূতন নূতন শক্তির টানে নূতন নূতন ভাববিলাসে ভারত আবার আন্দোলিত হইয়াছে। এই আন্দোলনে—এই আলোড়নে ভারতের প্রতিষ্ঠা কে রক্ষা করিবে। কে আবার ঐ শ্রীকৃষ্ণ-দত্ত মন্ত্র-বলে এই ভেদবৈষম্যের সামঞ্জস্য ঘটাইবে।

রাজা রামমোহন ও কেশবচন্দ্র সমন্বয়-বাদী ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ছিল না। তাই তাঁহারা পরস্ব আহরণ করিতে গিয়া কতকটা নিজস্ব হারাইয়াছিলেন। কর্ণধারের অভাবে অনেকেই নূতন ভাবের তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। এই বিপ্লবে সমাজ-ভঙ্গ রোধ করিবার জন্য ভগবান্ রামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনের বলে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ের পন্থা খুলিয়া দিয়াছেন। ঐ পন্থা ধরিলে গৃহচ্যুত হইতে হয় না অথচ পরকে আত্মীয় করিয়া লওয়া যায়। নবাগত শক্তি ও ভাবসকলকে অগ্রাহ্য করিলে বাঁচিতে পারা যাইবে না—উহারা তোমায় গৃহ হইতে টানিয়া বাহির করিবে। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগের যথাবিধি আদর করিতে হইবেক। ইহাই খাঁটি হিন্দুর লক্ষণ। ভগবান্ রামকৃষ্ণ খাঁটি হিন্দু সাধক ছিলেন। আগন্তুক ভাববিরোধগুলি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে মিলিত করিয়া লোকরক্ষার উপায় করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ এই শতাব্দীর লোকরক্ষার সেতু। তাঁহারই কথা আমরা আজ বলিব।

বাল্যাবস্থা।

অনেকেই জানেন জাহানাবাদ হুগলী জেলার একটী মহকুমা। এই মহকুমার চারি ক্রোশ পশ্চিমে শ্রীপুর কামারপুকুর গ্রামে রামকৃষ্ণদেবের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল। এই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জপ তপ নিরত নিষ্ঠাবান হিন্দু বলিয়া গ্রামের সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও অতি দয়াবতী ও সুশীলা ছিলেন। পরমহংসদেব এই দম্পতীর তৃতীয় পুত্র। তিনি ১২৪১ সালে ১০ই ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামকুমার ও মধ্যম ভ্রাতার নাম রামেশ্বর ছিল।

রামকৃষ্ণ পাড়াপ্রতিবেশীর আদরের নন্দদুলাল ছিলেন। তাঁহারা সকলে তাঁহাকে গদাই বলিয়া ডাকিত। গদাই তাঁহার বাল্যসখা ধনীর সন্তান গঙ্গাবিষ্ণু লাহার মাতার নিকট পুত্রাধিক স্নেহ

পাইতেন। ধনি নাম্নী এক কর্ম্মকার কন্যা তাঁহাকে লালন পালন করিয়াছিল। তাঁহার বাসনাক্রমে রামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকট পৈতার সময় ভিক্ষা গ্রহণ করেন। ধনিও তদবধি রামকৃষ্ণের ভিক্ষামাতা হইলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার ঠাকুর দেবতার প্রতি ভক্তির নানা লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। খেলাধূলা করিতে করিতে স্বহস্তে মাটীর ঠাকুর গড়িতেন ও পূজা করিতেন। তাঁহার লেখাপড়া শিক্ষায় বিশেষ কোনও আস্থা ছিল না, কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই মেধার বলে যাত্রা বা কীর্ত্তন প্রভৃতি যখন যাহা শুনিতেন কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন এবং এইরূপে সুগায়ক হইয়া উঠেন।

কলিকাতায় আগমন।

কলিকাতায় ঝামাপুকুরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ রামকুমার এক চতুষ্পাঠী খোলেন। কনিষ্ঠ বিদ্যার্থে সেখানে আসিলেন এবং স্বাভাবিক মিষ্ট স্বভাব ও সুকণ্ঠের গুণে শীঘ্রই প্রতিবাসী গৃহস্থদিগের প্রিয় হইয়া উঠেন।

এই সময়ে রাণী রাসমণি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামকুমারের খ্যাতি প্রতিপত্তি শুনিয়া তাঁহাকে দেবপূজার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। রামকৃষ্ণও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত গমন করিয়া প্রথমে বেশকারী পরে রাধাকৃষ্ণের পূজারী নিযুক্ত হন, পরে রামকুমারের লোকান্তর গমনে কালীরও পূজারী হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। কামারপুকুরের দুই ক্রোশ দূরে জয়রামপুরের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সারদামণির সহিত বিবাহ হইল। কিন্তু বিবাহই হইল ঘর সংসার আর কখনও পাতা হইল না। দেবী সারদামণি আজও জীবিতা। রামকৃষ্ণের ভক্তগণ তাঁহার সেবা করিয়া আজও কৃতার্থ হন।

সাধন আরম্ভ।

রামকৃষ্ণ অতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত কালীপূজা করিতেন। সে পূজা কেবল মন্ত্রপাঠ নহে। তিনি আরতি করেন, আরতি আর শেষ হয় না, দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া আর ফুরায় না, কখনও বা রোদন করিতেন কখনও বা প্রণাম করিতেন কখনও বা বালকের ন্যায় মা! মা! করিয়া কত কি আবদার করিতেন। আবার কখনও বা শক্তিসাধকদিগের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সঙ্গীতগুলি গাহিতেন। এইরূপ পূজা করিতে করিতে ক্রমে উন্মাদাবস্থা প্রাপ্ত হন। "মা আমায় দেখা দে মা" বলিয়া প্রায়ই অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। সে সময় পূজা করিতে করিতে কখনও নিজের মাথায় ফুল দিতেন। এই সময় হইতেই তাঁহার সাধনা আরম্ভ হইল। প্রথমে অহং নাশের নানা উপায় অবলম্বন করিলেন এবং তজ্জন্য নানা প্রকার নীচ জাতীয়ের হেয় কার্য্যকলাপ স্বহস্তে করিতে আরম্ভ করিলেন, তারপর গঙ্গাতীরে বসিয়া এক হস্তে টাকা অপর হস্তে মাটী লইয়া তোলা পাড়া করিয়া টাকা মাটী, মাটী টাকা—এইরূপ বিচার করিতে করিতে উভয়ই গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিতেন। এইরূপ বিষ্ঠা চন্দন লইয়া সাধন করিয়াছিলেন। ক্রমে কামিনী সম্বন্ধ বিচার করিয়া তাহাও পরিত্যাজ্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। তাঁহার সাধনাবস্থার প্রথম সোপানই কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ। এইরূপে তাঁহার উপদেশ-নিচয়ের সর্ব্ব প্রধান উপদেশের উৎপত্তি হয়। আজ আমরা এই মহদুপদেশের তত্ত্ব কথা আলোচনা করিতে বসি নাই। তাঁহার জীবনের নানা ঘটনায় যে ভাবতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহারও প্রস্ফুট চিত্র দিতে আমরা প্রবৃত্ত নহি। তবে তাঁহারই অনুগ্রহে, তাঁহারই কথামৃত পানে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

কামিনী ও কাঞ্চন জগতের সমস্ত সম্বন্ধ ও বিরোধের মূল। ব্যষ্টিভাবে উহাদিগকে গ্রহণ

করিলে বাসনাবিরোধ ঘটে। কিন্তু সমষ্টি ভাবে অঙ্গীকার করিলে ব্যষ্টিগত বাসনার ক্ষুদ্রতাগুলি নিবৃত্তির পূর্ণতায় পরিণত হয়। রামকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন যে উদার মঙ্গলময় মাতৃরূপই নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ—কামিনী-সম্পর্কজনিত রাগবিরাগের পূর্ণ সমন্বয়। তাই তিনি কামিনী মাত্রকেই মাতৃভাবে দর্শন করিতেন এবং কালীরূপে মায়ের ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনীর মূর্ত্তি দেখিতেন— আর তাঁহারই চরণে সচন্দন পুষ্প প্রদান করিয়া বলিতেন "মা, এই নে তোর ভাল এই নে তোর মন্দ আমায় ভক্তি দে—এই নে তোর সৎ এই নে তোর অসৎ এই নে তোর শুচি এই নে তোর অশুচি আমায় ভক্তি দে—এই নে তোর বিষ এই নে তোর অমৃত—আমায় ভক্তি দে।"

এই অবস্থার সময় মন্দিরের লোক তাঁহাকে কেহ বা উন্মাদ মনে করিত, কেহ বা ভণ্ড মনে করিত। যাঁহারা উন্মাদ মনে করিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত করিতেন, আর যাঁহারা ভণ্ড মনে করিতেন তাঁহারা তাঁহাকে নানা প্রকারে পরীক্ষা করিতেন। কিন্তু উৎপীড়ন ও পরীক্ষাই সাধনপথের প্রকৃষ্ট সোপান। রামকৃষ্ণদেব অবলীলাক্রমে সে সোপান উত্তীর্ণ হইলেন।

ব্রাহ্মণী।

এই সময় একদিন প্রাতঃকালে পরমহংসদেব দেখিলেন জাহ্নবী তটে এক এলোকেশী গৈরিকপরিহিতা সন্ন্যাসিনী বসিয়া আছেন। তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়কে উঁহাকে আনিতে বলিলেন। আসিতেই উভয়ে ভাবাবিষ্ট। সন্ন্যাসিনী বহুদিন হইতে যেন তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতেছিলেন—পরমহংসদেব "মা" বলিয়াই মহাভাবাবিষ্ট হইয়া রহিলেন। মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটিল।

রামকৃষ্ণ-জীবনে এই সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মণী বলিয়া আখ্যাত। ইনি কে, কোথা হইতে আসিলেন তাহা কেহ জানে না। ব্রাহ্মণী অসাধারণ গুণসম্পন্না ছিলেন—বেদবেদান্ত শাস্ত্রাদিতে ও সর্ব্বপ্রকার সাধন ভজন প্রণালীতে পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি দ্বাদশ বৎসর কাল রামকৃষ্ণ সন্নিধানে থাকেন এবং পরমহংসদেব তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সর্ব্বপ্রকার সাধনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

গুরু তোতাপুরী।

ইতিপূর্ব্বে তোতাপুরী নামক এক যোগীর নিকট পরমহংসদেব মন্ত্র গ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চবটী বর্গপরিমিত চারি হাত স্থানে হইয়া থাকে। ইহার এক কোণে নিম্ব, দ্বিতীয় কোণে বিল্ব, তৃতীয় কোণে অশ্বত্থ বা বট, চতুর্থ কোণে শেফালিকা ও মধ্যস্থলে আমলকী বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়। চতুর্দ্দিকে জবা ফুলের বেড়া তাহাতে অপরাজিতা। বা মাধবীলতা বেষ্টিত থাকে। পরমহংসদেবের ইচ্ছানুসারে মথুরাবাবু এই পঞ্চবটীতে বৃন্দাবনের ধূলা আনাইয়া দেন। গভীর নিশীথে লোক-কোলাহলের বহু দূরে জাহ্নবী-তটে এই পঞ্চবটীর মধ্যে বসিয়া রামকৃষ্ণদেব মন্ত্র সাধনা করিয়াছিলেন। তোতাপুরী দেখিলেন তিন দিন মধ্যে তাঁহার সমাধির অবস্থা লাভ হইল। তাঁহার এই সাধনা করিতে বিয়াল্লিশ বৎসর লাগিয়াছিল আর তাঁহার শিষ্যের এই সাধনা দেখিয়া তিনি প্রীত হইয়া এগার মাস পরমহংসদেবের সহিত বাস করেন।

উদারতা।

রামকৃষ্ণদেব যখন এই সকল সাধনায় সিদ্ধ হন তখন ব্রাহ্মণী তাঁহাকে অন্য সাধনপথের পথিক করিলেন। একে একে তাঁহাকে ঘোষপাড়ার নবরসিক দলের পঞ্চনামীদলের বাউলের নানাপ্রকার প্রণালী দিয়া লইয়া গেলেন। দক্ষিণাচারী পঞ্চমুণ্ডী সাধন করিবার সময় কারণ স্পর্শ করিতে হইলে তিনি জিহ্বায় স্পর্শ করেন নাই—কালী কালী বলিয়া কপালে ফোঁটা কাটিয়াছিলেন। এইরূপে সকল প্রণালীর সিদ্ধির জন্য তিনি সাধন করিয়াছিলেন। তান্ত্রিকেরা তাঁহাকে কৌল বলিয়া মানিত। কর্ত্তাভজারা সহজ বা আলেখ ভাবান্বিত জানিত, নবরসিকেরা অটুট অবস্থা দেখিয়াছিল, বাউলেরা সাঁই চিনিয়াছিল এবং বৈষ্ণবদিগের মহাভাব তাঁহাতে বিকশিত হইয়া উঠিত।

কিন্তু ইহাতেও তাঁহার উদার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে নাই। তিনি দেখিলেন ধর্ম্মলীলাময়ী পুণ্যভূমিতে এই যুগে মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় এই দেশে স্থান পাইয়াছে। তাঁহারও ইচ্ছা হইল এই সাধনপথও দেখিতে হইবে। গোবিন্দ দাস নামে এক ব্যক্তি এই সময় দমদমার নিকট মহম্মদীয় সাধন ভজন করিতেন। পরমহংসদেব তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিন দিন অভ্যাস করেন। এই দিনত্রয় তিনি কালীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই কালীর প্রসাদ ভক্ষণ করেন নাই।

কালীবাড়ীর দক্ষিণে যদুলাল মল্লিকের উদ্যান বাড়ীতে যীশুর চিত্রপট ছিল। একদিন হঠাৎ সেই চিত্র দেখিয়া তাঁহার যীশুর প্রতি ভক্তি জাগিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ যীশুর একটী ছবি আনিতে বলিলেন। সেই ছবি আজও তাঁহার দক্ষিণেশ্বরের ঘরে বর্ত্তমান আছে।

এতদ্ভিন্ন পরমহংসদেব রামচন্দ্রকে দুইভাবে সাধন করিয়াছিলেন—এক, হনুমান ভাবে অপর কৌশল্যাভাবে। কখনও বা "জয় রঘুবীর" বলিয়া বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িতেন আর কখনও বা স্নেহময়ী জননীর মত এক পিত্তলের রামচন্দ্রমূর্ত্তি লইয়া আদর করিতেন।

এই রামমূর্ত্তিও এখনও তাঁহার ঘরে আছে। এইরূপ নানাবিধ সাধনায় সিদ্ধ হইলে তাঁহার গুণসৌরভ বিকীর্ণ হইল। ঐ সৌরভে আজ চতুর্দ্দিক আমোদিত।

১২৯৩ সালে পরমহংস রামকৃষ্ণের দেহোপরম হয়। দেহের উপরম হইল বটে কিন্তু তাঁহার শক্তি ও তেজ দেশকে জাগাইতেছে ও মুক্তির দিকে লইয়া যাইতেছে।

[১০ই চৈত্র, ১৩১৩ সাল]

স্বামী বিবেকানন্দের কথা।

মহৎ জীবনের কথা বলিতে গেলে যতখানি মহত্ত্ব থাকা আবশ্যক, তাহা লেখকের নাই। অতি সঙ্কোচের সহিত স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে অগ্রসর হইতেছি।

আমি বিবেকানন্দকে এক সময়ে জানিতাম, তখন তিনি বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী---তখন কিন্তু তাঁহার নাম বিশ্ববিখ্যাত হয় নাই—তখন সেই প্রতিভার বহ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, উপযুক্ত সময় তখনও আসে নাই। সেই সময়ে আমি স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিয়াছিলাম। তখন তাঁহার সেই প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখশ্রী, সেই প্রতিভার জ্যোতিঃ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, এমন এক দিন আসিবে—যেদিন এই সন্ন্যাসী যুবকের নাম দিগ্‌দিগন্তে বিঘোষিত হইবে—যেদিন সমস্ত পৃথিবী অবাক্ হইয়া এই সন্ন্যাসী বাঙ্গালী যুবকের প্রতিভার আলোচনা কবিবে—যেদিন জ্ঞান গর্ব্বিত ইংলণ্ড আমেরিকা অবনত মস্তকে বাঙ্গালী সাধুর কথা শুনিবে—যেদিন বঙ্গদেশের নাম --স্বামী বিবেকানন্দের নাম—মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নাম দেশে দেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ঘোষিত হইবে—যেদিন সমস্ত সভ্যজগতের সম্মুখে তাহার ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইবে---যেদিন ইউরোপ ও আমেরিকা হিন্দুযোগীর পদপ্রান্তে বসিয়া উপনিষদ্ বেদান্তের পাঠ গ্রহণ করিবে।

সে-দিন আসিয়াছিল; সেই শুভ-মুহূর্ত্ত আসিতে বিলম্ব হয় নাই—হিন্দুর সেই বিজয় দুন্দুভির নিনাদ শ্রবণ করিবার জন্য কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় নাই।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো নগরে ধর্ম্মের মহাসমিতি আহূত হয়। দেশ দেশান্তর হইতে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সেই মহা সমিতিতে উপস্থিত হন। অপরিচিত অজ্ঞাতনামা স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীর বেশে সেই মহা সমিতিতে উপস্থিত হন। তখন পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারে নাই যে কি এক মহাশক্তি—কি এক অপূর্ব্ব প্রতিভা ঐ গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত আছে—কি অতুল বাগ্মিতা—কি অপরিমেয় শাস্ত্রজ্ঞান—কি পবিত্র ধর্ম্মপ্রাণতা ঐ গৈরিক বসনের নিম্নে লুক্কায়িত আছে।

মহাসমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া—ইংলণ্ডের ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ খ্যাতনামা ধার্ম্মিক ধর্ম্মযাজকগণ স্ব স্ব ধর্ম্মের মত ও মহিমা ঘোষণা কবিলেন। বাঙ্গলা দেশের ব্রাহ্ম সমাজের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক, স্বনামখ্যাত বাগ্মী স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সেই মহা সমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনিও সেই মহাসভায় বক্তৃতা করিলেন---ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মতের ব্যাখ্যা করিলেন।

তাহার পর গৈরিক বসনধারী, গৈরিক উত্তরীয় ও গৈরিক শিরস্ত্রাণধারী অপরিচিত বাঙ্গালী যুবক---বিবেকানন্দ তখনও যুবক—দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মুখশ্রীতে তখন যেন প্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল--সেই পণ্ডিতগণের সভায় একজন অপরিচিত অজ্ঞাতনামা যুবক সন্ন্যাসী হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান। অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পর্য্যন্ত এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

তখন ধীরে ধীরে সেই যুবক বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন—ক্রমে গ্রামে গ্রামে বক্তৃতার সুর উঠিতে লাগিল—হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র ব্যাখ্যা যুবকের মুখ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। যুবকের বক্তৃতাশক্তি—যুবকের শাস্ত্রজ্ঞান—যুবকের অকাট্য যুক্তি তর্কের প্রণালী দেখিয়া ...

সাধু-সমাজ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—সকলে অতৃপ্তভাবে এই বাঙ্গালী যুবকের কথা শুনিতে লাগিলেন—সভায় ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল—সমস্ত আমেরিকায় এই বক্তৃতা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইল,—সে আন্দোলন সে প্রশংসাধ্বনি আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হইয়া দেশ বিদেশে—নূতন ও পুরাতন পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ সত্যসত্যই প্রতিভার অবতার—স্বামী বিবেকানন্দ সত্যসত্যই মহাজ্ঞানী পুরুষ। তখন ভারতবর্ষ জানিতে পারিল—বঙ্গভূমি কি অমূল্য রত্নের প্রসবিনী। তাহার পর স্বামী বিবেকানন্দ দেশে ফিরিলেন—কলিকাতায় আসিলেন। শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্তের বিস্তৃত ঠাকুরবাড়ীর নাটমন্দিরে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিরাট সভা হইল—সেই সভায় স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিলাম। বহুকাল পূর্ব্বে হিমালয়ের নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রকাণ্ডকায় অশ্বত্থবৃক্ষমূলে রোগে শীর্ণ অথচ তেজঃপূর্ণ যে যুবককে দেখিয়াছিলাম—যাঁহার মুখের সুমধুর কথা শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম—যাঁহার সুকণ্ঠনিঃসৃত গান শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম—যাঁহার অনন্যসাধারণ ত্যাগ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম—যাঁহার নবযৌবনে বিষয়বিরাগ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম—সেই বিবেকানন্দকে গৌরবমণ্ডিত দেখিলাম—সেই বিবেকানন্দের কথা শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

কি তেজ সেই শরীরে—কি আধ্যাত্মিক বলে অনুপ্রাণিত তাঁহার কথাগুলি। সে কথা শুনিলে হৃদয়ে তাড়িতের সঞ্চার হয়। তাহার পর অনেক বার তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছি। সকল সময়েই দেখিয়াছি, কি এক মহাশক্তি সেই হৃদয়ের মধ্যে নিহিত—কি এক অপূর্ব্বভাবে ঐ সাধু সন্ন্যাসীর হৃদয় পরিপূর্ণ—কি সমবেদনা—গরিব দুঃখীর জন্য কি কাতরভাবে—দেশের মঙ্গলের জন্য কি আকুল আর্ত্তনাদ।

তারপর একদিন হঠাৎ শুনিলাম—সব শেষ—স্বামী বিবেকানন্দের নশ্বর দেহ ভাগীরথী তীরে পড়িয়া রহিয়াছে—তাঁহার দেবাত্মা সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছে। দৌড়িয়া গেলাম সেই বেলুড় মঠে—সেই ভাগীরথী তীরে। দেখিলাম সেই অপূর্ব্ব প্রতিভা—সেই দেবসন্তান—এখন নীরব নিস্তব্ধ। বন্ধুবান্ধবগণ সজলনয়নে মৃতদেহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান। নিম্নে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী কুলকুল শব্দে বহিয়া যাইতেছে বুঝি সাগরসঙ্গমে সাধু বিবেকানন্দের দেহত্যাগের সংবাদ দিতে যাইতেছে। গোধূলি সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের দেহ চিতায় ভস্ম করিয়া আমরা ঘরে ফিরিলাম। সেই দিন ভাগীরথী তীরে—বেলুড় মঠের সীমান্ত স্থানে যে দেহ ভস্মীভূত হইল—তাহা আর ফিরিবে না। অকালে—অসময়ে মায়ের আদরের গোপাল মায়ের কোলে চলিয়া গেলেন—ভারতবর্ষ একটী রত্ন হারাইল।

স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলিতে গেলে ঐ সকল কথাই মনে হয়—ঐ সকল দৃশ্যই নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠে।

বাঙ্গালী স্বামী বিবেকানন্দকে চিনিল না—এই বড় দুঃখ থাকিল। সেই অসীম হৃদয়ের মধ্যে যে প্রবল দেশানুরাগ ছিল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। দেশের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা পড়িলে স্বামীজি সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন;—তখন তাঁহার মুখে এক অপূর্ব্ব তেজের বিকাশ হইত। কর্ম্মবীর তখন অধীর হইয়া পড়িতেন। স্বামী বিবেকানন্দ যাহা লিখিতেন, তাহা প্রাণ খুলিয়া লিখিতেন— তাঁহার লেখার মধ্য দিয়া তাঁহার সেই পবিত্র হৃদয়ের ছবি দেখিতে পাওয়া যাইত। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের একটা কথার মত কথা তুলিয়া দিয়া—এই প্রস্তাবের শেষ করিব।

স্বামী বলিতেছেন, "জেনারেল ষ্ট্রঙ নামক এক ইংরেজ বন্ধু সিপাহীর হাঙ্গামার সময় এ দেশে ছিলেন। তিনি সহরের গল্প অনেক করতেন। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করা গেল

যে, সিপাহীদের এত তোপ বারুদ রসদ হাতে ছিল, আবার তারা সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী, তবে এমন কোরে হেরে মোলো কেন? জবাব দিলেন যে, তাদের মধ্যে যারা নেতা হোয়েছিল, সেগুলো অনেক পেছন থেকে "মারো বাহাদুর" "লড়ো বাহাদুর" কোরে চেঁচাচ্ছিল; অফিসার এগিয়ে মৃত্যুমুখে না গেলে কি সিপাহী নড়ে? সকল কাজেই এই "শিরদার ত সরদার।" মাথা দিতে পার ত নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই; তাইতে কিছু হয় না, কেউ মানে না।

স্বামীজিই যথার্থ শিরদার নেতা ছিলেন।

আর কি কেহ তেমন আছে?

শ্রীজ [জলধর সেন]

[২২শে বৈশাখ, ১৩১৪ সাল]

বিবেকানন্দ কে?

দিন কয়েকের জন্য আমি বোলপুরের আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যেমন হাবড়া ইষ্টিশানে পা দিলাম অমনি কে বলিল—কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।—শুনিবামাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ানো কথা নয়—ঠিক যেন একটা ছুরি বিঁধিয়া গেল। বেদনার গভীরতা কমিয়া গেলে আমার মনে হইল—বিবেকানন্দের কাজ কেমন করিয়া চলিবে? কেন—তাঁহার ত অনেক উপযুক্ত বিদ্বান গুরুভাই আছেন—তাঁহারা চালাইবেন। তবুও যেন একটা প্রেরণা হইল—তোমার যতটুকু শক্তি আছে ততটুকু তুমি কাজে লাগাও—বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গিজয়-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্ত্তেই স্থির করিলাম যে বিলাত যাইব। আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই যে বিলাত দেখিব। কিন্তু সেই হাবড়ার ইষ্টিশানে স্থির করিলাম—বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম—বিবেকানন্দ কে। যাহার প্রেরণাশক্তি মাদৃশ হীনজনকে সুদুর সাগর পারে লইয়া যায়—সে বড় সোজা মানুষ নয়। তাহার কিছুদিন পরেই সাতাইশটি টাকা লইয়া বিলাত যাইবার জন্য কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিলাম। অবশেষে বিলাত গিয়া উক্ষপার (Oxford) কামব্রজে (Cambridge) বেদান্তের ব্যাখ্যা করিলাম। বড় বড় অধ্যাপকেরা আমার ব্যাখ্যান শুনিলেন ও হিন্দু অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া বেদান্ত বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে বলিয়া স্বীকার করিলেন। ঐ অধ্যাপকেরা যে সকল চিঠি আমায় লিখিয়াছেন তাহা আমি ছাপাই নাই। ছাপাইলে বুঝিতে পারা যাইবে বিলাতে বেদান্তের প্রভাব কিরূপ গভীর হইয়াছিল। আমি সামান্য লোক। আমার দ্বারা যে এত বড় একটা কাজ হইয়া গেল—তাহা আমার কাছে ঠিক একটি স্বপ্নের মত। এই সমস্তই বিবেকানন্দের প্রেরণাশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে—অঘটন ঘটিয়াছে—আমি মনে করি। তাই অনেক সময় ভাবি—বিবেকানন্দ কে। বিবেকানন্দ যে প্রকাণ্ড কাজ ফাঁদিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিবেকানন্দের মহত্ত্বের ইয়ত্তা করা যায় না।

আর একবার বিবেকানন্দের সঙ্গে কলিকাতায় হেদোর ধারে আমার দেখা হয়। আমি বলিলাম—ভাই চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন। এস—একবার কলিকাতা সহরে একটা বেদান্ত-বিজ্ঞানের রোল তোলা যাউক। আমি সব আয়োজন করিয়া দিব। তুমি একবার আসরে আসিয়া নামো।—বিবেকানন্দ কাতরস্বরে বলিল—ভবানী ভাই—আমি আর বাঁচিব না (তাহার তিরোভাবের ঠিক ছয় মাস পূর্ব্বের কথা)—যাহাতে আমার মঠটি শেষ করিয়া কাজের একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারি—তাহারি জন্য ব্যস্ত আছি—আমার অবসর নাই। সেই দিন তাহার সকরুণ একাগ্রতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে লোকটার হৃদয় বেদনাময়—ব্যথায় প্রপীড়িত। কাহার জন্য বেদনা কাহার জন্য ব্যথা। দেশের জন্য বেদনা—দেশের জন্য ব্যথা। আর্যজ্ঞান আর্য্যসভ্যতা বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে—তাহার স্থলে যাহা ইতর যাহা অনার্য্য তাহাই সূক্ষ্মকে উদারবস্তুকে আর্য্যতত্ত্বকে পরাভূত করিতেছে—আর তোমার সাড়া নাই ব্যথা নাই। বিবেকানন্দের হৃদয়ে ইহার যন্ত্রণাময় সাড়া পড়িয়াছিল। সেই সাড়া এত গভীর যে উহাতে মার্কিণ ও য়ুরোপের চৈতন্য হইয়াছিল। ঐ ব্যথার কথা ভাবি—বেদনার কথা চিন্তা করি—আর জিজ্ঞাসা করি—বিবেকানন্দ কে। দেশের জন্য ব্যথা কি

কখন শরীরিণী হয়। যদি হয় ত বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।

এখন বিবেকানন্দের সম্বন্ধে দুই একটা স্থূল কথা বলি। বিবেকানন্দের পিতৃদত্ত নাম—নরেন্দ্র নাথ দত্ত। নরেন্দ্রের পিতার নাম ৺বিশ্বনাথ দত্ত। তিনি একজন কলিকাতার টোর্ণী ছিলেন। বিশ্বনাথ দত্তের বাটি শিমলা কলিকাতায়। ঐ উহার চিত্র দেখুন। নরেন্দ্রের তিন ভাই। নরেন্দ্র জ্যেষ্ঠ—মহেন্দ্র মধ্যম—ভূপেন্দ্র কনিষ্ঠ। মহেন্দ্র পারস্য তুর্কিস্থান আরবিস্থান পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাহার দুর্দ্দমনীয় তেজ ও বীরত্বের কথা শুনিলে চমকিত হইতে হয়। ভূপেন্দ্র—সুবিখ্যাত যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক। ভূপেনের হৃদয় তাহার জ্যেষ্ঠের মত অনলময় [,] স্বরাজ-যজ্ঞে সেই অনল ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিতেছে। উহা নিবিবে না কারণ ব্রহ্মচর্য্যের ও স্বার্থ্যত্যাগের আহুতির দ্বারা উহা পরিপুষ্ট। নরেন্দ্র ছেলে বয়সে বড় আমুদে ছিলেন। তাস খেলিতে—ইয়ারকি দিতে—তামাক ফুঁকিতে—গাওনা বাজনা করিতে—এমন আর দুটি ছিল না। কিন্তু ঐ আমোদের মধ্যে কোন ইতরামি বা কদর্য্যতা দেখা যাইত না। প্রাণটা খোলা—গড়ের মাঠ—যত মাড়িয়ে যেতে পার মাড়িয়ে যাও। এই যৌবনের আমোদপ্রমোদের সময়েই তাঁহার এক স্পর্শমণির সঙ্গলাভ হইল। রামকৃষ্ণ—সেই স্পর্শমণি। রামকৃষ্ণের লীলা সম্বরণের পর নরেন্দ্র—বিবেকানন্দ নাম ধারণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—দশ বৎসর ধরিয়া ভিক্ষা করিয়া ভারত পর্য্যটন করিলেন—মার্কিণে গিয়া বেদান্ত প্রচার করিলেন। ভারতের গৌরব দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত হইল।

আমরা নরেন্দ্রের মাতার চিত্র দিলাম। নরেন্দ্রের মাতা রত্নগর্ভা। মা—অমন রত্ন হারাইয়াছেন। হারাইয়াছেন কি—ব্যবহারতঃ হারাইয়াছেন—পরমার্থতঃ হারান নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সুতের চরিত্র সৌরভে ভারত আমোদিত। আহা—মায়ের ছবিখানি দেখ—দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে নরেন্দ্র মায়ের ছেলে বটে—আর মাতা ছেলের মা বটে।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান কীর্ত্তি—বেলুড় মঠ। বারান্তরে আমরা মঠের ইতিবৃত্ত ও ছবি দিব ও তাঁহার সন্ন্যাসী গুরু ভাইদের পুণ্যচরিত্র ও কার্য্যকলাপ কীর্ত্তন করিব।

[২২শে বৈশাখ, ১৩১৪ সাল]

স্বামী বিবেকানন্দ

এই অশান্তির দিনে উদাসীন সন্ন্যাসীর কথা লইয়া আলোচনা করা কি সঙ্গত! স্বামীজি কামিনী-কাঞ্চন-বিরক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন বটে কিন্তু তিনি ব্যথার ব্যথী ছিলেন। অহঙ্কার-বিমূঢ় ফিরিঙ্গি জাতি ভারতের জ্ঞানবিদ্যা ধর্ম্মকর্ম্ম সভ্যতা-সমাজকে পদ-দলিত করিতেছে—জগতের নিকটে উহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া প্রদর্শন করিতেছে—উহার মূল উৎপাটন করিয়া পাশ্চাত্য স্থূল আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর ভারত সন্তানেরা কোথায় ইহার প্রতিকার করিবে— না আত্মবিস্মৃত হইয়া কাচমূল্যে কাঞ্চন বিক্রয় করিতেছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যথাই তাঁহাকে সাগরপারে সুদূর ফিরিঙ্গিস্থানে লইয়া গিয়াছিল। ঐ মায়াবীদের দেশে গিয়া তিনি একাকী আর্যজ্ঞানের বিজয়ভেরী বাজাইয়াছিলেন। কে এই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী—ইঁহার স্পর্ধা ত কম নয়—স্থূলবিজ্ঞানদৃপ্ত ফিরিঙ্গির কোর্টের ভিতরে গিয়া সিংহনিনাদে ঘোষণা করিলেন— হিন্দু জাতি জগতের গুরু—একমাত্র হিন্দুর নিবৃত্তিময়ী সভ্যতাই জগতকে শান্তি ও একতার পথে লইয়া যাইতে পারে।—ঐ বিজয় ভেরীর রব—ঐ সিংহনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া ফিরিঙ্গিস্থানের নরনারীরা চকিত স্তম্ভিত হইয়াছিল। তাহারা স্বীকার করিয়াছিল যে আর্যজ্ঞানের অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান নাই—সকল বিজ্ঞান সকল কর্ম্মকৌশল—বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বদ্বারায় উৎকর্ষ ও চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বামীজি—আমি তোমার যৌবনের বন্ধু—তোমার সহিত কত আমোদ প্রমোদ করিয়াছি—বনভোজন করিয়াছি—গল্প-গাছা করিয়াছি। তখন জানিতাম না যে তোমার প্রাণে সিংহবল আছে—তোমার হৃদয়ে ভারতের জন্য আগ্নেয়-পর্ব্বত-ভরা ব্যথা আছে। আজ আমিও আমার ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া তোমারই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তোমার অনুষ্ঠিত ব্রতের সমাধা সহজে ত হইবে না। কত বাধা বিঘ্ন জয় করিতে হইবে—কত ব্রতবিদ্বেষী নিশাচর সংহার করিতে হইবে —তবে ত উহার সিদ্ধি হইবে। এই ঘোর সংগ্রামে যখন ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত হইয়া পড়ি—অবসাদ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে—তখন তোমার প্রদর্শিত আদর্শের দিকে দেখি—তোমার সিংহবলের কথা ভাবি—তোমার গভীর বেদনার অনুধ্যান করি। অমনি অবসাদ চলিয়া যায়—কোথা হইতে দিব্য-লোক দিব্যশক্তি আসিয়া প্রাণমনকে ভরপুর করিয়া ফেলে [।] স্বামী বিবেকানন্দ স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ঐ ভিত্তির উপরে যে স্বরাজ-মন্দির নির্ম্মিত হইবে—তাহার চূড়ায় আর্যজ্ঞানের স্বর্ণকলস দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিবে—উহাতে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার বসিবে—উহার প্রাঙ্গণে ফিরিঙ্গিপ্রমুখ জাতিরা সেবাদাস হইয়া মায়ের প্রসাদ লাভ করিবে।

[২২শে বৈশাখ ১৩১৪ সাল]

নির্দেশিকা

গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যক্তি, স্থান, গ্রন্থ, পত্রিকা ও প্রবন্ধের নাম পদানুযায়ী বিন্যস্ত। সমগ্র গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখ প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায়, এ কারণে ওই দুটি নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়-গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যক্তিনাম, পদবী (Surname) অনুসারে বিন্যস্ত হলেও কিছু ক্ষেত্রে যেমন সন্ন্যাসীগণের নাম ব্যক্তিনামে অন্তর্ভুক্ত।

ইংরেজী বিভাগে কেবল গ্রন্থ, পত্রিকা ও প্রবন্ধের নাম দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের নাম বাংলা বিভাগে প্রদত্ত।